কালবেলা

সমরেশ মজুমদার

অনিমেষ যখন প্রথম কোলকাতায় পা রেখেছিল তখন রাস্তায় ট্রাম জ্বলছে, গুলি চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা এই তরুণটি সেদিন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। তারপর আর পাঁচটা মানুষের মত গা ভাসিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ তার জীবনের মোড় পাল্টালো। ছাত্র-রাজনীতি তাকে নিয়ে গেল জটিল আবর্তে। এই দেশে আর দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দুর্বার বাসনায় বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মনুষ্যত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ তাকে সরিয়ে নিয়ে এল উগ্র রাজনীতিতে। সত্তরের সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে দগ্ধ করে সে দেখল, দাহ্যবস্তুর কোন সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সে যখন বিকলাঙ্গ তখন বিপ্লবের শরিকরা হয় নিঃশেষ নয় গুছিয়ে নিয়েছে আখের।
অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল মাধবীলতাকে। মাধবীলতা কোন রাজনীতি করেনি কখনো, শুধু তাকে ভালবেসে আলোকস্তম্ভের মত একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। খরতপ্ত মধ্যাহ্নে যে এক গ্লাস শীতল জলের চেয়ে বেশি কিছু হতে চায় না। বাংলাদেশের এই মেয়ে যে কিনা শুধু ধূপের মত নিজেকে পোড়ায় আগামীকালকে সুন্দর করতে। দেশ গড়ার জন্যে বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা।
'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এই দুটি চরিত্র লক্ষ পাঠকের ভালবাসা পেয়েছিল। সুস্থ উপন্যাসের সেইখানেই সার্থকতা।

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ২৬ ফাল্গুন ১৩৪৮।
শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ।
শিক্ষা: স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ।
লেখালেখি: প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়'। ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়।
গ্রন্থ: দৌড়, এই আমি রেণু, উত্তরাধিকার, বন্দীনিবাস, বড় পাপ হে, উজান গঙ্গা, বাসভূমি লক্ষ্মীর পাঁচালি, উনিশ বিশ, সওয়ার, কালবেলা, কালপুরুষ এবং আরও অনেক।
সম্মান: ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এ ছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসাবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার-সমিতির পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

www.BanglaBook.org

সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৮৪

কালবেলা

সমরেশ মজুমদার

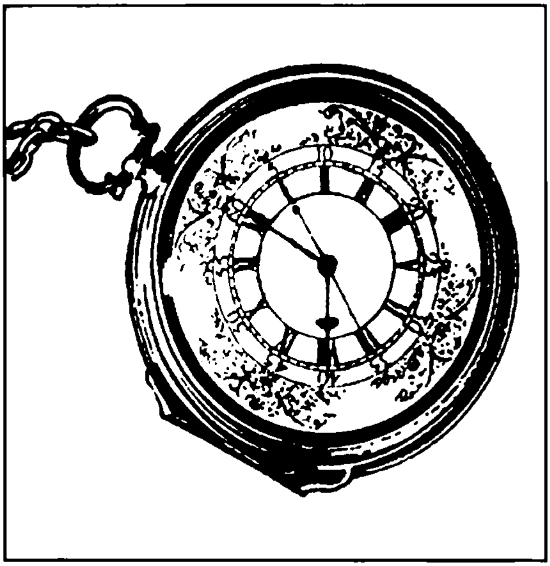

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯০
দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২১

© সমরেশ মজুমদার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-305-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

KALBELA
[Novel]
by
Samaresh Majumder

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

ভরদুপুরে নিজের ছায়া দেখা যায় না। ছায়া যখন দীর্ঘতর হয় তখন তার আদল দেখে কায়াকে অনুমান করাও সহজ কাজ নয়। এই সেদিন যেসব ঘটনা ঘটে গেল এ-দেশে তাই নিয়ে কিছু লিখতে বসার সময় হয়েছে কি না এ সংশয় থাকতেই পারে। সমসাময়িক কিছু নিয়ে লেখার মুশকিল হল আমাদের দেখাটা অন্ধের হস্তিদর্শন হয়ে যায়।

তবু 'উত্তরাধিকার'-এর পর 'কালবেলা' লিখতে বসে আমাকে এই সময়টাকেই বাছতে হয়েছে। আমি যেভাবে দেখতে চেয়েছি তার সঙ্গে অনেকেরই মতে মিলবে না, মিলতে পারে না। ওই সময়টাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম এই দাবি করি না কিন্তু আঁচ গায়ে না লাগুক মনে লেগেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার সময় আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেউ কাউকে স্বীকার করতে চায় না। অতএব, আমার বিশ্বাসটাই আমার কাছে সত্য।

'কালবেলা' কি রাজনৈতিক উপন্যাস ? আমি জানি না। কারণ এ ধরনের সাইনবোর্ডে আমি বিশ্বাসী নই। আমরা এক দারুণ অবিশ্বাসের কালে বেঁচে আছি। কেউ যদি বিশ্বাস করে ভুল করেন তবে তিনি কিন্তু আমাদের থেকে প্রাণবন্ত। অনিমেষরা যদি ভুলটা বুঝতে পেরে সঠিক পথটাকে খুঁজে পায় তা হলে কিন্তু ভুলটা মূল্যবান হয়ে যাবে।

কিন্তু 'কালবেলা' ভালবাসার উপন্যাস। দেশ, মানুষ এবং নিজেকে। কারণ নিজেকে যে ভালবাসতে পারে না সে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না।

উপন্যাসটি লেখার সময় আমি অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'দেশ' পত্রিকার অজস্র পাঠক-পাঠিকা যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি ধন্য।

উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা একমাত্র তাঁকেই মানায়। আমার বন্ধু কল্যাণ সর্বাধিকারী প্রতিনিয়ত যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তা স্মরণ থাকবে।

শেষ কথা, এই উপন্যাসে সময়টাকেই ধরতে চেয়েছি, কোনও মানুষ কিংবা ঘটনার সরাসরি ছবি তুলতে চাইনি।

সমরেশ মজুমদার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে তরল মেঘেরা উড়ে উড়ে যাচ্ছিল আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর মাথা মুড়িয়ে। বাতাস আর্দ্র কিন্তু বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না।

জানলা খুললে অনেকটা দূর দেখা যায়। অনিমেষ চুপচাপ বসেছিল। এরকম মেঘের দুপুর কিংবা বিকেলে মন কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। খুব আলস্য লাগে তখন। চোখ বন্ধ করলেই সেই মেঘগুলোর কথা মনে পড়ে যায় যারা ভুটান পাহাড় থেকে দল বেঁধে উড়ে এসে স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ওপর বৃষ্টি ঝরাত। তখন সেই সব বুনো লম্বাটে গাছগুলো কী উল্লাসে আকাশটা ছুঁয়ে রাখত। কান পাতলেই সেই শব্দ।

এ বছর ঘন মেঘের বিকেল এই প্রথম। মেঘেদের চেহারা কি পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম থাকে ? তা হলে স্বর্গছেঁড়া এমনকী জলপাইগুড়ির মেঘগুলোর চেহারা চালচলন এখানকার থেকে একদম আলাদা কেন ? ভীষণ ময়লা আর ঠুনকো মনে হচ্ছে এদের। যেন খুব কষ্ট করে আসছে ওরা, জমতে হয় তাই জমছে।

মেঘ দেখতে গিয়ে অনিমেষ কাছের দূরের ছাদগুলো দেখে ফেলল। তিনতলার ওপর ঘর বলে বেশ কিছু দূর দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার মেয়েরা বিকেলের এই সময়টা ছাদে ছাদে কাটিয়ে দেয়। হয়তো ওদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই কিংবা এই বিরাট শহরে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি মেলে না। অন্তত এ পাড়ার মেয়েদের দেখলে ওর তাই মনে হয়। কিন্তু এই মেঘ-থমথমে সন্ধেবেলায় যখন সব ছাদ খালি হয়ে গেছে তখন ওই মেয়েটি ঘাড় বেঁকিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অমন করে কী দেখছে ? খুব বিষণ্ণ সময় এলেই মানুষ অমন ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারে। মেয়েটিকে এর আগে সে কখনও দেখেনি। ওই হলুদ বাড়িটার ছাদে প্রায় সময় এক বিশাল চেহারার ফরসা মহিলা ঘোরাফেরা করেন। মেয়েটি মাথা নামিয়ে কিছু ভাবল, তারপর এ দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই কী হল কে জানে, একছুট লাগাল মেয়েটি, আর দেখা হল না। অনিমেষ হেসে ফেলল। তপন থাকলে বলত, বালিকা জানে না যে ও মরে গেছে। এই সময় ছটফটিয়ে বৃষ্টিটা নামল। জানলা বন্ধ করে আলো জ্বালল অনিমেষ।

এই ঘরের অন্য খাটটায় থাকে ত্রিদিব—ত্রিদিব সেনগুপ্ত, জামশেদপুরের ছেলে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া অথচ বাংলা কবিতা লেখে। ত্রিদিবের বিছানার দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওর বেডকভারটা খুব দামি, একরাশ নীল রঙের পাখি সেখানে ভিড় করে আছে; দেওয়ালে আঁটা হুকে ত্রিদিবের যে সব জামা-কাপড় ঝুলছে সেগুলো ওর পারিবারিক সাচ্ছল্যের সুন্দর বিজ্ঞাপন। ওর টেবিলের কোণে যে সব প্রসাধনদ্রব্য তা কলকাতায় আসার আগে অনিমেষ দেখেনি। অনিমেষ দেওয়ালে টাঙানো ত্রিদিবের আয়নার দিকে এগিয়ে গেল। কলকাতার জল পেটে পড়লে মফস্বলের মানুষ নাকি ফরসা হয়ে যায়। অনিমেষ নিজেকে সুন্দর দেখল। সামান্য বড় চুল, খুব অল্প এবং কালচে গোঁফদাড়ি মুখের আদল পালটে দিয়েছে। চোখ আর নাকে আলো পড়তেই চট করে ক'দিন আগে দেখা ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। যুবক রবীন্দ্রনাথের মুখ কি এরকম দেখতে ছিল ? ভাবতে গিয়েই লজ্জা পেল সে, দ্যুৎ, রবীন্দ্রনাথের গায়ের রং ভগবানের মতো ছিল।

কলকাতায় দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর হয়ে গেল। কলেজের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সময়টা কম নয় কিন্তু অদ্ভুত নির্জনতা নিয়ে এখনও সে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে

গেল। কলেজে থাকার সময় সে বাবার আদেশ পুরোপুরি মেনে চলেছে। জলপাইগুড়ি থেকে নিয়মিত দুটো চিঠি প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন নির্দেশ নিয়ে তার কাছে আসে। একটা ঠাকুরদা সরিৎশেখরের, অন্যটা বাবা মহীতোষের। প্রথমবার এই কলকাতায় আসামাত্রই যে ঘটনাটা ওর শরীর-মনে ছাপ রেখেছিল পাকাপাকিভাবে তার কাঁপুনি থেকে নিজেকে সরাতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। ফলে ওই সব চিঠিগুলোর নির্দেশ মান্য করা ছাড়া ওর কোনও উপায় ছিল না। আর তাই এই কলেজের সময়টা অদ্ভুত নিঃসঙ্গ হয়ে কলকাতায় কাটিয়ে দিল।

এই হোস্টেল মূলত কলেজ-ছাত্রদের, কিন্তু প্রাক্তন, যারা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তারা ইচ্ছে করলে থাকতে পারে। সেই সুবাদে অনিমেষের এখানে থাকা। ত্রিদিব এখানে নতুন এসেছে। ও কলকাতার বাইরে যে কলেজ থেকে পাশ করেছে সেই কলেজ আর অনিমেষদের কলেজ একই মিশনারিদের সংস্থার অন্তর্গত। তাই প্রাক্তন ছাত্র না হয়েও ওর এখানে থাকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। মিশনারি হোস্টেল বলেই প্রতি বছর বেশ কিছু বিদেশি ছাত্র কলকাতায় পড়তে এসে এখানে থাকে; হোস্টেলের অর্ধেক তারাই। বেশির ভাগই আফ্রিকার, কিছু বর্মা মুলুকেরও আছে। আফ্রিকার ছেলেদের ভাবভঙ্গিতে কোনও সঙ্কোচ নেই, বিদেশে আছে বলে মনে হয় না। বিশাল চেহারাগুলো নিয়ে সব সময় হইচই করছে। প্রথম প্রথম ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত অনিমেষ। যে-কোনও আফ্রিকানকে দেখলেই আঙ্কল টমকে মনে পড়ে যায়। ক্রীতদাস করে রেখেছিল সাদা মানুষেরা এই সেদিন পর্যন্ত অথচ ওদের হাবভাবে সে সব কষ্টের কোনও চিহ্ন নেই। আর একটা স্মৃতি চট করে অনিমেষের সামনে উঠে আসে। আসাম রোডে ছুটে যাওয়া মিলিটারি কনভয়ের নিগ্রো অফিসারটার মুখ যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। লোকটা এখন কোথায় আছে কে জানে। আমরা কাউকে অকারণে মনে রেখে দিই চিরকাল, যার হয়তো আমাদের মনে রাখার কোনও কথাই নেই।

শব্দ করে বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। অনিমেষ দরজা খুলে ভেতরের বারান্দায় এল। হোস্টেলের অনেক ঘর বন্ধ, খোলা দরজাগুলো থেকে আলো এসে বাইরের বৃষ্টিতে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ইউ প্যাটার্নের এই বাড়িটার মাঝখানের বাস্কেটবল কোর্টটা অন্ধকারে ডুবে আছে। ও পাশের একটা ঘর থেকে মাউথ অর্গানের সুর ভেসে আসছে। টানা এবং কান্নার সুর। আন্তরিক না হলে এ রকম বাজানো যায় না। কোনও চেনা গান বা পরিচিত ভঙ্গি সুরটায় নেই। নিশ্চয়ই ওটা ওই সব আফ্রিকানদের কেউ বাজাচ্ছে; হাজার হাজার মাইল দূরে এসে যার খুব কষ্ট হচ্ছে দেশের জন্য কিংবা ফেলে আসা কোনও মানুষের কথা সে ভাবছে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে হল ছেলেটিকে একবার দেখে আসে। মুশকিল হল ওদের দেখলে সে চট করে আলাদাভাবে চিনতে পারে না, কেউ খুব লম্বা, মোটা অথবা রোগা এইভাবে বুঝতে হয়। তিনতলার বারান্দা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে সেই ঘরটার সামনে এল অনিমেষ। একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, গায়ে পড়ে কথা বলতে কেমন যেন লাগে।

ঘরের ভেতর ছেলেটি একা চিৎপাত হয়ে খাটে শুয়ে চোখ বন্ধ করে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। বেশ ঢ্যাঙা চেহারা, জুতো সুদ্ধু পা দুটো খাটের বাইরে ঝুলছে। ঘরটা দারুণ অগোছালো, সাজগোছ করার কোনও চেষ্টাই নেই। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সে ফিরে আসছিল এমন সময় ছেলেটি বাজনা থামিয়ে উঠে বসে বলল, 'হে-ই!' কথাটা জড়ানো, মানে না বুঝলেও অনিমেষ অনুমান করল যে তাকেই কিছু বলছে ছেলেটি। পরমুহূর্তেই এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকল ছেলেটি, 'গেট ইন, প্লিজ!'

এ বার বুঝতে পারলেও অনিমেষ লক্ষ করল ওর উচ্চারণে একটা মোটা আওয়াজ এমন জড়িয়ে থাকে যেটা অন্য শব্দগুলোকে স্পষ্ট হতে দেয় না। অনিমেষ ভেতরে ঢুকতেই চকচকে সাদা দাঁতে হাসল ছেলেটি, 'ইয়া—!'

ওর আসার কারণটা বোঝাতে গিয়ে বিপদে পড়ল অনিমেষ। মনে মনে দ্রুত ইংরেজি করে নিয়েও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না সে। সঙ্কোচ হচ্ছিল ইংরেজিটা ভুল হতে পারে! শেষ পর্যন্ত সহজ রাস্তাটা বেছে নিল অনিমেষ, আঙুল তুলে মাউথ অর্গানটাকে দেখাল। ছেলেটি যেন খুব খুশি হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বাদ্যযন্ত্রটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে ফের লুফে নিয়ে বলল, 'য়ু লাইক ইট?'

'ইয়েস!' অনিমেষ ধাতস্থ হল, তারপর জুড়ে দিল, 'ভেরি সুইট।'

'থ্যাঙ্ক! ইটস মাই ফ্রেন্ড। মাদার গেভ ইট। সিট ডাউন, সিট হেয়ার প্লিজ।'

ওর টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে খাটের পাশে রেখে সে অনিমেষকে ইঙ্গিত করল বসার জন্য।

BanglaBook.org

এর আগে ইংরেজিতে কখনও কথা বলেনি অনিমেষ। জলপাইগুড়িতে যখন ছিল তখন এ প্রশ্ন উঠতই না। ত্রিদিব যখন বাংলা হিন্দি বলতে বলতে নিজের অজান্তে অনর্গল ইংরেজি বলে যায় তখন সেটা লক্ষ করেছে অনিমেষ। অনেক শব্দ যার অর্থ অন্য রকম ছিল, ব্যবহারে তার চেহারা পালটে যায়। এই যেমন ছেলেটি তাকে ভেতরে আসার জন্য বলল, গেট ইন। অনিমেষ নিজে গেট কথাটা ভাবতেই পারত না, বলত কাম ইন। অথচ বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গেটআউট তো স্বচ্ছন্দে মনে আসে। জলপাইগুড়ির বাঙালি স্কুলে ইংরেজি ভাষাটা যেভাবে শিখিয়েছে তাতে নিজের মতো করে কথা বলা যায় না। এই মুহূর্তে সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল।

চতুর্দিকে ছেলেটির রংবেরঙের জামাকাপড় ঝুলছে ওর রুমমেটটি এখনও বোধ হয় ফেরেনি। কেউ যে রঙিন জাঙিয়া পরে জানা ছিল না অনিমেষের। চেয়ারে বসে ছেলেটিকে ভাল করে দেখল সে। চামড়ার রং কালো হতে হতে তা থেকে কেমন নীলচে জেল্লা বেরুচ্ছে। চোখ দুটো ছোট, মাথার চুলে চিরুনি বোলানো অসম্ভব, এত কোঁকড়া এবং পাক খাওয়া বোধ হয় চুল আঁচড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। শরীর ওর বেতের মতো হিলহিলে, সামান্য মেদ নেই কোথাও।

'আই অ্যাম থম্বোটো। রিয়েল গ্ল্যাড টু সি অ্যান ইন্ডিয়ান ইন মাই রুম।'

চকচকে সাদা দাঁত একবার ঝিলিক খেল। এই প্রথমবার, সে যে ইন্ডিয়ান তা কেউ অনিমেষকে বলল। তার হঠাৎ খেয়াল হল থম্বোটোর মাতৃভাষা ইংরেজি নয় অতএব সামান্য ভুলভাল হলে নিশ্চয়ই সে গ্রাহ্য করবে না। অনিমেষ নিজের নাম বলল, এখন কিছুটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে সে।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো স্কটিশেই পড়ো ?'

'হ্যাঁ, বি এসসি ফার্স্ট ইয়ার, তুমি ?'

'আমি এম.এ-তে অ্যাডমিশান নিয়েছি, এখনও ক্লাশ শুরু হয়নি। আর্টস।'

'ও গড, তুমি তা হলে আমার সিনিয়ার, বাট য়ু লুক সো ইয়াং।' অবাক চোখে তাকে দেখছিল থম্বোটো। সত্যি কি তাকে এম. এ. ক্লাশের ছাত্র বলে মনে হয় না ? কী জানি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কেমন লাগছে তোমার ?'

'ভালই। তবে ওই মশলা দেওয়া খাবারগুলো যদি না থাকত! দ্যাটস হরিবল। আমার স্টমাক প্রায়ই গোলমাল করছে, এ ম্যান ক্যান নট লিভ অন মেডিসিন। তুমি হোস্টেলে থাকছ কেন, তোমার বাড়ি এখানে নয় ?'

'না। আমি এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে ডুয়ার্স বলে একটা জায়গা থেকে এসেছি।'

'সেটা কি ভারতবর্ষ নয় ?'

'কেন নয় ? এই পশ্চিমবাংলারই একটা অংশ।'

থম্বোটো চট করে টেবিল থেকে একটা বড় ভারতবর্ষের ম্যাপ সামনে বিছিয়ে বলল, 'শো মি হোয়ার ইট ইজ!'

অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে পশ্চিমবাংলার মাথায় জলপাইগুড়ি লেখা অঞ্চলটায় আঙুল রাখল। ও দেখল আলিপুরদুয়ার এবং ফালাকাটা ম্যাপে লেখা আছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ার উল্লেখ নেই। থম্বোটো জায়গাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'এ জায়গা তো হিমালয় পর্বতমালার নীচে, তুমি কি পাহাড়ি মানুষ ?'

'না, না, আমি বাঙালি!' হেসে ফেলল অনিমেষ।

'স্ট্রেঞ্জ! তোমাদের এই ভারতবর্ষে স্নো-রেঞ্জ আছে, সমুদ্র আছে, মরুভূমি আছে, আবার ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল উইদ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস একসঙ্গে বাস করছ, কেউ বাঙালি কেউ পাঞ্জাবি আবার সকলেই ইন্ডিয়ান, তোমাদের কোনও অসুবিধে হয় না ? কী করে তোমরা ইউনাইটেড হলে ?' জানবার আগ্রহ থম্বোটোর মুখে।

অনিমেষ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'আমাদের চেহারা এবং ভাষা আলাদা হলেও কালচারের কোথাও কোথাও এবং ধর্মের মিল রয়েছে। তা ছাড়া ইতিহাস বলে, বার বার বিদেশি-আক্রমণ হয়েছিল আমাদের ওপর। বোধ হয় আক্রান্ত হলেই ইউনিটি গড়ে ওঠে।'

মন দিয়ে কথাটা শুনে থম্বোটো বলল, 'বাট দেয়ার আর হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস, ক্রিশ্চিয়ানও কম নেই। এরা তো কমপ্লিট আলাদা ধর্মের মানুষ এবং প্রত্যেকের মানসিকতা আলাদা, তাই না ?'

অনিমেষ একটু থতমত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু ধর্ম তো ঘরের ব্যাপার, বাইরে আগুন লাগলে সেটা ঘরে রেখেই মানুষ আগুন নেবাতে বেরিয়ে আসে।'

BanglaBook.org

হাসল থম্বোটো, 'তাই যদি হয় তোমরা এত বছর ব্রিটিশকে থাকতে দিলে কেন ? খুব দেরিতে হলেও অবশ্য তোমরা ব্রিটিশকে তাড়াতে পেরেছিলে আর এইটে আমাদের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশগুলোকে সাহায্য করেছিল।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ, ওরা আমাদের হাতে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছে।'

বিস্মিত হল থম্বোটা, 'ফ্রিডাম কেউ কাউকে দেয় না, ফ্রিডাম আর্ন করতে হয়। তুমি কি বলতে চাইছ তোমরা ফ্রিডাম আর্ন করোনি ?'

কথাটা অনিমেষকে হঠাৎ উত্তেজিত করে ফেলল। স্কুল জীবনের শেষ দিকে সুনীলদা যে সব নতুন ব্যাখ্যা ওকে শুনিয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে, কলকাতায় আসার পর হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সেই শোনা ব্যাখ্যাকে আরও দৃঢ় করেছে। সে বলল, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম বিভিন্ন পথে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের দিয়ে গেছে। রক্ত না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না আর যদি তা পাওয়াও যায় তা হলে সে স্বাধীনতা সম্পর্কে দেশের মানুষের মমতা থাকে না।' এই প্রথম অনিমেষ প্রকাশ্যে এ সব কথা বলল। এত দিন এই সব বিষয় ওর ভাবনায় ঘোরাফেরা করত। কিন্তু এখন বলার সময় ওর মনে হল নিজের দেশের এই রকম দুর্বল জায়গা নিয়ে একজন বিদেশির সঙ্গে আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। থম্বোটো তার নিজের দেশের সমস্যা নিয়ে কোনও কথা বলেনি। এ সব কথা বললে ও নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে এবং সেটা ওর দেশের মানুষ জানুক তা কাম্য নয়। অনিমেষ গলার স্বর পালটে বলল, 'এর মধ্যে অনেকগুলো বছর গেছে, এ বার আমরা পুরনো ভুলগুলো শুধরে নেব। এ বার তোমার কথা বলো, আমরা একই পৃথিবীতে থাকি অথচ তোমাদের দেশের খবর ভারতবর্ষের মানুষ কিছুই জানে না।' থম্বোটো বলল, 'ওয়েল, আমাদের দেশ খুবই গরিব এবং বড়লোকেরা যাকে বলে আনডেভেলপড বোধ হয় তাই। প্র্যাকটিক্যালি আমরা আফ্রিকানরা এত ছোট ছোট স্টেটে ডিভাইডেড যে— ।'

ঠিক এ সময় একজন খর্বকায় মানুষ দরজায় এসে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গ ভেজা, পোশাক থেকে টুপটাপ জল ঝরছে, মুখ চোখে খুব বিরক্তি। একে অবশ্য অনিমেষ কয়েকবার দেখেছে, এর মতো বেঁটে এবং রোগা এ হোস্টেলের কোনও আফ্রিকান নয়। তবে এর গায়ের রং নিকষ কালো নয় বরং তামাটে ভাবটাই বেশি। মোটা নাক এবং পুরু ঠোঁট থাকা সত্ত্বেও একটা আলগা শ্রী আছে। মাথার চুলে একটু বেশি স্প্রিং থাকায় বৃষ্টির জলেও এলোমেলো হয়নি। ছেলেটি ঘরে ঢুকে খুব উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নেড়ে থম্বোটোকে কী সব বলতে লাগল নিজের ভাষায়। থম্বোটো হাসছে কিন্তু কোনও উত্তর দিচ্ছে না। ছেলেটা পাগলের মতো দু'-তিনবার পাক খেয়েও কথা থামাচ্ছে না। ভাষা ঠাওর না হলেও অনিমেষের মনে হল ছেলেটি বোধ হয় এই ঘরে ওকে দেখে রেগে গেছে। আফ্রিকান ছেলেদের ঘরে কোনও ভারতীয়কে সে আড্ডা দিতে দেখেনি, ওরাও কারও ঘরে যায় না। হঠাৎ ছেলেটি অনিমেষের দিকে তেড়ে এসে উলটোদিকের খাটে বসে তড়বড় করে যে কথাগুলো বলল সেটা যে ইংরেজি ভাষায় তা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। অনিমেষ দ্বিতীয়বার ওকে উচ্চারণ করতে শুনল, 'ইউ মাস্ত প্রতেস্ত।' কীসের প্রতিবাদ করার কথা বলছে ও বুঝতে না পেরে অনিমেষ থম্বোটোর দিকে তাকাতেই ছেলেটি একটা আঙুল ওর দিকে উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ লিভ দিস হোস্তেল ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অনিমেষ। একটু আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে ওর রাগের কারণ সে নয়, তা হলে প্রতিবাদ করার কথা বলত না। থম্বোটো এ বার কথা বলল। এই ছেলেটি ওর রুমমেট। আজ বিকেলে এক সদ্যপরিচিতা মহিলার সঙ্গে ওর বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টি এসে যাওয়ায় ওরা হোস্টেলে ফিরে এসে আড্ডা মারবে ঠিক করেছিল। কিন্তু গেটে যে দারোয়ান আছে সে নাকি বাগড়া দিয়েছে এই বলে যে এখানে নাকি মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। যেহেতু এখন আটটা বেজে গেছে তাই ভিজিটার্স রুমটাও বন্ধ ছিল। থম্বোটোর বন্ধু এতে ভীষণ অপমানিত বোধ করছে। তারা কেউ বাচ্চা ছেলে নয়, নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে জানে, এই ধরনের আইন মেয়েদের হোস্টেলে থাকতে পারে কিন্তু ওদের ওপর প্রয়োগ করা মানে রীতিমতো অপমান করা। একটু হেসে থম্বোটো যোগ করল, 'মহিলাটি আমার বন্ধুর মুখ আর দর্শন করবে না জানিয়ে গেছে।'

থম্বোটোর বন্ধু এতক্ষণ চুপ করে কথাগুলো শুনছিল, এ বার চিৎকার করে বলে উঠল, 'শি টোল্ড মি কি-ড।'

অনিমেষ হেসে ফেলল বলার ধরন দেখে। থম্বোটোর বন্ধু চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে নিজের জামাকাপড় খুলতে লাগল। গেঞ্জি-টেঞ্জি পরেনি, নির্লোম তামাটে বুক দেখলে কেউ নিগ্রো

BanglaBook.org

বলে ভাবতে পারবে না। এর পর সে নির্দ্বিধায় প্যান্টের বোতাম খুলে সেটাকে ছুড়ে দিল ঘরের এক কোনায়। অনিমেষ এতটা আশা করেনি, চট করে একটা অস্বস্তি ওকে বিব্রত করে তুলল। পরিচিত কিংবা অপরিচিত যে-কোনও মানুষের সামনেই এইরকম জামাকাপড় ছেড়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়ানোর কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। এদের কি কোনও সঙ্কোচের বালাই নেই? ওর আশঙ্কা হচ্ছিল এ বার হয়তো জাঙ্গিয়াটাও শরীরে থাকবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটি খুব ঘেন্নার সঙ্গে বলে উঠল, 'ইউ ইন্ডিয়ান আর উইদাউট ব্যাকবোন, কাওয়ার্ড।' এ বার শব্দগুলো বুঝতে এতটুকু অসুবিধে না হওয়ায় অনিমেষের মাথায় রক্ত উঠে গেল। চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল। ওর শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে, দুটো হাতের আঙুল মুঠোয় ধরে রাখতে পারছে না। অনিমেষের মুখ-চোখের ভাব দেখে ছেলেটি বোধ হয় ভয় পেয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল। থম্বোটো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ছুটে এসে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরল। ওর বিরাট শরীরের কাছে অনিমেষ এই মুহূর্তে অসহায় হলেও প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। জোর না খাটিয়ে থম্বোটো বলল, 'আমার বন্ধুর কথায় কান দিয়ো না, ও ঠিক জানে না কাকে কী বলতে হয়।' তারপর হেসে বলল, 'তুমি রাগ করেছ দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল অনিমেষ। এখন শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। থম্বোটো এসে বাধা না দিলে ও নির্ঘাত ছেলেটিকে মারত। উনি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন আর সেটা সমর্থন না করলে জাত তুলে গালাগাল দেবেন। কোনও রকমে থম্বোটোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অনিমেষ। আজ অবধি কখনও কারও গায়ে হাত তোলেনি সে, ছেলেটাকে মারলে ও নিশ্চয়ই কোনও প্রতিরোধ করতে পারত না। ওরকম দুর্বল শরীর নিয়ে এ ধরনের কথা বলার সাহস পায় কী করে! মারতে পারেনি বলে জীবনে এই প্রথমবার আফশোস হল অনিমেষের। বাইরে এখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে, আফ্রিকান ছেলেদের মানসিকতা এ রকম হয় কি না কে জানে, তবে থম্বোটোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই পিছনে ডাক শুনতে পেল সে, 'হেই, হনিমেস।

ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল থম্বোটো আসছে। নিজের নামটার এ রকম উচ্চারণ শুনে বিরক্তিটা যেন সামান্য মরে গেল। কাছে এসে থম্বোটো বলল, 'আমার খারাপ লাগছে। আমার বন্ধুটি কিন্তু খুব নিরীহ, শুধু মেয়েদের ব্যাপারে দারুণ সেনসিটিভ। যা হোক, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছে, তুমি কি আবার আসবে?'

কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে অনিমেষ রাগ করতে পারল না। সে বলল, 'আজ থাক, আর একদিন হবে।' ঠিক এই সময় থম্বোটোর ঘর থেকে একটা উদ্দাম সুর ভেসে এল। মাউথ অর্গানটা যেন ঝড় তুলছে। হেরে যাবে নিশ্চিত জেনে মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, সুরটা সেই রকম তেজি এবং উদ্দাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওরা বাজনাটা শুনল। এই শব্দ করে বৃষ্টিপড়া রাত্রে যখন সমস্ত হোস্টেলটা নিঝুম তখন এই রকম ঝিমঝিমে সুর যেন অবশ করে ফেলছিল ওকে। নিচু স্বরে থম্বোটো বলল, 'আমার চাইতে অনেক ভাল বাজায় ও, না?'

অনিমেষ কী বলবে ঠাওর না করতে পেরে নিজের মনে ঘাড় নেড়ে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগল। যে সুরটা ওর পিছন পিছন আসছিল আচমকা সেটা থেমে যেতেই অনিমেষের মনে হল একটা ভারী নিস্তব্ধতা ওর চারপাশ চেপে ধরেছে। ঘরের শেকল খুলে অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সে। নিজেকে ভীষণ একা মনে হচ্ছে, এই বিরাট কলকাতা শহরে তার কোনও বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। আলো না জ্বেলে ঘরে ঢুকে চুপচাপ খাটে শুয়ে পড়ল সে।

অস্বস্তিটা তবু যাচ্ছিল না। কী সহজে ছেলেটি ওকে গালাগালিটা দিল! থম্বোটো না থাকলে আজ কী হত বলা যায় না। হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ায় যে উত্তেজনা সমস্ত শরীরকে কাঁপাচ্ছিল তাতে সে কতখানি আঘাত করতে পারত কে জানে কিন্তু সেটা করতে পারলে বোধ হয় এখন ভাল লাগত। একটা ছেলে অত দূর থেকে কলকাতায় পড়তে এসে অমন সামান্য কারণে একটা দেশের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে এ রকম ইঙ্গিত দিতে যাবে কোন যুক্তিতে?

নিস্তেজ হয়ে অনিমেষ শুয়ে শুয়ে দরজা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখছিল। বারান্দায় জ্বেলে রাখা আলোয় বৃষ্টি মাখামাখি হয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। উত্তেজনা কমে আসায় ক্রমশ এক ধরনের অবসাদ এল। অনিমেষ কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, ইউ ইন্ডিয়ানস আর উইদাউট ব্যাকবোন, কাওয়ার্ড। শব্দগুলো হঠাৎ কেমন নিরীহ হয়ে গেল, সে যেন সামান্য ওপরে উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে শব্দগুলোকে দেখতে লাগল। এই তিন বছরে কলকাতা শহরে সে যে জীবন কাটিয়েছে, প্রতিদিনের খবরের

BanglaBook.org

কাগজে অথবা চারপাশের যে মানুষগুলোকে নিত্য সে দেখেছে তারা কী ধরনের? জলপাইগুড়ি শহর থেকে সেই প্রথমবার ট্রেনে চেপে আসবার সময় ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন কিছু গড়ার জন্য যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে বলে উত্তেজনায় টগবগে হয়েছিল সে, এই কয় বছরে তা কোথায় মিলিয়ে গেছে। এখন এই শহরের মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনেই হয় না তারা বা তাদের কেউ কেউ ও সব কথা কখনও ভেবেছিল। গড্ডলিকা প্রবাহ সে বইতে পড়েছিল কিন্তু সেটা কী জিনিস তা এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা না দেখলে বুঝত না। মেরুদণ্ডহীন কথাটা কি একদম প্রযোজ্য নয়? এখনও ভারতবর্ষের নব্বুই ভাগ মানুষ জানে না যে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। যারা জানে তাদের অনেকের মানসিকতায় ব্রিটিশ শাসন আর স্বাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

তার কলেজে পড়ার ব্যাপারে মহীতোষের সঙ্গে কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। মহীতোষ চাননি যে অনিমেষ স্কটিশচার্চ কলেজে ভরতি হোক। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশুনাটা তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া হোস্টেলটা যখন কলেজ কম্পাউন্ডে নয় তখন কলকাতার রাস্তায় ছেলেকে হাঁটাচলা করতে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। প্রায় আট মাস বিছানায় শুয়ে থেকে অনিমেষ খুব কাহিল এবং রোগা হয়ে গিয়েছিল, দ্রুত হাঁটাচলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একটু নজর করলেই বোঝা যায় যে সে একটা পা খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বস্তুত কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠানোর ইচ্ছাই চলে গিয়েছিল মহীতোষের। মাসকাবারি রিকশার ব্যবস্থা করে জলপাইগুড়ির বাড়ি থেকে আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ার ব্যাপারেই জোর দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মানুষের সহজে শিক্ষা হয় না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনিমেষ যে আরও একগুঁয়ে হয়ে গেছে সেটা প্রমাণ হল তার কলকাতায় পড়তে যাওয়ার জেদে। আর একবার ঠাকুরদা সরিৎশেখর তাকে সমর্থন করলেন। দুর্ঘটনা বারবার ঘটে না। প্রায় বাধ্য হয়ে মহীতোষ ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় এলেন, এ বার একা ছাড়েননি। প্রেসিডেন্সির পাশেই হিন্দু হোস্টেল, কিন্তু সেখানে ভরতি হওয়ার চেষ্টা বিফল হল। প্রথম ডিভিশনে পাশ করেও যে কোনও কোনও কলেজে জায়গা পাওয়া যায় না সেটা জেনে হতবাক হয়ে গেলেন মহীতোষ। ফলে কলকাতার তিনটি মিশনারি কলেজের দিকে ঝুঁকলেন মহীতোষ, সেন্ট জেভিয়ার্সে মন মানল না। সব দিক দিয়ে দেখেশুনে সেন্ট পল্স আসল জায়গা বলে মনে হল। কলেজের মধ্যেই হোস্টেল, রাস্তায় পা দিতে হবে না একবারও। কিন্তু অনিমেষ আকৃষ্ট হল তৃতীয়টিতে। স্কটিশচার্চে বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু পড়েছেন। কে কবে ঘি খেয়েছেন এখন গন্ধ শোঁকার কোনও মানে হয় না—মহীতোষ এই কথাটা বোঝাতে পারেননি। মা-মরা ছেলেরা বোধ হয় চিরকাল এ রকম জেদি হয়। ছেলের সঙ্গে দু'দিন কলেজে গিয়ে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অসহায় বোধ করেছিলেন তিনি। গাদা গাদা মেয়ে রংবেরঙের পোশাকে জটলা করছে কলেজ চত্বরে, তাদের কারও কারও ভঙ্গি বেশ বেপরোয়া। এখানে ছেলের পড়াশুনা কতদূর হবে সন্দেহ থেকে গেল তাঁর। যে চিন্তাটা তাঁকে আরও বিহ্বল করে দিচ্ছিল তা হল সায়েন্সের বদলে অনিমেষ আর্টসে অ্যাডমিশন নিয়েছে। বাবা হয়ে ছেলেকে ডাক্তার করার বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি দেখলেন এখানেও অনিমেষের ঠাকুরদার রায়ই শেষ কথা হল। যাওয়ার আগে বার বার তিনি ছেলেকে উপদেশ দিয়ে গেলেন। পড়াশুনা করে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। এই কলকাতা শহর নতুন ছেলেদের নষ্ট করে দেবার জন্য ওত পেতে থাকে, অনিমেষ যেন কখনও অসতর্ক না হয়। কোনও বন্ধুবান্ধবকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না কারণ বিপদের দিনে তারা কেউ পাশে থাকবে না। কলেজের ইউনিয়ন থেকে যেন সে সাত হাত দূরে থাকে কারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলের এই বিলাসিতা সাজে না। রাজনীতি যাকে নেশা ধরায় তার ইহকাল, পরকাল একদম ঝরঝরে হয়ে যায়। যাদের বাপের প্রচুর টাকা আছে তারাই ও সব করুক, যেমন জওহরলাল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস।

বাবার এ সব উপদেশ অনিমেষ মন দিয়ে শুনতে বাধ্য হয়েছিল। সে লক্ষ করেছিল বাবা যখন কথা বলেন তখন তিনি ভুলে যান ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। কিন্তু বাবার একটা কথার সঙ্গে সে একমত, ইতিমধ্যে তার একটা বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মন্টু তপন ওরা এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। মানুষের জীবন বড় অল্প সময়ের, তা থেকেও যদি একটি বছর ফালতু হয়ে যায় তা হলে সেটা কম ক্ষতি নয়। অনিমেষ মহীতোষকে কথা দিয়েছিল সে সময় নষ্ট করবে না। তাই বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত সে শুধু দেখে গেছে চারধার। স্কটিশচার্চের ছাত্র ইউনিয়ন অবশ্যই ছাত্র ফেডারেশনের দখলে কিন্তু মাঝে মাঝে মিছিল করা ছাড়া তাদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কী হল তার জন্য ওরা মিছিল বের করে অথচ কলেজের জলের কলটা তিন-দিন খারাপ হয়েছিল সে দিকে খেয়াল করেনি। অনিমেষ শুধু ওদের দেখে গিয়েছিল এই ক'টি বছর।

BanglaBook.org

দ্রুত হাঁটা অথবা শারীরিক উদ্যম ফিরে আসতে যে এতটা সময় লাগবে তা সে ভাবেনি, মনে মনে ভেবে যাওয়া ছাড়া তার কোনও উপায় ছিল না। আশ্চর্য, কেউ তাকে কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেনি তার পায়ে কী হয়েছে!

ত্রিদিব কখন এসেছে টের পায়নি অনিমেষ। ঘরে আলো জ্বালতেই চোখে লাগল, হাতের আড়ালে চোখ রাখল। ত্রিদিব একা নয়, সঙ্গে আরও দু'জন এসেছে। খাওয়ার ঘরে ওদের দেখেছে কিন্তু আলাপ হয়নি। এই হোস্টেলে দুটো খাওয়ার ঘর, একটা বিদেশিদের অন্যটা ওদের। কে এই নিয়ম চালু করেছিল জানা নেই তবে এখনও তা চলে আসছে। অনিমেষ উঠে বসতে একটা তীব্র গন্ধ পেল। ত্রিদিবরা দাঁড়িয়ে আছে আর ওদের শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া জলে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। তিনজনেই ভিজে কাক। অনিমেষ ত্রিদিবকে বলল, 'কী ব্যাপার, বৃষ্টিতে ভিজে এলে, অসুখ করে যেতে পারে।'

ত্রিদিব হাসল। বৃষ্টিতে ভিজলে চুলগুলো এমন নেতিয়ে থাকে যে অনেক সময় মানুষের চেহারা পালটে যায়। ত্রিদিবকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে, 'আরে এরকম ফাইন বৃষ্টির মধ্যে রোড দিয়ে হাঁটতে যে কী আরাম তা তুমি বুঝবে না। নিজেকে দেওয়ানা মনে হয়।'

'কিন্তু নিমোনিয়া হলে কী হবে?' কথার ভঙ্গিটায় অনিমেষ মজা পেল।

'কবিদের নিমোনিয়া হয় না। ঈশ্বর কবিদের সিনায় এত রকমের ভালবাসা দিয়েছেন যে সেখানে নিমোনিয়া জায়গা পায় না।' কথা বলতে বলতে ত্রিদিব নিজের অস্থিরতা লুকোতে পারল না। এ বার অনিমেষ লক্ষ করল ওরা তিনজনে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। ত্রিদিবের গলার স্বরটা একটু অন্যরকম, 'অনিমেষ, মাই রুমমেট, এদের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? নেই? আমরা এই হোস্টেলে থাকি তবু কেউ কাউকে চিনি না, আমরা একই পৃথিবীতে থাকি তবু মানুষের আজও জানাশোনা হল না। এ হচ্ছে দুর্গা—দুর্গাপদ, গোবিন্দ।' আঙুল দিয়ে দ্বিতীয়জনকে দেখাল ত্রিদিব। গোবিন্দ যার নাম সে যখন কথা বলল তখনই গন্ধটার রহস্য বুঝতে পারল অনিমেষ।

'তুমি তো গুডি বয়, এখনও মফস্বলের আলোয়ান গায়ে জড়ানো!'

কথাগুলো জড়ানো, মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া প্রতিটি শব্দে। তার মানে ত্রিদিব এবং দুর্গাপদ মদ খেয়েই এসেছে। গোবিন্দর কথায় বিদ্রূপ থাকলেও অনিমেষ জবাব দিল না। এটা জানা কথা, মত্ত হলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা অসংলগ্ন হয়ে যায়, তখন যুক্তি অচল।

সে শুধু ত্রিদিবকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মদ খেয়েছ?'

কলকাতার এই প্রবাস-জীবনে ত্রিদিবকে গৃহসঙ্গী পেয়ে খুশি হয়েছিল অনিমেষ। ছেলেটা কবিতা লেখে, অন্য রকম কবিতা, মনটা ভাল। অবশ্যই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু আচরণে কোনও চালিয়াতি নেই। শুধু, অনিমেষের ইচ্ছে হোক না হোক ত্রিদিব ওকে কবিতা শোনাবেই। কিন্তু আজ অবধি ত্রিদিবকে সে মদ্যপান করা অবস্থায় দেখেনি। কেউ মদ খেলেই সেই অনেক বছর আগের দেখা মহীতোষের চেহারাটা ওর সামনে উঠে আসে। মত্ত মহীতোষ আর শীর্ণ চেহারার ছোটমাকে ভুলে গেছে অনিমেষ, তবু—। মানুষ দুঃখ পেলে নাকি মদ খায়, বড়লোকরা মেজাজ আনতে ড্রিঙ্ক করে কিন্তু ত্রিদিবের ক্ষেত্রে তো এ দুটোর কোনও প্রয়োজন আছে তার জানা নেই। তা ছাড়া এই হোস্টেলের যে নিয়মাবলী দরজায় টাঙানো তাতে এ ধরনের আচরণের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

ত্রিদিব কথাটার জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জানলার দিকে। পাল্লা দুটো খুলে দিতে দিতে বলে, 'কেন, মদ খেতে তোমার খারাপ লাগে? পেটে মদ মাথায় বৃষ্টি—লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক সৃষ্টি। তুমি খাবে?'

'না।' নিজের অজান্তেই শব্দটা জোরে বলল অনিমেষ।

'কেন গুডি বয়? মদ খেলে মানুষ খারাপ হয়ে যায়?' গোবিন্দ টিপ্পনী কাটল জড়ানো গলায়। অনিমেষ দেখল দুর্গাপদ জামার তলা থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করছে। নাক সিঁটকে অনিমেষ বলল, 'মদ খেলে মানুষ কী হয় আমি জানি, আমার দেখা আছে।'

দুর্গাপদ খিকখিক করে হাসল, 'অনেকের জামাইষষ্ঠী থাকে না, ভাইফোঁটা নিতে নেই, তোমার বুঝি এরকম ব্যাপার—মদ খেতে নেই!'

BanglaBook.org

ত্রিদিব জানালা খুলে দিতেই হু-হু করে বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকতে লাগল। অনিমেষ দেখল ওর পড়ার টেবিল জলে ভিজে যাচ্ছে। সে তড়াক করে নেমে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে ত্রিদিবের কাছে বাধা পেল। দু'হাত দু'পাশে বাড়িয়ে ত্রিদিব বলল, 'নিয়ম না ভাঙলে নিয়মটাকে বোঝা যায় না, মাই রুমমেট।'

'আমার বইপত্র ভিজে যাচ্ছে।'

'কাল আমি শুকিয়ে দেব।'

অনিমেষ লক্ষ করল ত্রিদিব ভাবাপ্লুত অবস্থায় কথা বললে হিন্দি শব্দ একদম বলে না। যেমন কবিতা লেখার সময় ওর হয়। হাল ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে আসছিল এমন সময় গোবিন্দ ওর সামনে এসে দাঁড়াল, 'ইনডাইরেক্ট না ডাইরেক্ট?' বোতলটা সামনে ধরে সে ইঙ্গিত করতেই অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'আমি খাব না।'

'তা কি হয়! এক যাত্রায় পৃথক ফল।'

'আশ্চর্য! আমি না খেলে তোমরা জোর করে খাওয়াবে নাকি?'

ত্রিদিব এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল, 'সংস্কার ভাঙার কথা হচ্ছিল না সেদিন, তুমি নিজেই তো সংস্কারগ্রস্ত। নাও, খেয়ে নাও—লাথি মারো বিবেকের মাথায়।'

'ওটা শস্তা নয়, আমি মরে গেলেও খাব না।' অনিমেষ ফুঁসে উঠল। হঠাৎ কী হল ত্রিদিবের, ওর চোখ মুখ হিংস্র হয়ে গেল। ধস্তাধস্তি শুরু হল বৃষ্টিভেজা ঘরটায়। অনিমেষ ভাবল চিৎকার করে ওঠে। সুপার ছুটে এলে এদের হাত থেকে বাঁচা যাবেই। কিন্তু তারপর যেটা হবে সেটা ভেবে সে চিৎকার করল না। নিঃশব্দ ছিল বাকি তিনজনই। সে কিছুতেই ওই তিন প্রায়-মাতালের সঙ্গে পেরে উঠছিল না। প্রচণ্ড শক্তিতে ওরা অনিমেষকে মাটিতে চিত করে ফেলে মুখের মধ্যে মদের বোতল গুঁজে দিল। গলগল করে নেমে আসা বিশ্রী স্বাদের তরল পদার্থটিকে জিভ দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারল না অনিমেষ। উগরে ফেলতে গিয়ে কিছুটা পেটের ভেতর চলে গেল। জ্বলছে গলা—কী দুর্গন্ধ! অনিমেষ শেষবার দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিরোধ আনছিল। গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা খাচ্ছে না। ঠিক আছে, ওর শাস্তি হল আগাগোড়া ন্যাংটো করা।'

'নগ্নতা কবিতা নয় অথবা আরও কিছু বেশি।' ত্রিদিব বিড়বিড় করে উঠল। ওদের হাত চলছে। দু'জন চেপে ধরেছে অন্যজন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দু'পায়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অনিমেষের নিম্নদেশ নগ্ন হয়ে গেল। পরবর্তী আক্রমণ কী হবে সেটা ভাববার আগেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনতে পেল অনিমেষ।

গোবিন্দ বলছে, 'আরে ব্বাস, এ শালার থাইতে এত বড় দাগ কীসের?' চোখ বন্ধ অনিমেষের শরীরে আচমকা সেই যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে পড়ল। সে শূন্যে সামান্য লাফিয়েই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ত্রিদিব ওকে ছেড়ে দিয়ে অপারেশনের জায়গাটায় হাত দিয়ে অন্য রকম গলায় কথা বলল, 'কী হয়েছিল এখানে? কীসের দাগ?'

মুখের ভেতর বিশ্রী স্বাদ, গলা জ্বলছে, সমস্ত শরীরে অবসাদ, অনিমেষ থুতু ফেলার চেষ্টা করে জবাব দিল, 'বুলেটের।'

দুই

হাঁটুর খানিকটা ওপরে গভীর তামাটে দাগ অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের আদল নিয়েছে। হঠাৎ দেখলে একটু অস্বস্তি হয়। সুন্দর নির্লোম থাই-এর মধ্যিখানে একটা কুৎসিত চিহ্ন সারা জীবন আঁকা থাকবে। সাধারণত ফুলপ্যান্ট পরলে চিহ্নটি কারও চোখে পড়ে না, অনিমেষও সেটা মনের আড়ালে রেখে দেয়। সামান্য পা টেনে হাঁটা ছাড়া এই চিহ্নটি ওকে কোনও পীড়া দেয় না। চোখের বাইরে থাকলেই সব জিনিসের ধার কমে যায়। কিন্তু যখনই ওই প্রসঙ্গ ওঠে অথবা খবরের কাগজে পুলিশের গুলি চালানোর কথা লেখা হয় তখনই অনিমেষের থাই টনটন করতে থাকে। ব্যথাটা আচম্বিতে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়।

কখন জ্ঞান ফিরেছিল অনিমেষ জানে না। মানুষ জলে ডুবে গিয়ে কী দেখে সেটাও অভিজ্ঞতায় নেই। কিন্তু চোখের সামনে অজস্র ঘোলাটে ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে—এ ছাড়া সে কিছু জানে না। প্রথম যখন নিজের অস্তিত্ব টের পেল তখন সে বিছানায়, মাথার ওপরে ছাদ এবং নাকজোড়া কড়া ওষুধের গন্ধ। সামান্য মাথা ঘোরাতে ও বুঝতে পারল এটা হাসপাতাল এবং সবে ভোর হয়েছে।

BanglaBook.org

কলকাতায় পড়তে এসে যখন শিয়ালদায় নেমেছিল তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। অথচ এই ভোরবেলায় সে হাসপাতালে শুয়ে আছে কেন ? অনিমেষের চিন্তা করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখ বন্ধ করে পরিচিত মুখগুলোকে দেখতে চাইছিল। সরিৎশেখর, দাদুকে, ও এক পলকেই লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে দেখল চোখের পরদায়। মহীতোষ, ওর বাবা, গম্ভীর মুখে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে সাইকেল থেকে নামছেন। ছোটমা মাঠের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছেন, ঘোমটা একটু নেমে এসেছে। না, সবাইকে সে মনে করতে পারছে, আলাদা আলাদা করে প্রতিটি মুখের আদল দেখতে পাচ্ছে। আর তারপরেই সিনেমার মতো চোখের পর্দায় জ্বলন্ত ট্রামটা ভেসে উঠল, কিছু ছেলে যেটায় আগুন লাগিয়ে একটু আগে ছুটে গেছে। শব্দ হচ্ছে ট্রামটা থেকে, লকলকে আগুন ট্রামের তার ছুঁয়েছে। বারুদের গন্ধ বাতাসে, অনিমেষ সেই ট্রেনে-পরিচিত বৃদ্ধের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল। কার্ফু শব্দটার কার্যকর ক্ষমতা সে ওই প্রথম দেখল। এমন নিস্তব্ধ মৃত শহরের নাম কলকাতা এটা আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। সেই বৃদ্ধের মুখটা এখন মনে পড়ছে না, তিনিও কি—। সঙ্গে সঙ্গে যেন শব্দটা শুনতে পেল অনিমেষ। ট্রামের পাশে দাঁড়ানো পুলিশগুলোকে তেড়ে আসতে দেখে সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। এত অন্ধকার জলপাইগুড়ি শহরে কখনও দেখেনি সে। আর তখনই ওর থাই-এর মধ্যে গরম ছুরি বসিয়ে কেউ যেন শূন্যে ঠেলে দিল। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল অনিমেষ, আর কিছু মনে নেই। না, ঠিক তা নয়, কতগুলো অস্পষ্ট মুখ—কিছু না-বোঝা-কথাবার্তা এর পরে সে শুনেছে। নিজের মায়ের মুখ, ছবিতে থাকা মৃত মায়ের মুখ কি ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল ? একটা গান গাইছিল কেউ, তার সুর বা কথা কিছু মনে নেই। আর তারপরেই কে যেন এসে ভুল নামে তাকে ডেকেছিল, তারা কে ?

'জ্ঞান ফিরেছে।' গলাটা খসখসে কিন্তু ভাল লাগল অনিমেষের। সে চোখ খুলে যাঁকে দেখল তিনি একজন নার্স। সব নার্সকেই একই রকম দেখায়। এঁর চেহারা মোটেই সুন্দরী নয় এটুকু বোঝা যায়। অনিমেষ কথা বলতে চেষ্টা করল, ভীষণ দুর্বল লাগছে, 'আমি কোথায় ?'

'এটা মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল। দু'দিন আগে আপনি এখানে এসেছিলেন। এখন আরাম করে ঘুমোন।' নার্স হাসলেন। ওঁর কালো মাড়ি দেখতে অনিমেষের একটুও খারাপ লাগল না। কিন্তু হঠাৎই মনে হল কোমরের নীচ থেকে নিজের পায়ের অস্তিত্ব সে টের পাচ্ছে না। তলাটা যেন অসাড় হয়ে আছে। ব্যাপারটা কী বুঝে ওঠার আগেই শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল এবং পায়ের ওপর রাখা চাদর মাথা অবধি টেনে নেওয়ার মতো হঠাৎই একটা আচ্ছন্নতা ওকে ঢেকে ফেলল।

আবার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। কয়েক মুহূর্তের অস্বচ্ছতা, তারপরেই সব কিছু পরিষ্কার দেখতে লাগল অনিমেষ। তার কাছে কেউ নেই, সেই নার্সটিকেও দেখতে পেল না। কিন্তু ও পাশে বেশ কথাবার্তা চলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল ও পাশের বেডগুলোতে আরও মানুষ শুয়ে বসে আছেন এবং তাঁদের কাছে মানুষজন এসেছেন। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল সে যে এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে তা কি বাড়ির লোকেরা জানে ? অনিমেষ উঠে বসতে গিয়ে যন্ত্রণাটাকে আবিষ্কার করল। সে পারছে না, হাত আঙুল কিংবা মাথা তার ইচ্ছেমতন কাজ করলেও কোমরের নীচে ইচ্ছেটা পৌঁছাচ্ছে না।

আঘাত এবং যন্ত্রণাটা যে গুলি থেকে সেটা এখন স্পষ্ট। কিন্তু কে গুলি করল ওকে ? সেই গলির মধ্যে পালিয়ে যাওয়া ছেলেগুলো না পিছনে ধেয়ে আসা পুলিশ ? সে মনে করতে পারল আঘাতটা পিছন থেকেই এসেছিল এবং সে ধাক্কা খেয়েও পিছনে মুখ ঘোরাতে পারেনি। ট্রামের আগুনে দেখা পুলিশগুলো রাগী গোখরোর মতো তেড়ে আসছিল। কিন্তু হাতে স্যুটকেস আর বেডিং দেখেও কি ওরা বুঝতে পারল না ? খামোকা ওকে পুলিশ গুলি করল কেন ? গুলিটা যদি আর একটু ওপরে লাগত, একটুও অস্বাভাবিক ছিল না—তা হলে ?

'ঘুম ভেঙেছে তা হলে ?'

অনিমেষ দেখল একজন কালো চেহারার স্থূলকায় নার্স ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। সকালের নার্সটি নন। যদিও সব নার্সের পোশাক এক তবু এঁর কথা বলার ভঙ্গি এবং চাহনিতে এমন একটা ব্যাপার আছে যা অস্বস্তি এনে দেয়।

'হাঁ করে কী গিলছ ভাই, তোমার সামনে এখন অনেক পরীক্ষা।'

'পরীক্ষা, কীসের পরীক্ষা!' নিজের গলার স্বর অনিমেষের অচেনা, সে তো এরকম গলায় কথা বলে না। নার্স বললেন, 'তুমি তো আকাশ থেকে পড়েছ, নামটাও লেখা হয়নি, আর পায়ে যে মালটি ঢুকিয়েছিলে সেটা শান্ত ভদ্র ছেলের ঢোকে না। একজন বাবাজি রোজ দু'বেলা এসে তোমার

BanglaBook.org

খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে। তা আজ যদি কথা বলতে ইচ্ছে না করে চোখ মটকে পড়ে থাকো, আমি গিয়ে বলে দিই জ্ঞান ফেরেনি। খবরদার, চোখ খোলা চলবে না।' একনাগাড়ে কথা বললেও মুখের চেহারা একটুও পালটালেন না মহিলা।

'বাবাজি ?' এ সব কিছু হেঁয়ালির মতো লাগছিল অনিমেষের।

'পুলিশ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলে আর বাবাজিদের চিনলে না ? দিয়েছে তো পা ফাঁসিয়ে, এখন থাকো বিছানায় শুয়ে। এ বার পুলিশ অন্য ঠ্যাঙটা ধরে টানাটানি করবে। কি, ঘুমুবে না খবর দেব ?' মহিলার কথা বলার মধ্যে এমন একটা ঠাট্টার ভঙ্গি ছিল যে, অনিমেষ অসহায় হয়ে পড়ল। সে কাতর-গলায় বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি পুলিশকে কিছু করিনি, আমি কলকাতার কিছু চিনি না।'

'ও সব গল্প আমার কাছে বলে কোনও লাভ নেই।'

কথাবার্তা একদম অস্বাভাবিক। জলপাইগুড়িতে সে কোনও মহিলাকে এরকম কথা বলতে শোনেনি। কলকাতার সব মেয়ে কি এই ভঙ্গিতেই কথা বলে ? ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে কলকাতার মানুষদের মনে দয়ামায়া কম, কেউ কারও কথা ভাবে না, স্বার্থপর হয়ে যায় সবাই। কিন্তু নার্সরা এরকম হবে কেন ?

জলপাইগুড়িতে তার খবর এখনও পৌঁছায়নি। তার পকেটে অবশ্য এমন কিছু ছিল না যা থেকে কেউ তার ঠিকানা খুঁজে পাবে। অবশ্য স্যুটকেস খুললে সব কিছু পাওয়া যাবে। বাবার বন্ধুকে লেখা চিঠিও ওতে আছে। তা হলে কি স্যুটকেস বেডিং-এর হদিস কেউ পায়নি ? ও দুটো হারালে সে কী করবে ? তার সব শার্ট প্যান্ট তো ওই স্যুটকেসেই আছে। খুব দুর্বল লাগছে এখন।

'জ্ঞান ফিরেছে ?'

অনিমেষ দেখল একজন ডাক্তার—ডাক্তারই, কেন না গলায় স্টেথো ঝোলানো, ওকে প্রশ্ন করছেন। শরীরের পাশে নেতিয়ে থাকা ডান হাতের কবজিটা তুলে পালস্ দেখলেন তিনি, তারপর বললেন, 'পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলবেন না।'

'বাঁধা গৎ।' মোটা গলার চাপা হাসি কানে এল।

'যা বলেন, তবে এ কেসে আর একটু ব্লিডিং হলে বাঁচানো যেত না।' অনিমেষ ডাক্তারকে চলে যেতে দেখল। শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে ? অনিমেষের ইচ্ছে করছিল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে তার পা আস্ত আছে কি না ? সে নিজে উঠে বসে যে দেখবে তেমন শক্তি নেই। যদি পা বাদ দিয়ে থাকে ওরা তা হলে সে কী করবে ? চিরকাল খোঁড়া হয়ে হাঁটা—, মেঝেতে কিছু ঘষটে আনার শব্দ হতে অনিমেষ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একজন রোগা মানুষ কিন্তু কাতলা মাছের মতো মুখ, সবুজ হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরা, ও পাশ থেকে একটা টুল ঘষটে খাটের কাছে নিয়ে এল। লোকটার চোখ সে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না; কারণ, নাকের পাশে আর ভ্রূর তলার টিপি মাংস সে দুটোকে প্রায় ঢেকে রেখেছে।

'বিপ্লব হল ?' মুখের ভেতর চিবিয়ে ছিবড়ে ছুড়ে পেলেছে এমন ভঙ্গি কথা বলার। প্রশ্নটা বুঝতে পারল না, কীসের বিপ্লব, তার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক ?

'ফেরেব্বাজি আমি একদম পছন্দ করি না। যা জিজ্ঞাসা করব চটপট জবাব দেবে, তোমার চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য যে হাসপাতালে শুয়ে আছ।' কথা বলে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসল লোকটা। অনিমেষ দেখল ওর দাঁতগুলো খুব ছোট, চোখের মতো, আছে কি নেই বোঝা যায় না। সে খুব সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে ?'

'তোমাদের পরিত্রাতা, ঈশ্বর। ঈশ্বরকে চেনো ? যার ডাকনাম ভগবান ?' বলেই ভেঙচিয়ে উঠল লোকটা, 'আপনি কে ? নবাবসাহেব আমাকেই প্রশ্ন করছেন উলটে। একদম না। যা জিজ্ঞাসা করার তা আমিই করব।' হাতের ডায়েরি খুলে প্রথম প্রশ্ন হল, 'বাপ-মা-র দেওয়া নামটা কী ?'

'অনিমেষ।' ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, জিভ টানছে অনিমেষের।

'পুরো নাম বলার অভ্যেস নেই নাকি ? আচ্ছা ত্যাঁদোড় তো। যেন রবীন্দ্রনাথ, হিটলার, বললেই চিনে ফেলতে হবে। পুরো নাম ঠিকানা বলো!'

অনিমেষ বাধ্য হয়ে লোকটার হুকুম তামিল করতেই খিঁচুনি শুনতে পেল, 'আবার নক্করবাজি! বোম ছুড়লে শ্যালদায় আর ঠিকানা দিচ্ছ সেই জলপাইগুড়ির, ওখান থেকে বিপ্লব করতে এসেছিলে ?'

BanglaBook.org

অনিমেষ এতক্ষণে বিপ্লব শব্দটার অর্থ ধরতে পারল। সেদিন যে ট্রাম জ্বলছিল, বোম পড়ছিল, লোকটা তাকেই ব্যঙ্গ করছে। নার্স যার কথা বলছিলেন বাবাজি তিনি যে সুবিধের নন সেটা এতক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর কোনও ভয় লাগছে না অনিমেষের। সে সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কেউ সত্যি কথা বলে না, না?'

নো, নেভার। পুলিশদের কারবার সেরা মিথ্যুকদের সঙ্গে। এ বার আসল ঠিকানাটা বলে ফেলো। আরে বাবা, বাপ-মা থাকলে তারা এতক্ষণে হেদিয়ে মরছে, ঠিকানা জানলে আমি খবরটা দিয়ে দেব।' স্নেহ-স্নেহ মুখ করার চেষ্টা করতেই লোকটার চোখের তলার মাংসের ঢিবি নেচে উঠল।

'আমি ঠিকই বলছি। জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায় আমি থাকতাম। বাবা স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে কাজ করেন।' কথা বলতে এখন ক্লান্ত লাগছে। লোকটা যদি সত্যিই দাদুকে খবরটা দিয়ে দেয়! ঠিকানা লিখে নিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে আর যারা ছিল তাদের নাম বলো?'

'একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। উনি ফুটপাতে পড়ে গিয়েছিলেন, নাম জানি না।'

'বৃদ্ধ—ইয়ার্কি?'

'আমরা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে এসেছিলাম। স্টেশনে নেমে দেখলাম খুব গোলমাল হচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর উনি আমায় নিয়ে বেরিয়েছিলেন।'

'বেশ, বেশ, বলে যাও।' পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করেও কী ভেবে আবার বুক পকেটে রেখে দিল লোকটা।

'আমি এর আগে কখনও কলকাতায় আসিনি!'

'বাঃ, গুড, চলুক।'

'আমরা যখন রাস্তায় এলাম তখন চারপাশ নিস্তব্ধ আর একটা ট্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছিল।'

'দাউ দাউ করে জ্বলছিল, অ্যাঁ? কেমন লাগল দেখতে?' লোকটা ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'গপ্প বানানো সবার ক্ষমতায় আসে না, বুঝলে ছোকরা! আমরা ট্রাম পোড়ানোর জন্য একমাত্র যাকে ধরতে পেরেছি সে হল তুমি। আর তোমার গপ্প হল সেই সন্ধেতে প্রথম তুমি কলকাতার মুখ দেখেছ?'

কথা বলার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে, নীরবে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

'কিন্তু চাঁদু, ওই পোড়োবাড়ির আখড়ায়—যেখান থেকে বিপ্লব পরিচালনা করা হচ্ছিল সেখানে তোমাকে পাওয়া গেল কী করে? সব তখন ভোঁ ভোঁ, ওনলি তোমার হাফ-ডেড বডি পড়েছিল তো?' যেন আসল জায়গায় এতক্ষণে হাত দিয়েছে এমন ভঙ্গি করল লোকটা।

অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। চেতনায় অস্পষ্ট হলেও তার মনে আসছে কারা যেন তাকে চ্যাংদোলা করে ছুটে যাচ্ছিল। তারপর কেউ ভুল নামে ওকে ডেকেছিল—। সে চোখ না খুলেই বলল, 'আমি জানি না, আমার কিছু মনে নেই। এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে যেটা সে ঠাওর করেনি সেটাই ঘটে গেল। হঠাৎই যেন তার পায়ের তলায় মাটি সরে যেতে সে তলিয়ে যাচ্ছিল। সে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেও সব কিছু নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে হু হু করে নীচে নেমে গেল এবং তারপর সব অন্ধকার।

ঠিক কত ঘণ্টা জানা নেই, ঘুম থেকে ওঠার মতো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চোখ খুলল অনিমেষ। এখন বেশ ভাল লাগছে, গতকাল জ্ঞান ফেরার পর যে অবসাদ সমস্ত শরীরে জড়িয়েছিল সেটা এখন নেই। দুটো হাত মাথার ওপর এনে সে দেখল বেশ জোর পাচ্ছে, কিন্তু উঠে বসতে গিয়ে খচ করে কোমরে লাগতেই প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে গেল থাইতে। কিছুক্ষণ মুখ বুজে শুয়ে থেকে যন্ত্রণাটাকে কমিয়ে আনল অনিমেষ। হাত দিয়ে যেটুকু পারে বুলিয়ে সে বুঝতে পারল তার পা দুটো আস্তই আছে, মনে হয় কেউ বাদ দেয়নি। হ্যাঁ, পায়ের আঙুলগুলো সে নাড়াচাড়া করতে পারছে। অদ্ভুত স্বস্তি এল মনে, কী আরাম! ওর নাকি খুব ব্লিডিং হয়েছিল? যারা তাকে গলি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা কি অযত্ন করেছে? নাকি পুলিশই দেরি করেছে তাকে হাসপাতালে ভরতি করতে?

অনিমেষ দেখল, ও পাশের বেডে একজন বৃদ্ধ উবু হয়ে বসে আছেন। খুব রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা। চোখাচোখি হতেই ফোকলা মুখে সরল হাসি হাসলেন, 'তা হলে ঘুম ভাঙল, কেমন বোধ করছ বাবা?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ভাল।

'কাল বিকেলবেলায় সেই লোকটা খুব খিচোচ্ছিল বুঝি? আমি নার্সকে বললাম, কেন এ সব লোককে ঢুকতে দেন? তা সে মাগি জবাব দিল লোকটা নাকি পুলিশ। তা বাবা, কী করেছিলে,

BanglaBook.org

ডাকাতি না ছেনতাই ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'ও সব কিছু নয়।'

অনিমেষ দেখল, এটা একটা বিরাট হলঘর। তার বিছানা, একদম দেওয়াল ঘেঁষে। এক পাশে সাদা দেওয়াল, অন্য পাশে সারি সারি বিছানা। অনিমেষের মনে হল, বৃদ্ধের বসে থাকার ভঙ্গিটা খুব স্বাভাবিক নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওভাবে বসে আছেন কেন ?'

'শুতে পারি না ভাই, শুলেই শরীরের সব হাড় পটাপট গায়ের মধ্যে ফোটে। না খেতে পেয়ে মাংস বলে তো কিছু নেই। আবার লোকে যেভাবে বসে থাকে সেভাবে বসলে খচখচ করে। এই যে উচ্চিংড়ের মতো বসে আছি—এটাই আমার আরাম।' তারপর মাথা দুলিয়ে ফাঁকা মাড়িতে একগাল হেসে বললেন, 'সকলে মিলে যে নিয়মটাকে তৈরি করে আমরা সেটাকেই স্বাভাবিক বলি। কেউ কেউ যদি নিজের মতো কিছু করে নেয় সেটা চোখে ঠেকলেও জেনো তাতেই তার আরাম।'

পায়ের শব্দে অনিমেষ দেখল গতকালের সেই অসুন্দর অথচ ভাল লাগা নার্সটি এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজেই কথা বলল সে, 'এখন ভাল আছি।'

'খুব ঘুমিয়েছেন!' তারপর খাটের পিছনে টাঙানো একটা কাগজ দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাত্রে জ্বর এসেছিল ?' মহিলা ঝুঁকে পড়ে ওর কপাল ছুঁয়ে বললেন, 'না, এখন টেম্পারেচার নেই।' অনিমেষ অবাক হল। ঘুমের মধ্যে তার কখন জ্বর এল আবার চলেও গেল সে টের পায়নি। মহিলা সতর্ক করলেন, 'এখন নড়াচড়া একদম বন্ধ। যদি আবার হাঁটতে চান হাড়টা এমন জায়গায় ফেটেছে যে অবাধ্য হলে আর জোড়া লাগবে না। খুব ভাগ্য যে বেঁচে গেছেন।'

অনিমেষ মহিলার দিকে তাকাল। ছোট্ট শান্ত মুখ, গলার স্বরে দূরত্ব নেই। টুকটাক কাজ সেরে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে তো কিছুই নেই যা দিয়ে একটু পরিষ্কার হবেন। হাসপাতালে ও সব কিছু পাওয়া যায় না। বাড়িতে খবর গেছে ?'

'জানি না, কাল একজন পুলিশ এসেছিল—ওরা যদি খবর দেয়।' বলতে বলতে সে দেখল, ও পাশের অনেক বিছানার চারপাশে কাপড়ের ঘেরাটোপ, সম্ভবত প্রাকৃতিক কাজকর্মগুলো প্রকাশ্যে করা থেকে আড়ালের ব্যবস্থা। আশ্চর্য, অনিমেষ নিজে ওরকম তাগিদ অনুভব করছে না এখন আর করলেও এই মহিলার সামনে মরে গেলেও—।

ঠিকানাটা বলুন, দেখি হাসপাতাল থেকে চেষ্টা করে যদি খবর দেওয়াতে পারি।' মহিলা টুলটাকে টেনে নিয়ে পাশে বসলেন। অনিমেষ এ বার অনুভব করল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার চোখ দুটো ভারী, সম্ভবত সেখানে পিচুটি জমেছে। কোনও মহিলার দিকে এই চোখে তাকানো অস্বস্তিকর। সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় আমার বাড়ি।'

'জলপাইগুড়ি! ওমা, সে তো অনেক দূরে। কলকাতায় আপনি কোথায় থাকতেন ?'

'যে দিন গুলিটা লাগল সে দিনই আমি প্রথম কলকাতায় এসেছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারছি না। কলকাতার কিছুই চিনি না আমি। বাবার এক বন্ধু এখানেই থাকেন, তাঁর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। এই যাঃ, পুলিশকে ওঁর ঠিকানাটা বলতেই ভুলে গিয়েছি।' অনিমেষের সত্যি আপশোস হল।

'কী ঠিকানা ?'

'সাত নম্বর হরেন মল্লিক লেন, কলকাতা—কলকাতা বারো বোধ হয়। বাবার বন্ধুর নাম দেবব্রত বাবু, ওঁকেও আমি কখনও দেখিনি।' অসহায়ের মতো তাকাল সে।

'কলকাতা বারো ? তা হলে তো এই এলাকা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খবর দিয়ে দেব।'

'আপনি নিজেই দেবেন ?'

'দিলামই বা। আপনি আগে কলকাতায় আসেননি।' হেসে উঠলেন, 'আপনাকে আপনি বলতে আমার খারাপ লাগছে, একদম বাচ্চা ছেলে, আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'ঠিক আছে, আপনি আমাকে তুমি বলবেন। আমার নাম অনিমেষ।'

'এখানে কী জন্য আসা হয়েছিল ?'

'পড়তে। আমি এ বার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।'

'দেখো কী কপাল! এ বছরটা নষ্ট হয়ে গেল তো!'

'নষ্ট হল মানে ? আমি কি হাঁটতে পারব না ?'

'পারবে না কেন ? তবে অনেকদিন বিছানায় আটকে থাকতে হবে। হাঁটুর ওপরের হাড়টা ফ্র্যাকচার হয়েছিল, বয়স অল্প বলে জুড়ে যাবে। তুমি তো মরেও যেতে পারতে।'

BanglaBook.org

কথা শেষ করতেই ও পাশের একজন রুগি কিছু চেঁচিয়ে বলতে মহিলা উঠে তাঁর কাছে চলে গেলেন। অনিমেষ শিথিলভাবে শুয়ে রইল। ভীষণ মন খারাপ লাগছে।

দুপুরে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল, কিন্তু গরমে জামা ভিজে গেছে, ঘেমো গন্ধ বেরুচ্ছে বিছানা থেকে—গা ঘিনঘিনে ভাবটা আর ঘুমুতে দিচ্ছিল না ওকে। পাশের বেডের বৃদ্ধ সেই রকম ভঙ্গিতে বসে বসেই দুপুরটা ঘুমুলেন। এখন ওয়ার্ডে কেউ হাঁটাচলা করছে না। মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে আসছে বাইরে থেকে। খাওয়ার সময় বৃদ্ধের মুখে শুনে সে জেনেছে ওটা ট্রামের শব্দ। খাওয়া—অনিমেষ কোনও দিন চিন্তাও করেনি এ ভাবে শুয়ে শুয়ে মানুষ খেতে পারে। এমনকী প্রাকৃতিক কাজগুলো পর্যন্ত এই বিছানায় সারতে হল। ভাগ্যিস তখন কোনও নার্স ছিল না, জমাদার টাইপের একটা লোক অনিমেষকে খুব সাহায্য করেছে। ট্রামের শব্দটা শুনে ওর মনে হল, কলকাতা শহরের বুকে সে শুয়ে আছে, কিন্তু একটা চলন্ত ট্রাম সে দেখতে পেল না। এখন নাকি কলকাতা একদম স্বাভাবিক, রাস্তায় বন্দুক হাতে পুলিশ নেই। কেউ বোম ছুড়ছে না, ট্রাম পোড়াচ্ছে না। কলকাতা শহর যেমন হঠাৎই ফুঁসে ওঠে তেমনি চটজলদি ঠান্ডা হয়ে যায়। বৃদ্ধের মুখে এ খবর শুনে অনিমেষ অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে জন্য আন্দোলন হয়েছিল তা যেমনকে তেমনই রয়েছে। এ রকম ভালুক-জ্বরের মতো আন্দোলন করে কার কী লাভ হয়? আবার এমনও তো হতে পারে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে এর প্রকৃত কারণটা ধরতে পারছে না। কলকাতাকে জানতে হলে এই শহরে মিশে যেতে হবে। অসহায়ের মতো অনিমেষ নিজের পায়ের দিকে তাকাল।

কোথাও যেন ঘণ্টা বাজল ট্রেন ছাড়ার আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের বিছানার মানুষেরা নড়েচড়ে বসতে লাগল। এটা তা হলে ভিজিটার্স আওয়ার। রোগীদের আত্মীয় বন্ধুরা আসছে। সে দেখল বৃদ্ধের কাছে কেউ আসেনি এবং তাতে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। উনি তেমনি উবু হয়ে বসে সব দেখছেন। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই একটা অপরিচিত গলায় নিজের নাম শুনে তাকে চোখ খুলতেই হল। একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। ফরসা মাথার পাতলা চুল, লম্বা, ধুতি পাঞ্জাবি পরা। ওকে চোখ খুলতে দেখে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম অনিমেষ?'

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল সে।

'কোথায় বাড়ি?'

'জলপাইগুড়ি।' ইনি কে? দেখে তো পুলিশ বলে মনে হচ্ছে না।

'বাবার নাম কী?' ভদ্রলোক খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

'মহীতোষ–' কথাটা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক। যেন উত্তর পেয়ে গেছেন, আর প্রয়োজন নেই এমন ভঙ্গিতে হাত তুলে হাসলেন, 'আসার কথা ছিল আমার বাড়িতে, তার বদলে চলে এলে এই হাসপাতালে! কী আশ্চর্য!'

এ বার অনিমেষ অনুমান করল ভদ্রলোকের পরিচয়, 'আপনি–।'

'তোমার বাবার বন্ধু দেবব্রত মুখার্জি। সাত নম্বর হরেন মল্লিক লেন এখান থেকে দু' পা রাস্তা কিন্তু ওই নার্স মহিলা যদি না যেতেন তা হলে জানতেই পারতাম না। ওঁর কাছেই সব শুনলাম, কী গেরো বলো দেখি। বিধিলিপি কে খণ্ডাবে! আমি তোমার বাবার টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম যে দিন তোমার আসার কথা তার পরের দিন। কী ডাক ব্যবস্থা বোঝো! তা পেয়ে অবধি দুশ্চিন্তায় অস্থির, এই বিরাট শহরে কোথায় আছ কে জানে! তা আজ খবর পেয়েই মহীকে টেলিগ্রাম করলাম চলে আসার জন্য। এখন কেমন আছ?' ভদ্রলোকের কথা বলার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, অনিমেষের ভাল লাগল। সে বলল, 'শুধু এই পা-টা–।'

'ঠিক আছে, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না।' বলে দেবব্রতবাবু মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন, 'তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের আলাপ করিয়ে দিই—নীলা, এ দিকে আয়।'

এতক্ষণে অনিমেষ লক্ষ করল, দেবব্রতবাবু একা নন, একটি লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। যদিও গায়ের রং চাপা তবু ওকে দেখলে চট করে উর্বশীর কথা মনে পড়ে যায়। জলপাইগুড়ির বিরাম করের মেজ মেয়ে উর্বশী এখন কলকাতায় আছে।

'আপনার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে অবধি বাবা ছটফট করছেন, পারলে সেই দুপুরেই ছুটে আসতেন।' রেডিয়োর ঘোষিকারা যেভাবে কথা বলে থাকেন সেই ভাবে বলল মেয়েটি।

Banglabook.org

'অনিমেষ খুব ভাল ছেলে, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। নীলাও এ বার পাশ করেছে, বুঝলে। বিদ্যাসাগর মর্নিং-এ ভরতি হয়েছে। আচ্ছা নীলা, তুই একটু ওর কাছে বস, আমি ডাক্তারদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। দেবব্রতবাবুকে সত্যি চিন্তিত দেখাচ্ছিল, তিনি চলে গেলেন।

কী কথা বলবে অনিমেষ বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ কর থাকল। নীলাও সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় অনিমেষ বলল, 'আমার বোধ হয় কলেজে ভরতি হওয়া হবে না।'

'আগে সেরে উঠুন তো। যেমন চটপট পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন! মফস্বলের লোক তো—।' হাসল নীলা।

'কলকাতার লোকেরা বুঝি খুব বুদ্ধিমান হয়?'

'হয়ই তো। যাক, বাবা চাইছিলেন আজই আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। কিন্তু নার্স যা বললেন তাতে কী হবে কী জানি!'

'আপনাদের বাড়িতে এ অবস্থায় গেলে অসুবিধে করব।'

'বাব্বা, খুব জ্ঞান দেখছি।'

'এখন এ কথা বলছেন পরে অসহ্য হবে।'

'তাই নাকি! এত জেনে বসে আছেন। বরং হয়তো উলটো ব্যাপার হবে।'

'তার মানে?'

'আমার নাম শুনলেন তো?'

'নীলা!'

'জানেন তো, ওটা কারও কারও সহ্য হয় না।'

তিন

দেবব্রতবাবু খুব কাজের মানুষ। নইলে পুলিশ এত সহজে হাত গুটিয়ে নিত না। অনিমেষ শুনল, লালবাজারে দেবব্রতবাবুর খুব জানাশোনা আছে। কী করে কী হল অনিমেষ জানে না কিন্তু সেদিনের পর আর কোনও পুলিশ ওর সঙ্গে কথা বলতে আসেনি। ব্যাপারটা জেনে দেবব্রতবাবুর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

হাসপাতালে এখন সে অনেকটা স্বচ্ছন্দ। দেবব্রতবাবু সেদিনই দুটো শার্ট আর পাজামা কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন নীলা একটা ছোট বাক্সেটে তোয়ালে সাবান আর পাউডার এনে দিয়েছে। একইভাবে দীর্ঘদিন শুয়ে থাকলে নাকি পিঠে ঘা হয়ে যায় তাই পাউডারের ব্যবস্থা। শরীরটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় অনিমেষের মেজাজ ভাল হল। শুধু এই একভাবে শুয়ে থাকাটাই অস্বস্তিকর। ঘুম আসে না, বদলে আজেবাজে চিন্তার ভিড় জমে। নীলার মা কখনও আসেনি। কিন্তু নীলার সঙ্গে কথা বলতে অনিমেষের রীতিমতো ভয় করে। যদিও দেবব্রতবাবু সামনে থাকলে নীলার কথাবার্তা খুব সাধারণ হয়ে যায়, বোঝা যায় রেখেঢেকে কথা বলছে। কিন্তু একা থাকলেই এমন ভঙ্গি করে তাতে সে যে কলকাতার মেয়ে, অনেক বেশি জানে অনিমেষের চেয়ে, এটা বোঝাতে কসুর করে না। অনিমেষ আন্দাজ করে ওদের সংসার বেশ সচ্ছল, নীলা নিত্য পোশাক পালটে আসে, দেবব্রতবাবুকে রোজ ইস্ত্রিভাঙা পাঞ্জাবি পরতে দেখেছে সে। বাবা তো চিরকাল স্বর্গছেঁড়ায় রয়ে গেলেন, এদের সঙ্গে কী করে আলাপ হল কে জানে! ওদের পরিবারের কোনও মেয়ে রোজ রোজ অপরিচিত কোনও ছেলেকে দেখতে হাসপাতালে আসত না।

মহীতোষ যে বিকেলে এলেন সেই দিনই মৃত্যু দেখল অনিমেষ। নিজের মাকে যে চোখের সামনে একটু একটু করে মরে যেতে দেখেছে তার কাছে মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এই ঘটনাটা একদম অবাক করে দেবার মতো। সকালে নার্স সবাইকে দেখাশোনা করেছেন তখনই ওঁর নজরে পড়ল অনিমেষের পাশের বেডের বৃদ্ধ টানটান হয়ে শুয়ে আছেন। নার্সদের ডিউটি রোজ এক সময়ে থাকে না, আজকে যিনি আছেন তিনি গম্ভীর মুখের এবং অনিমেষ তাকে হাসতে দেখেনি। মহিলা বৃদ্ধের পাশে গিয়ে ঝুঁকে শরীরে হাত ছোঁয়ালেন, একবার নাড়ি দেখলেন, তারপর পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাদরটা টেনে মুখ অবধি ঢেকে জুতোয় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

আচমকা একটা মানুষকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় অনিমেষের শরীর কেঁপে উঠল। চোখের সামনে জুড়ে থাকা ওই সাদা কাপড়টা যেন নিষ্ঠুর হাতে জীবনকে সরিয়ে দেয়। ওর মনে পড়ল বৃদ্ধ বলেছিলেন যে স্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকলে ওঁর সর্বাঙ্গে হাড় ফোটে। তাই এক উদ্ভট ভঙ্গিতে বসে

BanglaBook.org

থাকতেন, সেই ভাবেই ঘুমুতেন, আরাম তৈরি করে নিয়েছিলেন মনের মতো। অথচ এখন কী নিশ্চিন্তে সর্বাঙ্গ বিছিয়ে শুয়ে আছেন। মানুষটা যে কখন নিঃশব্দে চলে গেল সে টের পায়নি দু'হাত দূরে শুয়ে থেকেও। হঠাৎ সে লক্ষ করল নার্স চলে যাওয়ার পর এই ঘরে আর কোনও শব্দ হচ্ছে না। সবক'টা বেডের মানুষ এই দিকে চুপচাপ তাকিয়ে। এঁরা প্রত্যেকেই জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহে হোঁচট খেয়ে হাসপাতালে এসেছেন মেরামতের জন্য। কিন্তু মুশকিল হল মৃত্যুর দরজাটা এখান থেকে এত কাছে, বড় কাছে! হঠাৎ কেউ শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় 'হরি হে নারায়ণ' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনিমেষের মনে হল বৃদ্ধের শরীর থেকে নির্গত আত্মা এখনও এই ঘরে পাক খাচ্ছে আর তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই ওই তিনটি শব্দ অঞ্জলির মতো ছুড়ে দেওয়া হল। এই বৃদ্ধের কোনও আত্মীয়কে সে দু'দিনে দেখেনি। পৃথিবীতে জন্মে এত বয়স ভোগ করে চুপচাপ চলে যাওয়ায় পৃথিবীর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হল না। এত কষ্ট পাওয়া অথবা কাউকে কষ্ট দেওয়ার কী দরকার ছিল ওই বৃদ্ধের যদি চুপচাপ মৃত্যুর কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়! সে দিন সেই অন্ধকার গলিতে পুলিশের বুলেট যদি আরও কয়েক ইঞ্চি ওপরে ছুটে আসত তা হলে অনিমেষেরও ওই একই হাল হত। খুব বিরক্তিতে মাথা নাড়ল অনিমেষ, না, এই রকম চুপচাপ সে মৃত হয়ে যাবে না।

এ দিন আর একটা ঘটনা ঘটল। এগারোটা নাগাদ অনিমেষ দেখল ওর বেডের দিকে একটি ছেলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখ পড়ায় চমকে উঠেছিল সে, সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, মনে হয়েছিল সুনীলদা এগিয়ে আসছে। যে মানুষটাকে ওরা মাথায় করে নিয়ে গিয়ে জলপাইগুড়ির শ্মশানে দাহ করে এল সে কী করে এখানে আসবে ? সে দেখল পঁচিশের নীচে বয়স, পাজামা আর হ্যান্ডলুমের গেরুয়া পাঞ্জাবি পরনে ছেলেটি ঘরে ঢুকে অন্য বেডগুলো একবার দেখে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কলকাতা শহরের কোনও ছেলেকে অনিমেষ চেনে না। ছেলেটি ওর বেডের পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল খানিক, তারপর বলল, 'এখন তো আপনি সুস্থ মানে কথা বললে অসুবিধে হচ্ছে না, তাই তো ?'

অনিমেষ নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'আপনি একটু সুস্থ না হলে আসতে পারছিলাম না। ওদের বুলেটটা নিচু হয়ে এসেছিল এটুকুই যা সান্ত্বনা। আপনার সব খবর আমি জানি, দু'দিন জ্ঞান ফেরেনি, প্রচুর ব্লিডিং হয়েছিল।' সামান্য জড়তা নেই কথায়, অপরিচিত শব্দটা কথা বলার ভঙ্গিতে নেই।

'আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।' সরাসরি বলে ফেলল অনিমেষ।

'কী করে চিনবেন ? তখন তো আপনার হুঁশই ছিল না। শুধু মা মা বলে গোঙাচ্ছিলেন।' হাসল ছেলেটি, 'যাক, আপনার জ্ঞান না ফিরলে আসতে পারছিলাম না। তারপর শুনলাম পুলিশ নাকি এমন মগজ ধোলাই করেছে যে আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল অনিমেষের। ও কি সেই ছেলেগুলোর একজন যারা ট্রাম পুড়িয়েছিল? এই মুহূর্তে যদি সম্ভব হত অনিমেষ উঠে বসত। ওর চোখ-মুখে এক ধরনের উত্তেজনা ফুটে উঠল, 'আপনারা আন্দোলন করছিলেন ?'

ওর এই হঠাৎ উত্তেজিত ভাবটা লক্ষ করেও ছেলেটি খুব সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'পুলিশ আপনাদের ধরতে পারেনি ?'

'না!' বলেই হেসে উঠল ছেলেটি, 'তা হলে এখানে এলাম কী করে ? আপনার সঙ্গে পরিচিত হই, আমার নাম সুবাস সেন। চাকরিবাকরি পাইনি এখনও, টিউশনি করি কয়েকটা। আপনার নাম তো অনিমেষ, এ বারে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ভর্তি হতে এসেছ ?'

আর একবার অবাক হল অনিমেষ। এ সব কথা সুবাস জানল কী করে ? সে লক্ষ করল সুবাস বাক্যটা আরম্ভ করেছিল আপনি বলে, শেষ করল তুমিতে।

টুলটা নিয়ে এসে সুবাস বলল, 'তোমার স্যুটকেস খুলে এ সব জানতে পারলাম। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি আমাদেরই দলের লোক। যাক, বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে এখান থেকে ?'

বিহ্বল অনিমেষ সময় নিল কথা বলতে, 'হ্যাঁ, বাবার এক বন্ধু দিয়েছেন, পুলিশও দিতে পারে।' তারপরই সে প্রশ্নটা ছুড়ল, 'আপনাদের আন্দোলন এখনও চলছে ?'

সুবাস প্রশ্নটা শুনে অনিমেষকে ভ্রূ কুঁচকে দেখল। কী বুঝল অনিমেষ জানে না। তবে সন্দেহ ছিল ওর চোখে, 'যতক্ষণ আন্দোলনটা আমাদের সবাইকার না হবে ততক্ষণ তার জীবন কয়েক ঘণ্টা

BanglaBook.org

কিংবা দিনের। আমরা শুধু সরকারকে খুঁচিয়ে একটু বিরক্ত করতে পারি কিন্তু সেটাকে বৃহৎ ব্যাপারে নিয়ে যেতে পারি না। তাই সেদিন গুলি চলল, ট্রাম পুড়ল, কাগজে হেডিং হল কিন্তু মানুষের অবস্থা একই রয়ে গেল। তুমি রাস্তায় বেরুলে দেখবে জীবন একদম স্বাভাবিক, সে দিনের কথা কারও খেয়ালে নেই।'

অনিমেষ মন দিয়ে কথাগুলো শুনল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সে দিন কী ধরনের আন্দোলন তার বিস্তৃত বিবরণ সুবাসের মুখে শোনে। কিন্তু সঙ্কোচ হল এ বার, কী মনে করবে বলা যায় না। তাই যে প্রশ্নটা নিজের কাছে অস্পষ্ট সেটাই ও জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কীসের জন্য আন্দোলন করছেন?'

সুবাস ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল, তারপর বলল, 'জলপাইগুড়িতে তুমি কি বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলে?' অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না।

'আজ থাক। পরে একদিন আলোচনা হবে। তোমার জন্য দুঃখিত, কলকাতায় পড়তে এসে কী হয়ে গেল! কত দিনে সারবে বলছে?'

'এখনও বলেনি তবে বাবার বন্ধু বলছেন বেশি দিন লাগবে না।' ওকে উঠতে দেখে অনিমেষের খারাপ লাগছিল। সুবাসের সঙ্গে কথা বলতে ওর ভাল লাগছে।

সুবাস বলল, 'তোমার স্যুটকেস আর বেডিং নীচের এনক্যুয়েরিতে জমা দিয়েছি আজ। মনে হয় ওরা কিছু সরাবে না, দেখে নিয়ো সব ঠিক আছে কি না!'

যেন ঝিনুক খুলেই মুক্তো পেল অনিমেষ। হারানো জিনিস দুটো সুবাস জমা দিয়ে গেছে জেনে ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। কলকাতা শহরের কোনও মানুষ একটা দায়িত্ব নিজে থেকে নেবে সে কল্পনা করতে পারেনি। এখানকার মানুষের হৃদয় নেই, বিশ্বাস শব্দটা এই শহরে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এ সবই শুনে এসেছে এতকাল। অথচ ওর আহত শরীরটাকেই ওরা শুধু তুলে আনেনি, গলির ভেতর ছিটকে পড়ে থাকা জিনিসপত্র কুড়িয়ে এনে হাসপাতালে জমা করে দিয়ে গেছে—অনিমেষের বুক ভরে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আবার আসবেন তো?'

'তোমাকে এরা কবে ছাড়বে কিছু বলেছে?'

'না।'

'যদি উপায় থাকে তবে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়াই ভাল। ভারতবর্ষের হাসপাতালগুলোর সঙ্গে মর্গের কোনও পার্থক্য নেই। বিকেলে আমার সময় হবে না, এলে এই সময় আসব।'

'এই সময় ওরা আসতে দেয়?'

'এসেছি তো। আমি সব জায়গায় যেতে পারি, ব্রিটিশ আমল হলে লাটসাহেবের শোওয়ার ঘরেও ঢুকে যেতে পারতাম। চলি।' কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এল সুবাস, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। কাগজে বেরিয়েছে প্রথম সারির একজন নেতাকে পুলিশ নাকি আহত অবস্থায় ধরেছে বলে দাবি করেছে। কিছু না পেয়ে ওরা পুতুলকে মানুষ বলে চালাচ্ছে। ওরা যদি আবার প্রশ্ন করে জবাব দিয়ো না।'

অনিমেষ সরল মনে জানাল, 'পুলিশ তো অভিযোগ তুলে নিয়েছে, ওরা আমার কাছে সে দিনের পর আর আসেনি। বাবার বন্ধু দেবব্রতবাবু এটা ম্যানেজ করেছেন।'

একটু অবাক চোখে অনিমেষকে দেখল সুবাস, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'দেবব্রতবাবু কী করেন?' কথাটার মধ্যে একটুও স্বাভাবিকতা নেই, অনিমেষের অস্বস্তি হল, 'জানি না, তবে এখানকার পুলিশের সঙ্গে ওঁর খুব জানাশোনা আছে।'

'ও। তবে আর চিন্তা কী!' কথাটা বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল সুবাস।

মন খারাপ হয়ে গেল অনিমেষের। যে উপমাটা এইমাত্র সুবাস দিয়ে গেল সেটা মনের সব আনন্দ নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যেহেতু সে কোনও সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দেয়নি তাই পুতুল হয়ে গেল? আর দেবব্রতবাবুর কল্যাণে পুলিশ যে হাত গুটিয়ে নিয়েছে এতে তার অপরাধ কোথায়? কিন্তু সুবাসের মুখের ভাব স্পষ্ট বলে দিল কথাটা শুনে সে একটুও খুশি হয়নি। ও পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। এখন কড়া রোদ। সুবাস নিজে থেকে না এলে তার দেখা পাওয়া আর সম্ভব নয়। পাশের বেডে এখনও সেই বৃদ্ধ চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। সুবাস কি একটা মৃতদেহের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছিল?

দুপুরবেলায় ঘুম এল না। আজকাল অবশ্য এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশের বিছানা এখন ফাঁকা। এমনকী বেডকভার না থাকায় ময়লা তোশকটা বিশ্রী দাঁত বের করে হাসছে। ও দিকে চোখ রাখা যায় না। সুবাসের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর অনিমেষের মন কেমন ভার হয়ে আছে। সুবাস ওর

BanglaBook.org

চেয়ে বয়সে খুব একটা বড় নয় অথচ ওর সঙ্গে কথা বললে নিজেকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। অনিমেষ জোর করে ভাবনাটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল। দেবব্রতবাবু বলেছিলেন যে স্কটিশচার্চে ওঁর এক বন্ধু নাকি অধ্যাপনা করেন। অনিমেষ সেখানে ভরতি হয়ে বাড়িতেই পড়াশুনা করতে পারে। ফার্স্ট ইয়ারে কাউকেই বেশি পড়তে হয় না। অ্যাটেন্ডেন্সের গড় ঠিক থাকলেই প্রমোশন পাওয়া যায়—তা সেটাও নাকি ম্যানেজ হয়ে যাবে। এটা শুনে অনিমেষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে কিন্তু যতক্ষণ ব্যবস্থাটা পাকা না হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। ফার্স্ট-ইয়ারটা শুয়ে শুয়েই কাটাতে হবে?

বিকেলবেলায় মহীতোষ এলেন। সঙ্গে দেবব্রতবাবু, আজ নীলা আসেনি। দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেয়ে খানিকটা সঙ্কোচ আর কেন জানা নেই অপরাধবোধ এল অনিমেষের। মহীতোষ সোজা মানুষ, চা-বাগানের নির্জনতায় থেকে সরল কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অনিমেষ জানে বাবা তাকে ঘিরে অনেক আশা করেন। ওকে ডাক্তার হতে হবে, অনেক পসার হবে—প্রচুর টাকা আসবে, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে ফর্মুলা তার বাইরে তিনি ছেলেকে কিছুতেই দেখতে চান না। অথচ কলকাতায় সে পড়তে আসুক এ ব্যাপারে তাঁর কোথায় যেন দ্বিধা ছিল। হয়তো ভেবেছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে আই. এসসি. পাশ করে কলকাতায় পড়তে গেলে ওর আরও দায়িত্ববোধ এবং বয়স বাড়বে সুতরাং চিন্তার কিছু থাকবে না। সেই ছেলে কলকাতায় পৌঁছে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে খবর পেয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খবরটা এল লোকাল থানা থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর ছেলে সম্পর্কে জেরা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যেন অনিমেষ কলকাতায় খুব বড় ডাকাতি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। একটা কথা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না, একদম আনাড়ি ছেলে কলকাতায় গিয়ে কী করতে পারে যার জন্য পুলিশ গুলি করবে? কাগজে তিনি পোড়া ট্রাম-বাস আন্দোলনের ছবি দেখেছেন। মহীতোষের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল নিজের ছেলেকে তিনি কখনওই চিনতে পারেননি। ট্রেনে গেলে অনেক সময়। পড়ি কি মরি করে তেলিপাড়া থেকে যে বেসরকারি মালের প্লেন ছাড়ে তাতেই জায়গা করে নিলেন। অনিমেষের এই খবরটা জলপাইগুড়িতে সরিৎশেখরকে জানাবার সময় পেলেন না আর। শেষ দুপুরে দমদমে নেমে সোজা দেবব্রতবাবুর কাছে চলে এসেছেন তিনি। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা একটু টের পেলেন না মহীতোষ। দমদম থেকে হরেন মল্লিক লেনে আসতে যে কলকাতা পড়ল তা শান্ত, কোথাও কোনও বিক্ষোভ নেই। কল্পনাই করা যাচ্ছে না এখানে এসে অনিমেষ কী কারণে গুলি খেতে পারে। দেবব্রতবাবু বাড়িতে ছিলেন, দীর্ঘকাল বাদে দেখা হওয়া মাত্র মহীতোষ হাসপাতালে যেতে চাইলেন। কিন্তু তখন দুপুর, যেতে চাইলে সম্ভব নয়। দেবব্রতবাবু মহীতোষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন। এর কিছুটা অনিমেষের কাছে দেবব্রতবাবু জেনেছেন, কিছুটা পুলিশের সূত্রে, বাকিটা অনুমান।

অনিমেষ এখন মোটামুটি ভাল, জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই জানতে পেরে মহীতোষ কিছুটা শান্ত হলেন। সকালে পাওয়া উত্তেজনাটা হঠাৎ নিভে এলে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল। দেবব্রতবাবু ওঁকে বোঝালেন এখন কিছুই করার নেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা থাই-এর হাড়ে গুলি লেগে সেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছিল, অপারেশন হয়েছে, ডাক্তার বলছে মাস ছয়েক বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলে অনিমেষ হাঁটতে পারবে। দুর্ঘটনা তো ঘটেই কিন্তু মুশকিল হল সেটা ঘটবার আগে কিছুতেই জানা যায় না। মহীতোষ বললেন, 'আসলে আমার ভাগ্যটাই এই রকম। ওর মা চলে গেল একটা সামান্য দুর্ঘটনায়, কোনও কারণ ছিল না। ছেলেটা এতকাল দাদুর কাছে মানুষ হয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্কুল ফাইনালে ও যখন ফার্স্ট ডিভিশন পেল আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পড়াশুনায় ভাল কিন্তু বড্ড জেদি আর অবাধ্য মনে হত। তা রেজাল্ট ভাল হতে ওকে ঘিরে একগাদা কল্পনা করে ফেললাম। অথচ দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আবার দুর্ঘটনা।'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'আপনার ছেলেকে অবাধ্য বলে মনে হয় না কিন্তু।'

মহীতোষ হাসলেন, 'ওটা ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। ও যেটা ভাল মনে করে সেটা করবেই। এককালে কংগ্রেসের কাজকর্ম করত আমার অপছন্দ সত্ত্বেও।'

দেবব্রতবাবু অবাক হলেন, 'অনিমেষ কংগ্রেস করত?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে সেরকমই শুনেছিলাম, নেহাতই কাঁচা ব্যাপার, চাপল্য তো ওই বয়সেই আসে।' মহীতোষ নিজেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

'ঠিক আছে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, ওর কলেজে ভরতির সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্কটিশে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে রাখছি, সুস্থ হলে ক্লাশ করবে।'

BanglaBook.org

'স্কটিশে কেন, প্রেসিডেন্সিতে জায়গা পাবে না ?'

'না—মানে, ধরাধরির ব্যাপার তো। ক্লাশ না করলে প্রেসিডেন্সি খাতায় নাম রাখবে না। খুব কম্পিটিশন ওখানে।'

'স্কটিশ কি আর আগের মতো আছে ?' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল মহীতোষকে, 'তার ওপর কো-এডুকেশন কলেজ—।'

'দূর মশাই, ও সব নিয়ে ভাববেন না। প্রেসিডেন্সিতেও মেয়েরা পড়ছে। পড়াশুনাই হল আসল কথা। স্কটিশের আর্টস ডিপার্টমেন্টটা ভাল।'

'আর্টস ?' মহীতোষ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'অনিমেষ কি আর্টসে ঢুকতে চায় ?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলল। তা ছাড়া সায়েন্স নিয়ে পড়লে ক্লাশ না করলে চলবে না। প্র্যাক্টিক্যালগুলো তো বাড়িতে বসে করা যাবে না।'

মুখ-চোখ শক্ত হয়ে গেল মহীতোষের, নীরবে মাথা নাড়লেন। সেটা লক্ষ করে দেবব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি অন্য কিছু ভাবছেন ?'

চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন মহীতোষ, 'ডাক্তাররা যদি বলে থাকেন ছয় মাসের মধ্যেও উঠতে পারবে না তা হলে আর এখানে রেখে লাভ কী! আর তার পরেও তো হাঁটাচলা সড়গড় হতে সময় লাগবে। আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই, সামনের বছর দেখা যাবে।'

'নিয়ে যাবেন মানে ?'হেসে ফেললেন দেবব্রতবাবু, 'আপনি তো এখনও ওকে চোখে দেখেননি, সামান্য নড়াচড়া ওর পক্ষে ক্ষতিকর আর আপনি সেই জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন ?' তারপর ব্যাপারটা ধরতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি চাইছেন না অনিমেষ আর্টসে ভরতি হোক ?'

মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন, 'না, ওর জীবন লক্ষ্যহীন হোক সেটা চাই না। ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তার হবে, আমারও তাই ইচ্ছে।'

কথাটা শুনে দেবব্রতবাবু হাসলেন, 'তাই বলুন। তা হলে অবশ্য এ বছরটা নষ্ট করতেই হবে। যাক, হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন। চারটের একটু আগেই বেরোব আমরা।'

মহীতোষ উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলেন, 'আমি বরং হোটেল থেকে ঘুরে আসি।'

'হোটেল ? আপনি হোটেলে থাকবেন নাকি ?'

'কত দিন থাকতে হবে জানি না তো, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তা ছাড়া প্যারাডাইস হোটেলটা কাছেই, আমাদের জলপাইগুড়ির হোটেল বলতে পারেন—এ সব নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

দেবব্রতবাবুর ঘোর আপত্তি মহীতোষ শুনলেন না। প্রয়োজনে পুত্রকে তিনি বন্ধুর কাছে সাময়িকভাবে থাকতে পাঠাতে পারেন কিন্তু নিজের থাকার কোনও কারণ পান না।

ক'দিনের যাওয়া আসায় দেবব্রতবাবু এর মধ্যেই হাসপাতালে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। এনক্যুয়ারি কাউন্টার থেকে এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে ওঁকে ডাকলেন, 'আপনি তো জেনারেল বেডের একশো আটত্রিশ নম্বরের কাছে আসেন ?'

দেবব্রতবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'কেমন আছে ও ?'

'খারাপ কিছু রিপোর্ট নেই। আপনার পেশেন্টের নাম অনিমেষ, তাই তো ?'

'হ্যাঁ। কী হয়েছে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ সকালে একজন আপনার পেশেন্টের নাম করে দুটো লাগেজ দিয়ে গেছে। ওকে দেখিয়ে তো কোনও লাভ নেই, আপনারা যদি চান তো নিয়ে যেতে পারেন।'

দেবব্রতবাবু অবাক হয়ে মহীতোষের দিকে তাকালেন। মহীতোষ এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি একটু দেখতে পারি ?'

দেবব্রতবাবু পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'ইনি পেশেন্টের বাবা।'

চিনতে পারলেন মহীতোষ। বেডিংটা তো বটেই, স্যুটকেসটাও সঙ্গে এনেছিল অনিমেষ। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কেউ হয়তো দিয়ে গেছে কিন্তু এত দিন বাদে চিনে চিনে এগুলো এখানে কী করে পৌঁছাল সেটাই বোধগম্য হচ্ছিল না ওঁদের। জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখার কোনও মানে হয় না। প্রথমত ওতে কী কী ছিল তাই মহীতোষ জানেন না আর যদি কিছু হারিয়ে থাকে তা কখনওই পাওয়া যাবে না। এগুলো কেউ দিয়ে গেছে তাই যথেষ্ট।

BanglaBook.org

চেয়ে বয়সে খুব একটা বড় নয় অথচ ওর সঙ্গে কথা বললে নিজেকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। অনিমেষ জোর করে ভাবনাটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চাইল। দেবব্রতবাবু বলেছিলেন যে স্কটিশচার্চে ওঁর এক বন্ধু নাকি অধ্যাপনা করেন। অনিমেষ সেখানে ভরতি হয়ে বাড়িতেই পড়াশুনা করতে পারে। ফার্স্ট ইয়ারে কাউকেই বেশি পড়তে হয় না। অ্যাটেন্ডেন্সের গড় ঠিক থাকলেই প্রমোশন পাওয়া যায়—তা সেটাও নাকি ম্যানেজ হয়ে যাবে। এটা শুনে অনিমেষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে কিন্তু যতক্ষণ ব্যবস্থাটা পাকা না হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। ফার্স্ট-ইয়ারটা শুয়ে শুয়েই কাটাতে হবে?

বিকেলবেলায় মহীতোষ এলেন। সঙ্গে দেবব্রতবাবু, আজ নীলা আসেনি। দূর থেকে বাবাকে দেখতে পেয়ে খানিকটা সঙ্কোচ আর কেন জানা নেই অপরাধবোধ এল অনিমেষের। মহীতোষ সোজা মানুষ, চা-বাগানের নির্জনতায় থেকে সরল কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অনিমেষ জানে বাবা তাকে ঘিরে অনেক আশা করেন। ওকে ডাক্তার হতে হবে, অনেক পসার হবে—প্রচুর টাকা আসবে, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে যে ফর্মুলা তার বাইরে তিনি ছেলেকে কিছুতেই দেখতে চান না। অথচ কলকাতায় সে পড়তে আসুক এ ব্যাপারে তাঁর কোথায় যেন দ্বিধা ছিল। হয়তো ভেবেছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে আই. এসসি. পাশ করে কলকাতায় পড়তে গেলে ওর আরও দায়িত্ববোধ এবং বয়স বাড়বে সুতরাং চিন্তার কিছু থাকবে না। সেই ছেলে কলকাতায় পৌঁছে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে খবর পেয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খবরটা এল লোকাল থানা থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর ছেলে সম্পর্কে জেরা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যেন অনিমেষ কলকাতায় খুব বড় ডাকাতি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। একটা কথা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না, একদম আনাড়ি ছেলে কলকাতায় গিয়ে কী করতে পারে যার জন্য পুলিশ গুলি করবে? কাগজে তিনি পোড়া ট্রাম-বাস আন্দোলনের ছবি দেখেছেন। মহীতোষের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল নিজের ছেলেকে তিনি কখনওই চিনতে পারেননি। ট্রেনে গেলে অনেক সময়। পড়ি কি মরি করে তেলিপাড়া থেকে যে বেসরকারি মালের প্লেন ছাড়ে তাতেই জায়গা করে নিলেন। অনিমেষের এই খবরটা জলপাইগুড়িতে সরিৎশেখরকে জানাবার সময় পেলেন না আর। শেষ দুপুরে দমদমে নেমে সোজা দেবব্রতবাবুর কাছে চলে এসেছেন তিনি। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার উত্তেজনা একটু টের পেলেন না মহীতোষ। দমদম থেকে হরেন মল্লিক লেনে আসতে যে কলকাতা পড়ল তা শান্ত, কোথাও কোনও বিক্ষোভ নেই। কল্পনাই করা যাচ্ছে না এখানে এসে অনিমেষ কী কারণে গুলি খেতে পারে। দেবব্রতবাবু বাড়িতে ছিলেন, দীর্ঘকাল বাদে দেখা হওয়া মাত্র মহীতোষ হাসপাতালে যেতে চাইলেন। কিন্তু তখন দুপুর, যেতে চাইলে সম্ভব নয়। দেবব্রতবাবু মহীতোষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন। এর কিছুটা অনিমেষের কাছে দেবব্রতবাবু জেনেছেন, কিছুটা পুলিশের সূত্রে, বাকিটা অনুমান।

অনিমেষ এখন মোটামুটি ভাল, জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই জানতে পেরে মহীতোষ কিছুটা শান্ত হলেন। সকালে পাওয়া উত্তেজনাটা হঠাৎ নিভে এলে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল। দেবব্রতবাবু ওঁকে বোঝালেন এখন কিছুই করার নেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা থাই-এর হাড়ে গুলি লেগে সেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছিল, অপারেশন হয়েছে, ডাক্তার বলছে মাস ছয়েক বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলে অনিমেষ হাঁটতে পারবে। দুর্ঘটনা তো ঘটেই কিন্তু মুশকিল হল সেটা ঘটবার আগে কিছুতেই জানা যায় না। মহীতোষ বললেন, 'আসলে আমার ভাগ্যটাই এই রকম। ওর মা চলে গেল একটা সামান্য দুর্ঘটনায়, কোনও কারণ ছিল না। ছেলেটা এতকাল দাদুর কাছে মানুষ হয়েছে, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্কুল ফাইনালে ও যখন ফার্স্ট ডিভিশন পেল আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পড়াশুনায় ভাল কিন্তু বড্ড জেদি আর অবাধ্য মনে হত। তা রেজাল্ট ভাল হতে ওকে ঘিরে একগাদা কল্পনা করে ফেললাম। অথচ দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আবার দুর্ঘটনা।'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'আপনার ছেলেকে অবাধ্য বলে মনে হয় না কিন্তু।'

মহীতোষ হাসলেন, 'ওটা ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। ও যেটা ভাল মনে করে সেটা করবেই। এককালে কংগ্রেসের কাজকর্ম করত আমার অপছন্দ সত্ত্বেও।'

দেবব্রতবাবু অবাক হলেন, 'অনিমেষ কংগ্রেস করত?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে সেরকমই শুনেছিলাম, নেহাতই কাঁচা ব্যাপার, চাপল্য তো ওই বয়সেই আসে।' মহীতোষ নিজেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

'ঠিক আছে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, ওর কলেজে ভরতির সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্কটিশে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে রাখছি, সুস্থ হলে ক্লাশ করবে।'

BanglaBook.org

'সে কী! কালই তো দেখে গেলাম।' হতভম্ব দেবব্রতবাবুর মুখটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'আজ সকালে টের পাওয়া গেল।'

এ বার মহীতোষ কথা বললেন, 'টের পাওয়া গেল মানে? একটা লোক কখন মরে গেছে তা কেউ খবর রাখল না? অদ্ভুত ব্যাপার তো! তুই দেখলি?' এই প্রথম ছেলেকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন মহীতোষ।

অনিমেষ বাবার দিকে তাকাল। খুব বিচলিত দেখাচ্ছে ওঁকে। বাবাকে দেখার পরই যে সঙ্কোচটা এসেছিল এখন সেটা অনেক কম। বরং বাবার অদ্ভুত ব্যবহারে সে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ওর আহত হবার পর যিনি জলপাইগুড়ি থেকে ছুটে এলেন তিনি এসে অবধি একটাও কথা বলেননি, কী করে ঘটনাটা ঘটল জিজ্ঞাসাও করেননি। গম্ভীর মুখে অনিমেষ মহীতোষের প্রশ্নটার উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

মহীতোষ বললেন, 'খুব খারাপ ব্যাপার। আচ্ছা, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা যাবে এখন?'

দেবব্রতবাবু বললেন, 'চলুন দেখি। তবে আপনি যা চাইছেন তা হবে না।'

অন্যমনস্ক মহীতোষ বললেন, 'মানে?'

'ওই যে তখন বলছিলেন না, ছেলেকে নিয়ে ফিরে যাবেন, সেটা অসম্ভব। দেখেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। তার ওপর আপনাদের বিখ্যাত মণিহারীঘাট পার হয়ে যাওয়া—কিছু হয়ে গেলে সারাজীবন আফশোষ করতে হবে।'

'কিন্তু এখানে রাখা মানে আপনার ওপর অত্যাচার করা। তা ছাড়া, এ বছর যখন নষ্ট হচ্ছেই, চলুন, আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি— অনিমেষকে কিছু না বলে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

কথাগুলো শোনামাত্র অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। মহীতোষ এসেছেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? এটা ঠিক, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। কিন্তু জলপাইগুড়িতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই এখানকার কলেজে আর ভরতি হওয়া যাবে না। মহীতোষ তো স্পষ্ট বললেন এ বছরটা নষ্ট হচ্ছে। তার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে সে এখন কলেজে ভর্তি হচ্ছে না। একটা বছর চুপচাপ বৃথায় চলে যাবে এবং উনি সেটা মেনে নিয়েছেন। অনিমেষের মনে হচ্ছিল সে যদি একবার এখান থেকে জলপাইগুড়ি ফিরে যায় তা হলে আর কখনও কলকাতার কলেজে পড়া হবে না। কিন্তু সে এখন তো কিছুই করতে পারে না। যার বিছানা থেকে এক ইঞ্চি উঠে বসার সামর্থ্য নেই তার কথা কেউ শুনবে কেন? যদি দাদু থাকতেন কাছে, অনিমেষ সরিৎশেখরের অভাব ভীষণভাবে অনুভব করল। দাদুর কথায় বাবা না বলতে পারতেন না আর দাদুকে রাজি করানো নিজেকে রাজি করানোর মতোই সহজ। এখনও সে ভালভাবে কলকাতার রাস্তায় হাঁটেনি, কলকাতার কিছুই দেখেনি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ট্রামের চাকার ঘরঘর শব্দ ছাড়া কলকাতা ওর কাছে অচেনা, তবু অনিমেষের মনে হচ্ছিল, কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে তার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

অনিমেষ চোখ বন্ধ করে ছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল কেউ যেন খাটের পাশের টুলটায় এসে বসেছে। সে চোখ খুলল না। খানিক বাদে সে মহীতোষের গলা শুনতে পেল, গলা অদ্ভুত বিষণ্ণ এবং কেমন ভাঙা ভাঙা। এরকম গলায় বাবাকে কখনও কথা বলতে শোনেনি সে। মহীতোষ বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, খোকা?'

চোখ খুলল না অনিমেষ। এতক্ষণ কোথায় ছিল জানা নেই, অভিমানের সুতোটা টানটান হয়ে যেতে লাগল। ওর মনে হল, চোখ খুললেই সে কেঁদে ফেলবে। কিছুক্ষণ কোনও কথা নেই, তারপর খুব আলতোভাবে পায়ের ওপর স্পর্শ পেল অনিমেষ। ওর অপারেশনের জায়গায় হাত রেখে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, খুব ব্যথা করছে রে?'

সামান্য স্পর্শ কিন্তু অনিমেষের মনে হল, কেউ করাত দিয়ে ওর পা কাটছে। অন্য সময় হলে আর্তনাদ করত কিন্তু এখন শারীরিক যন্ত্রণাটাকে দাঁতে চাপল সে। প্রাণপণে, স্বাভাবিক গলায় সে বলার চেষ্টা করল, 'না বাবা।'

চার

ব্যাপারটা যে এত দ্রুত চাউর হয়ে যাবে কল্পনা করতে পারেনি অনিমেষ। পরদিন সকালে যখন আকাশ সাজানো রোদ উঠল, ত্রিদিবের সঙ্গে ডাইনিং রুমে ঢুকতেই ও বুঝতে পারল হোস্টেলের বাঙালি বাসিন্দাদের চোখের দৃষ্টি পালটে গেছে। প্রথমটায় একটু অস্পষ্টতা ছিল, ছেলেরা খেতে খেতে ওর দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এবং সেটা ওকে কেন্দ্র করেই।

BanglaBook.org

অনিমেষ ত্রিদিবকে কারণটা জিজ্ঞাসা করল। এরা বেশির ভাগই কলেজের ছাত্র, ওদের চেয়ে জুনিয়ার, একসঙ্গে মেশার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই রকম আচরণও ওদের করতে দেখা যায়নি এত দিন। ত্রিদিব কিন্তু আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'কী ব্যাপার, সামথিং গোলমাল মনে হচ্ছে ?'

ওদের মধ্যে যে ছেলেটি সব চেয়ে সপ্রতিভ সে খাওয়া থামিয়ে হেসে জবাব দিল, 'না, না, গোলমাল হবে কেন ? আমরা অনিমেষদার সম্পর্কে একটা খবর শুনেছি তাই আলোচনা করছিলাম।'

'কী খবর ?' ত্রিদিব মজা করে জিজ্ঞাসা করল।

'উনি খুব অ্যাকটিভ কমিউনিস্ট অথচ এখানে এমন ভাবে থাকেন কেউ তা টের পায় না।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, তারপর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী ভেবে চুপ করে গেল। ওর মনে হল ফালতু কথা বলে কোনও লাভ নেই। যে কেউ ইচ্ছেমতন ধারণা তৈরি করে নিতে পারে, জনে জনে গিয়ে সেই ধারণা ভাঙিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কী ঘটনা থেকে এদের তার সম্পর্কে এমত ধারণা হল সেটা জানতে আগ্রহ হচ্ছিল। সেটা ত্রিদিবই প্রশ্ন করল, 'তোমরা এই খবরটা কী করে পেলে ?'

'বাঃ, খাদ্য আন্দোলনের সময় অনিমেষদা পুলিশের গুলিতে হেভি ইনজ্যুরড্ হয়েছিলেন শুনলাম, সেটা অ্যাকটিভ না হলে হয় ?' ছেলেটি কথা থামিয়ে একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু অনিমেষদা, আপনি কলেজ ইউনিয়নে জয়েন করেননি কেন ? আমরা শুনলাম আপনি এস. এফ-এর মেম্বার পর্যন্ত ছিলেন না!'

খেতে ভাল লাগছিল না অনিমেষের। ত্রিদিব খুব দ্রুত খায়, ওর খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা খুব ভুল খবর শুনেছ। আমার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কোনও সম্পর্ক নেই।'

বেসিনে হাত ধুতে ধুতে কানে এল ওদের একজন চাপা গলায় বলছে, 'কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারশিপ পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আর যারা রিয়েল মেম্বার তারা কক্ষণও সেটা প্রকাশ করে না।'

ব্যাপারটা যদি এ পর্যন্ত থেমে থাকত তবে সেটা এরকম হত, ইউনিভার্সিটিতে খবর গড়িয়ে গড়িয়ে এল। সেই যে মাসে রেজাল্ট বেরিয়েছে আর এখন জুলাই-এর মাঝামাঝি, সবে ক্লাশ শুরু হয়েছে, কেউ কাউকে চেনে না। এমনকী নবীন ছাত্রদের বরণ-করা ব্যাপারটা এখনও হয়ে ওঠেনি। স্কটিশের যে ব্যাচটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে অনিমেষ ওদের সঙ্গেই সময় কাটাত। ওদের এই ব্যাচের সবাই খুব শান্তশিষ্ট, পড়াশুনোর মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। বি-এ অনার্সে যে ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল সে ওদের ব্যাচেরই। দু'জন খুব সিরিয়াসলি সাহিত্য করার কথা ভাবে। এর মধ্যেই বিদেশি সাহিত্যের অনেক খবর ওরা জেনে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে আসার পর বিদেশি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলার ঝোঁক ওদের আরও বেড়েছে।

স্কটিশের হোস্টেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করতে কেউ হেঁটে আসে না। পথটা এমন দূরত্বের নয় যে হাঁটা অসম্ভব কিন্তু কলকাতায় চোখের সামনে এত যানবাহন যে হাঁটার প্রয়োজন পড়ে না। অনিমেষ একটা মান্থলি করিয়ে নিয়েছে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামের। সেটায় সেই ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত সারাদিন ধরে ঘোরা যায় অথচ পয়সা সামান্যই লাগে। সেদিন ত্রিদিব একটা কথা বলল। জিনিসপত্রের দাম এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। একটা কাগজ লিখেছিল যে মাথাপিছু মানুষের প্রতিদিনের রোজগার নাকি কুড়ি পয়সা। কুড়ি পয়সায় একটা মানুষ কী করে বেঁচে থাকতে পারে ? ত্রিদিব বলেছিল তবু মানুষ বেঁচে থাকে এবং সেটা মানুষ বলেই সম্ভব। ভারতবর্ষের কোথাও যখন মানুষ এ বিষয় নিয়ে হইচই করেনি, জিনিসপত্রের দাম কমানো নিয়ে আন্দোলন হয়নি তখন কলকাতায় একদিন দু'দিনের জন্য হলেও বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল। ত্রিদিবের কাছে সেটাই অস্বাভাবিক লাগে। ও বলেছিল, 'এখানে দশ পয়সা দিলে এক ভাঁড় চা পাওয়া যায়, ট্রামে মাইলখানেক স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায়, বারো আনা পয়সায় একটা মানুষ ডাল ভাত তরকারি খেতে পারে। এই ব্যাপারটা পশ্চিমবাংলার বাইরে কোথাও সম্ভব নয়। দিল্লিতে বসে এটা স্বপ্নকুসুম। তাই এখানে এত মানুষের ভিড়, সবাই কম পয়সায় থাকবার জন্য কলকাতায় ছুটে আসছে। অথচ এখানেই খাদ্য আন্দোলন হয়, এক পয়সা ভাড়া বাড়লে ট্রাম পোড়ে কেন ? তার মানে কি এই যে পশ্চিমবাংলার মানুষ খুব সচেতন, তাদের কেউ ভুলিয়ে রাখতে পারে না ? অনিমেষ এই জায়গায় ত্রিদিবের সঙ্গে একমত নয়। এখানে যত তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলে ওঠে তত তাড়াতাড়ি তা নিভে যায়। নিভে যাওয়ার পর মনেই হয় না কখনও আগুন জ্বলেছিল। আর এই আগুন জ্বলবারও একটা মজার দিক আছে। বেশির ভাগ মানুষই শীতে হাত পা সেঁকার মতো দূরে থেকে নিজেদের গরম

রাখতে চায়, মুষ্টিমেয় যে ক'জন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আচরণ নাটক দেখার চোখ নিয়ে দেখে। বেশির ভাগ বাঙালির চরিত্রই এই, অবাঙালিরা যারা এই শহর কলকাতায় প্রায় আধাআধি, তাদের সঙ্গে যেন এই সব আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই, দেখলে মনে হয় তারা অন্য পৃথিবীতে বাস করে। কলেজে পড়ার সময় যে দু'-চারটে ছোটখাটো আন্দোলন অনিমেষ দেখেছে সেগুলোর চেহারা মোটামুটি একই। একটা ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ, মিছিল করে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল, সেখানে কিছুক্ষণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা চলল, ব্যাস, সব কর্তব্য শেষ। কিংবা খুব জোরদার কিছু ঘটলে একদিনের জন্য ধর্মঘট। এই ব্যাপারটা অনিমেষের মাথায় ঢোকে না, ধর্মঘট করলে কার কী লাভ হবে! নিজের নাক কেটে কি অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা যায়? আমি কোনও কাজ করছি না তোমার আচরণের প্রতিবাদে—যারা অন্যায় করে, এত সহজে তারা আজকাল ভয় পায় না এটাই বোধহয় ধর্মঘটি নেতারা ভুলে গেছেন। নাকি আসলে কিছু করার ক্ষমতা নেই বলেই ধর্মঘটের মুখোশ পরে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে চান। ক্রমশ এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে সাধারণ মানুষ কখনওই কোনও আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চায় না। অথচ আন্দোলন বলে যেটা হয় সেটা সাধারণ মানুষের জন্যই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মান্থলি টিকিট নিয়ে যাওয়া-আসার পথে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে অনিমেষ। প্রথম শ্রেণীতে এক তিল জায়গা না থাকলেও ভদ্র বাঙালিরা কখনওই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে চান না। সেখানে কিছু অবাঙালি এবং ওই কুড়ি পয়সা-আয়মার্কা মানুষের ভিড়। অথচ দুটো কামরা একই সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে তো এই বিচার আরও প্রবল। অনিমেষ কোনও সুন্দরী মহিলাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে দেখেনি। চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে এ দুটো শ্রেণীর মানুষেরাই সাধারণ—জনসাধারণ।

জলপাইগুড়িতে যে সব চিন্তা-ভাবনা ওর মাথায় ছটফট করত সেগুলো এই চার বছরে অন্য চেহারা নিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে দিন পুলিশের ছোড়া বুলেটটা তার একদিক দিয়ে উপকারই করেছে। এই যে অত দিন বিছানায় শুয়ে থাকা, শরীর কাহিল হওয়ায় সতর্ক হয়ে চলাফেরা—এগুলো অনেক উদ্দামতাকে সংযত করতে সাহায্য করছে। না হলে যে উদ্দীপনা প্রথমবার কলকাতায় আসবার সময় বুকের মধ্যে আঁচড় কাটত সেটা তাকে এত দিনে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে। খোলা চোখেও যে অনেক সময় দৃষ্টি থাকে না—সেটা সেরকম সময় ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বাড়িটায় ওদের ক্লাশ শুরু হয়েছে। বইপত্র এখনও কেনা হয়নি। মহীতোষ এখনও টাকা পাঠাননি। রেজাল্ট বের হবার পর যখন সে জলপাইগুড়ি থেকে এ বার এল তখন ভরতির অতিরিক্ত টাকা মহীতোষ দিতে পারেননি। এম এ ক্লাশে কী রকম বই কিনতে হয় ওঁরা কেউ জানেন না, অনিমেষও বলতে পারেনি। রেজাল্ট বের হবার পর মহীতোষ একটু পালটে গেছেন। তাঁর এখন মনে হচ্ছে অনিমেষ যদি ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে এম এ পাশ করতে পারে তা হলে কোনও কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে যাবে। যদিও মাইনে কম তবু চাকরিটায় সম্মান আছে। এ সব ব্যাপারে দেবব্রতবাবু তাঁকে হালফিল খবর চিঠিতে জানিয়ে থাকেন।

দেবব্রতবাবুর বাড়িতে অনেক দিন যাওয়া হয়নি। মনে পড়ে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে প্রায় মাস তিনেক ওঁর বাড়িতে থাকতে হয়েছিল অনিমেষকে। একটুও কষ্ট হয়নি। দেবব্রতবাবু ব্যবসা করেন কিন্তু কী ধরনের ব্যবসা তা ও জানে না। দিন-রাতের খুব কম সময়ই ওঁকে বাইরে যেতে দেখেছে সে সময়। কিন্তু বাড়িতে সচ্ছলতা সবখানে, ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হত। নীলা কলেজে পড়ছে। কলেজ মানে সকালে সেজেগুজে যেত আর বারোটা নাগাদ খুব পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসত। সারাটা দুপুর নীলার সঙ্গে গল্প করে কেটে যেত। গল্প মানে পৃথিবীর কোনও বিষয় যা থেকে বাদ নয়। ক'দিনের মধ্যে তুই-তোকারিতে সম্পর্কটা নামিয়ে এনেছিল নীলা। অত বড় একটা মেয়েকে তুই বলতে লজ্জা করত কিন্তু মেয়েটার ব্যবহার এত সহজ যে লজ্জা প্রকাশ করাটাই একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিল নীলার মতন মেয়ে জলপাইগুড়িতে সে কখনও দেখেনি। সীতা, উর্বশী কিংবা রম্ভার থেকে নীলা যেন হাজার মাইল আলাদা জাতের মেয়ে। মন্টু বলত যৌবন এসে গেলে মেয়ে-পুরুষে বন্ধুত্ব হয় না। অনিমেষের মনে হয়েছিল মন্টু নীলার মতো মেয়েকে দেখেনি। কোনও রকম নকল লজ্জা বা ঢং ছাড়া একটা মেয়ে যখন কথা বলতে পারে তখন তাকে বন্ধু না ভেবে পারা যায়! ওর কলেজে যাওয়া-আসার পথে ছেলেরা দাঁড়িয়ে থেকে যে সব মন্তব্য ছুড়ে মারে সেগুলো অকপটে বলতে পারে নীলা। গুডি ছেলেদের দেখলে কী ভীষণ

ক্যাবলা মনে হয়, আবার অতিরিক্ত স্মার্টদের দেখলে গা জ্বলে যায়—অনিমেষের জানা হয়ে গেছে। ওদের বাড়িতে থাকার শেষের দিকে ওর সহপাঠিনীর এক দাদাকে ভাল লাগতে শুরু হয়েছিল—অনিমেষকে সেটা জানাতে দ্বিধা করেনি নীলা। একসঙ্গে একই বাড়িতে থেকে এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনও রকম আচরণ করতে দেখেনি ওকে অথচ হাসপাতালে প্রথম আলাপের দিন অনিমেষ নীলার সম্পর্কে একটা মোটা দাগের ধারণা করে ফেলেছিল।

পরের বছর হোস্টেলে আসার পর দেবব্রতবাবুর ওখানে সে গিয়েছে মাঝে মাঝে। দেবব্রতবাবুও খোঁজখবর নিতে এসে থাকেন কিন্তু নীলার সঙ্গে সে আড্ডাটা আর জমেনি। একটা বছর নষ্ট হওয়ায় নীলা ওর থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বি এ পড়ার সময় একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল যার পর অনিমেষ আর দেবব্রতবাবুর বাড়িতে যায়নি। যায়নি মানে সম্পর্ক চলে যাওয়া নয়, যেতে ঠিক ইচ্ছে করে না। ব্যাপারটা ওকে এত চমকে দিয়েছিল যে এখনও ভাবলে কূলকিনারা পায় না। দেবব্রতবাবু মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন তাঁর বাড়িতে সে যাচ্ছে না বলে। কারণটা ওঁকে বলা যায় না তাই জানাতে পারেনি অনিমেষ। যাকে বলা যেত সে কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেনি। নীলা কখনওই ওর হোস্টেলে আসেনি। যখন বাড়িতে যেত তখন হেসে গল্প করত, খবরাখবর নিত, ব্যস। এক এক সময় অনিমেষের মনে হয়েছে সরাসরি গিয়ে নীলাকে ব্যাপারটা বলে, ওর কী বক্তব্য সেটা জেনে নেয়। নীলা যেমন সহজ মেয়ে নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলবে। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা করাটাই যে অস্বস্তির।

সেই বিকেলটা ছিল শীতের। সন্ধেটা আসবার আগেই কলকাতা ধোঁয়াটে হয়ে যায়। নীলাদের বাড়িতে এসেছিল অনিমেষ। এসে শুনল নীলা দেবব্রতবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে। ওর আসার কোনও কথা নয়, ওরা জানেও না। মাসিমা খুব আদর করে ওকে খাওয়ালেন, ভদ্রমহিলাকে কখনও গম্ভীর মুখে দেখেনি অনিমেষ। ওদের এই বাড়িটা সুখী সংসারের একটা দারুণ উদাহরণ। মহীতোষ তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছেন এটা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ওদের ফিরতে দেরি হবে বলে অনিমেষ চলে আসছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে হাঁটছে এমন সময় কেউ একজন ওর সামনে এসে দাঁড়াল। অনিমেষ দেখল ছেলেটি ওর চেয়ে সামান্য বড় হবে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, এই শীতেও কোনও গরম জামা গায়ে নেই। অনিমেষ থমকে দাঁড়াতেই ছেলেটি গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল, কোনও রকমে বলল, 'আপনি কে?'

'আমি যে-ই হই তোমার তাতে কী দরকার! কথা আছে শুনতে হবে।'

'বাঃ, আপনাকে আমি চিনি না—'

অনিমেষকে থামিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও পাশে একটা পার্ক আছে, সেখানে বসব।' কথা বলার সময় ছেলেটি বারংবার চার পাশে তাকাচ্ছিল। ওর চোখ মুখে এমন একটা উত্তেজনা ছড়ানো যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অনিমেষের মনে হল ছেলেটি তো অন্য কারও সঙ্গে তাকে গুলিয়েও ফেলতে পারে। এই আবছা অন্ধকারে সেটা অসম্ভব নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'তুমি তো অনিমেষ, এসো, আমি এগোচ্ছি।' ছেলেটি সামনে হাঁটছে, ইতস্তত করেও অনিমেষ ওকে অনুসরণ করল। ঠিক ভয় নয়, অনিমেষের মনে হচ্ছিল এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে যার ফলে ছেলেটির তাকে খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেটা এমন অস্পষ্ট যে ওটা জানবার আগ্রহ ওকে পার্কে টেনে আনল। সে পার্কের ভেতর ঢুকে দেখল একটা খালি বেঞ্চিতে ছেলেটি বসে আছে। ছোটখাটো পার্ক কিন্তু মানুষের ভিড় কম। অনিমেষকে একটু পা টেনে হাঁটতে দেখে ছেলেটি বলল, 'তোমার পায়ে কি এখনও ব্যথা আছে?' অবাক হয়ে তাকাল অনিমেষ। ঘাড় নেড়ে না বলতে বলতে ভাবল এই ছেলেটি ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। কী ব্যাপার!

বেঞ্চিতে বসলে ছেলেটি এ বার কেমন মিইয়ে গেল। যে উত্তেজনায় অনিমেষকে এখানে ডেকে এনেছে সেটা কমে আসতেই ও কথা খুঁজে পাচ্ছে না এটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। অনিমেষ বলল, 'কী কথা, বলুন।'

ছেলেটি হঠাৎ কাতর গলায় বলে উঠল, 'তুমি আমাকে চেনো না, আমার নাম শ্যামল। আমি নীলাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি।'

এরকম কথা শুনবে অনুমান করতে পারেনি অনিমেষ। ও অবাক হয়ে ছেলেটিকে দেখতে লাগল। এবং এতক্ষণে ওর খেয়াল হল প্রথম থেকে শ্যামল ওকে সমানে তুমি তুমি বলে যাচ্ছে অথচ

BanglaBook.org

ওকে খুব বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছে না তার। নীলাকে ভালবাসে বলেই কি অনিমেষকে তুমি বলার অধিকার পেয়ে যাবে! বিরক্ত হয়ে সে অন্য দিকে তাকাল। ছেলেটি সেই রকম গলায় বলল, 'আমি তোমার কাছে, কী বলব, আমার মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব।'

কোনও রকমে অনিমেষ বলতে পারল, 'এ সব কথা আমাকে বলছেন কেন ?'

শ্যামল বলল, 'কারণ তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো!'

'আমি ?' হতভম্ব হয়ে গেল অনিমেষ।

'তুমি এমন ভাব করছ যেন কিছুই বুঝতে পারছ না!' আড়চোখে তাকাল শ্যামল।

'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হয় তুমি মিথ্যুক নয়—, না, নীলা কখনওই মিথ্যে কথা বলতে পারে না। শোনো, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই। নীলাকে আমি ভালবাসি। আমি জানতাম ও আমাকে ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু ইদানীং ওর ব্যবহার একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল যে আমাকে নাকি ও ভালবাসতে পারছে না। আমি জানি এর কারণ তুমি। তুমি ওদের বাড়িতে অত দিন ছিলে, একসঙ্গে থাকলে অনেক সময় মমতা এসে যায়। নীলা তোমার জন্য আমাকে রিফ্যুজ করছে।' বড় বড় চোখে তাকাল শ্যামল।

হেসে ফেলল অনিমেষ। সে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কথা আপনি কোত্থেকে জানলেন ? নীলা আপনাকে বলেছে ?'

ঘাড় নাড়ল শ্যামল, 'নীলা বলবে কেন ? আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ছাড়া আর কোনও ছেলে ও বাড়িতে যায় না।'

হাসছিল অনিমেষ, 'ব্যস, তা থেকেই আপনি ধারণা করে ফেললেন ?'

শ্যামল রেগে গেল, 'ইয়ার্কি মারার সময় এটা নয়। নীলা আমাকে যেরকম ভালবাসত তা থেকে সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ অন্য কেউ তার মন ভুলিয়েছে। মেয়েরা রুগ্ণ মানুষের ওপর চট করে মায়া দেখিয়ে বসে।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি ভুল করছেন। নীলার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কেন নীলা এরকম করেছে সেটা তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

'আমাকে ও এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। নীলা তোমার গল্প আমার কাছে যখনই করত তখন এমন ভাব দেখাত যে তুমি একজন হিরো। পুলিশের গুলি খেয়েও বেঁচে গেছে। নীলা জানে না আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারি।'

অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না নীলা কেন এরকম ব্যবহার শ্যামলের সঙ্গে করছে। বোধ হয় শ্যামল হল সেই ছেলে যার কথা নীলা ওকে বলেছিল। সহপাঠিনীর দাদা। এত চট করে ভালবাসা চলে যায় কী করে! ও বন্ধুর মতো শ্যামলকে বলল, 'নীলা যখন চাইছে না তখন ব্যাপারটা ভুলে যান। জোর করে কারও ভালবাসা আদায় করা যায় না আর আদায় করাটা পাওয়া নয়।'

ফুঁসে উঠল শ্যামল, 'ভুলে যাব ? অসম্ভব। আমি তার আগে নীলাকে মেরে ফেলব।'

এ বার সত্যি ঘাবড়ে গেল অনিমেষ। শ্যামলের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে রকম কিছু করা ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?' শ্যামল খুব গম্ভীর গলায় এ বার বলল, 'তুমি যদি আর নীলার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখো তা হলে নিশ্চয়ই নীলার মন আবার আমার দিকে ফিরে আসবে। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। তুমি তো বলছ তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, তা হলে যোগাযোগ না থাকলে কোনও ক্ষতি হবে না।'

এই প্রথম ছেলেটির জন্য কেমন মমতা অনুভব করল অনিমেষ। ভালবাসতে মানুষ কি অন্ধ হয়ে যায়! কোনও যুক্তি কি আর মাথায় কাজ করে না ? নীলা যদি ওকে এড়িয়ে যেতে চায় তা হলে শ্যামল কত মানুষের কাছে গিয়ে এই ধরনের অনুরোধ করবে ? কিন্তু নীলার মতো সহজ মেয়ে এইরকম ব্যবহার করবেই বা কেন ? যদিও নীলা শ্যামলকে বলেনি যে সে অনিমেষকেই ভালবাসে—ব্যাপারটা চিন্তা করতেই সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজে নীলার কাছে আসব না।'

শ্যামল খুব খুশি হল, ওর মুখে হাসি ফুটল।

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও মন পালটাল। শ্যামলকে পার্কের বেঞ্চিতে রেখে সে হনহন করে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। দ্রুত হাঁটতে তখনও অসুবিধে হত কিন্তু সে গ্রাহ্য করল না।

BanglaBook.org

কথা রেখেছিল অনিমেষ। যদিও মাঝে মাঝে মনে হত শ্যামলের ওই ছেলেমানুষি হৃদয়াবেগকে ও অহেতুক প্রশ্রয় দিচ্ছে তবু নীলাদের বাড়িতে যেতে কেমন আড়ষ্টতা অনুভব করত এর পর থেকে। এ সব কথা দেবব্রতবাবুকে বলা যায় না। নীলা-শ্যামলের সম্পর্কটা এখন কী রকম সে খবর আর পায়নি সে। এবং একটা অদ্ভুত ব্যাপার, নীলা তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্কটিশ তো মোটে দশ মিনিটের রাস্তা।

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে কী একটা গোলমাল হয়েছে, ট্রামগুলো লাইনবন্দি হয়ে পড়ায় অনিমেষ নেমে পড়ল। আজ প্রথম পিরিয়ড বারোটায়। সময় আছে হাতে। বই-এর দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যেতে ওর খুব মজা লাগে। সার দেওয়া দোকানগুলোতে কত রকমের বই অথচ দু' দণ্ড সে দিকে তাকাবে তার জো নেই। দরজায় দাঁড়ানো কর্মচারীরা চিৎকার করে ডেকে দোকানে ঢোকাবেই। যারা ওই ফুটপাতে হাঁটবে তারা সম্ভাব্য খরিদ্দার বলে বোধ হয় ওরা ধারণা করে। এক-এক দিন তো প্রায় হাত ধরে টানাটানি চলে ভেতরে নিয়ে যেতে, তা বই কেনার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। ওদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বই দেখার মধ্যে লুকোচুরি খেলার মতো একটা মজা আছে। হ্যারিসন রোড পার হয়ে এ পারে আসতেই অনিমেষ চমকে উঠল। প্রায় পাঁচ বছর পর দেখল, চেহারার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু চিনতে একটুও অসুবিধে হয় না। সেই গেরুয়া পাঞ্জাবিটি আর পাজামা, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, হাতে সিগারেট নিয়ে কিছু ভাবছে। অনিমেষ সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'চিনতে পারছেন ?' আচমকা প্রশ্নটায় মুখে ভাঁজ পড়ল। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য, তারপরই, অনিমেষের হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি, 'আরে তুমি!'

অনিমেষ বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত চিনতে পারলেন!'

সুবাস সেন বলল, 'কী আশ্চর্য, চিনব না কেন ? তবে তুমি খুব বড় হয়ে গেছ। মুখটা দাড়িগোঁফে ঢেকে ফেললেও চিনতে অসুবিধে হবে কেন ? কেমন আছ ?'

'ভাল।' অনিমেষ উত্তরটা দিতে গিয়ে টের পেল এত দিন বাদে সুবাস সেনকে দেখতে পেয়ে ওর খুব ভাল লাগছে।

'তোমার পা ? এখন ঠিক হয়ে গেছে তো ?' সুবাস পায়ের দিকে তাকাতেই অনিমেষ বলল, 'প্রায় ঠিক, কোনও অসুবিধে হয় না। তবে দৌড়ালে লাগে।'

সুবাস হাসল, 'দৌড়বার কী দরকার। হেঁটে হেঁটে যদি পৌঁছে যাওয়া যায় সেটাই তো ভাল। তারপর বলো, আছ কোথায়, কী করছ ?'

একটা সময় ওর সুবাসের ওপর অভিমান হত, এই কয় বছরে কলকাতা শহরে যখনি সে হেঁটেছে তখনই মনে হয়েছে, হয়তো একদিন সুবাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও দিন সেরকম কিছু হয়নি। হাসপাতালে এক দিন এসে সেই যে সুবাস চলে গেল আর দেখা পায়নি তার। সুবাস বলেছিল, আবার তাকে দেখতে আসবে কিন্তু কথা রাখেনি। ইচ্ছে করলে কি সুবাস তার ঠিকানা হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করে দেবব্রতবাবুর বাড়িতে যেতে পারত না! এ সব চিন্তা যত পুরনো হয়েছে তত মনে হয়েছে, তার কাছে সুবাসের আসবার কী কারণ থাকতে পারে ? সে সুবাসদের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, একদিন যে হাসপাতালে এসে দেখা করে জিনিসপত্র দিয়ে গেছে তাই ঢের। কিন্তু সুবাস যে কথা দিয়েছিল আসবে— কথা দিয়ে না এলে বড় কষ্ট হয়। এখন এই মুহূর্তে সেই সব অভিমানগুলো যখন ওর মনে দুলতে শুরু করেছে, সুবাস বলল, 'নাও, এত দিন পর দেখা হল, একটা সিগারেট খাও।' চারমিনারের প্যাকেটটা সামনে এগিয়ে ধরতেই অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না সিগারেট সে খায় না তা নয়, কিন্তু ওই যে অত দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হল তারপর থেকে খাওয়ার ঝোঁকটাই একদম চলে গেছে। আর এখন মহীতোষ যে টাকা পাঠান তাতে সিগারেট খেতে গেলে খুব অসুবিধে হবে।

অনিমেষ এখন কী করছে তা জেনেটেনে নিয়ে সুবাস বলল, 'বাঃ, তুমি দেখছি বেশ গুডি বয়। যাক, তোমাদের ক্লাশ শুরু হয়েছে, ওখানে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল?'

'আপনাদের ছেলে মানে ?' অনিমেষ অবাক হল।

সুবাস ওর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি স্কটিশে ছাত্র ফেডারেশন করতে না ? অবশ্য করলে তো আমি জানতামই।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। ইউনিয়নের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক ছিল না।'

সুবাস এ বার অবাক হল, 'সে কী! আমার যদ্দূর মনে পড়ছে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তুমি বামপন্থী কথাবার্তা বলেছিলে।'

BanglaBook.org

অনিমেষ বুঝতে পারছিল না কী করে ব্যাপারটা বোঝাবে। সে যদি চটপট বলে বসে যে, আন্দোলনের ব্যাপারটা ওর কাছে স্পষ্ট নয় বলে সে সক্রিয় হতে পারেনি অথবা স্কটিশের ছাত্র ফেডারেশন কতগুলো বিলাসী ছেলের সময় কাটানোর একটা মাধ্যম বলে তার মনে হয়েছিল, তা হলে সুবাসদা সে কথা নিশ্চয়ই খুব সহজে মেনে নেবে না। ওর ভয় হচ্ছিল, এ কথা শুনলে বরং সুবাসদা ওকে ভুল বুঝতে পারে।

অনিমেষ বলল, 'আসলে আমার এই পা নিয়ে এত বিব্রত ছিলাম যে, কিছু করতে সাহস পেতাম না।' কথাটা শেষ করেই মনে হল উত্তরটায় ফাঁকি থেকে গেল। সে আবার বলল, 'তা ছাড়া, কোনও ব্যাপার অস্পষ্ট থাকলে আমার মন তার মধ্যে যেতে সায় দেয় না।'

'কিন্তু অস্পষ্টতা কীসের জন্য এ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেছ কখনও?'

সুবাস ওর কাঁধে হাত রাখল। অনিমেষ উত্তর দিল, 'না, আসলে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা নিজেই ভেবে ঠিক করে নেওয়া যায়।'

সুবাসের হাতের আঙুল ওর কাঁধে শক্ত হল, 'না। আলোচনাই পথ পরিষ্কার করে। ঠিক আছে, এক দিন তুমি আর আমি বসব। একা একা লড়াই করা যায় না।'

অনিমেষ বলল, 'মাঝে মাঝে আপনার কথা ভাবতাম কিন্তু ঠিকানা জানি না যে দেখা পাব। ক'টা বাজে?'

সুবাস ঘড়ি দেখল, বারোটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। সে বলল, 'তুমি তো ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছ, চলো, তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিই।'

অনিমেষ অস্বস্তির গলায় বলল, 'কিন্তু আমার যে বারোটায় ক্লাশ।'

সুবাস বলল, 'কী সাবজেক্ট?'

অনিমেষ বলল, "বৈষ্ণব সাহিত্য।'

সুবাস হাসল, 'ওটা জেনে তোমার কী কাজে লাগবে? পরীক্ষার আগে তিন দিন চোখ বোলালেই নম্বর পেয়ে যাবে। বিমানের সঙ্গে আলাপ করো, দেখবে ভবিষ্যতে কাজ করতে সুবিধে হবে।' ক্লাশ না করে কোথাও যেতে খারাপ লাগছিল অনিমেষের। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'বিমান কে?'

সুবাস বলল, 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি।'

পাঁচ

একতলার ক্যান্টিন রুমে সুবাস সেনের সঙ্গে ঢুকল অনিমেষ। এখানে ও প্রথম এল। বারোটার সময় ক্যান্টিনে ভিড় কম, কয়েকজন ভাত খাচ্ছে। ও পাশে তিন-চারজন ছেলে বেঞ্চিতে পা তুলে বসে গুলতানি মারছে। সুবাস একবার চোখ বুলিয়ে ক্যান্টিনের ম্যানেজারকে বিমানের কথা জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোক পিছনের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে।'

ওরা একটা বেঞ্চিতে বসলে সুবাস দুটো চায়ের জন্য হুকুম দিল। ঘণ্টাখানেক আগে ভাত খেয়ে এসেছে, এখনই চা খাওয়া ওর অভ্যাসে নেই কিন্তু অনিমেষ আপত্তি করল না। কলকাতার মানুষের কাছে এভরি টাইম ইজ টি-টাইম। দেবব্রতবাবুর বাড়িতে রাত দশটাতেও চা হত। অথচ স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে চা খাওয়ার এত চল নেই। বেশি খেলে শরীর কষে যায়—এরকম একটা ধারণা চা-বাগানের মানুষের। কলকাতার মানুষ হার্ট ভাল করতে ঘন ঘন চা খায়—এ রকম একটা খবর ক'দিন আগে কাগজে দেখেছে।

সুবাস চা খেতে খেতে বলল, 'বিমান খুব সিরিয়াস ছেলে। পলিটিক্যাল চিন্তাভাবনা ওর পরিষ্কার। কিন্তু মুশকিল হল সময়মতো কঠোর হতে পারে না, ফলে মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তুমি চার বছর কলেজে থেকে কী করে এস. এফ-এর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে চললে!'

অনিমেষ উত্তর দিল না। কথাটা এর আগেও সুবাস জিজ্ঞাসা করেছে। বোধ হয় কোনও সন্দেহ ওর মনে ঢুকেছে। সুবাস জিজ্ঞাসা করল, 'চুপচাপ কেন?'

অনিমেষ বলল, 'কোনও কারণ নেই। আসলে আমার যে একটা বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে পায়ের জন্য, আর কোনও রিস্ক নিতে চাইছিলাম না।'

BanglaBook.org

সুবাস বলল, 'রিস্ক মানে ?'

অনিমেষ উত্তর দিল, 'আমি যদি ফেল করতাম তা হলে আর পড়া হত না। বি এ একবারে পাশ করাটা জরুরি ছিল।'

সুবাস ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থেকে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তুমি গ্র্যাজুয়েট। কতটা লাভবান হয়েছ তুমি ?'

'মানে ?' অবাক হল অনিমেষ।

'বি এ পাশ করে তোমার ক'টা হাত গজিয়েছে ? তুমি কোথাও দরখাস্ত করলে কেউ তোমাকে চাকরি দেবে ? সুস্থভাবে বাঁচার জন্য বি এ ডিগ্রিটা তোমাকে কী সাহায্য করবে ? এই যে তুমি বাংলা নিয়ে এম এ ক্লাশে ভরতি হয়েছ, ধরে নিলাম তুমি খুব ভালভাবে পাশ করবে, কিন্তু তারপর ?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সুবাস।

'এম এ পাশ করলে নিশ্চয়ই একটা চাকরি পাওয়া যাবে।' অনিমেষ বলল।

'ছাই পাওয়া যাবে! বোঝা যাচ্ছে তুমি কোনও খবরই রাখো না। স্ট্যাটিস্টিকস বলছে আঠারো লক্ষ বেকার গ্র্যাজুয়েট আর তিন লক্ষ বেকার এম এ আঙুল চুষছে। সংখ্যাটা প্রতি বছর বাড়বে। তোমার যদি কোনও মামা থাকে তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তবে তার জন্য এম এ পড়ার কোনও দরকার হয় না।' সুবাস সিগারেট ধরাল। কথাগুলো শুনতে শুনতে অনিমেষ কী রকম অসহায় বোধ করছিল।

সুবাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একটা জিনিস ভাবলেই ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাংলায় এম এ হওয়ার পর চাকরি করার সুযোগ কোথায় কোথায় আছে ? প্রথমে কলেজে তারপর স্কুলে। এই দুই জায়গার বাইরে দু'-একটা খবরের কাগজ, ব্যস। প্রতি বছর ক'টা চাকরির স্কুল কলেজগুলোতে বাংলার জন্য খালি হচ্ছে ? খুব জোর পঞ্চাশটা, অ্যাঁ ? অথচ দুটো ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরুচ্ছে প্রায় শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে। এই যে প্রত্যেক বছর দেড়শো করে ছেলেমেয়ে বেকার হয়ে থাকছে তারা কোথায় যাবে ? চাকরি দরকার বলে ওরা এমন প্রফেশনে ঢুকবে যার সঙ্গে বাংলায় এম এ পড়ার কোনও সংস্রব নেই। এটা কি কর্তৃপক্ষ জানে না ভাবছ ? নিশ্চয়ই জানে। আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' কথাগুলো বলতে বলতে সুবাস দরজার দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। কথা শেষ করেই বলে উঠল, 'এই যে, বিমান এসে গেছে।'

অনিমেষ দেখল, ফরসা সুন্দর চেহারার একটি ছেলে ক্যান্টিনে ঢুকছে। শার্ট-প্যান্ট পরনে, চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। ওর পিছনে আরও দু'জন। ঘরে ঢুকেই বিমান সুবাস সেনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'আরে সুবাসদা, তুমি কতক্ষণ ?'

'মিনিট দশেক।' সুবাস ওর বাড়ানো হাতটা স্পর্শ করে বলল, 'কেমন আছ ?'

'চলছে। তোমাকে কিন্তু এখানে আশা করিনি।' বিমান ওর সঙ্গীদের কিছু বলতে তারা আবার বেরিয়ে গেলে সে ওদের পাশে এসে বসল।

'কেন ?'

'শুনেছিলাম তুমি বীরভূমে চলে যাচ্ছ। ওখানকার কাজকর্ম দেখবে।'

'ঠিকই শুনেছ। আমি গতকাল কলকাতায় এসেছি। তোমার কাছে আসবার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। হঠাৎ এর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় মনে হল তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার। সুবাস অনিমেষকে দেখাল।

পরিচয়-পর্ব শেষ হবার পর অনিমেষকে বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন কলেজ থেকে আসছেন ?' সুবাস বলল, 'ও স্কটিশে পড়ত। আসলে জলপাইগুড়ির ছেলে, এখানে হোস্টেলে থাকত। ওর একটা ব্যাপার ঘটেছিল সেটার সঙ্গে আমিও কিছুটা জড়িত।' বলে সে হাসল।

বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার ?'

অনিমেষ দ্রুত বলে উঠল, 'না, না, এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

সুবাস হাসছিল, বিমান ওদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'স্কটিশের যারা এ বার বেরিয়েছে তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না বলে মনে হচ্ছে।'

সুবাস জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? ওরা কি সব ডান দিকে ?'

বিমান বলল, 'স্কটিশ দেখাশুনা করত অতীনবাবু। ওরা তো এখন আমাদের চিনের দালাল বলে বেড়াচ্ছে। ন্যাচারালি স্কটিশের ইউনিটটা ওদের মতকেই সমর্থন করছে। পুরোপুরি ক্লাশ শুরু না হলে

BanglaBook.org

ঠিক বোঝা যাবে না আমাদের দিকে কারা কারা আছে। আপনার কি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে ?'

অনিমেষ দেখল বিমান ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল। খবরের কাগজ থেকে আজ কারও জানতে বাকি নেই বিমান কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে। সেই চিন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই এই সব ব্যাপার চলছে। অনিমেষ অবাক হত একটা ব্যাপার দেখে, বিদেশি একটা রাষ্ট্রের আক্রমণের ফসল হিসেবে এ দেশের একটা বড় পার্টি ভাগ হয়ে গেল। পার্টির ভাগাভাগিটা সবে অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু তার প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন থেকে। স্কটিশে যারা ছাত্র ফেডারেশন করছে তারা পার্টিকেই সমর্থন করছে আর বিমান এবং নিশ্চয়ই সুবাসদারা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট অংশটার সঙ্গে রয়েছে। একই পার্টিতে দীর্ঘকাল একসঙ্গে থেকে পার্টির নেতারা চিন-যুদ্ধের পর দ্বিমত হলেন। একদল বললেন চিন আক্রমণকারী, অন্যদল মনে করলেন ওটা সীমান্ত সংঘর্ষ। ব্যস, ভাগাভাগি হয়ে গেল দলটা। কিন্তু সেই সঙ্গে খবরের কাগজে যে কথাটা লেখা হল সেটাই অনিমেষকে গুলিয়ে দেয়, ডানপন্থী কমিউনিস্টরা নাকি রাশিয়ার সমর্থক, বামপন্থীরা চিনের। কেন আমরা বিদেশি রাষ্ট্রের কথায় পরিচালিত হব, এটাই বুঝতে পারে না সে। বিমানের মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ উত্তর দিল, 'এ সব ব্যাপার আমি সিরিয়াসলি কখনও ভাবিনি।'

'ভাবেননি ? নগরে যখন আগুন লাগে তখন কি দেবালয় অক্ষত থাকে ? দেশের জন্য যদি চিন্তা-ভাবনা করেন তা হলে একটা সঠিক পথে আপনাকে যেতে হবে। পথটা কী নেবেন সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। ঠিক হয়ে গেলেই সেটা আপনার কাছে সঠিক পথ। আজকের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি ছাত্রের দায়িত্ব আছে।'

সুবাস এতক্ষণ শুনছিল, এ বার বলল, 'আমি এটুকু বলতে পারি অনিমেষ একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সমর্থন করে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আসলে পলিটিক্যাল কনশাসনেস ওর মধ্যে আসেনি বলে ও এখনও মনস্থির করতে পারছে না।'

বিমান সোজা হয়ে বসল, 'আপনি ভাবুন, অনিমেষ। যদি কোনও ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকে তা হলে সরাসরি আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।'

এই সময় আরও কয়েকজন ছেলে ক্যান্টিনে ঢুকল। ওদের দেখে বিমান একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সুবাসদাও একটু উসখুস করছিলেন। দলটা থেকে একজন এগিয়ে এল, 'বিমান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী ব্যাপার!' বিমান ওদের দিকে তাকাল।

'আমাদের ছেলেদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না।' অনিমেষ দেখল যে ছেলেটি কথা বলছে তার মধ্যে কোনও জড়তা নেই। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরনে।

'কে বাধা দিচ্ছে, আমরা ?'

'আমাদের কাছে তাই খবর।'

'কী রকম ?'

'নবাগত ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানিয়ে যে সব পোস্টার দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ছাত্র পরিষদের একটাও পোস্টার চোখে পড়ছে না।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ওগুলো আমরা ছিঁড়েছি! কেন ছিঁড়ব ? ওই সব পোস্টার পড়লে কি নতুন ছেলেমেয়েরা সব আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে ? দ্যাখো মুকুলেশ, আমি চাই না কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে বিরোধ করতে। তোমাদের যদি সত্যি কোনও নালিশ থাকে তা হলে ভি সি-র কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন ?'

'আমরা কী করব সেটা আমাদের বিবেচ্য। যেহেতু তুমি জি এস, আর বাম ছাত্র ফেডারেশন এই কাজ করছে তাই তোমাকে জানিয়ে রাখা হল। যদি একই রকম আচরণ চলতে থাকে তা হলে পরবর্তীকালে আমরা অন্য রকম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।'

কথা শেষ করে ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, বিমান তাকে ডাকল। মুকুলেশ পেছন ফিরে তাকাতে বিমান বলল, 'তুমি আমাকে জানো, এই রকম ভয় দেখিয়ে কোনও কাজ হবে না। তোমাদের পোস্টার কারা ছিঁড়ছে আমি জানি না, তবে ওই সব পোস্টার দেবার আগে তোমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। নতুন ছেলেমেয়েদের ওয়েলকাম করতে আমাদের গালাগালি করতেই হবে—এটা কী ধরনের ভদ্রতা ? কই আমাদের পোস্টারে তো তোমাদের সম্পর্কে কোনও কথা বলিনি। রাজনীতির প্রথম কথাই কি অভদ্রতা ?'

BanglaBook.org

মুকুলেশ হেসে উঠল, 'রাজনীতির পাঠ তোমার কাছ থেকে নেবার আগে আমার আত্মহত্যা করা উচিত। নতুন যে সব মুরগি ঢুকছে তাদের ব্রেন-ওয়াশ করতে পারো, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। তোমরা কতটা ভদ্র তার বিরাট লিস্ট আমার কাছে আছে। যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা রাখব।'

বিমান একটু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমাকে চোখ রাঙাতে এসেছ?'

মুকুলেশ দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি জেনারেল সেক্রেটারি, তোমাকে চোখ রাঙানোর সাধ্য কী! কিন্তু মনে রেখো, এই দেশটা ভারতবর্ষ, চিনের দালালদের আমরা ক্ষমা করব না।' যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ওরা।

অনিমেষ দেখল সমস্ত ক্যান্টিনঘর এখন চুপচাপ। যারা ও পাশে ভাত খাচ্ছিল তারা তো বটেই, এমনকী ক্যান্টিনের বয়গুলো পর্যন্ত কাজ ভুলে বিমানের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা নৈঃশব্দ্য কিছুক্ষণ সুতোর মুখে ঝুলতে থাকল। এতক্ষণ সুবাস সেন চুপচাপ শুনছিল, এবার নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কী?'

সে নিজে হলে কী হত কে জানে, কিন্তু অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল বিমান খুব সহজেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'সেই পুরনো চাল, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করা। দিনরাত গালাগাল দেবে কিন্তু প্রতিবাদ করলেই ছাত্র ফেডারেশনের আক্রমণ বলে পোস্টার পড়বে।'

সুবাস জিজ্ঞাসা করল, 'পোস্টার ছেঁড়ার ব্যাপারটা কী?'

বিমান কাঁধ ঝাঁকাল, 'আরে যাচ্ছেতাই কথা লিখছে! নবীন ছাত্ররা চিনের দালালদের চিনে রাখুন। একজন দেশদ্রোহী আপনার পাশেই আছেন, যার গেঞ্জি চিন থেকে আসছে। এই সব পোস্টার দেখতে দেখতে কোনও ছেলে যদি মাথা গরম করে ফেলে এক-আধটা ছিঁড়ে ফেলে তা হলে আমি কী করতে পারি! ওদের চরিত্র সেই টিপিক্যাল গ্রাম্য ঝগড়াটে বুড়ির মতো হয়ে গেছে।'

সুবাস বলল, 'দক্ষিণীরা?'

বিমান হেসে ফেলল, 'ভাল বলেছ। তাদের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের সংখ্যা সামান্য, শুনছি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে একটা আঁতাত হচ্ছে ওদের। এক সময় সবার চরিত্র প্রকাশ পাবেই।'

চার-পাঁচজন ছেলেকে খুব উত্তেজিত গলায় কথা বলতে বলতে এ দিকে আসতে দেখল ওরা। সবাই অনিমেষের সমবয়সী, দু'-একজনের চেহারা বেশ রাগী রাগী। ক্যান্টিনে ঢুকে ওরা সরাসরি কাছে চলে এল, 'কী ব্যাপার, শুনলাম মুকুলেশ নাকি তোমাকে মারতে এসেছিল?' একজন খুব উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'কে বলল?' অনিমেষ তাজ্জব হয়ে শুনল কী নিরাসক্ত গলায় কথা বলছে বিমান!

'সত্যি কি না একবার বলো। শালার লাশ নামিয়ে দেব আজই। এত বড় হেক্কড় যে তোমার গায়ে হাত তুলতে আসে! ফ্যাক্ট?'

বিমান ওদের উত্তেজিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'মারামারি করে কোনও লাভ হবে না। এস এফ গুণ্ডাদের পার্টি নয়। ওটা যাদের ধর্ম তারা করুক। তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে ওরা সেই সুযোগ নেবে।'

আর একজন বলে উঠল, 'কিন্তু গুরু, তোমাকে ইনসাল্ট করলে তো আমরা মুখ বুজে বসে থাকব না। মুকুলেশকে এর কিস্মত দিতে হবে। শালা কি গায়ে হাত তুলেছে?'

বিমান হেসে ফেলল, 'তোমরা এত খেপে গেছ কেন? বলছি তো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি জানি কী করে এটা ট্যাকল করতে হবে।'

চুপচাপ শুনছিল অনিমেষ। একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হচ্ছিল ও, ছেলেগুলোর প্রশ্নের উত্তরে বিমান একবারও বলছে না ছাত্র পরিষদের ছেলেরা তাকে মারেনি।

দলের আর একজন বলল, 'কিন্তু ওদের প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্যন্ত রোখা যাবে না। খামোকা জি এস-এর গায়ে হাত তুলবে আর আমরা সেটা সহ্য করব—শালারা টিটকিরিতে হাড় জ্বালিয়ে দেয়।'

বিমান দু' মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'সুদীপ এসেছে?'

'না, দেখিনি।' একজন জবাব দিল।

'একটু দ্যাখো। তোমরা ক্লাশে ক্লাশে বলে এসো যে আজ তিনটের সময় লনে আসতে। যা বলার আমরা সাধারণ ছাত্রদের কাছে সরাসরি বলব।'

'গেট মিটিং?'

BanglaBook.org

'না, গেট মিটিং নয়। জাস্ট একটা গেট টুগেদার।'

'মাইক বলব ?'

'দরকার নেই। আমার গলা ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। এ নিয়ে তোমরা কোনও গোলমাল কোরো না। তিনটে অবধি অপেক্ষা করতে বলো সবাইকে।'

ওরা চলে গেলে সুবাস বলল, 'খুব টেনশন দেখছি।'

'হবেই। সরকার ওদের হাতে, যা ইচ্ছে করলেও ভাইস-চ্যান্সেলার চুপ করে থাকেন, সেটাই ওদের সুযোগ। এটা আমাদের ছেলেরা সহ্য করতে পারে না। যাক, বীরভূমে তোমার কেমন কাজ হচ্ছে বলো।'

সুবাস সিগারেট ধরাল, 'ওখানে না গেলে সত্যি কিছুই জানতাম না। এখানে এই কলকাতা শহরের মানুষের যে প্রবলেম আছে, পলিটিক্যাল যে সব ঝামেলা আছে, গ্রামে গেলে তুমি তার সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারবে না। কমপ্লিট ডিফারেন্ট ব্যাপার। এমন এক-একটা গ্রাম আছে যেখানে স্বাধীনতা শব্দটার অর্থ জানে না এমন মানুষের অভাব নেই। জওহরলাল, গান্ধী তাদের কাছে শিব নারায়ণের মতো ভগবানেরই একটা রূপ। ওরা কমিউনিস্ট বলে যাদের জানে তারা থাকে অন্য দেশে। যেন বর্গি কিংবা রাক্ষসের মতো ভয়ানক শত্রু, তারাই কয়েকদিন আগে এই দেশটাকে জয় করতে এসেছিল, ভাগ্যিস গান্ধী দেবতার শিষ্যরা ছিলেন তাই দেশ রক্ষা পেয়েছে। এইরকম অবস্থায় কাজ করা যে কী দুরূহ তা তোমরা বুঝবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে ওদের যত সহজে কোনও সমস্যা বোঝানো যায়, শিক্ষিত মানুষকে তা সম্ভব নয়।'

'তুমি কলকাতায় ফিরছ কবে পাকাপাকিভাবে ?' বিমান উসখুস করল।

'যবে পার্টি বলবে। তবে আমার ওখানে থাকতেই ভাল লাগছে। চলো, আজ উঠি, কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল অনেক।' সুবাস উঠে দাঁড়াতেই বিমান যেন দাঁড়াতে পারল। অনিমেষের মনে হল বিমানের উসখুস ভাবটা নিশ্চয়ই সুবাসদা লক্ষ করেছিলেন। বিমানের পলিটিক্যাল ধ্যানধারণা সুবাসদার কথা মতো হয়তো খুবই ভাল কিন্তু সুবাসদার দৃষ্টিভঙ্গি বিমানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এ ব্যাপারে অনিমেষের কোনও সন্দেহ নেই।

ক্যান্টিনের দরজায় গিয়ে সুবাস থমকে দাঁড়াল, 'ওই যা, চায়ের দামটা দেওয়া হয়নি। দাঁড়াও দিয়ে আসি।'

বিমান বাধা দিল, 'দিতে হবে না। ওটা আমার নামে লিখে রাখবে।' সুবাস শুনল না। দাম মিটিয়ে ফিরে এসে বলল, 'এই লিখে রাখা সিস্টেমটা খুব খারাপ ব্যাপার। খরচের হাত বেড়ে যায়, খেয়াল থাকে না।'

বিমান বলল, 'তুমি তো খুব হিসেবি, সুবাসদা।'

সুবাস বলল, 'আমাকে খুব কম অর্থে মাস চালাতে হয় বিমান। অনিমেষ, তুমি কি এখন ক্লাশে যাবে ?' অনিমেষের খেয়াল হল ততক্ষণে দুটো পিরিয়ড অবশ্যই হয়ে গেছে। সবে শুরু হওয়া সেসনে পড়ানো এখনও সিরিয়াসলি শুরু হয়নি। তবু খামোকা ক্লাশে না যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ও ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

সুবাস বলল, 'তা হলে আমি চলি। আবার কবে কলকাতায় ফিরব জানি না, এলে দেখা করব। বিমানের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে গেল, এখন কাজকর্ম শুরু করতে কোনও অসুবিধা নেই।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আজই যাচ্ছেন ?'

'না, কাল সকালে। কেন ?'

'কারণ নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।'

সুবাস অনিমেষকে একবার ভাল করে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি স্কটিশের কোন হোস্টেলটায় থাকো ?' অনিমেষ ঠিকানাটা বলতে সুবাস মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, যদি সময় পাই সন্ধেবেলায় তোমার কাছে যেতে পারি।' অনিমেষ এটাই চাইছিল। সুবাসদার সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলা দরকার। কী কথা তা এই মুহূর্তে ওর মাথায় নেই, সমস্ত ব্যাপারটা কী রকম ছায়া হয়ে আছে।

ওরা ক্যান্টিনের সামনের প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ বিমান চেঁচিয়ে একজনকে ডাকল, 'সু-দী-প।' বাঁ হাতে একটা মোটা চুরুট জ্বলছে, সুদীপকে এগিয়ে আসতে দেখল অনিমেষ। সমবয়সী একটি ছেলেকে চুরুট খেতে দেখতে খুব বেমানান দেখাচ্ছে। সিগারেট সবার হাতে মানিয়ে যায় কিন্তু ছেলেটি যে ভাবে চুরুট থেকে ধোঁয়া ছাড়ছে তাতে ওকে একটুও মানায় না। সুদীপের কথা

BanglaBook.org

বলার ঢংটাও অদ্ভুত। কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলোর ওপর একটু জোর দিয়ে আলতো করে ছেড়ে দেওয়া। সুদীপ কাছে এসে বলল, 'মুকুলেশের ব্যাপারটা শুনলাম। চল, ইউনিয়ন রুমে বসা যাক।'

বিমান হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সুবাসদা, তুমি সুদীপকে চেনো তো!'

সুবাস বলল, 'বাঃ, আমি কি এখানে নতুন এলাম ?' সুদীপ হাসল না শব্দ করল অনিমেষ বুঝতে পারল না।

বিমান বলল, 'সুদীপ, এর নাম অনিমেষ, ফ্রেশার, স্কটিশ থেকে আসছে।' সুদীপ ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'স্কটিশচার্চ ? ওহো, ওখানকার একটা ছেলের কথা শুনলাম একটু আগে, খুব ইন্টারেস্টিং কেস।'

ওরা লনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম ?'

'একটি ছেলে, নামটা কী যেন—কী যেন—, হ্যাঁ, ছেলেটি নাকি অ্যাকটিভলি পার্টির কাজকর্ম করে অথচ স্কটিশের স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি। সবচেয়ে বড় খবর লাস্ট মুভমেন্টে ওকে নাকি পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, লাকিলি বেঁচে গেছে। অনেকে বুলেটের দাগ দেখেছে।'

বিমান বলল, 'অদ্ভুত ঘটনা। এরকম একটা কেস কোনও কলেজে আছে আর আমরা জানব না ? ইম্পসিবল! সুবাসদা, তুমি জানো ?'

সুবাসদা হেসে ফেলল। অনিমেষ খুব অবাক হয়ে গেল। এত দ্রুত গল্পটা বাড়তে বাড়তে এইখানে চলে এসেছে। এ ভাবে যদি এগোয় তবে শেষ পর্যন্ত সে বিরাট বিপ্লবী হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ বিমান অনিমেষের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি তো স্কটিশ থেকে এসেছেন। ছেলেটিকে চেনেন ? কী পড়ে ?'

কাঁচুমাচু মুখে অনিমেষ বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক সত্যি নয়।'

সুবাস হাসছিল, এ বার বলল, 'তোমরা যার কথা বলছ সে তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তবে ঘটনাটা হল পুলিশের বুলেট ওর পায়ে লেগেছিল এটা ঠিক, এক বছর নষ্ট হয়েছে, মারাও যেতে পারত, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ওর কখনও কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি। বাকিটা সবার মনগড়া গল্প।'

বিমান অনিমেষকে একদৃষ্টে দেখছিল, এ বার প্রশ্ন করল, 'পুলিশ আপনাকে কেন গুলি করল ?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'ভুল করে। দৌড়াচ্ছিলাম বলে ভেবেছিল আমিই বোম মেরেছি।'

সুদীপ নিবে যাওয়া চুরুট ঠিক করতে করতে বলল, 'কিন্তু তবু আপনি অভিনন্দনযোগ্য। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন, কমরেড।'

এই প্রথম কেউ তাকে কমরেড সম্বোধন করল। একই সঙ্গে অস্বস্তি এবং এক ধরনের খুশি অনিমেষকে টালমাটাল করল। কোনটার পাল্লা ভারী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সে মুখ নিচু করে বলল, 'আপনারা বোধহয় তিলকে তাল করছেন, আমি তার যোগ্য নই।'

বিমান এক হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'আঘাতটা কেমন ছিল ?'

অনিমেষ বিমানের এরকম সহৃদয় ব্যবহারে আড়ষ্ট হয়ে উত্তর দিল, 'আমি প্রায় আটমাস বিছানায় শুয়ে ছিলাম। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! তা হলে তো আমরা একসঙ্গে পাশ করেছি। অনিমেষ, আপনার পায়ে কি এখনও বুলেটের দাগ আছে ?' বিমান গাঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, ওটা মৃত্যু অবধি থাকবে। আমার থাইটা বীভৎস হয়ে আছে।'

'ভালই হল, আপনি আমাদের হাত শক্ত করুন।' বিমান ওর সঙ্গে করমর্দন করল।

সুবাসকে সামান্য এগিয়ে দিয়ে অনিমেষ দোতলায় উঠে এল। অনেকক্ষণ ক্লাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। বি সেকশনে ঢোকার তিনটে দরজা, অধ্যাপক যদি পড়ানোর ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দেন তা হলে তাঁর পক্ষে লক্ষ করা সম্ভব নয় কেউ এল কি না। ও দিকে দেওয়াল ঘেঁষে মেয়েরা, এ পাশে দরজার দিকে ছেলেরা বসে আছে। অনিমেষ ইতস্তত করছিল ঢুকবে কি না। এই ভাবে ফাঁকা করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল দেখায় না। এখন যিনি বাংলা ছোটগল্প পড়াচ্ছেন তাঁর সম্পর্কে বাংলা নিয়ে যারাই পড়ে তাদের অসীম দুর্বলতা। গত চার বছরে অনিমেষ ওঁর লেখা সব ছোটগল্প-উপন্যাস গোগ্রাসে গিলেছে। একটা অদ্ভুত জীবন যেন ছিটকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ অন্যরকম আদল নিয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়। ছোটগল্প যখন পড়ান তখন চট করে মনে হয় আমি প্যারিসের রাস্তায় হাঁটছি মোপাসাঁর হাত ধরে অথবা এডগার অ্যালান পোর সঙ্গে একটু আগে চা খেয়ে এলাম। পড়ানোটা এত আন্তরিক যে কান বন্ধ করতে ইচ্ছে করে না।

BanglaBook.org

দরজার ধারে বসা দু'-তিনটি ছেলে অনিমেষকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখে ইশারায় ভেতরে আসতে বলল। এরা স্কটিশ থেকে আসেনি। আলাপও হয়নি, ক'দিনের ক্লাশে শুধু চোখাচোখি হয়েছে মাত্র। মাথা নামিয়ে অনিমেষ চট করে দরজা ডিঙিয়ে সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। দু'-একজন এ দিকে তাকাল মাত্র কিন্তু কেউ কোনও মন্তব্য করল না। অনিমেষকে যারা ডেকেছিল তাদের মধ্যে একজন, যে এখন ওর পাশে বসে আছে, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোন কলেজ ?'

'স্কটিশচার্চ', অনিমেষ উত্তর দিল।

'চার্চ ?' ছেলেটা চোখ বড় করল, 'চার্চ না সার্চ ? মেয়ে খোঁজার জায়গা। মাইরি তোমাদের কপাল সোনা দিয়ে বাঁধানো। আমাদের কলেজের ধারেকাছে মেয়ে ছিল না।' দাঁত বের করে হাসল সে। ছেলেটিকে ভাল করে দেখল অনিমেষ। নীল ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি পরনে, সাধারণ মানুষের তুলনায় যথেষ্ট বেঁটে। ওপরের দাঁতগুলো একটু উঁচু বলে মুখ খুললেই মনে হয় হাসছে। ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা সহজ ব্যাপার ছিল যে অনিমেষ রাগ করতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন কলেজ আপনার ?'

'সিটি। কিন্তু নো আপনি-টাপনি। আমি শালা মেয়েদেরই ডাইরেক্ট তুমি বলছি।'

এর মধ্যে কখন পড়ানো থেমে গিয়েছিল বুঝতে পারেনি অনিমেষ। হঠাৎ ছেলেটি পা দিয়ে ওর পায়ে টোকা মারতে দেখতে পেল ক্লাশসুদ্ধ সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ তুলে তাকাতেই অধ্যাপকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। লম্বা মানুষটা নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু চাপা হাসি উঠল ঘরটায়, অনিমেষ বুঝতে পারছিল ওর মুখে রক্ত জমছে। অধ্যাপক এ বার হাতের বইটা টেবিলের ওপর মুড়ে রেখে খুব ধীরগলায় অনিমেষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব জরুরি কথা হচ্ছিল কি ?' উত্তর দিতে হলে উঠে দাঁড়াতে হয়, অনিমেষের মনে হল এর চেয়ে লজ্জা সে জীবনে কখনও পায়নি। ওই ছেলেটা যদি মিছিমিছি তার সঙ্গে কথা না জুড়ত তা হলে এই পরিস্থিতিতে ওকে পড়তে হত না। অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে না বলল।

'আমরা কিন্তু একটু জরুরি কথা বলছিলাম। ছোটগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেটা এখন মানা যায় না। এ ব্যাপারে তুমি বোধহয় আমাদের সাহায্য করতে পারবে।' অধ্যাপকের ঈষৎ সরু গলা অনিমেষকে কাঁপিয়ে দিল। ও অনুভব করছিল একটা বিরাট ফাঁদ ওর জন্য পাতা হচ্ছে এবং সেটা জানা সত্ত্বেও ওই ফাঁদে পা বাড়ানো ছাড়া তার কোনও উপায় নেই।

অধ্যাপক বললেন : 'আচ্ছা, আজকালকার একটা গল্পের কথাই ধরা যাক। তুমি ইদানীং যে সব গল্প পত্রপত্রিকায় পড়েছ তার মধ্যে কোন গল্পটা তোমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে, আমরা ওই গল্পটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।' অধ্যাপক ওর দিকে সহানুভূতির চোখে তাকালেন। সমস্ত ছেলেমেয়ের মুখ ওর দিকে ফেরানো। অনিমেষ বুঝতে পারছিল ওর সর্বাঙ্গে ঘাম জমছে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করে গত পূজাসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার সেই গল্পটা মনে করল। পড়তে পড়তে সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গিয়েছিল, পড়া শেষ হলে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। প্রথম দিন ওই অধ্যাপকের ক্লাশে এসে সেই গল্পটার সঙ্গে ওঁকে মেলাতে চেষ্টা করেছিল সে, মেলেনি। লেখকদের সঙ্গে লেখা মেলেনা বোধহয়। মন ঠিক করে ফেলল অনিমেষ, তারপর পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি সত্যি কথা বলতে পারি ?'

'আশ্চর্য! খামোকা মিথ্যে বলতে যাবে কেন ?' অধ্যাপক বিস্মিত হলেন।

এ বার অনিমেষের মনে দ্বিধা নেই, সে গল্পটির নাম উচ্চারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের কপালে তিনটি ভাঁজ পড়ল, ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বুলিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে নিঃশব্দে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। কয়েকটা মুহূর্তের অপেক্ষা, বোধহয় অধ্যাপকের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যই, হঠাৎ ক্লাশ ফেটে গেল হাততালিতে। সবাই প্রায় একসঙ্গে অনুরোধ করতে লাগল গল্পটি নিয়ে আলোচনা করতে। অধ্যাপক অনিমেষকে আর একবার দেখে টেবিল থেকে বই টেনে সবাইকে এক হাত তুলে থামালেন। তারপর বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধিমানদেরও মনোযোগী হতে হয়। আচ্ছা, আমরা যেখানে থেমেছিলাম—।'

আবার পড়ানো শুরু হল নতুন করে। অনিমেষ ধীরে ধীরে বেঞ্চিতে বসতেই পাশের ছেলেটি চাপা গলায় বলে উঠল, 'গুরু, একটা লেগ দেখি!'

আর কথা বলতে এ বার ভয় হল। সে জড়োসড়ো হয়ে সামনে তাকিয়ে থাকল। অধ্যাপক তাকে যে ভাষায় তিরস্কার করলেন সে ভাবে কোনও মানুষ তাকে কোনও দিন করেনি। একটুও না

BanglaPDF

রেগে যে ঠিক জায়গায় শাসনটাকে পৌঁছে দেওয়া যায় সেটা এই প্রথম অনুভব করল অনিমেষ। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ও মুখ নামাল। অধ্যাপকের সরু গলার মধ্যে এমন মাদকতা আছে, শব্দগুলো এমন গল্প হয়ে যায় যে সত্যি অন্য দিকে মন দিতে ইচ্ছে করে না। সামনে সার সার মাথা, অনিমেষ ছোটগল্পের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে হঠাৎ কেঁপে উঠল। সামনের মাথাগুলোর সামান্য ফাঁক একটা সরলরেখায় অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। সেই রেখার শেষে যে বসে আছে তার দুটো চোখ এখন ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ। অমন আয়ত গভীর দৃষ্টি যেন মনে হয় সমস্ত হৃদয় ওই চোখে মাখানো— অনিমেষ বুকের মধ্যে অজস্র ঝরনার চাঞ্চল্য আবিষ্কার করল। দৃষ্টিটা সরছে না কিন্তু একটু বাদেই সরলরেখাটা ভেঙে গেল। মাথাগুলো সামান্য নড়াচড়া করতেই চোখদুটো হারিয়ে গেল। বুকের মধ্যে থম ধরে গেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়—অনিমেষ কোনও কারণ বুঝতে পারছিল না। এরকম হল কেন তার ? অধ্যাপকের পড়ানোটা কান দুটোয় পৌঁছাচ্ছে না। যেন ওর সব ইন্দ্রিয় হঠাৎ অকেজো হয়ে গিয়েছে। শুধু দুটো চোখ একটা পদ্মফুলের মতো মুখের ওপর থেকে সরাসরি উঠে এসে তার রক্ত নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে ঘন্টা পড়েছে, অধ্যাপক ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে করিডোরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কখন টের পায়নি অনিমেষ। কে একজন এসে ওকে বলল, 'স্যার তোমাকে পরে প্রফেসারস রুমে দেখা করতে বলেছেন।'

অনিমেষ বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ পিছন থেকে শুনল, 'লেগটা দিলে না গুরু ?' সে অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সিটি কলেজের ছেলেটিকে দেখতে পেল।

'তোমাকে একটু প্রণাম করতাম। টি. জি-কে যেভাবে বোল্ড করলে গুগলি দিয়ে—তুমি মাইরি সাধারণ মাল নও।' সত্যি সত্যি হাসল ছেলেটি।

অনিমেষ বলল, 'আমার নাম অনিমেষ, তোমার নাম কী ?

'পরমহংস রায়। পরম বলে ডাকাই ভাল, শেষেরটা শুনলে খারাপ লাগে।'

'পরমহংস ?' অনিমেষের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এরকম নাম কোনও মানুষের হয় ? ঘাড় নাড়ল ছেলেটি, 'হ্যাঁ, শুদ্ধচিত্ত সংযতাত্মা নির্বিকার ব্রহ্মানন্দে মগ্ন যোগীপুরুষ। আমার ঠাকুরদার আমাকে ওই ভূমিকায় দেখার বাসনা ছিল।'

আরও তিন-চারজন ছেলে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল, তারা এ বার খুব জোরে হেসে উঠল। ওরা যখন কথা বলছে তখন অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে করিডোরে যাওয়া-আসা করছে। বাংলা ক্লাশে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। অনিমেষ আড়চোখে তাদের দেখছিল। এখন সেই ঝিমঝিমে ভাবটা অনেক কম কিন্তু উত্তেজনা কমে গেলে ওর যেমন হয়, পেটের ভেতর চিনচিন করছিল। না, সেই চোখদুটোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত সে ক্লাশ থেকে বের হয়নি। এখন মুষ্টিমেয় ছাত্রী ওই ঘরে আছে, গেলেই দেখা হয়ে যাবে, কিন্তু অনিমেষের যেতে সাহস হচ্ছিল না। পরমহংস চা খাওয়ার প্রস্তাব করল কিন্তু অনিমেষের এখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিল না তার এরকমটা কেন হচ্ছে ? স্কটিশে ওদের সঙ্গে প্রচুর মেয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকারের সুন্দরী ছিল। কিন্তু কখনও তাদের দেখে ওর মনে এরকম চাঞ্চল্য আসেনি। নীপা বলে একটা মেয়ে ওদের সঙ্গে বাংলা অনার্সে ছিল। প্রথম দিনের পরই সে ওদের সঙ্গে তুই-তোকারি করেছে, একটা ছেলের সঙ্গে নিজের কোনও তফাত রাখেনি। অদ্ভুত ব্যাপার, ওদের সহপাঠীদের মধ্যে কেউই নীপাকে প্রেম নিবেদন করেনি। অথচ এখন ওই চোখদুটি দেখার পর থেকে ওর এরকমটা হচ্ছে কেন ?

পরের ক্লাশ আরম্ভ হবার সময় অনিমেষ দেখল সুদীপ করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে। হাতে তেমনি আধপোড়া চুরুট। ওকে দেখে সুদীপ একটা হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলল। অনিমেষের পাশে তখনও পরমহংস ছিল। সে চাপা গলায় বলল, 'লিডার আসছে, তুমি চেনো নাকি ?'

অনিমেষ ঘাড় নেড়ে এক পা এগোতেই সুদীপ কাছে এসে গেল, 'তোমাকে খুঁজছিলাম, এইটে তোমার ক্লাশ ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন কমরেড।'

একটা অবাক গলায় অনিমেষ বলল, 'কেন ?'

'শোনো, তুমি অবশ্যই তিনটের সময় লনের মিটিং-এ যাবে আর বাঁ দিকের থামের নীচে দাঁড়াবে যাতে প্ল্যাটফর্ম থেকে তোমাকে স্পষ্ট দেখা যায়।' নেবা চুরুটটা টানল সুদীপ।

BanglaBook.org

ছয়

তিনটের ক্লাশটা শেষ হলে অনিমেষ পরমহংসকে বলল, 'চলো একবার নীচের লনে যাই।'

পরমহংস বলল, 'ধ্যুৎ, ওখানে গিয়ে কী হবে! রোজ এক কথা, এস এফ বলবে তাদের মতো ভাল দল আর কেউ নেই, ছাত্র পরিষদ বলবে ওরাই ধোয়া তুলসীপাতা। এ সব শুনে আমার কী লাভ হবে ? ও সব ছেঁড়াছেঁড়ি খাওয়া-খাওয়ির মধ্যে আমি নেই।'

অনিমেষ হেসে ফেলল বলার ধরনে, 'তুমি দেশের কথা ভাবো না ?'

'দেশের কথা ?' হাঁ করে তাকাল পরমহংস, 'তুমি তো হেভি খ্যাপা! দেশের কথা কেউ ভাবে নাকি! সবাই নিজের ধান্দা হাসিল করার জন্য দেশের নামটা ব্যবহার করে। যে যত দেশের কথা বলবে সে তত মাল গোটাবে।'

অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে, তবু মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে যাই চলো। তা ছাড়া, স্টুডেন্টস লিডাররা নিশ্চয়ই আমাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে, দেশের ব্যাপারটা তো এখানে জড়িত নয়।' অনিমেষের একা যেতে ভাল লাগছিল না। স্কটিশে সে অনেককে বক্তৃতা করতে দেখেছে কিন্তু সেগুলো কেমন ছেলেমানুষি ব্যাপার। শোনার ইচ্ছে হত না তেমন। আজ বিমানের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর একটা কৌতূহল ওর মনে জেগেছে, ওরকম ধীর স্থির এবং সুবাসদার কথামতো পলিটিক্যালি কনশাস একটি ছেলে কেন একবারও দলের ছেলেদের বলল না কেউ ওর গায়ে হাত তোলেনি। নিশ্চয়ই হঠাৎ-ডাকা আজকের মিটিং-এ এ ব্যাপারে কিছু জানা যাবে।

পরমহংস বললেন, 'আচ্ছা, প্রথম দিন, তোমার কথা ফেলব না। কিন্তু ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিট, তারপর কেটে পড়ব।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে পড়াশুনা করো ?'

পরমহংস ঘাড় বেঁকিয়ে ওর মুখের দিকে পিটপিট করে তাকাল, 'তুমি মাইরি হয় ডুপ্লিকেট, নয় মেড ইন মফস্বল। কোনটা ?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'প্রথমটা কী আমি বুঝতে পারছি না, তবে আমার বাড়ি ডুয়ার্সে।'

'তাই বলো! নইলে এ সব ফর্মা বেরোয় মুখ থেকে! বাংলা নিয়ে এম. এ. বেশির ভাগ ছেলে পড়ে কেন জানো না ? পড়ে যাতে ক্লাশের বাকি সময়টা আড্ডা মারা যায়। যারা ফার্স্ট ক্লাশের ধান্দায় থাকে তাদের কথা আলাদা, সেকেন্ড ক্লাশ এম. এ-র জন্য পরীক্ষার আগে ছাড়া বাংলা পড়তে হয় না। আমি এখান থেকে বেরিয়ে কফি হাউসে যাব, তারপর হেঁটে চিৎপুরে গিয়ে টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরব।' পরমহংস জিভে একটা তিক্কুটে শব্দ করল।

এতক্ষণে সব ছেলেমেয়েরা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেছে। আজ ওটাই শেষ পিরিয়ড ছিল। অনিমেষ দেখল তিনটি মেয়ে নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। তাদের একজনের মুখ নীচে নামানো, কিন্তু অনিমেষের বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না এই সেই মেয়ে। ওরা তিনজনই কিন্তু একবারও এদিকে ফিরে তাকাল না। মুখ না দেখতে পেলেও অনিমেষ শরীরটাকে পিছন থেকে দেখে সম্পূর্ণ চেহারাটা অনুমান করে ফেলল। অত সুন্দর চেহারার মেয়ে অমন করে ওর দিকে চেয়েছিল কেন ? শুধুই কৌতূহল ? তার উত্তর শুনে অন্য ছেলেমেয়েরা খুশি হয়েছিল যেমন, তেমনই ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিল এইমাত্র ? কিন্তু ওই চোখদুটোর মধ্যে কেন অত কথা জমা থাকে ?

পরমহংস ব্যাপারটা লক্ষ করছিল, চাপা গলায় বলল, 'পিচ খুব খারাপ গুরু। ডিফেন্সিভ না খেললেই আউট হয়ে যাবে।'

থতমত হয়ে অনিমেষ বলল, 'মানে ?'

পরমহংস পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'ওনারা বেথুনের জিনিস। তিনদিনেই বুঝে গেছি নাকের ডগা আকাশে বেঁধে রেখে এসেছেন।'

ওরা লনে এসে দেখল তেমন কিছু ভিড় হয়নি। বড় জোর শখানেক ছেলে এবং কিছু মেয়ে একটা উঁচু চাতালের সামনে জমা হয়েছে। মাইকের কথা তখন নিষেধ করেছিল বিমান কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটা পোর্টেবল মাইক এসে গেছে। তাতে একজন ছাত্রবন্ধুদের কাছে সমানে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে সভায় দলে দলে যোগদানের জন্য। চাতালের পিছনে লাল কাপড়ে ছাত্র ফেডারেশনের ফেস্টুন টাঙানো। অনিমেষ আর পরমহংস সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। হঠাৎ পরমহংস

BanglaBook.org

ওকে মনে করিয়ে দিল, 'এই, তোমাকে লিডার আদেশ করে গেল বাঁ দিকের থামের নীচে দাঁড়াতে, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চলো ও পাশে গিয়ে দাঁড়াই।'

কথাটা তখন খেয়াল করেনি, এখন মনে পড়তে অনিমেষ দ্বিধায় পড়ল। সুদীপ তাকে ওই জায়গাটায় দাঁড়াতে বলেছিল যাতে মঞ্চ থেকে ওকে ওরা দেখতে পায়। মঞ্চ যদি এই চাতালটা হয় তা হলে সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে দেখার কী দরকার ? নাকি ওরা দেখতে চায় সে সভায় হাজিরা দিয়েছে, মন দিয়ে বক্তৃতা শুনছে ? রাগ হয়ে গেল অনিমেষের, সে এমন কিছু কথা দিয়ে আসেনি যে বিমানরা ওর ওপর এখন থেকেই কর্তৃত্ব করবে! মিটিং-এর বক্তব্য সে শুনতে চায়, কেউ দেখুক বা না দেখুক তার বয়ে গেল। সে পরমহংসকে বলল, 'এখান থেকেই বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ও দিকে যাওয়ার দরকার নেই।'

একটু বাদেই চাতালের পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়ের সমবেত শ্লোগানের পর বিমান এসে মাঝখানে দাঁড়াল হাতে কিন্তু মাইক নেই। সবাই চুপ করতে ওর গলা শোনা গেল, 'বন্ধুগণ, আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজকের এই সভার পিছনে কোনও প্রস্তুতি নেই, বিশেষ কারণে আমাদের মিলিত হবার প্রয়োজন হয়েছে।' একটু থামল বিমান, অনিমেষ লক্ষ করল বিমানের বলার ভঙ্গি খুব স্বচ্ছন্দ, যেন এক টেবিলে বসে কথা বলছে। তা ছাড়া ওর গলার স্বর যে ওইরকম পরদায় পৌঁছাতে পারে, না শুনলে অনুমান করা যায় না। ওরা যে এত দূরে আছে কিন্তু শুনতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। বিমান তখন কেন মাইক প্রয়োজন হবে না বলেছিল এখন বোঝা গেল।

'বন্ধুগণ! আপনারা জানেন ছাত্র ফেডারেশন কখনওই হিংসায় বিশ্বাসী নয়। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশ এবং ছাত্রবন্ধুদের কাজ করতে চাই। মিথ্যে কুৎসা এবং ভন্ডামিকে আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু আমাদের ওপর সেই সব জঞ্জাল চাপিয়ে দেবার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের কমরেডদের দিন-রাত প্ররোচনা করা হচ্ছে উত্তেজিত হতে। একবার যদি উত্তেজিত করতে পারে আমাদের কর্মীদের তা হলে যে ভুল তারা করবে তার ফসল তুলতে ওরা মুখিয়ে আছে। আমি আমার বন্ধুদের কাছে আবেদন করছি কোনও অবস্থাতেই আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে আমরা নাকি ওদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছি এবং নবাগত বন্ধুরা সেই মহামূল্য পোস্টার দর্শনে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভাল কথা। কিন্তু কে কখন কী পোস্টার ছিঁড়ছে তার কোনও প্রমাণ ওঁরা আমাকে দেননি। আমরা হাওয়ার ওপর বাস করতে পারি না। আর তাদের পোস্টারে কী লেখা থাকে ? না, তাদের উদ্দেশ্য বা কর্মপন্থার খবর সেখানে পাবেন না। নবাগত ছাত্রদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন আমাদের গালাগালি দিয়ে। একটা পোস্টারে যদি আশি ভাগ আমাদের কথা লেখা থাকে তা হলে সেটা ওদের পোস্টার কী করে হল! আমি ওদের কাছে সামান্য ভদ্রতা আশা করেছিলাম, কিন্তু উলটে ওরা আমাকে চোখ রাঙিয়ে গেল।

'নতুন বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি কাদের কথা বলছি। না, দক্ষিণপন্থী ছাত্র ফেডারেশন সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। মানুষ যখন ধর্মচ্যুত হয় তখন তার মস্তিষ্ক স্থির থাকে না, না হলে আজ ওরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মেলাবে কেন ? আমি ছাত্র পরিষদের কথা বলছি। ওরা বলে এই দেশে স্বাধীনতা ওরাই এনেছে, এই দেশকে সোনায় মুড়ে দেবার জন্য ওরা সংগ্রাম করছে। আমরা নাকি চিনের দালাল, দেশের শত্রু। এই কথা নিয়ে আমি অনেকবার সভায় বলেছি, আমাদের বক্তব্য আপনারা জানেন। চিন না আমেরিকা, সে প্রশ্নে আমি যেতে চাই না। কিন্তু সোনায় মুড়ে দেবার ব্যাপারটা কার ক্ষেত্রে খাটে! দশটা পরিবারকে সোনায় মুড়ে দেবার জন্য ওরা এই দেশের মানুষকে ছিবড়ে করে দিয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে ? আমাদের গালাগালি না দিয়ে ওরা ভেবে দেখুক তারা কার দালাল। ওদের হাতে সরকার আছে, পুলিশ আছে, শুধু গায়ের জোর আর ভাঁওতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ক'দিন দমন করে রাখা যায় ?' বিমান সামান্য থামল, শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোধ হয় বুঝতে চাইল। পরমহংস চাপা গলায় বলল, 'এ বার নির্ঘাত হাততালি পড়বে।' কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বিমানের বক্তৃতায় শ্রোতাদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হল বোঝা গেল না। কারণ, সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, বিমান আবার গলা তুলল, 'যারা আমাদের চিনের দালাল বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে তাদের জেনে রাখা উচিত আমরা জনসাধারণের সুখ-দুঃখে তাদের সঙ্গেই আছি, কারণ আমরাই তাদের লোক, কয়েকজন শিল্পপতির দালাল নই। বন্ধুগণ, বর্তমান কংগ্রেস সরকার দেশের অর্থনীতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা, সব জায়গায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে চান যাতে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ছাত্র পরিষদের বন্ধুরা সেই কাজই

banglabook.org

করছে। আমি আপনাদের সামনে এরকম একটি জঘন্য কাজের নমুনা উপস্থিত করতে পারি। এই সরকারের পুলিশ, ছাত্র পরিষদের পুলিশ যে কত নির্মম তার শিকার আমাদের এক ছাত্রবন্ধু, যিনি তাঁর জীবনের অমূল্য একটি বছর হারিয়েছেন। কমরেড অনিমেষ, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে এগিয়ে আসুন।'

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে একটা বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর অনিমেষ আবিষ্কার করল ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। পরমহংস ওর বাহু ধরে বলে উঠল, 'এই তোমার নাম করছে!' ওর কথা যাদের কানে গিয়েছিল তারা অবাক চোখে অনিমেষকে দেখতে লাগল। বিমানের ইচ্ছেটা বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ধাঁধার মতন। ছাত্র পরিষদের ছেলেরা তাকে মেরেছে কি না এই প্রশ্নের জবাবে সভা ডেকেছে বিমান। এখনও সে প্রসঙ্গে না গিয়ে হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকাডাকি কেন ? তার একটা বছর নষ্ট হয়েছে এটা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার, বিমানের এ ব্যাপারে কী বলার আছে! পুলিশ তো তাকে ছাত্র ধারণা করে গুলি করেনি।

বিমান আবার ডাকল, 'অনিমেষ, কমরেড, আপনি এগিয়ে আসুন। এটা দ্বিধা করার সময় নয়, সমবেত ছাত্রবন্ধুদের ব্যাপারটা জানানো দরকার।' বিমানের চোখ বাঁ দিকের থামের কাছে, সেখানে সুদীপকে ব্যস্ত হয়ে কাউকে খুঁজতে দেখা গেল। এ বার অনিমেষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল কেন সুদীপ তাকে ক্লাশে এসে ওখানে থাকতে বলে গেছে। কিন্তু বিমান তো মিটিং ডাকার কথা বলেছে তার ব্যাপারটা জানবার আগেই, তা হলে আসল প্রসঙ্গে না গিয়ে ওকে নিয়ে পড়ল কেন ?

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা এখন উসখুস করছে। ব্যাপারটা যেন খুব মজার, জেনারেল সেক্রেটারি যার নাম ধরে ডাকছে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিমানের মুখ লাল হয়ে উঠেছে এর মধ্যে, পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে সে চার পাশে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ছাত্র অনিমেষকে বলল, 'আপনার নাম কি অনিমেষ ?' ওর বদলে পরমহংস ঘাড় নাড়তে ছেলেটি বলল, 'আপনাকে বিমান ডাকছে শুনতে পাচ্ছেন না ?'

এ বার অনিমেষের মেজাজ গরম হয়ে গেল। তাকে ডাকলেই যেতে হবে ? আর এই পরমহংসটা যদি তার নাম উচ্চারণ না করত তা হলে এতক্ষণে ও পাশ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এখন আরও অনেকের চোখ এ দিকে পড়েছে। কী করা যায় ? পরমহংস চাপা গলায় বলল, 'ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের ভয় পেলে চলে না। সোজা ক্রিজে দাঁড়িয়ে ব্লক করতে শুরু করে দাও।'

এর মধ্যে সুদীপ ওখানে পৌঁছে গেছে। অনিমেষের এক হাত ধরে সে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে লাগল সামনে। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল অনিমেষ, 'আমি কী করব, আমাকে ডাকছেন কেন ?' সুদীপ কোনও জবাব দিচ্ছিল না। বিমান ওদের দেখতে পেয়ে আবার গলায় জোর পেল, 'এই যে, আমাদের বন্ধু কমরেড অনিমেষ এসে গেছেন। কোনও কোনও মানুষ প্রচার চান না, নীরবে কাজ করে যেতে ভালবাসেন, অনিমেষ সেইরকম একজন। অত্যন্ত লাজুক এই ছেলেটি তাই আমার ডাকে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। যা হোক, আমি যে মিথ্যে বলিনি সেটা একটু বাদেই আপনারা বুঝতে পারবেন।'

ততক্ষণে অনিমেষ চাতালের কাছে পৌঁছে গেছে। বিমান এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে চাতালে তুলে দিল। অনিমেষ এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে ওর গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না। বিমান চাপা গলায় বলল, 'ডোন্ট গেট নার্ভাস। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সময়।' কোনও রকমে অনিমেষ বলতে পারল, 'আমি কী করব বিমানদা ?' বিমান কোনও উত্তর না দিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হাত মাথার ওপর তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল। গোলমাল একটু শান্ত হয়ে এলে বিমান আবার কথা শুরু করল, 'বন্ধুগণ, কমরেড অনিমেষ এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। উনি এ বছর বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়া শুরু করেছেন! কিন্তু এই বছর ওঁর সিক্সথ ইয়ার হওয়ার কথা ছিল। কে তার এই সর্বনাশ করল, না আমাদের উপকারী বন্ধু পুলিশ। বিনা প্ররোচনায় সম্পূর্ণ অকারণে অনিমেষকে গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা। যখন অনিমেষ মাটিতে পড়ে একটু নিশ্বাসের জন্য ছটফট করছেন তখনও তারা অত্যাচার থামায়নি। আমাদের সৌভাগ্য যে তবু উনি বেঁচে গেছেন! আপনারা দেখুন, নিজের চোখে সেই বীভৎস অত্যাচারের নমুনা দেখুন। গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, সময় থেমে থাকেনি, কিন্তু সেই রক্তাক্ত অত্যাচার ওঁর শরীরে চিরকালের জন্য ছাপ রেখে গেছে। কোনও ভাঁওতা সেটা মুছে ফেলতে পারবে না। অনিমেষ, আপনি সঙ্কোচ করবেন না, আমাদের ছাত্রবন্ধুদের ওই দাগটি দেখান।'

BanglaBook.org

কুলকুল করে ঘামতে লাগল অনিমেষ। ওর মাথায় আর কিছু ঢুকছিল না। কেন তাকে ওই দাগ দেখাতে হবে এবং সেটা করতে তার ইচ্ছে আছে কিনা এ সব কথা তাকে আলোড়িত করছে না। এখন যে-কোনওভাবে সে নেমে যেতে পারলেই বাঁচে। সামনে সারি সারি মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। পাশে বিমান ছাড়া সুদীপ এবং আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে। বিমান আবার চাপা গলায় কিছু বলল কিন্তু সেটা আর কানে ঢুকছে না অনিমেষের। কিন্তু তার পরনে প্যান্ট আর দাগটা হাঁটুর ওপরে, কী করে সহজ ভঙ্গিতে সেটা এত মানুষকে দেখানো যায়!

সুদীপ বলল, 'বৃষ্টিতে আমরা যে ভাবে প্যান্ট গুটিয়ে রাস্তায় জল ভাঙি সে ভাবেই না হয় প্যান্টটাকে গুটিয়ে নিন কমরেড।'

বক্তৃতা নয়, যেন নাটক দেখছে একটা, ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ হাজার গুণ বেড়ে গেল। ঠেলে ঠুলে চাতালের কাছে আসবার চেষ্টা করত লাগল সবাই, যেন কাছাকাছি হলে ভাল করে দেখা যাবে এবং সে সুযোগ কেউ হারাতে চাইছে না। প্রথমে যত শ্রোতা ছিল এখন তার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

সম্মোহিতের মতো নিচু হয়ে ও প্যান্টের তলায় হাত দিল। একটা একটা ভাঁজ ফেলতে ফেলতে প্যান্টটা হাঁটুর ওপরে উঠে এল। ততক্ষণে ভাঁজগুলো মোটা হয়ে গেছে বেশ, পরের ভাঁজটা করতেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল সামনের মানুষগুলোর মুখ থেকে। তেলতেলে বীভৎস চামড়াটাকে পরমুহূর্তেই আড়াল করে প্যান্টটাকে নামিয়ে আনল অনিমেষ। বিমান ততক্ষণে কথার সুতো ধরেছে, 'বন্ধুগণ আপনারা নিজের চোখে আজ দেখলেন। কিন্তু যারা গুলি করেছিল তারা জানে না ওই বীভৎস চিহ্নটা আগামিকালের একজন সৈনিক তৈরি করে দিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লন কাঁপিয়ে হাততালি উঠল। বিমান চিৎকার করল, 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ', সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল, 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।' সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক—নিপাত যাক নিপাত যাক।' 'দালালদের চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন।'

এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রক্ত অনিমেষের শরীরে যেন ফিরে আসছিল। ক্রমশ অন্ধ রাগ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া কান্না ওর দুটো চোখ ঝাপসা করে দিল। আজ প্রকাশ্যে যে কাজটা সে করল সেটা করার জন্য কোনও রকম মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না। মাঝে মাঝে স্নান করার সময় গোপনে ওই দাগটাকে সে দেখেছে, আঙুল বুলিয়ে সেই যন্ত্রণাকে সে স্পর্শ করেছে, কিন্তু সেটা ছিল তার একদম নিজস্ব ব্যাপার। সেটাকে এমন প্রকাশ্যে হাজির করে সবার করুণা কুড়োতে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা অপমান আছে যেটা এতক্ষণে তার ভিতর বাইরে জ্বলুনি ছড়াচ্ছে। নিজেকে সঙের মতো মনে হচ্ছে এখন। ছাত্র ফেডারেশনের জয়ধ্বনি দিয়ে জমায়েতটা তখনই শেষ হল।

ওরা চাতাল থেকে নেমে এলেও কিছু উৎসুক ছাত্র অনিমেষের চার পাশে ঘিরে ধরল। সবাই জানতে চাইছে কী অবস্থায় পুলিশ গুলি করেছিল, তখন অনিমেষ কী করছিল এবং ব্যাপারটা কত দিন আগে ঘটেছিল—এই সব। বিব্রত অনিমেষকে সরিয়ে আনল সুদীপ। সে ছেলেদের বলল, 'আপনাদের আগ্রহ স্বাভাবিক, কিন্তু অনিমেষ একটু আপসেট হয়ে আছে, প্লিজ এ নিয়ে এখন আলোচনা করবেন না।' সুদীপ যখন ওকে নিয়ে এগোচ্ছে তখনও ছেলেরা পিছন পিছন আসছিল। তা দেখে সে অনিমেষকে বলল, 'ভিনি ভিডি ভিসি। এক দিনেই তুমি হিরো হয়ে গেলে। বাংলাদেশে ফিলম স্টারদেরই এই ভাবে ক্রাউড ফলো করে। কনগ্রাচুলেশনস।' সত্যি বলতে কী, অনিমেষের এখন একা হাঁটতে ভয় করছিল। এত লোক যদি তাকে নানান রকম প্রশ্ন শুরু করে তা হলে সে পাগল হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিমানের সঙ্গে কথা বলা দরকার। এই রকম একটা ব্যাপার করার আগে বিমান কেন তার সঙ্গে পরামর্শ করেনি? সুবাসদা তার সঙ্গে বিমানের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মাত্র, তার মানে এই নয় যে বিমান ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেবে। সুদীপ তাকে যেখানে নিয়ে এল সেটাই যে ইউনিয়ন রুম সেটা বুঝতে সময় লাগল। চতুর্দিকে নানা রকম ফেস্টুন, পোস্টার স্তূপ করে রাখা আছে। বেঞ্চিতে বেশ কিছু ছেলে সরবে আলোচনা করছে। গলার স্বরে বোঝা যায় তারা এখন খুব খুশি। ও পাশের একটা টেবিলে বিমান কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিল, ওদের দেখে হাসল, 'এসো অনিমেষ, প্রথমবার ইউনিয়ন অফিসে আসাটা একটু সেলিব্রেট করি। এই ক্যান্টিনে চা বলে এসো তো।' পাশের একটি ছেলেকে কথাটা বলতেই সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেল।

ওদের দেখে দুটো চেয়ার খালি হয়ে গিয়েছিল। তার একটাতে সুদীপ বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুরুটটা ঠিক করতে লাগল। অনিমেষ বসতেই বিমান বলল, 'তোমাকে অ্যাডভান্স কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে রাখি, নেক্সট ইউনিয়ন ইলেকশনে তোমাকে হারাতে পারে এমন কোনও ক্যান্ডিডেট নেই।'

BanglaBook.org

অনিমেষ হাঁ হয়ে গেল। ইলেকশন ? মানে ইউনিয়নের নির্বাচনের কথা বলছে বিমান ? সে ইলেকশনে দাঁড়াবে ? সে দাঁড়ালে ছাত্ররা তাকে ভোট দেবে ? চট করে বাবার মুখটা মনে পড়ে গেল ওর। কোনও রকম রাজনীতি কিংবা ইউনিয়নের মধ্যে যেতে তিনি পইপই করে নিষেধ করে গেছেন ; এত দিন, স্কটিশে পড়ার এই সময়ে সে কখনওই সেই আদেশ অমান্য করেনি। করেনি তার কারণ শুধু বাবা নন, সে নিজে ব্যাপারটা ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না, পরবর্তী সময়ে দেশের কাজ করার যে ইচ্ছে শৈশবে ওর মনে জন্ম নিয়েছিল পনেরোই আগস্টের সকালে, নিশীথবাবু কংগ্রেসের পতাকার তলায় সেই ইচ্ছেটাকে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সুনীলদা বামপন্থী রাজনীতিতে তাকে আকৃষ্ট করেন। এখন সেই কলকাতায় বিগত কয়েক বছরের অরাজনৈতিক জীবনে সে নিজে মনে মনে অনেক কিছু ভাবত এবং সেই ভাবনাগুলো কংগ্রেস সমর্থনপুষ্ট ছিল না। তাই বলে কমিউনিস্ট পার্টিতে সরাসরি কাজ করবে কি না এ ব্যাপারটা কখনও স্পষ্ট ছিল না। ছাত্র ফেডারেশন করা মানে কমিউনিস্ট পার্টি করা নয়। কিন্তু এত দিনে সে জেনে গেছে যে কোনও ছাত্র সংগঠনের কর্মপদ্ধতি এক-একটা রাজনৈতিক দলের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনিমেষ বিমানকে সরাসরি বলে ফেলল, 'আপনি আজ যে কাজ করলেন সেটা আগে জানলে আমি উপস্থিত থাকতাম না।'

চা এসে গিয়েছিল, কাপটা এগিয়ে দিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল বিমান, 'মানে ?'

'এই ভাবে নিজেকে এক্সপোজ করে সিমপ্যাথি পাওয়া খুব লজ্জার। তা ছাড়া ওই বুলেটের দাগটা পুলিশ আমাকে ছাত্র হিসেবে দেয়নি। ট্রাম পুড়ছিল, ওরা ফায়ার করেছে, আমি আহত হয়েছি মাঝখানে পড়ে গিয়ে। এর সঙ্গে আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই।' অনিমেষ সোজা চোখে বিমানের দিকে তাকাল।

হেসে ফেলল বিমান, 'তুমি নেহাতই ভাল মানুষ। ঠিক আছে, তুমি তো শিশু নও, যখন আমি তোমাকে ডেকে দাগটা দেখাতে বললাম তখন প্রতিবাদ করলে না কেন ?'

মুখ নামাল অনিমেষ, 'তখন কেমন হয়ে গেলাম, আর তা করলে আপনাকে অপমান করা হত—।'

কথাটা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল বিমান। ঘরের সবাই এ বার ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বিমান হাসি শেষ করে বলল, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে তোমার কোনও মানসিক সুস্থিতি নেই। দ্যাখো, মহাভারতেই তো আছে ভালবাসা এবং যুদ্ধে কোনও রকম অন্যায় নেই। শঠতা সেখানে একটা জয়ের কৌশল মাত্র। আমরা চাই সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই সংগঠনের সঙ্গে আসুক যাতে আমরা আরও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারি। সব মানুষ যদি আজ কমিউনিস্ট পার্টির পাশে দাঁড়ায় তা হলে রাতারাতি দেশের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বুর্জোয়া দল তা হতে দেবে না। তারা বাধা দেবে কায়েমি স্বার্থের দুর্গ আগলে রাখতে। তাই এখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধে আনফেয়ার শব্দ অচল। তা ছাড়া পুলিশ যে তোমাকে গুলি করেছে এতে কোনও মিথ্যে নেই, তাই না ?'

ঠাণ্ডা চা মুখে দিতে ইচ্ছে করছিল না। বিমানের কথাগুলোর ঠিক কীভাবে প্রতিবাদ করা যায় বুঝতে না পেরে সে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল। হঠাৎ বিমান কেমন অন্যরকম গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি ইলেকশনে দাঁড়াতে ইচ্ছে নেই ?'

অনিমেষ সরল হয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'কেন ? সুবাসদা বলে গেলেন তুমি আমাদের মত এবং আদর্শকে সমর্থন করো। তা হলে এটাই তো একমাত্র রাস্তা।' বিমান অবাক হল।

'দেশের কাজের সঙ্গে ইউনিয়নের কী সম্পর্ক ?'

'বাঃ, কোনও শিশু কি এক দিনেই হাঁটতে শেখে ? তাকে একটা নিয়মের মধ্যে বড় হতে হয়। ছাত্র ফেডারেশনে সক্রিয় কাজ করতে করতে তুমি ছাত্রদের প্রব্লেম নিয়ে কিছু করতে চেষ্টা করবে। এটাকেই একটা মিনি দেশ ভাবো না কেন! সেই সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের দেশের রাজনৈতিক ফোকরগুলো যদি চিনিয়ে দাও, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি যদি সহানুভূতি আনতে সাহায্য করো তা হলে এরাই যখন পরবর্তী কালে দেশের নাগরিক হবে তখন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকটা সহজ হয়ে যাবে, তাই না ?'

এই সময় আরও কিছু ছেলে এসে বিমানের কাছে দাঁড়াল। ওদের দেখে বিমান অনিমেষকে বলল, 'কমরেড, আজ এই পর্যন্ত, আর এক দিন না হয় আমরা বসব। তুমি মন ঠিক করে নাও। দুর্বলতা থেকে কখনওই কোনও ভাল সৃষ্টি হয় না।'

Banglabook.org

অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল বিকেল শেষ হতে চলেছে। সামনের লন একদম ফাঁকা। কোনও ছাত্রছাত্রী ধারে-কাছে নেই। সাধারণত সে কলেজ স্ট্রিটের দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করে, আজ হেয়ার স্কুলের পাশের রাস্তাটা দিয়ে বেরুল। দরজার সামনেই বিরাট পোস্টার, 'সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, ভিয়েতনাম থেকে হাত ওটাও।' পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা আমেরিকান বেয়নেটের ডগায় ভিয়েতনামি শিশুকে গেঁথে রাক্ষুসে হাসি হাসছে। ছবিটা অনেকক্ষণ দেখল অনিমেষ। ভিয়েতনামের ঘটনা এত দিনে তার জানা হয়ে গেছে। হো চি মিন নামের একজন মানুষের নেতৃত্বে নিরক্ষর অসহায় ভিয়েতনামিরা আজ এক হয়ে আমেরিকান মিলিটারির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ভিয়েতনাম, তবু সেখানে সাম্রাজ্য অটুট রাখার বাসনায় আমেরিকা পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে একটা দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে। কেন ? শুধু ক্ষমতার অহঙ্কার মানুষকে কতটা উন্মত্ত করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ছবিটা মাথায় নিয়ে অনিমেষ হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে চলে এল। ততক্ষণে ওর পরমহংসের কথা মনে পড়ল। সেই সুদীপ যখন ওকে চাতালের দিকে ধরে নিয়ে গেল তারপর আর ওর দেখা মেলেনি। তখন ওর ওপর খুব খেপে গিয়েছিল অনিমেষ কিন্তু এখন আর রাগটা নেই। পরমহংস তো ইচ্ছে করে তাকে বিপাকে ফেলবে বলে নাম ধরে ডাকেনি। ছেলেটার সঙ্গে আজই আলাপ কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে অনিমেষের। খুব সহজ হয়ে ফটাফট কথা বলতে পারে। মনে পড়ল পরমহংস বলেছিল মিটিং থেকে বেরিয়ে কফি হাউসে যাবে, সেখান থেকে টিউশনি। ওর পোশাক দেখে অবস্থা খারাপ বলে মনে হয় না, তবু টিউশনি করে কেন ? অনিমেষের মনে হল বাবার পাঠানো গোনাগুনতি টাকায় তাকে যখন খুব কষ্ট করে চালাতে হয় তখন সেও তো পরমহংসের মতো টিউশনি করতে পারে। কিন্তু তাকে কে টিউশনি দেবে ? কলকাতায় এসে কোনও পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়নি এক দেবব্রতবাবু ছাড়া। পরমহংসকে বললে হয়। অবশ্য জীবনে সে কখনও কাউকে পড়ায়নি, কিন্তু একটু দেখে নিলে স্কুলের যে-কোনও ছাত্রকে না পড়াতে পারার কোনও কারণ নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দেখল ট্রাম-বাসে বেজায় ভিড়। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সাধারণত ও যখন ফেরে তখন ভিড় থাকে না। এখন এখান থেকে ট্রামে ওঠা অসম্ভব। ঠিক উলটো দিকে ইন্ডিয়ান কফি হাউসের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল ওর। পরমহংসকে ওখানে গেলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ছেলেটা যখন দেখল সে একটা বিপদে পড়েছে, তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে মিটিং শেষ না হওয়া অবধি ওর জন্য অপেক্ষা করল না কেন ? কলকাতায় বোধ হয় কেউ কারও বন্ধু হতে পারে না। পরমহংসের ওপর একটু অভিমান জমতে না-জমতেই হেসে ফেলল অনিমেষ। ছেলেটার সঙ্গে আজ দুপুরেই প্রথম আলাপ হল আর সে অনেক কিছু ভেবে বসছে। চট করে নিজের পছন্দমতো ভাবার এই স্বভাবটা যে সে কবে ছাড়তে পারবে!

ট্রামরাস্তা পেরিয়ে সে গলিটার মধ্যে চলে এল। কফিহাউসের দরজার পাশেই এক মাঝবয়সী মানুষ সিগারেট বিক্রি করছে। অনিমেষকে দেখে সে খুব পরিচিত হাসি হাসল। অবাক হল অনিমেষ, লোকটা তাকে চেনে নাকি, এমন ভঙ্গি করছে যেন আগেও দেখা হয়েছে। অনিমেষ মুখ নামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়েও অবাক হয়ে গেল। পর পর অনেকগুলো লিটল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন, প্রত্যেকেই এক-একটা দারুণ বিস্ফোরক সংখ্যা বের করছে বলে দাবি করছে। দোতলায় উঠতে মনে হল একটা বাজার কাছাকাছি রয়েছে। খুব চেঁচামেচি করে কেনা-বেচা চলছে সেখানে। দরজায় দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে গেল অনিমেষ। বিরাট হলঘর জুড়ে টেবিল-চেয়ার আর তাতে ভরতি মানুষ। এত বড় রেস্টুরেন্ট সে কখনও দেখেনি। সবাই একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আর সেই শব্দরাশি অনেক উঁচু ছাদের তলায় পাক খেয়ে অদ্ভুত আওয়াজ তুলছে। অনিমেষ এই ভিড়ের মধ্যে পরমহংসকে দেখতে পেল না। চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরে যাবে বলে ভাবছে, তখন লক্ষ করল কয়েকজন ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। সে মুখ ঘোরাতেই একজন উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বসবেন ?' নিজেদের টেবিল দেখাল সে। একটু ঘাবড়ে গিয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না।

'আপনাকে আজ মিটিং-এ দেখলাম।' হাসল ছেলেটি। 'আপনার কোনও অসুবিধা হয় না?' সে তার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল। অনিমেষ এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চায় না, সে দ্রুত ঘাড় নেড়ে দরজার দিকে ফিরে গেল। খুব বিরক্তি লাগছিল তার, এখন থেকে কত লোককে যে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে! নিজের কোনও গোপন দুঃখ বা যন্ত্রণা যদ্দিন নিজের থাকে সে একরকম, কিন্তু সেটা জানাজানি হয়ে গেলেই তার ধার কমে যায়।

BanglaBook.org

দরজার বাইরে এসে অনিমেষ দেখল ওপরের সিঁড়ি দিয়ে কিছু ছেলেমেয়ে হইহই করে নীচে নামছে। তার মানে তেতলাতেও বসার জায়গা আছে! কৌতূহল নিয়ে অনিমেষ পায়ে পায়ে ওপরে উঠে এল। দু'দিকে দুটো দরজা। ডান দিকেরটা দিয়ে ঢুকতেই লবি মতন একটা জায়গা, দু'পাশে দুটো ব্যালকনি, অনেকটা ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আদলে। তেতলায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি, কারণ প্রতিটি টেবিলে শাড়ি চোখে পড়ছে। ঠিক এই সময় নিজের নাম শুনতে পেল অনিমেষ। চিৎকার করে যে ডাকছে সে পরমহংস তাতে সন্দেহ নেই। অনিমেষ দেখল বাঁ দিকের ব্যালকনির একদম কোনায় একটা বিরাট ফ্যানের সামনে টেবিলে ওরা বসে আছে। পরমহংস আর তিনটে মেয়ে। ও ইতস্তত করে ঘাড় নেড়ে পরমহংসকে উঠে আসতে বললে পরমহংস তেমনি চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে একটা চেয়ার আছে, চলো এসো।'

অপরিচিত মেয়েদের মধ্যে গিয়ে বসতে অনিমেষের সঙ্কোচ হচ্ছিল, কিন্তু এর পরে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনটি মেয়েই এ বার তাকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। অগত্যা পায়ে পায়ে সে ওদের টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খালি চেয়ারটায় কতগুলো বই রাখা ছিল, মেয়েরা সেগুলো তুলে নিতে পরমহংস বলল, 'তুমি তো গুরু বর্ণচোরা আম। প্রথম আলাপে আমাকে এমন ভড়কি দিলে যে আমি ভাবলাম— । যাক, মাঠে নেমেই তা হলে সেঞ্চুরি করে ফেললে! বসো বসো।

পরমহংস সব সময় হাসে কি না বোঝা যায় না দাঁত উঁচু থাকার জন্য। কিন্তু অনিমেষ বুঝল কথাটার মধ্যে একটু ঠাট্টা মেশানো আছে। চেয়ারে বসে সে বলল, 'তুমি না বলে চলে এলে কেন ?'

'যাচ্চলে। তোমাকে ভি আই পি রিসেপশন দেওয়া হচ্ছে আর আমি ফেকলুর মতো দাঁড়িয়ে থাকব। আমি ভাই জনতার লোক, রাজনীতি বুঝি না। তা হঠাৎ এখানে ?'

'তোমাকে খুঁজতে এলাম।'

'সত্যি ?'

'বাঃ, মিথ্যে বলতে যাব কেন ? তখন বললে না কফিহাউসে আসবে।'

'নাঃ, তোমার দ্বারা রাজনীতি হবে না। আজকের ও সব ব্যাপারের পর তো তোমার আমার কথা খেয়ালই করা উচিত নয়। যাক, ও সব ব্যাপারে পরে কথা বলব। তুমি তো এদের কাউকে চেনো না!' পরমহংস মেয়েদের দিকে হাত দেখাল।

এক পলক মুখগুলো দেখে নিয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না। পরমহংস বলল, 'আমিও চিনতাম না, এরা সবাই বাংলা নিয়ে এম. এ. পড়ে, অন্য সেকশনে।'

ওদের মধ্যে যার চেহারা খুব রোগা সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিও কি বাংলা ?'

অনিমেষ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। মেয়েটি বলল, 'বাংলায় এম. এ. যে সব ছেলেরা পড়ে তাদের নিয়ে দারুণ দারুণ গল্প আছে।'

পরমহংস বলল, 'সেই চিড়িয়াখানার বাঘের গল্প তো! ও পুরনো হয়ে গিয়েছে।'

বাকি দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠল পরমহংসের বলার ধরনে। অনিমেষ গল্পটা শুনেছে কিন্তু ও পরমহংসের দিকে প্রশংসার চোখে তাকাল। গল্পটা শুনলেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধকারটা ভারী হয়ে আসে, কিন্তু ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা মজা আছে যে মনটা খারাপ হওয়ার সুযোগ পেল না।

রোগা মেয়েটা পরমহংসকে বলল, 'আপনি পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো ওর সঙ্গে!'

পরমহংস হাত উলটে বলল, 'আমাকে কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ? আমি তো নিজে থেকে আপনাদের টেবিলে এসে জুড়ে বসলাম।'

এ বার আর একটি মেয়ে জবাব দিল, 'আপনি পরমহংস, চোখ-কানগুলো বন্ধ করে রেখেছেন, সবাই তো তা নয়।'

পরমহংস বলল, 'অ। ইনি হচ্ছেন নবনীতা, আত্রেয়ী এবং অনন্যা। আর এর নাম অনিমেষ স্কটিশ থেকে পাশ করেছে। আর খুব বড় নেতা হবার সুযোগ ওর সামনে অপেক্ষা করছে।'

রোগা মেয়েটি, যার নাম আত্রেয়ী, বলল, 'বুঝলাম না।'

পরমহংস বলল, 'যারা ব্রিটিশ আমলে এক দিন জেল খেটেছিল তারাই মন্ত্রী হবার সুযোগ আগে পেয়েছে স্বাধীনতার পর। আর এখন যারা পুলিশের হাতে গুলি খাবে তারা মন্ত্রী হবে আগামিকালে। অনিমেষের পায়ে বিরাট দাগ আছে পুলিশের বুলেটের। ওকে কে মারে!'

তিনজনই অবাক চোখে অনিমেষকে দেখল। অনিমেষ পরমহংসের ওপর রাগতে পারছে না কিন্তু এখানে কিছু বলাও যায় না। আত্রেয়ী বলল, 'আপনাকে পুলিশ গুলি করেছিল কেন ? আপনি কি অ্যাকশন করেছেন কখনও ?'

BanglaBook.org

অ্যাকশন! অনিমেষ ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, 'না, না, ওটা একদম নিছক দুর্ঘটনা। পরমহংস বাড়িয়ে বলছে।' তারপর কথা ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কোন কলেজে পড়তেন ?'

অনন্যা জবাব দিল, 'বেথুন।'

শব্দটা শুনেই অনিমেষের সেই চোখ দুটো মনে পড়ল। পরমহংস বলছিল সেও নাকি বেথুন থেকে এসেছে। অনিমেষ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কলেজে কি বাংলার ছাত্রী বেশি ?'

আত্রেয়ী জবাব দিল, 'না আমরা পাঁচজন এক সেকশনে আছি। অন্য সেকশনে আরও ন'জন আছে। সবসুদ্ধ চোদ্দো, কেন ?'

প্রশ্নটা অনিমেষকে একটু বিপাকে ফেলে দিল। সে একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, 'না মানে, আরও কয়েকজন বেথুন থেকে এসেছেন শুনে মনে হল ওখানে বাংলার ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি।'

আত্রেয়ী বলল, 'কী বোকা বোকা কথা বলছেন, চোদ্দোজন মোটেই বেশি নয়।'

নবীনতা বলল, 'আর কাদের কথা শুনেছেন ?'

অনিমেষ পরমহংসের দিকে তাকালে সে চোখ টিপে বলে উঠল, 'ছাড়ো তো যত আজেবাজে কথা। অনিমেষ, মেয়েদের কাছে মেয়েদের সম্পর্কে কখনও কৌতূহল দেখাবে না।'

আত্রেয়ী বলল, 'আপনার খুব অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে ?'

পরমহংস মাথা নেড়ে বলল,'শরৎচন্দ্র থেকে বিমল মিত্তির আমি গুলে খেয়েছি।'

কথা বলার ধরনে সবাই হেসে উঠলে অনিমেষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হঠাৎ পরমহংস অনিমেষকে চটজলদি বলে উঠল, 'এই, চোখ বন্ধ করো তো।'

'কেন ?' অনিমেষ অবাক হল।

'করো না! একটা মজার জিনিস বলব। এই কফি হাউসটা এককালে বক্তৃতার জায়গা ছিল। বড় বড় নেতারা এখানে বক্তৃতা দিতেন। এর নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। সেই সব বক্তৃতা নাকি সারা দেশে সমুদ্রের ঢেউ তুলত। এখনও এত দিন বাদে এই কফিহাউসে বসে সেই সমুদ্র গর্জন শুনতে পাবে।' পরমহংস বলল।

সবাই একসঙ্গে অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'কী রকম ?'

পরমহংস ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে বলল, 'প্রথমে দুটো কান হাতের চেটোয় চেপে ধরো, ধরেছ, হ্যাঁ, এ বার চোখ বন্ধ করো। এক মিনিট বাদে চোখ না খুলে কান থেকে হাত সরিয়ে নাও।'

ওর কথামতো ওরা ঠিকঠাক করে গেল। চারজনই একসঙ্গে এ রকম ব্যাপার করছে—দৃশ্যটা ভেবে হাসি পাচ্ছিল অনিমেষের। কিন্তু সে যখন কান থেকে হাত সরিয়ে নিল চারপাশে কেমন গুমগুম শব্দ শুনতে পেল। যেন কিছু গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আর আসছে। এটা যে বিভিন্ন টেবিল থেকে ওঠা কথার আওয়াজ সেটা বুঝে বেশ মজা লাগছিল ওর। এমনি আচমকা টের পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ কান বন্ধ থাকায় ব্যাপারটা এই চেহারা নিয়েছে।

পরমহংস বলল, 'কী, সমুদ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে ?'

চোখ খুলে অনিমেষ হেসে বলল, 'আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি, তাই ঠিক—।'

অনিমেষের কথা আটকে গেল। ও দেখল একটি ছেলের সঙ্গে নীলা ওপাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই কয় বছরে নীলার স্বাস্থ্য ভরাট হয়ে অন্য রকম আদল এনেছে। ওর সঙ্গের ছেলেটিকে সে কখনও দেখেনি। খালি টেবিল না পেয়ে নীলা চারপাশে চোখ বোলাতে অনিমেষকে দেখতে পেল। যেন নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না নীলার চোখমুখের অভিব্যক্তি এইরকম।

সাত

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়েছিল। নীলাকে অনেক দিন বাদে দেখছে সে। ওর সেই প্রেমিকের অনুরোধের পর আর যাওয়া হয়নি দেবব্রতবাবুর বাড়িতে। কিন্তু নীলার সঙ্গে এখন যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে সে কে ? ওর প্রেমিকের নামটা মনে করতে চেষ্টা করল অনিমেষ। হ্যাঁ, শ্যামল, শ্যামল এখন কোথায় ? শ্যামলের সঙ্গে নীলার কি সম্পর্ক তৈরি হয়নি ? না হলে শ্যামল আত্মহত্যা কিংবা খুন দুই-ই করতে পারে বলে মনে হয়েছিল তখন। সেরকম কিছু হলে অবশ্যই কাগজে খবরটা পড়ত সে।

এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অভদ্রতা। অনিমেষ পরমহংসকে বলল, 'আমি একটু আসছি।'

চেয়ারগুলো বাঁচিয়ে নীলাদের কাছাকাছি আসতেই সে একটা ঠাট্টার গলা শুনতে পেল, 'আরে ব্বাস, আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি কি ঠিক দেখছি ?'

BanglaBook.org

অনিমেষ হেসে বলল, 'এত অবাক হবার কী আছে ? এখানে তো সবাই আসতে পারে। তারপর ?'

'আগে তো কখনও এখানে দেখিনি!' নীলার বিস্ময় যেন কাটছিল না।

'আমি আজ প্রথম এলাম।' জানাল অনিমেষ, 'এসে অবশ্য মাথা ধরে যাচ্ছে। কী চিৎকার চেঁচামেচি, লোকে বসে থাকে কী করে!'

নীলার সঙ্গী বলল, 'আপনি আজ প্রথম এলেন ? অবশ্য প্রথম দিন ওরকম মনে হয়, পরে এমন নেশা ধরে যায় এখানে না এলে ভাল লাগে না। বাংলা সাহিত্য শিল্পের আঁতুড়ঘর হল কফিহাউস। এখানে লিটল ম্যাগাজিনের আন্দোলন করে এক-একজন বড় সাহিত্যিক হয়েছেন। রোজ এলে বুঝবেন নেশার ধরনটাই আলাদা।'

নীলা তখনও একদৃষ্টে অনিমেষকে দেখছিল। সেটা লক্ষ করে অনিমেষ বলল, 'বাবা কেমন আছেন ?'

'আমার সঙ্গে কখনও দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবে বলে এতদিন অপেক্ষা করছিলে ? জানতে ইচ্ছে করলে তো নিজেই যেতে পারতে।' নীলা চোখ সরাচ্ছিল না।

'আসলে যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে ওঠে না।' অনিমেষ পাশ কাটাতে চাইল।

এইসময় একটা টেবিল খালি হতেই নীলার সঙ্গী দ্রুত গিয়ে সেটা দখল করে ডাকল, 'চলে আয়, ভ্যাকেন্সি হয়ে গেছে।'

নীলা হেলতে দুলতে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। অনিমেষ লক্ষ করল নীলাকে একজন পূর্ণযুবতী মহিলার মতো দেখাচ্ছে। বালিকাদের শরীরে যে সব ছেলেমি ভাব থাকে তার বিন্দুমাত্র ওর মধ্যে নেই। ভরাট লাবণ্যময়ী নদীর মতো শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে গেল নীলা। ওই টেবিলে যে সব মেয়ে এখনও বসে আছে তারা কেউ এখনও এই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। নীলাকে এখন চট করে ফিল্ম স্টার অথবা বনেদি বাড়ির বউ হিসেবে ভেবে নেওয়া যায়।

নীলাদের টেবিলে গিয়ে বসবে, না পরমহংসদের কাছে ফিরে যাবে, দোমনা করছিল অনিমেষ। এত দিন বাদে নীলাকে দেখে ভাল লাগছে, ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আবার পরমহংসদের টেবিলে ফিরে গেলে এক ফাঁকে ওকে টিউশনি জোগাড় করে দেবার কথা বলে রাখা যেত। সামান্য আলাদা রোজগার এখন বিরাট সাহায্যের হবে। অনিমেষ দেখল নীলা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। অনিমেষ ঠিক করল প্রয়োজন তো চিরকাল থাকবে কিন্তু এই মুহূর্তের ইচ্ছেটাকে জোর করে দাবিয়ে রাখা আরও মুর্খামি। সে নীলাদের টেবিলে এসে বসল। নীলা এখনও হাসছে। দুটো উজ্জ্বল চোখ কী রকম কৌতুকে হেসে ওঠে।

অনিমেষ একটু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কী হল ?'

নীলা ঘাড় কাত করে আরও একটু দেখে নিয়ে বলল, 'কলকাতার জল পেটে পড়লে কী রকম পরিবর্তন হয় তাই দেখছি।'

নীলার সঙ্গী বলল, 'তোর মাইরি এই পেছনে লাগা হ্যাবিটটা গেল না।'

নীলা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'চেহারা অনেক চকচকে হয়েছে, চোখের চাহনি, কথাবার্তা এবং মাথার চুল অনেক মার্জিত হয়েছে। মোটামুটি কলকাতা শহর তোমাকে একজন প্রেমিকের চেহারা দিয়ে দিয়েছে।'

অনিমেষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'চমৎকার আবিষ্কার।'

হঠাৎ নীলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'কফি হাউসে প্রথম দিন এসেই ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারতে আরম্ভ করেছ। তোমার মেয়ে-ভাগ্য খুব ভাল দেখছি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল অনিমেষ। কোনও মেয়ে এরকম কথা ছেলেদের সঙ্গে বলতে পারে ? কথাটা এমনিতে মনে হয় নিরীহ কিন্তু অশ্লীল ইঙ্গিতটুকু তো এড়ানো যায় না।

নীলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করল, 'কলকাতায় প্রথম এসে অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলে। আজ অবধি কেউ কখনও শুনেছে কোনও নার্স গায়ে পড়ে একজন পেশেন্টের খবর তার পরিচিতের কাছে পৌঁছে দেয় ? তারপর যখন জ্ঞান এল তখন চোখ খুলেই আমাকে দেখতে পেলে। অবশ্য তখন তোমার চোখের দৃষ্টি ছিল নিপাট ভালমানুষের। এর পর এত কলেজ থাকতে বেছে বেছে স্কটিশে ভরতি হওয়া হল। কফি খাবে তো ?'

একই ভঙ্গিতে শেষ প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে অনিমেষ চট করে জবাব দিতে পারল না। ও দেখল পিছনে একটা উর্দিপরা বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে।

BanglaBook.org

উত্তরের অপেক্ষা না করে নীলা তিনটে কফি দিতে বলল। তারপর হেসে অনিমেষকে জানাল, 'অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম বিপ্লবীকে। যদি বাসনা থাকে তবে প্রমীলা-রাজ্যে ফিরে যেতে পারো।'

নীলার সঙ্গী বলল, 'বাঃ, কফি বলে দিয়ে এখন যেতে বলছিস কেন ?'

নীলা বলল, 'আমি তো যেতে বলছি না। বলেছি যদি চায় তো যেতে পারে, কি, তাই বলিনি অনিমেষ ? এ কী, এমন ঝিমিয়ে গেলে কেন ?'

নীলার বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল অনিমেষ। মেয়েরা খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে কথা বললে তাদের একটা সৌন্দর্য আসে। নীলাকে তাই এখন সুন্দরী দেখাচ্ছে। কোনও ওপরচালাকি নয়, নীলা যে কথাগুলো বলল প্রতিটির ওপর যেন পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল ওর। অনিমেষ খুব আস্তে আস্তে অথচ স্পষ্ট গলায় বলে ফেলল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে নীলার ভ্রূ দুটোয় কুঞ্চন লাগল। আর নীলার সঙ্গী হো হো করে হেসে বলে উঠল, 'রাইটলি সার্ভড। নীলা, এ-ভাবে তোকে রিটার্ন দিতে আর কাউকে দেখিনি।'

নীলা গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'যা ভেবেছিলাম তা তো নয়। কলকাতার জল যে এরকম ভিজে বেড়াল করে দেয় তা জানতাম না। তা বেশ, আমাকে সুন্দর দেখে কী করতে ইচ্ছে করছে ?'

অনিমেষ কথাটা একদম না ভেবে উচ্চারণ করেছিল। সত্যি, নীলাকে ওর খুব সুন্দরী মহিলা মনে হচ্ছে। সামান্য মোটা হওয়ায় চাপা গায়ের রঙের ওপর শোভন পালিশ এসেছে। মুখের কোথাও দাগ নেই, বুকের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হয়। কিন্তু কথাটা নিয়ে এমন ঠাট্টা জুড়ে দেবে নীলা সেটা বুঝতে পারলে সে সতর্ক হত। ও দেখল নীলার সঙ্গে কথা বললে খুব স্মার্টলি বলতে হবে যাতে ওকে কোনও সুযোগ না দেওয়া হয়। আক্রমণই খুব বড় প্রতিরোধ। সে মুখ তুলে বলল, 'বেড়াল তো চিরকাল ভিজে থাকে না যদি তার গায়ে জল ঢেলে না দেওয়া হয়। আমি তো কোনও বেড়ালকে সাধ করে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখিনি। তা তুমি যদি এরকম চেহারা করতে পারো তো আমি নাচার, বলতেই হবে।'

'কী রকম চেহারা ?' নীলা ঠোঁট কামড়াল।

'বেশ বুক-থমথমে চেহারা।' অনিমেষ সাহসী হল।

'প্রেমে পড়ে গেছ ?'

অনিমেষ খুব জোর সামলে নিয়ে বলল, 'পড়ে গেলে তো হাত পা ভাঙবে, তখন কি আর উপভোগ করা যায় ? তার চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাওয়া ভাল।'

নীলা আচমকা চোখ বন্ধ করল, তারপর বলল, 'শ্যামলের সঙ্গে এক দিন দেখা হয়েছিল ?'

অনিমেষ অভিনয় করল, 'শ্যামল ? কোন শ্যামল ?'

নীলা বিরক্তি-চাপা গলায় উত্তর দিল, 'আমার এক বন্ধুর দাদা যার কথা এক দিন বলেছিলাম।'

অনিমেষ নীলার সঙ্গীর দিকে তাকাল। ছেলেটার মুখচোখ ভদ্র, দু' আঙুলে সিগারেট চেপে ওদের কথা শুনছে। এর সঙ্গে নীলার সম্পর্কটা কী ধরনের ? দু'জনে যদি প্রেম-ট্রেম করে তবে তুই-তোকারি করছে কেন ? ছেলেটার চোখের চশমা বেশ পুরু কিন্তু মুখের আদলে এখনও কৈশোর মাখানো। শ্যামলের প্রসঙ্গ নীলা ওর সামনে তুলতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করছে না যখন তখন অনিমেষ স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। সে বলল, 'হ্যাঁ, একটি ছেলে যে নিজের নাম বলেছিল শ্যামল, আমার কাছে এসেছিল।'

'কী কথা হয়েছিল ?'

'ঠিক মনে নেই, অনেক দিন হয়ে গেল। কেন ?'

'তোমার কি বলতে আপত্তি আছে ?'

'না, না। মনে আছে, খুব পাগলামো করেছিল। তোমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা কিংবা খুন অথবা এ দুটোই করতে পারে বলে জানিয়েছিল।'

'কোনওটাই করেনি এবং করবে না সেটা জানতাম।' নীলা হাসল।

'কী রকম ?'

'যারা প্রেম প্রেম বলে গলাবাজি করে তাদের সেটা তলানিতে ঠেকে গিয়েছে।'

অনিমেষ নীলাকে পূর্ণ চোখে দেখল। কী নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো উচ্চারণ করল ও। চোখ না সরিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'শ্যামলের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই ?'

'আশ্চর্য! এত কথার পর এই প্রশ্নটা তোমার মাথায় এল ?' অনুযোগের ভঙ্গিতে অনিমেষকে একবার দেখে নিয়ে বেয়ারাকে জায়গা করে দিল নীলা কফির কাপ রাখতে।

BanglaBook.org

অনিমেষের খুব জানতে ইচ্ছে করছিল কেন নীলা শ্যামলকে ত্যাগ করেছে? যে প্রেমের জন্য শ্যামল অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল সেই প্রেমে কি সততা ছিল না? সৎ না হলে মানুষ কখনও বুকের ভেতর থেকে কথা বলতে পারে? নাকি নীলাই শ্যামলকে নিয়ে খেলা করেছে, খেলার ইচ্ছে শেষ হলে আর সম্পর্ক রাখেনি। ওর মনে পড়ল শ্যামল সেদিন জানিয়েছিল নীলা নাকি অনিমেষের অনুরক্ত। সে কথা নীলাই শ্যামলকে জানিয়েছে। ব্যাপারটা যে হাস্যকরভাবে মিথ্যে, এ কথা শ্যামলকে বলেছিল অনিমেষ।

নীলা এখন কফি করছে কিন্তু তার হাবভাবে একটুও আগের আলোচনার ছায়া নেই। খুব সহজে, যেন একটা বাসে চেপে কিছু দূর এগিয়ে অন্য বাস ধরার মতো প্রসঙ্গ পালটে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি ওর। অনিমেষ ভাবল নীলাকে এ বার সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে কেন তার নাম করে সে শ্যামলকে অজুহাত দেখিয়েছিল? নীলার সঙ্গে তো সেরকম সম্পর্ক তার কোনও দিন গড়ে ওঠেনি!

কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে নীলা বলল, 'থাক ছেড়ে দাও ও সব কথা। তুমি কেমন আছ বলো?'

'ভালই।' কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে অনিমেষের খেয়াল হল তার পকেটে খুব সামান্য পয়সা পড়ে আছে। যদি নীলা তাকে দামটা দিয়ে দিতে বলে তা হলে খুব ফ্যাসাদে পড়ে যাবে সে। এই কফির কাপগুলোর দাম তার জানা নেই।

নীলা বলল, 'মিষ্টি ঠিক হয়েছে? তোমাকে বাড়িতে দু' চামচ দিতাম।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

এতক্ষণে নীলার বন্ধু কথা বলল, 'আপনি কি স্কুল থেকেই ছাত্র ফেডারেশন করছেন?'

অনিমেষ অবাক হল, 'ছাত্র ফেডরেশন? না তো! আমাদের স্কুলে ও সব ছিল না।'

নীলা বলল, 'ও জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ত। মফস্বলের ছেলে খুব তাড়াতাড়ি কালার চেঞ্জ করে, কলকাতায় এলে কোনও থিয়োরি খাটে না।'

অনিমেষ বলল, 'অনর্থক গালাগাল দিচ্ছ। আমি কোনও কালেই পার্টি করিনি।'

ছেলেটি এবার হেসে উঠল, 'তাই নাকি? কিন্তু আপনার মিথ্যে কথাটা খুব কাঁচা হল।'

'মিথ্যে?' অনিমেষ উত্তেজিত হল, 'আপনি আমার চেয়ে আমাকে বেশি জানেন?'

'তা কী করে সম্ভব?' ছেলেটি হাসল, 'কিন্তু একটু আগে আমরা আপনাকে দেখে এসেছি। সাধারণ কোনও ছেলে হলে বিমান অমন ভেল্কি দেখাত না।'

অনিমেষ বুঝতে পারল আজ বিকেলে ইউনিভার্সিটি লনের ঘটনাটা ছেলেটি দেখেছে। আমরা বলতে কি নীলাও ওর সঙ্গে ছিল? কিন্তু এতক্ষণ ও বিষয়ে নীলা কোনও কথা বলেনি কেন?

নীলা অনিমেষকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি।'

ছেলেটি নীলাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আলাপ অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। আমার নাম শচীন, আপনার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র। আপনার নাম আজ ইউনিভার্সিটির সবাই জেনে গিয়েছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না আপনার ভূমিকাটা কী, হিরো অর ক্লাউন!'

নীলা বলল, 'সিনিয়র বলে বাড়তি কিছু দাবি করার চেষ্টা কোরো না। অনিমেষ অ্যাকসিডেন্টের জন্য একটা বছর নষ্ট করেছে। আসলে ও আমাদের ব্যাচের।'

শচীন বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট? মানে বিমান যে ঘটনাটাকে ক্যাপিটাল করল?'

নীলা ঘাড় নাড়ল।

অনিমেষ শচীনকে খুব ঠাণ্ডা এবং নিরীহ বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখন এই স্থির কথাবার্তা বলার ধরনে ওর ধারণা পালটে গেল। ছেলেটা প্রসঙ্গ পেলে খুব অ্যাগ্রেসিভ কথাবার্তা বলে, তখন তার হুল গভীরে বিদ্ধ হয়। বিমান সম্পর্কে যে বক্রোক্তি শচীন করল তা থেকে মানে এইরকম দাঁড়ায় সে ছাত্র ফেডারেশনের সমর্থক নয়। কিন্তু নিরাসক্ত হলে কেউ আক্রমণ করে না, তা হলে সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও দলকে সমর্থন করে।

অনিমেষ এবার নীলাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আজ ওখানে ছিলে?'

নীলা কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

'তোমার কী রি-অ্যাকশন?'

'কোনও রি-অ্যাকশন নেই। কারণ, পৃথিবীতে একটি জিনিসের ওপর আমার কোনও আগ্রহ নেই, সেটা পলিটিকস।'

BanglaBook.org

অনিমেষ একটু জেদি গলায় বলল, 'পলিটিকস ছেড়ে দাও, ছাত্র ফেডারেশনের সভায় বিমান আমাকে ডেকে মঞ্চে তুলে সবাইকে বুলেট মার্ক দেখাল, তুমিও দেখলে, তাতে তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি ?'

নীলা হেসে বলল, 'এমন প্রশ্ন কোরো না যার মাথামুণ্ডু নেই। একটা ইয়াং ছেলের পুরুষ্টু থাই দেখতে কোন মেয়ের খারাপ লাগবে ?'

বজ্রাহতের মতো বসে থাকল অনিমেষ। এরকম একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে আর নীলা কী অকপটে অন্য কথা বলে ফেলল। তখন সবার সামনে দাঁড়িয়ে যা হয়নি এই মুহূর্তে অনিমেষ আবিষ্কার করল ওর দু' কানে রক্ত জমছে গরম হয়ে যাচ্ছে। শচীন হেসে ফেলল নীলার উক্তি শুনে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা নীলার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত। স্কটিশচার্চে মেয়েদের মুখে শালা শুনেছে অনিমেষ। ত্রিদিব বলে কোনও কোনও মেয়ে নিজেদের মধ্যে এত মুখ খারাপ করে কথা বলে যে ছেলেরা শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। হয়তো ঠিক। কিন্তু নীলা যে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথাটা বলল তাতে কোনও অন্যায়বোধ মাখানো নেই কিন্তু মেয়েদের মুখে শুনতে অস্বস্তি হয়।

শচীন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কী রি-অ্যাকশন ?'

অনিমেষ শচীনকে বলল, 'দেখুন, আমি কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম। যেদিন এলাম সেদিন এখানে প্রচণ্ড গণ্ডগোল। যারা আন্দোলন করছিল তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছিল। কিন্তু আমার এক হাতে বেডিং অন্য হাতে স্যুটকেস, আমি যে বোম ছুড়তে যাচ্ছিলাম না তা একটি বালকও বুঝবে, তবু পুলিশ আমাকে গুলি করল। গুলিটা আর একটু ওপরে লাগলে আজ এই কথাগুলো আমি বলার সুযোগ পেতাম না। কী দোষ ছিল আমার ? পুলিশ যদি আমায় অ্যারেস্ট করে প্রশ্ন করত তা হলেই জানতে পারত সত্যি কথাটা। আমার জীবন, আমার ক্যারিয়ার নিয়ে ছেলেখেলা করল ওরা। এমনকী হাসপাতালে পুলিশ যে সব প্রশ্ন করেছে, যে ভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে, আমি তা কখনও ক্ষমা করতে পারব না। আপনি বলছেন হিরো না ক্লাউন আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার বুলেটের দাগ যদি আরও কিছু ছেলের মন তৈরি করতে সাহায্য করে তা হলে আমার ক্লাউন সাজতে আপত্তি নেই।'

কথাগুলো এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল যে অনিমেষ নিজেই অবাক হয়ে গেল। সামান্য আগেও সে ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে ভাবেনি। বিমানের ঘটনাটা তার মনে খুব অস্বস্তি এনে দিয়েছিল, রাগও হয়েছিল তার। কিন্তু যেই শচীন এটা নিয়ে ব্যঙ্গ করল সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই একটা প্রতিরোধ তৈরি হয়ে গেল। আর কিছু না হোক, তার জীবনের একটা বছর সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে ওই গুলিটার জন্যে এ কথা তো ঠিক।

শচীন কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বলল, 'আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না।'

অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল, 'তার মানে ?'

শচীন বলল, 'আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই এই সত্য ভুলে গিয়ে যদি আপনি হাত পুড়িয়ে আগুনকে গালাগালি দেন তা হলে সেটা হাস্যকরই হবে। আপনি যখন দেখলেন পুলিশের সঙ্গে কিছু লোকের সংঘর্ষ চলছে, বোম ফাটছে, তখন আপনার সেই স্পটে যাওয়াটাই তো অন্যায়। গোলমালের মধ্যে পুলিশের পক্ষে কী করে জানা সম্ভব কে নির্দোষ, কে দোষী ?'

অনিমেষ বলল, 'আমি সেদিনই প্রথম কলকাতায় এসেছি, এখানকার হালচাল কিছুই জানতাম না। তা ছাড়া—।'

নীলা এতক্ষণে কথা বলল, 'শুনেছিলাম সেদিন কার্ফু ছিল এবং তুমি দৌড়চ্ছিলে।'

অনিমেষ বলল, 'ওরকম পরিস্থিতিতে না দৌড়ে উপায় ছিল না।'

শচীন বলল, 'তা হলে বুঝুন। কার্ফুতে বাইরে বেরিয়ে আপনি প্রথম অন্যায় করেছেন। সে সময় পুলিশ স্বচ্ছন্দে আপনাকে গুলি করতে পারে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে। মুশকিল হল, আমরা নিজেদের ত্রুটিগুলো কখনওই লক্ষ করি না।'

অনিমেষ অস্বস্তিতে পড়ল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এ দিক দিয়ে চিন্তা করলে শচীনের যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছে না অনিমেষ। দেশের মানুষ খাবারের জন্য সরকারকে অনুরোধ করে সাড়া না পেয়ে ফুঁসে উঠেছিল। সরকার তাদের খাবার না দিয়ে কার্ফু জারি করে পুলিশ লেলিয়ে দিল—এই ব্যাপারটাই মেনে নেওয়া যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে আপনি পুলিশের কাজকর্ম সমর্থন করছেন ?'

BanglaBook.org

'এই ক্ষেত্রে করছি, তবে সব সময় যে পুলিশ গঙ্গাজল হয়ে থাকে তা বিশ্বাস করি না। এরকম ঘটনার প্রচুর নিদর্শন আছে। একটা সরকার—যেটা জাতীয় সরকার—তার কোনও ভাল কাজ নেই এ হতে পারে না। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা ছিল ? আজ যদি ওরা ক্ষমতায় আসে দেশের মানুষের সব অভাব এক দিনে দূর হয়ে যাবে ? প্রতিটি মানুষ সৎ বিবেকবান নাগরিক হয়ে যাবে ? পুলিশ তার চরিত্র পালটাবে ? নেভার। পুলিশ চিরকাল পুলিশই থাকবে। দু শো বছর ধরে ইংরেজ এই দেশ থেকে যে জিনিসটা সযত্নে মুছে দিয়ে গেছে সেটা হল প্রশাসনযন্ত্রের মর‍্যালিটি। সেটা ফেরত পাওয়া খুব সোজা ব্যাপার নয়, অনিমেষ।' শচীন খুব শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

অনিমেষ বলল,'তাই বলে নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাতে হবে ?'

শচীন হেসে ফেলল, 'দরকার হলে করতে হবে বইকী। লেনিনকে পৃথিবীর সব মানুষ শ্রদ্ধা করে। লেনিন একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব: নিজের হাতে দেশ গড়েছেন। কমিউনিস্টরা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে। ওয়েল, বিপ্লবের পর সেই লেনিন কী বলেছিলেন ? রাশিয়ায় তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। এ দিকে যেখান থেকে খাবার আসবে সেখানে গোলমাল শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রেলওয়েম্যানরা ধর্মঘট শুরু করেছে। ধর্মঘট যে-কোনও শ্রমিকের হাতিয়ার—এ কথা লেনিন এক সময় বলেছেন। তাই কিছু করা যাচ্ছে না। সেই মুহূর্তে এমন সময় নেই যে ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দ্রুত ফয়সালা করা যায় দাবিগুলোর। লেনিনকে জানানো হলে তিনি বললেন ওদের ধর্মঘট তুলে নিতে বলো। যদি তা না করে তা হলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো। দেশের সাধারণ মানুষ যখন অনাহারের সম্মুখীন তখন তাদের কথাই আগে ভাবতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজনে গুলি চালাতে যেন পুলিশ কোনও দ্বিধা না করে। মনে রাখবেন কথাগুলো লেনিনের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। খাদ্য নিয়ে তিনি কমিউনিস্ট থিয়োরিতে বিশ্বাস করেননি। এই ভূমিকা যদি এ দেশের সরকার নেন তা হলে চিৎকার উঠবে ফ্যাসিস্ট ফ্যাসিস্ট বলে। আমার জানতে ইচ্ছে হয় আপনারা কী চান ? একটা সুখী ভারতবর্ষ, না নিজেদের জগাখিচুড়ি মতবাদের প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে মুনাফা ?'

অনিমেষ মন দিয়ে শচীনের কথা শুনল। লেনিনের এই কাজ সে অকপটে সমর্থন করছে, ব্যাপারটা তার ভাল লেগেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইজমের চেয়ে মানবতা অনেক বড়, এই সত্য লেনিন মেনে নিয়েছিলেন বলে সে খুশি হল। চোখ বন্ধ না করেই সে দেখতে পেল খাদ্যবাহী একটি গাড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার মুখে ধর্মঘটি শ্রমিকেরা বাধা দিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য এর ফলে নতুন সরকার নিশ্চয়ই দাবি মেনে নেবে। লেনিনের নির্দেশে পুলিশ তাদের বুঝিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি। ধর্মঘট যেহেতু শ্রমিকের হাতিয়ার ওরা নির্ভয় ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে পুলিশ গুলি চালাল। অবাক শ্রমিকের চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনগুলো বেরিয়ে আসছে স্টেশন থেকে। দেশের না-খেতে-পাওয়া মানুষের দরজায় খাবার পৌঁছে দিতে ট্রেনটি গর্জন করে ছুটে যাচ্ছে। ছুটন্ত ট্রেনটির নাম মানবতা।

শচীন এবং নীলা অনিমেষকে লক্ষ করছিল। অনিমেষের হুঁশ হতে সে অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। ইদানীং এই ব্যাপারটা বেড়ে গেছে। কথা বলতে বলতে বা একা একাই হঠাৎ কোনও প্রসঙ্গ বা ঘটনা মন ছুঁয়ে গেলেই নিজের অজান্তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাস্তব থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয় তখন। কফি খেতে খেতে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী যেন বলছিলেন ?'

শচীন আবার বলল, 'আপনি কেন রাজনীতি করবেন ? একটা সুখী ভারতবর্ষ পেতে, না কতগুলো ফর্মুলার পিছনে ছুটতে ? মার্কস, মাও সে তুং কিংবা লেনিন যে কথা বলেছিলেন সেই নির্দেশিত পথে এই দেশকে মানুষ করতে চান ?'

অনিমেষ বলল, 'কেন নয় ? ওঁরা তো সেভাবেই নিজেদের দেশ গড়েছেন।'

এতক্ষণ নীলা একটাও কথা বলেনি। হঠাৎ সে ঘাড় নেড়ে বেয়ারাকে ডেকে দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার কথা বলো, আমি যাচ্ছি।'

অনিমেষ অবাক হল, 'মানে ?'

'মাথা ধরে গেছে। এই সব ইউজলেস কথাবার্তা বলে তোমরা কী আনন্দ পাও জানি না, কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। অনর্থক সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই।' নীলা ব্যাগ হাতে তুলে নিল।

শচীন বলল, 'কিন্তু তুই কোথায় চললি ? এরকম তো কথা ছিল না।'

নীলা বলল, 'কোনও কথা কি আদৌ ছিল ?'

শচীন বলল, 'না, আমি ভেবেছিলাম তুই আমার সঙ্গে সেখানে যাবি।'

BanglaBook.org

'না, আজ আর ভাল লাগছে না। এখন একটু রাস্তায় হাঁটব।' নীলা বলল।

'আমি সঙ্গে যাব?' শচীন উঠে দাঁড়াল।

'না। একা একা হাঁটতেই ভাল লাগবে। অনিমেষ—।' নীলা ফিরে তাকাল।

অনিমেষও উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না নীলাকে। এতক্ষণ কথা বলার নেশায় নীলার কথা সত্যি ভুলে গিয়েছিল সে। মেয়েরা কি উপেক্ষা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না? এতক্ষণ চুপ করে থেকে নীলা আচমকা ওর অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য উঠে চলে যাচ্ছে! সে নীলার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'বলো।'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল!' নীলা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল।

'বলো।'

'এখন নয়।'

'ও, এখন তো তুমি একা একা হাঁটবে।' নীলার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ হাসিটা জিইয়ে রাখল।

নীলা দুটো চোখ বড় করে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কাল চারটে নাগাদ ইউনিভার্সিটির সামনের বাস স্ট্যান্ডে এসো।'

নীলা আর দাঁড়াল না। শচীনকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। সেটা লক্ষ করে অনিমেষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

কাঁধ নাচালো শচীন, 'ও এইরকম। কোনওভাবেই অ্যাসেসমেন্ট করা যায় না। আমরা যারা ওর খুব ঘনিষ্ঠ তারাও ওকে বুঝতে পারি না। বরফের মতো। মুঠোয় ধরে অনুভব করতে করতেই জল হয়ে আঙুল গলে বেরিয়ে যায়। যাক, ছেড়ে দিন এ সব কথা। আপনি তা হলে এর আগে কখনও অ্যাকটিভ পার্টি করতেন না?'

প্রসঙ্গ ফিরে আসায় অনিমেষ অবাক হল, 'না।'

'আমার যুক্তি আপনার কেমন লাগল?'

'সমস্ত যুক্তির পাল্টা যুক্তি আছে।'

'বেশ। এক দিন আসুন না, আরেও খোলাখুলি আলোচনা করা যাবে।'

'আচ্ছা।' অনিমেষ হাসল, 'আলোচনা করতে কোনও অসুবিধা নেই।'

শচীন বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে কফি হাউসের দিকে তাকাল। চারধার গমগম করছে। প্রতিটি টেবিলের একান্ত কথা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে এই হলের মধ্যে ছোটাছুটি করছে। অনিমেষ দেখল পরমহংস তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। এতক্ষণ লক্ষ করেনি, এখন দেখল ওদের টেবিলে লোক কমেছে। একটি মেয়ে যার নাম নবনীতা, সে বোধ হয় এর মধ্যে কখন উঠে গেছে। এই হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরেটা ঠিক বোঝা যায় না তবে সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ এটা ঠিক। এই সময়েও মেয়েরা সমানে আড্ডা মেরে যাচ্ছে, ওদের বাড়িতে কেউ কিছু বলে না বোধ হয়। আটটার মধ্যে হোস্টেলে ফিরতে হবে। এটা অবশ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের জন্য আবশ্যিক নয়, তবু অনিমেষ কোনও দিন নিয়ম ভাঙেনি।

পরমহংস বলল, 'চোট খেলে গুরু?'

অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল। পরমহংসের কথাবার্তা কোত্থেকে শুরু হয় সেটা আন্দাজ করা মুশকিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'মহারানি তোমাদের মাটিতে বসিয়ে রেখে দিব্যি হাওয়া হয়ে গেলেন।'

ওর কথা শেষ হতে না-হতেই মেয়েরা একসঙ্গে হেসে উঠল, যেন ব্যাপারটা খুব মজার।

অনিমেষ কিছু বুঝতে না পেরে একবার পরমহংস আর একবার মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগল।

সেটা লক্ষ করে আত্রেয়ী বলে উঠল, 'আপনার মাথায় যেন কিছুই ঢুকছে না।!'

অনিমেষ বলল, 'সত্যি কিছু ঢুকছে না।'

আত্রেয়ী চোখ ছোট করল, 'ওই মেয়েটিকে আপনি কত দিন চেনেন?'

'কেন?'

'নীলা মুখার্জি তো বিদ্যাসাগর থেকে এসেছে, স্কটিশ থেকে নয়। তা ছাড়া ও আমাদের এক বছরের সিনিয়র। আগে বলুন, চেনাশোনা হল কী করে?'

'পারিবারিক সূত্রে আমরা পরিচিত।' অনিমেষ বিস্তারিত বলল না।

BanglaBook.org

তিনটে মুখই যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। আত্রেয়ীর খুব স্বাভাবিক হবার চেষ্টাটাই অনিমেষের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকল। পরমহংস বলে উঠল, 'সরি গুরু, সেমসাইড হয়ে গেছে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল। একটা কিছু ওরা হঠাৎ চেপে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে সে সহজ হবার ভান করল, 'কেন, ব্যাপারটা কী? অনেক বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হল!'

'তোমার রিলেটিভ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না, না। জাস্ট পরিচিত।'

এ বার আত্রেয়ী বলল, 'তা হলে একটা কথা বলি, নীলা মুখার্জি থেকে দূরে থাকবেন।'

'কেন?' অনিমেষের এ বার মজা লাগছে।

পরমহংস এ বার গুছিয়ে বসল, 'আরে গুরু, ইউনিভার্সিটিতে পা দিয়েই যার গল্প শুনলাম সে হল ওই নীলা মুখার্জি। যুব-হৃদয় সম্পর্কে স্পেশালিস্ট। অধ্যাপক থেকে বেয়ারা সবাই ওর কাছে নেতিয়ে থাকে। অথচ ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে, আর নীলা মুখার্জি তো মোটামুটি শ্যামলাই। তবু মাইরি মেয়েটার মধ্যে এমন একটা চমক আছে, যেটা চুম্বকের মতো টানে সবাইকে। কোনও ছেলেকে ওর সঙ্গে সাত দিনের বেশি দেখা যায় না। সেই রাক্ষসের মতো, যার প্রতিদিন একটা করে মানুষ লাগত। নীলা মুখার্জি সম্পর্কেও এই ধারণাটা চলতি আছে।'

শুনতে শুনতে অনিমেষের কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। ও বলল, 'আচ্ছা?'

আত্রেয়ী বলল, 'সেই মক্ষীরানির সঙ্গে আপনাকে এতক্ষণ বসতে দেখে কফি হাউসের অনেকের বুকে সমবেদনা জমেছে। বিভিন্ন টেবিলে এমন অনেকে বসে আছে যারা এক দিন আপনার ভূমিকায় ছিল।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ওর সঙ্গে একজন ছেলে-বন্ধু ছিল।'

আত্রেয়ী জানাল, 'বোধহয় লেটেস্ট কেউ।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আপনারা অনেক খবর রাখেন তো। তবে আমার সঙ্গে নীলার সম্পর্ক এমন ধরনের যে কোনও দিন আমাকে ওই ভূমিকায় দেখবেন না।'

অনন্যা এ বার কথা বলল, 'মফস্বলের ছেলেরা দারুণ মিচকে হয়।'

হঠাৎ কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখে লাফিয়ে উঠল পরমহংস, 'আরে ব্বাস, আমার চাকরি চলে যাবে!'

আত্রেয়ী অবাক হয়ে বলল, 'চাকরি? এই সময়ে চাকরি?'

পরমহংসের দাঁত সামান্য উঁচু হওয়ায় মুখটা সব সময় হাসি হাসি দেখায়, 'তোমাদের মতো আলালের ঘরের দুলালী নই তো খুকি, আমাদের খেটে খেতে হয়। দেড়শো টাকার টিউশনি—না গেলে বাম্পার ছুড়বে বুড়ো।'

অনন্যা ফুঁসে উঠল, 'আলালের ঘরের দুলালী মানে?'

পরমহংস মাথা ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'বাপের পয়সায় এম-এ পড়তে এয়েছ বেশ মোটা একটা কাতলা বিয়ের বাজারে গাঁথবে বলে। তোমাদের আর কী চিন্তা!'

অনন্যা তিক্ত গলায় বলল, 'কী অদ্ভুত জ্ঞান! সেদিন দশটার সময় বাসে আসছিলাম, আধবুড়ো লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, অপিস টাইমে মেয়েছেলে ওঠা কেন? যেন আমরা চাকরি করে বাপ মা ভাইকে খাওয়াই না। এইট্টিনথ সেঞ্চুরির মানসিকতা নিয়ে প্রগতির গল্পবাজি করতে বাংলাদেশের পুরুষদের জুড়ি নেই।'

পরমহংসের মুখটা এই প্রথম নিষ্প্রভ দেখাল। অনিমেষ এতক্ষণ অনন্যাকে ভাল করে লক্ষ করেনি, এই কথা শোনার পর এক নিমেষে অন্যরকম ধারণা জন্মাল।

আত্রেয়ী বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছিস। যাক, আমরা সবাই উঠব। বেয়ারাটিকে ডাকুন, দাম মিটিয়ে দেওয়া যাক।'

পরমহংস খুব দ্রুত নিজের অবস্থা সামলে বলে উঠল, 'আমি বাদ।'

আত্রেয়ী বলল, 'মানে?'

পরমহংস আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমরা মাইরি অন্নপূর্ণার জাত আর আমি চিরকাল ভিখিরি শিব। তোমাদের ভিক্ষে নিয়েই তো চলে আমার।'

অনন্যা ফুঁসে উঠল, 'ইস। অন্নপূর্ণা-শিবের রিলেশনটা জানা আছে? অত শস্তা না। ঠিক আছে, আমিই দিয়ে দিচ্ছি।'

পরমহংস বলল, 'কেন, অনিমেষ শেয়ার করবে।'

BanglaBook.org

অনন্যা মাথা নাড়ল, 'কেন ? উনি তো এখানে কিছু খাননি!'

বিল মিটিয়ে নীচে নামতে অনিমেষের মনে হল সে যেন অদ্ভুত শান্ত এক জগতে পা দিল। সামনে ট্রাম বাস রিকশা চলছে, কিন্তু সেটা কফি হাউসের তুলনায় এত নির্জন যে দুটো কান খাঁ খাঁ করতে লাগল। মেয়েরা চলে যেতে পরমহংসের সঙ্গে ট্রাম ধরার জন্য রাস্তা পেরিয়ে অনিমেষ কথাটা বলে ফেলল।

পরমহংস বলল, 'টিউশনি! তোমারও অবস্থা টাইট নাকি ?'

অনিমেষ স্বীকার করল, 'পেলে খুব উপকার হত। অবশ্য আমি আগে কাউকে পড়াইনি।'

পরমহংস বলল, 'দূর, ওর জন্য কোনও এলেম লাগে না। যে যত ভাল ম্যানেজমাস্টার সে তত ভাল টিউটর। ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

একটা রানিং ট্রামে ওঠার জন্য সে দৌড় শুরু করল। অনিমেষ সেই চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে গেল, ওর পায়ে খচ করে উঠেছে, চোখ বন্ধ করে ব্যথাটা সামলাল সে।

আট

পরমহংস চলে যাওয়ার পর অনিমেষ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বাদুড়ঝোলা বাস ট্রামে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। টনটন করছে অপারেশনের জায়গাটা। এত দিন দিব্যি ছিল, কখনও কষ্ট হয়নি। আজ ট্রামে ওটার চেষ্টা করতে গিয়ে আচমকা এই ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু সামনে পা ফেললে মনে হচ্ছে চোখের সামনে লক্ষ আগুনের ফুলকি নাচছে। জোড়া হাড়টা কি খসে গেল ? যাঃ, তা যদি হত তা হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ তার হুঁশ থাকত না। সোজা হয়ে থাকলে ব্যথাটা সব সময় থাকছে না, মাঝে মাঝে থাই থেকে একটা ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার বলেছিল ষাট বছর বয়স অবধি কোনও অসুবিধা হবে না। তারপর ওখানে বাতের যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর বাদেই এই রকমটা হয়ে গেল ? হয়তো পা বেকায়দায় পড়েছিল, অনিমেষ ঘামে ভিজে চোখ বন্ধ করল। এই যদি শরীরের অবস্থা হয় তা হলে সে জীবনে কোনও কিছুই করতে পারবে না। একটা অক্ষম পঙ্গু মানুষের পক্ষে কোনও স্বপ্ন দেখা বড় রকমের ভ্রান্তি।

নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে অনিমেষ ব্যাকুল হয়ে উঠল। অথচ হেঁটে যে এখান থেকে হোস্টেলে ফিরে যাবে তা অসম্ভব। অনিমেষ দেখল দূরে একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দু'জন বৃদ্ধা রিকশাওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষি করছেন। রিকশা করে হোস্টেলে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। এখান থেকে যা দূরত্ব তাতে ওরা এক টাকার কম নিশ্চয়ই নেবে না। অথচ পকেটে শুধু সেটুকুই রয়েছে। কাছেপিঠে আর রিকশা নেই। অনিমেষ অপেক্ষা করছিল যদি ওই বৃদ্ধারা বিফল হয়ে রিকশাওয়ালাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু ওর নাকের ডগা দিয়েই রিকশাওয়ালা তাদের নিয়ে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢুকে গেল।

অনিমেষ যখন সাতপাঁচ ভাবছে তখন হাওয়া উঠল। এতক্ষণ লক্ষ করেনি কোন ফাঁকে আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমেছিল, এখন সেগুলো ভরাট হয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি এসে যাবে এই আশঙ্কায় রাস্তাঘাটের চেহারা পালটে যেতে লাগল দ্রুত। বাসস্টপে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা মরিয়া হয়ে এক-একটা বাসে ওটার চেষ্টা করছে। বৃষ্টি নামার আগেই সবাই বাড়ি ফিরতে চাইছে। অনিমেষ হাল ছেড়ে দিল। তার পক্ষে যখন কিছু করা অসম্ভব তখন খামোখা চেষ্টা করার অর্থ হয় না। আসুক বৃষ্টি, একসময় রাত আরও গভীর হলে নিশ্চয়ই ট্রাম খালি হবে, তখন কোনওরকমে উঠে পড়লেই হবে। হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে গেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সত্যি কথা বলে দিলেই হবে, তাতে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন তা হলে হবেন। পেছনে ফুটপাতের ওপর যে বই-এর দোকানগুলো হয়েছে তার একটায় ভাল ছাউনি আছে। অনিমেষ চেষ্টা করল সেই ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়াতে। বৃষ্টি এলে নিশ্চয়ই হুটোপুটি শুরু হয়ে যাবে।

ব্যথাটা এখন আর পাক দিয়ে উঠছে না। কিন্তু হাঁটা যাচ্ছে না কিছুতেই। অনিমেষ পাশ ফিরতেই মনে হল একটা গাড়ি দ্রুত গতিতে ওর সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কেউ চেঁচামেচি করছে শুনে সে গাড়িটার দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেল। থম্বোটোর সেই রুমমেট ট্যাক্সির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকছে হাত নেড়ে। পেছন থেকে বোঝা যাচ্ছে থম্বোটোর বন্ধু একা নেই। অনিমেষ এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে প্রথমে সেই ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি কী

BanglaBook.org

করবে। বাসস্টপে দাঁড়ানো কয়েকজন ছুটে গেল ট্যাক্সিটার কাছে। থম্বোটোর বন্ধু হাত নেড়ে তাদের না বলল। ও নিশ্চয়ই হোস্টেলে ফিরছে, অনিমেষের মনে হল আকাশ থেকে যেন দেবদূত থম্বোটোর বন্ধুর চেহারা নিয়ে এসেছে, এরকমটা ভাবাই যায় না। এক পা এগোতেই অনিমেষের থাই থেকে কোমর অবধি একটা আগুনের বল ছুটে গেল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল, চোখে জল এসে যাওয়ার উপক্রম। সে দেখল থম্বোটোর বন্ধু ট্যাক্সির দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে ওর কাছে চলে এল, 'হোয়াত্ হ্যাপেন্ড?'

এক হাত দিয়ে নিজের পা দেখাল অনিমেষ, 'আই ক্যান নট ওয়াক্। অফুল পেইন।'

থম্বোটোর বন্ধু ডান হাতে অনিমেষের পিঠে একটা বেড় দিয়ে বলল, 'সাপোর্ট, সাপোর্ট।'

ব্যথার পা মাটি থেকে সামান্য ওপরে রেখে থম্বোটোর বন্ধুর কাঁধে ভর রেখে অনিমেষ অন্য পায়ে লাফাতে লাফাতে ট্যাক্সির দিকে এগোল। অনিমেষ লক্ষ করল এতে আর ব্যথাটা লাগছে না। শুধু থাই-এর কাছটায় শিরশির করছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হল এই ছেলেটির সঙ্গে গত কাল রাত্রে থম্বোটোর ঘরে তার প্রায় মারামারি হবার উপক্রম হয়েছিল। ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা হীন মন্তব্য এর মুখ থেকে বেরিয়েছিল। সেই মুহূর্তে এই ছেলেটিকে ওর খুব বাজে টাইপের মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন এইরকম পরিস্থিতিতে ও যে ভাবে ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে অযাচিত ভাবে তাকে সাহায্য করছে গত কালের ঘটনার পর তা কি আশা করা যায়? মানুষের চরিত্র চট করে বোঝা মুশকিল এই সত্য আর একবার প্রমাণিত হল। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ টের পেল থম্বোটোর বন্ধুর শরীর থেকে অদ্ভুত নেশা-ধরানো একটা অচেনা গন্ধ বের হচ্ছে। এরকম গন্ধ সচরাচর কোনও চেনা মানুষের শরীরে অনিমেষ পায়নি। ট্যাক্সিতে উঠে কোনওরকমে বসতে না বসতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু হলে যেমন বিশৃঙ্খল অবস্থা শুরু হয়ে যায় তেমনি বাসস্টপে দাঁড়ানো মানুষেরা এলোমেলো দৌড়ে একটা ছাউনি খুঁজতে লাগল। থম্বোটোর বন্ধু দরজা বন্ধ করে সামনের সিটে গিয়ে বসতেই অনিমেষ ট্যাক্সির অন্য যাত্রীর দিকে তাকাল। পেছনের সিটের ও পাশের জানালা ঘেঁষে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। এরকম আধুনিক বেশবাসের মহিলাদের উত্তর কলকাতায় দেখা যায় না। অনেক সময় ব্যয় করলে এই রকম প্রসাধন করা যায়। মাথার চুল কোমরের সামান্য নীচে, ফুলে ফেঁপে মেঘের মতো হয়ে রয়েছে। হাতকাটা জামা শঙ্খরঙা, বাহুকে এমন সুঠাম সৌন্দর্য দিয়েছে যে চোখ সরানো দায় হয়ে ওঠে। চোখাচোখি হতেই ওর রক্তাক্ত ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে চিকচিকে দাঁতের প্রান্ত দেখা গেল। অনিমেষ অনুমান করল মহিলা হাসছেন।

থম্বোটোর বন্ধু ড্রাইভারের পাশে বসে এ দিকে শরীরটাকে ঘোরাল, 'এনি অ্যাক্সিডেন্ট?' সব কথা সব জায়গায় বলতে ইচ্ছে করে না, অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। 'নো ব্লিডিং?' আবার প্রশ্ন করে থম্বোটোর বন্ধু উত্তর শুনে নিশ্চিন্ত হল। বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সিটা কিছু দূর যেতেই দাঁড়িয়ে গেল। সামনে জ্যাম। ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে গাড়িগুলো। বৃষ্টির ছাট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনিমেষ ওর দিকের জানলার কাচ তুলে দিতে দিতে খেয়াল করল থম্বোটোর বন্ধুর নামটাই তার জানা হয়নি অথচ ওর ট্যাক্সিতে সে লিফ্ট নিচ্ছে।

থম্বোটোর বন্ধু বিরক্ত গলায় বলল, 'ভেরি ব্যাড ট্রাফিক সিস্টেম, ভেরি ব্যাড।' এই মুহূর্তে অনিমেষেরও সেটাই মনে হচ্ছে। যেরকম বৃষ্টি চলছে তাতে আর কিছুক্ষণ বাদেই ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যাবে। তখন হবে আর এক মুশকিল। ট্যাক্সিওয়ালা বেশ বৃদ্ধ, বোধ হয় উত্তরপ্রদেশের লোক, তেমন জল জমে গেলে যদি যেতে রাজি না হয় তা হলেই সোনায় সোহাগা।

এই সময় বেশ শব্দ করে কোথায় বাজ পড়তেই মহিলা আঁতকে উঠলেন, 'ও গড, আমার ভয় করছে।' মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ দেখল ভদ্রমহিলা সত্যিই ভয় পেয়েছেন। দুটো হাতে কান চাপা দিয়েছেন, চোখ আধবোজা। খুব সুন্দরী মেয়েদের ভয় পাওয়া চেহারাটা আদৌ সুন্দর হয় না এটা জানা ছিল না।

থম্বোটোর বন্ধু ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হাউ ইজ ইয়োর পেইন?'

না, এখন আর ব্যথাটা লাগছে না। হেলান দিয়ে বসতে পেরে শরীরে স্বস্তি ফিরে এসেছে। অনিমেষ ঘাড় নেড়ে হাসতেই ছেলেটা বলল, 'দেন, মিট মাই ফ্রেন্ড, শীলা সেন। ভেরি হোমলি, রিয়েল সুইট।'

এইভাবে কারও সঙ্গে কখনও পরিচিত হয়নি অনিমেষ, মহিলার দিকে তাকিয়ে সে দুটো হাত জোড় করল, 'আমার নাম অনিমেষ।'

BanglaBook.org

সামান্য মাথা-দুলিয়ে মহিলা অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর কপালে দুটো রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি অসুস্থ ?'

অনিমেষ না বলতে গিয়েও পারল না, 'পায়ে একটু আঘাত লেগেছে।'

'পায়ে ? কোথায় ?' মহিলা এতক্ষণে যেন সিরিয়াস হলেন।

অনিমেষ প্যান্টের ওপর দিয়ে জায়গাটা দেখাল।

'ওখানে, ওখানে আঘাত লাগল কী করে ? ওখানে তো কোনও জয়েন্ট নেই!'

'লাগল, লেগে গেল। অনিমেষ হাসল।

হঠাৎ থম্বোটোর বন্ধু বলে উঠল, 'আই কান্ট ফলো ইউ। ইংলিশ, ইংলিশ প্লিজ।'

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত নেকি গলায় মহিলা বলে উঠল, 'ইস, সব যেন ওকে বুঝতে হবে! আমরা ভাই বাংলায় কথা বলব, না ? কেলে ভূতটা ইংরেজিও ভাল জানে না।'

চমকে উঠল অনিমেষ। ভদ্রমহিলা একী ভাষায় কথা বলছেন ? হয়তো এই মহিলার জন্যে কাল রাত্রে থম্বোটোর বন্ধু হইচই করেছিল। এই মহিলাকেই সম্ভবত দারোয়ান রাত আটটার পর আটকে দিয়েছিল। যার জন্যে থম্বোটোর বন্ধু অত আন্তরিকভাবে ক্ষিপ্ত হতে পারে তার মুখ থেকে এ ধরনের কথা কল্পনা করা যায় না। তা হলে কি মহিলা শুধুমাত্র কোনও স্বার্থের জন্য এই বিদেশি আফ্রিকান ছেলেটির সঙ্গে মিশছেন ? কী স্বার্থ হতে পারে সেটা ? হঠাৎ ওর খেয়াল হল কলকাতা শহরটা একটা বিচিত্র জায়গা। ক'দিন আগে একটা কাগজে পড়েছিল এখানে কয়েক হাজার সুন্দরী কলগার্ল বাস করেন যাঁদের চেহারা এবং কথাবার্তা খুবই অভিজাত এবং চাক্ষুষ কিছু বোঝা সম্ভব নয়। ইনি কি সেই শ্রেণীর ? না, তা হতেই পারে না। সেই বাল্যকাল থেকে, জলপাইগুড়ির বেগুনটুলির পাশের গলিতে যাওয়া ইস্তক, অনিমেষের একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, মেয়েরা অভাবের তাড়নায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও মেয়ে-ওই জীবনযাপন করতে কেন চাইবে ? এই মহিলা যে পোশাক এবং প্রসাধন ব্যবহার করেছেন তাতে দারিদ্র্যের কোনও চিহ্ন নেই। সে রকম মেয়ে হলে সুদূর আফ্রিকা থেকে এসে থম্বোটোর বন্ধু কেন একে বন্ধু বলে পরিচয় দেবে ?

মহিলা হাসলেন এবার, সত্যি সত্যি, 'কী ভাবছেন ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না তেমন কিছু না।'

মহিলা বললেন, 'তা হলে কিছু একটা তো বটেই! আপনিও কি ওর সঙ্গে একই হোস্টেলে থাকেন ? মানে যে হোস্টেলে সব বাচ্চারা থাকে ?'

থম্বোটোর বন্ধু এবারে অধীর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ইংলিশ, ইংলিশ।'

'শাট আপ।' মহিলা ধমক দিলেন। গলার স্বর চড়ায় উঠলে একটুও পেলবতা থাকে না অনিমেষ লক্ষ করল। 'ডোন্ট বিহেভ লাইক এ কিড।' উচ্চারণে সামান্য জড়তা নেই এবং আশ্চর্য ব্যাপার, সাপের মাথায় ধুলোপড়ার মতো থম্বোটোর বন্ধু কেমন মিইয়ে গেল বকুনি শুনে। জুলজুল চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করতে মহিলা স্তোক হাসি হাসলেন 'ইউ নটি বয়!' অনিমেষ দেখল থম্বোটোর বন্ধু তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে সোজা হয়ে বসে সামনের গাড়িগুলো লক্ষ করতে লাগল এবার।

মহিলা বললেন, 'এরা এমনিতে খুব রাফ হয়, কিন্তু ট্যাক্‌ল্ করতে পারলে এদের মতো সহজ শিশু পৃথিবীতে আর নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনাদের হোস্টেলের অমন নিয়ম কেন ?'

অনিমেষ বলল, 'ওটা কলেজ স্টুডেন্টদের থাকার জায়গা। তাই কিছু কিছু নিয়ম করতেই হয়। আমরা যারা কলেজ ছাড়িয়ে গেছি তারাও নিয়মটাকে মানি।'

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কলেজে পড়েন না ?'

'এটা এক রকমের কলেজ বটে, আমি এম এ পড়ি।'

'ও মা, তাই নাকি! কী ভাল ছেলে গো! হোস্টেলে থাকো, তোমার বাড়ি কোথায় ভাই ?'

'জলপাইগুড়ির কাছে একটা চা-বাগানে।'

'চা-বাগান ? ও মা, নিজেদের চা-বাগান আছে ?' মহিলা দ্রুত অনিমেষের গা ঘেঁষে এসে বসলেন, 'চা-বাগান খুব সুন্দর জায়গা, না ? দার্জিলিঙে যেতে আমি দু চোখ ভরে দেখেছি। কেমন স্বপ্নের মতো দেখতে না ? আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল মহিলার ভাবভঙ্গিতে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে প্রতিবাদ করতে গেল যে তাদের নিজেদের কোনও চায়ের বাগান নেই। চায়ের বাগানের মালিকরা প্রচুর টাকার মালিক, তার বাবা একটি ইউরোপীয় মালিকানায় পরিচালিত চা-বাগানে চাকরি করেন মাত্র। কিন্তু এ

BanglaBook.org

কথাগুলো বলার আগেই থম্বোটোর বন্ধু চিৎকার করে উঠল সামনের সিট থেকে। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল অভিনব দৃশ্য। থম্বোটোর বন্ধু তিড়িং করে লাফিয়ে জুতোসুদ্ধ গাড়ির সিটের ওপর বসে বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় অনর্গল কিছু বলে যেতে লাগল যার এক বর্ণ অনিমেষ বুঝতে পারছে না। উত্তেজিত এবং ভয় পাওয়া মুখ, দুটো আঙুল সামনের পা রাখার জায়গার দিকে উঁচিয়ে ধরেছে। বুড়ো ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল কালো সাহেবের চালচলন দেখে। কিন্তু সিটের উপর জুতো তুলে উঠে বসতে দেখে সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছিল। কারণ সাহেবের উত্তেজনার কারণটা অনুসন্ধান করতে তাকে নীচের দিকে ঝুঁকে তাকাতে দেখা গেল। অনিমেষ উঠে ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে গেল। এখন কোনওরকম নড়াচড়া আবার যন্ত্রণাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। ভদ্রমহিলা ট্যাক্সির মধ্যে যতটা পারেন উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনও হদিশ পাচ্ছেন না। ওইটুকু জায়গায় ভদ্রমহিলা দাঁড়াতে চেষ্টা করায় তাঁর শরীরের অনেকটা অনিমেষের ওপর চেপে গেছে, একজন রমণীর শরীর নয় শুধুমাত্র, প্রবল চাপের জন্যই অনিমেষের প্রাণ বেরুবার দায়। এতক্ষণে ড্রাইভার বস্তুটিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। একটি নধর কালো কুচকুচে আরশোলা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে বিরক্তির সঙ্গে একবার সবাইকে দেখিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে।

যেন সোডার বোতল খুলে গেল হঠাৎ, মহিলা খিলখিল করে উন্মাদ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতেই পেছনের সিটে লুটিয়ে পড়লেন। অনিমেষ দেখল ওঁর গায়ের আঁচল নীচে লুটিয়ে পড়েছে, বড় গলার কালো সিল্কের ব্লাউজ তাঁর বিশাল বক্ষকে আবদ্ধ করতে পারছে না। অনিমেষ নিজের অজান্তেই সেদিকে তাকিয়েছিল। হাসতে হাসতেই সেটা লক্ষ করে মহিলা অদ্ভুত ভঙ্গিতে অনিমেষকে টুসকে দিয়ে আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, কী বীরপুরুষ রে! একটা আরশোলা দেখে ভিরমি খাচ্ছেন, আবার মুখে বড় বড় বাত—সিংহের দেশের লোক আমি, গরিলার দেশের লোক আমি।'

বাইরে ফুটপাতের পাশে পড়ে থাকা আরশোলাটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়েছিল থম্বোটোর বন্ধু। উত্তেজনাটা এখন থিতিয়েছে। তারপর পা দুটো সন্তর্পণে নীচে নামিয়ে আর একবার ভাল করে দেখে নিল জায়গাটা, দেখে পেছনের সিটের দিকে ফিরে মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল, 'আই কান্ট স্ট্যান্ড।'

'খুব গর্বের কথা, আবার চেঁচিয়ে বলা হচ্ছে!' মহিলা টিপ্পনী কাটলেন। এতক্ষণে ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করেছে। সামনের জট খুলতেই গাড়িগুলো শামুকের মতো এগোচ্ছে। একটু বাদেই মনে হল ওরা বিরাট নদীর মধ্যে এসে পড়েছে। ফুটপাট দেখা যাচ্ছে না জলের ঢেউ দু' পাশের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ার উপক্রম। থম্বোটোর বন্ধু সোৎসাহে বলে উঠল, 'হাউ ফানি, উই আর সেইলিং।'

অনিমেষেরও মজা লাগছিল কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল, যদি ইঞ্জিনে জল ঢুকে যায় তা হলে চিত্তির। এখানে জলবন্দি হয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। ড্রাইভার সমানে নিজের মনে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে জল ভেঙে গাড়ি এগোচ্ছে যেন কতটা পথ আসা হল। অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজ ছাড়িয়ে আসতে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখন আর জল কিংবা জ্যাম নেই। ভেজা রাস্তা দিয়ে এগোতে দেখা গেল সারবন্দি হয়ে ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষ বলল, 'খুব জোর বাঁচা গেল।'

মহিলা চোখ বড় করে বললেন, 'গাড়িটা আটকে থাকলে খারাপ লাগত নাকি? বেশ তো আমরা অনেকক্ষণ গল্প করতে পারতাম!'

অনিমেষ এর উত্তরে কী বলবে বুঝতে না পেরে হাসল। হাসি অনেক কিছুর উত্তর হতে পারে, যে যেমন বুঝে নেয়।

বিবেকানন্দ রোডের কাছে গাড়িটা আসতেই মহিলা বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি, পায়ে যখন এত যন্ত্রণা, হাঁটা যাচ্ছে না তখন একা একা হোস্টেলে থাকা যাবে কী করে? ওটা তো আর বাড়ি নয় যে কেউ সেবাশুশ্রূষা করবে!'

অনিমেষ বলল, 'না, না, একটু শুয়ে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহিলা বললেন, 'যদি না হয়! আমার ইচ্ছে করছে বাড়িতে নিয়ে যাই। কারও কষ্ট হচ্ছে, ভাবলে এত খারাপ লাগে, মন কেমন হয়ে যায়!'

অনিমেষ লজ্জা পেল, 'আপনি কিছু ভাববেন না।'

BanglaBook.org

মহিলা বললেন, 'ভাবব না কী কথা! আলাপ হল আর ভাবব না ? ঠিক আছে, কেমন থাকা হচ্ছে আমায় যদি জানিয়ে দেওয়া হয় তা হলে নিশ্চিন্ত হই। আমার নম্বর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চারটে শূন্য। মনে থাকবে ? খুব সোজা। শুধু এক্সচেঞ্জ নম্বরটা মনে রাখলেই হল, তারপর সব ফাঁকা। ইংরেজিতে বললাম না, সামনের দুটো কান এ দিকে খাড়া হয়ে আছে।' কথা বলতে বলতে গলার স্বর নীচে নেমে এল, ফিসফিস শোনাল।

এত অল্প পরিচয়ে বলতে গেলে মাত্র কয়েক মিনিটের বলা যায়, কোনও মহিলা এ রকম আন্তরিক ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানাতে পারে ? অনিমেষের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হল তার নিজের মনে নিশ্চয়ই কু আছে। মহিলা তার আহত হবার সংবাদ শুনে স্নেহপ্রবণ হয়ে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চাইতে পারেন—তাতে অস্বাভাবিক কী আছে ? সে হয়তো মিছেই ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

হেদোর আগের গলি দিয়ে ট্যাক্সিটাকে ঘোরাতে বললেন মহিলা। স্কটিশের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি অনেকটা এগিয়ে একটা লাল রঙের বাড়ির সামনে থামতেই মহিলা একটু অপ্রসন্ন চোখে বৃষ্টির দিকে তাকালেন। এখন বৃষ্টির সেই তেজটা নেই, কিন্তু যেভাবে পড়ছে তাতে একটু হাঁটলেই ভিজে যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বৃষ্টির মধ্যেই থম্বোটোর বন্ধু লাফিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। নেমে গাড়িটাকে পাক দিয়ে এ-পাশের দরজায় এসে সেটাকে খুলে ধরল, 'মে আই গো উইদ ইউ ?' মহিলা পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লেন, 'নট টুনাইট ডার্লিং।' তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বললেন, 'চলি ভাই, মনে থাকে যেন!' কথা শেষ করেই উনি প্রায় দৌড়ে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে লাল বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেলেন। অনিমেষ দেখল নামবার আগে মহিলা দ্রুত হাতে আঁচলটাকে ঘোমটার মতো আড়াল করে নিয়েছিলেন এবং চলে যাওয়ার সময় একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না। বৃষ্টির জন্য রাস্তা ফাঁকা, রকগুলোতেও কেউ নেই।

থম্বোটোর বন্ধু অকপটে সেই চলে যাওয়া দেখল। বৃষ্টিতে ভিজে যে একশা হয়ে গেছে সেদিকে একটুও খেয়াল নেই। তারপর শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিমেষের পাশে উঠে বসল। সিট ভিজে যাচ্ছে বলে ড্রাইভার বিরক্তি প্রকাশ করতেই সে ঘাড় নেড়ে হাউহাউ করে নিজের ভাষায় কিছু বলে সোজা হয়ে বসল। অনিমেষ ড্রাইভারকে কিছু মনে না করতে বলে হোস্টেলের ঠিকানাটা জানিয়ে দিতে আবার ট্যাক্সি চলা শুরু করল।

থম্বোটোর বন্ধু অনিমেষের হাতের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'শি টক্‌ড্ অ্যাবাউট মি ?'

অনিমেষ বুঝল মহিলাকে জরিপ করার চেষ্টা করছে ছেলেটা। সে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

'টেল মি হোয়াট শি টোলড্ ইউ!'

অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে ওর দিকে তাকাল। মহিলার কথাবার্তা খুব স্বচ্ছন্দ ছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল থম্বোটোর বন্ধু সম্পর্কে মহিলার কিছুমাত্র আন্তরিক ধারণা নেই। কিন্তু ও সব কথা এই ছেলেটিকে কী করে বলা যায়। এর হাবভাবে মহিলাটি সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ স্পষ্ট। এ রকম চললে শেষ পর্যন্ত হয়তো চূড়ান্ত আঘাত পাবে ছেলেটি। অনিমেষের মনে হল কথাটা থম্বোটোকে খুলে বলা যায়। যদি কিছু সাবধানবাণী ওকে শুনতে হয় তা হলে তা থম্বোটোর মুখ থেকেই শোনা ভাল। কিন্তু এখন একে কী বলা যায়! তীব্র চাহনি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'শি টোলড্ মি দ্যাট ইউ আর এ ভেরি গুড্ বয়। অ্যান্ড অল দিজ প্রেইজি ওয়ার্ডস।'

চোখ বন্ধ করল থম্বোটোর বন্ধু। তারপর খুব গাঢ় গলায় বলল, 'আই নেভার লাভ্‌ড্ ওম্যান বিফোর হার। শি ইজ সামথিং।'

হোস্টেলের সামনে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতে থম্বোটোর বন্ধু ভাড়া মিটিয়ে দিল। প্রায় পনেরো টাকার মতো মিটারে উঠেছে। অনিমেষ দেখল ওর পার্সে থোকা থোকা নোট। চট করে অনুমান করা যায় না টাকার অঙ্কটা। এত টাকা কোনও দিন একসঙ্গে হাত দিয়ে ধরেনি অনিমেষ। পার্সটা যেভাবে ছেলেটা হিপ পকেটে গুঁজে রাখল তাতে বিন্দুমাত্র সতর্কতা নেই। ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়েই সমস্ত শরীর দুলে উঠল অনিমেষের। এতক্ষণ যে বসেছিল সেটা ছিল এক রকম, ব্যথাটার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এখন মাটিতে পা দিয়ে শরীরের ভার রাখতেই মনে হল থাই থেকে একটা আগুনের গোলা পাক খেয়ে কোমরে উঠে এল। যন্ত্রণাটাকে দাঁতে চেপে সামলাল অনিমেষ। দু চোখে পলকেই জল এসে গেল। থম্বোটোর বন্ধু সমস্ত ঘটনাটা চুপচাপ লক্ষ করছিল। এখন বৃষ্টি টুপটাপ পড়ছে। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অদ্ভুত কায়দায় ছেলেটা অনিমেষকে কাঁধে তুলে নিল। ব্যাপারটা এমন আকস্মিক এবং

সহজ ভঙ্গিতে ঘটল যে অনিমেষ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খুব কায়দা করে ওকে ধরে ছেলেটি সিঁড়ি অবধি হেঁটে গেল। থম্বোটোর বন্ধুটি মোটেই স্বাস্থ্যবান নয় কিন্তু ওর গায়ে যে এত শক্তি আছে তা অনুমান করা যায় না। সাবধানে সিঁড়ির গোড়ায় ওকে নামিয়ে দিয়ে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াটস্ ইয়োর রুম নাম্বার?'

অনিমেষ জানাতেই সে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। রেলিং ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। হোস্টেলের গেটটা ভেজানো ছিল, থম্বোটোর বন্ধু সেটাকে ঠেলে ঢুকেছে। বাঁ দিকে দারোয়ানের ঘর থেকে তুলসীদাসী রামায়ণের সুর ভেসে আসছে। এখন বোধ হয় প্রায় ন'টা বেজে গেছে। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এবার অনিমেষের মনে হল আবার কি ওকে হাসপাতালে গিয়ে এক বছর বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে? প্রচণ্ড আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। এইভাবে পঙ্গুর মতো সমস্ত জীবন কাটানোর চাইতে মরে যাওয়া ঢের ভাল। সারা জীবন টিপটিপ করে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

নানারকম কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপরে, অনিমেষ দেখল ত্রিদিব আরও কয়েকজনকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে আসছে। এক দৌড়ে কাছে এসে অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করল ত্রিদিব, 'কী হয়েছে? শুনলাম খুব উন্ডেড হয়েছে?' অনিমেষ দেখল আরও কয়েকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আর প্রত্যেকের মুখচোখে উদ্বেগ স্পষ্ট। অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে পড়ল, এরকমটা হবে ভাবেনি সে। সিঁড়ির ওপর দিকে থম্বোটোর বন্ধু নির্লিপ্তের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, চোখাচোখি হতে হাত নেড়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। যেন ওর কর্তব্য শেষ, এরকম ভাব।

অনিমেষ বলল, 'ট্রামে উঠতে হঠাৎ জখম পায়ে ব্যথা হল। তার পর থেকে আর হাঁটতে পারছি না। এখন যন্ত্রণাটা না হাঁটলে হচ্ছে না।'

ত্রিদিব ধমকে উঠল, 'নিশ্চয়ই রানিং ট্রামে উঠছিলে?'

অনিমেষ অস্বীকার করল না, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না জোড়া হাড় ভাঙল কি না!'

ভিড়ের মধ্যে দুর্গাপদ ও গোবিন্দকে দেখতে পেল অনিমেষ। গোবিন্দ ত্রিদিবকে বলল, 'সিক রুমে নিতে হবে?'

অনিমেষ বলল, 'না, না, সিক রুমে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা একটু হেল্প করো, নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ি।'

ওরা কোনও কথা শুনল না, অনিমেষকে ধরাধরি করে মাথার ওপর তুলে সন্তর্পণে ওঁর ঘরে ফিরিয়ে আনল। খাটে শুইয়ে দিয়ে ত্রিদিব ভিড়টাকে সরাল। ঘরে শুধু গোবিন্দ আর দুর্গাপদ রয়ে গেল। ত্রিদিব গোবিন্দকে ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যথাটা ঠিক কোথায় হচ্ছে?'

অনিমেষ হাত দিয়ে থাই দেখাতে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অনিমেষের মনে হল এরা খুব ঘাবড়ে গেছে।

ত্রিদিব জিজ্ঞাসা করল, 'জায়গাটা দেখেছ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তার নিজের পক্ষে প্যান্টের পা গুটিয়ে থাই দেখা সম্ভব নয়। আর নিশ্চয়ই জায়গাটার বাইরে কিছু হয়নি, রক্তটক্ত বেরুবার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

ত্রিদিব বলল, 'ইজি হয়ে শুয়ে থাকো, কোনও চিন্তা কোরো না, আমি দেখছি।'

দুর্গাপদ ওর শার্ট খুলে নিল, ঘামে গেঞ্জি সপসপ করছে। সেটাকে খুলে ফেলতে বেশ আরাম লাগল। ত্রিদিব প্যান্টের বোতামে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আন্ডার প্যান্ট পরা আছে?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলল অনিমেষ। কাল রাত্রে মদ্যপান করে এসে ত্রিদিবরা ওর ওপর যখন জুলুম করেছিল, জোর করে উলঙ্গ করেছিল তখন এ কথা একবারও চিন্তা করেনি। অথচ আজ খুব ভদ্রভাবে জেনে নিচ্ছে যাতে অনিমেষ লজ্জায় না পড়ে। ওকে হাসতে দেখে ত্রিদিব জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কী হল?'

অনিমেষ বলল, 'কিছু না। আন্ডার প্যান্ট পরাই আছে। তোমরা আমাকে একটু ধরো, আমি নিজেই প্যান্ট চেঞ্জ করে নিচ্ছি।'

ওরা সে কথায় কান না দিয়ে প্যান্টটা সন্তর্পণে অনিমেষের শরীর থেকে এমনভাবে খুলে নিল যাতে ওর একটুও ব্যথা না লাগে। দুর্গাপদ অনিমেষের থাই-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখে বলল, 'কোথাও তো ফোলা দেখছি না, কিন্তু তোমার বুলেট মার্কের নীচে বেশ কিছুটা জায়গা লাল হয়ে আছে। বোধ হয় ওখানেই কিছু হয়েছে।'

BanglaBook.org

ত্রিদিব লাল জায়গাটায় হাত রেখে বলল, 'ওরে ফাদার! একদম ফার্নেস হয়ে রয়েছে। একদম নড়াচড়া করবে না, চুপচাপ শুয়ে থাকো। একটা পাতলা চাদর নিজের বিছানা থেকে তুলে এনে সে অনিমেষের কোমর অবধি ঢেকে দিল।

একটু বাদেই গোবিন্দ ফিরে এর, সঙ্গে হোস্টেলের ডাক্তার আর হোস্টেলের সুপার মিস্টার দত্ত। হোস্টেলের ডাক্তারকে সবাই আড়ালে ঘোড়ার ডাক্তার বলে। ওঁর চিকিৎসায় নাকি কখনও কোনও রুগি সারে না। সব রকম অসুখেই তিনি একই মিকশ্চার আর ট্যাবলেট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন। এককালে ছেলেরা এ নিয়ে রাগারাগি করেছে, কোনও ফল হয়নি। উনি ছেলেদের কাছ থেকে কোনও ফি নেন না, হোস্টেলের সঙ্গে তাঁর একটা মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। অথচ এই হোস্টেলের কারও কোনও অসুখ হলে বাইরের অন্য কোনও ডাক্তারকে ডাকা যাবে না, ইনি যদি সুপারিশ না করেন।

ডাক্তার সেন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে?' একটা কথা দুবার বলা তাঁর অভ্যেস, কথা বলেন হড়বড়িয়ে। ত্রিদিব বলল, 'ওর পায়ে খুব লেগেছে ট্রামে উঠতে গিয়ে, হাঁটতে পারছে না।'

'লেগেছে মানে কী? ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছে?' একটা চেয়ার বিছানার পাশে টেনে এনে বসলেন ডাক্তার সেন।

ত্রিদিব বলল, 'না, উঠতে গিয়ে—'

'পেশেন্ট কে, পেশেন্ট কে? পেশেন্টকে বলতে দিন।' ডাক্তার সেন বললেন।

অনিমেষ যতটা পারে সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতেই ডাক্তার 'হুম্' বলে মিস্টার দত্তের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, 'মশা মারতে কামান দাগা মশাই। এর জন্যে আমাকে ডাকার কোনও দরকার ছিল না, কোনও দরকার ছিল না। সিম্পল ব্যাপার, শিরায় টান লেগেছে, ছেলেমানুষের কারবার।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর সেন। অনিমেষ বন্ধুদের চোখে মুখে প্রতিক্রিয়া দেখে দ্রুত বলে ফেলল, 'আমার পায়ের ঠিক এই জায়গার হাড় পাঁচ বছর আগে ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল।'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠলেন ডক্টর সেন, 'ওখানকার হাড়? হাউ?'

'অ্যাক্সিডেন্টে।' অনিমেষ মিস্টার দত্তের সামনে বুলেটের কথাটা বলতে চাইল না। আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে অনিমেষের পা থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন ডক্টর সেন। পুরনো অপারেশনের জায়গাটা চোখে পড়তেই বিড়বিড় করে বললেন, 'মেজর অপারেশন হয়েছিল দেখছি।' তারপর ধীরে ধীরে দুহাত দিয়ে অনিমেষের পা ধরে সেটাকে ভাঁজ করলেন, 'লাগছে? ফিলিং পেইন?'

'না, হাঁটুর কাছে কোনও ব্যথা নেই,' অনিমেষ জানাল।

এবার থাই-এর মাংস ঠুকে ঠুকে দেখলেন ডাক্তার সেন আর একই প্রশ্ন করে চললেন। কিন্তু অনিমেষ কোনও ব্যথা অনুভব করছিল না। পকেট থেকে রুমাল বের করে ডাক্তার সেন নাকের ডগা মুছে নিয়ে অন্য পকেট থেকে প্যাড বের করলেন। তারপর খসখস করে প্রেসক্রিপশান লিখে অনিমেষের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আজ রাত্রে খুব ব্যথা যদি হয় তবে অ্যানাসিন টাইপের কোনও ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ো। চলি।' আর দাঁড়ালেন না তিনি, মিস্টার দত্তের সঙ্গে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

অনিমেষের হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে ত্রিদিব চেঁচিয়ে সবাইকে পড়ে শোনাল, 'অ্যাডবাইস—কনসাল্ট এনি অর্থপেডিক ইমিডিয়েটলি। যা শালা! এর জন্য তোকে ডাকব কেন? ঘোড়ার ডাক্তার!'

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠল, 'ঘোড়ার ডাক্তার হলে তবু কথা ছিল, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই কাকেদের চিকিৎসা করে। কারণ, কাকেদের কখনও অসুখ করে না।'

দুর্গাপদ এগিয়ে এসে অনিমেষের বিছানায় বসল, 'তোমার কি এখন কোনও অস্বস্তি হচ্ছে অনিমেষ?'

অনিমেষ বলল, 'আমি উঠে দাঁড়ালে বুঝতে পারব।'

দুর্গাপদ বলল, 'তা হলে ওঠার দরকার নেই। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে যদি কারও হাড় ভাঙে তবে তা সেট না করা পর্যন্ত যন্ত্রণা অসহ্য হয়। আমার মনে হচ্ছে তোমার পায়ের কোনও লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। আমার দাদার একবার হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন লিগামেন্ট ছিঁড়লে যেন কখনও মালিশ না করা হয়, ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখাই যথেষ্ট।'

ত্রিদিব বলল, 'কিন্তু ব্যান্ডেজটা করবে কোথায়?'

BanglaBook.org

দুর্গাপদ এবার অনিমেষের পা নিয়ে পড়ল। মিনিট কয়েকের মধ্যে সে থাই-এর নীচের দিকে হাঁটুর সামান্য ওপরে একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলল যেখানে হাত দিলেই অনিমেষ চিৎকার করে উঠছে। জায়গাটায় কোনও বড় শিরা নেই। চিৎকারের সময় অনিমেষের মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে এটা লক্ষ করল সবাই।

ত্রিদিব চাপা গলায় বলল, 'সাধে কি ঘোড়ার ডাক্তার বলেছি, খালি বাকতাল্লা!'

গোবিন্দ বলল, 'গরম সেঁক দিলে হয় না?'

দুর্গাপদ বলল, 'সেঁক দিলে খারাপ হবে না তো?'

গোবিন্দ বলল, 'বাড়িতে তো সবাইকে সেঁক দিতেই দেখেছি।'

দ্রুত ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিচেন থেকে একটা ছোট্ট কয়লার উনুন নিয়ে আসা হল।

দুর্গাপদ যখন সেঁক দিচ্ছে তখন বেশ আরাম হচ্ছিল অনিমেষের। অনেকক্ষণ পরে স্বস্তি আসায় ওর দু-চোখ বুজে এল একসময়।

দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'অনমেষ, তুমি খাবে না?'

এখন ঘুম ছাড়া আর কিছু ইচ্ছে করছে না অনিমেষের। সে চোখ বুজে মাথা নাড়ল, না, খাবে না। দুর্গাপদ আর পীড়াপীড়ি করল না।

তখন নিশ্চয়ই মধ্যরাত, অনিমেষের ঘুম ভেঙে গেল। হুঁশ ফিরতেই ওর মনে হল পেটে ছুঁচো ডন মারছে। ধীরে ধীরে উঠে বসতেই সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। ত্রিদিবের বিছানায় বসে গোবিন্দ আর দুর্গাপদ তাস খেলছে। পাশে মাটিতে রাখা কয়লার উনুনটা নিবে গেছে কখন। ত্রিদিব তাতেই ভাঁজ করা কাপড়টা গরম করার চেষ্টা করে তার পায়ে সেঁক দিয়ে চলেছে। অনিমেষ এমন হতভম্ব হয়েছিল যে মুখ থেকে তার কথা সরল না। এই ছেলেগুলো তাকে সেবা করার জন্য একটা রাত জেগে আছে! অথচ গত কাল এদেরই অন্যরকম চেহারা ছিল, মাতাল তিনটি যুবক অশ্লীলতার চূড়ান্ত করেছিল।

ওকে জাগতে দেখে ত্রিদিব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন, আরাম পাচ্ছ?'

অনিমেষ থাই-এর তলায় হাত দিয়ে আবিষ্কার করল, সেই পিন-ছোঁয়া যন্ত্রণা একদম নেই, শুধু জায়গাটা অসাড় হয়ে আছে। লজ্জিত গলায় অনিমেষ বলল, 'আমি ঠিক হয়ে গেছি, তোমাদের আর রাত জাগতে হবে না, এবার শুয়ে পড়ো।'

খেলা থামিয়ে গোবিন্দ বলল, 'আরে গুরু, রাত আর কোথায়? আর মাত্র এক ঘন্টা, তার পরেই ফুড় ত করে আকাশ ফরসা হয়ে যবে। বাট, তুমি ফিট তো?'

দুটো হাতে বিছানায় ভর দিয়ে অনিমেষ বলল, 'একবার উঠে দাঁড়ালে বুঝতে পারব।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল ত্রিদিব, 'না, না, আজ রাত্রে উঠতে হবে না।'

দুর্গাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? উঠে দেখুক গড়বড় আছে কিনা!'

'কাল সকালে দেখবে। উঠলে যদি ব্যথা লাগে তা হলে এখনই মন খারাপ হয়ে যাবে আমার। যতক্ষণ অনিমেষের ব্যথা না হচ্ছে ততক্ষণ মনে হবে ও সুস্থ হয়ে গেছে।' ত্রিদিব হাসল।

দুর্গাপদ চাপা গলায় বলে উঠল, 'কবিরা মাইরি এক নম্বরের এস্কেপিস্ট।'

খিদে পাচ্ছে খুব, কিন্তু ঘরে কিছু নেই যা খাওয়া যায়। ত্রিদিবের স্টকে অবশ্য বিস্কুট থাকে, ক্রিম দেওয়া বিস্কুট। হোস্টেলের ঠাকুরকে ডাকতে গেলে মারতে আসবে। অনিমেষ ত্রিদিবকে বলল, 'কয়েকটা বিস্কুট দাও তো খাব।'

'বিস্কুট?' অবাক চোখে তাকাল ত্রিদিব, 'এত রাতে বিস্কুট কেন? ওহো, তুমি তো রাত্রে কিছু খাওনি। যা শালা!' এক লাফে উঠে গিয়ে ত্রিদিব তার শেলফ থেকে চৌকো টিনটা বের করে ঢাকনা খুলল। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'ইস, বিকেলে কিনব ভেবেছিলাম, একদম ভুলে গেছি। মাপ করো গুরু, একদম ইয়াদ ছিল না, দু-তিনটে ভাঙা পড়ে আছে।'

খাবার কিছু না পেয়ে অনিমেষ ভাবল চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে, ঘুমালে খিদে লাগবে না। কিন্তু খিদে যখন প্রবল হয় তখন যে ঘুম আসতে চায় না! সে এক গ্লাস জল চাইল। জল খেয়ে পেট ভরানো যাক।

দুর্গাপদ বলল, 'খালি পেটে জল খাবে? তার চেয়ে একটু মাল দিয়ে জল খাও। ওতে প্রোটিন আছে, পেটও ভরবে, নার্ভ ঠিক থাকবে আর যন্ত্রণা দূর হবে।'

ত্রিদিব সম্মতির ঘাড় নেড়ে লুকোনো জায়গা থেকে কাচের বোতলটা বের করে দ্রুত হাতে একটা গ্লাসে সামান্য ঢেলে জল মিশিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'আঃ, দারুণ ফ্লেভার, খেয়ে নাও, অমৃত।'

BanglaBook.org

অনিমেষ অবিশ্বাসের গলায় বললে, 'যাঃ, খামোকা মদ খেতে যাব কেন?'

ত্রিদিব বলল, 'মদ কথাটা খারাপ। টেক ইট অ্যাজ মেডিসিন, অ্যাজ হেল্‌থ টনিক। শরীর সুস্থ করার জন্য খাওয়া। নাও, হাঁ করো, সেবা করতে দাও।'

নয়

প্রায় পাঁচ বছর অনিমেষ কলকাতা শহরকে দেখছে। যদিও যাতায়াতের চৌহদ্দিটা খুব সীমিত তবু একটা ধারণা ওর মনে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে এখানকার মানুষ অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরে আর কিছুতেই তাদের আগ্রহ নেই। আর আগ্রহ বলে যেটা মনে হয় সেটার জন্য যদি কিছু মূল্য দিতে হয় তবে তারা সে ব্যাপারে নিজেদের জড়াবেই না। খুব সামান্য কারণে পথে-ঘাটে ভিড় জমে যায়, কিন্তু যখনই জনতা বোঝে এর পর তারা জড়িয়ে যাবে তখনই তারা সরে পড়তে আরম্ভ করে।

নির্জন দুপুরে ত্রিদিবের আনা একটা পত্রিকা পড়ছিল অনিমেষ। কলকাতা শহরের বয়েস বড় জোর দেড় শো বছর। তার আগে ইতস্তত কিছু জায়গায় মানুষের বসতি ছিল। কলকাতার অরিজিন্যাল বাসিন্দা বলে কেউ নিজেদের দাবি করতে পারে না। চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমানের কিছু বর্ধিষ্ণু পরিবার যাঁদের অর্থকৌলীন্য চাষের দৌলতে পরিচিত ছিল তাঁরাই ইংরেজের সঙ্গে কর্মসূত্রে মিলিত হবার জন্য কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কলকাতার চেহারা খুলল। তখন শ্যামবাজার থেকে বউবাজার অঞ্চলের বাসিন্দারাই ছিলেন শহরের মাতব্বর। ব্রাহ্মণদের তখনও কলকাতায় আগমন হয়নি ব্যাপক হারে। আসলে বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রামে যে সব তর্কালঙ্কার কিংবা ন্যায়রত্নরা ধর্মের দোহাই পেড়ে আধিপত্য করতেন তাঁদের বংশধররা পড়েছিলেন বিপাকে। তাঁদের অহঙ্কার সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর অব্রাহ্মণরা জীবিকার প্রয়োজনে দ্রুত ওই শিক্ষা গ্রহণ করে। রাজপুরুষের অনুগ্রহ না থাকলে কোনও ধর্মই আধিপত্য পায় না, ফলে সেইসব তর্কালঙ্কারের সন্তানাদিরা ইংরেজিশিক্ষার দিকে যখন ঝুঁকলেন তখন অন্যান্যেরা অনেক এগিয়ে গেছে। বাঙালির চরিত্রে চাকরি করার যে প্রবণতা জন্ম নিল তা তার রক্তে মিশে গেল। ধর্মের দোহাই দিয়ে যখন আর বাঁচা যায় না তখন বাংলা দেশের দূর-দূরান্ত থেকে শুরু হল কলকাতা অভিযান। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর বাবার হাত ধরে হেঁটে আসতে হয়েছিল কলকাতায় শুধু পয়সার অভাবে।

কলকাতা হল সরগরম। শ্যামবাজার থেকে বউবাজারকে বলা হল ঘটি এলাকা। পূর্ববঙ্গের মানুষ তখনও কলকাতায় বিদেশি এবং কালীঘাট-বেহালার কিছু মানুষ অনেক আগেই থেকেই রয়ে গেলেও তাঁরা ঠিক এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কলকাতার চেহারা রাতারাতি পালটে গেল। হু হু করে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ আসছে। কলকাতা বেলুনের মতো ফুলে জায়গা করে নিচ্ছে। এই নেওয়া এখনও শেষ হয়নি। উত্তর কলকাতার মানুষ যাদের আভিজাত্যের গর্ব ছিল আকাশছোঁয়া তাদের কলসি গড়িয়ে গড়িয়ে তলানিতে ঠেকল। নতুন সম্প্রদায় জন্ম নিল দক্ষিণ কলকাতায়, পূর্ববঙ্গের ধনবান শিক্ষিত মানুষেরা এসে দেশের ওপরতলার চেয়ারগুলো দখল করে নিজেদের আলাদা গোত্রের বলে চিহ্নিত করে নিলেন। নতুন এক ধরনের অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠল যাঁদের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ থাকল না। স্বাধীনতার পর কলকাতা অন্যরকম চেহারা নিয়ে নিল। বেলঘরিয়া থেকে যে কলকাতার শুরু তা থমকে দাঁড়াচ্ছে গড়িয়ায় গিয়ে। কিন্তু এই কলকাতার চেহারাটা কতগুলো খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল যেটা আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যাবে না। বেলঘরিয়া-দমদম এলাকার সঙ্গে টালিগঞ্জ-যাদবপুর-গড়িয়ার মানুষদের চরিত্রগত মিল বেশি, কারণ এইসব এলাকার মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে এসে কলোনি স্থাপন করেছিলেন। দেশত্যাগের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা এঁদের জীবনযাত্রার ধরন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের থেকে অনেক ধারালো করে দিয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জেদি হওয়ায় ক্রমশ এঁরা কলকাতার ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরের কলকাতা কোনও ভাবপ্রবণতার সঙ্গে জড়িত থাকল না। উত্তরে চিৎপুরের গোড়া থেকে কাশীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল অবাঙালি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। বড়বাজারের সঙ্গে উত্তর ভারতের কোনও শহরের তেমন পার্থক্য নেই। বস্তুত কলকাতার বাঙালিরা বড়বাজারের কোনও কোনও এলাকাকে বিদেশ বলে মনে করে। মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের ওখানে একচ্ছত্র আধিপত্য। পূর্বে রাজাবাজার

BanglaBook.org

এলাকায় কয়েক হাজার অবাঙালি মুসলমানের বসবাস। ট্যাংরা চিনে পাড়া হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মতলা এলাকায় বাঙালি পরিবার গোনাগুনতি। পাশেই পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ইংরেজ শাসনের আর এক ফসল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব এলাকা। খিদিরপুর-মোমিনপুর এলাকায় অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার। ক্রমশ রাসবিহারী এভিন্যু এবং তার সন্নিহিত এলাকা দক্ষিণ ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট হতে চলেছে। অর্থাৎ মূল কলকাতার যে এলাকা সেখানে বাঙালিরা খুবই সংখ্যালঘু। প্রবন্ধের শেষে লেখক তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই বলে যে, এই কস্‌মোপলিটন শহর বিক্ষিপ্তভাবে কোনও ঘটনায় ফুঁসে উঠতে পারে কিন্তু কখনও একই ভাবপ্রবণতায় আলোড়িত হতে পারে না।

এখন ঘরে কেউ নেই। ত্রিদিব কলেজে চলে গিয়েছে। কাল রাত থেকে জব্বর ঘুমিয়েছে অনিমেষ। ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় এগারোটা। ওর যাতে অসুবিধে না হয় তাই ত্রিদিব ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেছে। মাথার পাশে কিছু পত্রিকা আর একটা চিরকুট পেয়েছিল অনিমেষ। 'ঠাকুরকে বলে গেলাম খাবার ঘরে দিয়ে যাবে। আজ হাঁটার চেষ্টা কোরো না।'

হাঁটার কথাটা পড়তেই চলকে এল চিন্তাটা। তার পা গত কাল দারুণ জখম হয়েছিল, হাঁটতে গেলে যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছিল সে। সারা রাত শুয়ে থাকায় সে এ কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল। হাত দিয়ে শুয়ে শুয়েই পা টিপে দেখল অনিমেষ। না, কোথাও লাগছে না। কিন্তু মাটিতে পা পেতে দাঁড়ালেই ওটা মালুম হবে। যেন ব্যাপারটা ভোলার জন্যেই সে বিছানা ছেড়ে উঠছিল না। দু-তিনটে পত্রিকা উলটে-পালটে সময় কাটাচ্ছিল। কিন্তু কতক্ষণ এ ভাবে পারা যায়! হাতমুখ ধোয়া দরকার, তা ছাড়া বাথরুমে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অনিমেষ আশা করছিল এখনই ঠাকুর খাবার নিয়ে আসবে। ঠাকুর এলে তার কাঁধে ভর দিয়ে ও সব সেরে নিতে বাথরুমে যেতে পারবে সে। কিন্তু ঠাকুরের জন্যে আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

অনিমেষ ঘরে একবার নজর বুলিয়ে নিল। না, একটা লাঠি জাতীয় কিছু নেই যেটায় ভর দিয়ে হাঁটা যায়। কপালে যা আছে তাই হবে এইরকম ভেবে অনিমেষ প্রথমে ভাল পা মাটিতে রাখল। তারপর সন্তর্পণে অন্য পা নামিয়ে ভাল পায়ে শরীরের ভার রেখে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। না, এখনও কোন যন্ত্রণা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে সেটা দাঁত বসাবে। অনিমেষ কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। এতক্ষণ যেটা সামান্য ছিল, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সেটা প্রবল হল। বাথরুমে যাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। বিপদটা ইচ্ছে করে ডেকে না এনে আর একটু শুয়ে থেকে ঠাকুরের অপেক্ষা করা যদি যেত! দ্বিধায়, ভয়ে ভয়ে সে জখম পা সামান্য বাড়িয়ে একটু একটু করে শরীরের ভার রাখতে লাগল। না, ব্যথা লাগছে না, ধীরে ধীরে সমস্ত ভার ছেড়ে দিতে থাই-এর কাছটায় সামান্য চিনচিন করতে লাগল মাত্র। অনিমেষ এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওই মুহূর্তে সে সব প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে নিজের পা দুটো লক্ষ করতে লাগল। কী আশ্চর্য! কালকের যন্ত্রণাটা এখন বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল? অনিমেষ দুরুদুরু বুকে পায়ের ওপর আবার চাপ রাখল। হয়তো দাঁড়িয়ে আছে বলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, হাঁটতে গেলেই টের পাওয়া যাবে। ঠিক এই সময় ঠাকুর হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। এক হাতে খাবারের থালা, অন্য হাতে জলের গ্লাস। অনিমেষকে দাঁড়াতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল যেন, 'ত্রিদিববাবু কইল আপুনি হাঁটিতে পারবা নাই, ঠ্যাং ভাঙ্গি গেছে!'

ত্রিদিব কী বুঝিয়েছে অনুমান করে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'সবটা ভাঙেনি, তুমি খাবারটা টেবিলে রেখে এসে আমাকে একটু ধরবে?'

ঠাকুরের হাঁটা-চলা সব সময় দ্রুত মুহূর্তেই সে অনিমেষের কাঁধ জড়িয়ে ধরল। অনিমেষ হাঁসফাঁস করে উঠল, 'আরে, এ ভাবে নয়। তুমি চুপচাপ দাঁড়াও, আমি তোমাকে ধরে হাঁটব।'

কিন্তু সেটা ঠাকুরের পছন্দ নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁটিবার কী কারণ?'

অনিমেষ বলল, 'বাথরুমে যাব।'

ঠাকুর হাসল, 'আপনার খাটিয়ার নীচে একটা পাত্র রাখি গেছে জমাদার। ওইটার মধ্যে করি ফেলেন।'

খবরটা জানত না অনিমেষ। কিন্তু ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল না তার। সে একটু জোরেই আদেশ করল, 'যা বলছি তাই শোনো, তুমি বাথরুমের দিকে হাঁটো।'

BanglaBook.org

ঠাকুরের শরীরে ভর রেখে কয়েক পা হাঁটতেই অনিমেষ আবিষ্কার করল কালকের সেই মারাত্মক ব্যথাটা মোটেই নেই। থাই-এর কাছে কোনও শিরা সামান্য চিনচিন করা ছাড়া তার কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। এটা কেমন করে সম্ভব মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু অদ্ভুত একটা স্বস্তিতে মন এখন শান্ত হয়ে যাচ্ছে। আনন্দ যখন খুব প্রবল হয় তখন বিস্ফোরণে নয়, চুপচাপ সেটার অনুভবেই বোধ হয় পূর্ণতা পায়। অনিমেষ ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এল। চারপাশে এখন কড়া রোদ ছড়ানো, দু চোখ বন্ধ করে আলো সইয়ে নিল সে।

ভরদুপুরে স্নান করে ভাত খেয়ে বেশ আরাম হল। একটা সিগারেট পেলে বেশ হত। অনিমেষ খোলা জানলার পাশে চেয়ার পেতে মৌজ করে বসেছিল। কাল যে দারুণ ভয় সে পেয়েছিল সেটা মিথ্যে হওয়ায় এখন খুব হালকা লাগছে। ট্রামে উঠতে গিয়ে এমন কিছু বেকায়দায় লাগেনি যে পায়ের জোড়া হাড় ফের ভাঙতে পারে। কিন্তু ব্যথা হওয়া মাত্র সে কথাটাই মনে এসে বদ্ধমূল হয়েছিল। এমনকী, হোস্টেলের ডাক্তার পর্যন্ত স্পেশালিস্ট দেখিয়ে দিলেন। এই জন্যেই বোধ হয় সবাই তাঁকে ঘোড়ার ডাক্তার বলে। অনিমেষ সিদ্ধান্তে এল, ওটা নিশ্চয়ই মাস্‌ল্‌ পেইন, শিরায় টান ধরেছিল আচমকা। মানুষ কত সহজে ভয় পেয়ে যায়!

আজ ক্লাশ কামাই হল। এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে এখন আর একরকম আলস্যি এসে গেছে। কালকের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল অনিমেষ। বিমান ধরেই নিয়েছে সে ছাত্র ফেডারেশন করবে। এ কথা ঠিক সে ছাত্র ফেডারেশনকে সমর্থন করে এই কারণে যে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কোনও যুক্তি তার কাছে নেই। কিন্তু তাই বলে যে ভাবে বিমান তাকে সবার কাছে উপস্থিত করল সেটা কখনওই শোভন নয়। নাকি তাকে সামনে খাড়া করে বিমানরা একটু যুদ্ধে এগিয়ে গেল। সুবাসদার সঙ্গে কাল যদি অমন করে দেখা না হয়ে যেত তা হলে এ সব ঘটনা ঘটত না। অনিমেষের মনে পড়ল সুবাসদা বলেছিলেন যাওয়ার আগে সন্ধেবেলা তার সঙ্গে দেখা করে যাবেন হোস্টেলে এসে। কিন্তু সুবাসদা আসেননি। হয়তো বৃষ্টির জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। বিমানদের চেয়ে সুবাসদাকে তার অনেক গভীর এবং কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অথচ ওরা দুজনেই এক দলের সক্রিয় কর্মী। ছাত্র ইউনিয়নের কথা ভাবতেই শচীনের কথাগুলো মনে পড়ল। কংগ্রেসের সমর্থনে এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে শচীন যাই বলুক, নিশ্চয়ই তার পালটা বক্তব্য রাখা যেতে পারে। কিন্তু শচীনের কথাগুলো আরও ভাল করে শোনা দরকার। শচীনের কথা মনে হতেই চট করে নীলার মুখ ভেসে এল। নীলা একা পায়চারি করতে ওদের ফেলে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল। কথাটা ভাবতেই অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। আজ নীলা তাকে বাসস্টপে অপেক্ষা করতে বলেছিল। কথাটা স্মরণেই ছিল না তার। এখনও সেখানে যাওয়ার যথেষ্ট সময় আছে, কিন্তু অনিমেষ আবিষ্কার করল বেরুতে একদম ইচ্ছে করছে না। আলসেমি এমন পেয়ে বসেছে যে ইচ্ছে করছে আবার শুয়ে পড়ে। নীলা নিশ্চয়ই বাসস্টপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং অনিমেষ না গেলে বিরক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। কেউ আসবে বলে না এলে মেজাজ ঠিক থাকে না। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ে কোথাও ওর জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেনি। এবং যে মেয়ে সোজাসুজি কথা বলে সে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাবলেই এক ধরনের বুক-ভরা আনন্দ হয়, তবু অনিমেষ দোনামোনা করতে লাগল। এ কথা ঠিক, তার পায়ের দোহাই দিয়ে সে নীলার রাগ কমাতে পারবে। ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে লাগছে না বটে কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে ট্রাম-বাসে চড়তে গেলে যদি আবার কালকের মতো যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়! সবাই বলবে তার আজকের দিনটা অন্তত রেস্ট নেওয়া উচিত এবং সে তাই করছে। অনিমেষ এত সব যুক্তি খাড়া করেও ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়বে বলে অনিমেষ যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন দরজায় শব্দ হল। আস্তে আস্তে জায়গাটুকু পেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দারোয়ানকে দেখতে পেল সে। তার শরীরের দিকে দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর ঠিক আছে বাবু?'

তার শরীর খারাপ হয়েছিল বলে সবাই খবর নিতে আসছে দেখে অনিমেষের ভাল লাগল, 'এখনও ঠিক—তবে কালকের থেকে ভাল।'

'আপনি গেটে যেতে পারবেন?'

'কেন?'

'একজন মেয়েছেলে আপনার খবর নিতে এসেছে।'

'মেয়েছেলে?' অনিমেষ হকচকিয়ে গেল। মেয়েছেলে মানে নিশ্চয়ই নীলা। কিন্তু ও খবর পেল কী করে? তিনটে বাজতে তো এখনও কিছু দেরি আছে। ওর পরিচিতি এই হোস্টেলের কোনও

BanglaBook.org

ছেলেকে নীলা চেনেনা যে তার মুখে খবর পেয়ে দেখতে আসবে। নাকি মেয়েদের সেনসিটিভনেস এত বেশি যে ঠিক মনে মনে জেনে যায় কী হয়েছে। মেয়েরা যাদের ভালবাসে তাদের সম্পর্কে তারা নাকি এই রকম অনুভব করতে পারে। কিন্তু নীলার সঙ্গে তো তার সেরকম সম্পর্ক নয়। অনিমেষ দারোয়ানকে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো, সিঁড়ি ভেঙে নামতে সাহায্য লাগতে পারে।'

ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল অনিমেষ। দারোয়ানের সাহায্য লাগল না। কিন্তু নীচে নামার পর থাই টনটন করতে লাগল। অনিমেষ আশঙ্কা করছিল এই বুঝি আবার যন্ত্রণাটা শুরু হল। সিঁড়ির মুখে একটু সময় নিল সে। ওপর থেকে নীচে নামার চেয়ে নীচে থেকে ওপরে ওঠায় কষ্ট বেশি হবে। এই হোস্টেলের খুব কড়া নিয়ম কোনও মেয়েকে কারও ঘরে গিয়ে দেখা করতে দেওয়া হবে না। এমনকী, তিনি যদি কোনও আবাসিকের মা হন তবুও নয়। নিয়মটা হয়তো ভাল কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় হওয়া উচিত—এই মুহূর্তে অনিমেষ অনুভব করল। পরক্ষণেই থম্বোটোর বন্ধুর কথা মনে পড়ায় হেসে ফেলল সে। তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আধভেজানো গেটের সামনে কেউ নেই। মেঘের ছায়ামাখা রোদ সেখানে নেতিয়ে আছে। এই ভরদুপুরে কলকাতা ভীষণ নির্জন হয়ে যায়, কেমন ভার হয়ে থাকে চারধার। অনিমেষ দারোয়ানের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সে গেস্টরুমটা দেখিয়ে দিল। কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরতেই গেস্টরুমের খোলা দরজা দিয়ে যাকে অনিমেষ দেখতে পেল ক্ষীণতম কল্পনাতেও তাকে আশা করেনি সে। হতভম্ব হয়ে যাওয়ার ভাবটা লুকোতে পারল না অনিমেষ। তারপর সন্তর্পণে পা ফেলে গেস্টরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ?'

উঠে দাঁড়ালেন মহিলা 'দেখতে এলাম, পা কেমন আছে ?'

অনিমেষের সব গোলমাল হয়ে গেল। শীলা সেনের দিকে সে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। গতকাল সন্ধ্যায় ট্যাক্সিতে সামান্য আলাপ আর সেইটুকুনিতেই তিনি ছুটে এসেছেন তার শরীরের খবর নিতে। কলকাতার মানুষ মাত্রই যে স্বার্থপর নয় এটা বোধ হয় তার একটা নজির। ওঁর মতন সুন্দরী মহিলা, যিনি নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল, এতটা করবেন ভাবা যায় না। ভেতরে ভেতরে যখন আলোড়ন ওঠে তখন মুখে কথাগুলো মিলিয়ে যায়। চেষ্টা করলেও সে সময় শব্দ আসে না। আবেগটা কমাতে সময় লাগল তার।

মহিলা একটু বিস্মিত হলেন, 'আমি কি এসে অন্যায় করলাম কিছু ?'

দ্রুত ঘাড় নাড়লেন অনিমেষ, 'না, না, এ কথা ভাবছেন কেন ? আপনি বসুন।' গেস্টরুমটা মোটেই সাজানো নয়। কিছু চেয়ার-টেবিল এদিক-ওদিকে ছড়ানো। অনিমেষ চৌকো টেবিলের গা ঘেঁষে থাকা চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে আর একটায় বসল। বসে বলল, 'আপনি সত্যি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন।'

শীলা সেনের দুই ভ্রূর মাঝখানে চট করে কয়েকটা আঁচড় জাগল, 'কেন ? আমি এলাম তাই ? আশ্চর্য! কালকে যাকে অমন অসুস্থ দেখে গেলাম তার খোঁজ নেব না।'

অনিমেষ আপ্লুত গলায় বলল, 'সচরাচর তো দেখা যায় না এমন!'

শীলা সেন তাঁর টান-টান খোলা চুলের রাশটাতে সামান্যঢেউ তুলে বললেন, 'আমি অন্যরকম। তা আমার প্রশ্নটার উত্তর পেলাম না কিন্তু ?'

'এখন ভাল আছি। এই তো ওপর থেকে হেঁটে নীচে নেমে এলাম।' অনিমেষ জানাল। নিজের শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ওর।

'কিন্তু কালকে কী হয়েছিল, একা হাঁটতে পারা যাচ্ছিল না দেখলাম।' শীলা সেনের মুখের প্রতিটি রেখায় আন্তরিকতার ছাপ।

'শিরায় টান পড়েছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি। এমন কিছু নয়।'

'নিশ্চয় সামান্যও নয়, নইলে আজ কলেজ যাওয়া হত। শীলা সেন ভ্রূভঙ্গিতে সন্দেহটা জানিয়ে দিলেন, 'যাক বাবা, নিশ্চিন্ত হলাম। কালকে বাড়িতে ফেরার পর বারবার করে মনে হচ্ছিল বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকা হয় জেনেও আমি কিছু করলাম না। কারও কষ্ট হলে এত খারাপ লাগে, মনটা কেমন হয়ে যায়।'

এই ভরদুপুরে অনিমেষ মহিলাকে ভাল করে দেখল। কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত কোনও বাঙালি মহিলার একজন নিগ্রো যুবকের সঙ্গে এমন যোগাযোগের সম্ভাবনা নেই যার ফলে ছেলেটি আসক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। শীলা সেন কি তা হলে মধ্যবিত্ত নন ? উনি যে পাড়ায় এবং যে বাড়িতে বাস করেন সেটাকে কিছুতেই অতি আধুনিক বলা যায় না। উনি এখন যে ভাষায় কথা

BanglaBook.org

বলছেন তা কোনও সোসাইটি মেয়ে বলে কিনা অনিমেষের জানা নেই। তবু থয়োটোর বন্ধুর সঙ্গে একটা ট্যাক্সি চেপে আসার সাহস এঁর আছে। থয়োটোর বন্ধু এঁর বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাব করার সাহস রাখে। তা হলে ইনি কী? গত কাল মুহূর্তের জন্য হলেও অনিমেষের মনে হয়েছিল শীলা সেনের পুরুষ-ধরা জীবিকা। গতকাল ট্যাক্সিতে এঁকে খুব রহস্যময়ী এবং মোহিনী বলে মনে হয়েছিল। আজ এই দুপুরে সামনাসামনি বসে অবশ্য কোনও রহস্য দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু মহিলা দু' হাতে টান-টান করে সৌন্দর্যের লাগাম ধরে রেখেছেন। বয়সে নিশ্চয়ই বছর দশেকের বড় হবেন, কিন্তু লাবণ্য হল এমন একটা জিনিস যা সহজেই নিচু হয়ে দশ বছর নেমে আসতে পারে।

অনিমেষ বলল, 'আপনি এসেছেন জানলে থয়োটোর বন্ধু অবাক হয়ে যাবে।'

শীলা সেন বললেন, 'থয়োটোর বন্ধু? ও, মোসাম্বার কথা বলা হচ্ছে? সে আছে নাকি হোস্টেলে?'

অনিমেষ বলল, 'আমি ঠিক জানি না। সকাল থেকে দেখা হয়নি। খোঁজ করব?'

শীলা সেন হেসে উঠে দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না, না, তার দরকার নেই। আমি এসেছিলাম তাও বলতে হবে না। এই ছেলেগুলো এত প্যাশনেট হয় যে রিজন্ বুঝতে চায় না।'

বলি বলি করে অনিমেষ বলে ফেলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি কিছু মনে না করেন?'

আবার ভ্রূভঙ্গি হল, 'মনে করার হলে নিশ্চয়ই মনে করব।'

'তা হলে থাক।'

'উম্! বেশ, কথাটা কী?'

অনিমেষ প্রশ্নটা সাজাতে সময় নিচ্ছিল। সেই ফাঁকে শীলা সেন হেসে উঠলেন, 'নিশ্চয় বলা হবে কী করে ওর সঙ্গে আলাপ হল, আমি কী করি— এই সব তো? ঠিক আছে, আমিই জবাব দিয়ে দিচ্ছি—প্রশ্ন করতে হবে না। আমি একটা ট্রাবেল এজেন্সিতে আছি যাদের সঙ্গে এই সব আফ্রিকান কানট্রিগুলোর ভাল রিলেশন আছে। ওর দেশ থেকে যে-সব ছেলে এখানে পড়তে আসে আমরা তাদেরও ব্যবস্থা করি। আর এই সব করতে গেলে শুচিবাই হলে চলে না। কিছু বোঝা গেল?

অনিমেষ স্বীকার করল, না, এত কথাতেও তার কাছে কিছুই স্পষ্ট হল না। শুধু চাকরি করতে গিয়ে কেউ কি এরকম প্রশ্রয় দেয় অচেনা পুরুষকে? তা ছাড়া শীলা সেন মোসাম্বার কাছে তাঁর এই উপস্থিতি লুকিয়ে রাখতে চান। সেটাও কি স্বাভাবিক? সে মহিলার মাথার দিকে তাকাল। সিঁথি দেখে ও কিছুতেই বুঝতে পারে না কেউ বিবাহিতা কিনা। স্বর্গছেঁড়া কিংবা জলপাইগুড়ির মতো সিঁথিতে গাঢ় সিঁদুর এখানকার মেয়েরা পরে না। চুলের আড়ালে যদি কোনও সিঁদুর টিপ থেকেও থাকে তবে তা খালি চোখে দেখা যায় না। শীলা সেন বিবাহিতা কিনা জিজ্ঞাসা করা অশোভন। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল সে এত কৌতূহলী হচ্ছে কেন? এই মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী? কিছুই না। মাত্র এক দিনের আলাপ। তার মতো সাধারণ অবস্থার ছেলের পক্ষে এইরকম মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। কথাটা ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করল অনিমেষ, 'কিন্তু আপনি এসেছেন এ কথা জানতে পারলে মোসাম্বা খুব আহত হবে। তার চেয়ে—।'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন শীলা সেন, 'আই অ্যাম ফেড আপ। ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে আমার পেছনে। ও সব কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আমরা বরং চা-বাগানের গল্প করি। একটা চা-বাগান অনেকখানি জায়গা নিয়ে হয়, না?'

অনিমেষ ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল, অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আট-দশ মাইল জায়গা নিয়েও একটা চা-বাগান হতে পারে।'

'বাব্বা! তা হলে তো অনেক টাকার দরকার হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। আগে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি এক-একটা চা-বাগানের মালিক ছিল। স্বাধীনতার পর ওরা দেশি কোম্পানির কাছে বাগানগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় কিছু চা-বাগান আছে।' অনিমেষ তথ্যটা জানাল।

শীলা সেন বললেন, 'সত্যি, আমরা কিছুই খবর রাখি না। রোজ সকালে এক কাপ চা না খেলে চলে না অথচ সেটা কী করে তৈরি হচ্ছে সে খবর রাখার প্রয়োজন অনুভব করি না। যে জায়গায় থাকা হয় তার চারধারে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, তাই না?'

অনিমেষ হেসে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূভঙ্গি হল, 'হাসা হল কেন?'

'আপনি আমাকে তুমি বলুন। ও ভাবে কথা বললে অস্বস্তি হয়।'

BanglaBook.org

'ও মা, তাই নাকি! আমি ভাবলাম তুমি বললে রাগ হয়ে যাবে। আজকাল ছেলেরা ভীষণ অভিমানী হয়ে গেছে, আত্মসম্মান আত্মসম্মান করেই মরল। তোমাকে তুমি বলতে পেরে আমি বেঁচে গেলাম।' তৃপ্তির ছাপ ওঁর চোখে।

অনিমেষ বলল, 'আমাদের ওখানে কাছাকাছি কোনও পাহাড় নেই, তবে পাহাড়ি আবহাওয়া মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। আর সারা দিন আমরা এমন কত জিনিস ব্যবহার করি যার সম্বন্ধে খোঁজ নেবার খুব প্রয়োজন পড়ে না। এই যেমন আমি এখনও জানি না টেলিফোনের সিস্টেমটা সঠিক কী! এরকম তো কত কিছু আছে! তাই চা তৈরির সিস্টেমটা না জেনেও অনেকে খুব চমৎকার চা তৈরি করতে পারেন, তাই না?'

দাঁতে ডান গাল কামড়ে আলতো করে ছেড়ে দিলেন শীলা সেন, 'তুমি তো খুব সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারো। তোমার কি এখন কোনও কাজ আছে?'

অনিমেষ মাথা নেড়ে না বলল।

'তা হলে চলো আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে।' শীলা সেন উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু আমার তো হাঁটতে কষ্ট হবে। কালকে অমন হল, আমি আজ বেরুতে চাই না।' অনিমেষ আপত্তি জানাল।

শীলা সেনের কথাটা একদম পছন্দ হল না, 'ইস্ জোয়ান ছেলের এত ভয় করলে চলে! আর কিছু হলে তো আমি আছি। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোমাকে একপাও হাঁটতে হবে না। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল। উনি এতক্ষণ এখানে বসে আছেন বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে! আশ্চর্য ব্যাপার! এতক্ষণে তো প্রচুর মিটার উঠে গেছে। কিন্তু যেতে যে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। সে হেসে বলল, 'আজকে আমাকে ভীষণ আলস্যেমিতে পেয়েছে। আজ থাক।'

শীলা সেন সর্বাঙ্গে তাকে দেখলেন। তারপর খুব আস্তে বললেন, 'জানো, আজ অবধি কেউ আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেনি। শুধু সবাই যেচে এসে আমাকে এইরকম আমন্ত্রণ জানায়, আমি রাজি হলে কৃতার্থ হয়ে যায়। আর নিজে থেকে যদি কাউকে বলি সে আকাশ হাতে পায়। তুমি যে বলতেই আমার কথায় রাজি হলে না এতে তোমার ওপর আমার অন্যরকম ধারণা হল। আচ্ছা, আজ তা হলে চলি ভাই, তোমার যখনই ইচ্ছে হবে আমাকে টেলিফোন কোরো, সারাটা সকাল আমি বাড়িতে থাকি।'

শীলা সেনের পেছন পেছন গেট অবধি এল অনিমেষ। ট্যাক্সি ড্রাইভার সিটের ওপর শরীর এলিয়ে শুয়েছিল। ওঁকে দেখে সোজা হয়ে বসল।

গাড়িতে ওঠার সময় শীলা সেন ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন, 'টেলিফোন নম্বরটা মনে আছে তো? থ্রি ফাইভ আর চারটে শূন্য।'

নির্জন গলি দিয়ে ট্যাক্সিটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল অনিমেষ। এতক্ষণ কথা বলেও মহিলাকে সে একটুও বুঝতে পারল না। উনি কেন ওর কাছে এলেন, কেন বারেবারে টেলিফোন নম্বর দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য কী হতে পারে? নিছক ভদ্রতায় কেউ এতটা করে না। অনিমেষের সন্দেহ হল উনি তাকে এমন কিছুতে জড়াতে চাইছেন যাতে ওঁর কোনও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। সেটা কী তা জানা যাচ্ছে না কিন্তু তার মতো আদার ব্যাপারির জাহাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনও কারণ থাকতে পারে না। মহীতোষ বা সরিৎশেখর এরকম মহিলার সঙ্গে অপ্রয়োজনে তার আলাপের কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু এতক্ষণ ভাবা সত্ত্বেও অনিমেষ অনুভব করল শীলা সেন সম্পর্কে তার কৌতূহল কিছুতেই কমছে না।

ফিরে আসার জন্য অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াতেই দারোয়ানের সঙ্গে চোখাচোখি হল। লোকটা যে মিটিমিটি হাসছে এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না। প্রায় চার-পাঁচ বছর সে লোকটাকে দেখছে কিন্তু এরকম মুখ করতে কোনও দিন দেখেনি। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

'মেয়েছেলেটা আপনার কে হয়, বাবু?'

'চেনাশোনা, কেন?'

একটু ইতস্তত করল দারোয়ান, তারপর বলে ফেলল, 'ও মেয়েছেলেটা ভাল না।'

'কেন?'

'ও মেয়েছেলেটা নিগ্রোসাহেবের সঙ্গে খুব ঢলাঢলি করে। একদিন আটটার পর নিগ্রো সাহেব জোর করে ওকে নিয়ে ঢুকতে চেয়েছিল ঘরে। ভাল মেয়েছেলে হলে রাজি হবে কেন? তা ছাড়া একদিন মাল খেয়ে এসেছিল।'

BanglaBook.org

'মাল খেয়ে? নেশা করেছিল?' অনিমেষ অবাক।

'হ্যাঁ বাবু, নিগ্রো সাহেবও মাল খেয়েছিল। সেদিন অবশ্য মেয়েছেলেটা ট্যাক্সি থেকে নামেনি, কিন্তু আমার চোখ এড়াতে পারেনি।'

'তুমি কী করে বুঝলে উনি মদ খেয়েছেন?'

'এ আপনি কী কথা বললেন বাবু। আমি শুকনো নেশা করি বলে ভিজে নেশার গন্ধ টের পাব না! হে হে হে।'

শীলা সেন মদ খান কি না খান, ভাল মেয়ে কি খারাপ মেয়ে তাতে তার কী এসে যায়। একটা ব্যাপার সে অনুভব করতে পেরেছে, শীলা সেন তাঁকে খুঁজতে এই হোস্টেলে হয়তো আর আসবেন না। কিন্তু তিনি অনিমেষের টেলিফোনের প্রতীক্ষায় থাকবেন। ফাঁদ হোক বা নাই হোক, অনিমেষ আর সেখানে পা বাড়াচ্ছে না।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতে কষ্ট হল না। এতক্ষণে কালকের হারানো মনের জোরটা আবার ফিরে এসেছে। শরীরে যে আলসেমি ঘুম-ঘুম ভাবটা কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সেটা আর নেই। জানলার ধারে এসে দাঁড়াতেই ফাঁকা ছাদগুলো আর সিসে রঙা আকাশটা দেখতে পেল। এইরকম শূন্য দুপুরে কেমন ফাঁকা লাগে কলকাতায়। নীলা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাসস্টপে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছে! কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে অনিমেষের অস্বস্তি আরম্ভ হল। শীলা সেনের আসার আগে তার এমনটা হয়নি। পরিষ্কার পাজামার ওপর একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এল সে। দরজায় তালা দিয়ে নামতে নামতে খেয়াল হল ত্রিদিবরা এসে তাকে না দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু একটা মেয়ে তার জন্যে বাসস্টপে অপেক্ষা করে আছে আর সে ঘরে বসে থাকবে? তার পা এখন যথেষ্ট সুস্থ, শীলা সেনের সঙ্গে দেখা করতে সে যদি অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে যেতে পারে তা হলে নীলা কী দোষ করল!

ট্রামে ওঠার পর অনিমেষের মনে হল সে বোধ হয় একটু দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছে। কারণ, এখন পা বেশ ভার-ভার ঠেকছে। ও নিজেকে প্রবোধ দিল এটা শুধু মানসিক ব্যাপার। স্কুলে মণ্টু একটা থিয়োরি দিয়েছিল। এক হাতে খুব যন্ত্রণা হলে সেটা কমাতে অন্য হাতে খুব জোর চিমটি কাটতে হয়। নতুন জায়গায় ব্যথা হলে পুরনোটার ধার কমে যায়। ব্যাপারটা করলে কেমন হয়! কিন্তু অনিমেষ সাহস পেল না।

ইউনিভার্সিটির সামনে স্টপে নেমে পড়ল অনিমেষ। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নীলাকে খুঁজল। না, নীলা নেই। তাকে আসতে বলে নীলা চলে যাবে? অনিমেষের বুকে অভিমান জমতে শুরু করতেই সে একজনের হাতের ঘড়ি দেখতে পেল। চারটে বাজতে সামান্যই দেরি এখন। তা হলে নীলা এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে নিশ্চয়ই চলে গেছে। অভিমান চেহারা পালটে ফেলল আচমকা। নিজেকে খুব অসহায় এবং হৃতসর্বস্ব বলে মনে হচ্ছে। যদি নীলা তার জন্যে অপেক্ষা করে কোথাও চলে যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই খুব বেশি সময় আগে নয়। নীলা এখন কোথায় থাকতে পারে? পর পর যে জায়গাগুলো চোখে ভাসল সেগুলো হল কফি হাউস, লাইব্রেরি কিংবা ওর নিজের বাড়ি। এমনও হতে পারে ও চলে গিয়েও আর একবার ফিরে আসতে পারে অনিমেষ এল কিনা দেখবার জন্য। চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল সে। নীলার মতো মেয়ে তা করবে না। সময়মতো না আসায় অনিমেষকে ও আর আশা করবে না।

অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা নিয়ে অনিমেষ দাঁড়িয়ে ছিল। চারধারে মানুষের ব্যস্ততা, ট্রাম-বাসের আওয়াজ, ছেলে-মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে, অনিমেষ একটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। আধ ঘণ্টা আগেও নীলার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার ব্যস্ততা ছিল না। কিন্তু এখন সেই নীলাকে দেখতে না পেয়ে সব কিছু ফাঁকা মনে হচ্ছে। অনিমেষের মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে সব কিছুই তার জন্যে অপেক্ষা করবে কিন্তু সে সময়মতো সেই অপেক্ষার জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না। আর এ সব কথা কাউকে বলা যায় না, শুধু বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াতে হয়।

দশ

অন্যমনস্ক হয়ে আংটিটা ঘোরাচ্ছিল অনিমেষ। ঘোরাতে ঘোরাতে সচেতন হতেই সেটায় নজর গেল। আঙুলের যে অংশটায় ওটা চেপে আছে সেটা সাদা হয়ে গেছে কখন। ঘাসের ওপর কিছু চাপা থাকলে রং কিছু দিন পর যেরকম হয়। চট করে দেখলে জায়গাটা নিজের বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

দীর্ঘকাল কোনও কিছু আবদ্ধ থাকলে এমনি করে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে ? হাতের অন্য অংশের চেয়ে এই জায়গাটা বেশ ফরসা ফরসা লাগছে, কিন্তু সেটা যে দৃষ্টিকটু তা মানতেই হয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে বোধ হয় এইরকম বোধ কাজ করে। যা সহজ তা সব সময়েই শ্রেয়, যা চেপে বসে তার ফলশ্রুতি যতই মনোরম হোক তাকে মেনে নেওয়া যায় না। আংটির মাঝখানে ছোট্ট অথচ নিটোল অক্ষরটাকে দেখল সে। এত দিন ধরে আংটিটা আঙুলে আছে কিন্তু এমন সতর্ক চোখে দেখা হয় না। অ অক্ষরটা সুন্দর করে লেখা। অ মানে না। সবকিছুতেই না ? না মানে বিদ্রোহ ? তবু সব কিছু মেনে নিতে হয় ? ছোটমা পরিয়ে দিয়েছিল এইটে। এখনও এতদিন পরে সেই দিনটার উত্তাপ অনুভব করতে পারল অনিমেষ। কেমন একটা সঙ্কোচ এবং আদরের সঙ্গে ছোটমা ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল আংটিটা। নিজের মায়ের মুখ এখন ঝাপসা হয়ে গেছে অনিমেষের কাছে, বুকের মধ্যে সেই টনটনানি ভাবটা কখন হারিয়ে গেছে। ছোটমা যখন এল তখনকার সব কিছু ওর স্পষ্ট মনে আছে। সৎমা বা ওই জাতীয় কোনও মনোভাবের কথা ভাবলেই হাসি পায়। একটু একটু করে কখন ছোটমা ওর বন্ধু হয়ে গেছে। ছুটিছাটায় জলপাইগুড়ি গেলে প্রথম দেখায় হেসে ছোটমা বলবেই, 'ইস, মাছবাবু কী রোগা হয়ে গেছ!' অনিমেষ মানে যেহেতু মাছ তাই মাছবাবু। ছোটমা ওকে খ্যাপায়, 'তুমি তো মাছেরই মতো, কোনও কিছু তোমাকে স্পর্শ করে না। পাঁকাল মাছ।'

পরে অনিমেষ ভেবেছে কথাটা একদম মিথ্যে নয়। ইদানীং তার মনের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো খুব বড় হয়ে থাকছে না। এই যেমন দাদু সরিৎশেখরকে ও এত ভালবাসে বা হেমলতার কাছে সেই ছোটবেলা থেকে মানুষ হল, কলকাতায় থাকতে থাকতে এমনও হয়েছে দীর্ঘকাল ওঁদের কথা চিন্তায় আসেনি। দাদু তাকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু উত্তর দেব দেব করে এত দেরি হয়ে যায় যে সেই আবেগের দীনতাটা ধরা পড়ে যায়। তার মানে এই নয় যে সে শ্রদ্ধা কম করে বা ভাল না বাসে, ওই লেখা হয়ে ওঠে না এই মাত্র। ক্রমশ সব কিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে একটু একটু করে। মাছেরই মতো। আংটিটার দিকে তাকাতেই স্বর্গছেঁড়ার সেই মাঠ, মাঠে ছোটমার সঙ্গে হেঁটে আসা এবং তারপরই সীতার বিয়ে মনে পড়তেই হেসে ফেলল অনিমেষ। সীতার কথা ওর একদম মনে ছিল না। কেমন আছে, কোথায় আছে মেয়েটা ? তার প্রথম প্রেম অথচ সে-কথা ওরা কেউ মুখে বলেনি। সেই বালক বয়সেই প্রথম না হয়েছিল, না মানে অ, অ থেকে অনিমেষ।

শুয়ে থাকলেই যত রাজ্যের গপ্পো মাথায় আসে। বিশেষ করে জানালাটা দিয়ে যদি আকাশ দেখা যায় আর ঘরে কেউ না থাকে। খাট থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসল অনিমেষ। বইপত্র তেমন কিছু কেনা হয়নি, এম এ-তে যে ক'টি নেহাত না কিনলে নয় তার বেশি কেউ কেনেও না। এখন থেকে লাইব্রেরিতে যাওয়া অভ্যাস করতে হবে। আজ রবিবার। ত্রিদিব সেই ভাত খেয়েই প্রিয়ার ম্যাটিনি শো দেখতে গেছে। এই উত্তর থেকে সেই দক্ষিণে। ইদানীং ত্রিদিবের দক্ষিণমুখো মন, উত্তর কলকাতা ওর ঠিক বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। প্রায়ই বলে, দক্ষিণের ছেলেমেয়েদের মনে অনেক ডেপ্‌থ্ আছে, কথাবার্তা বললে সুখ পাওয়া যায়। আর কিছু না হোক, গড়িয়াহাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই সময়টা কখন টুপ করে চলে যায় যে টের পাবে না। তা ছাড়া ওদিকের বাবা-মারা অনেক বেশি উদারচেতা, মানিয়ে চলতে পারে।

অতএব দুপুরে একা একা কাটাচ্ছিল অনিমেষ। আর একা থাকলেই যত রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে। মানুষ যদি তার সব স্মৃতি, জ্ঞান হওয়া অবধি সে যা করেছে, যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে সব মনে রাখতে পারত, ভাবতেই হাসি পেল। জমতে জমতে একসময় পাত্র ফেটে যাবে, তাই আপনা থেকে প্রকৃতির নিয়মে বিস্মৃতি আসে, বাঁচিয়ে দেয়।

রোদ্দুরের রং দেখে অনিমেষের খেয়াল হল। আজ ঠিক চারটের সময় বি কে পাল এভিন্যুতে পৌঁছাতে হবে। অথচ নিজের সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে সে কথা খেয়ালই নেই। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পালটে সে বেরিয়ে এল হোস্টেল থেকে। নীচের বাস্কেটবল লনে কয়েকটা ছেলে বল নিয়ে দাপাদাপি করছে। গেটে মোসাম্বার সঙ্গে দেখা। একটা ছোট্ট শর্টস পরে খালি গায়ে দারোয়ানকে টাকা দিয়ে কিছু আনতে বলছে। অমন কুচকুচে কালো শরীরে এক চিলতে সাদা কাপড় কী অশ্লীল দেখাচ্ছে! এ অবস্থায় কিছুতেই অনিমেষ বাইরে আসতে পারত না। অথচ মোসাম্বার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অনিমেষকে দেখে মোসাম্বা চিৎকার করল, 'হাই।'

অনিমেষ হাসল, 'হ্যালো।' ভাগ্যিস সামনের গেটটা পুরো খোলা নেই,তাই রাস্তা থেকে কেউ এই উত্তম শরীর দর্শন করতে পারছে না।

BanglaBook.org

হাত তুলে একটু দাঁড়াতে বলে ও দারোয়ানকে বুঝিয়ে দিয়ে কাছে এল। এসে চকচকে দাঁত বের করে হাসল, 'আজকাল তোমাকে দেখাই যায় না! সেদিনের ঘটনার পর তুমি কিন্তু আমার ঘরে আর আসোনি।'

'তুমি এসেছ আমার ঘরে?'

'অ্যাঁ।' হো হো করে হেসে উঠল খর্বোটোর বন্ধু, 'তোমরা বাঙালিরা সব সময় কমপেয়ার না করে কথা বলতে পার না। ইউ নো শীলা, তারও এই এক হ্যাবিট।'

'মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?' অনিমেষ কৌতুক বোধ করল।

'ও না থাকলে কলকাতায় থাকতে পারতাম?' একটা চোখ ছোট করল ছেলেটা, 'শি ইজ মাই হেভেন আর হেল অর এনিথিং—এনিথিং অ্যান্ড ওঃ এভরিথিং।' সুর করে গেয়ে উঠল সে, 'বাট হোয়ার আর ইউ গোয়িং?'

এক মুহূর্ত ভেবে সত্যি কথাটা বলল অনিমেষ, 'একটা টিউশনি পাব, সে ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে যাচ্ছি।'

'টিউশনি! হোয়াট ফর?'

'টাকার দরকার। আচ্ছা, চলি।' অনিমেষ দেখল মোসাম্বার মুখ কেমন হতভম্ব দেখাচ্ছে।

বি কে পাল এভিন্যু পর্যন্ত হেঁটে আসা কিছু নয়। কিন্তু সময় বাঁচাতে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে চেপে চলে এল সে। হাতিবাগান থেকে বাকি রাস্তাটাকু হেঁটে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখল বিরক্ত পরমহংস ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'শালা, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই আর পাড়াপড়শির ঘুম নেই, না? সেই চারটে থেকে দাঁড়িয়ে আছি। সেইজন্যে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, কখনও কারও উপকার কোরো না।' খেঁকিয়ে উঠল পরমহংস।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'সত্যি দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু তুমি এরকম আংসাং কোটেশন দিয়ো না। রেকর্ডেড হয়ে গেলে মুশকিল হবে।'

'মানে?'

'বিদ্যাসাগর ও কথা বলেননি। কেউ ওঁর নিন্দা করলে মন্তব্য করেছিলেন— খোঁজ নিয়ে দেখো হয়তো কোনও দিন ওর উপকার করেছিলাম।'

'তোমার ওই হল দোষ। মুখের কথাই শোনো, অন্তরের ব্যথা বোঝো না। মুখে না বললেও বিদ্যাসাগর তাই মিন করেছিলেন। ঠিক আছে, এখন যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো। যে বাড়িতে আমরা যাচ্ছি সেটা খুব কনজারভেটিভ বাড়ি। বাইরের লোক বৈঠকখানা পার হয়ে কোনও দিন ভেতরে ঢোকেনি। বুড়ো মনে করে পৃথিবীটা রসাতলে যাচ্ছে তাই তিনি নিজের ঘর সামলে রাখতে চান। মেয়েরা সিনেমায় যায় ঝি-এর এর সঙ্গে এবং ম্যাটিনি শো। আরও অনেক নিয়মকানুন আছে, সে গেলেই দেখতে পাবে। মোদ্দা কথা হল, একদম উত্তর কলকাতার খাঁটি ঘটিদের বাড়ি।'

'তুমি এদের খবর পেলে কী করে?' অনিমেষের অস্বস্তি হচ্ছিল।

'আমার মাসিমার ননদের বিয়ে হয়েছে ওখানে। আগে একটা আশি বছরের বুড়ো পড়াত। সে ব্যাটা পটল তুলতে তিনমাস ভ্যাকান্ট আছে। এদিকে ক্লাশ এগিয়ে গেছে, মেয়েটার ক্ষতি হচ্ছে।'

'মেয়ে? আমাকে ছাত্রী পড়াতে হবে নাকি?'

'আপত্তি থাকলে যেয়ো না। তবে মেয়ে বলে গলেও যেয়ো না। এইসব ঘটি মেয়েগুলো এক-একটা কাঁকড়া বিছে। বেচাল হলে থানা-পুলিশ করিয়ে ছাড়বে। প্রাইভেট টিউটার-ছাত্রী মার্কা প্রেমের ধান্দা একদম কোরো না, করলে বিপদে আমি থাকব না।' পরমহংস জানাল।

পরমহংসের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে অনিমেষের। বেঁটেখাটো শরীর অথচ হরিণের মতো ছটফটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আগে হলে অন্য কথা ছিল, এখন অস্বাভাবিক কিছু করলেই পায়ে টান লাগে, টনটন করতে থাকে তাই। কিন্তু অনিমেষ তাল রাখতে চেষ্টা করল।

শোভাবাজার/চিৎপুরের এই অঞ্চলে এর আগে কখনও আসা হয়নি। এখন ঠিক সন্ধে নয়, তবে বিকেল শেষ হয়ে আসছে। দুপাশে দোকানপাট মানিকতলা-শ্যামবাজারের তুলনায় অনেক কম। কেমন একটা আলস্য চারদিকে মাখানো। অনিমেষ নজর করল দু পাশের বাড়ির রকগুলোতে যারা গা এলিয়ে বসে আছে তারা বেশ বয়স্ক। বেশির ভাগই ধুতি এবং ফতুয়া টাইপের জামা পরে রয়েছে এবং ধুতি পরার ধরনটা কেমন আলাদা। একটা রকে আড্ডা দিচ্ছে যারা তাদের বয়স আশির কাছাকাছি তো বটেই। এ দৃশ্য কলকাতার অন্য কোনও অঞ্চলে দেখা যাবে না। এটা একদম খাস ঘটি পাড়া।

BanglaBook.org

পরমহংস বলল, 'এসে গেছি। খুব বিনীত বিনীত মুখ করবে।'

বাড়িটার দিকে তাকালে বয়স ঠাওর করা অসম্ভব। বেশিরভাগ ইট মুখ বের করে রয়েছে। এবং এই বাড়ির বিশেষত্ব যে বাইরে কোনও আড্ডা দেবার রক নেই। দরজায় ধাক্কা দিতে ভেতর থেকে ধমকের সুরে একটা চিৎকার ভেসে এল।

এবার একটু নরম শব্দ তুলতেই দরজাটা খুলে গেল। খুব রোগা, বেঁটে এবং কুৎসিত চেহারার একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই? দরজা ভাঙবে না?' কথাগুলো জড়ানো এবং অনিমেষ লক্ষ করল বলার সময় দু গাল বেয়ে লালা গড়িয়ে এল।

পরমহংস মিষ্টি মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তালুইমশাই আছেন? তুমি আমার চিনতে পারছ না? আমি — ।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল, 'বাব্বা-বাব্বা— তোমাকে ডাকছে, বাইরের নোক, কী করব? বসতে বলব, না দাঁড়িয়ে রাখব?'

চট করে সাড়া পাওয়া গেল না। অনিমেষ দেখল সামনে একটা লম্বা প্যাসেজ এবং সেটা চমৎকার পরিষ্কার। সবে বোধ হয় ধোয়া হয়েছে। একটু বাদেই ওপর থেকে বাজখাঁই গলা ভেসে এল, 'কে?'

শব্দ লক্ষ করে ওপরে তাকাতেই দেখা গেল এক ভদ্রলোক দোতলার রেলিং-এ ঝুঁকে ওদের দেখছেন। যেটুকু দেখা যায় তাতেই বোঝা গেল পঞ্চাশোর্ধ মানুষটি এখন খালি গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে রয়েছেন।

পরমহংস মুখ তুলে বলল, 'আমি ঝুনু!'

'অ! তুমি এয়েচ! সঙ্গে ওটি কে?'

'আমার সহপাঠী, ওই যে যার কথা বলেছিলাম!'

'অ! ঠিক আচে। ভুলু, ওদের বাইরের ঘরে বসা।' শরীরটি অন্তর্হিত হল।

'জুতো খুলে এদিকে আসুন।'

পরমহংসের দেখাদেখি সেই বাইরের দরজার পাশেই জুতো খুলে রেখে ভেজা প্যাসেজ থেকে দালানে উঠে এল অনিমেষ। ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা খুলে দিয়ে ভুলু নামের ছেলেটি বলল, 'আপনারা কি অনেকক্ষণ থাকবেন?'

পরমহংস কিছু বলার আগেই অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?' প্রশ্নটার ধরনে ওর ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠেছিল। আচ্ছা অভদ্র তো!

'তাড়াতাড়ি চলে গেলে বাইরের দরজা বন্ধ করব না।' ছেলেটি লালা চাটল।

অনিমেষের গলার স্বরে সতর্ক হয়েছিল পরমহংস, সামাল দিতে সে বলে উঠল, 'কথাবার্তা শেষ হতে বোধ হয় সময় লাগবে, তুমি বরং বন্ধ করে দিয়ে যাও ভুলু।'

ছেলেটি অদ্ভুতভাবে শরীর দুলিয়ে দরজা বন্ধ করতে গেল।

অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে পরমহংস বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ ছেলেটা হাবাগোবা, কী কথা কীভাবে বলবে জানে না!'

ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। এবং এটা যদি বসার ঘর হয় তা হলে বলতে হবে অনেক কাল কেউ এখানে বসেনি। নীচে ধুলোটুলো নেই বটে, কিন্তু এমন অগোছালো জীর্ণ হয়ে আছে ঘরের জিনিসপত্র যে এদিকে নজর দেবার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করে না। গোটা চারেক লম্বা প্রাচীন আমলের কাঠের চেয়ার আর একটা গোল রংচটা টেবিল, এক পাশে একটা তক্তাপোশের ওপর কালো মাদুর পাতা, ঘরের দেওয়ালে শেষ কবে রং বোলানো হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না।

চেয়ারে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনিমেষ টের পেল তাকে ছারপোকা আক্রমণ করছে। ব্যাপারটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে। হাজার হোক এ বাড়ি পরমহংসের আত্মীয়দের বাড়ি। দরজার দিকে মুখোমুখি বসার অছিলায় চেয়ার পালটেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না।

পরমহংস বলল, 'বাড়িটা একটু কনজারভেটিভ, কিন্তু তাতে কী হয়েছে। তোমার পড়ানো নিয়ে কথা, পড়িয়ে টাকা পেলেই হল, কী বলো?'

অনিমেষ বুঝতে পারল পরমহংস পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করে তুলতে চাইছে। সে হাসল, 'তোমার ডাকনামটা জানা গেল আজ।'

পরমহংস বলল, 'ওই আর কী! এরকম তো সবার থাকে। আমারটা তবু ভাল, এ বাড়ির কর্তাদের ডাকনাম শুনলেই চমকে যাবে।'

BanglaBook.org

'কী রকম?'

'আমার মাসিমার ননদের বড় শ্বশুরের নাম ছিল বাঘ, মেজ শ্বশুর সিংহী, আর ছোটজনের নাম শিয়াল; মনে হয় ওদের বাবা খুব জীবজন্তু পছন্দ করতেন। খানিক দূরেই তো রাজেন মল্লিকের চিড়িয়াখানা।'

হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ। এরকম নাম কেউ রাখতে পারে! পাড়ার ছেলেরা খ্যাপাত না? পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে, কোনও রকমে সামাল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যিনি কথা বললেন তিনি কে?'

'শিয়াল। বাঘ-সিংহী দেহ রেখেছেন। আমরা আড়ালে শিয়ালতালুই বলি। অবিশ্যি ওঁর মা এখনও শিয়াল বলেই চেঁচান।'

কথা শেষ হওয়ার পরেই শব্দ উঠল। শব্দটা জুতোর নয় বোঝা গেল কাছাকাছি হতেই, শিয়ালতালুই খড়ম পরে আসছেন। লম্বা, দড়ির মতো পাকাটে চেহারা, গালের গলার চামড়া কোঁচকানো, নাক অসম্ভব লম্বা। অনিমেষ দেখল ভদ্রলোকের পরনে এখন ঝোলা ফতুয়া আর কোঁচানো ধুতি। এরই মধ্যে বেশ সাজগোজ করে এসেছেন। কাছাকাছি হতেই একটা অম্বুরী তামাক মার্কা গন্ধ পাওয়া গেল।

পরমহংসের দেখাদেখি উঠে প্রণাম করতে গিয়ে থমকে গেল অনিমেষ। লোকটা বয়স্ক কিন্তু চেনাশোনাজানা নেই, ফট করে প্রণাম করবে? হাত তুলে সে নমস্কার করতেই ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বসো তোমরা।' ওই শরীর থেকে অমন ভারী আওয়াজ বেরুতে পারে না শুনলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

অনিমেষের ছেড়ে-আসা চেয়ারটায় বসলেন শিয়ালতালুই, বসে বললেন, 'ভর সন্ধেতে কথা বলতে এলে, তা যাক এসে পড়েছ যখন তখন আর কী করা যাবে। তা ঝুনু, তোমার বাবা কেমন আছেন?

পরমহংস ঘাড় নাড়ল, 'ভাল, তালুই মশাই।'

'মা?'

'ভাল।'

'ঠাকুমা?'

'ভাইবোন?'

প্রশ্নের ধরন দেখে অনিমেষ কোনওরকমে হাসি চাপল। ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন আর বেচারা পরমহংসের অবস্থা খাঁচায় বন্ধ ইঁদুরের মতো। শেয়ালতালুই শেষ করলেন, 'আজকাল যা যুগের অবস্থা, কেউ ভাল আছে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তা তুমি যখন বলচ ভাল তা হলে নিশ্চয়ই ভাল আচেন ওঁরা। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে ওঁদের বোলো আমি ভাল নেই।' কথার শেষে একটা বড় রকমের নিশ্বাস পড়ল।

'কেন, কী হয়েছে তালুই মশাই!' পরমহংসকে উদ্‌গ্রীব দেখাল।

'মামলা, বুঝলে মামলাতে শেষ হয়ে গেলাম। আজকালকার ভাড়াটেরা তো এক-একটা নবাবপুত্তুর, ভাড়া দেবেন না কিন্তু চোখ রাঙাবেন। আরে, তোরা ভাড়া না দিলে কি আমি না খেয়ে থাকব? জীবনে পরের গোলামি করিনি, বাড়িভাড়ার টাকায় খাই—দশটা মামলা একসঙ্গে চলচে। যদি জিততে পারি তবে আয় দশগুণ হয়ে যাবে। বেনেটোলার মতো জায়গায় দশখানা ঘরের ভাড়া দেয় ত্রিশ টাকা, ভাবতে পারো? তাই-ই আদায় হয় না। বাড়িঘরদোর করে সুখ নেই, বুঝলে!' কথা বলতে বলতে বাঁ দিকের পকেট থেকে একটা টিনের ডিবে বের করে তা থেকে এক চিমটে নস্যি নিয়ে দুই নাকে গুঁজে চোখ বন্ধ করলেন শিয়ালতালুই। তারপর একটা নোংরা নস্যিমাখা রুমালে সন্তর্পণে নাক মুছলেন। অনিমেষ দেখেছে যারা নস্যি নেয় তাদের গলার স্বরে একটু নাকি ভাব এসে যায়। এ ভদ্রলোকের বেলায় সেটা হয়নি। একটু ধাতস্থ হয়ে শিয়ালতালুই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, এবার কাজের কথা বলি, এসেছ কেন?'

'ওই যে আপনি বলেছিলেন একজন ভাল মাস্টার চাই।'

'অ। তা এটি তো একদম ছোকরা—এ পড়াবে?'

'হ্যাঁ তালুইমশাই, খুব ভাল ছেলে, মেরিটোরিয়াস।'

'অ। কিন্তু এত ছোঁড়া মাস্টার রাখার কথা তো ভাবিনি। আগে যিনি পড়াতেন তাঁর বয়স আশির ওপরে ছিল, দিনকাল তো ভাল নয়, বুঝলে!'

'না, না, সে সব ব্যাপারে কোনও চিন্তা করবেন না। আপনি আমার মতো বিশ্বাস করতে পারেন ওকে।' পরমহংস বোঝাবার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

'তোমার সহপাঠী বললে না ?'
'হ্যাঁ।'
'কত বয়স ?'
'একুশ-বাইশ, তাই না অনিমেষ ?' পরমহংসের প্রশ্নের উত্তরে নীরবে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।
শিয়ালতালুই ওর দিকে এখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। বোধ হয় ওর ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছেন এর মধ্যে। এরকম অস্বস্তিতে এর আগে কখনও পড়েছে বলে মনে হয় না।
'কী নাম তোমার ?' প্রশ্নটা এতক্ষণে সরাসরি করা হল।
'অনিমেষ।'
'আঃ, নাম জিজ্ঞাসা করলে পদবিটাও বলতে হয়।'
পরমহংস বলল, 'ওর মিত্তির তালুইমশাই।'
'অ। মিত্তির! কাদের বাড়ির ছেলে তুমি ? শ্যামপুকুর না ঝামাপুকুর ?'
'আমাদের বাড়ি জলপাইগুড়িতে।' অনিমেষ জানাল।
'জলপাইগুড়ি! ওখানে—মানে, তোমরা কি বাঙাল ? না, না, বাঙাল মাস্টার আমি রাখব না।' শিয়ালতালুই সোজা হয়ে বসলেন।
পরমহংস বলে উঠল, 'ওরা বাঙাল নয়, তালুইমশাই। তা ছাড়া জলপাইগুড়ি তো পশ্চিমবঙ্গেই।'
শিয়ালতালুই ঘাড় নাড়ালেন, 'আমাকে শেখাতে এসো না তুমি। রাজশাহি রংপুর জলপাইগুড়ি সব এক গোত্রের। আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় চালচলনের সঙ্গে কোনও মিল নেই। ভাতের থালা খাটের ওপর তুলে খায় সব।'
ইচ্ছে করছিল না তবু অনিমেষ বলল, 'আমার ঠাকুরদা নদিয়া জেলা থেকে ওখানে গিয়ে সেটল্ করেছিলেন।'
'অ। তাই বলো। তোমরা নদে জেলার লোক। এখানে থাকা হয় কোথায় ?'
'হোস্টেলে।'
'টাকাপয়সার অভাব বুঝি ?'
'হ্যাঁ।'
'কদ্দুর পড়েছ ? ওহো, তুমি তো আবার ঝুনুর সহপাঠী। তা অঙ্ক-টঙ্ক পড়াতে পারবে ?'
'কোন ক্লাশ ?'
'সেভেন। যাদব চক্কোত্তি ভাল জানা না থাকলে পড়ানো কঠিন।'
'পারব।'
'অ মাইনে নেবে কত ?'
এবার অনিমেষ পরমহংসের দিকে তাকাল। আগে থেকে এ ব্যাপারে কিছু ঠিক করে আসেনি ওরা, খুব ভুল হয়ে গেছে। পরমহংস নির্বিকার মুখে বসে রয়েছে দেখে অনিমেষ বলল, 'আপনি কী ঠিক করেছেন ?'
শিয়ালতালুই বললেন, 'দেখো, আজকাল তো পড়াশুনা হয় না, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। আগের মাস্টারের সঙ্গে কড়ার ছিল যে তিনি অর্ধেকটা মাসকাবারে নেবেন, বাকি অর্ধেক একসঙ্গে রেজাল্ট বেরুলে পেয়ে যাবেন। তা তুমি তাও করতে পারো।'
কাটা কাটা গলায় অনিমেষ বলল, 'আমার প্রতি মাসে পেলেই ভাল হয়।'
'অ। চা-জলখাবার সহ পড়ালে পনেরো টাকা পাবে, বাদ দিলে কুড়ি। কোনটা করবে ? তা জলখাবার বলতে কোন দিন বিস্কুট, কোন দিন মুড়ি, মানে ঘরে যা হয় এইসব।'
'আমাকে চা দিতে হবে না।'
'তার মানে কুড়ি। বেশ, বেশ। ভালভাবে পড়াও, মন দিয়ে পড়াও, রেজাল্ট ভাল করুক, দেখবে চড়বড় করে মাইনে বাড়িয়ে দেব। জানো, হাতিবাগানের একটা তিন ঘরওয়ালা বাড়ি থেকে আমি কুড়ি টাকা ভাড়া বাবদ পাই, কী দুরবস্থা! তা আজ হল গিয়ে ষোলো তারিখ— বেশ, বেশ, তুমি আজ থেকেই শুরু করে দাও। এ মাসে অর্ধেক পাবে। আর একটা কথা, তুমি অল্প বয়সের ছেলে, দেখো, আমার মেয়েকে নিয়ে কোনও গোলমাল কোরো না, বুঝলে ?'
পরমহংস বলল, 'সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তালুইমশাই।'
'তা হলে তোমরা কথা বলো, আমি একটু তোমার মাসিমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে আসি। হাজার হোক, মেয়েছেলের ব্যাপার।'

BanglaBook.org

শিয়ালতালুই খড়মের শব্দ তুলে চলে যেতেই অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'ইম্পসিব্‌ল। আমার দ্বারা এখানে পড়ানো হবে না। চলো কাটি।'

'সে কী! সব ঠিক হয়ে গেল যখন — ।'

'কিস্যু ঠিক হয়নি। এরকম চশমখোর ব্যবসাদারের সঙ্গে আমার যে বনবে না তা বুঝতে পেরেছি। কবে যে ঠোকাঠুকি লেগে যাবে সামনাসামনি, মেজাজ সামলাতে পারব না, তোমার বদনাম হয়ে যাবে।'

'ধ্যাত।' পরমহংস ওকে হাত ধরে আবার বসাল, 'তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। যুদ্ধ কিংবা প্রেম, এ দুটো ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা করে থাকলে আখেরে লাভ হয়। আরে, এ বাড়িতে তোমার এমন কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েও যেতে পারে যা কল্পনা করতে পারোনি। শেষটা দেখে যাও।

এই সময় খড়মের শব্দ আবার ভেসে এল। শেয়ালতালুই ফিরে এসে দরজায় দাঁড়ালেন, 'বুঝলে ঝুনু, তোমার মাসিমার আপত্তি ছিল, কিন্তু তোমার বন্ধু বলে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু এ ঘরে পড়ালে তো চলবে না। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের তো জানো, মুখে মুখে বদনাম ছড়িয়ে যাবে। তুমি বরং উঠে এসো— ভুলু, ওকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যা। না, না ঝুনু, তুমি যাচ্ছ কোথায়? তুমি বসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

এগারো

ভুলু নামের ওই বিদঘুটে ছেলেটি অনিমেষকে বারান্দা পার করে এই ঘরে বসিয়ে রেখে সেই যে উধাও হল আর দেখা নেই। আসার সময় সে লক্ষ করেছিল দু পাশের দরজা-জানলা বন্ধ। একটা বুড়ি ঝি ছাড়া কোনও মানুষ এ বাড়িতে আছে বলে মনে হচ্ছিল না। আব্রুটা এ বাড়িতে একটু বেশি কড়া, কিন্তু কেমন যেন গা-শিরশিরে। পরমহংসের আত্মীয় এরা কিন্তু তাকেও ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। এই ঘরে জিনিসপত্র প্রচুর। সবগুলোই ক্লাইভের আমলে কেনা হয়েছিল বোধ হয়। ভারী ভারী জিনিসগুলোর কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই। একটা তক্তাপোশের ওপর ওকে বসতে দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরের সব ক'টা দরজা-জানলা খোলা। কিছুক্ষণ পরে অনিমেষের মনে হল তাকে কেউ বা কারা লক্ষ করছে। দরজা বা জানলার বাইরে থেকে চুরি করে এ ভাবে দেখাটা বোঝা যাচ্ছে চুড়ির শব্দে। খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার কিন্তু কিছু করার নেই। চট করে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দর্শকদের দেখা যাবে, কিন্তু তাতে লাভ কী!

বসে থাকাটা যখন আর সম্ভব হচ্ছে না তখন বাইরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'যা না, ভেতরে যা, মাস্টারের কাছে পড়তে হবে যখন তখন লজ্জা করে লাভ কী। মাস্টার হল বাবার মতন।' বাইরে বোধ হয় ঠেলাঠেলি চলছে। ছাত্রীটি ঘরে ঢুকতে চাইছে না। নিজেকে কেমন চোর চোর মনে হল অনিমেষের। সুযোগ থাকলে তক্ষনি রাস্তায় নেমে যেত সে।

ভুলু পেছন পেছন খড়মের আওয়াজ তুলে শিয়ালতালুই ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে গ্রামভারী গলায় বললেন, 'এদিকে আয়।'

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে যে চলে এল তাকে দেখে অনিমেষ সোজা হয়ে বসল।

শিয়ালতালুই বললেন, 'মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। এই শেষবার, এবার যেন ফেল না হয়। মাস্টার, ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোরো না। পড়াতে যে জানে সে গাধা পিটিয়েও ঘোড়া করতে পারে।'

অনিমেষ তক্তাপোশ থেকে উঠে দাঁড়াল, 'আমি কিন্তু সন্ধে নাগাদ আসব।'

'ছ'টা। ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। আড়াই ঘন্টা পড়ালেই যথেষ্ট।'

'রোজ?'

'রোজ না পড়ালে তুমি ছাত্রীকে পাশ করাতে পারবে হে? তা হলে মাস্টার রাখতে যাব কেন? আচ্ছা নাও, পড়াশুনা করো।' শিয়ালতালুই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এবার আবার ছাত্রীর দিকে তাকাল অনিমেষ। শরীরের কোথাও ভাঁজ আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ শাড়িটা ওকে আলখাল্লার মতো জড়িয়ে রেখেছে। চট করে একটা পিপের কথা মনে আসে। গায়ের রং অসম্ভব ফরসা, মুখে একটা মিষ্টি ছাপ আছে।

চিবুক এখন প্রায় বুকের ওপর নামানো। আঁচলের আড়ালে রাখা হাতের আদলেই বিব্রত হল সে, এত মোটা মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

BanglaBook.org

অনিমেষ কিছু বলার আগেই ভুলু বলল, 'মা তোকে প্রণাম করতে বলেছে না! প্রণাম কর!'

কথাটা শেষ হতেই দম-দেওয়া পুতুলের মতো শরীরটা অনিমেষের দিকে এগিয়ে আসতে অনিমেষ আঁতকে উঠল, 'না, না, প্রণাম করতে হবে না।'

ভুলু বলল, 'ছি, ছি, মাস্টারমশাই, মা বলছে আপনি বাবার মতন, প্রণাম না নিলে খুকুর পাপ হবে। প্রণাম কর খুকু।'

অতএব প্রণাম নিতে হল।

মেয়েটির বোধ হয়, ঝুঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। অনিমেষ বলল, 'বসো।'

টেবিল চেয়ার নয়, এই তক্তাপোশের ওপর বসেই পড়াতে হবে। কিন্তু বইপত্র কিছু সঙ্গে আনেনি মেয়েটা। অনিমেষ ঠিক করল প্রথম দিন ওর কোর্সটা জেনে নেবে। অনেকটা দূরত্ব রেখে খুকু বসল। বসার সময় তক্তাপোশের মচমচে শব্দটা কান এড়াল না অনিমেষের। এই ছাত্রীকে পড়াতে হবে ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা হিমভাব আসছে। অনিমেষ নিজের জায়গায় বসে দেখল ভুলু ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বাবু হয়ে বসে এ দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটার দিকে নজর পড়ার পর অন্যরকম অস্বস্তি হতে আরম্ভ করল। ওকে কি পাহারা দেবার জন্যে বসিয়ে রেখেছে? ছেলেটার অস্তিত্ব উপেক্ষা করল অনিমেষ। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ক্লাশ সেভেনে পড়ো?'

তুমি বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। এত বড় মেয়েকে প্রথমেই তুমি বলা অন্য সময় হয়তো অসম্ভব হয়, এখন পারল। সে নিজের মুখ-চোখে খুব ভারিক্কি ভাব রাখার চেষ্টা করতেই মনে পড়ল তাকে এই বিশাল মেয়েটির বাবার মতন বলা হয়েছে। শরীর দেখলে বয়স ঠাওর হয় না। বলা যায় না, তার সমান বয়সীও হতে পারে। প্রশ্নটার জবাব তখনও আসেনি। অনিমেষ বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর গলা ভেসে এল, 'বাবা তো বলেচেই কোন কেলাসে পড়ে, আবার নেক্কড়ি করে জিজ্ঞাসা করার কী আচে?'

'সে আমি বুঝব, তুমি চুপ করো।' চাপা গলায় ধমকে উঠল অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর কপালে তিন-চারটে ভাঁজ পড়ে গেল, আর অনিমেষ দেখল মেয়েটা খুব দ্রুত সামনে-পেছনে ঘাড় নাড়ছে। অবাক হতে গিয়ে সামলে নিল, ঘাড় নাড়ার অর্থ সেভেনেই পড়ে।

'কী কী পড়ানো হয়?'

এবার কোনও উত্তর নেই। হঠাৎ অনিমেষের সন্দেহ হল মেয়েটি কি কথা বলতে পারে না। বোবা মেয়েরাও তো পড়াশুনা করে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞাসা করল সে, 'তুমি কি কথা বলতে পারো না?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নড়বড় করে জানাল, হ্যাঁ।

'তা হলে আমি যেটা জিজ্ঞাসা করেছি তার জবাব দাও।'

ঠোঁট দুটো খানিক কাঁপল, তারপর খুব নিচু স্বরে সরু গলায় উত্তর এল, 'ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ড্রইং—।'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'না, না, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করছি না, তোমাদের কী কী বই পড়ানো হয়? তুমি তো সঙ্গে কোনও বই আনোনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ভুলু উঠে দাঁড়াল, 'আমি নিয়ে আসচি বই।' তারপর দরজা অবধি এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। এক সেকেন্ড কী ভেবে বোনের দিকে ঘুরে বলল, 'আমি তো যেতে পারব না। আমাকে এখানে থাকতে বলেচে।'

অনিমেষের মাথায় রক্ত উঠে গেল। এরকম নোংরা মানসিকতার মধ্যে কোনও ভদ্রলোক পড়াতে পারে না। এর মধ্যে খুকু উঠে দাঁড়িয়ে সেইরকম গলায় বলল, 'আমি বই নিয়ে আসচি, আপনি বসুন।'

ছাত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনিমেষ ভুলুর দিকে তাকাল। সেই একরকম ভঙ্গিতে তাকে জুলজুল করে দেখছে। কপালের ভাঁজগুলো এখনও মেলায়নি। অনিমেষ ডাকল, 'এই এদিকে এসো!'

ভুলু খেঁকুড়ে গলায় বলল, 'কেন?'

'আমি ডাকছি তাই আসবে।'

'ইস, ডাকলেই হল! কাচে গেলে ধোলাই লাগাবে, জানি না! মাস্টাররা খুব মারকুটে হয়, জানি বাবা।' ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে লাগল সে।

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে খামকা মারতে যাব কেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে তোমাকে কাছে ডাকছি।' অনিমেষ গলার স্বর নরম করার চেষ্টা করল।

ভুলুকে একটু ভাবতে দেখা গেল। অন্যমনস্ক হলেই লালা গড়িয়ে আসে, সেটাকে টেনে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী কতা?'

'তোমাকে এখানে কে থাকতে বলেছে?'

'বাবা।'

'তোমার বাবা বলেছেন! কেন?'

'আপনি বাইরের লোক, খুকি সোমত্ত মেয়েছেলে তাই।'

কোনওরকমে ঢোক গিলল অনিমেষ, 'আগের মাস্টারের সময়ও তুমি থাকতে? মানে এইরকম পাহারা দিতে?'

ঘাড় নাড়ল ভুলু, 'হুঁ। তখন মা বলত থাকতে। মা বলত বুড়োরা নাকি খুব খচ্চর হয়।'

কথাটা শুনে জমে গেল অনিমেষ। এরকম পরিবারের কথা তার কল্পনায় ছিল না। আগের মাস্টারের বয়স আশির ওপর ছিল তা গৃহকর্তা জানিয়েছেন। তবু পাহারা চলত। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'কিন্তু আমি যখন পড়াব তখন তোমার থাকা চলবে না।'

'ইস! সেই ফাঁকে যদি ফষ্টি-নষ্টি চালান! আমাদের বাড়িতে চাকর পর্যন্ত রাখা হয় না এ জন্যে—।' কথাটা শেষ করার আগেই ছাত্রী বইপত্র দু' হাতে জড়িয়ে ঘরে ঢুকল।

ততক্ষণে অনিমেষের পড়ানো মাথায় উঠেছে। তাকে খাট থেকে নামতে দেখে ভুলু প্রস্তাব দিল, 'আমাকে যদি এক টাকা করে মাসে দেন তবে—।'

'তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।' হাত তুলে ওকে দরজা দেখাল অনিমেষ।

ওর গলার স্বরে এমন একটা কাঁপুনি ছিল যে ভুলু থতমত হয়ে এক লাফে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিরাপদ দূরত্বে থেকে বলে উঠল, 'ইস! খুব নেক্কড়বাজ!'

কথাটার মানে বোধগম্য হল না। এই সময় ছাত্রীটি বলে উঠল, 'বই এনিচি, দেখুন।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'খুকি, আজকে আমার পড়াবার মন নেই। যদি আবার আসি তখন তোমাকে পড়াব। আজ আমি যাচ্ছি।' তারপর হনহন করে বাইরে বেরিয়ে এল। কোনওদিকে না তাকিয়ে সে সোজা বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

পরমহংস নেই কিন্তু শিয়ালতালুই খালি গায়ে বসে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে নাক কুঁচকে বলে উঠলেন, 'এ কী, পড়ানো হয়ে গেল! মাস্টাররা যদি ফাঁকি দেয় তবে ছাত্ররা কী শিখবে! না, না, দু' ঘণ্টার কম পড়ানো আমি পছন্দ করি না।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি এখানে পড়াব না ঠিক করেছি। আর একটা অনুরোধ করছি, পড়ানোর চেষ্টা না করে এবার ওর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। নমস্কার।' কোনওরকমে প্যাসেজে নেমে পায়ে জুতো গলিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল অনিমেষ।

ধারেকাছেও পরমহংস নেই। এ ভাবে একদম না বলে কয়ে চলে যাবে আশা করা যায় না। অবশ্য যদি থাকার হত ও-বাড়িতেই সে থাকত। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার জন্যে অনিমেষ পরমহংসের ওপর রাগ করতে পারছে না। বাড়াবাড়িটা যে এতটা দূর হবে সেটা হয়তো সে আন্দাজ করতে পারেনি। তাই কলকাতা শহরে এরকম পরিবার এখনও থাকতে পারে বিশ্বাস করা শক্ত। এরাও বাংলা দেশের মানুষ, যে দেশের স্টুডেন্টস ইউনিয়নগুলো ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এই যে এত মিছিল হয়, আন্দোলনের আগুন জ্বলে, তার সামান্য আঁচ এ-বাড়িতে লাগেনি। ঠিক জানা নেই, তবে নিশ্চয়ই এরকম বাড়ির সংখ্যা কম নয়;

কয়েক পা হাঁটার পর অনিমেষের নিজেকে খুব হালকা মনে হল। যেন একটা ভারী পাথর তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, হঠাৎ সরে গেছে। এতক্ষণ যে ধৈর্য ধরে ওখানে পড়েছিল সেটাই আশ্চর্যের। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যাপারটা ঠাওর করে চলে আসতে পারত। তা হলে কি টাকার লোভ, না ছাত্রীটিকে দেখবার আগ্রহ? ছাত্রীটি যে নিরেট হবে এটা অনুমান করা গিয়েছিল, কিন্তু ধৈর্য না রাখলে এরকম বাড়ির পূর্ণ চিত্র তো পাওয়া যেত না! টাকাটা পেলে অবশ্যই উপকার হত, কিন্তু আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই নয়। অনিমেষ হেসে ফেলল, প্রথম রোজগার করতে গিয়েই তাকে এমনভাবে হোঁচট খেতে হল, যাচ্চলে!

বি. কে. পাল অ্যাভিন্যুতে আসতেই চিৎকার করে কেউ তাকে ডাকছে শুনতে পেল অনিমেষ। পরমহংসের গলা, একটা চায়ের দোকান থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসছে। কাছে এসে পরমহংস

জিজ্ঞাসা করল, 'হয়ে গেল ?'

'কী ?' অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল।

'দুটোই।'

পরমহংসের মুখের দিকে তাকিয়ে রাগতে পারল না অনিমেষ। ছেলেটার মুখে এমন মজা-করা ভাব আছে যে রাগাও যায় না। ও বলল, 'হ্যাঁ বেশ পড়িয়ে-টড়িয়ে এলাম। ছাত্রীটি খুব ভাল।'

'ভাল মানে ?' পরমহংসের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'ভাল মানে ভাল। ইনটেলিজেন্ট। তুমি তো জল বাদ দিয়ে দুধটুকু খাও আর সহজ কথাটা বুঝতে পারো না!' কপট বিরক্তি দেখাল অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে হতাশ ভঙ্গি করল পরমহংস, 'দূর শালা! যা ভেবেছিলাম তাই হল! তা, বলে কেটেছ, না ভক্কি দিয়ে ?'

'আমি কেটেছি কে তোমাকে বলল ?'

'কেন ছলনা করছ, গুরু! তালুইমশাই আমাকে ভাগিয়ে দেবার পর থেকে ওয়াচ করছি চায়ের দোকানে বসে। দেরি দেখে ভাবছিলাম ক্যালেন্ডার হয়ে ঝুলে গেলে বোধ হয়। কিন্তু ওই গোবরে মেয়েটাকে যখন ইনটেলিজেন্ট বলছ তখন তুমি নির্ঘাত কেটে পড়েছ।' পরমহংস নিশ্চিত গলায় জানাল।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'হ্যাঁ, ও মেয়েকে আমি পড়াতে পারব না, অসম্ভব। আর তুমি দেখে-শুনে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাল করনি। ফালতু সময় নষ্ট হল।'

'কোনও কিছু ফালতু নয় বন্ধু। যাকে উপেক্ষা করছ সেই একদিন তোমার উপকারে আসতে পারে। কাদের জন্যে দেশ উদ্ধার করবে তা চোখ চেয়ে দেখবে না ? তালুইকে কী বললে ?'

'বললাম, আমি পড়াব না, পারলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে।'

'যাচ্চলে! হয়ে গেল, ও বাড়ির দরজা আমার জন্যে ফর এভার বন্ধ হয়ে গেল। পড়াবে না সেটা বললেই হত, মেয়েটা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার কী দরকার ছিল! চলো।'

'আবার কোথায় যাব ?'

'আমার সঙ্গে এসোনা! অলটারনেটিভ ব্যবস্থা রাখাই আছে—এটা ফেল করলে, আর একটা ফিট করে রেখেছি। বাড়ির দালালরা যেমন একসঙ্গে দু-তিনটে বাড়ি দেখায়। এটা হরি ঘোষ স্ট্রিটে, বেশি দূরে নয়।'

অবাক হয়ে পরমহংসকে বলল অনিমেষ, 'সে কী! তোমার সন্ধানে ক'টা টিউশনি আছে ? এজেন্সি নিয়েছ নাকি। তবে ওরকম বাড়ি হলে আমার গিয়ে দরকার নেই আগে থেকে বলে দিচ্ছি।'

'যাচ্চলে! অত গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া তোমাকে তো কেউ দিব্যি দেয়নি যে পড়াতে হবেই। ভাল লাগলে পড়াবে, নইলে নয়। আরে, এক-একটা ছেলে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে কত টাকা টিউশনি করে রোজগার করে ভাবতে পারবে না। আমাদের পাড়ার সুবলদা টিউশনি করতে করতে এম-এ পাশ করল। তারপর চাকরি-বাকরি না পেয়ে টিউশনিটা বাড়িয়ে দিল। রোজ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে আটটা বাগবাজারে, সওয়া আটটা থেকে পৌনে দশটা শ্যামবাজারে, দুপুরে দু' জায়গায় মেয়ে পড়ায়, মর্নিং স্কুল হওয়ার সেইটে সুবিধে, রাত্রে আবার দুটো। সপ্তাহে তিন দিন করে হলে সিক্স ইন্টু টু মাসে বারোটা টিউশনি, এক শো পঁচিশ করে ইচ, হাই ক্লাসের স্টুডেন্ট সব। নেট দেড় হাজার টাকা মান্থলি ইনকাম। চাকরি করলেও পেত না বলো ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, তা ঠিক। তবে লোকটার নিশ্চয়ই পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু নেই, কোনও কিছু সিরিয়াসলি চিন্তা করতে পারে না। যত টাকাই পাওয়া যাক এরকম ছক-বাঁধা হয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। অনিমেষ মরে গেলেও তা পারবে না। কিন্তু একটা এক্সট্রা ইনকাম তার যে খুব প্রয়োজন সে কথা ঠিক। বাবা স্বর্গছেঁড়া থেকে যে টাকা পাঠাচ্ছেন এতগুলো বছরে তার অঙ্কটা বাড়েনি। বাড়ানো যে বাবার পক্ষে সম্ভবও নয় তা সে জানে। মাঝে মাঝে মনে হয় পারলে সে বাবাকে নিষ্কৃতি দিত—এই টাকা পাঠানোর কর্তব্য থেকে, ইউরোপ-আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা তো রেস্টুরেন্ট-হোটেলে চাকরের কাজ করে নিজেদের পড়াশুনার খরচ চালায়—সেরকম যদি একটা কিছু করা যেত!

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর পরমহংস বলল, 'আমাদের ডান দিকে কী বলো তো ?'

বিরাট রাস্তার ডান দিকে তাকিয়ে অনিমেষ পুরনো ধাঁচের কিছু ঘরবাড়ি আর দোকানপাট ছাড়া

BanglaBook.org

আর কিছু দেখতে পেল না।

পরমহংস ওর মুখের ভাব লক্ষ করে মজা পেল, 'জানো না ?' যাঃ, তুমি নেহাতই নাবালক। এই এলাকাটা ভুবনবিখ্যাত। কোথায় যেন পড়েছিলাম প্যারিসের বারবনিতারা, বঙ্গ সন্তানটি এই জায়গা ঘুরে গেছে জানলে, একদম ঠকাবার চেষ্টা করে না। ওরা আদর করে একে ডাকে গোলডি বলে।'

'গোলডি!'

'সোনাগাছি। কলকাতায় আছ আর সোনাগাছি কোথায় জানো না ? এই জনচেতনা নিয়ে তুমি রাজনীতি করবে, ইস!'

আচমকা অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আজকাল প্রায়ই তুমি এই রাজনীতি করার প্রসঙ্গ তুলছ কেন বলো তো ? এটা তো আমার ব্যাপার, তাই না ?'

পরমহংস অনিমেষকে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের মনে হল কথাটা এ ভাবে না বললেও চলত, যা এতদিন দেখেছে তাতে ছেলেটাকে হাসিখুশি জমাটি বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে ওই রকম শ্লেষ ভাল লাগে না, বিশেষ করে সে যখন সক্রিয় রাজনীতি করছেই না।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে চলে আসার সময় বড় বড় বাড়ির দরজায় সাজুন্তি মেয়েদের দেখা গেল। সেই কলকাতায় প্রথম আসার পর বউবাজার, কিংবা জলপাইগুড়ির বেগুনটুলির গলিতে সে এদের দেখেছে, তাই চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার পরেই পাড়াটা স্বাভাবিক, ভদ্রলোকের মনে হল। এরকম সহ-অবস্থান বোধ হয় কলকাতাতেই সম্ভব।

হরি ঘোষ স্ট্রিটের মাঝামাঝি বাড়িটা। এখন রাত হয়েছে, অন্তত সাড়ে সাতটা তো হবেই। পরমহংস বলল, 'সবে সন্ধে।'

যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁকে সুন্দরী বললে কম বলা হবে। অহঙ্কার গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশে, চোখের চাহনি শরীরের গঠনের সঙ্গে মিলে এমন একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে যে চোখ চেয়ে থাকাও যায় না, আবার চোখ সরিয়েও নিতে ইচ্ছে করে না। পরমহংসকে দেখে মহিলা বললেন, 'আরে, পথ ভুলে নাকি ? কী সৌভাগ্য। এসো, এসো।'

পরমহংস বলল, 'সঙ্গে আমার বন্ধু আছে, অনিমেষ মিত্র, হোস্টেলে থাকে, জলপাইগুড়ির ছেলে।'

মহিলার দুটো ভ্রূ ডানা মেলার মতো ওপরে উঠল, 'জলপাইগুড়ি! ও মা, তাই নাকি! বসো, বসো।'

ছিমছাম সাজানো বাইরের ঘর। কোনও বাড়তি আসবাব নেই। ওরা সোফায় বসার পর মহিলা সামনেই একটা গদি-মোড়া টুল টাইপের আসনে বসলেন, 'জলপাইগুড়ির কোথায় থাকা হয় ?'

'হাকিমপাড়া। অনিমেষ বলল। সত্যি, মহিলার চারপাশে এমন একটা মিষ্টি আকর্ষণের মায়া জড়ানো যে ভাল না লেগে যায় না। বয়স হয়েছে অবশ্যই চল্লিশের চৌহদ্দিতে, কিন্তু কোথাও সেটা তাঁকে আক্রমণ করতে পারেনি। বিজ্ঞাপন ছাড়া এমনটি দেখা যায় না।

'ও মা, হাকিমপাড়ায় যে আমার বাপের বাড়ি ছিল! কী মজা!'

'হাকিমপাড়ায় আপনারা থাকতেন ?'

'হ্যাঁ, ওই যে ঝোলনা পুল, ওটার ঠিক ডান দিকে। বর্ষার সময় করলার জল একদম বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেত। সে সব দিনের কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। কী আনন্দে ছিলাম তখন! আপনাদের বাড়িটা কোনখানে ?'

অনিমেষ বলল, 'আমাকে তুমি বলবেন, আমি ওর সহপাঠী।'

'বেশ, বেশ। অতটুকু ছেলেকে আপনি বলতে ইচ্ছে করে না, আবার না বললে—।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আমরা তো মফস্বলের ছেলে, আমাদের অত ভ্যানিটি নেই। ও হ্যাঁ, আমাদের বাড়িটা হল টাউন ক্লাব ছাড়িয়ে তিস্তা নদীর ধারে।'

'কোন বাড়িটা ? বিরাম করদের বাড়ির কাছে ?'

'না। কিন্তু বিরাম করকে আপনি চেনেন ?'

'খুউব চিনি। ওঁরা তো এখন রিচি রোডে আছেন। দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড়জন আমেরিকায়, মেজোটা বম্বেতে। ছোটটার কী একটা অসুখ হয়ে শরীর এত রোগা হয়ে গেছে যে ওকে নিয়ে বিরামবাবুদের চিন্তা। তুমি ওদের চেনো নাকি ?' ভদ্রমহিলার চোখ সব সময় কথা বলে।

BanglaBook.org

'চিনতাম। কলকাতায় আসার পর আর দেখা হয়নি।'

'ওই তো, থার্টি ফোর বি রিচি রোডে ওরা থাকে, চলে যেয়ো এক দিন।'

'দেখি।'

'আরে, তখন থেকে কথা বলে যাচ্ছি, কী খাবে বলো?'

পরমহংস এতক্ষণ কথা শুনছিল, এবার বলল, 'দেশের লোক পেয়ে এমন মগ্ন হয়ে পড়লেন যে আমার কথা খেয়ালই নেই। খাব, কিন্তু আমরা একটা প্রয়োজনে এসেছি।'

'সে তো জানি, দরকার ছাড়া আমার কাছে কেউ আসে না। আগে চা খাও, তারপর শুনব। বোসো তোমরা।' ভদ্রমহিলার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটায় অদ্ভুত মাদকতা আছে।

অনিমেষ পরমহংসকে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে ইনি?'

'তোমার দেশওয়ালিভাই। নর্থ বেঙ্গলের লোকেদের দেখেছি পরস্পরের প্রতি খুব টান থাকে, সেটা মনে পড়তেই নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু এখানে কাকে পড়াতে হবে?'

'ওঁর ছেলে। উনি ইন্ডিয়ান টোবাকোতে বড় চাকরি করেন।'

'ওঁর স্বামী?'

'ছিল, এখন ডিভোর্সি।'

'সে কী!'

'যাঃ, আঁতকে উঠলে! এই মন নিয়ে তুমি পলিটিকস—সরি, মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে। এঁরাও আমার আত্মীয়, মানে এঁর হাজব্যান্ড।'

'বাব্বা, তোমার তো ভ্যারাইটিস আত্মীয়স্বজন আছে!'

'অনেকেই অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, একমাত্র আমিই সেতু হয়ে আছি। তবে এ বাড়িতে অনেক দিন পরে এলাম।'

দেওয়ালে কয়েকটা কিউরিয়ো, একটা বাচ্চা ছেলের দারুণ উজ্জ্বল ছবি চোখ টানে। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল এই মহিলা বিরাম করের কথা বলছিলেন। জলপাইগুড়ির এককালের কংগ্রেসি রাজনীতির নেতা বিরামবাবু নিশ্চয়ই আর সক্রিয় নন, থাকলে নাম শোনা যেত। ওঁরা কলকাতায় আছেন, কিন্তু কোনও দিন দেখা করার বাসনা হয়নি। মুভিং ক্যাসেল কি এই মহিলার বান্ধবী? অবশ্য তাঁর বয়স নিশ্চয়ই বেশি। মেনকাদি এবং উর্বশীর বিয়ে হয়ে গেছে, সময় কীভাবে চলে যায়! অনিমেষ আবিষ্কার করল উর্বশী নয়, এতদিন পরে রম্ভার জন্যে মনে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। তার জীবনে রম্ভাই প্রথম, যে নারী হবার আগেই ওকে চুমু খেয়েছিল। কী বিরক্তি এবং ক্রোধ সে সময় তাকে মেয়েটাকে ঘেন্না করতে সাহায্য করেছিল! এখন এই মুহূর্তে হাসি পায়। ভদ্রমহিলা যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে রম্ভাই এখন অসুস্থ! সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা—। সেই দুপুরে শরীরের জ্বর নিয়ে শুয়ে-থাকা মেয়েটার সব অহঙ্কার সে চুরমার করে দিয়েছিল নির্লিপ্ত হয়ে—এখন কেমন যেন মায়া লাগছে সে কথা ভেবে। অনিমেষের খেয়াল হল এই মহিলার নিশ্চয়ই ও বাড়িতে যাতায়াত আছে এবং রম্ভা যখন শুনবে যে অনিমেষ টিউশনির উমেদারি করতে এখানে এসেছে তখন নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকাবে। মেয়েরা কি পুরুষের স্মৃতি ভুলে যায়? যদি না যায় তা হলে নিশ্চয়ই রম্ভা এতদিন বাদে মন খুলে হেসে নেবে।

অনিমেষ ঘুরে বসল, 'এই তুমি এখানে টিউশনির কথা বোলো না।'

অবাক হল পরমহংস, 'কেন?'

'না, আমি ঠিক করলাম, জলপাইগুড়ির লোকের বাড়িতে টিউশনি করব না। এটা ঠিক হবে না।'

'যত সব ফালতু সেন্টিমেন্ট। ভাল মাল দেবে বুঝলে!'

'দিক। তবু না, প্লিজ। এ-সব কথা পেড়ো না।'

'কিন্তু আমি যে বললাম প্রয়োজনে এসেছি—।'

'কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ো, সে তুমি পারবে।'

'তোমার টাকার দরকার নেই?'

'আছে।'

'তা হলে?'

'আমার কতগুলো জমানো স্মৃতি আছে, সেগুলোকে বিক্ষত করে টাকা চাই না। এ তুমি ঠিক বুঝবে না।'

BanglaBook.org

বারো

হোস্টেলে কেমন একটা থমথমে ভাব। এমনিতেই খুব হইহল্লা না হলেও যে স্বাভাবিক চেহারাটা থাকে সেটা নেই। সবাই গুজগুজ করছে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, যেন মারাত্মক কিছু হয়ে গেছে! ওকে দেখতে পেয়ে গোবিন্দ এগিয়ে এল, 'আজকে এখানে একটা কেস হয়েছে।'

'কেস, কী কেস ?' অনিমেষ তাকাল।

'অ্যাসিস্টেন্ট সুপারের ঘরে মহিলা এসেছেন।'

'আচ্ছা!' অনিমেষ হেসে ফেলল, 'কখন ?'

'সেই সন্ধেবেলায়, স্টিল চালিয়ে যাচ্ছে।' উষ্মা গোবিন্দর গলায়।

'তাতে কী হয়েছে ?' অনিমেষের মজা লাগছিল।

'কী হয়েছে মানে ? এ হোস্টেলের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে স্পষ্ট লেখা আছে কারও ঘরে মেয়েদের আসা চলবে না, সে মা কিংবা বোন যাই হোক না কেন। আমাদের প্রত্যেকের বেলায় নিয়মটা কড়াকড়ি করে রাখা হয়েছে। এ এস ব্যাচেলার, ওঁর ক্ষেত্রে তা শিথিল হবে কেন ?'

কথাটা ঠিক। এ নিয়ে কিছু দিন আগে থম্বোটোর বন্ধুর সঙ্গে ওর কথা হয়েছিল। ছেলেটা ব্যবস্থাটাকে গালাগালি দিচ্ছিল। নিয়ম যা তা সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক ব্যবস্থার সাদা কালো দুটো দিকই আছে, তা নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও লোকে মেনে নেয় যখন দেখে সবাই একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে এ এস নিয়ম ভেঙে নিশ্চয়ই অন্যায় করেছেন। তবু কে বলতে চাইল, 'যিনি এসেছেন তিনি ওঁর মা বা বোন নয় তো ?'

গোবিন্দর সঙ্গে ততক্ষণে আরও অনেকেই জুটে গেছে। এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ওরা জটলা করছিল, ফুঁসছিল, কিন্তু কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। এখন অনিমেষকে দেখতে পেয়ে অনেকেরই দেখা বা শোনা দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল। ইউনিভার্সিটির জি এসের সঙ্গে অনিমেষের যোগাযোগ এবং পুলিশের গুলিতে একদা আহত হওয়ার গল্প। গোবিন্দ বলল, 'তুমি খেপেছ! সেরকম হলে আমরা কিছু বলতাম না। শ্রীলা এসেছে।'

'সে আবার কে ?'

'স্কটিশের মক্ষীরানি। ফোর্থ ইয়ারের পাশ ক্যান্ডিডেট। দারুণ অভিনয় করে।'

ব্যাপারটা ভাল লাগল না অনিমেষের। কিন্তু এদের এতখানি উত্তেজনার তেমন কী কারণ আছে বোধগম্য হচ্ছিল না। ও শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সুপারকে ব্যাপারটা জানাও, জানিয়েছ ?'

'সুপার নেই। তা ছাড়া সুপার কি আর এ এস-এর এগেনস্টে স্টেপ নেবে! ওরা সব এক জাতের লোক।' ভিড়ের মধ্যে একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল।

অনিমেষ বলল, 'বেশ, তোমরা কী করতে চাও ?'

'মেয়েটাকে এখান থেকে বেরুতে দেব না।' একজন বেশ দৃঢ় গলায় জানাল।

'সেটা অন্যায় হবে, সুপারের কাছে একটা রিটন্ কমপ্লেন করলে হয় না ? সবাই সই করব।' আর একটা গলা মিনমিন করল।

'ছিঁড়ে ফেলবে, কোনও কাজ হবে না। শালা প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা মারছে আমাদের কলা দেখিয়ে—ও করবে সুবিচার!'

'মাইরি, মার্বেল প্যালেসে ভিখিরিদের এর চেয়ে ভাল খাবার দেয়। ডাল না তো আমাশার পায়খানা! মাছগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে আনে।'

অনিমেষ হাত তুলে সবাইকে থামাল। গোলমালটা বাড়তে শুরু করলে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তার ঠিক নেই। সে বলল, 'ব্যাপারটা যদি আমার ওপর ছেড়ে দাও তা হলে আমি চেষ্টা করতে পারি। আমি প্রথমে এ এস-এর সঙ্গে কথা বলব। তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে?'

দেখা গেল সবাই এক সঙ্গে যেতে চাইছে। এত লোক গেলে কথা বলা যাবে না। গোবিন্দ আর একটি অবাঙালি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অনিমেষ কথা বলতে যাবে ঠিক করল, বাকি সবাই সিঁড়িতে অপেক্ষা করবে। ত্রিদিবকে এই ক্ষুব্ধদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল না সে। হয়তো হোস্টেলেই নেই, কিংবা সে এইসব বারোয়ারি ঝামেলা পছন্দ করে না। হোস্টেলের সবাই ভিড় করে এসেছে, কিন্তু থম্বোটোর বন্ধু বা থম্বোটো আসেনি, যদিও অবাঙালি ছাত্রদের সংখ্যা কম নয়। এবারে থম্বোটোর বন্ধুর অভিযোগ সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত ছিল।

BanglaBook.org

দোতলায় উঠতেই অনিমেষ থম্বোটোকে দেখতে পেল। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যালো, হোয়ার ইজ ইয়োর ফ্রেন্ড?'

উত্তরে দু কাঁধ নাচিয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল থম্বোটো, সে জানে না।

অনিমেষ একবার ভাবল থম্বোটোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে কি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত পালটাল। সেটা হয়তো থম্বোটো বিদেশি বলে কিংবা ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়, তাই।

অ্যাসিস্টেন্ট সুপারের ঘরটা একদম কোনার দিকে। বড় ঘর, সঙ্গে বাথরুম আছে। এই কোনা থেকে তাকালে হোস্টেলের অর্ধেকটা দেখা যায়। সুপারিনটেনডেন্ট থাকেন ঠিক বিপরীত দিকের দোতলায়। তাঁর জানলা থেকে হোস্টেলের বাকি অংশটা চোখে পড়ে। ব্যবস্থাটা এইভাবে করা যাতে দুজনের চোখের ওপর ছেলেরা থাকে। এখন অ্যাসিস্টেন্ট সুপারের ঘরের একটা দরজা ভেজানো, পরদার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে বাইরে।

অনিমেষরা দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই গোবিন্দ বলল, 'চলো, আচমকা ঢুকে হাতে হাতে ধরে ফেলি।'

অবাক হয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ধরবে? মেয়েটি তো আছেই!'

ঘাড় নাড়ল অবুঝ ভঙ্গিতে গোবিন্দ, 'আরে, সেতো আছে। আমি মাল কট করার কথা বলছি। উলটাপালটা অবস্থায় থাকলে সবাইকে ডেকে আনব।'

হঠাৎ অনিমেষের মনে হল ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এরা এই ঘটনাতে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অথচ অনিমেষের মনে তার আঁচ একটুও লাগছে না। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না। আমরা ভদ্রভাবে বলব এবং তোমরা যদি অন্য কিছু করতে চাও তা হলে আমি নেই।'

গোবিন্দ হতাশ ভঙ্গিতে একবার ওর দিকে আর একবার নীচে অপেক্ষায় থাকা ছেলেদের দেখে কোনওরকমে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

অনিমেষ ভেজানো দরজায় কড়া নাড়ল একবার। ওরা এতক্ষণ কথা বলছিল প্রায় ফিসফিসিয়ে কিন্তু ঘরের ভেতর থেকেও তো কোনও শব্দ বাইরে আসছিল না! দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তেই এ এস-এর গলা শোনা গেল, 'আয়।'

খুব স্বাভাবিক এবং একটুও নার্ভাসনেস গলায় নেই। ওরা অবাক হল। অনিমেষের মনে হল ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝতে পারেননি যে ওরা এসেছে।

দরজাটা ঠেলে অনিমেষ প্রথমে ভেতরে ঢুকল। জানলার ধারে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এ এস কিছু লিখছেন। টেবিল ল্যাম্পের আলো ওঁর মুখ, শরীর এবং ঘরে একটা কোণে ছড়িয়ে আছে। ঘরে এক পাশে বই-এর আলমারি, আলনা আর স্প্রিং-এর খাট। অনিমেষ দেখল একটি মেয়ে সেই খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। শোয়ার ভঙ্গিতে বোঝা যায় যে সে গভীর ঘুমে মগ্ন। এরকম দৃশ্য দেখতে পাবে বলে সামান্য প্রস্তুত ছিল না গোবিন্দরা, স্বভাবতই হকচকিয়ে গেল।

এ এস লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' অনিমেষ শান্তস্বরে বলল।

চমকে মুখ ঘোরালেন এ এস। মাঝবয়সী ভদ্রলোক এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন খানিকক্ষণ মুখ থেকে কথা সরছিল না। হয়তো ভেবেছিলেন ঠাকুর চাকর কেউ এসেছে। তাই খেয়াল করেননি। এখন ওদের দেখে চট করে বিছানায় নজর বুলিয়ে নিলেন। সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ঘুমলে মানুষ শিশু হয়ে যায়।

'কথা? কীসের কথা?' চশমাটা চোখ থেকে সরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক।

'আপনি একটু বাইরে আসুন।' অনিমেষ একটুও উত্তেজিত হচ্ছিল না।

'বাইরে যাব কেন? হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'আমরা যে বিষয়ে কথা বলতে এসেছি সেটা ওঁর সামনে শুনতে হয়তো আপনার ভাল লাগবে না।' কথাটা শেষ করে চোখের ইঙ্গিতে বিছানাটাকে দেখাল অনিমেষ।

এ এস এবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'আপনার সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ আছে।'

'আমার সম্পর্কে? হাউ ফানি! কী ব্যাপার?'

'আপনি কি এখানেই শুনতে চান?'

BanglaBook.org

'ও, ইয়েস!'

'আপনি হোস্টেলের আইন ভাঙছেন। এবং সেটা হোস্টেলের ছেলেরা ভালভাবে নিতে পারছে না। আইন সবার ওপর সমান প্রযোজ্য।'

কথাটা বলার সময় লক্ষ করল অনিমেষ মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ খুলে শুনছে কথাগুলো। যদিও এখনও উপুড় হয়ে রয়েছে তবু মুখ বালিশের ওপর পাশ ফিরে রাখার ফলে চোখের পাতার নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে সে।

'বুঝতে পারছি না কী বলতে চাইছ!'

'ভিজিটারদের জন্য একটা ঘর বাইরে আছে। আপনি সেটা না ব্যবহার করে একজন মহিলাকে ঘরে নিয়ে এসেছেন। এটা অন্য ছেলে করলে তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হয়।'

'অফ কোর্স! কিন্তু সে নিয়মটা আমাকে মানতে হবে কে বলল?'

'কারণ আপনি এই হোস্টেলে থাকেন।'

'দেখো ছোকরা এতক্ষণ অনেক বাড়াবাড়ি করেছ, কিন্তু আমি আর অ্যালাউ করব না। তুমি ভুলে যেয়ো না আমি অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট এবং তার জন্য ফ্রি কোয়ার্টার পাচ্ছি, ফুড পাচ্ছি; বাট ইউ আর টু পে ফর অল। তোমরা ছাত্র আর আমি কলেজে পড়াই। কোন সাহসে তোমাদের সঙ্গে আমার কমপেয়ার করছ আমি বুঝতে পারছি না।' ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

'ঠিকই, আপনি সবই ঠিক বললেন, শুধু আইনটা সবার জন্যই এটা ভুলে গেলেন। আপনি ঘরে মহিলাকে আসতে দিলে সেটা অন্যদের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। অনেকেই তাই চাইবে, যেহেতু আপনার আদর্শ সামনে আছে। তা ছাড়া হোস্টেলের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনে কোথাও বলা নেই যে ছাত্রদের একরকম চলতে হবে আর অবিবাহিত এ এস-এর সাত খুন মাফ। এটা কি ঠিক বললেন?'

'পরের ব্যাপারে নাক গলানো বাঙালির নোংরা অভ্যেস।' একটুও না নড়ে মহিলাটি কথা বললেন। অনিমেষ দেখল মহিলা কথাটা বলার পর আবার চোখ বন্ধ করলেন।

এ এস বললেন, 'গেট আউট ফ্রম হিয়ার! আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

অনিমেষের পেটের ভেতরে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা জন্ম নিল। সে তবু স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল, 'কথা আপনাকে বলতে হবে।'

'মানে?'

'আমরা যা চাইছি তাই শুনতে হবে।'

'তুমি আমাকে হুকুম করছ? হাউ ফানি!'

'হ্যাঁ। কারণ আইন আপনি ভেঙেছেন।'

'তা কী করতে হবে আমাকে?'

'ওই মহিলাকে এখনই বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসে ছেলেদের কাছে ক্ষমা চান। কারণ ওরা খুব উত্তেজিত।'

'হো-য়া-ট!' ভদ্রলোকের চোয়াল যেন ঝুলে গেল।

এই সময় মেয়েটি তড়াক করে খাটের ওপর উঠে বসল। ওঠার সময় কাপড়ে টান পড়ায় ওর শরীরের কিছু কিছু জায়গা উন্মুক্ত হয়ে গেলেও সে একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠিকঠাক করে নিল। অনিমেষ দেখল মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী। এমন একটা সৌন্দর্য যার ধার আছে কিন্তু আধার নেই। একে কোনও দিন অনিমেষ দেখেনি। হয়তো ও কলেজ ছাড়ার পর ভরতি হয়েছে। মেয়েটি বলল, 'হু ইজ হি?'

'আমার নাম অনিমেষ মিত্র, এই হোস্টেলের একজন বোর্ডার। শুনুন, আমার অনুরোধ আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে এবং ছেলেরা উত্তেজিত।'

এ এস উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি—তুমি আমার সামনে ওকে অপমান করছ? আই উইল টিচ ইউ, তোমাকে আমি হোস্টেল থেকে তাড়াব। ভীষণ বাড় বেড়ে গেছে তোমাদের। গেট আউট, গেট আউট ফ্রম মাই রুম!'

এতক্ষণে যন্ত্রণাটা সারা শরীরে ছড়াল। অনিমেষ প্রথমে ঠাওর করতে পারছিল না সে কী করবে। কিন্তু এত উত্তেজনার মধ্যে সে সূক্ষ্মভাবে একটা চিন্তা করতে পারছিল যে হুট করে কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না। সে গোবিন্দদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি যখন ভাল কথায় শুনবেন না তখন আমাদের বাধ্য হতে হচ্ছে ওঁকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে। চলো।'

কথাটা শোনামাত্র মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। যেন এক রাশ বিদ্রূপের নোংরা জল ওদের

BanglaBook.org

ওপর ছিটিয়ে দিয়ে আনন্দ পেল সে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে অনিমেষ দেখল সিঁড়ির মুখটায় ভিড় মৌমাছির চাকের মতো জমে আছে। সঙ্গীদের নিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে যেতে ছেলেরা চুপ করল। সবাই বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে। অনিমেষ বলল, 'এ এস কোনও কথা শুনতে চাইছেন না। বলছেন আইন নাকি ওঁর ওপর প্রযোজ্য নয়। আমাকে ভয় দেখিয়েছেন হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলে। রেগে গিয়ে যা-তা কথা বললেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হল যেন, ছেলেরা চিৎকার করে গালাগাল শুরু করে দিল এ এস-এর নাম ধরে। এই গালাগালগুলো হজম করা অনিমেষের পক্ষেও খুব শক্ত ব্যাপার, কারণ সবগুলোই আদিরসাত্মক ও মেয়েটিকে জড়িয়ে ইতর ভাষায় বলা। কেউ কেউ চাইছিল লোকটাকে বাইরে বের করে একটু শিক্ষা দিতে। কিন্তু অনিমেষ বাধা দিল। সবাইকে চুপ করাতে সে হাত তুলে অনুরোধ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গলাগুলো নেমে এলে সে প্রস্তাব দিল, 'খামোকা এমন কিছু আমরা করব না যাতে এ এস সুবিধে পেয়ে যান। আমাদের অভিযোগ হল : আইন সবার জন্যে এবং এ এস সেটা মানছেন না। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ কেউ মাথা গরম কোরো না। এ এস-কে বাইরে যেতে হলে এই বারান্দা দিয়েই যেতে হবে। আমরা সবাই এখানে বসে থাকব। আমাদের মাড়িয়ে তো তিনি যেতে পারছেন না! যতক্ষণ না ভদ্রলোক তাঁর সবরকম আচরণের জন্য ক্ষমা না চাইছেন ততক্ষণ তাঁকে যেতে দেব না। কী, রাজি?'

ঢেউ-এর মতো শব্দটা গড়িয়ে এল, সবাই রাজি।

গোবিন্দ প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু ওই মেয়েটা? ও যেতে চাইলে কী হবে?'

অনিমেষ হেসে ফেলল প্রশ্নটা বলার ধরনে, 'না, ওঁকেও যেতে দেওয়া হবে না। কারণ আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম চলে যেতে, তিনি বিদ্রূপ করেছেন।'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'ওকে আপনি বলে সম্মান দিয়ো না, অনিমেষদা। কলেজে কত ছেলের বারোটা বাজিয়েছে তা জানো না।'

আর একজন বলল, 'তোর বাজায়নি তো?'

'প্রায় বাজিয়ে দিয়েছিল। তিনমাস ধরে আমার পয়সায় খেয়ে শেষে বলে কিনা তোমরা ছেলেরা সব এক রকম। একটু প্রশ্রয় দিলেই নিজেকে জমিদার ভাবতে শুরু করো।'

কথাটা শেষ হলেই সবাই হইহই করে উঠল।

মুহূর্তের মধ্যে বারান্দাটা ভরতি হয়ে গেল। সবাই যেন ফুর্তির সঙ্গে গুলতানি শুরু করে দিল। এখন কারও পক্ষে ওদের ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যে কে একজন গিয়ে থবোটোকে ধরে নিয়ে এল ওখানে। সকলের অনুরোধে সে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গানে ঠোঁট রাখল। একটা ঝমঝমে সুর ক্রমশ হোস্টেলটায় ছড়িয়ে পড়ল। সুরটার মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে যে ছেলেরা একসময় হাততালি দেওয়া শুরু করল তালে তালে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে অনিমেষ এই সুরের মধ্যে থেকেও অন্য কথা ভাবছিল। পেটের যন্ত্রণাটা এখন থিতিয়ে এলেও সমস্ত শরীর অবসন্ন করে দিয়েছে। এটা কেন হয় জানা নেই, কিন্তু উত্তেজিত হলেই যদি এইরকম শারীরিক অবস্থা হয়—তা হলে?

হঠাৎই সব বাজনা কথাবার্তা আচমকা থেমে গেল। এ এস ঘরের বাইরে এসেছেন। সবাই এখন ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। এতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে যাতায়াতের পথের ওপর বসে থাকতে দেখে এ এস যে চিন্তিত তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। ভদ্রলোক দু' পা এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা তোমরা ঠিক করছ না। তোমাদের এ জন্যে শাস্তি পেতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কেউ একজন সিটি দিয়ে উঠল, শেয়ালের ডাক ডেকে উঠল কেউ কেউ।

এ এস চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট, সরে যাও এখান থেকে। রাত দশটা বাজে, যে যার নিজের ঘরে ফিরে যাও ইমিডিয়েটলি।'

'রাসলীলা শেষ হয়ে গেল নাকি?' একটা গলা ভেসে এল।

'রাসলীলা? কে বলল কথাটা? ছাত্রী অধ্যাপকের কাছে পড়তে এলে তোমরা এইরকম ব্যবহার করবে, ছি ছি!'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলা ছি-ছি-ছি-ছির ধুয়ো তুলল।

BanglaBook.org

এ এস এবার অনিমেষের দিকে তাকালেন, 'তুমি তো এদের নেতা, এদের এখান থেকে সরে যেতে বলো।'

অনিমেষ বসে বসেই মাথা নাড়ল, 'তা হয় না, স্যার। প্রথমে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

এবার মেয়েটিকে দেখা গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে যেভাবে হেঁটে আসছে তাতেই বোঝা যায় যে বেচারার মনের জোর কমে এসেছে। সোজাসুজি অনিমেষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে এবার যেতে দিন।'

গলার স্বরে এমন একটা কাকুতি ছিল যে অনিমেষ মেয়েটির মুখের দিকে না তাকিয়ে পারল না। মেয়েরা কী দ্রুত নিজেদের মুখ পালটে ফেলতে পারে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আপনি ওঁকে ক্ষমা চাইতে বলুন।'

এ এস বললেন, 'আঃ, তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলছ কেন ?'

মেয়েটি হাত নেড়ে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন, আমার কী দোষ ? আমি তো স্যারের কাছে পড়তে এসেছিলাম। হোস্টেলের নিয়মকানুন আমার জানার কথা নয়। যদি উনি অন্যায় করে থাকেন তবে তার দায় আমাকে বইতে হবে ?'

'নেকু রে নেকু—খাও ঢুকু ঢুকু।' ছড়া কেটে বলল কেউ।

এ এস বললেন, 'চলে এসো, এই স্কাউন্ড্রেলগুলো — ।'

মেয়েটি ফুঁসে উঠল, 'আঃ, চুপ করুন। অনেক বীরত্ব দেখিয়েছেন। ওরা ইচ্ছে করলে আপনাকে ছুড়ে নীচে ফেলে দিতে পারে তা জানেন ? শুনুন, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন, একটা মেয়ের পক্ষে এ ভাবে আটকে থাকা সম্ভব ? আমি বাড়িতে কী কৈফিয়ত দেব ?' মেয়েটি আবার অনিমেষের শরণাপন্ন হল।

'নেকু রে নেকু—খাও ঢুকু ঢুকু!' ছড়া উঠল।

অনিমেষ এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'একটু আগের আপনি আর এই আপনি কি এক ? যদি তা না হন তা হলে ওঁকে বলুন ক্ষমা চাইতে।'

'বেশ, আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি!' মেয়েটি বুকে হাত দিল।

'ওরে কে কার হচ্ছে দেখ।' টিপ্পনী কাটল কেউ।

'কিন্তু আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে!' মেয়েটি প্রায় কেঁদে ফেলল।

'বাঃ, একটু আগে তো দেখলাম বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিলেন। পড়তে এসে কেউ বুঝি ঘুমোয় ?' গোবিন্দ কথা বলল।

এমন সময় নীচ থেকে কেউ চিৎকার করে জানাল, 'সুপার এসেছে।'

কথাটা শুনে অনিমেষ ছেলেদের দিকে ঘুরে বলল, 'তোমরা কেউ এখান থেকে নড়বে না। আমি ওঁকে ডাকছি।'

ভিড় বাঁচিয়ে রেলিং-এর ধারে গিয়ে অনিমেষ নীচে তাকাল। বাস্কেট বলের মাঠের মাঝখানে সুপার দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাটো মানুষটিকে আরও বেঁটে দেখাচ্ছে ওপর থেকে। অনিমেষ চিৎকার করল, 'স্যার, আপনি একটু ওপরে আসুন।'

ভদ্রলোক ওপরে আসবার সময় যেটুকু সময় পেয়েছিলেন তাতেই জেনে গিয়েছিলেন কী ঘটনা ঘটেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দাঁড়াতেই অনিমেষ তাঁর সামনে দাঁড়াল, 'স্যার, হোস্টেলের আইন ভেঙেছেন বলে আমরা এ এস-কে বলতে গিয়েছিলাম, তাতে উনি খামকা অপমান করেন। তাই ছেলেরা ওঁকে ঘেরাও করেছে যতক্ষণ না উনি ক্ষমা চান!'

'কী আইন ?' ভদ্রলোকের গলা খুবই সরু।

'মেয়েদের নিয়ে ঘরে যাওয়াটা গুরুতর অপরাধ।' অনিমেষ জানাল।

'ও সব আইন আমাকেও মানতে হবে ?' এ এস-এর গলা ভেসে এল।

সুপার বললেন, 'এরকম ঘটনা এই হোস্টেলে প্রথম হল। যা হোক, কী চাইছ তোমরা ?'

অনিমেষ বলল, 'ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সুপার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাতেই তোমরা খুশি হবে ?'

'আর এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এখানে অনেক ছেলে আছে যারা এর সুযোগ নিতে চাইবে।'

'আ-চ্ছা! আপনি অ্যাপলজি চেয়ে ব্যাপারটা শেষ করুন।' সুপার ছেলেদের মাথা ডিঙিয়ে তাঁর অ্যাসিস্টেন্টের উদ্দেশে বললেন।

BanglaBook.org

'স্ট্রেঞ্জ! আপনি এ কথা বলছেন ?' সুপারের দিকে বিস্ময়ে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন এ এস।

এবার মেয়েটি বলে উঠল, 'ঠিকই তো! অন্যায় করলে দোষ স্বীকার করতে লজ্জা নেই কিছু।'

'ইউ স্টপ!' চেঁচিয়ে উঠলেন এ এস, 'আপনি কি এই ছেলেদের কাছে ক্ষমা চাইতে বলছেন আমাকে ?'

'হ্যাঁ। একজন মেয়ে এখানে সারা রাত আটকে থাকলে সম্মান বাড়বে না।' সুপার কথাটা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। তাঁর কোয়ার্টারে যাওয়ার রাস্তা এ দিক দিয়ে নেই।

এবার সবাই এ এস-এর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভদ্রলোক দুটো হাত শূন্যে নাচালেন, তারপর বললেন, 'ওয়েল, যদি এটা অন্যায় হয় আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

সঙ্গে সঙ্গে একটু খুশির শব্দ বোমার মতো ফাটল। অনিমেষ বলল, 'তা হলে আইন সবার জন্য, মানছেন ?'

ভদ্রলোক এবারে ঘাড় নেড়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। উৎফুল্ল ছেলেরা নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটাকে দেখার জন্য।

মেয়েটি এবার অনিমেষকে বলল, 'একটু কষ্ট করবেন ?'

'বলুন!'

'বুঝতেই পারছেন এখন আমি সবার চোখে কী রকম ছোট হয়ে গেছি। একা একা নীচে নামতে ভয় করছে। আপনি একটু এগিয়ে দেবেন ?' সত্যি সত্যি ভয় পাবার মতো মুখ করল মেয়েটি।

অনিমেষের মাথায় চট করে একটা মতলব খেলে গেল। সে নিরীহ মুখ করে বলল, 'এতটা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ছিল না, তবু আপনি যখন বলছেন তখন আমি একজনকে সঙ্গে দিচ্ছি।'

ছেলেরা সবাই সরে গেলেও ছোটখাটো জটলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। অনেকেই দূর থেকে মেয়েটিকে লক্ষ করে বেশ মজা পাচ্ছে। অনিমেষ সেই ছেলেটিকে খুঁজছিল যে মেয়েটিকে আপনি বলে সম্মান দিতে নিষেধ করেছে এবং বারোটা বাজানোর কথা বলেছিল। ছেলেটির সঙ্গে ওর তেমন আলাপ নেই কিন্তু মুখ চেনে। চট করে তাকে খুঁজে না পেয়ে অনিমেষ গোবিন্দকে মৃদু স্বরে ছেলেটিকে ডেকে আনতে বলে সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন ?'

দ্রুত একটা হাসির আলতো ঢেউ উঠল মেয়েটির ঠোঁটে, বলল, 'কেন বলুন তো ?'

'এত রাতে যেতে অসুবিধে হবে কিনা জানতে চাইছি।'

'তাই বলে আমি সারা রাত এখানে থাকতে পারি না।'

অনিমেষ মনে মনে বলল, এতক্ষণ তো ছিলেন! সামনাসামনি ঘাড় নাড়ল, 'তা নিশ্চয়ই নয়। বেশি দূর হলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম।'

'আপনি যাবেন ?'

'না, আমি খুব ক্লান্ত!'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকাল। মেয়েটির রূপে যে ধারালো চমক আছে সেটা এত প্রখর যে কোনও স্নিগ্ধতা সেখানে ছায়া ফেলে না। এই তাকানোর ভঙ্গি তাই শুধু কটাক্ষই হয়ে রইল। হাসল মেয়েটি, 'এত সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন আপনি! না, আমি একাই যেতে পারব।'

ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না অনিমেষ, 'অবশ্য আপনি যাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁরই উচিত ছিল আপনাকে পৌঁছে দেওয়া।'

'উচিত ? ছেলেরা যখন দেখে বদনামের নোংরা গায়ে লাগবে না তখন তারা আকাশ ছুঁতে পারে, একটু সেরকম অবস্থায় পড়লে গুটিয়ে কেন্নো হয়ে যায়। আমি ঋণ শোধ করতে এসেছিলাম, অনেক হয়েছে।' কথাগুলো বলতে বলতে মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় গোবিন্দ ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এল।

অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে বলল, 'শোনো ভাই, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। উনি তো তোমাদের ক্লাস-মেট, তুমি তাই ওঁকে একটু বাস-স্টপ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। রাত হয়েছে, ওঁর একা যাওয়া ঠিক নয়।'

এরকম প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না ছেলেটি, বলল, 'কিন্তু হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে গেছে, এখন যাওয়া অসম্ভব।'

অনিমেষ হাসল, 'আমি সুপারের পারমিশন নিয়ে নেব, স্পেশাল কেস হিসেবে যেতে পারো। তোমরা একসঙ্গে পড়ো, তাই বলছি।'

ছেলেটি খুব বিব্রত বোধ করছে দেখে অনিমেষের মজা লাগছিল। সে বলল, 'মেয়েদের সম্মান

BanglaBook.org

রাখা আমাদের কর্তব্য। যান, আপনি ওর সঙ্গে চলে যান।'

'ধন্যবাদ।' মেয়েটি কথাটা বলেই দ্রুত নামতে শুরু করল। একান্ত অনিচ্ছায় ছেলেটি ওর সঙ্গ নিল।

ওরা চলে গেলে গোবিন্দ চাপা গলায় বলল, 'নির্ঘাত যেতে যেতে ভাব হয়ে যাবে।'

অনিমেষ বলল, 'তুমি একবার সুপারকে ওর কথা বলে এসো, ভাই। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, আমি ঘরে যাচ্ছি।'

নিজের ঘরের দরজায় তালা নেই। তার মানে ত্রিদিব ফিরে এসেছে। এতক্ষণে অনিমেষের খেয়াল হল যে ওপরের ভিড়ে ত্রিদিবকে সে দেখেনি। সবাই গিয়েছে আর ও ঘরে বসে রইল। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালতে যেতেই ত্রিদিবের জড়ানো গলা কানে এল, 'নো লাইট, প্লিজ।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আজকেও খেয়েছ?'

ত্রিদিব প্রথমে কিছু বলল না। অনিমেষ নিজের খাটে গিয়ে বসলে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বিপ্লব হয়ে গেল?'

'বিপ্লব?' অনিমেষ বিস্মিত।

'কাজকর্মগুলো নাকি বাড়ি থেকেই শুরু করতে হয়। তুমি তোমার বিপ্লব হোস্টেল থেকেই আরম্ভ করলে। ব্রাভো ব্রাদার। যখন ফিরলাম তখন শুনছিলাম তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ। এই প্রথম নেতা হয়ে গেলে, গুড! সামনে খোলা ময়দান, এগিয়ে যাও, ফরোয়ার্ড মার্চ। সম্ভাবনার ঢেউ আছে তোমাদের মধ্যে, তোমার হবে।' নাটুকে গলায় বলল ত্রিদিব।

'কী যা-তা বকছ?' অনিমেষ বিরক্ত হল।

'যা-তা নয়, বন্ধু। এ ঘটনা কাল অন্য ছেলেরা জানবে। অটোমেটিক্যালি তুমি হিরো হয়ে যাবে। নেক্সট স্টেপ ইউনিভার্সিটির ইলেকশনে জেতা, তারপর ইউনিয়নের সেক্রেটারি, তারপর এম এল এ মন্ত্রী। স্বর্গের সিঁড়ি — উঠে যাও।'

'তুমি মাতাল হয়ে গেছ।' অনিমেষ সহজ করার চেষ্টা করল।

'একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি যা করলে তার চেয়ে মাতাল হওয়া ঢের ভাল।'

তেরো

ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার মুখেই বিমানের সঙ্গে দেখা। ওকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল।

বিমান বলল, 'তোমার পাত্তা নেই কেন? এটা খুব অন্যায়।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় খুঁজছিলেন?'

'খুঁজছিলাম মানে? তিনদিন তোমার ক্লাশে ছেলে পাঠিয়েছি, তারা এসে বলল, তুমি নেই। গত কাল তোমার হোস্টেলে গিয়ে পাওয়া যায়নি। যাক, তুমি একটু অফিসে এসো, দরকার আছে।'

এখন ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে মনে কোনও অস্বস্তি হয় না। বাংলার ক্লাশ না করেও কোনও ছাত্র ইচ্ছে করলে ভাল রেজাল্ট করতে পারে। কতগুলো ধরা-বাঁধা প্রশ্ন এবং তার বস্তাপচা উত্তর মানেই পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাশ পাওয়া—এই সত্য অনিমেষের জানা হয়ে গেছে। সেদিন কোথায় যেন পড়ছিল আগেকার দিনে ম্যাট্রিক পাশ করার চেয়ে এখন ডক্টরেট পাওয়া সহজ। লোকসাহিত্য বা জয়দেব সম্পর্কে প্রচারিত বইগুলো থেকে ছেঁকে নিয়ে সাজিয়ে দিলেই সেই সাবজেক্টের থিসিস হয়ে যায়। আর যাঁর অধীনে কাজ হচ্ছে তাঁর ভালবাসা পেলেই নামের আগে ডক্টরেট বসে যাবে। কিন্তু ইদানীং ব্যাপারটার অসারতা এত স্পষ্ট যে চট করে কেউ নিজেকে ডক্টরেট বলে পরিচয় দেয় না, বিশেষত বাংলায়। অনিমেষ বিমানকে বলল, 'চলুন।'

ছেলেমেয়েরা যে যার ক্লাশে কিংবা আড্ডায় যাচ্ছে। এখন ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের সংখ্যা বোধ হয় ছেলেদের থেকে বেশি। এত রকমের সাজগোজ একসঙ্গে দেখে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। কিছুদিন হল অনিমেষ টের পাচ্ছে সে যখন ওদের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করে তখন তাকে নিয়ে ফিসফাস আলোচনা হয়। সম্ভবত সেই মিটিং-এর আবিষ্কারের কথা এখন জনে জনে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বিমান বলল, 'কাল তোমাদের হোস্টেলে খুব কাণ্ড হয়েছে শুনলাম।'

অনিমেষ অবাক হয়ে বিমানের দিকে তাকাল, 'আপনি কী করে জানলেন, বিমানদা?'

'সব খবরই আমাদের কাছে আসে। তুমি লিড করেছিলে?'

BanglaBook.org

'লিড মানে আমিই কথা বলেছিলাম এ এস-এর সঙ্গে। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি খুব একটা ভাল ছিল না। সুপার না এসে গেলে কী হত বলা যায় না। ওঁর কথায় ভদ্রলোক ক্ষমা চাইলেন।' অনিমেষ বলতে বলতে ভাবছিল যদি সুপার না আসতেন তা হলে একটা হাতাহাতি হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না।

বিমান বলল, 'যা হোক, নেতৃত্বটা তোমার হাতে ছিল জেনে আমি খুশি।'

একটু ইতস্তত করে অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা খুবই বাজে। ওরকম একটা ইস্যু নিয়ে হইচই করতে আমার প্রথমে ইচ্ছে ছিল না, শেষে জড়িয়ে পড়লাম। ঘটনাটা এত সামান্য— ।'

হাত তুলে অনিমেষকে থামিয়ে বিমান ঘুরে দাঁড়াল, 'সব সময়ে একটা কথা মনে রাখবে, লাইম লাইটে আসতে গেলে সুযোগের সদব্যবহার করতে হবে। যেটাকে সামান্য মনে হচ্ছে তাকে যদি একটু মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে পারো সেটাই অসামান্য হয়ে যেতে পারে। ধরো, কালকে যদি তোমরা ওই ইস্যুটার সঙ্গে আরও কতগুলো পয়েন্ট যোগ করতে তা হলে আজ তুমি সারা কলকাতায় পরিচিত হয়ে যেতে।'

'কী রকম ?' অনিমেষ কৌতুকবোধ করল।

'অত্যন্ত জঘন্য খাবার, হোস্টেল কর্তৃপক্ষের তোমাদের টাকায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ানো এবং হোস্টেলের কোয়ার্টার অসৎ কাজে ব্যবহার—স্রেফ এই তিনটে ইস্যু যোগ করে দিলে কলকাতার সব হোস্টেলের বোর্ডারদের সঙ্গে পেতে। কারণ, প্রথম অভিযোগটা এত কমন যে সবাই একমত হবেই। আজ যদি সারা দেশের হোস্টেলগুলোয় ওরকম ঘেরাও প্রতিবাদ শুরু হয়ে যেত তা হলে সবার সঙ্গে সংযোগরক্ষার জন্যে একটা কমিটির প্রয়োজন হত; এবং যেহেতু তুমি প্রথম ঢিল ছুড়েছ তাই তোমার উদ্যোগে কমিটি হলে তার নেতৃত্ব তোমারই থাকত। এত হোস্টেল এবং তার বোর্ডারের সংখ্যা বিরাট হওয়ায় খবরের কাগজে ব্যাপারটা গুরুত্ব পেত এবং তুমি নেতা হিসেবে নিজের জায়গা করে নিতে পারতে। না, না, অনিমেষ তুমি ভুল করেছ এ সুযোগ না নিয়ে। কাল যদি একবার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে তা হলে— ।' আফশোসের ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়ল বিমান।

চোখের সামনে অবলীলায় বিমান যে ছবিগুলো এঁকে গেল তা অনিমেষ স্পষ্ট দেখতে পেল। এবং দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে ওর মুখে কথা ফুটল না। এই জটিলভাবে সহজ করে তোলার নামই বোধ হয় রাজনীতি। সে নিচু গলায় জবাব দিল, 'বিমানদা, ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে ভাববার সময় পাইনি।'

'বুঝেছি এবং সেখানেই আমার আপত্তি। তোমাকে একটা সরল সত্য বুঝিয়ে দিই। ধরো রামকৃষ্ণ মিশনে যিনি দীক্ষা নিয়েছেন তিনি কতগুলো উপদেশ জানেন এবং সেভাবেই জীবনযাপন করেন। তাঁর জীবনে যদি কোনও সমস্যা আসে তা হলে তার সমাধান তিনি সেই উপদেশমতোই সমাধান করবেন। এই ভদ্রলোক থাকেন কলকাতায়। এবার আর একজনের কথা ভাবো যিনি থাকেন কানপুরে। দেখা যাবে তিনি যদি দীক্ষিত এবং একনিষ্ঠ হন তা হলে তাঁর কার্যকলাপ কলকাতার ভদ্রলোকের প্রায় কার্বনকপি হবে। কেন হবে বলো তো ? বিমান প্রশ্নটা করে উত্তরের জন্য ইউনিয়ন অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এক হবে কারণ ওঁদের আদর্শ এক।' অনিমেষ সহজ গলায় বলল।

'আমি হলে অবশ্য বলতাম, এক তো নাও হতে পারে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও বোধ দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধ আত্মসমর্পণের ওপর, তাই তার ভিত নড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়—সব সময় এক হবেই কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ধর্ম তার শেকড় গাড়ে। কিন্তু যে মানুষ মার্কসবাদে বিশ্বাস করে সেটা পরীক্ষায় সত্য জেনেই করে। বাতাস-জলের মতো মার্কসবাদ মানুষের প্রয়োজন। এখন তার নানারকম ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ হচ্ছে কিন্তু মূল সত্তা তো অবিকৃত। তুমি যদি তোমার বোধ ও বুদ্ধি মার্কসবাদে শুদ্ধ করতে তা হলে গত কাল কারও জন্যে অপেক্ষা করতে হত না। তোমার কর্মপদ্ধতি এবং তার ফলাফল দেখেই তুমি বুঝতে পারতে আমার সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। বিমান হাসল, 'হতাশ হয়ো না কমরেড, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তুমি যা করেছ তা অনেক, কিন্তু এ থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষিত হলে বেশি লাভবান হবে।'

এই সাতসকালেই ইউনিয়ন অফিস জমজমাট। ইলেকশন আসছে। কাজকর্ম প্রচুর। অনিমেষ দেখল সুদীপদাকে ঘিরে বেশ বড় একটা দল কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে। সুদীপদার মুখে আধপোড়া এবং বোধ হয় নেবা চুরুট। কয়েক সেকেন্ডেই অনিমেষ বুঝতে পারল বিভিন্ন ক্লাশের ক্যান্ডিডেট সিলেকশন চলছে যারা ছাত্র ফেডারেশনের ব্যানারে দাঁড়াবে।

সুদীপ ওকে দেখে চিৎকার করে বলল, 'এই যে এসে গেছে! তা তোমার মতলবটা কী বলো তো?'

সবাই ওর দিকে ঘুরে দেখছে, অনিমেষ বিব্রত বোধ করল। প্রশ্নটার মানে সে ধরতে পারছে না।

সুদীপ বলল, 'একদম বোবা হয়ে গেলে যে! এদিকে শুনছি বেশ নেতা হয়ে গেছ, চারধারে নাম হয়েছে, আর আমাদের এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে!'

অনিমেষের মুখে রক্ত জমল, 'কী যা-তা বলছেন!'

সুদীপদা বলল,'গত কাল তোমাদের এ এস-কে খুব টাইট দিয়েছ খবর পেলাম। ভাল করেছ। ব্যাটা এককালে কমিউনিস্টদের গালাগাল দিত।'

কথাটা প্রথম শুনল অনিমেষ। এ এস সম্পর্কে এরা যে খবর রাখে ওরা হোস্টেলে থেকেও তা জানে না। ওর হঠাৎ মনে হল যারা রাজনীতি করে তাদের অনেক গোপন কান এবং চোখ আছে, তাই কোনও কিছুই তাদের অজানা থাকে না। মুশকিল হল সে নিজে দুটোর বেশি প্রকৃতির কাছ থেকে পায়নি। অনিমেষ দেখল ঘরে ঢুকেই বিমান নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সর্বত্র কর্মব্যস্ততা, তাই এ ভাবে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছিল। অথচ নিজে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দুজন পোস্টার লিখছে। অনিমেষ শুনল, যে সচরাচর লিখে থাকে সে আসেনি বলে ওরা হিমসিম খাচ্ছে। সুদীপ আবার লিস্ট নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত এখন। অনিমেষ ছেলে দুটোর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি একটু সাহায্য করতে পারি?'

একটা ছেলে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে হেসে উঠে দাঁড়াল, 'আপনার অভ্যেস আছে?'

অনিমেষ বলল, 'না, অভ্যেস নেই। তবে বাংলা অক্ষর তো, চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ছেলেটা বলল, 'খুব সোজা নয়। বড় হরফ হতে হবে, সেই সঙ্গে গোটা গোটা এবং তাতে এমন স্পিড থাকবে যে সংগ্রামী মনে হবে। নিন দেখুন, পারেন কিনা!'

ছেলেটা একটা কাগজ ওর হাতে ধরিয়ে দিল, তাতে তিনটে লাইন লেখা। 'আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে", 'বাম ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ', 'নির্বাচন অধিকার আদায়ের একমাত্র হাতিয়ার।'

অনিমেষ দেখল প্রথমটা লেখা হয়েছে, সে তার পরের লাইনটা শুরু করল। লিখতে লিখতে ওর খেয়াল হল সেই ছেলেবেলায় কংগ্রেসের নৌকোতে রিলিফের কাজে যাওয়ার পর এই প্রথম সে কোনও রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসীদের সহযোগী হয়েছে। ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে, অনিমেষ খুব সাবধানে আঁকার চেষ্টা করছিল। একে লেখা না বলে আঁকা বলাই ভাল। ছেলেটা ঠিকই বলেছে লেখাগুলোর মধ্যে একটা সংগ্রামী চরিত্র ফুটে ওঠা দরকার এবং সেটা আঁকার কায়দার ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু লিখতে লিখতে বুকের মধ্যে একটা তপ্ত ভাব অনুভব করছিল অনিমেষ। এই শব্দগুলোর মধ্যে এমন একটা ফোর্স আসে যা বন্দেমাতরমের মধ্যে নেই।

লেখা যখন শেষ তখন সুদীপের গলা শুনতে পেল অনিমেষ, 'শাবাশ, হাতেখড়ি মন্দ হয়নি!' ব্যাপারটা ওকে এতখানি আকৃষ্ট করে রেখেছিল যে অন্য দিকে খেয়াল ছিল না। এখন দেখল ওর পেছনে ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে, সবাই পোস্টারগুলো দেখছে। সচেতন হয়ে সে নিজের লেখা দেখল। না, খারাপ হয়নি, বরং এগুলো সে নিজে লিখেছে তা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ছে। কোনও দিন সে এ-কাজ করেনি, কিন্তু এত ভাল কী করে হল! সে সুদীপকে বলল, 'প্রথম চেষ্টা তো — ।'

একটা চুরুট এগিয়ে দিল সুদীপ, 'নাও, এটা ধরাও।'

বিমান চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, অন্য কেউ চাইলে তো চুরুট ছাড়া হয় না, আজ হঠাৎ এত উদারতা, লক্ষণ ভাল নয়।'

সুদীপ ঠাট্টার গলায় জবাব দিল, 'এই চুরুট সবার সহ্য হবে না।'

বিমান বলল, 'তা হলে বলছ অনিমেষের সহ্য হবে!'

সুদীপ বলল, 'মনে হচ্ছে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আমি খাই না, সুদীপদা।'

বিমান কপট ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'না বলতে নেই, অনিমেষ। ওটা খেলে দেখবে বেশ বুদ্ধিজীবী বলে মনে হবে নিজেকে। তা ছাড়া তুমি ভাগ্যবান, তাই ওটা পাচ্ছ। নিয়ে নাও চটপট।'

অগত্যা অনিমেষ চুরুটটা নিল। ছোট্ট কিন্তু বেশ শক্ত চেহারার চুরুট। এর আগে সে কাউকে কাউকে দেখেছে চুরুট খাবার আগে দেশলাই কাঠি দিয়ে মুখ ফুটো করে নিতে। কিন্তু এটায় সেরকম প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না। সুদীপ আগুন জ্বেলে সামনে ধরতে সে ওটা ধরাল। বিকট গন্ধ

BanglaBook.org

সহ ধোঁয়াটা নাকে যেতে অনিমেষের মনে হল দমবন্ধ হয়ে যাবে। ততক্ষণে সুদীপ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকল, 'অনিমেষ, এদিকে এসো।'

সমস্ত শরীর গোলাচ্ছে, কোনওরকমে কাশি চেপে অনিমেষ দেখল তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে কোনওরকমে সুদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সুদীপ কতগুলো কাগজ থেকে একটা বেছে নিয়ে ওকে বলল, 'পুরো নাম সই করো।'

অনিমেষ যতটা সম্ভব দ্রুত কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল এটা একটা নমিনেশন ফর্ম। ফিফথ ইয়ার বাংলার ক্যান্ডিডেট হয়ে তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে। একটুও ইতস্তত না করে অনিমেষ সই করল সুদীপের কলমে। সুন্দর গোটা অক্ষরে লেখা অনিমেষ মিত্র, শব্দ দুটো ঝকঝক করছিল কাগজে।

সুদীপ বলল, 'তোমার ক্লাশের দুজন ছেলে চাই যারা প্রপোজ এবং সেকেন্ড করবে। তোমার কেউ পছন্দের আছে?'

অনিমেষ চট করে শুধু পরমহংস ছাড়া কাউকে মনে করতে পারল না।

ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আমি করতে পারি।'

সুদীপ বলল, 'হ্যাঁ, তুমি তো আছ। আর একজনকে ডেকে সই করিয়ে নিয়ো।'

অনিমেষ ছেলেটিকে দেখল, বাংলার ক্লাশে ওকে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। হয়তো লক্ষ করেনি।

এবার বিমান ওকে ডাকল। অনিমেষ ওর সামনে গিয়ে বসতেই বিমান বলল, 'অন্য ক্যান্ডিডেটদের সঙ্গে মিটিং হয়ে গেছে, তুমি বাকি ছিলে। এই ইলেকশনে আমাদের প্রতিপক্ষ দুজন। ছাত্র পরিষদ আর এস. এফ. রাইট। শেষ দলটা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই, কারণ ওদের শক্তি এত কম যে কিছু করে উঠতে পারবে না। ছাত্র পরিষদ প্রচুর টাকা ঢালছে। ওদের পোস্টারগুলো দেখেই তা বুঝতে পারবে। এটা তো সবাই জানে ছাত্র পরিষদ হল কংগ্রেসের সংগঠন। এখন দেশের যা অবস্থা তাতে কংগ্রেসি সরকার খুব সুখে নেই। মানুষ ক্রমশ ওদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছে। ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে যখন আমরা প্রচার করব তখন ওই সেন্টিমেন্টটাকে কাজে লাগাব। ওরা হয়তো আমাদের চিনের দালাল বলে এক হাত নেবে কিন্তু মানুষ দূরের জিনিসের চেয়ে কাছের সমস্যাই বেশি প্রয়োজনীয় মনে করে। বুঝতে পারছ?'

অনিমেষ হঠাৎ বলল, 'চিনের দালাল মানে ছাত্র ফেডারেশন চিনকে সমর্থন করে?'

বিমান হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলল, 'সেটা আলাদা প্রশ্ন। ভারত-চিন সীমান্ত-যুদ্ধ সম্পর্কে পার্টি যে বক্তব্য রেখেছে সেটা পড়ে দেখবে। কংগ্রেসিরা সেই বক্তব্যটার অপব্যাখ্যা করছে। কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে তুমি চিনের দালাল কি না তা হলে জবাব দেবে কারও ভালকে সমর্থন করা মানে দালালি নয়। মাও সে তুং যেভাবে কৃষক-শ্রমিককে সংগঠিত করে লংমার্চ করেছিলেন সেটা বিশ্বে মানবতার জ্বলন্ত মশাল বলে চিহ্নিত থাকবে। আমরা যদি এই মশালের আগুনে নিজেদের শুদ্ধ করি তা হলে কি দালালি হবে? এই হবে আমাদের বক্তব্য।'

অনিমেষ বলল, 'তা হলে ওটাকে সীমান্ত-সংঘর্ষ বলব?'

'হ্যাঁ, কারণ ঘটনাটা কী তা আমরা জানি না। যে দেশ কমিউনিজমের আদর্শে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ মাথা তুলেছে, যে দেশের মহান নেতা মাও সে তুং, সে দেশ আক্রমণকারী এটা স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না। আচ্ছা, এবার তোমার কাজ হবে ক্লাশের সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এক আধটা কাজ যা চোখে পড়ার মতো যদি করতে পারো তা হলে সবার নজরে পড়বে। অবশ্য ওই মিটিং-এর পর তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ম্যান টু ম্যান ক্যাম্পেনের মূল্য আছে, সেটা শুরু করে দেবে। কখনও কোনও অবস্থায় মাথা গরম করবে না, সব সময় হাসিমুখ করে থাকবে। আর যদি কোনও প্রবলেম সামলাতে না পারো তা হলে অফিসে যোগাযোগ করবে। অল রাইট?' বিমান বুঝিয়ে দিল।

সেদিন থেকেই ক্যাম্পেন শুরু হয়ে গেল। সুদীপের সঙ্গে কয়েকটা ক্লাশ ঘুরল অনিমেষ। সে-সব ক্লাশের ক্যান্ডিডেটদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুদীপই বক্তৃতা দিল। খুব ভাল বলে সুদীপ, বলার ধরনে এমন একটা তেজস্বিতা আছে যে চুপ করে শুনতে হয়।

ঘুরতে ঘুরতে অনিমেষের ক্লাশের সামনে আসতে ওরা দেখল টি. এন. জি. ক্লাশ নিতে আসছেন। সুদীপ দ্রুত ভদ্রলোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার, আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে।'

BanglaBook.org

টি. এন. জি. চশমাটা এক হাতে ঠিক করে নিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

'ছেলেমেয়েদের দু-তিনটে কথা বলব। ইলেক্‌শনের ব্যাপারে।'

'পাঁচ মিনিটেই যেন হয়ে যায়।' টিন. এন. জি. আবার প্রফেসার্স রুমে ফিরে গেলেন।

সুদীপ অনিমেষকে নিয়ে ক্লাশে ঢুকল। ওদের দলের ছেলেরা দরজায় দাঁড়িয়ে। টি. এন. জি-র ক্লাশ বলেই ঘরটা ভরতি। ছেলেমেয়েরা সবাই উৎসুক হয়ে ওদের দেখছে। সুদীপ ডায়াসে উঠে বলল, 'বন্ধুগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন আসন্ন। আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা ছাত্র ফেডারেশন (লেফট) আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। এই নির্বাচনে আমাদের তরফ থেকে এই ক্লাশের প্রার্থী শ্রীঅনিমেষ মিত্র। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে অনিমেষ এই কংগ্রেসি সরকারের উগ্র দমননীতির শিকার হয়েছেন। এই সরকারের পোষা পুলিশ সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাঁকে এমনভাবে গুলিবিদ্ধ করে যে চিরকালের মতো তিনি শরীরে বুলেটের চিহ্ন নিয়ে বেঁচে থাকবেন। অনিমেষকে ভোট দেওয়া মানে সেই নৃশংসতার প্রতিবাদ জানানো। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, তবু আমি অনিমেষকে অনুরোধ করছি আপনাদের কিছু বলতে। অনিমেষ—।'

মাথা নেড়ে অনিমেষকে ডায়াসে আসতে বলে সুদীপ গম্ভীরমুখে দরজার কাছে সঙ্গীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সুদীপের বক্তৃতার সময় অনিমেষ ছেলেমেয়েদের প্রতিক্রিয়া দেখছিল। সবাই বেশ উৎসুক হয়ে তাকে লক্ষ করেছে। অনিমেষ, অস্বস্তি থাকলেও, বেশ স্মার্ট হবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সুদীপ এ ভাবে তাকে ডাকবে চিন্তা করেনি, কারণ অন্যান্য ক্লাশে ক্যান্ডিডেটদের কিছু বলতে বলা হয়নি। সময় কম এবং সবাই ওকে উৎসুক হয়ে দেখছে বুঝতে পেরে অনিমেষের পেটের ভেতর চিনচিন ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল। ও বুঝতে পারছিল এখন একটা ভুল পদক্ষেপ মানে চিরকালের মতো হাস্যকর হওয়া। পায়ের স্টেপ ঠিক রেখে ও এমন ভান করে ডায়াসে উঠে এল যে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। যে-কোনও মুহূর্তে শরীরে ঘাম হতে পারে বা কথা জড়িয়ে যেতে পারে জেনেও ও কথা শুরু করল, 'বন্ধুগণ, আমি অনিমেষ মিত্র, আপনাদের সতীর্থ, আগামী নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন চাইছি। কবে, কখন, কী কারণে পুলিশ আমাকে গুলিবিদ্ধ করেছিল কিংবা আমার একটি অমূল্য বছর কীভাবে হাসপাতালে শুয়ে নষ্ট হয়েছে সে সব বলে আপনাদের মন নরম করতে আমি চাই না। আমি এখন সুস্থ, যদিও বুলেটের দাগ উল্কি হয়ে আছে, থাকবে। আমি মফস্বলের ছেলে, জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলাম। সেখানে দেখেছি ক্ষমতার কী কদর্য প্রয়োগ, দেখেছি স্বার্থের কী নোংরা ব্যবহার! একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন নির্দিষ্ট প্ল্যান লাগে, একটা দেশকে গঠন করতেও তেমনি পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনা হল একটা নির্দিষ্ট মতবাদ যা দরিদ্রের মুখে অন্ন দেবে এবং একটা শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলবে। ছাত্র ফেডারেশন লেফট মনে করে সেটা কমিউনিজমের পথেই সম্ভব। এর ফল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখেছি। কেউ কেউ বলতে পারেন, আমরা ছাত্র, রাজনীতির এই জটিলতায় আমরা কেন যাব ? বাড়িতে যদি আগুন লাগে তা হলে ছোটরাও বালতি হাতে ছুটে যায়, তাই না আমরা প্রতিবাদ করতে পারি অরাজকতার বিরুদ্ধে। এইসব ছোট প্রতিবাদ এক হয়ে যে শক্তি ধরবে তা কিন্তু আমাদেরই উপকারে আসবে। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে সমর্থন চাইছি যাতে প্রতিবাদ করতে পারি। ধন্যবাদ।'

কথা বলতে বলতে খেয়াল ছিল না, এখন অনিমেষ আবিষ্কার করল তার সেই নার্ভাসনেসটা একদম নেই। খুব সহজে সে বলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপরই তুমুল হাততালিতে ঘর ভরে গেল যেন। মেয়েরাই বেশি শব্দ করছে।

অনিমেষ শান্ত মুখে দরজার কাছে আসতেই সুদীপ বলল, 'আর একটা চুরুট খাবে ?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না, না, বাপস!'

'মানে ?' চোখ বড় করল সুদীপ।

'ওটা এই বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর। তা ছাড়া আমি তো মফস্বলের ছেলে, বুদ্ধিজীবী হতে পারব না।' হাত জোড় করল অনিমেষ।

সুদীপের মুখে কিছুক্ষণ কথা ফুটল না। তারপর সঙ্গীদের বলল, 'শ্রীমান অনিমেষ মিত্রের দীক্ষা হয়ে গেছে। এখন উনি সাবালক।'

বিকেলে হোস্টেলে ফেরার সময় অনিমেষ পরমহংসের সঙ্গে ফিরছিল। পরমহংস বলছিল, 'তুমি কালকে শোভনাদির ছেলেকে পড়াতে রাজি না হয়ে ভাল করেছ, এতক্ষণে মনে হল।'

অনিমেষ অবাক হল, 'কেন ?'

BanglaBook.org

'এ সব টিউশনি-ফিউশনিতে কি তোমাকে মানায় ? তুমি হলে বর্ণচোরা আম। ওপরে লাজুক, ভেতরে আগুন। শালা কী বক্তৃতা দিলে আজ! একবার ভাবলাম মুখস্থ করেছ নাকি, তারপর দেখলাম, নাঃ। সব ক'টা মেয়ে বোলড আউট। মিডল স্টাম্প ছিটকে গেছে। তা এই তুমি ঘাড়গুঁজে ছাত্র পড়াচ্ছ—ভাবাই যায় না।'

হো হো করে হাসল অনিমেষ, 'যে লোকটা বক্সিং লড়ে সে বউকে আদর করে না ? কী আশ্চর্য! এ সব বলে এড়িয়ে গেলে হবে না, তুমি আমার জন্য টিউশনি দেখো।'

'শালা হাতের মোয়া, চাইলেই পাওয়া যায়, না ? তারপর ফ্যাচাং করে রেখেছ। ঘটি হলে হবে না, চেনাশুনা বেরুলে চলবে না—দেখি, যদি পাই। তা তোমার চিন্তা কী! ইউনিয়ন থেকে গ্যাম্বলিং হবে না ?'

'গ্যাম্বলিং ?' অনিমেষ হতভম্ব।

'ফালতু টাকা পাওয়া মানে গ্যাম্বলিং।'

'সেটা কংগ্রেসি ইউনিয়নে হত।'

'গুড। এখন থেকে ভাল স্পিন বোলিং রপ্ত করেছ। তোমার হবে। দেখো অনিমেষ, সব শালাই গাছে ওঠে কিছু হাতিয়ে নিতে। যারা আদর্শ-ফাদর্শ কপচায় তারাই রান আউট হয়ে যায়।'

এই কথাগুলো হোস্টেলে ফিরে অনিমেষের মনে হচ্ছিল। এই দেশে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। সাধারণ মানুষের মানসিকতা এইভাবেই তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিদিব নেই। ঘরে একা শুয়ে শুয়ে অনিমেষ আকাশ দেখছিল। অনেক দিন জলপাইগুড়ির চিঠি পাচ্ছে না। দাদু প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিতেন, আজকাল তাও যেন অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। ছোটমা তো দেয়ই না, টাকা পাঠানোর পর বাবা খবরাখবর জানতে চান। আসলে সে নিজে নিয়মিত লিখতে পারে না বলেই ওঁদের এই ঠাণ্ডা ভাব সেটা সে জানে। কিন্তু চিঠি লিখতে গেলে এত আলসেমি লাগে!

বাবা যদি আজকের খবরটা জানতেন তা হলে নিশ্চয়ই রেগে যেতেন। ওঁর ভাষায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে নিজের বারোটা বাজানো। অনিমেষ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে অধ্যাপনা করুক এই তাঁর ইচ্ছা। ইউনিয়ন করছে জানলে টাকা বন্ধ করেও দিতে পারেন। বরং দাদু অতটা বিপক্ষে যাবেন না। অনিমেষ যখন কিছু করছে সেটা মন্দ নয় জেনেই করছে এই তাঁর বিশ্বাস।

দরজায় শব্দ হতে অনিমেষ বলল, 'খোলা আছে।'

দারোয়ান মুখ বাড়াল, 'আপনাকে বড়া সাব বোলাচ্ছে।'

বড়া সাব মানে সুপারিনটেনডেন্ট। সচরাচর টাকা বাকি না পড়লে তিনি খোঁজ নেন না। অনিমেষ দরজা বন্ধ করে বাস্কেটবল লন পেরিয়ে এদিকে চলে এল। সুপার ওঁর টেবিলে বসে ছিলেন। অনিমেষ যেতেই তিনি সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

অনিমেষ বলল, 'ডেকেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। আজ কলেজ কর্তৃপক্ষ একটা মিটিং ডেকেছিলেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আর আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের একসঙ্গে হোস্টেলে রাখা চলবে না। কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য একদম আলাদা হোস্টেল হবে এগুলো। ব্যাপারটা সামনের মাসের এক তারিখ থেকেই কার্যকরী হবে।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি কি আমায় হোস্টেল ছেড়ে দিতে বলছেন ?'

সুপার বললেন, 'ব্যাপারটা সেইরকম।'

কলকাতার কলেজে ভরতি হবার পর থেকে এই হোস্টেলে বছরগুলো কেটেছে। এখন কোথায় যাবে সে ? অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কারণটা কি শুধু এটাই, না গত রাত্রের ঘটনাটা এর পেছনে রয়েছে ?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'আপনি বলবেন না।'

'অপ্রিয় কথা বলতে আমি চাই না।'

'আপনাদের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি এবং সেটা করতে আপনি বাধ্য করছেন।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে সুপার বলে উঠলেন, 'আমার কথা শোনো অনিমেষ, এ নিয়ে প্লিজ হইচই কোরো না। যদি স্ট্রাইক করো তাহলে কিছু ছেলের ক্ষতি হবে যারা এখনও স্কটিশ কলেজে

BanglaBook.org

পড়ে। তোমার তো থাকা নিয়ে কথা। আমি সেন্ট জন হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানে অনেক এম এ-র স্টুডেন্ট আছে। উনি তোমাকে একটা সিট দিতে রাজি হয়েছেন। আফটার অল, তোমার বাবা আমাকে পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করেছেন তোমাকে দেখতে, তুমি আমার কথা রাখো।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল। তারপর ধীরে পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সামনের লনে দুটো ছেলে বল নিয়ে পিটোপিটি করছে। খুব শান্ত পরিবেশ এখন। ওপরে বোধ হয় থম্মোটো মাউথঅর্গান বাজাচ্ছে। গত রাত্রের ঘটনার জন্যে এত তাড়াতাড়ি আঘাত আসবে কল্পনা করতে পারেনি সে। সামান্য এই ব্যাপারে যদি তাকে হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে হয়, বড় ব্যাপারে না জানি কী হবে। একবার বিমানদার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। অনিমেষ দেখল ত্রিদিব ঢুকছে। ও কাছে গিয়ে বলল, 'একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'কী?'

'আমাকে সুপার হোস্টেল ছেড়ে দিতে বললেন।'

'জানতাম।'

'জানতে মানে?'

'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।' দু হাত নেড়ে আবৃত্তি করল ত্রিদিব। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওরা তোমার ক্ষতি করতে গিয়ে ভাল করে ফেলল। কথাটার মানে পরে বুঝবে।'

চোদ্দো

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ফলাফল প্রায় এক তরফা হয়ে গেল। ছাত্র পরিষদ যে ক'টা সিট পেয়েছে তা এত সামান্য যে ওদের ক্যাম্পে এখন লোকজন নেই বললেই চলে। হঠাৎই যেন উত্তেজনা হ্রাস পেয়ে গেছে, যেসব ছেলেরা ছাত্র পরিষদের হয়ে কাজকর্ম করেছিল তারা এখন এমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে যেন ও ব্যাপারের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই। দল হেরে গেলেই যে এমন করে পিছিয়ে যেতে হয় সেটা অনিমেষ জানত না, এখন জানল। বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশন এখন তুঙ্গে। ডানেরা তো আমলই পায়নি। অনিমেষ ওর ক্লাশের শতকরা আশিটি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। বিমান বলেছিল, 'এটা তো জানা কথাই। বিধান রায়ের সিটের মতো তোমার জেতা নিশ্চিত ছিল।' বিধান রায় নাকি কখনওই হারেননি। চৌরঙ্গি এলাকায় তাঁর একবার হারো-হারো অবস্থা হয়েছিল কিন্তু শেষতক জিতে গেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত ভাললাগা পার্টির ওপরে গিয়ে তাঁকে জিতিয়ে দিত। অনিমেষ বোঝে ক্লাশের ছেলেরা যখন ওর সঙ্গে কথা বলে তখন বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলে। হয়তো ওর মিষ্টি লাজুক চেহারা এবং সেই বুলেটের চিহ্ন ছেলেমেয়েদের মানসিকতায় ওর সম্পর্কে দুর্বলতা এনে দিয়েছে। আশ্চর্য! আজ যেটা চরম আঘাত মনে হচ্ছে কাল সেটা তুরুপের তাস হয়ে যেতে পারে—শিক্ষাটা জানা ছিল না, এখন জানল।

ইউনিয়নের কাজকর্মে অনিমেষ এখন সক্রিয় কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে ওর মনে কিছু অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। কোনও ইস্যু নিয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সেটা কী হবে তা আগেই ঠিক করা থাকে। নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার কোনও প্রয়োজন হয় না। অনিমেষ লক্ষ করেছিল এ ব্যাপারে কারও কোনও ক্ষোভ নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি ঠিক করে রেখেছেন, এই ইস্যুগুলো সামনে এলে সেই নীতির আলোয় পথ ঠিক করে নেওয়া হয়। এক রকম বিশ্বাসে সকলে তা মেনে চলে।

অফিস-বেয়ারার নির্বাচনের সময় যে ক'টা নাম কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছিল অনিমেষ তার মধ্যে ছিল। তার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তা দল স্বীকার করেছে। ফিফথ ইয়ারের ছাত্র হওয়ায় সে আরও দু বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে, তাই এখন থেকে যদি সে দায়িত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পায় তা হলে সামনের বছরে যখন সিনিয়াররা থাকবে না তখন তাদের জায়গা নিতে পারবে। সুদীপের প্রস্তাব ছিল, সহ-সম্পাদকের দুটো আসনের একটায় অনিমেষকে নেওয়া হোক। কিন্তু সে ব্যাপারে কতগুলো অসুবিধার মধ্যে যেটা অন্যতম সেটা হল কলেজ জীবনে অনিমেষ ছাত্র ফেডারেশনকে কোনও সাহায্য করেনি। সে সময় বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে যারা সত্যি খেটেছে এবং এই নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছে তাদের দাবি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

BanglaBook.org

এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে ঠিক সেসময় অনিমেষ একটা গোলমাল করে বসল। ভিয়েতনামে আমেরিকার নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্র সংসদ থেকে একটা কার্যক্রম নেওয়ার কথা উঠলে বিমান বলেছিল, 'সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের যে কার্যসূচি নেওয়া হয়েছে তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একদিন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের ক্লাশ বয়কট করতে বলা হবে, ধরো আগামী মঙ্গলবার।'

ব্যাপারটা যখন ঠিক হয়ে যাচ্ছে তখন অনিমেষ বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয় না ?'

সুদীপ চমকে ওর দিকে তাকিয়েছিল আর বিমান খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করেছিল, 'কেন, তোমার কি পার্টির নির্দেশ মানতে আপত্তি আছে ?'

মাথা নেড়েছিল অনিমেষ, 'না, না, আমি সে-কথা বলছি না। আলোচনা করলে সবার বুঝতে অসুবিধা হবে না, তাই।'

'ভিয়েতনামে যে লড়াই চলছে সেটা তুমি স্বীকার করো তো ?'

'নিশ্চয়।'

'তা হলেই হল।'

তারপর প্রসঙ্গটা অন্যদিকে চলে গেল।

পরবর্তীকালে অফিস-বেয়ারারদের নাম ঘোষণা করার সময় অনিমেষকে সরিয়ে রাখা হল। অনিমেষের একটু সুবিধা ছিল যে সে কিছু আশা করেনি তাই তার কোনও ক্ষোভ হল না। তবে সুদীপ ওকে একদিন আড়ালে ডেকে বলেছিল, 'অনাবশ্যক কৌতূহল না দেখালে তুমি অনেক উঁচুতে উঠতে পারবে অনিমেষ। পার্টির বিশ্বাস অর্জনের জন্য কাজ করে যাও।'

পরমহংস একা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের সঙ্গে কথা বলার সময় অনিমেষের একটা খটকা লাগছিল। এরা কেউ কোনও বিষয়ে তেমন আগ্রহী নয়। বাংলায় এম এ পড়তে এসেছে একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। যারা একটু আশাবাদী তারা পরবর্তীকালে ডক্টরেট করে কোনও কলেজে লেকচারারের কাজ পাবে বলে ভাবছে। বাকিরা হয় স্কুলে নয় আর কী যে করবে জানে না। কিন্তু মজার কথা হল, তা নিয়ে কারও তেমন দুশ্চিন্তা নেই। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাদের এরকম নির্লিপ্ততা তারা তো ভিয়েতনাম অথবা কিউবার কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষ নিয়েই কোনও চিন্তা-ভাবনা করে না। অথচ ভিয়েতনাম নিয়ে যে আন্দোলনের কথা অনিমেষরা ভাবছে সেটা ছাত্রদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অত্যন্ত সত্যি কথা, অস্বীকার করার মানে হয় না। কথাগুলো বিমানের সঙ্গে আলোচনা করতে এখন ভয় পায় সে। বিমানের আলোচনা শুনলে মনে হয় যেন তামাম ছাত্ররা ওদের সঙ্গে একমত হয়ে ভিয়েতনামের ঘটনার প্রতিবাদ জানাবে এবং এ ব্যাপারে কোনও ছাত্রের দ্বিধা নেই।

অনিমেষের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বিমানরা কি সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মেশে না ? তাদের মনের খবর কি জানে না ? নাকি, নিজেদের ধ্যানধারণা যাতে সবাই বাধ্য হয়ে মেনে নেয় সেই ব্যবস্থাই চায়!

অনিমেষ বোঝে যে, কতগুলো বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে না এগোলে কোনও কাজ করা যায় না। হয়তো সেটা ফর্মুলার চেহারা নিয়ে নেয় কিন্তু ছোটখাটো অসঙ্গতি বৃহত্তর স্বার্থের জন্য মেনে নিতে হয়। মাও সে-তুঙ, চে-গুয়েভারা, লেনিন কিংবা হো চি মিন যা করেছেন সেগুলো কি সবক্ষেত্রে ত্রুটিহীন ? কমিউনিজম তাই প্রচ্ছন্নে একটা আদর্শের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবকে মেনে নেয়—না মানলে কোনও কাজ হয় না। গড়াতে গড়াতে বল এক সময় হয়তো গর্তে গিয়ে পড়বে, প্রগতি পায়ে আলোচনার নামে দ্বিধা প্রকাশ মানেই তার গতি হ্রাস।

প্রতিবাদ দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে একটা বিরাট জমায়েত ডাকা হল। বিমান সেখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ঘোষণা করলে যে দুটো নাগাদ ছাত্রদের একটা মিছিল বেরুবে। তার আগে অফিস-বেয়ারারদের এবং মেম্বারদের নিয়ে একটা গোপন বৈঠক হয়ে গেছে, তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পুলিশ যদি বাধা দেয় তা হলে গ্রেপ্তার এড়িয়ে প্রতিরোধ করা হবে। অর্থাৎ একটা গোলমাল সৃষ্টি করে এই প্রতিবাদকে লাইম-লাইটে আনতে হবে যাতে দেশের মানুষ জানতে পারে। গ্রেপ্তার এড়ানো হবে এইজন্যে চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে পুলিশভ্যানে উঠলে কোনও কাজের কাজ হবে না। বিশেষ করে সমস্ত কলেজ স্ট্রিট এলাকায় যখন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে।

অনিমেষ কিন্তু একটা প্রস্তুতির গন্ধ পাচ্ছিল। ব্যাপারটা সবাইকে জানানো হয়নি, কিন্তু সহজ ভঙ্গিতে যে পুলিশের মুখোমুখি বিমানরা হবে না এটাও ঠিক। হঠাৎ ওর মনে অভিমান এল, সেই

BanglaBook.org

ইলেকশনের পর থেকে সে নিয়মিত দু' বেলা ইউনিয়নের কাজকর্ম করে যাচ্ছে কয়েকদিন পার্টি অফিসে গেছে সুদীপের সঙ্গে, কিন্তু তবু সে বিমানের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। একদিন বিমান বলেছিল কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারশিপ তো চার আনা দিয়ে কেনা যায় না, দীর্ঘদিন তাকে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসতে হয় যা তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করবে, অভিমান হলেই এই কথাটা মনে পড়ে। কে জানে হয়তো তারও এখন সেই অবস্থা চলছে।

ক্লাশ বয়কটের ডাকটা কিন্তু খুব কার্যকরী হল না। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা কেমন গা-এলানো ভাব দেখাচ্ছে, যেন সবাই দর্শক হয়ে থাকতে চায়, কেউ মঞ্চে উঠতে চাইছে না। অনিমেষরা করিডোরে ঘুরে ঘুরে ছেলেমেয়েদের চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, একটা দিন আমরা ক্লাশ বয়কট করছি সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য কার্যকলাপের প্রতিবাদে, প্রতিবাদ না করলে আমরা কীসের মানুষ ? আপনারা সবাই নীচের লনে নেমে আসুন। লন থেকে আমরা মিছিল করে মার্কিন দূতাবাসে যাব এবং সেখানে আমাদের প্রতিবাদ জানাব।'

জোর করে কাউকে বের করে আনার নির্দেশ ছিল না তাই দেখা গেল বিভিন্ন কলেজ থেকে আসা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র একতৃতীয়াংশ ওই জমায়েতে এসেছে। অবশ্য তাতেই লন ভরে গেছে।

অনিমেষ যখন ছেলেমেয়েদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল তখন ওদের মুখগুলোকে কেমন মুখোশ বলে মনে হচ্ছিল। কোনও রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না সেখানে। নিজের ক্লাশের সামনে দিয়ে যখন সে নেমে আসছে তখন ঘটনাটা ঘটল।

সিঁড়ির মুখটায় কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অনিমেষ ওদের দিকে একটুও লক্ষ না করে এদের নিস্পৃহতার কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। এমন সময় একটি মেয়েলি গলা কানে এল, 'শুনুন!'

অনিমেষ দেখল, মেয়েদের মধ্যে একজন তার সামনে এগিয়ে আসছে। বুকের ভেতর দ্রিমি দ্রিমি শুরু হয়ে গেল। সেই যে চোখ এতদিন ক্লাশের ছেলেদের মাথার ফাঁকে একটা সরলরেখায় তাকে ছুঁয়ে থাকত তা এখন সামনাসামনি। অনিমেষ আবিষ্কার করল ওরা গলা শুকিয়ে কাঠ এবং নিশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে।

'আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।' মেয়েটির গলার স্বর স্পষ্ট।

'বলুন।' অনিমেষ নিজেকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল।

'আপনারা কী চান ?'

'মানে ?'

'আমরা এখানে পড়াশুনা করতে এসেছি। এতদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছি সেটাকে জলে ভাসাবার রাইট আপনাদের কে দিল ?'

'এ সব কথা কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছি না', অনিমেষ আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার ভান করল। ও কী বলতে চাইছে সেটা শোনা দরকার।

'আপনারা আজ ক্লাশ বয়কট করতে বলছেন, কাল ধর্মঘট করতে হবে। এই করেই বছরটা যাক। আপনারা যদি পরীক্ষায় পাশ না করেন তা হলে দল আপনাদের চিরদিন খাওয়াবে, কিন্তু আমরা কেন বলি হচ্ছি ?'

'আজ তো আমরা কাউকে জোর করছি না। যারা মনে করবে প্রতিবাদ করা উচিত তারাই আসবে—এটাই আমাদের আবেদন।' অনিমেষ শান্ত গলায় বলল।

'আশ্চর্য! আপনারা একটা সাইকোলজিকাল প্রেশার ক্রিয়েট করছেন না ?' মেয়েটি যখন কথা বলছিল তখন অন্যান্যরা যে তাকে সমর্থন করছে এটা স্পষ্ট।

'আপনি এম এ পড়ছেন। আপনার বোধবুদ্ধি সাধারণ মানুষের চেয়ে ওপরে। আপনি কি মনে করেন না ভিয়েতনামে আমেরিকা যে বর্বর অত্যাচার করছে বিবেকবান মানুষ হিসেবে আমাদের তার প্রতিবাদ করা উচিত।' অনিমেষ সরাসরি মেয়েটির চোখের দিকে তাকাল।

'পৃথিবীর সব জায়গায় যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আপনাদের কে দিল ? আর আজ নিজের নাক কেটে কি আপনি ভিয়েতনামে অত্যাচার বন্ধ করতে পারবেন? আপনি এখানে চেঁচালে আমেরিকা তা শুনে সুড়সুড় করে নতিস্বীকার করবে ?'

'বাঃ, আপনি বিশ্বজনমত কথাটা মূল্যহীন মনে করেন ?'

'সুন্দর! আপনাদের কতকগুলো সিলেকটেড শব্দ আছে, সেগুলোর বাইরে আপনারা কিছু বলতে চান না বা পারেন না। আজ ভারতবর্ষে লক্ষ মানুষ নানান ভাবে অত্যাচারিত, তাদের কথা না বলে,

BanglaBook.org

তাদের উপকার না করে আপনারা ভিয়েতনাম নিয়ে মেতেছেন। ওখানে যারা লড়াই করছে তারা কিন্তু আপনাদের মুখ চেয়ে নেই। থাকলে আজকে লড়তে পারত না। আচ্ছা নমস্কার।' আচমকা কথা শেষ করে মেয়েটি সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাশরুমে ঢুকে গেল।

ঠিক এ রকম আক্রমণের জন্য অনিমেষ প্রস্তুত ছিল না। কথাগুলো শুনতে শুনতে সে মেয়েটাকে কীভাবে বোঝাবে তা ভেবে নিচ্ছিল। কিন্তু এ ভাবে চলে যাওয়াতে সেটা সম্ভব হল না। ওই মেয়ে এত ভাবে, অনিমেষের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তা হলে যে মুখগুলোকে তার মুখোশ বলে মনে হচ্ছিল সেগুলো সত্যি তা নয়? সেই বিখ্যাত কথা আইডেন্টিফিকেশন না হলে কোনও রেসপন্স পাওয়া যায় না—সেটা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? অর্থাৎ ভারতবাসীর কাছে সিংহলই যেখানে সুদূর সেখানে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাদের জন্য আন্দোলন করে জনমত গঠন করা সত্যের খাতিরে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাতে জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে পাওয়ার চিন্তা বাতুলতা। যদি এ রকম কোনও ইস্যু হত—এই যে, প্রতি বছর এম এ পাশ করে ছেলেরা বেকার থাকবে জেনেও সরকার যে সিস্টেমটা চালু রেখেছে সেটা ভেঙে ফেলা দরকার, প্রতিটি ছেলের পূর্ণ শিক্ষার শেষে যোগ্য সংস্থানের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে—এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে যদি দাবি ওঠে তা হলে সবাই সাড়া দেবে? অনিমেষের মনে হল দেবে।

জমায়েতে দাঁড়িয়ে অনিমেষ এইসব কথা ভাবছিল। কোনও মানুষকে প্রথম দেখায় বিচার করা যে নেহাতই ছেলেমানুষি তা আজ প্রমাণ হল। কোনওদিন কথা হয়নি, শুধু চোখে দেখে সে মেয়েটি সম্পর্কে যে কল্পনা তৈরি করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। মেয়েটি এত সিরিয়াস, এত স্পষ্ট কথা বলতে পারে এবং কী নির্লিপ্ত হয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে দিয়েছে তা কি ওই চোখ দেখে আন্দাজ করা যায়?

অমিনেষ অনুভব করল আজ কথা বলার সময় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার বুকের মধ্যে যে কাঁপুনি এসেছিল এখন তার একটুও অবশিষ্ট নেই। এক ধরনের রোমান্টিক ধারণার বদলে সে মেয়েটি সম্পর্কে অন্যরকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

মিটিংয়ের শেষে স্লোগান উঠল, 'ভিয়েতনাম যুগ যুগ জিয়ো। আমেরিকার কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও।' সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেন গমগম করছে এখন। কথা ছিল বিমানের ভাষণের শেষে ওরা এক জায়গায় চলে আসবে। অনিমেষ গিয়ে দেখল বিমান নির্দেশ দিচ্ছে কী করতে হবে। মিছিল একটা দিক দিয়ে কলেজ স্ট্রিটে নামবে না। হেয়ার স্কুলের গেট দিয়ে একটা মিছিল এগোবে, অন্যটা কলেজ স্কোয়ারের দিক দিয়ে। পুলিশ রয়েছে হ্যারিসন রোড আর মেডিক্যাল কলেজের সামনে। এদিকটা যখন তারা বাধা পাবে তখন অন্য মিছিলটা ইডেন হোস্টেলের পাশ দিয়ে কলুটোলায় চলে যাবে। অনিমেষের ওপর নির্দেশ হল কলেজ স্ট্রিটের দিকে মিছিলের সঙ্গে যেতে।

এত চটপট সবাই ব্যাপারটা বুঝে নিল যে চমকে যেতে হয়। যেন কোনও শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর মতো মিছিলটা দুটো মুখ হয়ে এগোতে লাগল। সুদীপ কলেজ স্ট্রিটের মিছিলটাকে আকারে ছোট করে দিল। কারণ ওদের কাজ শুধু পুলিশকে ব্যস্ত রাখা।

সুদীপ অনিমেষ এবং আরও কয়েকজন এই ছোট মিছিলটাকে লিড করে স্লোগান দিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ; ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ; মার্কিন সরকার নিপাত যাক, নিপাত যাক; তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।' ঢেউ-এর মতো স্লোগানগুলো চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত উত্তেজনা এখন। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল ওপরের বারান্দাগুলোর ছেলেমেয়েরা ভিড় করে ঝুঁকে ওদের দেখছে।

সুদীপ সেটা লক্ষ করে বলল, 'একদিন ওরা আসবে অনিমেষ। রাতারাতি সবাই সৈনিক হবে এটা আশা কোরো না। ব্যবধান তো থাকবেই।'

মিছিলটা ট্রাম লাইন অবধি গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। অবশ্য স্লোগান চলছে সামনে। উত্তেজনায় সবাই অস্থির। অনিমেষ ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কোনও পুলিশ দেখতে পেল না। সুদীপ মিছিলটাকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ পর্যন্ত যেতেই কফি হাউসের গলি দিয়ে ভ্যানগুলো এগিয়ে এল। সামনে একটা জিপ, তাতে কয়েকজন অফিসার বসে আছে।

পুলিশ দেখে আরও জোরদার হল স্লোগান। অনিমেষ লাইনের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছিল, 'সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও।' সরবে তার সমর্থন বাজছিল গলায় গলায়। 'মার্কিন-দালাল কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক নিপাত যাক,' 'পুলিশ দিয়ে আন্দোলন ভাঙা যায় না, যাবে না', 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম লাল সেলাম,' 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।'

BanglaBook.org

চারপাশে ঝটপট দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাতে সেকেন্ড হ্যান্ড বইওয়ালারা ছুটোছুটি করে নিরাপদে রাখছে তাদের বইপত্তর। বৃষ্টি আসার আগে যেমন আচমকা দমকা হাওয়ায় চারদিক আলোড়িত হয় এখন সেই অবস্থা।

সুদীপ বলল, 'মেইন মিছিলটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চলে গেছে। আমরা আবার কলেজ স্কোয়ারের সামনে ফিরে যাই চলো।'

মিছিলের মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল কলুটোলা মির্জাপুর স্ট্রিটের মুখটায় অজস্র পুলিশ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এখন অবস্থা হল এই যে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হবে। কারণ দু'দিকের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম-বাস চলছে না, একটা ট্রাম হিন্দু স্কুলের সামনে আটক হয়ে রয়েছে। কয়েকজন নাছোড়বান্দা যাত্রী ছাড়া সেটা প্রায় ফাঁকাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসে যেন সবাই আরও মুখর হয়ে উঠল। অনিমেষ শ্লোগান দিল, 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।' গলায় গলায় সমর্থন ছড়াল 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।'

ঠিক সেই সময় জিপটা কাছাকাছি এগিয়ে এল। জিপের সামনে একজন অফিসার পোর্টেবল মাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'এই এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে রাস্তা ছেড়ে চলে যান। একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ থাকলে মিছিল করা আইনত অপরাধ।'

'পুলিশ তোমার হুকুম আমরা মানি না, মানব না।'

'জুলুমবাজ পুলিশকে চিনে নিন—এই মাটিতে কবর দিন।'

'ভিয়েতনাম লাল সেলাম—লাল সেলাম।'

উত্তেজনা এখন এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। সুদীপ চিৎকার করে বলল, 'কমরেড্স, কংগ্রেস সরকারের দালাল ওই পুলিশরা আমাদের ওপর জুলুমবাজি করতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রথমে এমন কিছু করব না যাতে ওরা সুযোগ পায়। মনে রাখবেন, রক্তে রাঙা ভিয়েতনাম বাংলাদেশের আর-এক নাম।'

ঠিক সেই সময় দুম-দুম করে আওয়াজ উঠল। পায়ের তলার রাস্তা কাঁপিয়ে দুটো বোমা ফাটল কলুটোলার দিকে। অনিমেষ দেখল, একটা পুলিশ মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। দু'তিনটে ছিটকে ওপাশে পড়ে গেল। মুহূর্তে ওদিকটা ফাঁকা হয়ে গেল, পুলিশগুলো পড়িমড়ি করে মির্জাপুরে রাখা ভ্যানগুলোর দিকে ছুটে গেল।

ব্যাপারটার জন্যে একদম প্রস্তুত ছিল না অনিমেষ। হঠাৎ কাণ্ডটা হওয়ায় মিছিলের সবাই হকচকিয়ে গেছে। সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সজাগ করিয়ে গলা তুলল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে পুলিশ বাহিনীর সামনে দুমদাম বোমা এসে পড়ল। ধোঁয়ায় চারদিক এখন ঢাকা। ওদিকের পুলিশ পিছু হঠেছে। সমস্ত এলাকা এখন জনশূন্য। সুদীপ চিৎকার করে বলল, 'কমরেডস, আপনারা গেটের সামনে চলে আসুন। ওরা যদি আক্রমণ করে তা হলে ভেতরে ঢুকে যাবেন। অনুমতি ছাড়া কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে পুলিশ ঢুকতে পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে সবাই গেটের কাছে চলে এল। অনিমেষ তখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে দু'পাশে চোখ বুলিয়ে বোমার উৎসটা খুঁজল। প্রথম যে বোমা দুটো পড়েছে সেগুলোর দিকে তার খেয়াল ছিল না, কিন্তু শেষের দুটো যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ধরনের পরিকল্পনার কথা তার জানা ছিল না। সে মুখ তুলে দেখল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালকনিগুলোয় মেয়েদের ভিড় এবং তাদের নজর সব ওর দিকে। সুদীপ চিৎকার করে অনিমেষকে ডাকতেই টিয়ার গ্যাস চার্জ করল পুলিশ। ঠিক অনিমেষের সামনে একটা শেল এসে পড়ে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল। অনিমেষ দেখল শেলটা এখনও অবিকৃত এবং ধোঁয়া একটা দিক থেকেই বেরুচ্ছে। চোখ জ্বলছে কিন্তু অনিমেষ পকেট থেকে রুমাল বার করে শেলটাকে তুলে কয়েক পা এগিয়ে পুলিশের দিকেই ছুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে একরাশ পায়রার পাখার ঝটপটানির মতো সোচ্চার হাততালি বাজল। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল অনর্গল টিয়ার গ্যাসের শেল বৃষ্টি।

অনিমেষ সুদীপের কাছে সরে এলে সে বলল, 'ও-রকম হিরো হবার জন্য মাঝ রাস্তায় দাঁড়াবার দরকার ছিল না। ওরা যে-কোনও মুহূর্তেই ফায়ারিং শুরু করতে পারে।'

সে-কথায় কান না দিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'বোমা ফাটাল কে? এ রকম হবে আগে জানতাম না!'

BanglaBook.org

সুদীপ খিঁচিয়ে উঠল, 'আমি কি জানতাম? পুলিশ নিজের লোক দিয়ে বোমা ফাটিয়ে প্যানিক সৃষ্টি করছে। অ্যাকশান নেবার জন্যেও একটা অজুহাত দেওয়া দরকার। এটাও বোঝো না?'

দু' চোখ এখন জলে ভরা। ভীষণ চোখ জ্বলছে, একটু রগড়ালে জ্বলুনিটা বাড়ছে। কতগুলো ছেলে ভেতর থেকে কয়েকটা জল ভরা বালতি নিয়ে এল। দেখাদেখি অনিমেষ রুমাল জলে ভিজিয়ে চোখে চাপা দিচ্ছিল। অনিমেষ দেখছিল একটি ছেলে, যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে মনে হচ্ছে না, মাঝে মাঝে ছুটে রাস্তায় নেমে গিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে শেল কুড়িয়ে নিয়ে এসে বালতিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এই সময় ওপরের বারান্দাগুলোয় মেয়েদের চিৎকার উঠল। পুলিশ এবার বারান্দা তাক করে শেল ছুড়ছে।

সুদীপ বলল, 'শালাদের কাণ্ডটা দেখছ। মেয়েরা ওদের কোনও ক্ষতি করেনি তবু ওখানে শেল ছুড়ছে। একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী করা যায়?'

'আমরা অ্যাটাক করব।' সুদীপের মুখ এখন শক্ত। কথাটা বলেই সে ছুটে গেল ও পাশে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না অ্যাটাক করব বলতে সুদীপ কী বোঝাচ্ছে? রাইফেলধারী পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কি ছাত্রদের আছে! ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথায় আর একটা বোধ উঁকি দিল। এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা কি হওয়া উচিত? যে ইস্যু নিয়ে ওদের বিক্ষোভ জানানোর কথা সেই ইস্যুটা তো ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। আর সেটা এমন একটা ব্যাপার যে তা নিয়ে এত বড় কাণ্ড হওয়া ঠিক নয়। এ যেন মশা মারতে কামান দাগার মতো ব্যাপার। হঠাৎ ওর খেয়াল হল বিমান নিশ্চয়ই এতক্ষণে আসল মিছিল নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ বিমানের যাওয়াটা নিরাপদ করার জন্যেই এখানে ওদের পুলিশকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

একটা চিৎকার, সেই সঙ্গে হ্যা হ্যা-অ্যা-অ্যা শব্দে কতগুলো ছেলেকে ছুটে যেতে দেখে অনিমেষ থতমত হয়ে গেল। এ রকম শব্দ কী কারণে মানুষের গলা থেকে বের হয় কে জানে কিন্তু ছেলেগুলোকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অবিরাম বোমাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অনিমেষ ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই দেখল, ও পাশের থেমে থাকা ট্রামটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আচম্বিতে তার মনে সেই ছবিটা ভেসে এল। প্রথম যে-রাতে সে কলকাতায় পা দিয়েছিল, এমনি করে একটা ট্রামকে জ্বলতে দেখেছিল।

শব্দ করে ট্রামের শরীরটা ফাটছে। যে ছেলেগুলো ছুটে গিয়েছিল তারা চক্ষের নিমেষে গা ঢাকা দিল। আর সেই মুহূর্তে যে শব্দ হল সেটা যে রাইফেল থেকে হচ্ছে তা অনিমেষকে বলে দিতে হবে না কাউকে। প্রাচী সিনেমার পাশের গলিতে এই রকম একটা শব্দ তার শরীরে ছিদ্রচিহ্ন রেখে গেছে চিরকালের জন্য। সেদিন যে বোকার মত গলির মাঝখান দিয়ে ব্যাগ হাতে ছুটেছিল সে আজ তড়িৎগতিতে গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফায়ারিং হচ্ছে এই খবরটা বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে সোচ্চার হয়ে ছড়িয়ে যেতেই ওপরের বারান্দার ভিড়টা হাওয়া হয়ে গেল আচমকা।

অনিমেষ আড়াল থেকে দেখল, পুলিশ বাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। জায়গাটায় থাকা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে পড়তে দেখতে পেল আড়ালে আবডালে ছেলেরা শেলটার নিয়ে নিয়েছে। দূরে দমকলের আওয়াজ ভেসে আসছে। গাড়িটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। চোখে চেপে ধরে ধরে ভেজা রুমালটা এখন প্রায় শুকনো। জ্বলুনিটা বাড়ছে। এখন কী করা যায়? কোনও বিশেষ নির্দেশ দেয়নি বিমান। সুদীপকেও সে দেখতে পাচ্ছে না। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটল আচম্বিতে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ফায়ারিং শোনা গেল। অনিমেষ দৌড়ে দোতলায় উঠে এল। এ পাশের বারান্দাটা ফাঁকা। একদম রাস্তার ধারে বলে কোনও দর্শক এখানে নেই। সে উঁকি মেরে দেখল, দমকলের লোকরা কাজে নেমে পড়েছে। অঝোরে জল ঝরছে ট্রামটার ওপরে। আর তখনই ইট বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। রাশি রাশি ইটের টুকরো এমনভাবে দমকলের লোকদের ওপর এসে পড়া শুরু হল যে ওদের পক্ষে কাজ করা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়াল থেকে ইট পড়ছে এবং পুলিশের পক্ষে এই মুহূর্তে কিছু করা অসম্ভব।

যা হোক যা চাওয়া হয়েছিল তা সফল হয়েছে। আজকের এই ঘটনার কথা নিশ্চয়ই আগামিকালের কাগজে থাকবে। ব্যাপারটার প্রচার যত বাড়বে তত ভিয়েতনাম সম্পর্কে ছাত্ররা যে উদ্বিগ্ন তা প্রকাশ পাবে। বিমান কি শেষ পর্যন্ত মার্কিন দূতাবাসে মিছিল নিয়ে পৌঁছাতে পারল? খবরটা এখন জানা যাবে না যদি কেউ না ফিরে আসে। হঠাৎ নীচে চোখ পড়তে অনিমেষ দেখতে

BanglaBook.org

পেল তিনটে পুলিশের জিপ হেয়ার স্কুলের দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে ঢুকে পড়েছে। কী ব্যাপার? সুদীপ বলেছিল পুলিশ নাকি অনুমতি ছাড়া এখানে থাকতে পারে না! তবে কি অনুমতি পেয়ে গেছে?

এতক্ষণে খেয়াল হল এত যে গোলমাল হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা টিয়ার গ্যাসে নাস্তানাবুদ, কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলার তো দূরের কথা কোনও অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ওঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছুতেই ছাত্রদের বোঝানো সম্ভব নয়। অতএব হাল ছেড়ে বসে আছেন। পুলিশের খুব একজন বড় অফিসারকে ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরের দিকে যেতে দেখতে পেল সে। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই অফিসারটি নেমে এসে কিছু বললেন ওঁর সহকর্মীদের। আর তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়চত্বর পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেল।

অনিমেষ সুদীপকে দেখতে পাচ্ছে না, ছাত্রদের তরফ থেকে কী করা উচিত এখন? হুকুম পাওয়া মাত্র পুলিশ ছুটে গেল সেই অংশটায় যেখান থেকে লুকিয়ে ইটবৃষ্টি করা হচ্ছে। কেউ কাউকে সতর্ক করার চেষ্টা করার আগেই একটা কনস্টেবল দুটো ছেলেকে টানতে টানতে ভ্যানটার কাছে নিয়ে এল। ছেলে দুটোকে চেনে না অনিমেষ এবং চেহারা দেখে মনে হয় না ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কী করে এখানে এল কে জানে! ছাত্র-আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগল না। চারদিকে ধোঁয়া, ভাঙা ইট কাচ ছড়িয়ে—পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়ে নিয়েছে। এই যদি পরিণতি হয় তা হলে এতসব করা কী জন্যে? এবং এই পরিণতির কথা তো নিশ্চয়ই জানা ছিল। কয়েকটা ছাত্র একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরকম লড়াই করতে পারে না। আর লড়াইটা কী নিয়ে হচ্ছে, না কয়েক হাজার মাইল দূরে একটি বিদেশি রাষ্ট্র অন্য একটি দেশের ওপর অত্যাচার করছে বলে প্রতিবাদ জানাতে। অনিমেষ মাথা নাড়ল আপন মনে, না এ ভাবে চলতে পারে না। হয়তো এরকম টুকরো টুকরো কিছু বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে প্যানিক সৃষ্টি করা যায় কিন্তু সেটা কি ফলপ্রসূ?

বিশাল চত্বরটায় পুলিশ গিজগিজ করছে। অনিমেষ ফাঁকা দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে নিজের ক্লাশের সামনে এসে দেখল কুড়ি পঁচিশটা মেয়ে চোখে রুমাল দিয়ে বসে আছে।

পনেরো

'যুদ্ধ হয় একটার পর একটা এবং শত্রু-শক্তি ধ্বংস করা যায় একের পর এক। কলকারখানা তৈরি হয় একটার পর একটা। চাষীরা চাষ করে একের পর এক প্লট। আমরা যে খাবার শেষ করতে পাব তাই নিই কিন্তু আমরা মুঠো মুঠো করেই তাই খাই। সমস্ত খাবার একসঙ্গে খাওয়া অসম্ভব। একেই পিসমিল সলিউশন বলে।' মাও সে তুং-এর বিখ্যাত এই উক্তিটির ব্যবহার করেছিল সুদীপ। একসঙ্গে কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। পিসমিল সলিউশন হচ্ছে একমাত্র উপায়। এই যে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ হল সেটা হয়তো একটা ছোট্ট বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনা জন্ম নেবে। আজ যদি সারা দেশের মানুষ এই রকম ঘটনা অবিরত ঘটাতে থাকে তা হলে কোনও সরকারের পক্ষে তার মোকাবিলা করা অসম্ভব। ভারতবর্ষ ভিয়েতনাম হয়ে যাবে সেই সময়।

সন্ধে হয়ে এসেছে। সাহসী ছেলেরা বেরিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পুলিশের ভ্যান এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এবং কলেজ স্ট্রিটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। চারধারে একটা থিতিয়ে আসা ভাব কিন্তু কোনও দোকানপাট খোলেনি, সামান্য যে ক'জন পথচারী হাঁটছে তারা যে সন্ত্রস্ত তা বোঝা যায়। পোড়া ট্রামটাকে এখনও সরিয়ে নেওয়া হয়নি। অবশ্য সেটার কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। এখন কোনও রকম গোলমালের আশঙ্কা নেই। সমস্ত কলকাতা জেনে গেছে কলেজ স্ট্রিটে এই সংঘর্ষের কথা। খবর এসেছে বিমানের মিছিল এয়ার লাইনসের কাছেই পুলিশ আটকে দেয়। খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল শোভাযাত্রা তাই ওখানে কিছু ঘটেনি। চারজনের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়ে বিমান মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে প্রতিবাদপত্র পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বিমান অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও ফিরে আসতে পারেনি, কিন্তু একটি ছাত্র খবরটা পৌঁছে দিয়েছে।

সুদীপ চার-পাঁচজনের একটা দলকে নিয়ে কথা বলছিল।

অনিমেষ বলল, 'আপনি যা বলছেন তা এ সব ইস্যু নিয়ে সম্ভব নয়। তা ছাড়া—।

চুরুট ধরিয়ে এক হাতে ওকে থামতে বলে সুদীপ খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'সেটা আমরা জানি। কিন্তু এ ভাবেই মানুষকে সচেতন করতে হবে। যে কোনও লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে সরাসরি যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু ছলনার আশ্রয়ও নিতে হয়। আজকে এই ঘটনা না ঘটালে বিমান মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছাতে পারত না।'

BanglaBook.org

'কিন্তু মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছে কী লাভ হল ? ওরা শুনবে আমাদের কথা ? এটাও তো একধরনের চাটুকারিতা।' একটি ছেলে ফোঁস করে উঠল।

অনিমেষ চমকে ছেলেটাকে দেখল। ফরসা সুন্দর চেহারা কিন্তু এর আগে কখনও কথা বলতে দেখেনি ওকে।

সুদীপ বলল, 'তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। চিনের দালাল বলে গুলজারিলাল নন্দা যখন আমাদের চিহ্নিত করেছিল তখন আমাদের পার্টি সেক্রেটারি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটা পড়ে দেখো।'

অনিমেষ বলল, 'কী সেটা ?'

'তিনি বলেছিলেন, আমরা কোনও রকমের সশস্ত্র যুদ্ধের কথা চিন্তা করছি না। আমরা আইনসম্মত দল এবং খোলাখুলি কাজ করতে চাই। আমি আর একবার স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে তেলেঙ্গানা-মার্কা সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ডে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই।'

ছেলেটি বলল, 'আমাদের সঙ্গে সি পি আই-এর তা হলে তফাত কী ?'

সুদীপ বলল, 'ওরা সুবিধাবাদী, রাশিয়ার তাঁবেদার।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'পার্টির যদি এই সিদ্ধান্ত তা হলে আজ আমরা সংঘর্ষে গেলাম কেন ?'

বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল সুদীপের মুখে, 'কে বলেছে আমরা সংঘর্ষে গেছি। পুলিশ সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় আমাদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে, গুলি চালিয়েছে। ছাত্র আন্দোলনকে হেয় করার জন্য নিজেরাই গুণ্ডা দিয়ে ট্রাম জ্বালিয়েছে। তুমি কি যারা ট্রাম জ্বালিয়েছে তাদের দেখেছ? ওদের কি ছাত্র বলে মনে হয়েছে ? তবে! আর দু-একটা ইট যা এখান থেকে ছোড়া হয়েছে তা প্ররোচিত হওয়ার পরই ছোড়া হয়েছে। ব্যাপারটা যে সমস্তটাই সাজানো তা বুঝতে এত অসুবিধে হয় কেন ?'

একটি ছেলে দৌড়ে এসে বলল, 'সুদীপ, রিপোর্টাররা এসেছে কথা বলতে চায়। কী করবে ?'

'কী করবে মানে ?'

'বিমান তো নেই।'

'আমরা আছি। ওদের ক্যান্টিনে বসাও আর রাখালদাকে চা করতে বলো। আমি আসছি।' ছেলেটি সুদীপের নির্দেশ নিয়ে চলে গেলে সে বলল, 'বোধ হয় কিছু মেয়ে এখনও আটকে আছে এখানে। তাদের বুঝিয়ে বলো ভয়ের কিছু নেই, ওরা বাড়ি চলে যেতে পারে আমি রিপোর্টারদের সামলাচ্ছি।'

সুদীপ খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে ইউনিয়ন অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল। অনিমেষ শুনল, ফরসা ছেলেটি নিজের মনে কিছু বিড়বিড় করছে। বোঝা যাচ্ছিল সে আজকের ব্যাপারটায় মোটেই সন্তুষ্ট নয়। অনিমেষ নিজেও স্বস্তি পাচ্ছিল না।

সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনিমেষ নিজেদের ক্লাশরুমের দিকে হাঁটছিল। এর আগে যখন সে মেয়েদের দেখেছিল তখন কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ দরজা থেকে সরে সুদীপের খোঁজে নেমে এসেছিল। এখন সিঁড়ির মাঝামাঝি মুখোমুখি হয়ে গেল ওদের। ওরা নেমে আসছে।

'আপনাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ?'

অনিমেষ সেই চোখ দুটোকে নজর করল। এখন টকটকে জবাফুলের মতো লাল। অনিমেষের নিজের অবস্থাও তাই কিন্তু অনেকটা সামলে নিয়েছে সে। আর একটি মেয়ে প্রায় ভেঙে পড়া গলায় বলে উঠল, 'ট্রাম-বাস চলছে না, না ? আমি কী করে বাড়ি যাই বলুন তো ?'

'কোথায় থাকেন আপনি ?' রোগা এবং আতঙ্কিত মেয়েটিকে দেখল অনিমেষ।

'ঢাকুরিয়া।'

'ট্রেনে যাবেন ?'

'না, না, ট্রেনে গেলে অনেক হাঁটতে হয়।'

'তা হলে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চলে যান। ওদিকে সব বাস পাবেন।'

'সে কী! এই যে একজন বলল, সব বাস-ট্রাম বন্ধ ?'

'সেটা শুধু কলেজ স্ট্রিটে। আপনারা ইডেন হোস্টেলের পাশ দিয়ে চলে যান। উত্তর বা দক্ষিণ দু' দিকের গাড়ি পেয়ে যাবেন।'

অনিমেষের কথায় উজ্জ্বল হল মুখগুলো। কুয়ো থেকে যেন টেনে তোলা হল ওদের।

নীচে নেমে এসে রোগা মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ গুলি করবে না তো ?'

অনিমেষ হাসল, 'কী আশ্চর্য! খামোকা পুলিশ গুলি করতে যাবে কেন ?'

BanglaBook.org

আর একটি মেয়ে বলল, 'কেন ? করেনি গুলি ? কিছু বিশ্বাস নেই।'

'না, এখন সব থেমে গেছে।' অনিমেষ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

সে লক্ষ করছিল, সবাই কিছু না কিছু বলছে কিন্তু সেই প্রথম প্রশ্ন করার পর থেকে একজন একেবারে চুপ। যেন তার উত্তরটা না পাওয়া অবধি সে কথা বলবে না। অনিমেষ প্রশ্নের শ্লেষটা গায়ে না মাখার চেষ্টা করছিল অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে।

ততক্ষণে অন্যান্য ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ইডেন হোস্টেলের পথে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। প্রায় নিঃশব্দে ওরা হাঁটা শুরু করতে অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

একটু অস্বস্তির গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যাবেন না ?'

'সব অসুখেই কি এক অসুধ খান আপনি ?'

'মানে ?'

'পরোপকার করতে গিয়ে এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন ? সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু যে আমার পথ তা আপনাকে কে বলল ?'

অনিমেষ বলল, 'আপনি এত বেঁকিয়ে কথা বলেন কেন ? সবসময় মানুষকে বিদ্ধ করে কী আনন্দ পান কে জানে ? কোথায় থাকেন আপনি ?'

'কেন ? এখন কি আপনার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের দেখাশোনা করার ?'

'যদি বলি তাই। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে আলাদা কথা।'

'এটাও কি সংগ্রামী পদক্ষেপ ?'

'আর কিছু বলবেন ? তা হলে একবারে বলে ফেলুন।'

'আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।'

'একটু ঠাণ্ডা করে বলুন কোন দিকে যাবেন ?

মেয়েটি একটুক্ষণ অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিন বলছিলেন না যে মফস্বলের ছেলে আপনি। ওটা তো সহানুভূতি আদায়ের ছল, কিন্তু এর মধ্যেই—।' কথাটা শেষ না করে হেসে ফেলল সে।

অনিমেষ দেখল ঠাস দাঁতের সারির একটা দিকে গজদাঁতের আদল, যেটা হাসিটাকে আরও সুন্দর করেছে। সেটা চোখে পড়ায় অনিমেষ একটুও রাগতে পারল না কথাটা শুনেও। বলল, 'আপনি একনাগাড়ে ঝগড়া করে যাচ্ছেন।'

মেয়েটি আবার গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল। কলেজ স্ট্রিটের দিকে মুখ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না ?'

'আপনি কোথায় যাবেন এখনও বলেননি। যদি আপত্তি থাকে তবে—।'

'আপত্তির কী আছে! আমাদের বাড়ি বেলঘরিয়া। শিয়ালদা দিয়ে গেলে সুবিধে হয়। আপনি ওদিকে গেছেন ?'

'না। আমি যদি শিয়ালদা অবধি যাই তা হলে।—'

'চলুন।'

কলেজ স্ট্রিট দিয়ে যেতে অনিমেষের একটু অস্বস্তি ছিল। কারণ এখনও প্রচুর পুলিশভ্যান ও দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই গোলমালের সময় তাকে মাঝরাস্তায় টিয়ারগ্যাসের শেল কুড়োতে দেখে থাকতে পারে। সুতরাং এখন মুখোমুখি হলে ওকে ধরে ফেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু মেয়েটির কাছে এ সব কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। সত্যিই তো শিয়ালদা যাওয়ার জন্যে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু ঘোরার কোনও মানে হয় না।

দু-একজন মানুষ সন্তর্পণে ফুটপাত ধরে হাঁটছে। পোড়া ট্রামটিকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ততক্ষণে।

অনিমেষ বলল, 'আসুন, ওই কলেজ স্কোয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাই।'

ওরা যখন রাস্তা পার হয়ে এ-ফুটপাতে এল তখন একজন অত্যন্ত অবহেলায় হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলল। মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'ওরা আমাদের কেয়ারই করছে না।'

কলেজ স্কোয়ারের ভেতর ঢুকে একটু সহজ হল অনিমেষ। সামনেই বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু এবং সেটা জড়ভরতের মতো তাকিয়ে। এইসব মূর্তিগুলো দেখলে ইদানীং অস্বস্তি হয় ওর। সে-সময়ের মানুষগুলোকে আমরা আস্তে আস্তে লিলিপুট বানিয়ে ফেলছি।

BanglaBook.org

মির্জাপুরের কিছু দোকান খোলা। মোড়ে মোড়ে জটলাগুলো বোধ হয় আজ দুপুরের ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত। অর্থাৎ বিমানের পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। অবশ্যই এটাকে এক রকম জয়লাভই বলতে হবে। টুকরো টুকরো করে যদি সফলতা আসে একসময় সেগুলো জোড়া দিয়ে দিলেই পূর্ণতা পাবে।

মেয়েটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আজকে যা করলেন তাতে কার কী ভাল হল বলতে পারেন?'

অনিমেষ বলল, 'একদম মেরুদণ্ডহীন আমরা নই সেটা প্রমাণ হল।'

'তাই নাকি?' বাঁকা চোখে তাকাল মেয়েটি, 'পাড়ার গুণ্ডারা যখন পুলিশের সঙ্গে বোমা নিয়ে লড়াই করে তখন তাদেরও মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হয় না।'

'আশ্চর্য! দুটো ব্যাপার এক হল? ওরা লড়ছে কোনও কারণ ছাড়াই—জাস্ট গুণ্ডামি করতে।' অনিমেষ বিরক্ত হল।

মেয়েটি বলল, 'আপনাদের কারণটা কী? না, ভিয়েতনামে আমেরিকা অত্যাচার করছে তাই কলকাতার ট্রাম পোড়াও, পুলিশ মারো, সাধারণ মানুষকে অসুবিধেতে ফেলো—কী মহৎ ব্যাপার!'

ভ্রূ কুঁচকে গেল অনিমেষের, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'দেখুন, আমি সাধারণ মানুষের দলে। মাথায় যদি অন্য চিন্তা না থাকে তা হলে যে কেউ বুঝতে পারবে এগুলো হল স্টান্ট দেওয়ার চেষ্টা। নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার সহজ রাস্তা। আচ্ছা, সত্যি কি আপনি নিজেকে কমিউনিস্ট ভাবতে পারেন?'

'কমিউনিস্ট? আমি ঠিক জানি না। তবে আমি এমন সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে কোনও বৈষম্য থাকবে না। সেটা তো আর আকাশ থেকে নেমে আসবে না, তাই তার জন্যে কতগুলো আদর্শ সামনে রেখে এগোতে হবে। সেক্ষেত্রে কমিউনিজমের কোনও বিকল্প নেই।'

'বেশ, আপনার দল যা করছে তা কি সাম্যবাদের লক্ষণ! কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে আপনারা ভুল করছেন।'

'আপনি কি কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করেন?'

'মোটেই না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের দল সরকারে এলে আর একটা কংগ্রেসি সরকার হবে। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।'

চট করে নিশীথবাবুর মুখ মনে পড়ে গেল অনিমেষের। জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলের যে মাস্টারমশাই তাকে প্রথম দেশ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। তাঁরও তো একই বক্তব্য ছিল। কথাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে, 'এ দেশে কমিউনিস্ট সরকার হওয়া মুশকিল। যদি কখনও হয় দেখবে আমরা যা যা করেছি ওরা তারই নকল করছে আর যা করিনি ওরা সেটা করছে না। উপরন্তু ওদের বাড়তি সমস্যা হল যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টেইনের এখন ওরা জন্ম দিচ্ছে তাদের সামলানো তখন মুশকিল হয়ে পড়বে। একজনকে ক্ষমতা থেকে সরাতে তুমি দশ রকমের ভাঁওতা দিতে পারো, কিন্তু নিজে ক্ষমতায় এলে দেখবে সেই ভাঁওতাগুলো একশো রকমের হয়ে গেছে।'

কমিউনিস্ট পার্টির মাথা বা মাঝারি নেতাদের চেনে না অনিমেষ। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বিমানের কথাবার্তা ওর তেমন পছন্দ হয় না। সব সময় একটা চাপা মনোভাব, কেউ প্রতিবাদের ভঙ্গি করলে সেটা যেন বিমানের সহ্য হয় না। কিন্তু একজন লোককে দিয়ে একটা দলের বিচার করা ঠিক নয়। মার্কসবাদ ছাড়া এ দেশে মুক্তি নেই সেটা যখন সত্য তখন অন্য কোনও বিকল্প দলের কথা ভাবা যায় না। ছাত্র পরিষদের শচীন সেদিন ওদের যে মতবাদের কথা বলছিল কিংবা মুকুলেশ যা করতে চায় সেটা তো শুধুই ভাবপ্রবণতা। অবলম্বন ছাড়া কোনও সার্থকতা আসে না। আসলে মানুষের সহজাত ধর্ম হল চট করে হতাশ হয়ে পড়া। কাজ শুরু করার আগেই যারা শুধু পরিণতির কথা চিন্তা করে তারা তো কিছুই করতে পারবে না।

মেয়েটি বলল, 'কী ভাবছেন তখন থেকে?'

অনিমেষের খেয়াল হল ওর শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকের অবস্থা প্রতি দিনের মতো স্বাভাবিক। এই যে মাত্র মাইলটাক দূরে অমন কাণ্ড হয়ে গেল তা এই এলাকা দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। অনিমেষ বলল, 'কিছু না। পরে একদিন আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। আপনার ট্রেন ক'টায়?'

'এখন তো ঘন ঘন ট্রেন। আপনাকে এতদূরে এনে কষ্ট দিলাম।'

'কষ্ট কী! শিয়ালদায় এলে আমার মন ভাল হয়ে যায়।'

'সেকী? কেন?'

BanglaBook.org

'স্টেশনে ঢুকলেই রেলগাড়ি দেখতে পাই। আর রেলগাড়ি দেখলেই জলপাইগুড়ির কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলা এমন একটা জিনিস যা সব ক্ষত সারিয়ে দিতে পারে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও।'

'আপনার ক্ষত আছে ?' ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল মেয়েটি।

কথাটা শুনে চমকে তাকাল অনিমেষ। তারপর হেসে ফেলল, 'আপনি এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর দেওয়া যায় না।'

'তা হলে আপনার এমন কথা বলা উচিত নয় যার অর্থ আপনি জানেন না।'

নর্থ স্টেশনের দরজায় এসে দাঁড়াতে মেয়েটি বলল, 'এবার আমি যেতে পারব, আপনাকে শুধু এটুকু করার জন্য ধন্যবাদ।'

'কিছুই করিনি।'

'তা ঠিক। আসলে আমরা মেয়েরা অনেক কিছু অলীক ভয় আগাম কল্পনা করে নিয়ে বিব্রত হই। একটা পুরুষ যা পারে আমিও তাই করতে পারি। কিন্তু যদি কিছু হয়, যদি যদি করে নার্ভাস হয়ে সব গুলিয়ে ফেলাটা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, কী করব বলুন ? নইলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে রোজকার মতো আজও চলে আসতে পারতাম, এই যেমন এলাম।' গজদাঁত বের করে হাসল মেয়েটি।

'আমি সঙ্গে এলাম বলে এখন আফশোস হচ্ছে ?'

'এটাও কিন্তু মেয়েদের অভ্যেস, গায়ে পড়ে কাদা মাখা। ও কথা আমি একবারও বলিনি। এই যাঃ, কী অভদ্র দেখুন তো আমি। আপনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসাই করিনি।' ঠোঁট টিপে হাসলে মেয়েটির চোখ কথা বলে।

'হাতিবাগানের একটা হোস্টেলে।'

'আপনি হোস্টেলে থাকেন ? ও তাই!'

'মানে ? আবার কী থিয়োরি আছে এ ব্যাপারে!'

'হোস্টেলের ছেলেরা একটু ডেসপারেট এবং স্বার্থপর হয়।'

'তাই নাকি ? বাঃ, এটা তো জব্বর জানা হল।'

'একা একা থেকে ভাবতে শুরু করে আমি যা করছি তাই ঠিক।'

'বাঃ, গুড।' জ্ঞান গ্রহণ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অনিমেষ। হঠাৎ যাত্রীদের ভিড় বেড়ে গেল। অফিস-ফেরত মানুষেরা পড়ি কি মরি করে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন ধরতে। গেটে যে টিকিট কালেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ভঙ্গি জগন্নাথের মতো। হাত দুটো আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটি এবার চলে যাওয়ার ভঙ্গি করতে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'টিকিট কাটবেন না ?'

'আমার মাসের টিকিট আছে।'

হঠাৎ অনিমেষের ইচ্ছে হল ট্রেনে ওঠার। অনেকদিন ট্রেনে ওঠা হয়নি। জলপাইগুড়ি যাওয়া-আসা ছাড়া তো ট্রেনে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না।

সে বলল, 'একটু দাঁড়াবেন, আমি টিকিটটা কেটে আনি।'

'কেন ? আপনি কোথায় যাবেন ?' বিস্ময় মেয়েটির চোখে।

'ট্রেনে চড়তে ইচ্ছে করছে খুব।' বলে অনিমেষ দ্রুত গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল। বোধ হয় এখন অফিসটাইম বলেই কাউন্টারে ভিড় কম। এখনকার যাত্রীদের মান্থলি আছে। যারা হঠাৎ-যাত্রী তারা এই সময়টাকে এড়িয়ে আসে। বেলঘরিয়া পর্যন্ত টিকিট কাটল অনিমেষ। হাতিবাগান দিয়ে একটা বাস যাওয়া-আসা করে বেলঘরিয়া পর্যন্ত। ফেরার সময় সেটায় আসা যাবে।

অনিমেষকে আসতে দেখে মেয়েটি প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ঢুকে গেল। পাশাপাশি কতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে কিন্তু সেগুলোয় বাদুড়-ঝোলা ভিড়।

অনিমেষ বলল, 'আরে ব্বাস, এগুলোয় উঠবেন কী করে ?'

মেয়েটি বলল, 'আপনাদের কাছে যেটা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ আমাদের সেটা প্রাণ বাঁচানোর দায়। নিজে সুখে থাকলে অবশ্য এ রকম করা যায়।'

'মানুষকে আঘাত দিয়ে আপনার এক ধরনের আনন্দ হয়, না ?'

মেয়েটি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে হাঁটছেন এ দৃশ্য পরিচিত কেউ দেখলে কী কৈফিয়ত দেব ?'

'কৈফিয়ত কেন ? আপনি আমার সঙ্গে হেঁটে অন্যায় করছেন নাকি ?'

BanglaBook.org

'এই সন্ধেবেলায় একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরঘুর করছি—সমাজটাকে তো আপনারাই নিয়ন্ত্রণ করেন।'

'এখন সমাজ বলে কিছু নেই।'

'তাই নাকি! তা হলে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা চান কেন?'

থতমত হয়ে গেল অনিমেষ। কী কথা থেকে কোন কথায় চলে এল এ মেয়ে। এতক্ষণে ওর মনে এক ধরনের হীনতাভাব ছড়াতে শুরু করল। মেয়েটির সঙ্গে কথায় সে প্রতি মুহূর্তে হেরে যাচ্ছে।

'কী, মুখ শুকিয়ে গেল কেন? ভয় নেই, কেউ জিজ্ঞাসা করলে আলাপ করিয়ে দেব উনি একজন মহান কর্মী, আজ ইউনিভার্সিটিতে বিপ্লব করে এসেছেন। এ কথা শুনলে কেউ আর অন্য কিছু ভাববে না।'

মেয়েটি ওকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে চলে এল। এদিকের লাইনে কোনও গাড়ি নেই। যাত্রী হকার কুলিতে স্টেশন গমগম করছে। সেই প্রথম রাতটার কথা মনে পড়ে যায় যেদিন সে একা জলপাইগুড়ি থেকে এসে শিয়ালদায় নেমেছিল। এখানে এসে প্রথমে বোঝা যায়নি কলকাতার অ্যালার্জি হয়েছে। এ কথাটা ত্রিদিবের মুখে শোনা। এই যে মাঝে মাঝে বিক্ষোভ, ট্রাম-বাস পোড়ানো নাকি অ্যালার্জির মতো। চিংড়ি খেয়ে অনেকের শরীরে কয়েক দিনের জন্যে বেরিয়ে আবার যেমন মিলিয়ে যায় তেমনি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাকার টিকিট কাটলেন?'

'বেলঘরিয়া।'

'আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

'বুঝলাম না।'

'ন্যাকামি করবেন না। আপনি আমার বাড়িতে যেতে চাইছেন নাকি?'

'আপনার আপত্তি থাকলে যাব না,' অনিমেষের মজা লাগছিল।

'নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। আমি একটা উটকো লোককে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি না। বাড়িতে যখন জিজ্ঞাসা করবে কেন এল তখন আমি কী বলব? অ্যাডভেঞ্চার করতে এসেছে?'

'না। বলবেন বেড়াতে এসেছে।'

'আপনি আমাকে কী ভাবেন?'

'একজন শিক্ষিতা মহিলা।'

'কোনও শিক্ষিতা একদিনের আলাপে কোনও ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যায় আদর করে কোনও প্রয়োজন ছাড়া! আর আপনিই বা কেমন লোক অযাচিত হয়ে আমাদের বাড়িতে যেতে চাইছেন?'

'বললাম তো আপত্তি থাকলে যাব না।'

'শুনেছেন তো, আমার আপত্তি আছে।'

'বেশ যাব না।'

'তা হলে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'টিকিটটা যখন কেটে ফেলেছি তখন ট্রেনে উঠব। সেটায় নিশ্চয়ই আপনার আপত্তির অধিকার নেই।'

'তা নেই কিন্তু অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠবেন। আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন আমি ধন্যবাদ দিয়েছি। এর বেশি কিছু চাইবেন না।'

'আচ্ছা।'

কিন্তু অনিমেষ সরে গেল না। মেয়েটির মতো উদ্বিগ্ন মুখ করে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে। এখন প্ল্যাটফর্মটা ভরে উঠেছে। হঠাৎ-খেয়ালে টিকিটটা কেটে একটু অস্বস্তি হচ্ছে এখন। মেয়েটি নিশ্চয়ই সহজ ব্যবহার করছে। যে কোনও ভাল মেয়েই এরকম কথা বলবে। যদিও ওর বাড়িতে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা ওর ছিল না কিন্তু খেপিয়ে দিতে ভাল লাগছে। মেয়েরা একবার রাগলে বোধ হয় থামতে জানে না, এর মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। অনিমেষ চটপট আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ ওদের কথা শুনছে কিনা। দু-একজন দূর থেকে আচার খাওয়ার মতো মেয়েটিকে দেখছে বটে কিন্তু কথা শোনার মতো কাছাকাছি নেই। যদি ওর সঙ্গে বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে বাড়ি অবধি যায় তা হলে মেয়েটি কী করবে? ব্যাপারটা কল্পনা করতেই হাসি পাচ্ছিল ওর।

'পাশে দাঁড়িয়ে অমন ক্যাবলার মতো হাসবেন না।' ফোঁস করে উঠল মেয়েটি।

BanglaBook.org

অনিমেষ অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল, 'আরে, আমি হাসতেও পারব না ?'

'দূরে গিয়ে হাসুন।'

'আপনি বড্ড রেগে গেছেন। এরকম যদি অভ্যেস হয় তা হলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো উচিত। কারণ এটা একটা অসুখ।'

এই সময় ট্রেনটা এসে গেল প্ল্যাটফর্মে। যাত্রীরা নামতে না নামতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল সেটায় ওঠার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দৃশ্যটা আতঙ্ক নিয়ে দেখছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ট্রেনটা ভরে গেল মানুষে। এখনও প্রচুর লোক ছুটোছুটি করছে প্ল্যাটফর্মে একটু জায়গা পাওয়ার আশায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে কিছু শোনা যাচ্ছে না। এই মানুষগুলো প্রতিদিন এ ভাবে গাদাগাদি করে যায়। মুখ দেখে বোঝা যায় না ওরা এতে অসন্তুষ্ট কি না। অভ্যেস বোধ হয় সব কিছু সহজ করে দেয়। এ নিয়ে বিক্ষোভ নেই, তবে এটুকুও না পেলে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড হয়। কতটুকু ন্যূনতম চাহিদা মানুষের তবু তাই মেটাতে সরকার অক্ষম। আচ্ছা কমিউনিস্ট পার্টি তো এ সব নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার কথা মনে হতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। হঠাৎ কি করে যে ও উধাও হয়ে গেল বুঝতে না পেরে অনিমেষ চারপাশে তাকাতে লাগল। তবে কী ওই ভিড় ঠেলে মেয়েটি উঠে পড়েছে ট্রেনে ? এরকম একটা অসম্ভব কাজ একটা মেয়ের পক্ষে এখন আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না অনিমেষের। চোখের সামনেও মেয়েদের ঠেলাঠেলি করতে দেখেছে।

হঠাৎ কেমন নিঃসঙ্গ মনে হল ওর। এতক্ষন কথা কাটাকাটি করেও যা মনে হয়নি হঠাৎ ওকে না দেখে তাই হল। অনিমেষ ট্রেনের কামরাগুলোয় সাগ্রহে চোখ বোলানো শুরু করল। ভেতরে কেউ থাকলে এই ভিড়ে বাইরে থেকে কিছুতেই বোঝা যাবে না। এইভাবে কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু অনিমেষের মনে হল এ অবস্থাতেই যদি ওকে দেখতে পেয়ে যায় সে তা হলে অনেক কিছু ব্যাপার সত্যি হতে পারে। যেন নিজের ভাগ্য যাচাই করার জন্যে ও কামরাগুলো দেখা শুরু করল।

এবং ভাগ্য এত কাছে অপেক্ষা করছে তা দেখে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। এই কম্পার্টমেন্টে লোক আছে কিন্তু অন্যগুলোর চেয়ে কম কারণ সামনে বড় বড় করে মহিলা এবং ফার্স্ট ক্লাশের চিহ্ন লেখা আছে। আর তারই জানলায় বসে মেয়েটি যে অনেকক্ষণ তাকে লক্ষ করছে এটা বলে দিতে হবে না। কিছুই হয়নি এমন ভাব করে অনিমেষ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি ফার্স্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার ?'

'বাধ্য হয়ে। আপনিও উঠতে পারেন কারণ এখানে অন্য শ্রেণীর লোকও উঠে থাকেন। আপনার অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী, যাবেন না ?'

'আর ইচ্ছে নেই।'

'এত তাড়াতাড়ি ইচ্ছে চলে গেল ?'

'যার সঙ্গে যাব সেই যখন এরকম অভদ্রতা করতে পারল—'

'ও কথা আপনার মুখে মানায় না।'

'কী কথা ?'

'ভদ্রতা।'

'কেন ? আমি কি কিছু অভদ্রতা করেছি ?'

'এতক্ষণ যার সঙ্গে এলেন, কথা বললেন, বাড়ি যেতে চাইলেন, একবারও তার নাম জানতে ইচ্ছে করল না ? আমি মেয়ে এটাই কি আপনার কাছে সব ?'

অনিমেষ সোজা মুখের দিকে তাকাল। ট্রেনটা এবার ছাড়ছিল। মেয়েটি হাসল, 'নিজে কখনও ছোট হইনি, আজ হচ্ছি। আমার নাম মাধবীলতা মুখার্জি।'

'মাধবী ?'

'উহুঁ, ফুল নয়, আমি শুধুই লতা, মাধবীলতা।'

অনিমেষ ট্রেনটার চলে যাওয়া যেন দেখতে পেল না।

BanglaBook.org

ষোল

এমন বিষধর সাপ আছে যে দাঁত বসালেই মুহূর্তে শরীর নীল হয়ে যায়, কোনও বৈজ্ঞানিক তার প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি। অনিমেষ শুনেছে বিষ যখন শরীরে কাজ করে তখন আপাত যন্ত্রণার চাইতে নেশা মানুষকে আচ্ছন্ন করে, ঘুম পায়। এবং সেই খানিক ঘুম কখন চিরকালের হয়ে যায় সে টের পায় না।

নতুন হোস্টেলের এই ঘরে গতকালের রাত নিঝুম কেটেছে অনিমেষের। চোখের সামনে আকাশের চেহারা পালটানো, শেষ ট্রামের শব্দটা ডুবে গিয়ে হঠাৎ কলকাতা শীতল হল এবং শেষ পর্যন্ত কখন প্রথম ট্রাম নতুন দিনটাকে টেনে নিয়ে এল সে টের পায়নি।

চোখের পাতায় জোনাকির মতো আগুনের ফুলকি নেচে বেড়ায় যার সে ঘুমুবে কী করে! আর চোখ খুলতেই যার মুখ—সে মাধবীলতা।

ভোরের প্রথম আলো যে এত আন্তরিক হয়, এত সহজ নরম অনুভূতি বুকে ছড়ায় জানা ছিল না অনিমেষের। এই আলো এখন পৃথিবীর অনেক জায়গায় এমন সোহাগি হয়ে রয়েছে। কিন্তু অনিমেষের মনে হল, তার মতো এমন আপন হয়ে আর কারও কাছে যায়নি। জীবনে কখনও কোনও নেশা করেনি বা তার সুযোগ আসেনি কিন্তু কাল থেকে নিজেকে কেমন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। যেন সেই মারাত্মক সাপটা আচমকা ছোবল বসিয়ে দিয়ে গেছে এবং এখন তার আর কিছু করার নেই।

অথচ মাধবীলতাকে গতকাল দুপুরের আগে সে ভালভাবে চিনতই না। ক্লাশে মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়েছে কিন্তু সেই চোখের ভাষা পড়তে কখনওই সচেষ্ট ছিল না সে। কোনও সংস্কারের বশে প্রতিরোধ শক্তি যে তাকে বিরত করেছিল তা নয়, এ সব ব্যাপারে সে নিজেই নিস্পৃহ ছিল। এবং ইদানীং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সে এমন ডুবে ছিল জীবনের এই দিকটা খেয়াল হয়নি। অথচ গতকালের ওই রকম উত্তেজনাময় ঘটনাগুলোয় যখন তার নার্ভ টানটান ঠিক তখন এমন করে সে নিহত হবে তা কে জানত। হেসে ফেলল অনিমেষ জানলায় দাঁড়িয়ে। অনেকদিন আগে শোনা কথাটা মনে পড়ল, সে জানে না কখন মরে গেছে।

কিন্তু মাধবীলতাকে সে চেনে না। ওর পারিবারিক পরিচয় তার জানা নেই। শুধু এটুকুই মনে হয়েছে মেয়েটি নরম এবং বোকা নয়। কোনও কোনও মেয়ে বোধ হয় সহজে আত্মসমর্পণ করার জন্য জন্মায় না, মাধবীলতা এই ধরনের মেয়ে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার সময় অনিমেষ দেখেছে মাধবীলতার নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে এবং সেটাকে গুছিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলার ক্ষমতা রাখে। এ রকম সতেজ ডাঁটো আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে কোনও মেয়েকে অনিমেষ দেখেনি। কলকাতায় এসে নীলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নীলা অবশ্যই খুব ডেসপারেট মেয়ে, কোনও রকম ভিজে ব্যাপার ওর নেই। কিন্তু নীলা কখনওই আকর্ষণ করে না, বুকের মধ্যে এমন করে কাঁপন আনে না। যে কোনও পুরুষ-বন্ধুর মতো নীলার সঙ্গে সময় কাটানো যায়। তা ছাড়া কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারেই নীলার মানসিকতা বদ্ধ, মাধবীলতার মতো এমন দ্যুতি ছড়ায় না।

অথচ গতকাল এমন কোনও সংকেত বা ইঙ্গিত মাধবীলতা দেয়নি যে অনিমেষের এ রকম হতে পারে। বরং বলা যায়, মাধবীলতা সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকে আহত করে কথা বলছিল। অথচ যেই ট্রেনটা চলে গেল স্টেশন ছেড়ে অমনি অনিমেষকে কেউ যেন আচমকা ছুড়ে দিল এমন এক অসীমে যেখানে শুধুই ভেসে থাকতে হয়, ভেসে যেতে হয়। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল সে যে মাধবীলতাকে ঘিরে এ সব ভাবছে এটা তো সে সমর্থন নাও করতে পারে। এমনও হতে পারে মাধবী অন্য কাউকে ভালবাসে!

কথাটা মনে হতেই একটা অস্বস্তি শুরু হল। গতকাল থেকে যে জোয়ার সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল একটু একটু করে তা থিতিয়ে যেতে লাগল। মাধবীলতাকে সে জানে না এবং এ অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করে হয়তো খেলো হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া মাধবীলতার সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থাও তার অজানা। কাউকে পেতে হলে তার যোগ্য হতে হয়। অনিমেষের এই প্রথম মনে হল মানুষ হিসেবে তার যোগ্যতা কতখানি সে কখনও ভেবে দেখেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এমন একটা বিষয় নিয়ে পড়ছে যার বাজার মূল্য শূন্য, বাবার প্রচুর অর্থ নেই, শারীরিক সুস্থতা পায়ের জন্য সব সময় মেনে নেওয়া যায় না। একে কি যোগ্যতা বলে ? তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে প্রবেশের পর পড়াশুনায় মন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত তার আত্মবিশ্বাস আছে, ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে একটু চেষ্টা করলেই সে রপ্ত করে নিতে পারবে।

BanglaBook.org

কিন্তু এ সব তো যোগ্যতা-বিচারে প্রতিকূল মতামত সৃষ্টি করবে। এই বয়সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও ভাবে নিজেকে যোগ্য করতে পারে না। যদি অর্থনৈতিক সাফল্য বা সামাজিক পদমর্যাদা যোগ্যতার মাপকাঠি হয় তা হলে মাধবীলতার নাগাল পাওয়া অবশ্যই দুঃসাধ্য। বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত ও-দুটো সাফল্যের কথা তার চিন্তায় কখনও আসেনি। আজ মাধবীলতার জন্যে সেটা সম্ভব নয়। নিজের পছন্দ মতো কিংবা বলা যায় মনের মতো পড়াশুনায় সে চিরকাল নির্ভর ছিল। হয়তো বাবার নির্দেশ মেনে বাংলার বদলে অর্থকরী বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করলে আজ এ সব ভাবতে হত না।

অনিমেষ হেসে ফেলল, না, এজন্য ওর কোনও আফশোস নেই। দেশের জন্য এককালে যে ধরনের সেন্টিমেন্ট কাজ করত ওর মনে, ইদানীং সেটা নেই বটে কিন্তু অন্য রকম দৃষ্টিতে দেশ—এই সমাজব্যবস্থাকে দেখতে শুরু করেছে। ইদানীং সে বুঝতে পেরেছে যে সাধারণ মানুষ নিজেকে ভারতীয় বলে অনুভব করে না। এই ভারতবর্ষে জন্মে বড় হয়েও কেউ ভারতবর্ষ নিয়ে কোনও চিন্তা করে না। মানুষের চিন্তা-ভাবনা এখন তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে জড়িত। এই দেশ নিজের এই অনুভূতি যখন মানুষের নেই তখন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন কী করে আশা করা যায়! রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বিশেষ বিশেষ চশমা দিয়ে সমস্যাগুলোকে দেখে। তবু অনিমেষের মনে হয় কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র কাছের দল যার সঙ্গে কাজ করলে এই পরিবর্তন সম্ভব। একটা বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র বা ডাক্তার হওয়ার চেয়ে একজন আন্তরিক কর্মী হওয়া অনেক কাম্য মনে করে সে।

কিন্তু এ সব কথা মাধবীলতাকে বোঝানো যাবে কি! যদি না যায়, যদি তাকে মাধবীলতা গ্রহণ না করে তা হলে কি ওর প্রতি অনিমেষের মনে যে অনুভূতি জন্ম নিয়েছে তা মিথ্যে হয়ে যাবে? শ্লেট মোছার মতো মুছে ফেলা যায়? সেই ছেলেবেলায় সীতা তার বালক মনে যে ঢেউ তুলেছিল, যার প্রকাশ কখনই সোচ্চার হয়নি, তা তো নেহাতই ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়, ধোঁয়া ধোঁয়া ছিল সব। কিন্তু যে অনুভূতি জলের দাগের মতো এখন অস্পষ্ট হয়েও রয়ে গেছে তাকে কি অস্বীকার করা যায়? আসলে ভালবাসা কখনও কোনও শর্ত মেনে আসে না, আমরা তার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করি। কেন যে এমন হয়!

জীবনে আর কখনও এমন করে সময় পার করার তাগিদ অনুভব করেনি অনিমেষ। আজকের প্রথম ক্লাশ বারোটায়। প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় হাতে। একটা মিনিট কাটতে যেন এক প্রহর লাগছে। বারোটা বাজলেই মাধবীলতার দেখা পাওয়া যাবে। এখন, চোখ বন্ধ করলেই সেই ঝকঝকে মুখ, সামান্য নিচু, মুখের ভঙ্গিমায় ধরে রাখা দীঘল চোখের চাহনি—যেন বুকের গভীরে অনন্ত হয়ে মিশে যায়।

দরজায় শব্দ হতে অনিমেষ কপাট খুলল। এই হোস্টেলের কনিষ্ঠ চাকর চা নিয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা মাত্র ঝড়ের মতো টেবিলে কাপ রেখে উধাও হল। ইদানীং বাসি মুখে চা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের অভ্যেস পালটে যায়? এই যেমন, চিরকাল সে নিজের জামাকাপড় নিজেই ধুয়ে নিত, জলপাইগুড়িতে থাকার সময় এই অভ্যেসটা হয়ে গিয়েছিল। আগের হোস্টেলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এখানে এসে ওই ছোকরা চাকরটা যখন পাঁচ টাকার বিনিময়ে সারা মাস কাজ করে দেবে বলল তখন অনিমেষ রাজি হয়ে গেল। পাঁচটা টাকা অত্যন্ত মূল্যবান ওর কাছে তবু ওই সময়টুকু বাঁচিয়ে আলসেমি করার বিলাসিতা এখন ভাল লাগে।

এই হোস্টেলের চেহারা অবশ্য সব দিক দিয়েই আলাদা। নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি এখানে অনেকটাই শিথিল। এর একটা কারণ শুধু কলেজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এখানে থাকছে। এমন কেউ শুধু সন্ধেবেলায় আইন কলেজে পড়ার সুবাদে দিনে চাকরি করা সত্ত্বেও এ হোস্টেলের আবাসিক। স্কটিশ চার্চ কলেজ অবশ্য এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুপারিনটেনডেন্ট ভদ্রলোক ওখানকার অধ্যাপক কিন্তু এটাকে একটা ভাল মেস ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

চায়ের কাপ শেষ করতে না করতেই দরজায় শব্দ হল। এ-ঘরে সে একা। ছাদের ওপর এ রকম নির্জনে ঘর পাওয়া কপালগুণেই সম্ভব হয়েছে। মাঝে মাঝে অনিমেষের মনে হয়েছে ভাগ্যদেবী তাকে খানিকটা কৃপা করে থাকেন। এটা ভাবলে আত্মবিশ্বাস বেশ বেড়ে যায়। অনিমেষ দরজা খুলে দেখল দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বলল, 'বাবু, এক বুড্ঢা আপকো ঢুঁড়তা হ্যায়?'

'কাঁহা?'

'গেটপর বৈঠা হ্যায়।'

কেন কোনও বৃদ্ধ তাকে খুঁজতে এসেছে বোধগম্য হল না অনিমেষের। কলকাতায় এমন কোনও

BanglaBook.org

বৃদ্ধের সঙ্গে ওর আলাপ নেই যে এখানে আসতে পারে। দারোয়ানকে বৃদ্ধকে ওপরে পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে গিয়ে মত পরিবর্তন করে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তারপর ধীরেসুস্থে নিজেকে মার্জিত করে সে খানিকটা সময় নিয়ে একতলায় নেমে এল। একতলায় এখন দারুণ কর্মব্যস্ততা। বিরাট চাতালে বাসন মাজা চলছে সশব্দে। এই সকালেই বাথরুমে লাইন পড়ে গেছে। অনিমেষ বাইরের গেটের দিকে এগিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। দারোয়ানটা টুলে বসে খইনি টিপছিল, জিজ্ঞাসা করতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অনিমেষের মনে হল ওর বুকের মধ্যে একটা লোহার বল আচমকা লাফিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে দিয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। কোনও রকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল সে কোনায় রকের দিকে। বৃদ্ধ নিজেকে গুটিয়ে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। তাঁর পাশে দুটো বড় ঝোলা, ময়লা ধুতির ওপর একটা সুতির কোট যার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। মাথা পরিষ্কার করে কামানো বলে মুখের চেহারাটা একদম বদলে গেছে। অনিমেষ কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। কোনও রকমে সে উচ্চারণ করল, 'আপনি?'

বৃদ্ধ চোখ মেললেন, ঘোলাটে চোখ। দৃষ্টি যে স্বাভাবিক নয় বোঝা যায় এবং শরীরের কাঁপুনিটা স্পষ্ট। অনিমেষ একটু সচেতন হয়ে ঝুঁকে প্রণাম করতে যেতেই একটা হাত ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিল, 'না, অসুস্থ মানুষকে প্রণাম করতে নেই।'

অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই শরীর শিহরিত হল। যেন অকস্মাৎ কেউ একটানা সমস্ত ছেলেবেলাটাকে তার সামনে হাজির করল। এই শরীরের সঙ্গে কোনও মিল নেই, কিন্তু ওই কথাগুলো শুধু সরিৎশেখরই অমন ভঙ্গিতে বলতে পারেন। কিন্তু দাদুর এ কী চেহারা হয়েছে! গত দু-তিন সপ্তাহ সে জলপাইগুড়ি কিংবা স্বর্গছেঁড়া থেকে কোনও চিঠিপত্র পায়নি। কিন্তু সরিৎশেখরের মতো মানুষ দুটো ঝোলা নিয়ে মাথা কামিয়ে এমন নোংরা পোশাকে ঘুরে বেড়াবেন—কল্পনাতেও আসে না। অনেকগুলো প্রশ্ন এখন জিভে কিন্তু অনিমেষ নিজেকে সামলে নিল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি হাঁটতে পারবেন?'

'আমি তো হেঁটেই এলাম,' সরিৎশেখর জানালেন।

অনিমেষ জানে শত অসুস্থ হলেও দাদু তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু বলার মানুষ নন। সে দুটো ঝোলা কাঁধে দিয়ে দাদুর হাত ধরল, 'উঠুন!'

সরিৎশেখর ক্লান্ত চোখে তাকালেন, 'তোমার ঘর কদ্দুর?'

ততক্ষণে সরিৎশেখরের শরীরের কম্পন অনিমেষ প্রবলভাবে অনুভব করছে। এ অবস্থায় ওঁকে তিনতলায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? কিন্তু এ ছাড়া এ হোস্টেলে অন্য ব্যবস্থা নেই।

অনিমেষ বলল, 'তিনতলায়। আপনি আস্তে আস্তে উঠুন।'

হাতের মুঠোয় উত্তাপ লাগছে, সরিৎশেখরের জ্বর এসেছে অবশ্যই। এই শরীর নিয়ে অনিমেষের হোস্টেল খুঁজে এলেন কী করে সেটাই বিস্ময়ের কথা। উনি আসবেন এ খবর কেউ তাকে জানায়নি। অনিমেষের মনে হল, এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে যার জন্যে সরিৎশেখর চুপচাপ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু মাথা ন্যাড়া কেন? আর যে লোকটি কলকাতায় দীর্ঘকাল আসেনি তাঁর পক্ষে এরকম অসুস্থ শরীরে রাস্তা চিনে এই অবধি আসা কী করে সম্ভব হল?

সরিৎশেখর টলছিলেন। চাতালটার কাছাকাছি এসে অনিমেষ বুঝতে পারল ওঁর পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়। সেই লম্বা-চওড়া শরীরটা এখন কেমন গুটিয়ে ছোট হয়ে এসেছে। যাঁকে একদিন বিশাল মনে হত এখন তিনি অনিমেষের কাঁধের নীচে মুখ নামিয়েছেন। অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছিল অনিমেষের। হোস্টেলের যারা নীচে এসেছিল বিভিন্ন দরকারে তারা অবাক হয়ে ওদের দেখছে।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'অনিমেষবাবু ওঁকে কি আপনার ঘরে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

অনিমেষ দেখল ওর পাশের ঘরের ছেলে তমাল খালি গায়ে লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে।

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু উনি কি ওপরে উঠতে পারবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। সে ঝোলা দুটো তমালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা ধরুন, প্লিজ।'

তমাল ঝোলা দুটো নিতেই সে একটু ঝুঁকে সরিৎশেখরকে দু'হাতে তুলে নিল। ব্যাপারটা এমন ঘটল যে সরিৎশেখর চমকে উঠে প্রতিবাদ করলেন, 'আরে, তুমি ভেবেছ কী? আমি ঠিক যেতে পারব।'

BanglaBook.org

হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ বলল, 'পারতেন, কিন্তু এ ভাবে যাওয়া আরও সহজ হবে। আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন।'

অতবড় মানুষটাকে কোলে করে তুলতে অনিমেষের নিশ্বাস অস্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এককালের দশাসই চেহারাটা এখন যতই গুটিয়ে যাক তবু ওজন কম নয়। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় অনিমেষ নিজের পায়ে আবার সেই যন্ত্রণা বোধ করল। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে খুব কিন্তু সেটা করতে গেলে দাদুর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেটা সে কোনওমতেই হতে দিতে রাজি নয়।

সরিৎশেখর নাতির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বোধ ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। অনেক পথ এই শরীর নিয়ে ভ্রমণের ফলে তাঁর চিন্তাশক্তি শিথিল হয়ে পড়ছিল। অনিমেষের হাতে তিনি নিরাপদ এই বোধটুকু তাঁকে আরও নিশ্চিন্ত করে ফেলায় তিনি বললেন, 'একটা কাল ছিল যখন তুমি আমার কোলে ধামসাতে, আমার কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াতে, আর এমন একটা কাল এল যখন আমি তোমার কোলে চেপে ওপরে উঠেছি। বিধাতার কী নিয়ম, সব শোধবোধ হয়ে গেল।'

নিজের বিছানায় দাদুকে শুইয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অনিমেষের পক্ষে কথা বলা সম্ভব ছিল না। হালকা হলে মনে হল, ওর বুক টনটন করছে, ঘন ঘন বাতাস নিচ্ছিল সে। নিতে গিয়ে লক্ষ করল সমস্ত ঘর অগোছালো, ময়লা জামা-প্যান্ট থেকে শুরু করে কাগজপত্র এলোমেলো ছড়ানো। এ রকম ঘরে সরিৎশেখর কখনও বাস করেননি। এবং চেতনা ঠিক হলেই তিনি অনিমেষকে অবশ্যই এর জন্যে তিরস্কার করবেন। সেই অবস্থাতেই দ্রুত হাতে ঘরটাকে ঠিক করে ফেলল অনিমেষ। সরিৎশেখর বোধ হয় দীর্ঘদিন পর বিছানা পেয়ে আরাম বোধ করছেন। কারণ বালিশে মাথা রাখা মাত্রই তিনি নেতিয়ে গেলেন। চোখ বন্ধ, ঘুম ঘুম ভাবটা বোঝা যায়। কপালে হাত রেখে অনিমেষ এবার নার্ভাস হয়ে পড়ল। থার্মোমিটার সঙ্গে নেই কিন্তু জ্বরটা যে বেশ জোরালো তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তমাল ঝোলা দুটো টেবিলে রেখে চুপচাপ দেখছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর নাকি?'

'হ্যাঁ। দুই তিন হতে পারে।' অনিমেষ অন্যমনস্ক হয়ে বলল।

'আপনার কেউ হন উনি?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদা।'

তমাল ব্যস্ত হল, 'তা হলে আর দেরি করা ঠিক নয়। আপনি ডাক্তার ডেকে আনুন।'

এই হোস্টেলেও একজন বাঁধাধরা ডাক্তার আছেন। অমনোযোগী হওয়ার ফলে তাঁর সম্পর্কেও ছেলেদের বিস্তর নালিশ। কিন্তু বিনাপয়সায় দেখানো যায় বলে ব্যবস্থাটা সকলে মেনে নিয়েছে। তাঁকে খবর দিলে আসতে কত বেলা করবেন সে জানে। তার চেয়ে হোস্টেলের পাশেই গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে একজন ডাক্তারকে প্রায়ই সে লক্ষ করে থাকে, তকেই ডাকলে ভাল হয়। ভদ্রলোকের চেম্বারে বেশ ভিড় হয় যখন তিনি নিশ্চয়ই ভাল ডাক্তার। কিন্তু দাদুকে এ অবস্থায় একা ফেলে যেতে মন চাইছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তমাল বলল, 'আমি আছি, আপনি তাড়াতাড়ি করুন।'

কৃতজ্ঞ হল অনিমেষ। মানুষকে বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসা কখনওই উচিত নয়। একটা মানুষের অনেকগুলো মুখ থাকে আর প্রতিটি স্বতন্ত্র ধরনের। একটিকে দেখে অন্যটিকে ধারণা করতে গেলে ঠকতে হয়। তমাল ডিগবয়ের ছেলে। অবস্থাপন্ন। পাউডার-সেন্ট ছাড়া কোনওদিন ওকে বেরুতে দেখেনি অনিমেষ। হোস্টেলের চাকরবাকরদের টাকা ছড়িয়ে হাতে রেখেছে। এ রকম বড়লোকের দুলালদের আদৌ পছন্দ করত না অনিমেষ। তাই যতটা সম্ভব ওকে এড়িয়ে যেত। প্রায় সমবয়সী হলেও তমাল তাকে বাবু বলে সম্বোধন করে। ডাকটা কানে লাগে, বোধ হয় নৈকট্য স্থাপন করতে না চাওয়ার এটা একটা চেষ্টা। অথচ আজ দাদুকে নিয়ে সে যখন বিব্রত তখন অন্য ছেলেদের আগে তমালই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

ডাক্তার সেনের চেম্বারে এই সকালে তিন চারজন লোক প্রতীক্ষায় বসে। ভদ্রলোক এখনও আসেননি। অনিমেষ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ ওর খেয়াল হল তার নতুন হোস্টেলের ঠিকানাটা দাদু পেলেন কী করে। মহীতোষ জানেন খুবই সম্প্রতি এবং জেনেই তিনি সরিৎশেখরকে জানিয়ে দেবেন এতটা ভাবা যায় না। ইদানীং দাদুকে সে অনিয়মিত চিঠি দিচ্ছিল। কেন আগের হোস্টেল ছাড়তে হল সে বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়ে চিঠি দেবে দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু দেওয়া হয়ে ওঠেনি। মহীতোষের পাঠানো আগের মাসের টাকাটা পুরনো হোস্টেলের ঠিকানায় এসেছে। তা হলে? দাদু কি ওখানে গিয়েছিলেন? তার নতুন ঠিকানা ওখান থেকে সংগ্রহ করে এখানে এসেছেন? অনিমেষের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

BanglaBook.org

এর মধ্যে চেম্বারে রোগীদের উপস্থিতি বেড়ে গেছে। খবরের কাগজের পাতা এবং বিভিন্ন জার্নাল অনেকের হাতে হাতে। কিছু পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। তিনি কোনও দিকে না তাকিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

অনিমেষ উঠে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য পা বাড়াতেই একটা লোক বাধা দিল, 'অপেক্ষা করুন, উনি স্লিপ অনুযায়ী ডাকবেন।'

স্লিপ! অনিমেষের খেয়াল হল রোগীরা এসেই নিজের নাম লেখা কাগজ এই লোকটির হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেটার যে এতখানি প্রয়োজন তখন খেয়াল করেনি। তিন-চার জনের পরেই সে এখানে এসেছে, নতুন করে স্লিপ দিতে গেলে অনেক পিছিয়ে যেতে হবে।

ব্যাপারটা বলতেই লোকটি জানাল, 'কিন্তু আমি কী করব বলুন। কেউ যাতে রাগ না করতে পারে তাই ডাক্তারবাবু এ নিয়ম করেছেন।'

'কিন্তু আপনি তো দেখেছেন যে আমি অনেক আগে এসেছি।'

'সে কথা অন্য লোক মানতে চাইবে কেন?'

'বেশ, আমি তো রোগ দেখাতে আসিনি। ওঁকে আপনি বলুন আমি শুধু একটা কথা বলব।' অনিমেষ আবেদন করল।

'না মশাই, ও সব ভাঁওতা দিয়ে ঢুকে অনেকেই রোগের কথা বলে।' লোকটা সামনে থেকে সরে গিয়ে স্লিপ সাজাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার রক্ত চড়ে গেল অনিমেষের। দ্রুত পা চালিয়ে ছোট ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। পেছনের লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়ে শেষতক সামলে নিয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। অনিমেষ ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখল প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধূপকাঠি জ্বেলে চোখ বন্ধ করে কিছু আওড়াচ্ছেন। ব্যবসা শুরু করার আগে ঠাকুর-প্রণাম বোধ হয়।

অনিমেষ একটু অপেক্ষা করে বলল, 'মাফ করবেন, আমি তিনজনের পর এসেছি কিন্তু স্লিপ দেওয়ার নিয়মটা জানতাম না। অথচ একজন ডাক্তারের প্রয়োজন খুবই। তাই আইনটা ভাঙতে হল।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে একবার দেখে শেষে মাথা নেড়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী?' লোকটি বলতে যাবার আগেই অনিমেষ বলল, 'আমার দাদু অত্যন্ত অসুস্থ, কাছেই, আপনাকে একবার যেতে হবে।'

'ইম্পসিব্‌ল।' প্রৌঢ় খুব বিরক্ত হল, 'সকালে এত রোগী ফেলে আমি কলে যেতে পারব না। ইউ ফাইন্ড সাম আদার ডক্টর।'

'আপনার দশ মিনিটও ব্যয় হবে না। অনুগ্রহ করে চলুন। এখানে আর কে ডাক্তার আছেন জানি না।'

'কেন সময় নষ্ট করছেন? দশ মিনিটে আমি তিনটে পেশেন্ট দেখতে পারব। প্লিজ গো আউট।' হাত বাড়িয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন ডাক্তার।

জেদ চেপে গেল অনিমেষের। সে টেবিলের প্রান্তে দু'হাত ধরে বলল, 'কিন্তু আমার দাদু খুব অসুস্থ, আপনাকে যেতে হবে।'

'যেতে হবে? গায়ের জোর দেখাচ্ছেন?' ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'যদি তাই মনে করেন আমি নিরুপায়।' অনিমেষ চোয়াল শক্ত করল।

'ইজ ইট সো? আমি আপনাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতে পারি তা জানেন? আপনি আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে ভয় দেখাচ্ছেন।'

'আপনি যাই ভাবুন কিন্তু সেটা পরে ভাববেন। দশ মিনিট যদি ব্যয় করেন তা হলে এমনকিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি যদি চান তা হলে বাইরের ভদ্রলোকদের কাছে আমি সময়টা চেয়ে নিতে পারি।'

'নো, নেভার। একবার কলে গেলে সেটা উদাহরণ হয়ে থেকে যাবে। আমি দুপুরে যাওয়ার সময় যেতে পারি।'

'তখন যদি পেশেন্ট মরে যায়!'

'কান্ট হেল্প।'

'আপনি কিন্তু আমাকে উত্তেজিত করছেন।' অনিমেষের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, 'হোস্টেলের ছেলেরা জানলে আপনি বিপদে পড়বেন।'

BanglaBook.org

'হোস্টেল! এর মধ্যে হোস্টেল আসছে কোত্থেকে ?'

'আমি হোস্টেলে থাকি। সেখানেই আপনাকে যেতে হবে। চিরকাল যেভাবে টাকা রোজগার করে এসেছেন এবার তার ব্যতিক্রম করতে হবে।'

'সমাজ সংস্কারক মনে হচ্ছে! কমিউনিস্ট নাকি ?'

'আপনি মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছেন।'

'কী আশ্চর্য। এত ডাক্তার থাকতে আমাকে নিয়ে—তা কী হয়েছে—আপনার পেশেন্টের ? সিরিয়াস ব্যাপার হলে হাসপাতালে রিমুভ করুন।'

'সেটা ওঁকে দেখে আপনি বলবেন। বয়স হয়েছে, খুব জ্বর আর মনে হচ্ছে ভীষণ দুর্বল। রোগটা বুঝতে পারলে আপনার কাছে আসব কেন ? নিন, উঠুন।' প্রায় ধমকের গলায় কথাটা বলতে ভদ্রলোক নার্ভাস হয়ে গেলেন। অনিমেষ ততক্ষণে চেম্বার ছেড়ে ভিজিটার্স রুমে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের উত্তেজিত কথাবার্তা এখানকার মানুষগুলো নিশ্চয়ই শুনেছেন কারণ তাঁরা অবাক চোখে অনিমেষকে দেখছেন। অনিমেষ হাতজোড় করে বলল, 'দেখুন, আমি আপনাদের কাছ থেকে মাত্র দশ মিনিটের জন্য ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার দাদু অত্যন্ত অসুস্থ। হয়তো আপনাদের একটু অসুবিধে হবে কিন্তু দয়া করে মার্জনা করবেন।'

কেউ কেউ উসখুস করলেও মুখে আপত্তি প্রকাশ করল না।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে অনিমেষ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে হোস্টেলে পৌঁছে গেল। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত চেম্বার থেকে বেরুবেন কি না এ সন্দেহ ছিল কিন্তু হোস্টেলের নাম করতে যে এতটা কাজ হবে বোঝা যায়নি।

হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'হোস্টেল থাকেন সে-কথা প্রথমে বললেই তো হত।'

'কেন ?'

'কিছু মনে করবেন না, হোস্টেলের ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে খুব রাগারাগি করে। তা আপনাদের তো একজন ডাক্তার আছে!'

'তিনি এত তাড়াতাড়ি আসতে পারতেন না।'

ঘরে ঢুকে অনিমেষ অবাক হল। তমাল সরিৎশেখরের কপালে জলপটি লাগিয়ে পাশে বসে মাথায় পাখার হাওয়া করে যাচ্ছে। ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে জ্বরটা আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

কালবিলম্ব না করে ডাক্তার পরীক্ষা করতে বসে গেলেন।

ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অনিমেষ ভাবল এবার তমালকে ছুটি দেওয়া উচিত। কথা বলতে গিয়েও সঙ্কোচ হল। কেউ যদি খুব আন্তরিক হয় তার সঙ্গে ভদ্রতা করাটা অনেক সময় অত্যন্ত বেমানান দেখায়।

ডাক্তার বেশ কিছুক্ষণ পরক্ষিা করার পর ব্যাগ খুলে একটা সিরিঞ্জ বের করে ইঞ্জেকশন দিলেন। সামান্য যে ব্যথাটুকু লাগল তাতেই দাদু চোখ খুলে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনিমেষ বুঝতে পারছিল যে ওঁর চেতনা আর দখলে নেই। হঠাৎ খুব ভয় করতে লাগল অনিমেষের। যদি কিছু হয়ে যায় ? দাদু নেই এ কথা ভাবতেই বুকে কাঁপুনি এসে গেল। এই মানুষটার কাছে যে এমন ঋণবদ্ধ যে এঁকে ছাড়া কিছু ভাবা অসম্ভব। তার সমস্ত ছেলেবেলা এই মানুষটা নিজের ইচ্ছে মতো সাজিয়ে দিয়েছেন। তার চিন্তা, মানসিক প্রকাশ এঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এক সময়। এখন সেটা যতই নিজের পথে চলুক, মূল ব্যাপারটায় দাদু এখনও জড়িয়ে আছেন। অনেক অনেকদিন পরে সেই ছেলেবেলার স্মৃতিটা ভেসে এল। কোনও আশঙ্কার সামনে দাঁড়ালে একটা লাইন স্মরণ করে কপালে তিনবার মা অক্ষর লিখে চোখ বন্ধ করে প্রণাম করত। ছেলেবেলায় এটা দারুণ কাজ করত। নিজের অজান্তে অনিমেষ এতদিন পরে তার পুনরাবৃত্তি করল। ওঁ, ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তার আগ্রহ বা ভক্তির কোনও প্রকাশ কলকাতায় এসে ঘটেনি। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন সে অনুভব করেনি। মার্কস কিংবা লেনিন পড়ার সময় এই সব সংস্কারগুলোকে সে নির্মমভাবে সরিয়ে দিয়েছে। একজন মাও সে-তুং কিংবা হো চি মিনের জীবনে অন্য ধর্মবিশ্বাসের কোনও প্রয়োজন নেই। অথচ রক্তে ডুবে থাকা এই সংস্কার হঠাৎ নিজের অজ্ঞান্তে ভুস করে মাথা তুলল। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেতেই সজাগ হল অনিমেষ। তমাল বলল, 'ভয় পাবেন না, উনি জলে পড়ে নেই।'

ডাক্তার কোনও কথা বলছিলেন না। এর মধ্যে প্রায় পনেরো মিনিট সময় চলে গেছে। শেষ

BanglaBook.org

পর্যন্ত পালস্ দেখে ভদ্রলোক সহজ হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অনিমেষকে বললেন, 'মনে হয় খুব টর্চার করেছেন। ইঞ্জেকশনটায় কাজ হয়েছে, এখন স্বাভাবিকভাবে ঘুমোবেন। আমি যে ওষুধ লিখে দিচ্ছি সেগুলো খাইয়ে কাল রিপোর্ট করবেন।'

প্রেসক্রিপশন লেখার সময় অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ভয়ের কিছু আছে?'

ডাক্তার লেখা শেষ করে বললেন, 'ছিল। হরলিক্স, বিস্কুট আর মিষ্টি ফল ছাড়া আজকে কিছু দেওয়ার নেই। মনে হচ্ছে তিন-চারদিন কিছুই খাননি আর খুব পরিশ্রম করেছেন। আচ্ছা চলি।'

প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে অনিমেষ ড্রয়ার খুলে টাকা বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ফিস কত আমি ঠিক জানি না —।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'পড়ো না চাকরি করো?'

'পড়ি।'

'আমি চেম্বারে বত্রিশ টাকা নিই। কলে গেলে ডাবল হয়। আমাকে টাকা দেখাতে এসো না ছোকরা। দশ টাকা দাও।' বিস্মিত অনিমেষের হাত থেকে একটা দশ টাকার নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'ক্লাশ কামাই করো। অন্তত একটা দিন এঁকে সব সময় চোখে রাখা দরকার।' ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে বললেন, 'আর হ্যাঁ, তোমার রাস্তাটা সবাইকে শিখিয়ে দিয়ো না।'

তমাল ওঁকে পৌঁছতে নীচে নেমে গেল অনিমেষ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আর একবার মানুষের অন্য মুখ দেখল সে।

ওষুধপত্র আনিয়ে অনিমেষ দাদুর পাশে বসে বাতাস করছিল। সকালে যে সময়টা কাটছিল না সেট এখন দৌড়ে যাচ্ছে। এখন দুপুর। হোস্টেল ফাঁকা। বারোটার ক্লাশটা করা হল না। আজ সকালে যে তাগিদ বুকের মধ্যে ছটফট করছিল সেটা এখন মিইয়ে গেছে। মাধবীলতাকে দেখার ইচ্ছের চেয়ে এই বৃদ্ধের পাশে বসে থাকতে বড় আরাম হচ্ছিল। দাদুর কথাটা মনে পড়ল, সব শোধবোধ হয়ে গেল। মাথা নাড়ল অনিমেষ, না, কখনওই শোধ হয় না।

দুপুর ঘন হলে সরিৎশেখর চোখ খুললেন। নাতিকে দেখে ধীরে ধীরে বললেন, 'অনি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম, না?'

অনেকদিন পর অনিমেষ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

সতেরো

সন্ধে নাগাদ সরিৎশেখরকে খানিকটা সুস্থ দেখাচ্ছিল। সারাদিন জল আর বিস্কুট ছাড়া কিছু খাননি। অনিমেষ জোর করে একটা সন্দেশ খাইয়ে দিলে বৃদ্ধের গলার স্বর একটু স্বাভাবিক হল। সরিৎশেখর বললেন, একটু বাথরুমে যাবেন।

সারাটা দিন শুয়েই কাটিয়েছেন তিনি, ওঠার কোনও কারণও ছিল না। ওরকম জ্বরো রোগী যে হেঁটে চলে বেড়াবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষের খেয়াল হল যে দাদু একবারও বাথরুমে যাননি। এবং কথাটা শোনামাত্র সে বিচলিত হয়ে পড়ল। ওদের এই হোস্টেলের বাথরুম-পায়খানা খুব সভ্য ধরনের নয়। এতগুলো মানুষের প্রয়োজন মেটাতে হয়তো কিছু সুবন্দোবস্ত করা যেত কিন্তু তার সুরক্ষা সম্ভব নয়। প্রতি তলায় একটা করে ঘেরা জায়গা আছে ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্যে কিন্তু বৃহৎ ব্যাপারের ব্যবস্থা নীচে। জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমন স্যাঁতসেঁতে। আগের হোস্টেলটা এ সব ব্যাপারে অনেক ভদ্র ছিল। কিন্তু এই বাড়িটা এত প্রাচীন এবং কিছুটা রহস্যময় ভঙ্গিতে গঠিত যে এর উন্নতি করা অসম্ভব। জলপাইগুড়ি থাকতে যে মানসিক গঠন ও অভ্যাস অনিমেষের ছিল কলকাতার হোস্টেলে থাকতে এসে তা কিছুটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। ওটা এমন বয়স যা সব কিছু মানিয়ে নিতে পারে। এখন এগুলোর গুরুত্ব সারাদিনের জীবনে এত কম যে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার বোধ করেনি অনিমেষ। মনে পড়ে, প্রথম দিন এক ঘরে অপরিচিত ছেলের সঙ্গে থাকতে হবে জেনে চোখে জল এসে গিয়েছিল। সারাটা ছেলেবেলা সে কারও সঙ্গে ভাগ করেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে তো তাও অভ্যেস হয়ে গেল।

কিন্তু সরিৎশেখর কী করে এই রকম ব্যবস্থা মেনে নেবেন? সারাটা জীবন যে মানুষ সাহেবদের সঙ্গে কাটিয়ে মানসিকভাবে কতগুলো রুচি মেনে চলেন, তাঁর পক্ষে এই ধরনের বাথরুম ব্যবহার করা অসম্ভব। হয়তো ভেতরে ঢুকেই বেরিয়ে আসবেন। কী করা যায় বুঝতে পারছিল না অনিমেষ।

সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি?'

BanglaBoi.com

অনিমেষ ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারপর দাদুকে সযত্নে ধরে ধরে সামনের ছাদে নিয়ে গেল। কোনার দিকে দুটো দিক দেওয়াল ঘেরা জায়গাটায় পৌঁছে বলল, 'এখানেই সেরে নিন।' ভেতরে দুটো সিমেন্ট লাগানো ইট ছাড়া কিছু নেই।

অনিমেষ যা আশঙ্কা করছিল তাই হল, সরিৎশেখর বেরিয়ে এসে বললেন, 'এখানে জলের কল নেই ?'

'না। মানে, এটা খুব প্রয়োজনের জন্যে। রোজ জমাদার এসে ধুয়ে দিয়ে যায়।' অনিমেষ দাদুর দিকে তাকাল।

'কিন্তু জল না হলে হাত ধোব কী করে ?' সরিৎশেখর অবাক।

অনিমেষ এক ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে সেটা আবার সরিৎশেখরের কাছে নিয়ে এল। ব্যাপারটা দেখে সরিৎশেখর হতভম্ব হয়ে গেলেন, 'তুমি খাওয়ার জলে শৌচ কর নাকি আজকাল ? ছি ছি!'

অনিমেষ বলল, 'আপাতত এই জলে কাজ মিটিয়ে নিন, আমি ভাল করে ধুয়ে রাখব।'

ঘরে ঢুকে সরিৎশেখর বললেন, 'শিক্ষা মানুষকে এমন নোংরা করে ভাবতে পারি না। তোমাকে এতদিন আমি কী শেখালাম!'

অনিমেষ বলল, 'এখানে আমি একা কী করব ? যেমন পরিবেশ তেমন ভাবেই চলতে হচ্ছে।'

'তোমরা হোস্টেলের মালিককে বলো না কেন ?'

'কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না দাদু।'

'বাঃ, চমৎকার। সভ্য সমাজের মিনিমাম প্রয়োজন সম্পর্কেও তোমরা এত উদাসীন ? মাঝরাতে পেট খারাপ হয় না কারও ?' সরিৎশেখর কড়া চোখে নাতিকে দেখলেন।

'আপনি এ রকম পরিবেশে তো কখনও থাকেননি তাই চোখে লাগছে। কলকাতা শহরের লোক এ সবে অভ্যস্ত।' জবাবদিহি করার ভঙ্গিতে বলল অনিমেষ। কিন্তু বলার সময়েই সে বুঝতে পারছিল দাদু তার এ সব কথায় কোনও আমল দেবেন না। বাথরুমে এই, পায়খানায় ঢুকতে গেলে দাদু যে কী কাণ্ড করবেন ভাবতেই শক্ত হয়ে গেল। আসলে এ সব খামতি নিজের চোখে ঠেকেনি কিংবা ঠেকলেও পাত্তা পায়নি।

সরিৎশেখর বললেন, 'এই ঘরে তুমি থাকো ?'

অবাক হল অনিমেষ। এ কী রকম কথা ? অন্যের ঘরে কি সে দাদুকে থাকতে বলবে ? তবু স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে ঘাড় নাড়ল।

'এ ভাবে তোমার থাকতে ইচ্ছে করে ?'

অনিমেষ ঘরটার দিকে তাকাল। রোজ দেখে অভ্যস্ত চোখে ঘরটা একই আছে। সে বলল, 'এই ঘরটাই সবচেয়ে নিরিবিলি।'

'আমি সে-কথা বলছি না। বিছানার চাদরটা ক' মাস কাচোনি ? বালিশের ওয়াড়টার চেহারা দেখেছ ? ওখানে মুখ রাখতে তোমার প্রবৃত্তি হয় ? বইপত্তর স্তূপ করে ছড়ানো, এখানে ওখানে জামা ঝুলছে, দেওয়ালে ঝুল। একটা মানুষের রুচি তার শোয়ার জায়গায় ফুটে ওঠে। তাই না?' সরিৎশেখর নিজের ঝোলাটা এগিয়ে দিলেন, 'এতে একটা চাদর আছে, তাই পেতে দাও।'

অনিমেষ খুব অসহায় বোধ করছিল।

সে যতটা সম্ভব গোছগাছ করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও দাদু এগুলো আবিষ্কার করলেন। বিছানার চাদর তার দুটো, আর একটা সেট বালিশের ওয়াড় ধোব ধোব করে ধোওয়া হয়নি। অনিমেষের চোখে এগুলো তেমন নোংরা নয়। এ হোস্টেলেরই অনেক ছেলে আছে খুব সাজগোজ করে থাকে। এমনকী ফুলদানি এবং ধূপ জ্বালার শখও আছে অনেকের। ওরকম মেয়েলি স্বভাব অনিমেষ রপ্ত করতে পারেনি।

মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে দাদুকে শুইয়ে দিয়ে অনিমেষ বলল, 'আপনি একটু বিশ্রাম নিন, আমি ঘুরে আসছি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আজ তো তোমাকে ক্লাশ করতে দিলাম না, সন্ধেবেলায় পড়তে বসবে না ?'

কথাটা শুনে অনিমেষের মজা লাগল। কলকাতায় আসার পর তাকে কেউ পড়তে বসার কথা বলেনি। অথচ ওই একটা কথায় দাদু সমস্ত ছেলেবেলাটাকে সামনে এনে দিলেন। এই মানুষই সন্ধেবেলায় চিৎকার করে না পড়লে এমন শাসন করতেন যে অনিমেষ তটস্থ থাকত। দাদুকে সে এখন কী করে বোঝাবে যে পড়াশুনো ব্যাপারটা সময় মেপে করার অভ্যেসটা আর নেই প্রয়োজনমতো সেটা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

BanglaBook.org

অনিমেষ মুখে কিছু বলল না। হাত বাড়িয়ে সরিৎশেখরের কপাল স্পর্শ করে বলল, 'নাইন্টি নাইনের বেশি হবে না। এখন চুপ করে শুয়ে থাকুন। অনেক কথা বলেছেন। আমি ডাক্তারকে রিপোর্ট দিয়ে আসি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'বড্ড কড়া ওষুধ এনেছ, মাথা ঝিমঝিম করছে।'

অনিমেষ বলল, 'ডাক্তারকে বলব।'

ঘরের দরজা ভেজিয়ে সে ভাবল তমালকে একবার খোঁজ করবে কি না। বুড়ো মানুষটাকে একদম একা রেখে যেতে মন চাইছে না। তারপর মত পালটাল। এই সন্ধেছোঁয়া সময়টা কোনও জোয়ান ছেলে হোস্টেলে পড়ে থাকে না। আর থাকলেও তাকে এক অসুস্থ বৃদ্ধের সঙ্গে জোর করে বসিয়ে রেখে যাওয়া অন্যায় হবে। তমাল নিজে আজ সকালে যা করেছে তাই অনেক।

নীচের গেটে সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই প্রবীণ অধ্যাপকটির ওপরে যদিও হোস্টেলের দায়িত্ব কিন্তু কোনও ব্যাপারে নাক গলান না। এমনকী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছেলেদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রতি মাসে একজন করে ম্যানেজার ঠিক করে দেন, সেই চালায়। দাদু ওর ঘরে আছেন এই খবরটা নিজে থেকে ভদ্রলোককে দেওয়া উচিত, যদিও এরকম চালু আইনটা কেউ বড় একটা মানে না। অনিমেষকে দাঁড়াতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে? ও হ্যাঁ, তোমার ঘরে একজন অসুস্থ বৃদ্ধ এসেছেন শুনলাম। তিনি কে হন তোমার?'

'আমার ঠাকুরদা।'

'কেমন আছেন এখন?'

'ভাল।'

'ওঁর তো এখানে থাকতে অসুবিধে হবে। তোমার কলকাতা শহরে আর কোনও আত্মীয় নেই?'

'না। উনি একটু সুস্থ হলেই চলে যাবেন। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'ঠিক আছে।' ভদ্রলোক চলে যেতে অনিমেষের খেয়াল হল সারাদিনে দাদুকে জিজ্ঞাসাই করা হয়নি কী কারণে তিনি মাথা ন্যাড়া করে একা একা কলকাতায় এলেন? আশ্চর্য! সে যে কেন একটুও প্র্যাকটিক্যাল হতে পারল না আজও!

ডাক্তার চেম্বারেই ছিলেন। ভদ্রলোকের পসার খুব জমজমাট। কলকাতা শহরের মানুষের রোগ বোধ হয় লেগেই থাকে। এবং এতে ডাক্তাররা খুশিই হন। অপেক্ষারত মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে অনিমেষের মনে হল, আচ্ছা, যদি আজ এঁদের সবাই সুস্থ থাকতেন তা হলে ডাক্তারের মন কেমন থাকত? অর্থের জন্যে মানুষের মন সব সময় নিম্নগামী হয়।

সকালে যে লোকটা তাকে আটকেছিল সে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। বেশ খাতিরে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন?'

এইসব ন্যাকামো অনিমেষের সহ্য হচ্ছে না আজকাল। সে এখানে বেড়াতে আসেনি জেনেও এ ধরনের প্রশ্নের কোনও মানে আছে? বাজারের থলে হাতে দেখেও কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কী বাজারে যাচ্ছেন, তখন ন্যাকামো ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। অনিমেষ মুখে কিছু না বলে ঘাড় নাড়ল।

'পাঁচ মিনিট দাঁড়ান। ডাক্তারবাবু একজনকে চেক করছেন, মেয়েছেলে তো! বসুন না, ওখানে বসুন।' লোকটা ব্যস্ততা দেখাল।

'ঠিক আছে।' অনিমেষ ওকে এড়াতে সামনের টেবিল থেকে ম্যাগাজিন তুলে চোখ রাখল। আজ সকালে এই লোকটা তাকে পাত্তা দিয়ে চায়নি আর এখন খাতির করছে কেন? ঘরে এখন কমসেকম বারো জন লোক, সিরিয়ালি এলে ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করতে হতে পারে, অথচ লোকটা বলল পাঁচ মিনিট দাঁড়ান! তার মানে নিয়ম ভাঙবে লোকটা। তখন যদি সবাই প্রতিবাদ করে—। অনিমেষ ঠিক করল কেউ কিছু বললে সে ভেতরে ঢুকবে না। ঘন্টা দুই পরে ঘুরে আসবে।

কিন্তু ভদ্রমহিলা চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকটা যখন হাত নেড়ে তাকে ভেতরে যেতে বলল তখন কেউ আপত্তি করল না। এতকাল শুনে এসেছে অসুস্থতা মানুষকে অধৈর্য্য করে, কিন্তু এঁরা বেশ চুপচাপ।

পরিশ্রম করে ডাক্তার একটু আরাম করছিলেন সিগারেট ধরিয়ে, অনিমেষকে দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন, 'ও তুমি! কতক্ষণ এসেছ?'

'এইমাত্র।' অনিমেষ বসল না। কারণ বসার মতো সময় নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কেমন আছেন?'

BanglaBook.org

'এখন একটু ভাল। জ্বর কম কিন্তু খুব দুর্বল বোধ করছেন। ওষুধগুলো খুব কড়া বলছিলেন।' অনিমেষ বলল।

'পেচ্ছাপ হয়েছে?'

'একবার, বিকেলে।'

'শোনো ওঁর বয়স হয়েছে। আজ যদি জ্বর চলে যায় তো ভাল কিন্তু আবার যদি আসে তা হলে তুমি ম্যানেজ করতে পারবে না। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি তো আছেই, মনে হয় ক'দিন কিছু খাননি। আবার যদি জ্বর আসে ব্লাড আর ইউরিন পরীক্ষা করিয়ে নেবে। প্রেসক্রিপশনটা দাও।' হাত বাড়ালেন ডাক্তার।

অনিমেষ পকেট থেকে কাগজটা বের করে এগিয়ে দিতে তাতে খস খস করে কয়েকটা শব্দ লিখে ফেরত দিলেন, 'দুটো ওষুধ চেঞ্জ করে দিলাম। আজ রাত্রে হরলিক্স আর সন্দেশ দেবে; দুধ সহ্য নাও হতে পারে। কাল যদি জ্বর না থাকে এই ফুডগুলো দেবে। ঠিক আছে।' মাথা নেড়ে ওকে বিদায় করতে চাইলেন ডাক্তার।

অনিমেষ ওষুধগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে ভাবছিল, যেগুলো সকালে কেনা আছে সেগুলো কী করবে জিজ্ঞাসা করা উচিত কিনা! কিন্তু কথা না বাড়িয়ে সে দরজার দিকে ফিরতেই শুনল, 'হোস্টেলে কোনও বৃদ্ধ রোগীর দেখাশোনা হয় না। ওঁকে অন্য কোথাও শিফ্‌ট কর। আর আমার চেম্বারে একটা ফোন আছে। এ ভাবে হুটহাট চলে আসার চেয়ে টেলিফোনে কথা বললে ভাল হয়।'

কথাটা চুপচাপ শুনল অনিমেষ। অন্যায় কিছু বলেননি ডাক্তার। অন্য সময় সে কী করত বলা যায় না, এখন মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকেছে। আজ সকালে ওষুধপত্র কিনতে বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে। বাবা যে টাকা পাঠান তাতে সব খরচ মিটিয়ে সামান্যই নিজের জন্যে থাকে। এখানে আসার পর কোনও বড় রকমের অসুখ-বিসুখ করেনি তার, বাড়তি খরচের প্রশ্ন ওঠেনি। অনেকে বাড়ি থেকে পাঠানো টাকার কিছু কিছু প্রতি মাসে জমিয়ে রাখে। অনিমেষের ক্ষেত্রে সে কথা ওঠে না।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে সামনের ওষুধের দোকানে গিয়ে প্রেসক্রিপশনটা দেখাতে আরও কিছু টাকা চলে গেল। তার কাছে বড় জোর কুড়িটা টাকা পড়ে আছে। মাসের একেবারে শেষ হলে দুটো টাকাও থাকত না। অনিমেষ ভাবছিল, দাদু নিশ্চয় বেশিদিন থাকবেন না। কিন্তু বাকি মাসটা কীভাবে চালাবে! বাবার কাছে নতুন করে টাকা চেয়ে চিঠি দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু চিন্তা করতে গিয়ে অনিমেষ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে থতমত হয়ে গেল। পৃথিবীতে তার যদি সবচেয়ে আপন বলে কেউ থাকে তা হলে সরিৎশেখর। ছোটবেলায় এই মানুষটিকে ঘিরে সে কত রকমের স্বপ্ন দেখত। বাবা, ছোটমা কিংবা পিসিমা হেমলতাও সেই স্বপ্নের ধারেকাছে আসতে পারেননি কখনও। আর আজ অসুস্থ সরিৎশেখর মাত্র একটা দিন তার কাছে এসে ওঠায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। অনিমেষ নিজেকে শাসন করল। দাদু এত জায়গা থাকতে তার কাছে এসে উঠেছেন এটাই ভাগ্যের কথা। তাঁর জন্যে যদি খরচ হয় তো হোক। নিজের কাছে না থাকলে হোস্টেলের ছেলেদের কাছে ধার করলে চলবে। আর কেউ না থাক পরমহংস আছে। টিউশনির টাকা জমিয়ে রাখে ও। চাইলে নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু এ ঘটনা থেকে একটা সত্য খুব জোরালো হল অনিমেষের কাছে। না, আর ঢিলেমি নয়, এবার কিছু টাকা রোজগার করতেই হবে। টিউশনির কপাল সবার থাকে না। তা ছাড়া অন্য লোকের বাড়ির মর্জি মতন পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

হাতিবাগানের মোড়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিল অনিমেষ। এখন, এই সন্ধেবেলায় বেশ ভিড় হয়। মেয়েরাই কেনাকাটা করতে অথবা দোকান দেখতে বেরিয়ে পড়েছে। অনিমেষের এ সব দিকে খেয়াল ছিল না। কিছু একটা গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে গেলেই এ রকম হয়। আশেপাশের সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। ওই অবস্থায় মনে হল কেউ যেন তাকে ডাকছে। তারপর আচমকা কারও হাতের ঝাঁকুনিতে ও সজাগ হল। চমকে যাওয়া ভাবটা সামলে পেছনে ফিরে ও সত্যি অবাক হল।

'তুমি কী তোমার মধ্যে ছিলে? কী ভাবছিলে এত?'

'একী সারপ্রাইজ সুবাসদা। কোত্থেকে এলে?'

'বেলগাছিয়ায় গিয়েছিলাম। ট্রাম থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে নেমে এলাম। তখন থেকে নাম ধরে চেঁচাচ্ছি কোনও সাড়া নেই। অসুখ-টসুখ আছে নাকি?'

অনিমেষ লজ্জা পেল, 'না না। আসলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম এই আর কি। আঃ, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু তুমি যে কলকাতায় আছ তাই জানতাম না। বিমানদা

BanglaBook.org

বা সুদীপ—কেউ তো বলেনি।'

'বলেনি, হয়তো বলতে ইচ্ছে হয়নি কিংবা ভুলে গেছে।' সুবাস যেন হাসল।

কথাটা কেমন বেসুরো লাগল কানে, অনিমেষ বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সব কথা না বোঝাই ভাল। অনেক সময় বুঝতে না চাইলে উপকার হয়। তার চেয়ে চলো আমরা একটু চাই খাই। সেই বিকেল থেকে ঘুরছি, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ওই তো একটা চায়ের দোকান, চলো।' সুবাস অনিমেষের হাত ধরে রাস্তা পার হবার জন্য এগোল।

সুবাসদার কথাবার্তা একটু অন্যরকম। অনিমেষের মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে। সুবাসদাকে ওর ভাল লাগে। বলতে গেলে কলকাতায় পা দিয়েই সুবাসদার সঙ্গে তার যোগাযোগ। বোধ হয় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে সেদিন বাঁচিয়েছিল সুবাসদা। লোকটা খুব চাপা এবং কারও ব্যাপারে নাক গলাতে ভালবাসে না।

কিন্তু এখন চায়ের দোকানে বসলে হোস্টেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। যদিও এর পরে দাদুকে ওযুধ দিতে হবে রাত দশটা নাগাদ তবু অতক্ষণ একা একা থাকতে ওঁর অসুবিধে হতে পারে। কাউকে বলেও আসা হয়নি। দেরি করে হোস্টেলে ফিরলে দাদু অসন্তুষ্ট হবেন। ভাববেন এই রকম সময়ে ফেরা ওর নিয়মিত অভ্যেস।

রাস্তা পার হতে হতে অনিমেষ মনে মনে হেসে ফেলল। স্কুলে পড়ার সময় দাদুর ভয়ে সন্ধের আলো জ্বলবার আগেই খেলার মাঠ থেকে দৌড় শুরু করত বাড়িতে ফেরার জন্যে। আলো জ্বলে গেলে বুক ধড়াস ধড়াস করত শাস্তি পাওয়ার ভয়ে। সেই ব্যাপারটাই যেন এতদিন বাদে কলকাতায় তার কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু সুবাসদাকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারত সে ডাক্তারের দেখা পেয়েছে স্বাভাবিকভাবে দু'ঘণ্টা অপেক্ষার পর। তা হলে তো সেই দেরি হতই যার জন্যে কিছু করার ছিল না তার। মনে মনে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল অনিমেষ। অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি করে ফিরলেও ম্যানেজ করা যায়।

রেস্টুরেন্টে বেশ ভিড়। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দুটো বসার জায়গা জোগাড় করল ওরা। একই টেবিলে অন্য লোক রয়েছে। তারা যে কথা বলছে তা স্বাভাবিকভাবে এমন চেঁচিয়ে বলার নয় তবু অনর্গল বলে যাচ্ছে। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ করেছে অনিমেষ। ট্রামে বাসে মানুষেরা এমন স্বচ্ছন্দে পারিবারিক গল্প করে যে মনে হয় সেখানে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। ট্রাম-বাসের ঠাস ঠাস ভিড় যেন নির্জন গাছের মতো।

দুটো চা বলে সুবাসদা নিচুগলায় বলল, 'এখন কী করছ?'

কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না অনিমেষ। ছাত্র হিসেবে তার এখন পড়াশুনা করার কথা। তবু এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই অকারণ নয়। ইঙ্গিতটা অনুমান করলেও এড়িয়ে গেল অনিমেষ। মুখে কিছু না বলে হাসল।

সিগারেট ধরিয়ে সুবাসদা বলল, 'তোমাদের ইউনিয়নের কাজকর্ম কেমন চলছে?'

'ভালই। আসলে ছাত্রদের দাবিদাওয়া নিয়ে মাঝে মাঝে ভি সি-র কাছে যাওয়া আর শ্লোগান দেওয়া ছাড়া ইউনিয়নের কাজকর্ম আর কী আছে বলুন?'

দিয়ে-যাওয়া-চায়ে চুমুক দিল অনিমেষ। দিয়ে মনে পড়ল আজ বিকেলে তার চা খাওয়ার কথা খেয়ালই ছিল না।

'তুমি পার্টির অফিসে যাচ্ছ না?'

'দু' তিন দিন গিয়েছিলাম; ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না, আমি বোধ হয় গায়ে পড়ে আলাপ করতে পারি না—তাই।'

'কয়েকদিন আগে পুলিশের গুলিতে দু'জন কমরেড খুন হয়। তোমরা এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট করেছিলে, কেমন হয়েছিল?'

'সাকসেসফুল। আসলে এ সব ছুতো পেলে ছাত্ররা ক্লাশে ঢোকার দায় থেকে বাঁচে, তা সে যেই ডাকুক না কেন!' অনিমেষ বলল।

'কিন্তু ধর্মঘটটা করলে কেন?'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল, 'মানে?'

'কত লোক তো প্রতিদিন খুন হচ্ছে সেজন্যে তো তোমরা ধর্মঘট করছ না! এই সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবী খুন হলেন, তোমরা কোনও প্রতিবাদ করনি, এখন করলে কেন?'

অনিমেষ সুবাসদার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্থটা ধরতে চেষ্টা করল কিন্তু বিফল হল। সে বলল,

BanglaBook.org

'এ তো সোজা কথা। যে দু'জন মারা গেছে তারা পার্টির লোক আর আমাদের ছাত্র সংগঠন সেই পার্টির মতবাদে বিশ্বাস করে তাই প্রতিবাদ জানানো দরকার ছিল।'

'বেশ বেশ, আমি এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম। ছাত্ররা এখন আর দেশের বৃহত্তম শক্তি হিসেবে কেন গণ্য হবে না সে সন্দেহ কেউ করবে না। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ছাত্র সংস্থা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থা অনুসরণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে ছাত্র সংস্থাগুলো রাজনৈতিক দলের একটা শাখা। তাই তো?'

'এ কথা সবাই জানে সুবাসদা। তুমি কী বলতে চাইছ?'

'পার্টি যদি ভুল করে এবং সেই ভুলটা ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেয় তা হলে তুমি কি সেটা সমর্থন করবে?' অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল সুবাস সেন।

অনিমেষ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'তা কেন? পার্টি যদি ভুল করে তা হলে সেটা দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করা উচিত।'

'কিন্তু নেতারা যদি জেনেশুনে ভুল করেন, তা হলে?'

'তা কেন করবে?'

'করবে এবং করছে। এটাও এক ধরনের রাজনীতি।'

'কী করে সম্ভব সুবাসদা! প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। না হলে একটার সঙ্গে আর একটার কোনও পার্থক্য থাকবে না। নেতারা যদি সেই আদর্শ মানতে না চান তা হলে তার প্রতিবাদ দল থেকেই উঠবে। যারা কর্মী, তারা চুপ করে থাকবে কেন?'

'চুপ করে থাকবে স্বার্থের জন্যে।'

'না, এ কথা আমি মানি না।'

'আমি মানি।'

'কারণ?'

'কারণ এই প্রতিবাদ করার জন্যে আমাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যে ক'জন বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলাম তারা ছাড়া আর কেউ একটা কথা বলেনি। এমনকী আমাদের ওপর যে আচরণ করা হল তার সমালোচনা করার সাহস কেউ করেনি।'

অনিমেষ হতবাক্ হয়ে গেল। সুবাসদাকে দল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে? সেই সুবাসদাকে? যে এতগুলো বছর দলের জন্যে প্রাণপাত করে গেল, নিজের ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে বীরভূমের গ্রামে দলের হয়ে কাজ করে বেড়াল, তাকে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল অনিমেষের। কোনও রকমে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হয়েছে এই ব্যাপারটা?'

সুবাসদা হাসল, 'মাসখানেক। তুমি জানতে না দেখে অবাক হচ্ছি।'

'না আমি জানি না। বিমানদারা জানে?'

'অবশ্যই। ওরাই তো সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আমাকে তাড়ানোর ব্যাপারে। দ্যাখো, বিধান রায় মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের নেতারা যেন গন্ধ পাচ্ছেন একদিন মন্ত্রিত্বটা দলের হাতে আসবে। তারপর থেকে সবার চালচলন মতামত দ্রুত পালটে যাচ্ছে। এটাই হল সবচেয়ে দুঃখের কথা। এখন কেউ কাউকে চটাতে চায় না। চোখ বুজে অন্যায় এড়িয়ে যাচ্ছে সবাই।'

'তোমাদের কী কারণে এক্সপেল করা হল?'

'পার্টির বর্তমান কার্যধারার সমালোচনা করেছিলাম। মুখে যা বলা হয়েছিল কাজে তা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন গ্রামে থেকে ওখানকার মানুষগুলোর কাছে ক্রমশ প্রতারক হয়ে যাচ্ছি। কমিউনিজমের প্রথম কথাই হল মানুষের সমানভাবে বাঁচার অধিকার আদায় করতে হবে। অথচ দলের মধ্যে ছোটখাটো হিটলারের ছড়াছড়ি। নিঃস্ব মানুষের পার্টি কখনও জোতদারের ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না। গত কুড়ি বছরে পার্টির নেতারা কতগুলো ফাঁকা বুলি আওড়ে যাচ্ছে যেগুলোর বাস্তব রূপায়ণের কোনও চেষ্টা এ দেশে হয়নি। এ দেশের কমিউনিজম তাই একটা হাওয়ার বেলুনের মতো, ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমরা বলেছিলাম নতুন রক্ত চাই নেতৃত্বে। যে মানুষগুলো এতগুলো বছরে দলকে সুনির্দিষ্ট পথে চালাতে পারল না তাদের সরে যেতে হবে। এর ফল একটাই হল এবং আমরা জানতাম, আমাদেরই সরে যেতে হয়েছে।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু এ রকম করলে দল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। যত ভাঙন হবে তত শত্রুপক্ষ উৎসাহিত হবে।'

'শত্রুপক্ষ? আমরাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

Banglabook.org

'কিন্তু—।'

'শোনো, কমিউনিস্ট পার্টির দুটো ভাগ হল কেন ? চিনা সমস্যা ? মোটেই না। তুমি কি জানো, হোম মিনিস্টার যখন রেডিয়োতে ঘোষণা করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির একটা শাখা এই দেশে সশস্ত্র বিপ্লব আনতে চায় চিনের স্বার্থে তখন আমাদের প্রধান নেতা কী বলেছিলেন তাকে ? সেই সকালে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন আমরা কমিউনিস্টরা আইনসম্মত গণতান্ত্রিক কার্যধারায় বিশ্বাস করি। কোনও রকম সশস্ত্র বিপ্লবের ধারেকাছে আমরা নেই। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা হলে দল ভাগ হল কেন ? কমিউনিস্ট পার্টির ডান-বাম যদি একই পথে চলে তা হলে আলাদা হাঁড়ি করতে হল কেন ? সেটা নেতৃত্বের গোলমাল না আদর্শের সংঘাত তা এখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।'

সুবাসদা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। রেস্টুরেন্টের অনেকেই এ দিকে এখন তাকাচ্ছে। এমনকী সামনের লোক দুটোও। সেটা বুঝতে পেরে সুবাসদা উঠে দাঁড়াল। দাম মিটিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো এখনও মানিকতলায় আছ, তাই না ?'

অনিমেষ বলল, 'না। আমি এই গ্রে স্ট্রিট-হরি ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ের হোস্টেলে এসেছি। আসবে ?'

'আজ থাক। তোমাকে আমার দরকার। ব্যাপারটা ভাবো। এ সব কথা এখনই কাউকে বলার দরকার নেই। আমি শিগগিরই দেখা করব।'

'কী করছ সুবাসদা ?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের এখন কী করা উচিত তাই ভাবছি অনিমেষ।'

আঠার

হোস্টেলে ফিরে এসে অনিমেষ দেখল ওর ঘরে বেশ ভিড়। তমাল আর পাশের ঘরের দুটি ছেলে বেশ মেজাজে আড্ডা জমিয়েছে দাদুর সঙ্গে। সরিৎশেখর ডুয়ার্সের পুরনো দিনের গল্প বলছেন। তমাল চেয়ারে বসেছে আর দু'জন জানলার কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

অনিমেষ দরজায় দাঁড়াতেই বিছানায় বসা সরিৎশেখরের নজর পড়ল প্রথম, কথা থামিয়ে বললেন, 'এখানে ডাক্তারকে বোধ হয় সহজে পাওয়া যায় না!'

অনিমেষ হেসে ঘাড় নাড়ল। দাদুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে হলে এ প্রশ্নটা করতেনই না। দেরি হলে বকাঝকা করে বাড়ি মাথায় করতেন। হঠাৎ অনিমেষের মনে পড়ল এই লোকটার ভয়ে এককালে স্বর্গছেঁড়ায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। অনিমেষ ওষুধগুলো টেবিলে রাখল, 'এখন শরীর কেমন আছে ?'

'ভাল, বেশ ভাল। এই যে তোমার বন্ধু আমাকে সন্দেশ খাওয়াল, চমৎকার খেলাম।' ফোকলা মুখে হাসলেন সরিৎশেখর।

তমাল অনিমেষকে বলল, 'দাদুর কাছে তোমাদের ওখানকার গল্প শুনছি। দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। চা বাগান কী করে পত্তন হল তার জীবন্ত সাক্ষী দাদু। আমরা তো সেই 'দুটো পাতা একটি কুঁড়ি' থেকেই যেটুকু জেনেছি।'

অনিমেষের এত ভিড় ভাল লাগছিল না। একেই ঘরটা ছোট তার ওপর এত লোক একসঙ্গে হলে ভাল করে দাঁড়ানো যায় না। সে বলল, 'বাবাকে চিঠি দেওয়া হল না। ভাবছি কাল সকালে একটা টেলিগ্রাম করে দেব!'

'হোয়াই ?' সরিৎশেখরের ভুরু কুঁচকে গেল।

অনিমেষ দাদুর দিকে তাকাল। এ রকম প্রশ্ন কেন ? উনি এই অবস্থায় অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছেন এ খবর জানানোয় অন্যায়টা কী ? 'বাবা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছেন!'

'আমার মনে হচ্ছে চিন্তাটা তোমারই বেশি হচ্ছে। তা ছাড়া তোমার টেলিগ্রাম যাবার আগেই আমিই পৌঁছে যাব। ও সব করতে যেয়ো না।' সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন।

'আপনি পৌঁছে যাবেন মানে ?'

'আমি ঠিক করেছি কাল নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে চলে যাব।'

'সেকী! এই শরীর নিয়ে আপনি যাবেন কী করে! পথেঘাটে কিছু হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। শরীর ঠিক করে তারপর যাবেন।' অনিমেষ খুব অসন্তুষ্ট গলায় বলল। যে লোকটা সকালবেলায় ওরকম ধুঁকেছে সেই সন্ধেবেলায় এ রকম কথা বলছে ?

BanglaBook.org

সরিৎশেখর হাসছিলেন, 'আমার শরীরকে আমার চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই কেউ বুঝবে না। যেটুকু দুর্বলতা আছে তা বয়সটার জন্যে। জলপাইগুড়িতে ফিরে গেলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে।'

এতক্ষণ ওরা চুপচাপ কথা শুনছিল। এবার তমাল বলল, 'কিন্তু দাদু, আরও দু-তিন দিন থেকে গেলে দোষটা কী। শরীর ফিট হয়ে গেলে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর ঘুরে পুজোটুজো দিয়ে তবে যান। আমাদের কাছে যখন এসেছেন তখন তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেনই বা কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'বেঁচে থাকি যদি নিশ্চয়ই আবার আসব ভাই, অনিমেষ চাকরি-বাকরি করে ঘরদোর করুক তখন এসে থাকব। এখন এই খাঁচায় আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব।'

'খাঁচা?' অনিমেষ অবাক হল।

'খাঁচা নয়! স্বর্গে আছি পাতালে যেতে হবে পায়খানা করতে। তাও যদি একই সঙ্গে কয়েকজনের প্রয়োজন হয় তা হলে লাইন দিতে হবে সেখানে। আমি মনে করি মানুষের শোয়ার ঘর আর পায়খানা একই রকমের আরামদায়ক হওয়া উচিত। তার ওপর এই রকম কানের কাছে দিনরাত ট্রামের ঢং ঢং আওয়াজ অসহ্য।' সরিৎশেখর মুখ বেঁকালেন।

অনিমেষ হেসে বলল, 'তা হলে বুঝুন আমি—আমরা কী রকম আরামে থাকি!'

সরিৎশেখর উত্তেজিত হলেন, 'এটা তোমাদের কী দুর্ভাগ্য তোমরা বুঝছ না। একটি ছাত্রকে যদি ন্যায্য পয়সা দিয়েও এই রকম নরকে থাকতে হয় তা হলে তার কাছ থেকে দেশ কী আশা করবে? এইভাবে তোমাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

পাশের ঘরের আর একটি ছেলে বলল, 'বিশৃঙ্খলা মানে?'

সরিৎশেখর কঠিন মুখে বললেন, 'এখন কত রাত? এই সময় প্রতিটি ছাত্রের কী করা উচিত? আর তোমরা আমার সঙ্গে গপ্পো করছ, এটা বিশৃঙ্খলা নয়?'

কথাটা শুনে ছেলেদের মুখ কালো হয়ে গেল। অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে পড়ল। দাদু যে এ রকম মুখের ওপর ওদের কথা শোনাবেন সে ভাবতে পারেনি। অবশ্য এটাই সরিৎশেখরের আসল চরিত্র। রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারেন না।

তমাল উঠে দাঁড়াল, 'আমি কিন্তু আপনার কথা মানছি না। আমরা যারা হোস্টেলে থেকে পড়ি তারা জানি আমাদের পাশ করতেই হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। নিজেদের পড়াশুনা আমরা নিজেদের সুবিধেমতো সময়ে করে নিই। আপনার কাছে যেটা পড়াশুনার সময় বলে মনে হচ্ছে সেটা আমার কাছে জিরোবার মনে হতে পারে। ধরুন সারাদিন ক্লান্তির পর ট্রামে-বাসে ঝুলে হোস্টেলে ফিরে পড়তে বসলে আমার ব্রেন তা অ্যাকসেপ্ট করবে না। অথচ দশটার পর পড়লে ওটা আমার বুঝতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কোনটা বিশৃঙ্খলা এবার বলুন?'

সরিৎশেখর কিছুক্ষণ তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বোঝা যাচ্ছিল তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। তারপর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'আমি তোমাদের ঠিক বুঝতে পারিনা। প্রায়ই কাগজে ছাত্রদের ট্রাম-বাস পোড়ানোর কথা পড়ি। তখন মনে হয় তোমরা যাতে পড়াশুনো ছাড়া সব কিছু করো তার জন্যে একটা প্ল্যান চলছে। হয়তো তোমরা ভাল ছেলে তাই এ ভাবে থেকেও একটা পথ বের করে নিয়েছ। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান নয় তারা তো তলিয়ে যাবে।'

এর পর আর কথা জমল না। দাদুর কথার সুর ওদের কানে লেগে আছে অনিমেষ বুঝতে পারছিল। এক একটা অজুহাত দেখিয়ে বা না দেখিয়ে ওরা চলে গেল। ঘর নির্জন হয়ে গেলে অনিমেষ বলে ফেলল, 'আপনি ও ভাবে না বললেই পারতেন!'

'কী ভাবে?'

'এই সরাসরি—মুখের ওপর।'

'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। তোমার কি অন্যায় মনে হচ্ছে?'

'আমরা অপ্রিয় সত্যি বলতে চাই না।'

'অপ্রিয় সত্যি!' সরিৎশেখর হাসলেন, 'তা হলে তুমি এটাকে সত্যি বলতে চাইছ?'

'হয়তো, আবার তা নাও হতে পারে। দাদু, আমরা জলপাইগুড়িতে সব কি যে-রকমভাবে দেখতাম এবং ভাবতাম, কলকাতায় এসে জানলাম সেটাই অন্যভাবে দেখা যায় বা ভাবা যায়। তাই এখানে সব কিছুই অন্য রকম। আসলে জলপাইগুড়ি আর কলকাতার পরিবেশ একদম আলাদা, সবাই পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করে নেয়।'

সরিৎশেখর নাতিকে ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, 'লন্ডনে দুপুর বেলায় বরফ পড়ে, সাহারায় আগুন জ্বলে আর কলকাতায় ঘাম হয়। কিন্তু ওই একই সময়ে তিনটে জায়গার মানুষের

BanglaBook.org

বোধগুলোর কিন্তু পরিবর্তন হয় না। থাক ছেড়ে দাও এ সব কথা। তোমার ডাক্তার কী বলল ?'

অনিমেষ ডাক্তারের কথা জানাল। সরিৎশেখর শুনে বললেন, 'ও সব আর দরকার হবে না। রাত্রে যদি ঘুম হয় তা হলেই হবে। এই বয়সে ওষুধপত্র শরীরকে কাহিল করে দেয়। তা হলে কাল সকালে আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দিয়ো।'

'আপনি কালকে যাবেনই ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন ?'

'আমার ফিরে যাওয়া দরকার তাই।'

'তা হলে ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলছেন কেন ? আমি তো স্টেশনে গিয়ে সিট রিজার্ভ করিয়ে আপনাকে বসার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার তো তাই করা উচিত।'

'কী দরকার। আমি তো এতটা রাস্তা একা একা ঘুরলাম, তুমি তো সঙ্গে ছিলে না। এখানে এসে আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম বলেই তোমাকে বিরক্ত করেছি। আবার শরীরটা ঠিকঠাক হয়ে গেলে নিজেই চলে যেতে পারব। এই জন্যে মিছিমিছি তোমার একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। কাল স্টেশনে গেলে তোমার আর একটা দিন কলেজ নষ্ট হবে। সেটা আমি চাই না।' সরিৎশেখরের গলা কেমন নিরাসক্ত লাগছিল।

অনিমেষের মনে হচ্ছিল দাদু অনেক দূরের মানুষ। সকালে দাদুকে দেখে বুকের মধ্যে যে আবেগের জোয়ার এসেছিল তা এই মুহূর্তে নিঃসাড়। এই মানুষটার বুকে হামাগুড়ি দিয়ে ওর শৈশব কেটেছে। রিটায়ার করে যখন সরিৎশেখর স্বর্গছেঁড়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে জলপাইগুড়িতে চলে এলেন তখন সে সাত-আট বছরের বালক, বাবা-মাকে ছেড়ে ওঁর সঙ্গ ধরেছিল। স্কুলের ক্লাশগুলো একটা একটা করে ডিঙিয়েছে এই মানুষটার কড়া নিয়মের মধ্যে থেকে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে সরিৎশেখরকে কোনওদিন চিনতে পারেনি। এ কথা ঠিক, এরকম ঘরে থাকার অভ্যেস দাদুর নেই। হোস্টেলের বারোয়ারি ব্যবস্থায় দাদুর অসুবিধে হবে। কিন্তু তা হলেও এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছে না অনিমেষ। হঠাৎ তার খেয়াল হল দাদু কোথায় গিয়েছিলেন, কেন গিয়েছিলেন তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু বলবে ?'

নিচু গলায় অনিমেষ বলল, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'গয়া।'

'গয়া ? গয়াতে কেন ?'

'শ্রাদ্ধ করতে।'

'কার শ্রাদ্ধ?'

'আমার নিজের।'

স্তব্ধ হয়ে গেল অনিমেষ। সরিৎশেখরের মুণ্ডিত মস্তকে গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা চুলের আভাস হঠাৎ তার চোখে কেমন অপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছিল। কোনও মানুষ জীবিত অবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধ করে আসছে এটা কল্পনাতেও ছিল না তার। বিশেষ করে সেই লোক যিনি বৃদ্ধ বয়সেও ধর্মকর্ম মানেননি, দীক্ষাটিক্ষা নেননি। যা সত্যি মনে হয়েছে তাই করেছেন, আপোস করার জন্যে কোনও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। সে কোনও রকমে বলতে পারল, 'আপনি এমন করলেন কেন ?'

'তোমার খারাপ লাগছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'আমি আপনাকে—!' অনিমেষের কণ্ঠে আবেগের প্রাবল্য হল। সে কোনও রকমে বলতে পারল, 'শ্রাদ্ধের পর মানুষের জাগতিক সুখ দুঃখ—।'

'রাইট।' সরিৎশেখর সোৎসাহে ঘাড় নাড়লেন, 'ঠিক বলেছ। আমি এখন এক অর্থে মৃত। কিছুদিন থেকে ব্যাপারটা ভাবছিলাম। সারা জীবন ধরে আমি অনেক কিছু করেছি। একজন সাধারণ মানুষের যা যা করা উচিত সব। ইদানীং আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। খেতে ভালবাসতাম খুব, আজকাল শরীর খাবার নিতে পারে না। তোমার পিসিমা চাল ডাল গলিয়ে একটা পিণ্ডির মতো করে দেয় তাই আধ ঘণ্টা ধরে গলায় ঢালি। গিলতেও কষ্ট হয়। যতদিন নিজের শক্তি ছিল ততদিন কারও পরোয়া করিনি। কিন্তু অথর্ব হওয়া মাত্র অন্যের করুণা প্রত্যাশা করা ছাড়া আর কিছুই অসম্ভব। অর্থ

BanglaBook.org

কষ্ট বড় কষ্ট অনিমেষ। আমার মতো মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন সেটা অভিশাপের মতো মনে হবে। তোমার বাবা আমাকে টাকা দেয়। দু-তিন দিন দেরি হলে মনে হয় সে আমাকে অবহেলা করছে। এই মনে হওয়াটা থেকে আমাকে কে উদ্ধার করবে! যেহেতু সংসারে আছি তাই অথর্ব হলেও লোভ মোহ ক্রোধ থেকে আমার মুক্তি নেই। এগুলো যত থাকবে তত আমি জর্জরিত হব। ক'দিন আগে তোমার জ্যেঠামশাই সস্ত্রীক আমার কাছে চলে এল। অত্যন্ত জীর্ণদশা তার। খেতে পায় না। এসে এমন ভাব দেখাল যেন আমার সেবা না করলে তার ইহকাল নষ্ট হয়ে যাবে। যে ছেলেকে এককালে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম, বারংবার যার ছায়া আমি এড়িয়ে চলেছি তাকেই আমি মেনে নিলাম। আমি বুঝতে পারছি আমাকে সেবা করার নাম করে সে আমারই অন্ন ধ্বংস করতে চায়। আমি মরে গেলে ঘরবাড়ির দখল নিতে চায় তবু আগেকার সেই শক্ত ভাবটা কোথায় চলে গেল আমার। আমাকে সে তেল মালিশ করে দেয়, হাতে ধরে কালীবাড়ি নিয়ে যায়, এই বৃদ্ধ বয়সে আর একা থাকতে হয় না আমাকে, এটাই আমার কাছে এত বড় যে আমি তার অতীতের সব অন্যায় ভুলে যেতে পারলাম। তোমার বাবার সেটা পছন্দ হল না। এককালে যে আমাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, আমার সম্মান পাঁচজনের কাছে লুটিয়ে দিয়েছিল, আবার তাকে আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি সেটা সে মানতে পারছিল না। অনিমেষ, নিজে উপলব্ধি করলাম, যখন রক্তের জোর চলে যায় তখন মানুষ খুব লোভী হয়ে পড়ে। নিজেকে আমি এককালে যতটা কঠোর ভাবতাম এখন আবিষ্কার করলাম আমি আদপেই তা নই। শুধু জেদের বশে অন্য রকম চলার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই সময় তোমার পিসিমা বলল, সে নাকি শুনেছে—ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে আমি চলে গেলেই বাড়িটা পেয়ে যাবে। কবে যাব তাই চিন্তা। মুহূর্তেই আমি অন্য রকম হয়ে গেলাম। সেই দিনই ওদের আবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। যাওয়ার সময় আমার মুখের ওপর অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে গেল ওরা। পরে মনে হল এ রকমটা কেন আমি করলাম? ওই বাড়িটাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বলেই কি ওটা নিয়ে কোনও লোভ সহ্য করতে পারলাম না? তা হলে ভালবাসাটা তো একটা লোভেরই অন্য পিঠ। হঠাৎ মনে হল পৃথিবীতে যে ক'টা দিন একটা মানুষের বেঁচে থাকা দরকার তার থেকে অনেক বেশি দিন আমি বেঁচে আছি। দীর্ঘজীবন বড় অভিশাপের!' এক নাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন সরিৎশেখর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'পিছু টান মুছে ফেলব ঠিক করলাম। এক রাত্রে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলাম গয়া। আমার মৃত্যুর পর লোকে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে আর লোকজনকে ডেকে খাওয়াবে এটা সহ্য হবে না। নিজের পাট নিজেই চুকিয়ে দিয়ে এলাম। এখন নিজেকে অন্য রকম মনে হচ্ছে। যেন আকাশ থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখার মতো মজা লাগছে। তোমার বন্ধুরা আমাকে দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাট দেখার কথা বলেছিল। ও সব জায়গায় যাবে যারা আমি তো তাদের দলে নই। আমার তো সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন যে ক'দিন থাকব চোখ চেয়ে দেখব আর কান খুলে শুনব। কিন্তু এই দেখা বা শোনা আমার মনে কোনও রেখাপাত করবে না। মানুষ বেঁচে থাকে আশা নিয়ে। আমি সেই ইচ্ছেটুকু গয়ায় রেখে এসেছি। জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি কারণ আমাকে এখনও কিছুদিন এই শরীরটাকে টানতে হবে। তোমার পিসিমা সেই বালবিধবা হবার পর থেকে আমার ঘাড়ে আছে। সে আমাকে বোঝে।'

অনিমেষ মানুষটার দিকে অপলক তাকিয়েছিল। এখন সরিৎশেখরের ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে কেমন অন্যরকম চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ সময় নিল নিজেকে সংযত করতে। সরিৎশেখর উর্ধ্বমুখে বসে আছেন এখন। কিছুক্ষণ ঘরে কোনও শব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাত্রে কী খাবেন?'

'কিছু না। সন্দেশটা খেয়ে পেট ভার হয়েছে। তুমি বরং এক গ্লাস জল দাও।'

সরিৎশেখর উঠলেন। এখন থেকে পদক্ষেপ অনেকটা স্বাভাবিক। অনিমেষ দেখল উনি ছাদের কোনায় একা একা হেঁটে গেলেন। টেবিলে জল রেখে অনিমেষ দ্রুত বিছানাটা ঠিক করে দিল। ইচ্ছে করলে সে আজ রাতে অন্য কোনও ঘরে শুতে পারে। কিন্তু দাদুকে একা রেখে দিতে মন চাইছে না। সে একটা চাদর বিছিয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকবে বলে ঠিক করল।

রাতের খাওয়া নীচে সেরে এল অনিমেষ। এসে দেখল সরিৎশেখর চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। ঘুমুচ্ছেন ভেবে নিঃশব্দে সে মেঝেতে বিছানা করছিল নিজের, সরিৎশেখর বললেন, 'কোনও ঘরে খাট খালি নেই?'

'কেন?'

'মেঝেতে শুলে অসুস্থ হতে পারো। যদি খাট খালি থাকে সেখানে শোও।'

BanglaBook.org

'না, আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'
'তুমি কি ভাবছ একা থাকলে রাত্তিরে আমি মরে যেতে পারি ?'
'এ কথা কেন বলছেন ?'
'তুমি তো শুনলে আমার জন্যে ভাবনা করা নিষ্ফল। অবশ্য তোমার অসুবিধা হবে তেমন হলে। কিন্তু যে ছেলে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে তার এমন মন থাকা উচিত নয়।'
আচমকা ইলেকট্রিক শক খাওয়া অনুভূতি হল অনিমেষের। ও মুখ তুলতে পারছিল না। দাদু এ কথা এতক্ষণ পরে কেন বললেন ? পুলিশের সঙ্গে লড়াই তো সে কখনও করেনি। করতে যাওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতিও হয়নি। অবশ্য ক'দিন আগে ইউনিভার্সিটির সামনে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটায় সে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তাকে কি পুলিশের সঙ্গে লড়াই বলা যায় ? কিন্তু প্রশ্ন হল দাদু সে-কথা জানলেনই বা কী করে ? কলকাতায় সে এসেছে পড়াশুনা করতে। সে যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে, বামপন্থী রাজনীতিতে সে বিশ্বস্ত এবং ইউনিয়নের জন্য অনেকখানি সময় ব্যয় করে—এ সব ব্যাপার তো সরিৎশেখরের জানার কথা নয়। পরীক্ষায় ফেল করেনি মানে বাবার পাঠানো টাকার অপব্যয় হয়নি। ছুটিতে সে যখন জলপাইগুড়িতে গিয়েছে তখন চুপচাপ বাড়িতে বসে থেকেছে। তার আচরণ দেখে কারও বোঝার অবকাশ ছিল না যে সে কলকাতায় এ সব ব্যাপার করছে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল তার মুখের ওপর সরিৎশেখরের দুটো চোখ স্থির হয়ে আছে। অতএব তাকে এক্ষুনি একটা জবাব দিতে হবে। দাদুর কাছে মিথ্যে কথা বললে ছেলেবেলায় বুক কেঁপে যেত, কখনওই পারত না। সরিৎশেখরের মুখের দিকে না তাকিয়ে অনিমেষ হাসবার চেষ্টা করল, 'এ খবর আবার কোথায় পেলেন! পুলিশের সঙ্গে আমি লড়াই করতে যাব কেন ? আর সেরকম হলে আমাকে ওরা ছেড়ে দিত ?'
'তুমি কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছ এ কথা মিথ্যে ?'
'আপনি কোত্থেকে জানলেন ?'
'আগে বলো মিথ্যে কি না ?'
'কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করি মানেই পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করছি ?'
'আজ করছ না, কাল করবে, পরশু করবে।' সরিৎশেখর দৃঢ় গলায় বললেন, 'তুমি এখন ছাত্র। তোমার কর্তব্য ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করা, যোগ্য করা। তা না করে তুমি কমিউনিস্ট হয়েছ। দেশে বিপ্লব আনতে চাও ? এরকম একটা নেশায় তোমাকে ধরবে আমি চিন্তাও করিনি। যেদিন তুমি জলপাইগুড়ি থেকে প্রথম এসেছিলে সেদিন আমি তোমায় বলেছিলাম, তুমি কৃতী হয়ে ফিরে এসো, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু তোমার স্কুলের এক মাস্টার যখন আমায় বলল যে তুমি ইউনিয়ন করছ, দিনরাত পার্টি নিয়ে মত্ত আছ, আমার আর অপেক্ষা করার কোনও প্রয়োজন থাকল না। বলতে পারো এটাও একটা জাগতিক আকাঙ্ক্ষা। তোমার জন্যে একটা স্বপ্ন দেখা সেটা ভেঙে গেলে কষ্ট হচ্ছিল খুব। তা গয়া থেকে ঘুরে এসে আমার সেই কষ্টটা আর নেই। এখন তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখি না।'
'আপনি বোধ হয় একটু অতিরঞ্জিত সংবাদ পেয়েছেন। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করলেই যে একটা ছেলের ভবিষ্যতের বারোটা বেজে গেল—এ ধারণা এখন অচল।' অনিমেষ সরিৎশেখরের শেষ কথাটার কোনও গুরুত্ব দিতে চাইল না। ও চাইছিল দাদুকে কমিউনিজমের আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসে যাতে ওঁর বদ্ধ ধারণা কিছুটা পালটে দিতে পারে!
কিন্তু সরিৎশেখর সেদিকে গেলেনই না। অনিমেষের কথা শুনে চুপচাপ শুয়ে থাকলেন।
রাত বেশি হলে ট্রামের শব্দ আরও বিকট হয়ে ওঠে। আলোচনাটা উঠেও থেমে গেল বলে অনিমেষ অস্বস্তি বোধ করছিল। আগে দাদুর কাছে খোলাখুলি মনের কথা বলতে পারত সে। আজকাল সেই ইচ্ছেটা আছে কিন্তু সরলতাটুকু কখন হারিয়ে গেছে। তাই যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাতে হয়।
একসময় সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি কি এখন পড়াশুনা করবে ?'
অনিমেষ বলল, 'আজকে ভাল লাগছে না দাদু।'
'তা হলে আলোটা নিবিয়ে দাও।' সরিৎশেখর পাশ ফিরে শুলেন।
সকালে সরিৎশেখর অন্য মানুষ। একদিনের বিশ্রামের পর শরীর একটু স্থির হওয়ায় আবার আগের ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। জ্বর আসেনি আর। সেই ভোর রাতে যখন সবাই ঘুমুচ্ছে তখন অনিমেষকে ডেকে তুলেছেন। ঘুম চোখে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই সময়ে উঠছেন কেন ? অন্ধকার আছে বাইরে।'

BanglaBook.org

'দেরি নেই ভোর হবার; প্রাকৃতিক কাজকর্মগুলো সেরে নিই। আশা করি এখন লাইন পড়েনি।'

সরিৎশেখরের কথা শুনে হেসে ফেলল অনিমেষ। দাদুর মাথায় ওই একটাই চিন্তা পাক খাচ্ছে।

তখন ঠাকুর-চাকরও ওঠেনি। নির্বিঘ্নে নীচের কাজ সেরে ওপরে উঠে এসে সরিৎশেখর বললেন, 'তোমাদের বাথরুম পায়খানায় কি চব্বিশ ঘণ্টা আলো জ্বলে ? ওরকম স্যাঁৎসেঁতে হয়ে থাকে সব সময় ?'

অনিমেষ বলল, 'পুরনো বাড়ি তো, তাই আলো ঢোকে না।'

'তুমি কলকাতার জন্য উপযুক্ত হয়েছ।'

কথাটা হয়তো সরিৎশেখর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কিন্তু অনিমেষের মনে হল এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই। কলকাতায় বাস করতে গেলে কতগুলো যোগ্যতার খুব দরকার। বিবেক ভদ্রতা স্নেহ অথবা সৌজন্যের চিরাচরিত সংজ্ঞাগুলো এখানে প্রয়োজন মতো অদলবদল করে নেওয়া হয়। যে মানুষ এ সব বোঝে না তাকে প্রতি পদক্ষেপে ঠোকর খেতে হয়। অনিমেষ এই কয় বছর কলকাতা বাসের পর এ সবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া করে ফেলেছে।

এখন আকাশে প্রচুর তারা। চারধার এত বেশি চুপচাপ যে মনে হয় এটা কলকাতা নয়। ঘুমের মধ্যে শেষ ট্রাম চলে গেছে আর প্রথম ট্রাম চলার এখনও সময় হয়নি। অদ্ভুত করুণ এবং বিষণ্ণ লাগছিল আকাশ। সারারাত জ্বলার পর এই সময় রাস্তার আলোগুলো এমন হলদে হয়ে যায় কেন ? ছাদে দাঁড়িয়েছিল অনিমেষ এমন সময় সরিৎশেখর লাঠি হাতে ঘর থেকে বের হলেন। যে ময়লা পোশাকগুলো গতকাল খুলে রেখেছিলেন ঘরে ঢুকে আজ সেগুলো পরনে।

অনিমেষ এগিয়ে এল, 'এখন কোথায় যাচ্ছেন ?'

'একটু বেড়িয়ে আসি। কেন, তুমি মর্নিং ওয়াক করো না ?'

ঠোঁট কামড়াল অনিমেষ। জলপাইগুড়ির সেই দিনগুলো! বছরের পর বছর এই মানুষটা প্রত্যেক ভোরে তাকে নিয়ে হেঁটেছেন তিস্তার পাশ দিয়ে। ওটা তো অভ্যাস হয়ে যাওয়ার কথা। কথায় বলে বাল্যের অভ্যেস আমৃত্যু থাকে। কিন্তু কলকাতায় আসার পর ওটা কখনও মনেই আসেনি। এখন ভোরে বরং ঘুম গাঢ় হয়। কলকাতায় যে যত দেরিতে ওঠে সে তত প্রতিভাবান।

অনিমেষ বলল, 'সে অভ্যেসটা চলে গেছে। কিন্তু এখানে মাঠ বা নদী খুব কাছাকাছি নেই, হাঁটবেন কোথায় ?'

'কেন ? এতবড় রাস্তা আছে। গাড়িঘোড়া না থাকলে ওখানে হাঁটতে তো কোনও অসুবিধা নেই। তোমাদের সদর দরজা খোলা আছে ?'

অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না গতকাল ওরকম ধুঁকতে আসা মানুষটি এরকম তাজা হয়ে যান কী করে। সে বলল, 'না গেট বন্ধ। আপনি চলুন আমি দারোয়ানকে ডেকে তুলি।'

একটা শার্ট গলিয়ে নীচে নেমে দারোয়ানকে তুলতে একটু ঝামেলা করতে হল। এই কাকভোরে কেউ বাইরে যায় না।

ওরা বেরিয়ে গেলে দারোয়ান আবার দরজা বন্ধ করে দিল। সরিৎশেখর বললেন, 'তুমি এলে কেন ?'

শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে অনেকদিন বাদে অনিমেষের এই সময় ভাল লাগছিল। একবার ঘুম চলে গেলে এরকম কাকভোরকে খুব আপন মনে হয়। সে কোনও উত্তর না দিয়ে সরিৎশেখরের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে লাগল।

এখন পথ নির্জন। রাস্তার হলদেটে আলো ছাড়া আকাশে কোনও আয়োজন শুরু হয়নি। ফুটপাতে কিছু ঘুমন্ত মানুষ ছাড়া লোকজন দেখা যাচ্ছে না। সরিৎশেখর লাঠি ঠুকে হাঁটছেন। এখন ওঁর চলা অত্যন্ত মন্থর। এককালে যাঁর সঙ্গে সে হেঁটে তাল রাখতে পারত না এখন তাঁর সঙ্গে পা মেলাচ্ছে হাঁটি হাঁটি করে। সরিৎশেখরের যে কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে এটা বুঝতে পারল অনিমেষ। নেহাত জেদের বশেই হাঁটছেন তিনি। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনু্য ছাড়িয়ে ডান হাতি একটা পার্কের সামনে দাঁড়াল ওরা। অনিমেষ বলল, 'এখানে একটু বসবেন ?'

সরিৎশেখর স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ, বসলে একটু ভাল হত।'

পার্কে ঢুকে বিব্রত হল অনিমেষ। অনেকগুলো বেঞ্চি পার্কময় ছড়ানো কিন্তু তার একটাতেও বসার পাটাতন নেই। কেউ বা কারা সযত্নে পার্কটাকে নেড়া করে রেখে দিয়েছে। দাদুকে নিয়ে একটা বেঞ্চির কাছে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে অনিমেষ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল। এর জন্যে তার কোনও দায়িত্ব না থাকলেও মনে হচ্ছিল কলকাতার মানুষ হিসাবে সে কতগুলো লজ্জার মুখোমুখি হচ্ছে।

সরিৎশেখর বললেন, 'আর চেষ্টা কোরো না। এবারে বরং ফেরা যাক।'

খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন সরিৎশেখর। এখন ওঁর ক্লান্তি অত্যন্ত পরিষ্কার। কোনও রকে বসলে হয়। কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে না অনিমেষ।

সরিৎশেখর বললেন, 'এই ন্যাড়া মাঠটাকে তুমি পার্ক বললে ? ফুল নেই গাছ নেই এমনকী মাটিতে ঘাস নেই, বসার জায়গার কথা ছেড়েই দিলাম। কোন সংজ্ঞায় একে পার্ক বলা যায় ? তবু তোমরা বলছ। বলছ অভ্যাসে। আসল জিনিসটা কখন হারিয়ে গিয়ে তার জায়গায় নকল জুড়ে বসল কিন্তু তোমরা টের পেলে না। আশ্চর্য!'

অনিমেষ জবাব দিল না। ওর মনে হচ্ছিল দাদুর কথার কোনও প্রতিবাদ আর এই মুহূর্তে সে করবে না। তর্ক করে এই বৃদ্ধকে আঘাত দিয়ে কী হবে। একটা অনুভূতি ক্রমশ ওকে অধিকার করছিল—দাদুকে আর দেখতে পাবে না সে। ভবিষ্যতের কথা সে জানে না। হয়তো ভবিষ্যৎ তাকে অনেক কিছু দেবে। যে সব কল্পনা তার বুকে মুখ খোঁড়ে সেগুলো হয়তো সত্যিকারের চেহারা নেবে। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে সে দু'হাত ভরে পেয়েছে সেই মানুষটি অতীত হয়ে যাবেন। এতদিন পরে যে সরিৎশেখরকে সে দেখেছে তাঁর সঙ্গে অতীতের সেই চেহারার কোনও মিল নেই। যে মানুষ নিজের শ্রাদ্ধ করে এসেছেন তিনি যে কোনও মুহূর্তেই চলে যেতে পারেন। অনিমেষের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ সরিৎশেখর কথা বললেন, 'অনিমেষ, তোমার কুষ্ঠিতে আছে রাজদ্রোহের জন্য জেলবাস অনিবার্য। তুমি রাজনীতি করবেই। কিন্তু যাই করো নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে কোরো। আমি জানি না সকাল থেকে রাত্তিরে একবারও তোমার নিজেকে ভারতবাসী বলে মনে হয় কি না। চারধারে যা দেখি তাতে কেউ সে চিন্তা করে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। নেতারা রাজনীতিকে সম্বল করে ক্ষমতা দখল করছে। এই দেশে বাস করে কেউ দেশটার কথা চিন্তা করে না। একটা যুবক নিজেকে ভারতবাসী বলে ভাবে না বা তা নিয়ে গর্ব করে না। তা হলে কী জন্যে তুমি রাজনীতি করবে ? কেন করবে ? আমি ঠিক বুঝি না তোমাদের। কিন্তু মনে হয়, তোমরা নানান জিনিস দিয়ে প্রতিমা বানাও শুধু প্রতিমার জন্যে, ভক্তিটুকুই তোমাদের নেই।'

অনিমেষ নাড়া খেল। সেই সময় দূরে অন্ধকারের ফিকে আলোয় প্রথম ট্রাম চলার সাড়া পাওয়া গেল। একটা আলোর পিণ্ড থরথরিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। কান ফাটানো শব্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ড্রাইভার। চকিতে দাদুর হাত ধরে ফুটপাতে উঠে এল অনিমেষ। যেন বুকের মধ্যে সপাং সপাং চাবুক মেরে শব্দের ঝড় তুলে ট্রামটা মিলিয়ে গেল ও দিকে।

সরিৎশেখর বললেন, 'চলো। তোমার কলকাতা জাগল।'

অনিমেষ চুপচাপ নিজের অতীতকে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। না, দাদুর কথা শুনবে না সে। নিজে স্টেশনে গিয়ে ভাল জায়গা দেখে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসবে দাদুকে। কর্তব্য বা ঋণস্বীকার নয়, এ আর এক ধরনের দীক্ষা—যা বোঝানো যায় না, যে বোঝে সে বুঝে নেয়।

উনিশ

সরিৎশেখরকে জানালার কাছে বসিয়ে দিল অনিমেষ। রিজারভেশন পাওয়ার কোনও উপায় নেই, কুলিকে একটা টাকা দিয়ে জায়গা কিনতে হল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সরিৎশেখরের দিকে তাকাতেই অনিমেষের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সেই বিকেলটার কথা মনে হচ্ছিল। তার প্রথম কলকাতায় আসার বিকেল। সেদিন সে ছিল কামরায় আর সরিৎশেখর প্ল্যাটফর্মে। এবার সরিৎশেখরকে দেখার পর থেকেই কে যেন বুকের মধ্যে বসে বারংবার জানিয়ে যাচ্ছে, এই শেষবার। এরপর আর বৃদ্ধের দেখা পাবে না অনিমেষ। একটা বিরাট গাছ একটু একটু ঝুঁকে উঁকিয়ে একটা ছোট শেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার তেজ বাড়লেই ঢলে পড়বে যেন। কিছু করার নেই, শুধু চোখ চেয়ে দেখা। এই যে সে স্টেশনে এসেছে এটাও পছন্দ ছিল না সরিৎশেখরের। তাঁর জন্যে অনেক সময় নষ্ট করেছে অনিমেষ, আর নয়। কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি। রাস্তায় কিছু খাবেন না জেনেও মিষ্টি দিয়েছে সঙ্গে। পিসিমাকে দাদুর প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে একটা চিঠি দিতে হবে।

নির্বিকার মুখে বসেছিলেন সরিৎশেখর। হঠাৎ কাছে ডাকলেন ইশারায়। চারদিকে যাত্রীদের ব্যস্ততা, কুলির হাঁকাহাঁকি, ইঞ্জিনের আওয়াজ—অনিমেষ জানালার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দাদুর মুখটাকে একদম অচেনা দেখাচ্ছে এখন। অনিমেষ বলল, 'কিছু বলবেন ?'

ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'তোমার মায়ের কোনও চিহ্ন তোমার কাছে আছে?'

চমকে উঠল অনিমেষ, 'মা ?'

'হুঁ। তোমার স্বর্গত মায়ের কথা বলছি।'

সেই ছবিটার কথা মনে পড়ল। ছবিটা কোথায় ? মায়ের সেই জ্বলজ্বলে চোখের ছবি যেটা বাবার ঘরে টাঙানো থাকত।

সরিৎশেখর অনিমেষের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'খুব ছেলেমানুষ ছিলে তুমি তিনি যখন চলে গেলেন। তবু তোমার কি তাঁকে মনে পড়ে ?'

চোখ বন্ধ করলেই টকটকে লাল জ্বলন্ত চিতা। আগুন তখনও গ্রাস করেনি শরীর। দুটো পা আর হাঁটু-ছোঁয়া চুল তখনও চিতার বাইরে। রক্তের দাগ শুকিয়ে যাওয়া কালো দুটো হাত সে চোখের সামনে ধরে আছে—পরিষ্কার দেখতে পেল। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তের আগে মাকে তো তেমন করে মনে পড়েনি তার। এমনকী মাধবীলতাকে দেখার সময় মনে হয়েছিল মা এরকমই দেখতে ছিল। এই ছবিটা তো চোখের সামনে আসেনি। সে ছবিটাও তো এখন মনে পড়ছে। মৃত্যুর রাতে মা তাকে বলেছিল, আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।

দু' চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। অনিমেষ চেষ্টা করে নিজেকে ঠিক করল। কলকাতায় আসার পর ও সব কথা মনেই পড়ে না। মা ক্রমশ ধূসর হয়ে এক সময় হারিয়ে গেছে কখন। আজ দাদু এ ভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা না করলে হয়তো—সে মুখে বলল, 'হ্যাঁ পড়ে। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?'

'হঠাৎ তাকে মনে পড়ল, তোমার মুখ দেখে—। অনিমেষ, জীবন বড় জটিল। নিজেকে ঠিকঠাক রাখা খুব মুশকিল। তাই একটা অবলম্বন দরকার হয় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, তোমার মা তোমাকে ঘিরে কত স্বপ্ন দেখতেন। আজ তিনি নেই। তাঁর কথা ভেবে চোখের জল ফেলা কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু দু'দিন তোমায় আমি দেখলাম। যাই করো, শুধু মনে রেখো কেউ একজন তোমায় লক্ষ করে যাচ্ছে। তাই কখনও অসৎ হয়ো না।'

অনিমেষ জানলায় হাত রেখেছিল। পলকেই সে টের পেল হাতের তলায় জানলা নড়ছে। তারপর একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল সেটা। একটার পর একটা কামরা অনিমেষকে অতিক্রম করে গেল। সরিৎশেখরের মুখটা অনেক মুখের আড়ালে হারিয়ে গেল। স্টেশন ছাড়ার সময় কেন যে সবাই সতৃষ্ণ চোখে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে। ট্রেনটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে না যাওয়া অবধি অনিমেষ নড়ল না।

এখন অফিসের সময়। শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। পিলপিল করে মানুষজন ছুটে যাচ্ছে সার্কুলার রোডের দিকে। ঘন ঘন লোকাল ট্রেনগুলো শহরতলি থেকে মানুষ বয়ে এনে ছেড়ে দিচ্ছে কলকাতায়। প্রত্যেকে এত ব্যস্ত যে কারও পেছনে তাকানোর সময় নেই। অনিমেষ দেখল মানুষের চেহারা মোটামুটি একই। যেহেতু এদের প্রয়োজন অভিন্ন তাই ভঙ্গিতেও ফারাক নেই। হঠাৎ তাকালে সেই ছবিটার কথা মনে পড়ে যায়। ঝড়ের আভাস পেয়ে যেভাবে নানান চারপেয়ে জন্তুরা পাগলের মতো ছুটে যায় আশ্রয়ের জন্য ধুলোর বন্যা বইয়ে, ঠিক তেমনি। তাড়াহুড়া এমন যে, কেউ কাউকে সামান্য সৌজন্য দেখাচ্ছে না। আবার এই মানুষই পৃথকভাবে, একা থাকলে অত্যন্ত ভদ্র শিষ্টাচারসম্পন্ন হবে। কী করে মানুষের এতগুলো মুখ হয়! এদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সরিৎশেখরের কথাটা মনে পড়ল। এই যে লোকগুলো ঘুম থেকে উঠেই ভাত খেয়ে ট্রেনে চাপে, শিয়ালদায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অফিস যায় বাদুড় ঝুলে, সারাদিন খবরের কাগজ পড়ে, পরচর্চা করে এবং কিছু কাজ করে কাটিয়ে দেয়, আবার বিকেলে শেয়ালদা থেকে বাজার নিয়ে ট্রেনবন্দি হয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফেরে—তারা কী ধরনের মানুষ ? বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি সংসারের আয়-যন্ত্র; রাত্রে সন্তান উৎপাদন এবং দিনে পরচর্চা এখন রক্তে মিশে গেছে। এরা কেউ নিজেকে কি ভারতবাসী বলে মনে করে ? এই দেশ আমার এরকম বোধ কখনও কি তাদের চিন্তিত করে ? একমাত্র সমালোচনা ছাড়া এরা রাজনীতির ধারেকাছে ঘেঁষে না। যারা তাদের পাইয়ে দেয় সেই রাজনৈতিক দলগুলোকে এরা সমর্থন করে। আদর্শের বালাই নেই। তা হলে, এই যে মানুষের ভারতবর্ষ সে কতটা উন্নতি করবে ? হাত-পা-মাথা বিহীন একটা জন্তুর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দেশটা এবং তার জন্যে কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কমিউনিস্ট পার্টি এদের কথা কীভাবে চিন্তা করে অনিমেষ জানে না। পার্টির প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে তার

BanglaBook.org

আলাপ নেই। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারার পার্টি। কিন্তু এই সব মানুষ কিছুই হারাতে রাজি নয়। ওর মনে হল এই রকম দরকচা মারা মানুষগুলোকে কখনই কমিউনিজমে বিশ্বাস করানো যাবে না। একটা বড় আঘাত—সে যুদ্ধই হোক কিংবা শাসনযন্ত্রের দুর্বার পীড়নই হোক—যা ব্যক্তিগত ঘেরাটোপগুলোকে ছত্রাকার করবে, তা না এলে মানুষে মানুষে জানাশোনা হবে না।

স্টেশনের বাইরে এসে অনিমেষের খেয়াল হল গতকাল খবরের কাগজ পড়েনি। সরিৎশেখরকে নিয়ে সে এমন ব্যস্ত ছিল যে কোনওদিকে তাকাবার সময় পায়নি। হ্যারিসন রোডের দেওয়ালে টাঙানো একটা বামপন্থী কাগজের সামনে সে দাঁড়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন নেতারা। ভিয়েতনামে আমেরিকা বিষাক্ত বোমা ব্যবহার করছে। রাশিয়ায় পৌঁছে ভারতীয় ডেলিগেটরা লেনিনের সমাধিতে মালা দিয়েছেন। কেমন যেন সব সাজানো সাজানো ব্যাপার, অনিমেষ তৃপ্তি পেল না। আজ অবধি কোনও কমিউনিস্ট নেতা বললেন না, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। এই দেশের জন্যেই এখানে কমিউনিজম প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষকে দেশকে ভালবেসে সংগ্রামী হতে হবে। সব সময় বিদেশের কথা বলে একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বৈপ্লবিক আবহাওয়া তৈরি করা হয়। কী লাভ কে জানে। তা ছাড়া এতগুলো বছর নেতারা কাজ করলেন কিন্তু ক'পা এগিয়েছেন তা তাঁরাই জানেন। এখনও শহরের মানুষকে কমিউনিজম সম্পর্কে আগ্রহী করা সম্ভব হয়নি। গ্রামে তো আরও দূর অস্ত। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ তো কমিউনিজম বলতে বিদেশি কিছু বোঝে। তা হলে ? এদিকে কংগ্রেসিরা তিল তিল করে অবক্ষয়ের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু সে সুযোগ নেবার কোনও বাসনা বাম নেতাদের নেই। কংগ্রেসিদের অবস্থা যদুবংশের মুষলপর্বের মতন। এটাই তো প্রকৃত সময়। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় অনিমেষের। কিন্তু সেই যে দামি কথা, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই তোমাকে কাজ করতে হবে; মন চায় না তবু মেনে নিতে হয়।

অনিমেষ ভেবেছিল হোস্টেলে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে কলেজে যাবে। কিন্তু মির্জাপুরের কাছাকাছি এসে ভাবল একবার ইউনিভার্সিটিটা ঘুরেই যাই। এখন সাড়ে দশটা বাজে। বারোটার আগে ক্লাশ আরম্ভ হবে না। স্বচ্ছন্দে হোস্টেল থেকে তৈরি হয়ে আসা যেত। কিন্তু এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হল। রাখালদার ক্যান্টিনে এখনও আট পয়সার চা পাওয়া যায়। লনে ঢুকতেই দেখল চারধারে পোস্টার। ছাত্র ধর্মঘট। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। যদিও সে গতকাল খবরের কাগজ পড়েনি তবু কেউ তো এ কথা বলেনি! তমালদের মুখেও তো শোনা যেত তা হলে।

এখনও ছেলেমেয়েরা কেউ আসেনি। অনিমেষ ক্যান্টিনে ঢুকে দেখল কয়েকজন ভাত খাচ্ছে, কোনার দিকে ছোট্ট একটা জটলা। ওরা যে ছাত্র পরিষদের ছেলে বুঝতে অসুবিধে হল না। অনিমেষকে দেখতে পেয়েই ওদের গলার আওয়াজ নীচে নেমে এল। একজনকে চিনতে পারল সে। শচীন। নীলার বন্ধু। একদিন কফি-হাউসে এই ছেলেটির সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছিল। বেশ ভদ্র ছেলে। অনিমেষ রাখালদাকে একটা চায়ের কথা বলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর এই চিনতে পারার ভঙ্গিটায় শচীন অবাক হল। অনিমেষ গলা তুলে বলল, 'ভাল আছেন ?'

গায়ে পড়ে কথা বলা ওর অভ্যেস নয় কিন্তু মনে হচ্ছিল ছেলেটি কোনও কারণে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ব্যাপারটা জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল। শচীন এবার উঠে এল। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলছেন ?'

অনিমেষ দেখল শচীনের বলার ভঙ্গিতে একটা শীতলতা আছে। তবু সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'অনেকদিন দেখিনি, খবর কী সব ?'

'কী খবর চান ?'

'অনেকদিন নীলাকে দেখিনি। কেমন আছে ও ?' অনিমেষের মনে হল নীলার কথা বললে শচীন সহজ হবে।

শচীনের কপালে ভাঁজ পড়ল। অনিমেষকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'আপনি কিছু জানেন না ?'

'কী ব্যাপার, কী হয়েছে ?' অনিমেষ অবাক হল।

'ওদের বাড়িতে যাননি এর মধ্যে ?'

'না, বেশ কিছুদিন আমার যোগাযোগ হয়নি।'

'তা হলে নিজে গিয়েই জেনে আসুন। আজ তো আপনারা ধর্মঘট ডেকেছেন, চলে যান আজকেই। কাছেই তো।' শচীন এমন ভঙ্গি করল যেন তার কথা শেষ হয়ে গেছে, এবার ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

BanglaBook.org

অনিমেষ বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কি সব কথা খুলে বলতে অসুবিধে আছে?'

এই সময় ছেলেটা চা দিয়ে যেতে সে ইশারায় শচীনকে এক কাপ দিতে বলল।

শচীন আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আপনি গতকাল বিকেলে জানতেন যে আজ ধর্মঘট করা হবে! আপনিও তো একজন ছাত্র-প্রতিনিধি!'

অনিমেষ এ রকম প্রশ্ন আশা করেনি। ও বুঝতে পারল শচীন এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই তার সম্পর্কে এক বিরূপ ধারণা নিয়ে কথা বলছে। অনিমেষ উত্তর দিল, 'আমি

গতকাল অনুপস্থিত ছিলাম। থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সর্বসম্মত।'

'মিথ্যে কথা। আমাদের খবর, কালকেও আপনাদের পরিকল্পনা ছিল না ধর্মঘট করার। পুলিশ যাদের অ্যারেস্ট করেছে তারা কেউ ছাত্র নয়। কিন্তু গত রাত্রে পার্টির নির্দেশে বিমান নিজে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।'

কথাটা শুনে চমকে গেল না অনিমেষ। এটা হতেই পারে। সাধারণ সম্পাদককে যদি পার্টি নির্দেশ দেয় তবে নিশ্চয়ই সে মান্য করবে। এতে অন্যায়টা কীসের। সে বলল, 'এটা তো আমাদের ভেতরের ব্যাপার, আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'মাথা ঘামাচ্ছি কারণ আপনারা নিজের ইচ্ছে মতন সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারেন না। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার আপনারাই করেছিলেন। ওদের খুঁচিয়ে দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে এসে লুকিয়েছেন যাতে আমরাও জড়িয়ে পড়ি। বাইরের গুন্ডা দিয়ে ট্রাম পুড়িয়েছেন নিজের বীরত্ব প্রমাণ করতে। কী ইস্যু নিয়ে এত কাণ্ড হল? সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে কী সম্পর্ক? গতকাল কেরলে তিনজন কমিউনিষ্ট পুলিশের গুলিতে মারা গেছে অতএব আজ এখানে ধর্মঘট করো। অথচ সে কথা আপনারা বলছেন না ধর্মঘটের কারণ দেখাতে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বহুদূর থেকে কষ্টের পয়সা খরচ করে এখানে এসে দেখবে ক্লাশ হচ্ছে না—এই হয়রানি এবং অপচয় কেন করালেন? আর সবশেষে একটা কথা, নিজের নাক কেটে কি অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা যায়? একদিনের ধর্মঘট করা মানে একটা দিনের পড়াশুনো নষ্ট করা। এতে আপনাদের কী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?'

'আমি এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই। আপনার যদি আপত্তি থাকে তা হলে আপনি ধর্মঘটে যোগ দেবেন না। ব্যস।' অনিমেষ চায়ের দাম দিল।

'সে তো একশো বার। আপনারা যা ইচ্ছে করবেন আর আমরা তা মুখ বুজে সহ্য করব এটা ভাববেন না। আমরা ধর্মঘটের প্রতিবাদ করব। আমরা ছাত্রদের বলব ক্লাশ করতে।'

শচীন কথা শেষ করা মাত্রই অনিমেষ ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এল। কী পরিস্থিতিতে বিমানদা আজকের ধর্মঘট ডেকেছে সে জানে না কিন্তু সেদিন যে পুলিশ বাড়াবাড়ি করেছিল সেটা তো সত্যি।

ইউনিয়ন রুম জমজমাট। কার্যনির্বাহক কমিটির সবাই এসে গেছে। অনিমেষকে দরজায় দেখে সুদীপ চুরুট নামাল, 'এই যে অনিমেষবাবু, আসুন।'

কথাটায় ব্যঙ্গ মেশানো, অনিমেষ অবাক হল। এ ভাবে কথা বলার কী কারণ আছে তা বুঝতে পারল না সে।

একটা চেয়ার টেনে বসতেই বিমান বলল, 'কাল কী হয়েছিল তোমার?'

অনিমেষ বলল, 'একটা পারিবারিক কাজে জড়িয়ে গিয়েছিলাম।'

বিমান বলল, 'যাই হোক না কেন, একবার তোমার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল। পার্টির কাজ করতে গেলে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া চলবে না অনিমেষ। তা ছাড়া তোমার কাছ থেকে আমরা তেমন কোনও কাজও পাই না।'

সুদীপ বেঁকানো গলায় বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে স্নান-খাওয়া করোনি। তা এখন এখানে আসতে পরামর্শ দিল কে?'

এবার বিরক্তি চাপতে পারল না অনিমেষ, 'আমি কি এসে অন্যায় করেছি?'

বিমান বলল, 'তুমি হোস্টেলে ছিলে না সকালে, খবর পেলে কী করে?'

অনেমেষ বলল, 'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে পাওয়া যায়নি।'

'আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে কোনও কিছু না ভেবেই এখানে এসেছি।'

'আর এসেই সোজা ছাত্র পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় বসে গেলে!' সুদীপ বলল।

এবার অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা কী বলতে চাইছেন খুলে বলুন!'

BanglaBook.org

বিমান একটা হাত উপরে তুলে বলল, 'উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি। বসো।' তারপর অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কমরেডস, আমাদের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন যে, এ সময়ে কোনও রকম আচরণ করবেন না যাতে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এক সক্রিয় ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। আমরা যেন কেউ সেই ফাঁদে পা না দিই। আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলো পার্টির এক একটা হাতের মতো। অতএব এই সংগঠনের গুরুত্ব অনেক। পুলিশ, কংগ্রেস সরকারের পুলিশ প্রকাশ্যে জঘন্য অত্যাচার করে ছাত্র সমাজকে কলুষিত করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি। এই প্রতিবাদের প্রকাশ আজকের ছাত্র ধর্মঘট। আমরা জানি সাধারণ ছাত্ররা আমাদের পাশে আছেন। যদি কেউ বিরোধিতা করতে চান সেই দালালদের আমরা বাধা দেব। গতকাল কেরলে পুলিশ তিন জন কমরেডকে হত্যা করেছে। এই সুযোগে আমরা তার প্রতিবাদ করব। আপনাদের কারও কিছু বলার আছে?' বিমানের দৃষ্টি সবার মুখের ওপর বুলিয়ে এসে অনিমেষের ওপর স্থির হল। উত্তেজিত হলে মানুষের নার্ভ বিক্ষত হয়।

বিমানের বক্তৃতা অনিমেষের কানে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। তার সম্পর্কে অবিশ্বাস এদের মধ্যে এসেছে, এই বোধ তাকে নিঃসঙ্গ করছিল। বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'অনিমেষ কিছু বলবে?'

সচেতন হল অনিমেষ। ঘাড় নেড়ে না বলে বসে পড়ল। বিমান বলল, 'কোনও কোনও ব্যাপারে সবাই একমত নাও হতে পারে কিন্তু প্রতি ব্যাপার নিয়ে যদি আমরা সমালোচনা করি তা হলে কোনও কাজই শেষ হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্তব্য হল হুকুম পালন করা। তাতে যদি মৃত্যুও হয় তবু তাই সই। কারণ আজকের মৃত্যু আগামিকালের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াবেই। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আমাদের আন্দোলন সফল করতে প্রত্যেকে সক্রিয় ভূমিকা নিন।'

বিমান বসে পড়তেই সুদীপ উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সবাইকে দেখল। তারপর অত্যন্ত গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'কমরেডস, আমি খবর পেয়েছি আজকের ধর্মঘট বানচাল করতে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা বদ্ধপরিকর। তাদের লালিত ছাত্রসংস্থা এর মদত দেবে। দুঃখের কথা, কিছু প্রতিবিপ্লবী বিপথগামী বন্ধু এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরা এর মোকাবিলা করব। আপনারা অন্যান্য কমরেডদের নিয়ে ইউনিভার্সিটির প্রতিটি গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করুন। কেউ যদি জোর করে ঢুকতে যায় তা হলে আমরাও চুপ করে বসে থাকব না।'

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সবাই এক একটা গেটে চলে গেল। ইউনিভার্সিটির অফিস খোলা, অধ্যাপকদের আসতে বাধা দেওয়া হবে না।

অনিমেষকে ডাকল বিমান, 'তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো।'

একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী হয়েছে?'

'কিছুই হয়নি।'

'তুমি কি পার্টির প্রতি ভরসা হারাচ্ছ?'

'এ কথা কে বলল?'

'আমাদের কানে এসেছে তুমি এরকম কথাবার্তা বলো।'

'না, আমি কখনও বলিনি।' অনিমেষ ভাবতেই পারছিল না তার মনের কথা এরা টের পাচ্ছে কী করে। সে তো কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি।

'কাল রাত্রে তুমি কী করছিলে?'

'মানে?'

'অনিমেষ বি ইজি। কাল রাত্রে তুমি হাতিবাগানে কী করছিলে?'

এবার অনিমেষ শক্ত হল। ওরা কি সুবাসদার সঙ্গে তার দেখা হওয়া নিয়ে এ সব বলছে? কিন্তু সুবাসদা তার পরিচিত, দেখা তো হতেই পারে।

সে বলল, 'ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সুবাসদার সঙ্গে দেখা, আমরা চা খেলাম, গল্প করলাম।'

'কী গল্প?'

'এটা একদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়?'

'গুড। তুমি সহজ হতে পারছ না অনিমেষ। মনের মধ্যে ময়লা থাকলেই মানুষ গুটিয়ে যায়। তবু জিজ্ঞাসা করছি, কী কথা হয়েছিল?'

BanglaBook.org

'অনেক দিনের আলাপ। দেখা হল দীর্ঘ ব্যবধানে। এ রকম ক্ষেত্রে যে রকম কথা হতে পারে আর কি। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি সুবাসদার?'

না। সে দেখা করবে না। সুবাসকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এ খবরটা তো তুমি শুনেছ ওরই কাছ থেকে। কেউ শাস্তি পেলে তার ব্রেন অনেক কিছু বানিয়ে নেয়। সুবাস তোমাকে প্রকাশ্যে রেস্টুরেন্টে যে সব কথা বলেছে তা অনেকেই শুনেছে। এ সব কথা ওকে বলতে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টার জন্যে দল ওকে তাড়িয়েছে। এ রকম মানুষের সঙ্গে কোনও রকম সংশ্রব না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

বিমানের শেষ কথাগুলো যে সতর্কীকরণ তা বুঝতে অসুবিধে হল না অনিমেষের। এ নিয়ে অনেক তর্ক করা যেতে পারে কিন্তু অনিমেষ নিস্পৃহ থাকল। সুবাসকে ওর ভাল লাগে। সুবাস যে কথাগুলো বলেছে তা অযৌক্তিক বলে মোটেই মনে হয়নি। ও বুঝতে পারছিল এ ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত তা নিজেই নিতে হবে। এবং সেটা যতক্ষণ না নিতে পারছে ততক্ষণ বেফাঁস কথা বলা বোকামি হবে।

মেইন গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। গতকাল ওই রেস্টুরেন্টে এমন কোনও পরিচিত মুখ ছিল না যে সুবাসের সঙ্গে তার আলোচনা এদের জানাতে পারে। তা হলে জানল কী করে? সুবাস যদি দল থেকে বিতাড়িত হয় তা হলে নিশ্চয়ই এদের বলবে না। ব্যাপারটা রহস্যময় অথচ কোনও সূত্র খুঁজে পেল না সে। অনিমেষ বুঝল, রাজনীতি করতে গেলে তাকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে।

অনিমেষরা স্লোগান দিচ্ছিল। এখন দু-একজন করে ছাত্রছাত্রী আসতে শুরু করেছে। ইউনিয়নের যারা যারা সমর্থক তারা ওদের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় দলটাকে ভারী দেখাচ্ছিল। যারা কোনও দলে নেই তারা দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিল। ইউনিভার্সিটির সব কটা গেটেই এই ধরনের বিক্ষোভ চলছে। ফলে ওদের ডিঙিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছে না। পাশের দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা হয়েছে, পুলিসের বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ ছাত্র ধর্মঘট। এ কথাটাই বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে অনিমেষরা বলছিল। কলেজ স্ট্রিটে এখন অফিস টাইমের ভিড়। ট্রাম-বাস থেকে লোকজন মুখ বের করে দেখছে ওদের। স্লোগান থামিয়ে একটু আগে বিমান বক্তৃতা দিয়ে গেল একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে। জ্বালাময়ী ভাষণ এবং সমগ্র ছাত্র সমাজের অপমান হিসেবে সে ঘটনাকে ধিক্কার জানাল।

ক্রমশ কলেজ স্ট্রিটে ভিড় জমছে। ছেলেমেয়েরা ফুটপাত উপচে রাস্তায় নেমে ওদের দেখছে। ট্রাম বাসগুলো এক সময় দাঁড়িয়ে গেল ভিড়ের জন্যে। এতক্ষণ কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি। এমনকী কোনও অধ্যাপক বা অফিসকর্মীকেও আসতে দেখেনি অনিমেষ। ওর মনে হল, এই রকম ধর্মঘট ডাকায় ছাত্রছাত্রীরা বেশ আনন্দিতই হয়েছে। মুফতে একটা ছুটি পাওয়া গেল, বেশ চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে—ছুটির মেজাজ এখন ওদের। কী জন্যে ধর্মঘট, কেন সেটা করা হচ্ছে এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার কেউ বোধ করছে না। স্লোগান উঠছে ঢেউ-এর মতো, হঠাৎ শুনলে প্রতিটি শব্দ আলাদা করে কেউ বুঝতে পারবে না। অনিমেষের মনে হচ্ছিল, পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন সাজানো অথবা চাপানো, কারও মনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। যেন একটা ফর্মুলাকে অনুসরণ করে যাওয়া, সেটা যে কখন বাসি অকেজো হয়ে গেছে তার খোঁজ কেউ রাখে না।

অনিমেষের খিদে পাচ্ছিল। হোস্টেলে ভাত ঢাকা আছে কিন্তু এখন যদি সে হাতিবাগানে গিয়ে খেয়ে আসতে চায় তা হলে সেটা দৃষ্টিকটু হবে। স্নান না করে সে একটা দিনও থাকতে পারে না, সে না হয় আজ না করল। পকেটে এমন পয়সা নেই যে চট করে রাখালদার ক্যান্টিন থেকে খেয়ে আসবে। দাদুর জন্যে আচমকা যে খরচ হয়ে গেল তা সামলে এই মাসের বাকি ক'টা দিন কেমন ভাবে চালাবে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। খিদের কথা মনে হতেই এই চিন্তাটা এল।

ঠিক এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে স্লোগান উঠল, 'চীনা দালাল নিপাত থাক। বেআইনি ধর্মঘট মানছি না, মানব না। গুণ্ডাদের আন্দোলনে ছাত্ররা থাকছে না থাকবে না।' একজন একটু এগিয়ে দেখে এসে বলল, 'বড় জোর কুড়িজন ওদের সঙ্গে। চিন্তার কিছু নেই।'

ও পক্ষের স্লোগান কানে আসা মাত্রই এ পক্ষের গলা উত্তাল হল। ওদিকের আওয়াজ যত এগিয়ে আসতে লাগল তত টেনশন বাড়ছে। ক্রমশ অনিমেষ ওদের দেখতে পেল। মুকুলেশ সামনে,

BanglaBook.org

শচীনও আছে। প্রত্যেকের হাতে বইখাতা, যেন ক্লাশ করতে আসছে। দু'পক্ষের চিৎকারে কান পাতা দায়, ইউনিভার্সিটির কার্নিশে বসা একটা চিল ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল আচমকা।

গেটের কাছাকাছি ওরা আসতে পারল না। অনিমেষরা অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছে। মুকুলেশ নিজের দলকে চুপ করিয়ে ওদের দিকে মুখ করে গলা তুলে বলল, 'আমরা এই ধর্মঘট মানছি না। আমাদের ভেতরে যেতে দিন।'

বোধ হয় এইরকম অনুরোধের জন্য এরা প্রস্তুত ছিল না। শ্লোগান থেমে গেল হঠাৎই, সবাই চুপচাপ, কেউ উত্তর দিল না।

মুকুলেশ আবার বলল, 'যারা ধর্মঘট করবেন তারা যাবেন না, কিন্তু সেটা সবার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই।'

বিমান বা সুদীপ এই গেটে নেই এখন। অনিমেষ চট করে টুলে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'এটা ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত, ছাত্রদের তা মানতে হবে।'

মুকুলেশ বলল, 'ইউনিয়নের নয়, আপনাদের পার্টির সিদ্ধান্ত, সেটা মানতে আমরা বাধ্য নই। আপনারা সরে যান, আমরা ভেতরে ঢুকব।'

ঠিক তখনই হইচই বেঁধে গেল। মুকুলেশের দলের দুটো স্বাস্থ্যবান ছেলে এদের সরিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকতে গেল। এরা তাদের থামাতে হাতাহাতি বেঁধে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজ স্ট্রিট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা, যারা এতক্ষণ নাটক দেখছিল তারা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করল। দেখা গেল সেই দুটো ছেলে রীতিমতো প্রহৃত হয়ে মির্জাপুরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। মুকুলেশরা উধাও। একটি ছেলেও ঢুকতে পারেনি। সবক'টা গেটই অনিমেষদের দখলে। ফুটপাতের দোকানদাররা মালপত্র নিয়ে পালাচ্ছে। পরিস্থিতি সামলে নিয়ে অনিমেষরা শ্লোগান দিচ্ছিল জোর গলায়। খবর পেয়ে বিমান সুদীপ ছুটে এসেছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সবাই কাঁপছে। ঠিক সেইসময় গেটের মুখে বোমা পড়ল। মাটিতে পড়েই যে শব্দ হল তাতে হকচকিয়ে গেল তারা। ধোঁয়ায় চারধার ঢেকে যাচ্ছে। পর পর কয়েকটা। কলেজ স্কোয়ারের দিক থেকে বোমাগুলো আসছে; আত্মরক্ষার জন্যে সবাই গেট ছেড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

বোমা ছোড়ামাত্রই অনিমেষের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে লক্ষ করতে লাগল কোন দিক থেকে বোমাগুলো আসছে। এখন কলেজ স্ট্রিট খাঁ-খাঁ করছে। ট্রামগুলো পিছু হটছে। পুলিশ ভ্যানের আওয়াজ পেল সে। অনিমেষের মনে হল কেউ একজন কলেজ স্কোয়ারের গেটের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ছেলেটাকে ধরার উদ্দেশ্যে অনিমেষ রাস্তা পার হতেই আরও কয়েকটা বোমা তার মাথা টপকে ও-পাশের ফুটপাতে গিয়ে সশব্দে ফাটল। ছেলেটি তাকে কাছে আসতে দেখে গেটের আশ্রয় ছেড়ে প্রাণপণে ভেতরে দৌড়ে গেল। অনিমেষ পিছু ধাওয়া করতে চেয়ে বুঝতে পারল তার পক্ষে সম্ভব নয় ওকে ধরা, জোরে পা ফেললেই থাই টন টন করছে।

গেটের ও পাশে আবার শ্লোগান উঠছে। বিমান চিৎকার করে ওকে ফিরে আসতে বলল। ফুটপাত ছেড়ে সে যখন সবে রাস্তায় পা দিয়েছে ঠিক তখনই আচম্বিতে একটা কালো ভ্যান তার পাশে এসে ব্রেক কষল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই দু-তিনটি পুলিশ ওর দু'হাত ধরে টানতে টানতে ভ্যানের পেছনে তুলে দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় অনিমেষ এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে কোনও কথা বলতে পারছিল না। সে শুনল সার্জেন্ট বলছে, 'আর কেউ আছে?'

'নেই স্যার, সব অন্দর মে।'

'অয়্যারলেসে খবর দাও, একটা হুলিগান অ্যারেস্টেড'।

তারপর যান্ত্রিক কিছু কথাবার্তার মধ্যে অনিমেষ চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করছেন কেন? কী করেছি আমি?' কেউ উত্তর দিল না। পুলিশভ্যানটা তেমনি স্থির হয়ে আছে অথচ অনিমেষের বেরুবার পথ বন্ধ।

এই সময় অনিমেষের কানে এল গেট থেকে নতুন শ্লোগান উঠছে, 'পুলিশ তুমি নিপাত যাও। কমরেড অনিমেষ লাল সেলাম লাল সেলাম।'

সার্জেন্টটা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'সেলাম আবার লাল হয় কী করে মোশাই?'

দাঁতে দাঁত চেপে অনিমেষ বলল, 'শা-লা!'

পুলিশভ্যানটা সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল।

BanglaBook.org

জীবনে প্রথমবার থানায় এল অনিমেষ। কলেজ স্ট্রিট ছাড়ার পর থেকেই ও চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ভ্যানের ভেতর গোটা ছয়েক কনস্টেবল এবং একজন সার্জেন্ট। তারাও ওকে তেমন পাত্তা দেয়নি, কারণ এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ভ্যানের জানলা দিয়ে অনিমেষ রাস্তায় নজর রেখেছিল। প্রতিদিনের কলকাতা স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। দোকানপাট খোলা, লোকেরা হাঁটাচলা করছে। এই একই দৃশ্য অনিমেষ রোজ পথ চলতে দেখেছে কিন্তু আজ এই ভ্যানের তার-ঘেরা ছোট্ট জানলা দিয়ে দেখতে ভীষণ ভাল লাগছিল। ক্ষুদ্র দিয়ে বিশালকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে এক বেদনা-জড়ানো আনন্দ আছে। কিন্তু এতক্ষণ অনিমেষের মনে কোনওরকম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়নি। সে যে বন্দি এবং কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও সেখানে তার ভাগ্য-নির্ধারিত হতে পারে— এ সব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। সে জানে ওরা অযথা তাকে ধরেছে। কোনও অন্যায় যখন সে করেনি তখন ভুল বুঝতে পারলেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু বিমানদের ব্যাপারটা নিয়েই ও বেশি চিন্তিত ছিল। তাকে ভ্যানে তোলা মাত্রই অতগুলো ছাত্র একসঙ্গে শ্লোগান দিয়ে উঠল তার নাম ধরে। বুকভরা আন্তরিকতা না থাকলে অমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হয় ? বিমান এর আগে যে কথাগুলো বলেছে সেটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। ভুলভ্রান্তি প্রতি দলের থাকে। কাজ করতে গেলে তা হওয়া স্বাভাবিক। সি পি আই সম্পর্কে তার কোনওরকম মোহ নেই। কমিউনিজমের প্রতি যে আকর্ষণ সে বোধ করে তার জন্যে বিমানদের সঙ্গেই কাজ করা উচিত। সুবাসদা যে কথাটা বলেছিল তাও হয়তো মিথ্যে নয়। দলের নেতৃত্ব কোনও নতুন পথ দেখাতে পারছে না, দীর্ঘকাল নেতারা একই চেয়ারে বসে আছে, কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ক্যাডারদের সামনে নেই। কিন্তু তবু যত অল্পই হোক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠার জন্যে যে জঙ্গি মনোভাব দরকার তা বিমানদেরই আছে। একক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কাজ দুঃসাধ্য হবে, আদৌ সম্ভব হবে না, তা ওদের সঙ্গে থাকলেই হতে পারে। মতবিরোধ ঘটতেই পারে কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে মানিয়ে চলা নীতি অনুসরণ করা উচিত।

সার্জেন্টের পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকতেই অফিসার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল 'কী ব্যাপার?'

'কলেজ স্ট্রিট থেকে তুলে আনলাম।'

'কী অবস্থা ?'

'একদল ঢুকবে অন্যদল ঢুকতে দেবে না।'

'সিরিয়াস কিছু ?'

'নাঃ, দু-একটা ছুটকো বোমা ফেটেছে, ব্যস।'

'তা হলে খামোকা একে আনতে গেলে কেন ? ফরনাথিং ট্রাবল ইনভাইট করা। এখনি হয়তো ফোন আসবে সুড় সুড় করে ছেড়ে দিতে হবে। স্টুডেন্টস প্রব্লেম খুব ডেলিকেট ব্যাপার এটা তোমাকে বোঝাতে পারলুম না আজও।' খুব বিরক্তির গলায় কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। অনিমেষ দেখল ভদ্রলোকের মুখটা মোটেই পুলিশের মতো নয়। মাথায় টাক থাকায় অনেকটা বিদ্যাসাগরের মতো দেখাচ্ছে। পরনেও পুলিশি পোশাক নেই।

সার্জেন্ট বলল, 'একদম খালি হাতে ফিরে আসব ?'

অফিসার এর উত্তর না দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যে অনিমেষের হাসি পেয়ে গেল। সার্জেন্ট সেটা দেখে চিৎকার করে ধমকে উঠল তাকে।

অনিমেষ বলল, 'খামোকা চেঁচাচ্ছেন কেন ?'

'ইউ শাট আপ। এমন মার মারব জন্মের জন্যে বোমা ছোড়া বেরিয়ে যাবে।' সার্জেন্ট একটা চেয়ার টেনে ধপ করে বসে ওর দিকে মুখ খেঁচাল।

'বোম ? কে বোম ছুড়েছে ?' অফিসার চটপট জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই শ্রীমান স্যার। অল্পের জন্যে ভ্যানে লাগেনি।'

'আই সি ! চেহারা দেখে তো সুবোধ মনে হচ্ছিল। পুলিশ ভ্যানে বোমা মারার জন্যে কপালে কী জুটবে তা জানা আছে ?'

'আমি বোম ছুড়িনি। উনি মিথ্যে কথা বলছেন।' অনিমেষ বলল।

'মিথ্যে কথা বলছি ? দূর থেকে দেখলাম ইউনিভার্সিটির গেটে বোম পড়ল। রাস্তা ফাঁকা। কাছাকাছি আসতেই দেখলাম তুমি ফুটপাত থেকে নেমে আসছ। এ সব মিথ্যে কথা ?' ধমকানির সুরটা সার্জেন্টের গলা থেকে যাচ্ছিল না।

অফিসার ভদ্রলোকের মুখের চেহারা ততক্ষণে বদলে গেছে।

BanglaBook.org

অনিমেষ বলল, 'আমি বোমা ছুড়িনি, যে ছুড়েছিল তাকে ধরতে গিয়েছিলাম।'

কথাটা শেষ হতেই এক লাফে সার্জেন্ট ওর সামনে এসে দাঁড়াল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই লোকটার দুটো হাত ওর সর্বাঙ্গে ঘোরাফেরা করতে লাগল। পকেট থেকে আরম্ভ করে কোমর কিছুই বাদ গেল না।

লোকটা হতাশ হয়ে আবার চেয়ারে ফিরে গেল। তারপর কয়েক সেকেন্ড চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'স্যার, একে দু'নম্বর দেওয়ার দরকার। মিস্টিরিয়াস কেস। খালি হাতে বোমবাজকে ধরতে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে। দাওয়াই না দিলে সত্যি কথা বলবে না।'

'তুমি খালি হাতে গিয়েছিলে? যদি বোম ছুড়ত তা হলে?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি অতটা ভাবিনি। তা ছাড়া দেখামাত্র লোকটা পালিয়ে গেল।' অনিমেষ সত্যি কথাটাই বলল।

'লোকটা? কোন লোক? তুমি চেনো?'

'কী আশ্চর্য! আমি চিনব কেমন করে? ওকে কখনও দেখিনি আমি।'

'কোন পার্টির লোক?'

'তা জানি না।'

'বোম ছুড়ছিল বলছিলে, কাদের দিকে বোমগুলো ছুড়ছিল?'

'আমরা যারা গেটে ছিলাম তাদের দিকে।'

'তোমরা মানে যারা বন্ধ্ ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ'

'তার মানে লোকটা তোমাদের অ্যান্টি পার্টি এই তো? অর্থাৎ ছাত্র পরিষদ করে নিশ্চয়ই, কী বলো?'

অনিমেষ টের পাচ্ছিল অফিসার তাকে কথার জালে ঘিরে ধরে কোনও কিছু তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইছে। সে সতর্ক হল, 'আমি এ সব কিছুই বলছি না। একটা লোক বোম্বিং করছিল এবং সে চাইছিল না আমরা গেটে দাঁড়িয়ে স্ট্রাইক কনডাক্ট করি। কিন্তু সে কোন দলের লোক তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ তাকে আমি চিনি না।'

হঠাৎ অফিসার একসিট সাদা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজকে যা যা ঘটেছে তা এখানে লিখে নাম সই করে ঠিকানাটা দিয়ে দিন। আমি একটা রেকর্ড রাখতে চাই।'

একমুহূর্ত ভেবে অনিমেষ কাগজটা টেনে নিল। সে যদি না লেখে তা হলে এরা কিছু করতে পারে না। এই ঘরে ঢোকার আগে একটা খাঁচার ঘর সে দেখেছে। কয়েকটা অপরাধী মার্কা চেহারা সেই খাঁচায় শুয়ে বসে আছে। ওটাকে বোধহয় লক-আপ বলে। থানায় ধরে নিয়ে এলে লক-আপে রাখা হয়। পুলিশের লক-আপ সম্পর্কে নানান গল্প শুনেছে অনিমেষ। আজ কীরকম অভিজ্ঞতা হয় কে জানে! না লেখার পেছনে কোনও অজুহাত খুঁজে পেল না সে। যা সত্যি কথা তা লিখতে দোষ কী!

এখনও কেউ তাকে চেয়ারে বসতে বলেনি। শব্দ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। সার্জেন্ট বলছিল, 'আমার মন বলছে এ বোম্বিং-এ ইন্‌ভলভ্‌ড। একটু ধোলাই দিলে—।'

'লেট হিম রাইট।'

লেখা শেষ করে অফিসারের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিল অনিমেষ। সেটা হাতে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনিমেষ মিত্র?'

'হ্যাঁ।'

সার্জেন্ট সোজা হয়ে বসল, 'কোন হোস্টেল? হোস্টেলগুলো স্যার ক্রিমিন্যালদের আড্ডা।

'স্কটিশচার্চ।'

'বাড়ি কোথায়?' অফিসার কাগজটা থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না।

'জলপাইগুড়িতে।'

'এর আগে কখনও অ্যারেস্টেড হয়েছেন?'

'না।'

'এনি পুলিশ এনকোয়ারি?'

হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। পুলিশের খাতায় নিশ্চয়ই তার নাম আছে। হাসপাতালে যে পুলিশ অফিসারটি তাকে জেরা করতে গিয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই তা রেকর্ড করে রেখেছেন। কথাটা

BanglaBook.org

এখন বললে আর দেখতে হবে না। সার্জেন্টটা ওকে বোমবাজ প্রমাণ করার জন্যে তো মুখিয়ে আছে। তার পায়ে বুলেট লেগেছিল জানলে রক্ষে রাখবে না। সেবার নীলার বাবার দৌলতে —। ও ঘাড় নাড়ল 'না।'

'এতক্ষণ ভাবতে হল কেন ?' প্রশ্নটা সার্জেন্টের।

প্রশ্নটার উত্তর দিল না অনিমেষ। অনেক অপ্রিয় কথা চুপ করে থাকলে এড়ানো যায়।

সার্জেন্ট বলল, 'আমি সিয়োর স্যার —।'

অফিসার বললেন, 'ছেড়ে দাও এ সব কথা। অনিমেষবাবু, আমি চাই না ফরনাথিং কেউ হ্যারাসড হোক। আপনার স্টেটমেন্ট আমাদের কাছে থাকল। কিন্তু এর পর যদি কখনও আপনার সম্পর্কে সামান্য অভিযোগ পাই তা হলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে নিশ্চয়ই। কলকাতায় পড়াশুনো করতে এসেছেন তাই মন দিয়ে করুন। ইউনিয়নবাজি করে নিজের বারোটা বাজাচ্ছেন কেন ?'

অনিমেষ হাসল, 'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে প্রত্যেকের বোমার ধরন-ধারণ আলাদা এটা মনে রাখাই ভাল।'

কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই অফিসারের মুখটা বুলডগের মতো হয়ে গেল, 'গেট আউট, গেট আউট।'

অনিমেষ সুযোগ নষ্ট করল না। দ্রুত পায়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল। ওর ভয় হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তেই অফিসার তার ভুল বুঝতে পেরে ওকে আটকাতে নির্দেশ দেবেন। এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা ভাবা যায় না ?

রাস্তায় নেমে অনিমেষের অস্বস্তি শুরু হল। যে রকম সমারোহ করে তাকে নিয়ে আসা হল ও এভাবে কিছু না ঘটেই ছাড়া পাওয়া তার সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না।

ব্যাপারটা যে সত্যি বেমানান তা কয়েক মুহূর্ত বাদেই ভাল করে বোঝা গেল। ইউনিভার্সিটির পথে কিছুটা এগিয়ে যেতেই ওদের দেখতে পেল অনিমেষ। জনা কুড়ি ছেলে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। ওদের সামনে সুদীপ, মুখখানা খুব গম্ভীর। অনিমেষ অনুমানই করতে পারেনি ছাত্রমিছিলটা ওরই উদ্দেশে থানার দিকে এগোচ্ছে। শ্লোগানে নিজের নাম শুনতে পেয়ে চমকে গেল ও। তার জন্য দল এত চিন্তা করছে—নিজেকে ভীষণ মূল্যবান বলে মনে হল ওর। ফুটপাত ছেড়ে সে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সবাই। অনিমেষকে কেউ এখানে আশা করেনি। সুদীপ অত্যন্ত বিস্মিতের গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

অনিমেষের হঠাৎই মনে হল সে যেন একটা অন্যায় করে ফেলেছে। এবং এই অন্যায়টি মোটেই ছোট মাপের নয়। সে নিচু গলায় বলল, 'ছেড়ে দিয়েছে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ছাড়ল কেন ?' সুদীপের গলায় অসহিষ্ণু ভাব।

'ওরা ভেবেছিল আমি বোম ছুড়েছি তাই ধরেছিল। কিন্তু ও সি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন এটা ঠিক নয় কিংবা প্রমাণ করা যাবে না, তাই।'

'অসম্ভব। পুলিশ রাতারাতি চৈতন্যদেব হয়ে যায়নি। ভুল বুঝতে পারলেও ওরা দুদিন লক-আপে রেখে দেয়। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার।'

অনিমেষ অনুভব করল ওর এই বেরিয়ে আসায় সুদীপ আশাহত। ধারণাটার সমর্থন মিলল আর একটি কথায়। সুদীপের পাশে দাঁড়ানো একটি ছেলে বলে উঠল, 'এখন কী হবে সুদীপদা ? ওকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমরা যে কালকেও ধর্মঘট ডেকেছি। এখন তো তার কোনও মূল্য থাকবে না।'

সুদীপ বলল, 'দ্যাটস দি পয়েন্ট। তোমার রিলিজের ব্যাপারের মধ্যে কিছু একটা আছে। যাক সে-কথা। এখন হয় তোমাকে দুদিন কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে—না, না, সেটা আর সম্ভব নয়।' নিজেই কথাটা ঘুরিয়ে নিল সে, 'এতগুলো ছেলে যখন তোমাকে দেখতে পেয়েছে তখন খবর চাপা থাকবে না।'

সঙ্গের ছেলেটি বলল, 'সুদীপদা, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা অনিমেষকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাই। যেন থানায় বিক্ষোভ করে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি—।'

সুদীপ বলল, 'গুড। ইটস এ গুড প্রপোজাল। তাই করো।' তারপর চাপা গলায় অনিমেষকে বলল, 'ইউ আর বিকামিং এ হিরো আউট অফ নাথিং।'

BanglaBook.org

অনিমেষকে কিছুই করতে হল না। মিছিলটা প্রচণ্ড উন্মাদনা নিয়ে ফিরে এল বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনিমেষকে চুপ করে থাকতে হল কিন্তু সেটাই তার কাছে খুব কষ্টকর হয়েছিল। ছোট্ট একটা জনসভায় সুদীপ আগামিকালের প্রস্তাবিত ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু ব্যাপারটা যে খুব জোরালো এবং আন্তরিকতাপূর্ণ হচ্ছে না এটা অনিমেষ স্পষ্ট অনুভব করছিল।

বিমানকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল অনিমেষ। পুলিশ ওকে দিয়ে স্টেটমেন্ট লিখিয়ে নিয়েছে কিন্তু গায়ে হাত দেয়নি।

বিমান শুনে বলল, 'নিজের হাতে লিখে না দিলেই পারতে। এটাকে ওরা মুচলেকা বলে প্রচার করলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। তা ছাড়া তোমার ওইভাবে রাস্তা পেরিয়ে ধাওয়া করতে যাওয়া উচিত হয়নি। বোমাটা তোমার শরীরে সোজাসুজি এসে পড়তে পারত। হঠকারিতা থেকে কোনও সুফল পাওয়া যায় না। কমিউনিজমের সার্থকতা ব্যক্তিগত কৃতিত্বে নয়, সামগ্রিক দলবদ্ধ উন্নয়নে। যাক, আজ আমরা জিতেছি। একটি ছেলেও ক্লাশ করতে ঢোকেনি।

অনিমেষ বলল, 'পুলিশের হাত থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনও কারণ নেই কিন্তু। মানে, সুদীপের কথা শুনে মনে হচ্ছিল ও ঠিক বিশ্বাস করছে না ব্যাপারটা। অথচ আমি কিছুই জানি না —'

বিমান হাসল, 'হয়। এরকম পরিস্থিতি হয়েই থাকে। যাক, তুমি কিন্তু অনেকদিন পার্টি অফিসে যাওনি, আজ যাবে।'

অনিমেষ এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সারাদিন স্নান-খাওয়া নেই, তার ওপর এরকম একটা টেনশন গেল, এখন খুব কাহিল লাগছিল। বিমান সেটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় অনুমান করল, 'না, ঠিক আছে। তুমি হোস্টেলে ফিরে যাও। খাওয়া-দাওয়া করে রেস্ট নাও। আগামিকাল আমার সঙ্গে যেয়ো। জরুরি কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কী কাজ ?' অনিমেষ কৌতূহলী হল।

'নির্বাচন আসছে। বাই-ইলেকশন। তোমাকে প্রচারে নামতে হবে। হাতে-কলমে অন্তত পনেরো দিন কাজ করো। থিয়োরি আর প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে কীভাবে ব্রিজ তৈরি করতে হয় শেখো। আচ্ছা এসো।'

অনিমেষ বেরিয়ে আসছে এমন সময় বিমানের কণ্ঠ ওকে থামাল, 'অনিমেষ, সুবাসদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। যারা পথভ্রষ্ট তারা কখনওই এগোতে পারে না। ও কে !'

এতক্ষণ বেশ চলছিল। হঠাৎ একদম আকাশ থেকে পেড়ে আনার মতো যাওয়ার সময় সুবাসদার প্রসঙ্গ টেনে আনল বিমান। সমস্ত উদ্দীপনা, নির্বাচনে কাজ করবে বলে যা অনিমেষকে আপ্লুত করেছিল, সুবাসদার প্রসঙ্গ তুলতেই কেমন মিইয়ে যেতে আরম্ভ করল। বিমান কি সুপরিকল্পিত ভাবেই ওই সময় সুবাসের নাম করে তাকে সতর্ক করে দিল ?

অনিমেষ অনুভব করল, অবিশ্বাস এমন একটা জিনিস যা একবার কোথাও প্রবেশ করলে লক্ষ বার চুনকামেও দূর হয় না। কিন্তু তবু অনিমেষ নিজেকে প্রফুল্ল রাখতে চাইল। এতদিন পরে সে হাতে-কলমে কমিউনিজমের পক্ষে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামী মাসে পশ্চিমবাংলার দু' জায়গায় উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে। তাকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে ? অনিমেষ যেন এখনই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।

ট্রাম রাস্তায় পা দিতেই সে নিজের নাম শুনতে পেল। চিৎকার করে যে তাকে ডাকছে সে রাস্তার ওপারে। বেশ কিছুদিন পরমহংসকে দেখতে পায়নি অনিমেষ। এখন ওকে সামনে দেখে ভাল লাগছে। অমন খাটো শরীরেও কী উজ্জ্বল মুখ। কাছাকাছি হতেই পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'বিপ্লব হল ?'

বলার ধরনে এমন একটা স্নেহমিশ্রিত শাসন আছে যে না হেসে পারল না অনিমেষ, 'কোথায় আর হল ?'

পরমহংস খপ করে ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে পানের দোকানের সামনে আনল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'নিজের বদন চেয়ে দ্যাখো একটু।' অনিমেষ দেখল দোকানের আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। নিজের এরকম বিধ্বস্ত চেহারা সে কখনও দেখেনি। এমনকী জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনজার্নি করে এসেও নয়। মাথার চুলগুলো নেতিয়ে পড়েছে, মুখ ময়লায় কালো, চোখের তলায় কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। পরমহংসের গলা পেল সে, 'একদিনেই যদি এই হাল হয় তবে দেশে বিপ্লব করবেন উনি! ননীর পুতুল।

BanglaBook.org

কুচকুচে কালোকটি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অনিমেষ বলল, 'আছ বেশ!'

পরমহংস বলল, 'আছি কোথায় ? চিরজীবন হয় হাতল নয় পোস্ট অফিস হয়েই কাটালাম। তোমার মতো মেয়ে-কপালে হয়ে জন্মানোর ভাগ্য চাই।'

'হাতল মানে ?'

'চেয়ারে থাকে। না থাকলেও ক্ষতি নেই। থাকে একস্ট্রা আরামের জন্য। যাক, পুলিশ প্যাঁদায়নি তো ?'

'না।' হেসে ফেলল অনিমেষ।

'যাচ্চলে! হিরো হয়ে যেতে পারতে প্যাঁদালে। যে দুটো কারণে তোমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম—টিউশনি করার ইচ্ছে আছে ?'

'আছে। কিন্তু আপাতত সময় পাব না। পার্টির কাজে বাইরে যেতে হবে।'

'বাঁচা গেল। পড়াশুনার ইতি হয়ে গেল তো ?'

'তা কেন ? অসুখ-বিসুখের জন্যেও তো অনেকে কামাই করে।'

'ভাল। আমি এখন কাটছি। প্রয়োজন হলে খবর দিয়ো।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'ফোকটে ছুটি পাওয়া গেল, পিচ ছেড়ে দু-একটা স্ট্রোক করে আসি। টিউশনি সেরে আসি।' পরমহংস চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে এল। রসগোল্লার মতো মুখ করে বলল, 'দ্বিতীয় কথাটাই বলা হয়নি তোমাকে!'

'কী কথা ?'

'ডান দিকের ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সামান্য এগিয়ে সোজা দোতলায় চলে যাও। কুইক।' কথাটা শেষ করে হনহন করে চলে গেল পরমহংস।

ধাঁধার মতো লাগল কথাগুলো। অনিমেষ নির্দেশ মেনে বসন্ত কেবিনের দরজায় আসতেই নাকে খাবারের গন্ধ টের পেল। এতক্ষণ যা হয়নি এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্ষুধার অস্তিত্ব টের পেল ও। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই ওর মনে হল শরীরের সব রক্ত ঢেউ হয়ে যাচ্ছে। কোনওক্রমে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল অনিমেষ।

দোতলার হলের একটা কোনার টেবিলে মাধবীলতার সামনে যে, মেয়েটি বসেছিল অনিমেষকে দেখতে পেয়েই সে উঠে দাঁড়াল, 'যাই ভাই।' মাধবীলতা ঘাড় নাড়তেই মেয়েটি আড়চোখে অনিমেষকে একবার দেখে পাশ দিয়ে নেমে গেল।

রেস্টুরেন্টে আরও অনেকে আছে। আলটপকা ছুটি পাওয়ায় ছেলেমেয়েরা আড্ডা মারছে টেবিলে টেবিলে। এদের মধ্যে দু-একজোড়া এখনই বেশ প্রসিদ্ধ। ওরাও অনিমেষকে দেখছিল। খুব শান্ত ভঙ্গিতে সে মাধবীলতার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বসতে পারি ?'

ছোট্ট একটা ভাঁজ ঠোঁটে পড়ল কি পড়ল না, কিন্তু চোখ দুটো অনেক কথা বলে ফেলল। মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল, সম্মতির।

অনিমেষ ঠিক উলটো দিকে আরাম করে বসে টেবিল থেকে একটা নিটোল জলের গ্লাস তুলে পুরোটা খেয়ে নিল।

মাধবীলতা তাকে দেখছে। এতক্ষণ সে একবারও চোখ সরায়নি। অস্বস্তি হচ্ছিল অনিমেষের, বলল, 'কেমন আছেন ?'

'চমৎকার।' কথা বলল মাধবীলতা। শব্দের উচ্চারণে অনিমেষের মনে হল কথাটার মানে খুব খারাপ আছি, খুব।

'এখানে কখন এসেছেন ?'

'এসেছি!'

কথাটা যেন একটা পেরেক ঠোকার মতো, নিশ্চিত কিন্তু অবহেলায়। অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। এই দুদিন মেয়েটির কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেনি কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্তে মাধবীলতা জড়িয়েছিল সে টের পায়নি। বুকের মধ্যে রিমরিম শব্দ, চোখ খুললেই নিজেকে সম্রাট মনে হয়।

মাধবীলতা বলল, 'দুদিন কী হয়েছিল ?'

অনিমেষ কথা বলতে পেরে বেঁচে গেল। বলল, 'হঠাৎ আমার ঠাকুরদা এসেছিলেন, আর তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন বলে বেরোতে পারিনি। হোস্টেলে একা ওরকম মানুষকে রেখেও আসা যায় না।

BanglaBook.org

অথচ একটু ভাল বোধ করতেই আর থাকলেন না। আজই ফিরে গেলেন।'

'সেকী ! তা হলে এলেন কেন ?'

'আমাকে দেখতে। আমি ওঁর কাছে মানুষ হয়েছিলাম। সে অনেক কথা।'

'আমি শুনতে চাই।'

'কেন ?'

'আমার মনে হচ্ছে শোনা দরকার।'

'কী কথা ?'

'আপনার কথা।'

'বেশ। তবে আজ থাক, অন্যদিন—।'

'আজই তো বলছি না। সময় হলে বলবেন।'

অনিমেষ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।'

মাধবীলতা বলল, 'আমি জানি।'

'আপনি কখন এসেছেন এখানে ?'

'যেমন রোজ ক্লাশ করতে আসি।'

'তা হলে আমাকে যখন ভ্যানে তোলা হল তখন দেখেছেন ?'

'দেখেছি।'

'ও।'

'কিন্তু আমি জানতাম আপনি ফিরে আসবেন।'

'মানে ?' অনিমেষ চমকে উঠল। সুদীপের প্রকাশ্য সন্দেহটা কি মাধবীলতার মনেও সঞ্চারিত হয়েছে!

'আমি প্রার্থনা করেছিলাম তাই জানতাম।'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'তাই বলুন! কিন্তু কোনও কিছু প্রার্থনা করলেই যদি পূর্ণ হত তা হলে পৃথিবীতে কোনও কষ্ট থাকত না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি যখন ভীষণভাবে কিছু চাইব তখন সেটা বিফল হবে না। কারণ আমি নিজের জন্যে কিছু চাইনি কখনও এবং এই প্রথম কিছু চাইলাম। হয়তো চাওয়া শুরু হল।'

বুক ভরে নিশ্বাস নিল অনিমেষ। ওর কষ্ট এখন পরম পাওয়ায় নতজানু, 'আমি কিন্তু ভরসা করতে শিখলাম।'

মাধবীলতা হাসল, 'আমরা কিন্তু কেউ কাউকে জানি না।'

'জেনে নেব।'

'জানার পর যদি আফশোস হয় !'

'আফশোস নয়, ভয় হতে পারে।'

'ভয়! ভয় কেন ?'

'নিজের যোগ্যতা যদি না থাকে তা হলে —।'

'যোগ্যতা সেদিনই হারাবেন যেদিন অবহেলা করতে শিখবেন। চেহারা এমন হয়েছে কেন? আজ স্নান হয়নি ?'

'সময় পেলাম কোথায় ?'

'সেকী ! খাননি ?'

'ভেবেছিলাম হোস্টেলে ফিরে খাব। হল না।'

মাধবীলতা সোজা হয়ে বসে বয়কে হাত নেড়ে ডাকল। অনিমেষ তাই দেখে আপত্তি জানাল, 'আরে করছেন কী —!'

'আপনি খাবেন তাই ব্যবস্থা করছি।'

'কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই।'

এত দ্রুত মেঘ কখনও আসে না আকাশে, দুটো চোখে সমস্ত শরীর যেন জল ছুড়ে দিল। মাধবীলতার মুখ পলকেই লাল, ঠোঁট থরথর করছে। অনিমেষ কথাটা সহজ গলায় বলেছিল, বলেই বুঝতে পেরেছিল কী হয়ে গেল ব্যাপারটা। সে মাথা নিচু করে বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি!'

'ভরসার কথা বলছিলেন না ?'

'ক্ষমা চাইছি।'

BanglaBook.org

'আপনার কোনও দোষ নেই। দিতে পারার মধ্যে একটা অহঙ্কার আছে তাই অনেকেই তা পারে। কিন্তু নিতে জানতে হয়। সেটা বড় কঠিন।'

'লতা—!'

মাধবীলতা হাসল। চোখের কোণে মুক্তো অথচ মুখে শরতের প্রথম সকাল। নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে একটু দেখল অনিমেষকে, তারপর বলল, 'মনে আছে তা হলে! লতা বড় জড়িয়ে ধরে, বিরক্তি আসবে না তো কখনও?'

অনিমেষ উত্তরটা দিতে গিয়ে দেখল বয় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধবীলতা চোখের জল মোছার চেষ্টা করল না। শান্ত গলায় বলল, 'পেট ভরে যায় এমন খাবার কী আছে তোমাদের?'

ছেলেটি চটপট জবাব দিল, 'কষামাংস আর মোগলাই পরোটা।'

মাধবীলতা বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি আনো। এক জায়গায়। আমাকে শুধু এক কাপ চা দাও।'

সেটা শুনে আপত্তি করতে যাচ্ছিল অনিমেষ, হাত প্রসারিত করে মাধবীলতা বলল, 'একদম লজ্জা করতে হবে না।'

একুশ

সরিৎশেখরের চিঠি এল। ট্রেনে কোনও অসুবিধে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কিছু লেখেননি। তবে এখনও শরীর সুস্থ হয়নি। বাড়িতে তিনি এবং হেমলতা ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণী না থাকায় সাংসারিক কাজকর্ম তাঁকেই ওই শরীর নিয়ে করতে হচ্ছে। এখন যাওয়ার জন্য তিনি তৈরি, নিজের শ্রাদ্ধ করে এসে এক অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে ডুবে আছেন। তবে তাঁর একটাই আশঙ্কা এবং সেটা হেমলতাকে নিয়ে। তাঁর যাওয়ার আগে যদি হেমলতা যেতেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন সরিৎশেখর।

এ সব লেখার পর তিনি জানতে চেয়েছেন অনিমেষ পুজোর ছুটিতে জলপাইগুড়িতে আসছে কি না! এবং সরিৎশেখর কলকাতায় তার কাছে থাকার দরুণ যে টাকা খরচ হয়েছে তার অঙ্কটা জানালে তিনি সেটা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। হাতের লেখা এক না হলে এটাকে দাদুর চিঠি হিসেবে মেনে নেওয়া শক্ত হত। দাদুর চিঠি মানেই কিছুটা উপদেশ এবং সেই সঙ্গে কড়া সমালোচনা। অথচ এই চিঠির ভাষার মধ্যে কেমন যেন শীতলতা ছড়ানো। স্বর্গছেঁড়া থেকে বাবার চিঠি আজকাল নিয়মিত আসে না। মাসের প্রথমে যে মানিঅর্ডার পাঠান তার তলায় যেটুকু জায়গা তাই এখন বরাদ্দ। সরিৎশেখর চলে যাওয়ার পর তমালের মুখে জানতে পেরেছিল অনিমেষ, তিনি অনেক কিছু জেনে গেছেন। সেদিন সে যখন সন্ধেবেলায় ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিল তখনই তিনি তমালদের খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে অনিমেষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন কিন্তু চিঠিতে সে সবের কোনও উল্লেখ নেই। শুধু এই প্রথমবার তিনি জানতে চেয়েছেন অনিমেষ ছুটিতে জলপাইগুড়িতে যাবে কিনা?

অনিমেষ অনুভব করছিল বাড়ির সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে সেটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। না, এই ছুটিতে সে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না। বিমানের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। পার্টি অফিসে গিয়ে দিন-টিন ফাইনাল করে এসেছে। আগামী উপনির্বাচনে দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারের জন্য যে দল কলকাতা থেকে যাচ্ছে তাকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে। ছুটিটা পড়ছে বলে তার ক্লাশ কামাই হবে না। অনিমেষ ঠিক করল, এ সব কথা সরিৎশেখরকে খোলাখুলিই লিখে দেবে। ওদের উপনির্বাচনের জায়গাটা জলপাইগুড়ি থেকে খুব দূরে যদিও নয় তবু সে সময় পাবে কিনা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। কথাগুলো মাধবীলতাকে জানাল অনিমেষ। আজকাল কোনও কিছু ওকে না বললে স্বস্তি পায় না সে। এখন প্রতিটি দিন শুরু হয় বুকজোড়া এক ধরনের চাপ নিয়ে। সে চাপ বুক থেকে সরে না যতক্ষণ মাধবীলতাকে সে না দেখছে। একটু একটু করে মাধবীলতা তার রক্তে মিশে যাচ্ছে। এখন ওদের দেখা কিংবা কথা হয় লাইব্রেরি, বসন্ত কেবিন, কিংবা কফি-হাউসের তেতলায়। শেষের জায়গাটাই ওদের প্রিয়, কারণ দীর্ঘসময় এককাপ কফি নিয়ে বসে থাকা যায় এবং চারপাশে এত কথার ভিড় যে স্বচ্ছন্দে নিজেদের কথা বলা যায়।

মাধবীলতাকে সে তার সব কথা বলেছে। মা যে রাতে মারা গেলেন সেই বর্ণনা শোনার সময়

BanglaBook.org

মাধবীলতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। ছোটমার কথা শুনে অবাক হয়েছিল খুব। অনিমেষ তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখে না জেনে অনুযোগ করেছিল। বলেছিল, 'তোমার ছোটমাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন?' অনিমেষের আজকাল একটা ব্যাপার খুব মজা লাগে। মাধবীলতা যখন তার পরিবারের কারও সম্বন্ধে কথা বলে তখন মনে হয় ও তাকে ভীষণ চেনে। আসলে অনিমেষের মুখে শুনে শুনে দাদু পিসিমাদের ছবিটা ওর মনে স্পষ্ট আঁকা হয়ে গেছে। এক একসময় ও এমন কথা বলে যে অনিমেষের নিজেরই ধন্দ লাগে, ওদের কে বেশি চেনে, সে না মাধবীলতা!

মাধবীলতা বলল, 'কত বড় হৃদয় থাকলে তবেই এ ভাবে তোমাকে আপন করে নেওয়া যায় সেটা তুমি বুঝবে না। তোমার ছোটমার নিজস্ব দুঃখ কিংবা কষ্টের কথা তোমরা কোনওদিন জানতে পারো নি, পেরেছ?'

'কী দুঃখ, নিজের সন্তান নেই বলে বলছ?'

'সে তো আছেই। কিন্তু সে কষ্ট ভুলে থাকা যায় যদি স্বামীর ভালবাসা কেউ বুক ভরে পায়। তোমার ছোটমা সেটা পাননি। তোমার বাবা কখনওই তাঁকে ভালবাসেননি।'

মাধবীলতার গলায় আত্মপ্রত্যয়।

'কী বলছ! ওরা এতদিন একসঙ্গে আছেন।'

অনিমেষকে থামিয়ে দিল মাধবীলতা, 'একসঙ্গে অনেকদিন থাকলেই বুঝি ভালবাসা যায়! এই শহরে তো একসঙ্গে এতগুলো মানুষ চিরকাল আছে তবু মানুষে মানুষে ভালবাসাবাসি হল না কেন?'

'কী আশ্চর্য, এ দুটো ব্যাপার এক হল? দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকলে পরস্পরকে গভীরভাবে জানতে পারে, নিজেদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিতে পারে, পরস্পরের জন্যে তখন টান জন্মায় আর হাজার হাজার মানুষ যতই একসঙ্গে থাকুক এই নৈকট্য কখনই গড়ে ওঠে না, দুটোকে এক করছ কেন?'

'বেশ, ওইভাবে থাকতে থাকতে তুমি যেটাকে টান বললে সেটা এলেই তা হলে ভালবাসা পাওয়া গেল, কী বলো?' মাধবীলতার মুখে দুষ্টুমি।

'আমি কি ভুল বলছি?' অনিমেষ একটু বিব্রত হল।

'নিশ্চয়ই। দুটো মানুষ সারা জীবন শুধু প্রয়োজনের জন্যে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে কাটিয়ে দিতে পারে। দুজনে কেউ কাউকে একটুও ভালবাসল না হয়তো। শুধু প্রয়োজনই কাছাকাছি ওদের ধরে রাখল। আবার দুজন দুই বিপরীত মেরুতে বাস করেও পরস্পরকে ভালবাসতে পারে সারা জীবন। বুঝলে মশাই।' কথাটা শেষ করে টেবিলে রাখা অনিমেষের হাতে আলতো করে চিমটি কাটল মাধবীলতা।

'বুঝলাম।' অনিমেষ গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, 'এবার বলো ভালবাসাটা কি জিনিস? মানুষ মানুষকে কেন ভালবাসে?'

কথাটা শোনামাত্র চোখ বড় হয়ে গেল মাধবীলতার। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে সে হেসে উঠল। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার হাসির দমকে, দু' হাতের চেটোয় নিজের মুখ ঢেকেও সামলাতে পারছে না। এ রকম দৃশ্য এবং শব্দ আশেপাশের অনেক টেবিলকে সচকিত করেছিল, তারা বেশ মজা দেখার মুখ করে এদিকে তাকিয়ে আছে এখন। অনিমেষ চাপা গলায় বলল, 'এই, কী হচ্ছে!' এ ভাবে হাসিতে ফেটে পড়ার কী কারণ সে বুঝতে পারছিল না।

কোনও রকমে নিজেকে সামলে মাধবীলতা বলল, 'অনেকদিন এত প্রাণ খুলে হাসিনি, তোমার জন্যে সেটা পারলাম।' বলেই আবার হাসতে লাগল, অবশ্য নিঃশব্দে।

'তোমাকে কোনও কথা সরল মনে জিজ্ঞাসা করা যায় না —!' অনিমেষ গম্ভীর হল।

'আমি তোমাকে এখন ভালবাসা শেখাব?'

'শেখাতে কে বলেছে, আমি জাস্ট আলোচনা করছিলাম —!'

'বেশ, তা হলে সরাসরি কথা হোক। তুমি রোজ আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এত ব্যস্ত হও কেন?' দুটো বড় চোখ অনিমেষের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলল। সেই চাহনির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপন অনুভব করল। সে কোনও রকমে বলল, 'তুমি জানো!'

'কথা এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'বেশ, তোমাকে না দেখতে পেলে আমার ভাল লাগে না, খুব কষ্ট হয়। ঘুম ভাঙার পরই তোমার মুখটাকে দেখতে পাই আর ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ও মুখ চোখের সামনে থেকে সরে না।'

BanglaBook.org

'মারাত্মক ব্যাপার।'

'কেন?'

'যে কোনও মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু হচ্ছে না।'

'মানে?'

'চোখের সামনে যদি আমি ছাড়া কিছু না থাকে তা হলে তুমি হাঁটাচলা পড়াশুনা করছ কী করে? সে সবই করছ অথচ —'।

'কী আশ্চর্য। এত মোটা কথা বলছ কেন? চোখ কি শুধু রক্ত-মাংসেরই? মনের যে চোখ আছে কান আছে সেটা অস্বীকার করতে পারো?'

'এবার পথে এসো। প্রত্যেক মানুষের এ রকম দ্বৈত সত্তা আছে। মুশকিল হল অনেকেই ওই দ্বিতীয়টির ব্যবহার জানে না। তারা প্রথমটি নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এবার আমার ভয় হচ্ছে তোমার এই মন কদ্দিন থাকবে!'

'আমরণ!'

'মরণ কি শুধু শরীরের? মনেরও নয় কি?'

'আমি অত বুঝি না। আমি জেনেছি তোমাকে ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নই।'

'কিন্তু এ জানায় যদি ভুল হয় —।'

'না। এটা আমি আমার সমস্ত রক্ত দিয়ে অনুভব করি।'

'কিন্তু আমি তো একজন সাধারণ বাঙালি মেয়ে। তোমার সামনে বিরাট জগৎ। রাজনীতিতে তুমি গা ভাসাচ্ছ, নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখো তুমি, একবার যদি ঝড় ওঠে তুমি উত্তাল হবে। তখন আমি কী করব?'

'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।'

'আমার যদি সে ক্ষমতা না থাকে!'

অনিমেষ মাধবীলতাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লতা, তুমি কি আমার রাজনীতিতে জড়ানো পছন্দ করো না?'

মাধবীলতা হাসল 'পাগল!'

'তবে?'

'আমার ভয় করে, খুব ভয় হয়।'

এই হল মাধবীলতা। অনিমেষ যখন ছায়া চায় তখন ছায়া দেয় কিন্তু যেই কুঁড়েমি করে তখনই রোদে পুড়িয়ে মারে। শুধু এই জন্যে অনিমেষ মাঝে মাঝে ওকে বুঝতে পারে না। ইউনিয়নের কাজে অনেক সময় ক্লাশ করা হয় না। মাঝে মাঝে মনে হত এম এ ক্লাশের বিপুল কোর্স সবই না জানা থেকে যাচ্ছে, কীভাবে পরীক্ষা দেবে—হিম হয়ে যেত শরীর। এম এ না পাশ করতে পারলে চিরকাল বাবার কাছে চোরের মতো থাকতে হবে। মাধবীলতা তাকে প্রতিদিনের ক্লাশনোটস দিয়ে যেতে লাগল। অধ্যাপক যখন নোটস দিতেন তখন সে কার্বন ব্যবহার করে টুকে রাখত। কোনও কোনও রাতে হোস্টেলে শুয়ে সেই নোটসে চোখ রেখে অনিমেষ যেন মাধবীলতাকে দেখতে পেত, কল্পনায় মাধবীলতার হাতের গন্ধ নাকে আসত। কিন্তু নিজের বুকের এই ছটফটানি সে কখনও মাধবীলতার মধ্যে দেখেনি। আর এই না দেখতে পাওয়ার জন্যে কষ্ট হয়। কেন মাধবীলতা তাকে তার মতো আঁকড়ে ধরে না, কেন পরের দিন কখন দেখা হবে এই প্রশ্ন কখনও করে না, তা বুঝতে পারে না অনিমেষ। মাধবীলতার এই নির্লিপ্ত আচরণে মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হত সে সত্যি তাকে ভালবাসে কিনা কিন্তু পরক্ষণেই এমন এক একটা কাণ্ড করত মাধবীলতা যে অনিমেষ ওই সব চিন্তার জন্যে নিজেকে অপরাধী ঠাওরাত।

হ্যাঁ, সে মাধবীলতাকে সব বলেছে। এমনকী উর্বশী যে জ্বরো মুখে ওই জলপাইগুড়ির কৈশোরে তাকে চুমু খেয়েছিল তাও। কিন্তু অনিমেষ মাধবীলতার কিছু জানে না। কোনও উগ্রতা না থাকলেও অনিমেষের বুঝতে অসুবিধে হয় না মাধবীলতারা অত্যন্ত সচ্ছল। কিন্তু কোনওদিন তাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়নি। এই ব্যাপারটায় খুব অস্বস্তি হচ্ছে অনিমেষের। অনেকদিন ভেবেছে মুখ ফুটে বলেই ফেলবে কিন্তু সঙ্কোচে সেটা সম্ভব হয়নি।

এর মধ্যে দু'এক রবিবার সে চুপচাপ বেলঘরিয়ায় গিয়েছিল। স্টেশন ছাড়িয়ে যে রাস্তাটা নিমতার দিকে গিয়েছে সেদিকেই মাধবীলতার বাড়ি। এলোমেলো ঘুরে এসেছে সে, কোনওদিন দেখা পায়নি।

BanglaBook.org

কথাটা ওকে জানাতে খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'একটা দিন দেখা না করে থাকতে পারো না কেন ? এর পরে হয়তো মাসের পর মাস না দেখা করে থাকতে হবে। অনি, আমার জন্যে তোমার সব কাজকর্ম নষ্ট হোক এটা আমি চাই না। নিজেকে সংযত করো, এ রকম তরল হওয়া তোমাকে মানায় না।'

অনিমেষ বুঝতে পারে না তার এমন কেন হল! চিরকাল সে যেভাবে কাটিয়ে এল এখন সে রকম থাকতে পারছে না কেন ? সেই ছোট্টবেলায় জলপাইগুড়িতে মা-বাবাকে ছেড়ে আসবার পর সে এক রকম একাই। নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা বলার মতো কেউ ছিল না কাছাকাছি। দাদু কিংবা পিসিমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান তাকে ওঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে অনেক কিছু থেকেই নিবৃত্ত করে। আনন্দ কিংবা দুঃখের উচ্ছ্বাস তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যে তা জানতেও পারত না। বোধহয় এইভাবেই সংযম জন্ম নেয় এবং নিয়েছিলও। অথচ মাধবীলতাকে দেখার পর সেই দীর্ঘ সময়ে গড়া দুর্গ এক মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হল, অনিমেষ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না এবং মাধবীলতার এই রকম সতর্কীকরণ কানে বড় খারাপ শোনায়।

কিন্তু সংযম অবশ্যই প্রয়োজন। ওকে না দেখতে পেলেই এই যে শূন্যবোধ এটাকে চাপা দেওয়া দরকার। আর ক'দিন বাদেই পুজোর ছুটি। তখন মাসখানেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। কথাটা মাধবীলতাও জানে। মাধবীলতার কি তাকে এক মাস না দেখতে পেলে কোনও কষ্ট হবে না! না, অনিমেষ ঠিক করল নিজেকে পরিবর্তিত করবে, এইভাবে সহজে ধরা দিয়ে বসবে না।

আজ বিকেলে মাধবীলতা বলল, 'রোজ রোজ ট্রেনে যাই, আজ বাসে যাব।' এখন ছুটির সময়। ট্রাম-বাসগুলো বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মাধবীলতা রাস্তা পার না হয়ে ধর্মতলাগামী একটা প্রাইভেট বাসে উঠে পড়ল। উলটোমুখ বলে বাসটা খালি। ধর্মতলায় বোঝাই হয়ে বেলঘরিয়ায় ফিরবে। জানলার পাশে একটা জায়গায় বসে মাধবীলতা বলল, 'সব সমস্যার সমাধান আছে, শুধু রাস্তাটা খুঁজে নিতে হয়।'

অনিমেষ বলল, 'ডবল ভাড়া দিতে হবে।'

মাধবীলতা বলল, 'প্রয়োজনে তাই দিতে হয় বইকী।'

অনিমেষ একটু উষ্ণ গলায় বলল, 'তুমি সব কথাই দু'রকম মানে সাজিয়ে বলো। কেন, সহজ কথাটা সহজ গলায় বললে মান যায় নাকি!'

মাধবীলতা আস্তে আস্তে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অনিমেষ খেয়াল করেনি, অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা দেখছিল। ওয়েলিংটনের মোড় পার হতেই বাসটা দ্রুত ভরে গেল। লেডিস সিট উপচে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেরা যারা বড় ধরে রয়েছে তারা মাধবীলতার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছে। কোনও মেয়ে সাধারণ সিটে বসলেই পুরুষরা সেটাকে মানতে পারে না। অথচ সেগুলো তো শুধু পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়, তবু।

অনিমেষ কিছু বলার জন্য ডাকল, 'এই!' ডাকটা না শোনার মতো নয়, মাধবীলতা মুখ ফেরাল না। অনিমেষ অবাক হয়ে আবার ডাকতেই সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো ওদের দিকে তাকাল। এবারও মাধবীলতার কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। অনিমেষের খুব অস্বস্তি এবং এক ধরনের ভয় হল। পাশ থেকে সে যেটুকু দেখছে তাতে বুঝতে পারছে মাধবীলতার মুখের প্রতিটি ভাঁজ এখন টান টান। দাঁত দিয়ে হয়তো নীচের ঠোঁট চেপে রেখেছে। সে ডাকছে অথচ মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না, এই তথ্যটা যদি আশেপাশের লোকজন টের পেয়ে যায় তা হলে ওদের ঔৎসুক্য আরও বেড়ে যাবে। এই মুখ অনিমেষের অচেনা। যদি হঠাৎ কোনও রূঢ় কথা বলে বসে তা হলে এদের কাছে নির্ঘাত অপমানিত হবে বলে আবার ডাকতে তার ভয় করছিল। সে চেষ্টা করল নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকতে। কিন্তু কিছুতেই তার বোধগম্য হচ্ছিল না মাধবীলতা কেন এ রকম আচরণ করছে। তাদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাটি হয়নি, আঘাত লাগতে পারে এমন কিছু সে করেনি, তবে ? ওই মুখ দেখতে অনিমেষের খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আর কথা বলার মতো সাহস সে পাচ্ছিল না।

বাসটা এখন স্ট্যান্ডে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ইডেন গার্ডেনের পাশে বাবুঘাটে স্টিমারের ডাক শোনা যাচ্ছে। চার পাশে নানান রকম হকার আর বেড়াতে আসা মানুষের ভিড় জায়গাটাকে মেলার চেহারা দিচ্ছিল। অনিমেষ দেখল জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে ইডেন থেকে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। অনেকের ভঙ্গিতে একটা চোর চোর ভাব আছে। ইডেন কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যে সব জায়গায় সবাই প্রেম করতে যায়, সেখানে মাধবীলতাকে নিয়ে সে কখনও যায়নি। ইউনিভার্সিটির

চার পাশে যেসব খোলামেলা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানেই কথা বলেছে ওরা। প্রেম করলেই সকলে বোধ হয় নির্জনতা খোঁজে, চায়ের দোকানের কেবিনে গিয়ে ঢোকে। আশ্চর্য, ওদের মাথায় সে রকম চিন্তা আসেনি কেন ? অনিমেষের খেয়াল হল সে এখনও মাধবীলতার হাত পর্যন্ত ধরেনি। এই যে এখন সে পাশে বসে আছে, স্বাভাবিকভাবেই ওর শরীরের স্পর্শ লাগছে কিন্তু এই মুহূর্তেই সে সম্পর্কে সচেতন হল অনিমেষ। এবং হওয়ার পর আরও সংকুচিত হয়ে পড়ল।

মাধবীলতা হঠাৎ কথা বলল। বাইরে থেকে মুখ সম্পূর্ণ না ফিরিয়ে চাপা গলায় উচ্চারণ করল, 'ওই রকম হলে খুশি হন জানি, তা আমার কাছে কেন, ওই একটা জুটিয়ে নিলেই পারেন।'

কথাটা বুঝতে কয়েকপলক গেল, অনিমেষ চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটি জোড়া ইডেনের দিকে ঢুকছে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে। তার একটা হাত ছেলেটির কোমরে আর ছেলেটির হাত মেয়েটির কাঁধে। কী কারণে ওরা অমন হাসছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আশেপাশের লোকজনের কৌতুকের চোখ ওদের গ্রাহ্যবস্তু নয় এটা বোঝা যাচ্ছিল। যে কোনও মানুষের চোখে ওদের ভঙ্গিতে একটা বেলেল্লাপনা ধরা পড়বে, অনিমেষের খারাপ লাগল। কিন্তু মাধবীলতার ইঙ্গিত বোঝামাত্রই তার মুখে রক্ত জমে গেল। তার সম্পর্কে এতটা নীচ ইঙ্গিত করতে পারল ও ? শুধু শারীরিক প্রয়োজনেই সে মাধবীলতাকে কামনা করে ? এই তা হলে তার সম্পর্কে ধারণা ? অনিমেষের মনে হল এখনই এই সিট থেকে উঠে যায়। এই অপমানের পর আর পাশাপাশি বসে থাকা যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আর একটা অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করল। মাধবীলতাকে হারিয়ে সে থাকবে কী করে। ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে। হয়তো কোনও কারণে মাধবীলতা নিজেকে বেসামাল করে ফেলায় এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলছে। কিন্তু মন যখন শান্ত হবে তখন নিশ্চয়ই এই কথাটার জন্যে সে লজ্জা পাবে।

পালটা যুক্তি খুঁজে পেতে অনিমেষ সিট ছেড়ে উঠল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা হীনমন্যতাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। বুকের ভেতর একটা ভারী কিছু অনড় হয়ে আছে। বাসটা চলতে শুরু করলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। ভিড়ের চাপাচাপিতে আশেপাশের মানুষরা আর তাদের ভাল করে নজর করছে না দেখে অনিমেষ চাপা গলায় বলল, 'তুমি এ রকম করে বলতে পারলে ?'

মাধবীলতা উত্তর দিল না। যেন অপরিচিত সহযাত্রিনীর মতো চুপ করে বসে থাকল।

অনিমেষ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'শুনছ!'

মাধবীলতা নির্বিকার কিন্তু ওপরের একটা মুখ বলে উঠল, 'কিছু বলছেন ?'

অনিমেষ হতভম্ব হয়ে মুখ তুলে দেখল একটি টিয়াপাখির নাক বসানো মুখ ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সে চটপট বলে উঠল, 'না, না, কিছু বলিনি।'

'কিছু বলেছেন না তো তখন থেকে বিড়বিড় করছেন কেন ?'

রাগ হয়ে গেল এই গায়ে পড়াভাব দেখে। অনিমেষ বলল, 'কী যা-তা বলছেন!'

'যা-তা বলছি ! আই বাপ!' লোকটা মুখ ঘুরিয়ে আশেপাশের ঝুলে থাকা মুখগুলোকে বলল, 'তখন থেকে দেখছি মেয়েটিকে জ্বালাতন করছে, বিড়বিড় করে কথা বলে যাচ্ছে, আবার চোখ রাঙানো দেখেছেন।'

'বাসে ট্রামে এই হয়েছে আজকাল। মেয়েরা যে নিশ্চিন্তে একা একা যাবে তার উপায় নেই। কান ধরে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া উচিত।' আর একটি কিলবিলিয়ে উঠল। অনিমেষ মহা ফাঁপরে পড়ল। আশেপাশের সবাই তো বটেই, ও পাশের মহিলারা পর্যন্ত ঝুঁকে তাকে লক্ষ করছে। সে দ্রুত মাধবীলতাকে দেখল। তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বাইরের দিকে তাকানো। যেন ছুটন্ত ফুটপাতগুলোয় পৃথিবীর যাবতীয় দেখার জিনিস ছড়িয়ে আছে। বাসের ভেতর এখন যে কথাবার্তা চলছে তা ওর কানে মোটেই যায়নি। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চট করে সামলে নিল অনিমেষ। এখন চলে যাওয়া মানে এই লোকগুলোর ইঙ্গিতকে সত্যি প্রমাণিত করা।

একটি হেঁড়ে গলা বলে উঠল, 'ভদ্রভাবে যদি বসে থাকতে না পারেন তা হলে ঘাড় ধরে বের করে দেব বাস থেকে।'

মাথায় আগুন জ্বলে গেল অনিমেষের, চিৎকার করে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলুন!'

একটা হুড়োহুড়ি শুরু হওয়ামাত্র কন্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, 'বাসের ভেতরে নয়, বাইরে গিয়ে করুন। ও দাদারা —।'

কলকাতার মানুষ নিজে দর্শক হয়ে দূরত্বে থাকতে ভালবাসে। অন্য কেউ শুরু করে দিলে ছুঁক ছুঁক করতে পারে এইমাত্র। সমস্বরে গলাগুলো কন্ডাক্টরের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'নামিয়ে দিন

BanglaBook.org

তো মশাই, মেয়েদের বিরক্ত করবে আর বললে চোখ রাঙাবে। এদের জন্যেই ছেলেদের বদনাম হয়।'

ভিড় ঠেলে কন্ডাক্টর অনিমেষের সামনেএসে দাঁড়াতেই অনিমেষ বসে পড়ল। উত্তেজনায় ওর শরীর এখন থরথর করে কাঁপছে। এবং উত্তেজিত হলেই পেটে যে চিন চিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে সেটাও বাদ গেল না। কন্ডাক্টর কড়াগলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ও মোশাই, কোথায় যাবেন আপনি ?'

হাতিবাগান বলতে যাচ্ছিল অনিমেষ কিন্তু তার আগেই একটা হাত কন্ডাক্টরের উদ্দেশে এগিয়ে গেল। গম-রঙা সেই হাতের কব্জিতে একটা মকরমুখী বালা। হাতের শেষে আঙুলের চাপে একটা এক টাকার নোট ধরা। মাধবীলতার গলা শুনল অনিমেষ, 'দুটো বেলঘরিয়া দিন।'

'দুজন কে ?' কন্ডাক্টর টাকা ভাঁজ করে আঙুলের ফাঁকে গুঁজে পয়সা বের করছিল। হাত দিয়ে অনিমেষকে দেখাল মাধবীলতা।

কন্ডাক্টর এক গাল হেসে বলল, 'আপনারা একসঙ্গে, ও হ্যাঁ, কলেজ স্ট্রিট থেকেই তো উঠেছিলেন।' কথাটা শেষ করে আশেপাশের জনতার দিকে বাঁকা গলায় জানাল, 'আপনারা মাইরি সব জায়গায় সিনেমা করেন।'

এক পলকেই অনিমেষ দেখল আশেপাশের মুখগুলো হাওয়া বেরুনো মুখের মতো ঝুলছে। কিন্তু কারও দিকে তাকাতে ওর ইচ্ছে করছিল না। এই সময় লোকগুলোকে একহাত নেওয়া যেতে পারত কিন্তু তার প্রবৃত্তি হল না। হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না অনিমেষ। কারণ মাধবীলতা টিকিট কাটার পর আবার একই ভঙ্গিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাসের ভেতর যে নাটকটা হয়ে গেল সে সম্পর্কে যেন মোটেই ওয়াকিবহাল নয়।

অনিমেষের খেয়াল হল দুটো বেলঘরিয়ার টিকিট কাটা হয়েছে। কেন ? ও রহস্যটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল। এবার স্বাভাবিক গলায় কিন্তু অন্য কেউ স্পষ্ট শুনতে পেল না। মাধবীলতা ঘাড় না ঘুরিয়েই জবাব দিল, 'ইচ্ছে করলে হাতিবাগানে নেমে যেতে পারেন।'

এবার জেদ চেপে গেল অনিমেষের। হাতিবাগান শ্যামবাজার পেরিয়ে বাসটা যখন বি টি রোড ধরল তখনও ওরা তেমনি চুপচাপ বসে। লাস্ট স্টপে নামার পর মাধবীলতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে সে। তখন নিশ্চয়ই এই ঝুলন্ত মুখগুলো আশেপাশে থাকবে না। এটা না করলে হোস্টেলে ফিরে কিছুতেই স্বস্তি পাবে না অনিমেষ।

বিকেলটা দুদ্দাড় করে ছুটে গেল অন্ধকারে। সন্ধে হয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠছে চার ধারে। এত দেরি করে মাধবীলতা কখনও বাড়ি ফেরে না। আজ এই বাসে চড়ে যাওয়ার আবদারের জন্যেই এটা হল। বাড়ি ফিরে বকুনিটা অবশ্যই জোটা উচিত আজ। অনিমেষ নড়েচড়ে বসল।

বেলঘরিয়া স্টেশনের সামনে যখন বাসটা থেমে গেল তখন অল্পই যাত্রী তাতে। মাধবীলতার পেছনে পেছনে নীচে নামতেই অনিমেষ বলল, 'দাঁড়াও।'

মাধবীলতা দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এখানে নাটক করতে হবে না।'

'কিন্তু আমার কিছু কথা আছে। এ ভাবে অপমান করলে কেন ?'

'এখানে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে পারব না। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলো।'

'তোমার বাড়ির দিকে যাব ?'

'আমাদের পাড়ার অনেকেই এখন তোমাকে দেখছে। এখান থেকে চলে গেলে আমার বদনামের গল্পটা ছড়াবে। তার চেয়ে বাড়িতে যাওয়াটা শোভন হবে। এসো। মাধবীলতা পা বাড়াল।

এর আগে কখনই অনিমেষকে বাড়িতে যেতে বলেনি মাধবীলতা। আজকের ওই রকম আচরণের পর এই নিমন্ত্রণটা কেমন বেমানান ঠেকছে। তা ছাড়া একটা পরিস্থিতির চাপে পড়েই তাকে যেতে বলছে ও। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আরও খারাপ দেখায়। আশেপাশের চায়ের দোকান থেকে অনেক চোখ এখন এদিকে সেঁটে আছে। অনিমেষ মাধবীলতাকে অনুসরণ করল।

লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে মাধবীলতা খানিক ইতস্তত করল। অনিমেষ পাশাপাশি হাঁটছিল, জিজ্ঞাসা কলল, 'কী হল ?'

'আমাদের বাড়ি তোমার ভাল লাগবে না।'

'কেন ?' অনিমেষ প্রশ্নটা করতেই একটা সাইকেল রিকশা এগিয়ে এল, 'আসেন দিদিমণি।'

মাধবীলতা রিকশাওয়ালার দিকে চেয়ে একটু হাসল। অনিমেষ বুঝল ওরা সবাই মাধবীলতাকে চেনে। মাধবীলতা রিকশায় উঠতে উঠতে বলল, 'যা থাকে কপালে, উঠে পড়ুন, নিজের চোখে দেখে যদি মতিগতি পালটায়।'

BanglaBook.org

পাশাপাশি বসতে কোনও অসুবিধে হল না। রিকশাওয়ালা যে রকম দ্রুত চালাচ্ছে তাতে অনিমেষের ভয় হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অবিরাম হর্নের শব্দে ওরা ঘিঞ্জি এলাকাটা পেরিয়ে এলে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে তোমার এত কুণ্ঠা কেন?'

মাধবীলতা কথা বলল না, কিন্তু সেই টিপিক্যাল হাসিটা হাসল যার কোনও স্পষ্ট মানে ধরা যায় না। অনিমেষের এ রকম হাসি শুনলে খুব রাগ হয় কিন্তু বাসে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে এখন কথা বাড়াল না। শুধু বলল, 'তোমার যদি আমাকে বিরক্তিকর মনে হয় সোজাসুজি বলে দিয়ো। আমি কী করব সেটা আমার ব্যাপার, ওটা আমাকেই বুঝতে দাও।'

অন্ধকারে মাধবীলতার ঠোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ পড়ল। অনিমেষের মনে হল এটা হাসির চেয়েও মারাত্মক।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে রিকশাওয়ালা জোর প্যাডেল ঘোরাচ্ছে। তার মানে মাধবীলতাকে অনেকখানি এসে রোজ ট্রেন ধরতে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এটাও কি বেলঘরিয়া?'

'না, নিমতা। একদম মফস্বল লাগছে, তাই না!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভাল লাগছে।'

'এক-আধ দিনই লাগে। পুরনো হলে আর কিছুই আকর্ষণীয় থাকে না। ওর বলার ধরনটা এমন যে দ্বিতীয় অর্থটি বুঝতে অসুবিধে হল না।

প্রায় মাইল দেড়েক যাওয়ার পর একটা গলিতে ঢুকে মাধবীলতা ভাড়া মিটিয়ে রিকশাটাকে ছেড়ে দিল। ডানদিকে অন্ধকারেও একটা বড় পানাপুকুর দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের বাড়িগুলো বাগানসুদ্ধ কিন্তু বয়সের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। মাধবীলতা বলল, 'আপনি আমার কাছ থেকে একটা বই নিতে এসেছেন।'

অনিমেষ কথাটা অনুধাবন করার আগেই গেট খুলে ভেতরে ঢুকে ডাকল, 'আসুন।'

গেটের ওপরই মাধবীলতার ঝাড় বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। সামনেই একটা ভাঙাচোরা পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। দু-একটা ঘরে আলো জ্বলছিল মাত্র, পেছনে পুকুরের আভাস। মাধবীলতা রোয়াকে উঠে অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। একজন নুয়ে পড়া বৃদ্ধা খ্যানখেনিয়ে উঠলেন, 'এতক্ষণে আসা হল মেয়ের! ইদিকে তোর বাপ-মা এতক্ষণ বসে থেকে চলে গেল খিদিরপুর।'

'খিদিরপুর কেন?'

'অঞ্জলির মামাতো ভাই এয়েছে না? তোকে নিয়ে যেতে বলেছিল।'

'অ।' মাধবীলতা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আসুন।'

'কে ওখানে?' বৃদ্ধার গলা শুনে অনিমেষ ইতস্তত করল এগোতে।

'আমার সঙ্গে পড়ে। তুমি চায়ের জল বসাও যাও। আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?' অনিমেষ অত্যন্ত সন্তর্পণে উঠে এল। বৃদ্ধা তাকে জরিপ করছেন। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না ওঁকে প্রণাম করবে কিনা। মাধবীলতার কে হন উনি বোঝা যাচ্ছে না। মাধবীলতার পেছনে পেছনে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকতেই মাধবীলতা বলল, 'বসুন। আমি আসছি।'

অনিমেষ সেকেলে ঘরটাকে দেখল। দু-তিনটি চেয়ার, একটা তক্তাপোশ। জানলাগুলো বন্ধ। বাইরে বুড়ির গলা শোনা গেল, 'একটা উটকো ছেলেকে হুট করে বাড়িতে ঢুকালি। বাপ-মা শুনলে কী বলবে?'

'সে আমি বুঝব, তুমি চা বসাও।'

'আজ বাদে কাল যার বিয়ে —।'

'কে বলেছে?'

'অঞ্জলির মামাতো ভাই কী জন্যে এসেছে?'

'বেশি বাজে কথা না বলে এখন যাও।'

কয়েক সেকেন্ড বাদেই মাধবীলতা ঘরে এল। এসে বলল, 'এই আমাদের বাড়ি। মা-বাবা এখন নেই তাই আলাপ করাতে পারলাম না।'

'উনি কে?'

'কদুমাসি। ভাল নাম কাদম্বিনী। আমাকে মানুষ করেছেন।'

BanglaBook.org

'আমি আসায় বোধহয়—।'

'একেই আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। এ বাড়িতে এ ভাবে কথা বলবেন না। আর কদ্দিন থাকা যাবে কে জানে!'

'কেন?'

'শুনতে পাননি? বিয়ের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেছেন সবাই।'

অনিমেষ কথা বলল না। একবার ভাবল বলে, 'ভালই তো' কিন্তু পারল না।

হঠাৎ মাধবীলতা কেমন শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল, 'আমার কিছু হলে তুমি ভার নিতে পারবে?'

সমস্ত রক্ত এখন বুকের মধ্যে। আর এ রকম সময়ে পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় মনে হল অনিমেষের। সে পরিষ্কার গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

ওরা অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। এর মধ্যে বৃদ্ধা এসে চা দিয়ে গেছে। এক চুমুকে সেটা শেষ করে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আজ যাই।'

মাধবীলতা মুখে কিছু না বলে ঘাড় কাত করল। তারপরই হঠাৎ উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত মায়াময় চাহনিতে অনিমেষকে ভরিয়ে দিল। একটা হাত আলতো করে অনিমেষের বুকের ওপর রাখল মাধবীলতা, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

'কেন?' নিজের হৃৎপিন্ড যেন মাধবীলতার হাতের তলায় এমন অনুভব অনিমেষের। মাধবীলতা তো কোনও অন্যায় করেনি, তা হলে ক্ষমা কীসের?

হাত না সরিয়ে মাধবীলতা বলল, 'লোকে যে যাই বলুক আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি কড়া গলায় কিছু বললে আমি সইতে পারব না।'

অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, 'আমি কি কিছু বলেছি?'

'এবার থেকে আমি সহজ কথাটা সহজ গলায় বলব।'

অনিমেষের মনে পড়ল। বাসে উঠে সে ওই কথাটা বলার সময় খুব বিচ্ছিরিভাবে ধমকেছিল। কিন্তু সেটা তার মনে ছিল না, নেহাত অভ্যেসেই কথা বলা। তাই যে এই মেয়ের এমন করে লেগেছে তা কে জানত।

সে মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাল। ওকে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু কিছুতেই হাত উঠল না ওপরে। মুখ নামিয়ে সে ওর চুলের ঘ্রাণ নিয়ে বলল, 'আমি আর তোমাকে আঘাত দেব না।'

উজ্জ্বল হাসিতে মাধবীলতার মুখ এখন মাখামাখি। হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'দেখো, আমি ঠিক তোমার মতো হব। কোনও রকমে পরীক্ষাটা অবধি যদি এড়াতে পারি তা হলে আর কোনও চিন্তা করি না।'

চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না মোটেই। তবু অনিমেষ বলল, 'যাই।'

মাধবীলতা বলল, 'না। বলো আসি।'

হাসল অনিমেষ, 'আচ্ছা! আসি তা হলে।'

গেট অবধি পৌঁছে দিল মাধবীলতা। ভীষণ হালকা লাগছে এখন, অনিমেষ গলিটা পেরিয়ে এসে পেছনে তাকাল। আবছা অন্ধকারে মাধবীলতার শরীরের আদল দেখা যাচ্ছে। নিজেকে এখন সম্রাটের মতো মনে হচ্ছে তার। ওর মাথায় কোনও চিন্তাই জায়গা পাচ্ছিল না। এখনও যে বাবার টাকায় তাকে মাস চালাতে হয়, অনিশ্চিত রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছে, ব্যাক্তিগত কোনও আয়ের সংস্থান নেই, মাধবীলতার ভার নিতে হলে এই কলকাতায় একটা বাড়ি নিদেনপক্ষে একটা ঘর দরকার এবং সেটা পেতে হলে টাকা চাই—এ সব অত্যন্ত নগণ্য মনে হল। এ সব সমস্যা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে কোনও লাভ নেই। মাধবীলতা যদি তার পাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে সব সমস্যাই সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। অনিমেষ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

BanglaBook.org

বাইশ

খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল ঘটনাগুলো। জীবনটা কী এইরকম? যখন কিছু ঘটে না তখন দমবন্ধ গ্রীষ্মের দুপুরের মতো থমকে থাকে সব কিছু। আর যখন ঘটার পালা আসে তখন উত্তাল ঢেউ-এর

মতো, কোনও কিছু গ্রাহ্য না করে বেপরোয়া ছুটে চলে। সেইরকম ছুটে যাওয়ার সময় যেন এই দিনগুলো। অনিমেষ পেছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ পাচ্ছিল না।

সুবাসদার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন। খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে সে কিন্তু সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে দুবার সুবাসদা নিজে আসবে বলে আর আসেনি। এখন অনিমেষদের কাজকর্ম খুব বেড়ে গেছে। পার্টি অফিস-ইউনিভার্সিটি করতে করতে অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন লোকের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হচ্ছে। কিন্তু পুরনো যারা রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট নয়, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে আসছে। যেমন পরমহংস। যেদিন সময় পায় সেদিন ক্লাশ করতে গেলে দেখা হয়। একই রকম আছে ছেলেটা। এই যেমন আজ দেখা হতেই বলল, 'মালকড়ির শেয়ার পাচ্ছ মনে হচ্ছে গুরু। কামিয়ে নাও যত পারো।'

অনিমেষ হকচকিয়ে বলল, 'শেয়ার পাচ্ছি মানে ?'

পরমহংস বলল, 'তুমি যদি ভূত হও তা হলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে। তা না হলে এখান থেকে ফায়দা তুলবে।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে ?'

পরমহংস বলল, 'মাল গুটোচ্ছ বেশ।'

অনিমেষ প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল। কোনও লাভ নেই। যে নিয়মটা চালু হয়ে গেছে তার বাইরে চিন্তা করতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই মুহূর্তে তার পকেটে মাত্র দুটো টাকা পড়ে আছে। মাসের শেষ হতে অনেক দেরি এবং এতবড় কলকাতায় তাকে ওই টাকায় মাসটা চালাতে হবে। পরমহংস ওর মুখের পরিবর্তন লক্ষ করে বলল, 'একসময় তুমি টিউশনি করবে বলে খেপে উঠেছিলে। অথচ এখন সে সব কথা ভুলেও বলো না। তার মানে তোমার টাকার দরকার নেই। ঠিক কিনা ?'

অনিমেষ বলল, 'তা নয়। আসলে আমি বোধহয় খুব উদ্যোগী ছেলে নই। যা মাথায় আসে তাই করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা ছাড়া পার্টির কাজে এত সময় দিতে হয় যে ধরা-বাঁধা অনেক কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজ করতে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। কিন্তু আমি এ কাজ না করেও পারব না। তার ফলে অনেক আর্থিক কষ্টের মধ্যে আমাকে দিন কাটাতে হয়, বিশ্বাস করো, রাজনীতি করে যারা পয়সা পায় তাদের সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হয়নি এবং সেই ভূমিকায় নিজেকে দেখার কোনও আগ্রহ নেই।'

পরমহংস বলল, 'এরকম নেশার কোনও মানে আমি বুঝতে পারি না। যখন সময় চলে যাবে তখন দেখবে তোমার স্কোরে একটাও রান জমেনি। তুমি কি ভাবছ এই করে দেশের চেহারা পালটে দিতে পারবে ? মিছিমিছি নিজেকে নষ্ট করার কোনও মানে হয় !'

অনিমেষ বলল, 'এইরকম চিন্তা যদি সবাই করে তা হলে আগামী দশবছর পরে দেশের কী অবস্থা হবে তা ভাবতে পারো ?'

পরমহংস বলল, 'এখন কথাটা মানছ না, পরে বুঝবে। তুমি যাই বোঝাতে চাও দেশের সাধারণ মানুষ তা বুঝবে না। তারা একটা জিনিসই জানে, যে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবে সেই তাদের বন্ধু। ওসব ইজম-টিজমে ওদের কিছু যায় আসে না। সব শালা আমরা দারোগাবাবু হয়ে বসে আছি। হাঁসে ডিম পাড়ুক আমরা হাফবয়েল খাব। তা তোমার পরীক্ষা-টরীক্ষা দেবার ইচ্ছে আছে ?'

অনিমেষ বলল, 'কোনও লাভ নেই দিয়ে তবুও দেব।'

পরমহংস বলল, 'লাভ নেই জেনেই তো এম-এ পড়তে এসেছি বাংলায়। দু' বছর ভাল মেয়ের সঙ্গে আড্ডা মারার এই সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ? কপালে কোনও ব্যাঙ্ক বা সরকারি অফিসের কেরানিগিরি অপেক্ষা করছে তা তো জানি। কিন্তু পরীক্ষা না দিলে প্রেস্টিজ থাকে না। তুমি তো ক্লাশ করছ না, পড়াশুনা হচ্ছে কি ?'

অনিমেষ বলল, 'লাস্ট দু'মাসে ম্যানেজ হবে না ? তুমি কী বলো ?'

রামকৃষ্ণর মতো মুদ্রা করল হাতের আঙুলে পরমহংস। তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তোমাকে শোভনাদি খুঁজছিল, একদিন দেখা কোরো।'

'কেন, কী ব্যাপার ?'

'টিউশনির জন্যে গিয়েছিলে, বোধ হয় সেই ব্যাপারেই।'

'ভদ্রমহিলা বেশ ভাল।' আন্যমনস্ক গলায় বলল অনিমেষ।

'তাই নাকি ? স্পিন ধরেছে মনে হচ্ছে!'

BanglaBook.org

'ইয়ার্কি মেরো না।' মহিলার মুখে একটা ব্যথার ছায়া ঘোরে।'

'দয়া করে সেই ছায়াটা সরাবার চেষ্টা কোরো না, তা হলেই উনি আরও ব্যথা পাবেন। তোমার বান্ধবী আসছেন, আমি চলি।'

পরমহংস ঘুরে দাঁড়াতেই অনিমেষ দেখল মাধবীলতা আসছে। বেলঘরিয়া থেকে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি অনিমেষের। সাদা জামা সাদা শাড়িতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সে পরমহংসের হাত ধরে বলল, 'এই, পালাবে না।'

মাধবীলতা সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসল, 'কী খবর ?'

অনিমেষ বলল, 'কোথায় ছিলে ?'

'লাইব্রেরিতে। আমাদেরতো পাশ করতে হবে।'

'একে চেনো ?'

সঙ্গে সঙ্গে পরমহংস সামান্য ঝুঁকে নমস্কার করে বলল, 'ঈশ্বর, এও আমাকে শুনতে হল, অনিমেষ আমার পরিচয় দিচ্ছে!'

অনিমেষ দেখল মাধবীলতা হাসছে এখনও। সে বলল, 'তোমরা কি আগে থেকেই—' পরমহংস হাত নেড়ে জানাল, 'অফকোর্স। আমিই তো ফার্স্ট ওর পেছনে লাইন দিই, তুমি তো পেছন থেকে ওভারটেক করে চেয়ার দখল করলে। আমার কপালই এইরকম, বন্ধুরাই শত্রু হয়।' ওর বলার ভঙ্গি এমন যে মাধবীলতা হাতের খাতা দিয়ে ওকে কপট আঘাত না করে পারল না। শরীর খর্বকায় বলে পরমহংস মাথা নিচু করে একপাশে সরে গিয়ে উচ্চগ্রামে হাসতে শুরু করল। অনিমেষের মনে পড়ল, তার অ্যারেস্ট হওয়ার বিকেলে এই পরমহংসই ওকে খবর দিয়েছিল বসন্ত কেবিনের ওপরে মাধবীলতা বসে আছে। সে ব্যাপারটা বলতেই পরমহংস বলল, 'দারুণ ব্যাপার হয়েছিল সেদিন। আমি ইউনিভার্সিটির উলটো ফুট থেকে দেখলাম তুমি ফালতু ফালতু শহিদ হয়ে গেলে —'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ফালতু ফালতু মানে ?'

'নিরীহ হরিণশাবকের মতো তুমি রাস্তা পার হচ্ছিলে আর পুলিশ ভ্যানটার তখন একটা কেস দেখাবার প্রয়োজন ছিল তাই টুক করে তোমায় তুলে নিল। কোনওরকম বিপ্লব বিদ্রোহ নয়, ঠাকুরঘরে ঢোকার মতো তুমি ভ্যানের ভেতরে ঢুকে গেলে।'

অনিমেষ হাসল, 'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? পুলিশ চলে গেলে তুমি ছাত্রদের কাছে বিপ্লবী হয়ে গেলে। কমরেড অনিমেষের মুক্তি চাই, বাপস! মেয়েরা গুজব ছড়াতে লাগল। অনেক লড়াই করে তুমি ধরা দিয়েছ এইসব। তাই এই মহিলাও বোধহয় সেইসব গুজবের একটি শ্রবণ করে বসন্ত কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমি কি ছাই সে সব জানতাম। দেখলাম একা হরিণ কচি ঘাস খাচ্ছে। দেখে নির্মল হৃদয়ে পাশে গিয়ে বসলাম, নিজের পরিচয় দিয়ে লাইন করার চেষ্টা করলাম।'

মাধবীলতা ঠোঁট কামড়ে বলল, 'কীসের লাইন ?'

'একটা মোঘলাই পরোটা আর চায়ের।'

'ওমা!' মাধবীলতা হতবাক।

অনিমেষ বলল, 'খাওয়াল না ?'

'খাওয়াবে কী ! এক ডজন অমাবস্যা মুখে নিয়ে বসে থাকলে কাউকে খাওয়ানোর কথা মনে আসে। আমি শালা আলাপ জমাবার জন্যে কারেন্ট টপিক ব্যবহার করতেই ফেঁসে গেলাম।' আফশোসের মুখ করল পরমহংস।

'ডিটেলস প্লিজ।'

'যেই বললাম, অনিমেষ একটা দারুণ ছেলে। চেনেন নিশ্চয়ই ? আমাদের সঙ্গে পড়ে মাই ফ্রেন্ড। আজ পুলিশকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভ্যানে উঠে বাড়ি চলে গেল। অমনি এই মহিলা ভেঙে পড়লেন।'

'মোটেই না, একদম ইয়ার্কি করবেন না।' ফুঁসে উঠল মাধবীলতা।

'বেশ, তা হলে একা একা বসন্ত কেবিনে কী করছিলেন ?'

'আশ্চর্য। আমি ওখানে চা খেতে যেতে পারি না ?'

'একা একা ?'

'হ্যাঁ। আপনারা যেটা পারেন সেটা একটা মেয়ের পক্ষে কি পারা অন্যায় ?'

হাত জোড় করল পরমহংস, 'ক্ষমা করুন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু এতসব শোনার পরও যদি হৃদয় না গলে তা হলে আফশোসের কথা।'

BanglaBook.org

'হৃদয় গল্পবে কী কারণে ?'

'বাং, আমি যদি খবর না দিতাম তা হলে অনিমেষ আপনার কাছে যেত ? সেই সুবাদে আমার একটা মাটন ওমলেট আর কফি পাওনা হয়ে আছে।'

'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন, আর একদিন খাওয়াব। আজ আমার কাছে বেশি পয়সা নেই।'

'নেই তো কী হয়েছে, ধার দিচ্ছি।'

'মানে ? আপনার কাছ থেকে ধার নিয়ে আপনাকেই খাওয়াতে হবে ? কী ডেঞ্জারাস লোক!' কপালে চোখ তুলল মাধবীলতা।

ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অনিমেষের খেয়াল হল টি. এন. জি. সেদিন ক্লাশে বলেছিলেন একবার দেখা করতে। করা হয়নি। ভদ্রলোক যদি এখনও টিচারস রুমে বসে থাকেন তা হলে দেখা করে এলে হয়। সে শুনল পরমহংস বলছে, 'ওর ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কিছু ভাবছেন ?'

'কী ব্যাপার ?' মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল।

'এই যে, শ্রীমান ক্লাশ করছেন না, দেশ উদ্ধার করতে পার্টি করছেন, এ সব করে ভবিষ্যতে গোলমালে পড়বে তা বুঝতে চাইছে না। আপনার এখন কর্তব্য ওকে বুঝিয়ে বলা।' পরমহংস গড়গড় করে বলে গেল।

'আমি কেন ?'

'দোহাই, আর খেলবেন না, আমি মাইরি কিছুতেই এইরকম খেলা সহ্য করতে পারি না। কেমন নার্ভ ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়।'

মাধবীলতা হাসল, 'দেখুন ওকে আমি খুব অল্প জানি ; তবে যদি কেউ মনে করে সে যা করছে তা ঠিক করছে তাতে কোনও বাধা দেওয়া উচিত নয় বলেই বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু যদি সাফারিংস আসে।'

'সেটা তো জেনেশুনেই ডেকে আনা হচ্ছে, তাই এলে তার জন্যে আফশোস করে লাভ কী। এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলেন না !'

অনিমেষের মনে হল এবার কথার মোড় ঘোরানো দরকার। পরমহংস ক্রমশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে আলোচনাটা। আর একটু এগোলেই নিশ্চয়ই মাধবীলতা ফোঁস করে উঠবে আর তখন সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে। সে একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, 'তোমরা এখন কী করছ ?'

পরমহংস বলল, 'কফিহাউস যাব।'

মাধবীলতা ঠাট্টা করল, 'কেন, কফি শিকার করতে ?'

পরমহংস বলল, 'কী করি বলুন, অন্য কিছুর এলেম নেই যে।'

অনিমেষ ওদের দাঁড়াতে বলে টিচার্স রুমে চলে এল। যা ভেবেছিল তাই, ঘর ফাঁকা। ফিরে এসে বলল, 'টিএনজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, উনি নেই। চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

মাধবীলতা হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ টিএনজি কেন ?'

'একদিন ক্লাশে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, আর যাওয়া হয়নি।'

কথাটা শোনা মাত্র দুজনে অবাক হয়ে অনিমেষের দিকে তাকাল। পরমহংস বলল, 'গুরুদেব লোক মাইরি। ছ'মাস আগের কথা আজ মনে পড়ল ? এরপর হয়তো দশ বছর বাদে একদিন এসে জিজ্ঞাসা করবে, 'মাধবীলতা, তুমি যেন কী কথা বলছিলে সেদিন —', কথাটা শেষ না করে দ্রুত পা চালাল সে। চিৎকার করে বলল, 'কফিহাউসে আছি, ইচ্ছে হলে এসো, নইলে চরে খাও।'

চোখমুখ লাল করে মাধবীলতা বলল, 'আচ্ছা ফাজিল তো!'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ভীষণ হাসিখুশি।'

'তা অবশ্য, মনে প্যাঁচ থাকলে কেউ এরকম কথা বলতে পারে না। যার যত প্যাঁচ সে তত গম্ভীর। এতদিন পরে দেখা হল তবু হাসি দেখলাম না।'

অনিমেষ চোখ ছোট করল, 'আমার মনে প্যাঁচ আছে ?'

'আছেই তো।' মাধবীলতা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'কী রকম ?'

'এতদিন দেখা হয়নি তবু খোঁজ নেবার ইচ্ছে হয়েছিল ?'

'তুমি ক্লাশে আসোনি ?'

'আমি কিছু বলব না।' গম্ভীর মুখে হাঁটতে শুরু করল মাধবীলতা।

BanglaBook.org

হঠাৎ এই পরিবর্তনের কোনও কারণ বুঝতে না পেরে অনিমেষের অস্বস্তি শুরু হল। সেদিন বাসে যা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যদি হয় তা হলেই সর্বনাশ। মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করলেই মনে হয় বুকের ভেতরটা টলমল করছে। সে দ্রুত পা চালিয়ে মাধবীলতার পাশাপাশি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, কী হয়েছে!'

মাধবীলতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটলেও অনিমেষ ওর গালের নীচে একটা শিরার কাঁপুনি লক্ষ করল। আর প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। চুপচাপ ওরা হেঁটে গেল অনেকটা পথ।

বড়বাজার ছাড়িয়ে যেতে গিয়ে অনিমেষ পাশের একটা রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে বলল, 'একটু চা খাব।'

'আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই।' থমথমে মুখ এখনও মাধবীলতার।

'থাক তা হলে।'

একটু ইতস্তত করল মাধবীলতা, তারপর বলল, 'আমি বসছি।'

'না, একা একা চা খাওয়া যায় না।'

কপালে ভাঁজ ফেলে মাধবীলতা অনিমেষের মুখের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকল। বেশ ভিড় দোকানটায়। একটা টেবিলে দুজন লোক বসে আছে। অনিমেষ সেদিকে এগোতেই বয় একটা কেবিনের পরদা উঁচু করে ধরে তাদের ডাকল। অনিমেষ হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করতে যেতেই অবাক হল। মাধবীলতা সেই কেবিনে ঢুকে গেল। এরকমটা কখনওই হয়নি। অনুচ্চারিত একটা শর্ত ছিল যেন ওদের, কোনও নির্জন কেবিনে বসবে না। মাধবীলতার ধারণা কেবিনের পরদা ফেলে লোকে বদমাইসি করতে বসে। অথচ আজ অমন নির্দ্বিধায় সে ঢুকে গেল কেন?

অনিমেষ কেবিনে ঢুকে বিপরীত দিকের চেয়ারে বসতেই বয়টা জিজ্ঞাসা করল, 'মোগলাই ফিসফ্রাই, ব্রেস কাটলেট, কবিরাজি — কী দেব?'

অনিমেষ বলল, 'কিছু না, শুধু চা।'

'ওনলি চা?' ছেলেটা যেন তাচ্ছিল্যের গলায় প্রশ্নটা করল। অনিমেষের রাগ হয়ে গেল বলার ধরনে। যেন রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই একগাদা খাবার খেতে হবে নইলে মান থাকবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতা বলে উঠল, 'ফিসফ্রাই আছে? তা হলে দুটো দিন।'

ছেলেটি হাসল, তারপর পরদা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হল?'

'তোমার খিদে পেয়েছে।' মাধবীলতার মুখের ভাব একটুও বদলায়নি।

'তুমি কী করে জানলে?'

'মুখ দেখলেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু আমার পকেটে মাত্র দুটো টাকা আছে। এতে মিটবে?'

এবার বিচলিত হল মাধবীলতা। আজ ব্যাগ নিয়ে আসেনি, হাতে শুধু খাতা ছিল। কিন্তু কোমর থেকে রুমাল বের করে তার গিট খুলে একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বের করল। একটু বিব্রত মুখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এতে হবে না?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'ছেড়ে দাও, আমি ওকে শুধু চা দিতে বলছি।'

'না,' ঘাড় শক্ত করল মাধবীলতা, 'ফিসফ্রাই খাবই। আমার হাতে সোনার বালা আছে।'

'সোনার বালা দিয়ে কী হবে?'

'জমা দিয়ে যাব, পরে দাম দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।'

একদৃষ্টে মেয়েটাকে দেখল অনিমেষ। অসম্ভব জেদি কিন্তু ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে ওকে। ব্যাপারটা যে হাস্যকর তা ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। অনিমেষের মনে হল এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় ঢোকাটাই তার অন্যায় হয়েছে। সে মুখ নামিয়ে টেবিলের কাচের তলায় রাখা মেনুকার্ডের ওপর চোখ রাখল। ফিসফ্রাই-এর দাম একটাকা চল্লিশ আর চায়ের দাম তিরিশ। অর্থাৎ তিন টাকা চল্লিশ পয়সা ব্যয় করলেই এ যাত্রায় রেহাই পাওয়া যায়। দুজনের কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেটা হয়ে যাবে কিন্তু বাড়ি ফেরা?

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার রেলের টিকিট আছে?'

ঘাড় কাত করল মাধবীলতা। তারপর খাতাটা খুলে মাসের টিকিটটা দেখায়। অনিমেষ নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'যাক, প্রব্লেম সলভড। তোমার সোনার বালা হাতেই স্থির থাক। আমাদের যা পয়সা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে দাম মেটানো যাবে।'

BanglaBook.org

বোঝাটা কমে যেতে হাসল মাধবীলতা। এই হাসি দেখলে মনে হয় একটি সুন্দর মুখের সরল বালক হাসছে। একটু আগে, হেঁটে আসার সময় যে কালো মেঘ জমেছিল তা এখন উধাও, ভাগ্যিস এই টাকার সমস্যাটা উঠেছিল, অনিমেষ মনে মনে বয়টাকে ধন্যবাদ দিল। সে একটু সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলো, তোমার কী হয়েছে?'

'যাক হোক, তোমার কিছু এসে যায়?'

'যায়। যায় বলেই তো তুমি মুখ গম্ভীর করলেই মরে যেতে ইচ্ছে করে।' অনিমেষ সত্যি কথাই বলল।

'যাও! যত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা। আমি যে ক্লাশে ছ'দিন আসিনি, মরে আছি কি বেঁচে আছি খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন নেই, না? আমি তো ভেবেছিলাম আজ তোমার হোস্টেলেই চলে যাব।' মাধবীলতা আবদারের ভঙ্গিতে কথা শেষ করল।

'পার্টি অফিস থেকে বেরুতে রোজ দেরি হয়ে যাচ্ছিল। এই যাঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার জন্যে নোট নিয়ে যাচ্ছ—মুশকিলে পড়তে হবে। যাক, কী হয়েছে বলো?'

'মেয়েদের তো এই বয়সে একটাই সমস্যা থাকে। আমার বিয়ের জন্যে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি ওদের বোঝা হয়ে আছি যেন। এ দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ।'

'এ কথাটা তুমি বলছ, কিন্তু ভাবো তো, ইউনিভার্সিটি অবধি আসার সুযোগ তো তুমি পেয়েছ! এরকম ক'টা মেয়ের ভাগ্যে ঘটছে?'

'বাঃ তাই একটা লজ্জার কথা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে?'

'লজ্জা কেন? মেয়েরা বড় হলে বাপ-মা তাকে সুপাত্রে দিয়ে জীবনটা নিশ্চিন্ত করতে চাইবে না? স্নেহ থেকেই তো এটা আসে।'

'তা হলে সুপাত্রটিকে মেনে নেব? কী বলো তুমি?'

'তোমার যদি বাসনা হয়।'

'দেখো, আমি তোমাকে ধরে রাখিনি। যদি মনে হয় আমাকে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই তা হলে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারো। কারও দয়া নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমি আমার ব্যাপার নিজেই বুঝে নেব।'

মাধবীলতার মুখ আবার থমথমে হয়ে যাচ্ছে দেখে অনিমেষ বলল, 'তখন থেকে শুধু আমায় বকেই যাচ্ছ, আসল কথাটা বলে ফেলো।'

'এমন জ্বালায় না!' মাধবীলতা আনমনে কথাটা বলতেই বয় খাবার দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বললেন?'

'না না, আপনাকে নয়।'

বয় চলে যেতে অনিমেষ বলল, 'জ্বালাল তো অথচ নয় বললে কেন?'

মাধবীলতা তার সেরা অলঙ্কার ভুরুর তলায় চাহনি রাখতেই অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। ওর এই চাহনিটায় বুকের মধ্যে যেন লক্ষ জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। সে দেখল মাধবীলতা নিজের প্লেটের ফ্রাইটা দুভাগ করে একটা টুকরো তার প্লেটে তুলে দিয়ে বলল, 'অনেক কষ্টে থামিয়েছি।'

'কী?' অনিমেষ বুঝতে পারল না।

'বিয়ে। বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছে। মা তো কথাই বন্ধ করে দিয়েছেন। বুঝতে পারছি না কতদিন এ ভাবে চলবে। কোনও রকমে এম এ পাশ করতে পারলে আর চিন্তা করি না।' মাধবীলতাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

অনিমেষ দেখল সে খাচ্ছে না, ছুরিটা দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করছে শুধু। বুকের মধ্যে এক ধরনের চাপ অনুভব করল অনিমেষ। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সে মাধবীলতার কবজি ধরল, 'তুমি ভেঙে পড়ো না লতা —।'

কথা না বলে ঘাড় নেড়ে না বলল মাধবীলতা। তারপর কেমন কান্না মেশানো গলায় বলল, 'শোনো, তুমি আমাকে কখনও অবহেলা কোরো না।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না ও কথা।'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে দিল।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ বাদে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'সেদিন আমি গিয়েছিলাম বলে বাড়িতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?'

'কথা হয়েছিল। তুমি কে, কোথায় থাকো, এইসব। আমি জানি আমার ব্যাখ্যা ওদের সুখী করেনি। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো, যে মেয়েকে তিল তিল করে বাবা-মা বড় করল আদর যত্নে, সেই মেয়ে বড় হয়ে গেলেই কেন তাকে সন্দেহ করতে হবে সব সময় ? কেন মনে হয় সে অন্যায় করছে বোধহয়।'

'স্নেহের আধিক্যই এর কারণ।'

'কী জানি, অধিকারবোধ বড় অন্ধ করে দেয় মানুষকে।'

খাবারের বিল মিটিয়ে বাকি পয়সা ক'টা টিপস দিয়ে দিতে ছেলেটি খুশি হয়ে নমস্কার করল।

ওরা রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই মাধবীলতা বলল, 'তোমার আমার দুজনের কাছেই আর পয়সা নেই, না ?'

'হুঁ।' অনিমেষ শূন্য পকেটের কথা ভাবতে চাইছিল না। এখনও মাসটা চালাতে হবে। কী করে যে চলবে ঈশ্বর জানে। মুখে বলল, 'বেশ মুক্তপুরুষ মনে হচ্ছে।'

মাধবীলতা ঠোঁট বেঁকাল, 'এমন স্বার্থপর না, আমারও যে পয়সা নেই এটা ভুলে গেলে কথাটা বলার সময়!'

ও হাসল। মুক্তপুরুষ বললে যে ছবিটা মনে আসে, মুক্তনারী বললে তা কখনওই বোঝা যায় না। সে বলল, 'তোমার তো বাবা বাড়িতে পৌঁছালেই পয়সা পাওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু ওই দুটো টাকাই আমার শেষ সম্বল ছিল। এখন এই কলকাতায় আমার একটা পয়সাও নেই।'

'কত লাগবে তোমার ?'

'মানে ?'

'আমি কাল তোমাকে দিতে পারি। আমার কিছু জমানো টাকা আছে।'

'থাক, দেখি ম্যানেজ করব যা হোক করে।'

'দেখলে, তোমার মনে কেমন প্যাঁচ! আমার কাছে পয়সা নিলে অহঙ্কারে লাগবে না ? যে মেয়েটা —।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল গোটা ত্রিশ টাকা এনো। কবে কখন শোধ করতে পারব আগে থেকে কথা দিতে পারছি না কিন্তু।'

'আমি যাকে দিই তার থেকে ফেরত নেবার জন্যে দিই না।'

'বেশ। কিন্তু মহারানি, তুমি কি ভাল করে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ ? আমার জীবন এর পর অনিশ্চয়তায় ভরে যাবে। রাজনীতির কাজে কখন কোথায় থাকব তার ঠিক নেই। চাকরি-বাকরি করে স্থির হয়ে থাকব তারও কোনও সম্ভাবনা নেই। তখন ?'

'তখন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। এ কথা বোঝ না কেন আমি কখনওই তোমার বাধা হয়ে দাঁড়াব না।'

শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছানোর পর মাধবীলতা বলল, 'তুমি যেন কবে বাইরে যাচ্ছ ?'

'সামনের মাসে। নির্বাচনের কাজ করলে অনেক অভিজ্ঞতা হবে। তা ছাড়া জায়গাটা আমার একদম অচেনা নয়।'

'কবে ফিরছ ?'

'ভাবছি নির্বাচন শেষ হলে বাড়ি ঘুরে আসব।'

'আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে ?'

'তুমি যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাড়ি ?'

'সে আর ভাবি না। না, এখন যাব না। যেদিন তোমার পরিচয়ে নিয়ে যেতে পারব সেদিন আমি যাব। এখন তুমি কাজ করে এসো।'

পকেটে পয়সা না থাকায় পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল অনিমেষ। পথ যদিও দীর্ঘ নয় তবু তার মনে হচ্ছিল সে যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এত আনন্দ কেউ পায়!

BanglaBook.org

তেইশ

উপ-নির্বাচনটি নিয়ে উত্তরবাংলায় কোনও উত্তাপ নেই।

কংগ্রেসের কাছে আসনটির সঙ্গে অনেক মর্যাদা জড়িয়ে আছে। মন্ত্রীরা ঘন ঘন এসে জনসাধারণকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন। এ সবের দরকার ছিল না আগের নির্বাচনে। যিনি এই আসনে দাঁড়াতেন তাঁর নামটাই একটা মন্ত্র ছিল। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দাঁড়িয়েছেন এবার। পারিবারিক অধিকারে আসনটি তাঁর হবেই জানা সত্ত্বেও কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি, তাই মন্ত্রীদের যাওয়া-আসা। বিরোধীরা কখনওই নিজেদের বিরোধের দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে পারে না। এ সব অঞ্চলে ফরোয়ার্ড ব্লকের পরিচিতি আছে সুভাষ বোসের কল্যাণে। গ্রামের চাষাভুষো মানুষ এখনও তাদের নেতাজির পার্টি বলে মনে করে। সিপি আই, সমাজতন্ত্র দলগুলোও কাজকর্ম করছে। পার্টি ভাগ হবার পর সি পি আই এম অধিকতর সক্রিয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করার অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। নির্বাচনে যোগদান না করলে জনসাধারণের কাছে পার্টির নাম বাঁচিয়ে রাখা যায় না— এরকম একটা বোধ এঁদের প্রত্যেকের। ফলে বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের পক্ষে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার মতো নির্বাচনে জেতা সহজ হয়।

কিন্তু এবার উপ-নির্বাচন বলেই হোক কিংবা অন্য কোনও কারণেই হোক বিরোধীরা মোটামুটি একটা সমঝোতায় এসে প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে এনেছে। মুশকিল হল যারা নমিনেশন পায় না তারা দল ছেড়ে নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। সেটাও এবার এড়ানো গেছে। মোটামুটি দ্বিমুখী লড়াই বলা যেতে পারে। উপ-নির্বাচনটি ঘিরে তাই কর্মীদের মধ্যে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কলকাতা থেকে এসে অনিমেষ সেটা প্রথম দিনেই টের পেয়ে গেল। কিন্তু যাঁরা নির্বাচন করবেন তাঁরাই নিরুত্তাপ।

দাসপাড়ার পার্টি অফিসে বসে ওরা পরিকল্পনা করছিল। কলকাতা থেকে অনিমেষের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা নির্বাচনের কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। লোকাল কমিটির সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব নিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে। বিভিন্ন পরিকল্পনা হচ্ছিল। সৌমেন সেন বলে একজন প্রৌঢ় অনিমেষদের নেতা। তিনি বললেন, ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনেই ভাল ফল দেয়। যা সময় আছে তাতে এলাকাটা চষে ফেলা যাবে। কতগুলো গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে আমরা কাজে লাগতে পারি। মনে রাখতে হবে এখানকার সাধারণ মানুষের একমাত্র জীবিকা চাষবাস। তাই আমাদের কথাবার্তা জমি এবং চাষ দিয়েই শুরু করাই ভাল। আমি বলতে চাইছি ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে ওরা আমাদের নিজেদের লোক বলে চিন্তা করে।

লোকাল কমিটির একজন সদস্য কথাগুলো শুনে হাসলেন, 'আপনি যা বললেন তা শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু বাস্তবে বোধহয় এটা একদমই কাজ দেবে না। কারণ দরজায় দরজায় ঘুরলে কেউ আপনার সঙ্গে কথাই বলবে না। মোড়ল যা বলে দেবে তাই এদের কাছে শেষ কথা। মোড়ল দেখবে তাকে কোন দল কীরকম সুবিধে দিচ্ছে, তার ওপর সে নির্দেশ দেবে। সবচেয়ে মুশকিল হল এই মোড়লগুলোর বেশির ভাগই কংগ্রেসি।'

সৌমেনবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা হয়তো ঠিক কিন্তু পুরোটা নয়। কারণ গত নির্বাচনের ফল দেখে বোঝা যায় মোট ভোটের আটচল্লিশ শতাংশ পেয়েছে কংগ্রেস। তা হলে বাহান্ন শতাংশ বিরোধী ভোট গতবার ভাগ হয়েছিল। এই ভোট যারা দিয়েছিল তাদের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করতে হবে।'

লোকাল কমিটির ভদ্রলোকটি বললেন, 'অঙ্কের হিসেব যে এখানে মিলবে না সেটা কাজ শেষ হলে বুঝতে পারবেন।'

অনিমেষ সেটা প্রত্যক্ষ করল। নির্বাচনের কোনও অভিজ্ঞতা তার ছিল না। এখনও সে নিজে ভোট দেয়নি। স্কটিশের হোস্টেলে থাকতে ভোটার লিস্টে তার নাম ওঠেনি। ভোটের দিনে ছেলেদের একটা মজার খেলা ছিল, কে কত জাল ভোট দিতে পারে তার ওপর বাজি ধরা হত। অনিমেষ এখনও পোলিং বুথে ঢোকেনি। কিন্তু কলকাতা থেকে এখানে নির্বাচনের কাজে আসার সময় যে উৎসাহটা ওকে উত্তপ্ত করেছিল তা হল সাধারণ গ্রামের মানুষকে দেখা, জানা। কলকাতা শহরে নির্বাচনী প্রচার সে দেখেছে। পার্কে পার্কে গরম গরম বক্তৃতা, মাঝে মাঝে প্রার্থীরা দল নিয়ে গলিতে গলিতে হাতজোড় করে ঘুরে যান। লোকে ঠিক করেই রাখে কাকে ভোট দেবে এবং তাই দিয়ে চলে আসে। গ্রামে নিশ্চয়ই তা হবে না। এখানে মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে যদি ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা, মানুষের বাঁচার অধিকার কোন পথে আসবে তার একটা স্পষ্ট ছবি যদি লাঙল থেকে হাত নামানো চাষিদের বোঝানো যায় তা হলে সত্যিই কাজের কাজ হবে—এই রকম

BanglaBook.org

বিশ্বাস নিয়ে সে এসেছে। শহর দিয়ে গ্রাম নয়, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে। এবং তা করতে গেলে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা অবশ্যই প্রয়োজন। এইসব থিয়োরিগুলোর বাস্তব রূপায়ণের এত সুন্দর সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হল অনিমেষ। সৌমেনবাবু বুঝিয়ে দিলেন ঠিক কী কী কথা বললে কমিউনিস্ট প্রার্থীর সমর্থনে ভোট পড়বে। প্রথমে অভুক্ত কঙ্কালসার মানুষের ছবিতে রাস্তাঘাট ছেয়ে ফেলা হল। ছবির তলায় বড় করে লেখা, 'আজকের ভারতবর্ষ—কে দায়ি ?' কিন্তু দুদিন বাদেই সেই পোস্টারগুলো উড়ে গিয়ে জুড়ে বসল ক্যালেন্ডারে মতো গান্ধী নেহরু রবীন্দ্রনাথের ছবি; পাশে জোড়া বলদ। কলকাতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো পরস্পরের পোস্টারগুলো বাঁচিয়ে রাখে সৌজন্যবশত, বোঝা গেল এরা তার ধার ধারে না। রেষারেষি শুরু হয়ে গেলে সেটা কিছুতেই থামতে চায় না, খুন-খারাপি অত্যন্ত সামান্য কথা।

পাকিস্তান সীমান্ত খুব কাছেই ; আবার শিলিগুড়ির সঙ্গে দূরত্ব বেশি নয়। একটা বাস যাতায়াত করে দাসপাড়া— শিলিগুড়ির মধ্যে। পশ্চিম বাংলায় কলকাতার পর আধুনিক শহর বলতে শিলিগুড়িকেই বোঝায়। ব্যবসাকেন্দ্র এবং স্মাগলিং-এর কল্যাণে শহরটা কসমোপলিটান চেহারা নিয়ে ফেলেছে। অথচ তার চৌহদ্দি ছাড়ালেই যে গ্রামগুলো সেখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক চেহারা বর্তমান। একশো বছর আগেও যে ভাবে জমি চাষ হত, খাদ্যাভাবে ভুগত এবং সন্তান উৎপাদন করত, আজও তার হেরফের হয়নি। এদের কাছে শিলিগুড়ির সঙ্গে নিউইয়র্কের কোনও ফারাক নেই। উত্তরবাংলার পাঁচটা জেলায় পাঁচটা সদর শহরেই যা কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ—তার আঁচ এদের গায়ে লাগে না। মানুষগুলোর চেহারা কুচবিহার জলপাইগুড়িতে মোটামুটি এক। রাজবংশী সম্প্রদায় মাটি থেকে ফসল তোলেন, চিরকালের অবহেলিত হয়ে আছেন ওঁরা। শহরের মানুষেরা এই সুযোগ নিয়ে ওঁদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সরলতার শিকার হয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে নিজেদের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই এখন। রাজবংশীরাই এখানকার মাটির মানুষ, এঁদের ভোটেই জেতা হারা নির্ভর করে। জোড়াবলদের ওপর একটা আত্মিক টান আছে এঁদের। মোড়লদের নির্দেশ সেই টানকে আরও জোরালো করে।

শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে ইসলামপুরের দিকে এলেই দুপাশের যে গ্রামগুলো তার চরিত্র আলাদা। পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা একটু একটু করে শিকড় গাড়ছে মাটিতে কিন্তু যারা সংখ্যায় ভারী এবং মাটির কর্তৃত্ব যাদের হাতে তাদের মেজাজটাও সবসময় টানটান। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আধিক্যই গ্রামগুলোর চরিত্র একটু অন্যরকম করেছে। এঁরা যা বোঝেন তার বেশি বুঝতে চান না কিছুতেই। কংগ্রেসের বিকল্প কিছু এঁদের ভাবনাতে আসে না। পাশেই সীমান্ত ছাড়িয়ে পাকিস্তান; কিন্তু সে ব্যাপারে এঁদের কোনও ভাবপ্রবণতা নেই। অনিমেষের কাজ এঁদের সঙ্গেই, এই এলাকার মানুষদের প্রভাবিত করতে হবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিতে।

অনিমেষদের পার্টির থেকে যে ভদ্রলোক প্রার্থী হয়েছেন তিনি মুসলমান। জনসংখ্যার হিসেবে ত্রিশ শতাংশ হিন্দু হলেও উভয়পক্ষই হিন্দু প্রার্থী দিতে সাহস করেননি। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না। মালদার একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান দীর্ঘকাল পশ্চিম দিনাজপুরের এই প্রান্তদেশ থেকে সম্মানের সঙ্গে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। এবার তাঁর ছেলে দাঁড়িয়েছেন। গতবার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হিন্দু ছিলেন বলেই কম ভোট পেয়েছিলেন—এমন কথা শোনা যায়। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই ধাক্কা খেল অনিমেষ। তার মানে কোনও মতবাদ বা আদর্শ এখানে কাজ করছে না ? মানুষগুলোর ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হচ্ছে! তা হলে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কী পার্থক্য থাকল ? কথাটা সৌমেনবাবুকে বলতেই তিনি কিছুক্ষণ অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, 'মাও সে তুং-এর একটা থিয়োরি হল, দু'পা এগিয়ে যেতে মাঝে মাঝে এক পা পিছিয়েও যেতে হয়।'

এখন বর্ষার চলে যাওয়ার সময়। তবু উত্তরবাংলায় বর্ষা কি সহজে যেতে চায়। হুড়মুড় করে কিছুক্ষণ জল ঝরিয়ে আকাশ বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ভোর হলেই দাসপাড়া থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ে গ্রামগুলোতে চলে যেত। তখন মাঠের কাজ ছিল না। গ্রামগুলোতে সকাল হত দেরিতে, অদ্ভুত ঢিমে চালে ওরা দিন শুরু করে। এক ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গ্রামের মানুষ দেখা অনিমেষের একটা নেশার মতো হয়ে গেল। এক-একটা গ্রাম যেন একটি বাড়িকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে। জমিদাররা আর বাংলাদেশে নেই, কথাটা কলকাতায় বসে শোনা ছিল। কিন্তু এখানে এসে মনে হল কথাটা একদম মিথ্যে। জমিদারের চেহারা পালটে গেছে কিন্তু চরিত্র একই রকম আছে। জোতদারের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য নেই। সেই জোতদারের বাড়িতে আগে যেতে হত ওদের।

BanglaBook.org

মোটামুটি পাকা বাড়ি, টিনের চাল। জোতদার ওদের দেখলে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেন, 'আসেন আসেন বাবুরা, কী সৌভাগ্য, এ গ্রামের কী সৌভাগ্য যে আপনাদের পদধূলি পড়ল। বসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক।'

তিন-চারটে মাদুর পাতাই থাকে বোধ হয় সবসময় তাঁর দাওয়ায়। অনিমেষরা বসতেই ভদ্রলোক বললেন, 'বলুন, কী সেবা করতে পারি ?'

অনিমেষরা তিনজন এই দলে ছিল। সৌমেনবাবুরা অন্য গ্রামে গেছেন। ভদ্রলোকের মুখের ভাবভঙ্গি অনিমেষের ভাল লাগছিল না। এর একটা কারণ এখানে আসতে যে ঘরগুলো ওর চোখে পড়েছিল তার জরাজীর্ণ দশার তুলনায় এই গৃহটি প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছে। শোষক এবং শোষিতের পার্থক্যটা বড্ড স্পষ্ট। গ্রামে এসে বক্তৃতা করার আগে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমালে অধিকতর কাজ হবে বলা হয়েছিল।

অনিমেষ বলল, 'আপনি তো জানেন, নির্বাচন এসে পড়েছে। আমরা নির্বাচনের কাজেই এই গ্রামে এসেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'শহরে গিয়ে শুনেছিলাম বটে। তা কোন পার্টির মানুষ আপনারা ? আগে তো কখনও দেখিনি!'

অনিমেষ বলল, 'আমরা মহম্মদ চৌধুরীর পক্ষে প্রচার করতে এসেছি।'

'চৌধুরী ? অ! তা হলে আপনারা গিয়ে হলেন কমিউনিস্ট। হুম্। এবার কমিউনিষ্টরা খুব চাল দিয়েছে, ভাল ভাল। চৌধুরীকে দাঁড় করিয়ে নবাব সাহেবের ছেলেকে বিপদে ফেলেছে জব্বর। তা আপনাদের পরিচয় জানলাম না তো। শহরেও মনে হয় দেখিনি।'

অনিমেষের সঙ্গী বলল, 'আমরা কলকাতা থেকে নির্বাচনের কাজে এখানে এসেছি।' এখন যদি আপনি সহযোগিতা করেন তা হলে খুশি হব।'

হাঁ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক, 'কলকাতা থেকে এসেছেন ? অতদূর থেকে এই গ্রামে! তা হলে তো বলতে হবে খুব জব্বর ব্যাপার হবে এবার। একদম রাজধানীতেও সাড়া পড়ে গেছে আমাদের নিয়ে। কী আশ্চর্য !'

অনিমেষ বলল, 'এতদিন আপনাদের এলাকা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না কিন্তু কংগ্রেসের এতদিনের শাসন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা ভাববার সময় এসেছে। এবং সেটা ভেবেই যেন গ্রামের ভাইরা ভোট দেন।'

ভদ্রলোক পিটপিট করে অনিমেষকে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝলাম না। গ্রামের মানুষ ভোট দেবে তা আমার কী করার আছে। আপনি আমাকে নিজের কথা বলতে পারেন, অন্যের কথা আমাকে বলে লাভ কী!'

অনিমেষ বলল, 'শুনলাম, আপনার অনুমতি ছাড়া—।'

'মিথ্যে কথা, অপপ্রচার। আপনার যেমন খুশি তেমন বোঝান, আমি এর মধ্যে আসি কী করে।' লোকটি প্রতিবাদ করে উঠল।

ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। চাষ-নির্ভর গ্রাম। মানুষগুলো এত দরিদ্র যে সোজা হয়ে দাঁড়াবার কথাও অনেকে ভুলে গেছে। এই মানুষগুলোকে সচেতন করতে হবে, শ্রেণী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মইদুল শেখের উঠোনে বসে কথা বলছিল অনিমেষ। রোগা, পাঁজর বের করা চেহারা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনের লুঙ্গি শতছিদ্র। মইদুল উবু হয়ে বসে অনিমেষের কথা শুনছিল। মাটির দাওয়ায় অনিমেষ বসে, মাথার ওপর জলো মেঘ অনেকটা নেমে এসেছে। উঠোনময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতগুলো ন্যাংটো বাচ্চা। মইদুলের বউ দাওয়ার খুঁটি ধরে একমাথা ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। মাংস-মেদ-হীন লিকলিকে শরীরটা ঘিরে কাপড়টায় অনেক সেলাই।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মইদুলভাই, তোমার জমিতে বছরে ফসল হয় কটা ?'

'জমি ? জমি তো আমার নয় বাবু।'

'যে জমিটা তুমি চাষ করো সেটা তোমার নয় ? তবে কার ওটা ?'

'বড়কত্তার।'

'সে আবার কে ?'

'যার ঘরে বসে এতক্ষণ কথা বলছিলে। তাঁর।'

অনিমেষ লোকটার মুখ স্মরণ করল, কেমন তেল-চকচকে চেহারা। এই গ্রামে ঢুকতে গেলে ওঁর

BanglaBook.org

সঙ্গে কথা বললে সহজ হবে এ কথা শুনেছিল অনিমেষ। যেন এই গ্রামের মানুষেরা সব ওঁর তাঁবেদার। দু'পা এগোতে হলে এক পা পিছোতে হবে—তাই বুঝি এই লোকটির সঙ্গে সমঝোতা করতে হল।

'তার মানে তুমি ভাগচাষি ?'

মাথা নাড়ল মইদুল, 'ফসল হয় তিনবার। জমি যার তার, পরিশ্রম আমার— দু'ভাগ তিনি নেবেন একভাগ আমি।'

অনিমেষ বলল, 'ওতে চলে সারা বছর ?'

সাদা চোখে অনিমেষের দিকে তাকাল মইদুল। এমন ফ্যাকাসে চোখ কখনও দেখেনি অনিমেষ। ওই দৃষ্টি যেন বুকের ভেতরটা নড়বড়ে করে দেয়। কোনও শব্দ দিয়ে বোধ হয় এমন উত্তরটা দেওয়া যেত না।

অনিমেষ উসখুস করে জিজ্ঞাসা করল, 'এর আগে কখনও ভোট দিয়েছ ?'

ঘাড় নাড়ল মইদুল, 'তা দেব না কেন না দিলে চলে !'

'কাকে ভোট দিয়েছ ?'

'বড়কত্তার পার্টিকে।'

'সেটা কী? '

'ওই যে বাবু, জোড়া বলদ, তাতে ছাপ দিয়েছি আমরা।'

'কিন্তু কেন দিলে তাতে ?'

'ভারী মজার কথা! দেব না কেন ? বড়কত্তা বলল তাই দিলাম।'

'যাদের দিলে তারা ভাল লোক না মন্দ তা না জেনেই দিলে ?'

'সে খবরে আমাদের দরকার কী ! আর যে সব ছবি ছিল এই যেমন কাস্তে ধানের শিষ, সিংহ, ওদের দিয়েই বা কী লাভ হত ? এ তবু চেনা ছবিতে ছাপ দেওয়া। বড়কত্তা বেঁদে খাওয়ালেন সেদিন, সেটাই লাভ।' মইদুল হাসল, এবার বউ-এর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

অনিমেষ অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল, 'শোনো ভাই মইদুল, তুমি যেমন একজন মানুষ, যে দেশের জন্য খাবার উৎপাদন করে ঘাম ঝরিয়ে—' এই অবধি বলেই অনিমেষের মনে হল যে সে ঠিক ভাষায় কথা বলছে না। এই ভাবে কথা বললে মইদুলের কাছে পৌঁছানোই যাবে না। সে আবার শুরু করল, 'শোনো ভাই মইদুল, তুমি নিশ্চয়ই চাও তোমার নিজের জমি হোক, ছেলেমেয়েরা ভরপেট খাক, ভাল জামাকাপড় পরুক, যে ফসল তুমি তৈরি করবে তার ন্যায্য দাম পাও, ঠিক কিনা!'

মউদুল কথা না বলে তার সাদা চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

অনিমেষ আবার বোঝাতে লাগল, 'কিন্তু এতদিন তুমি কী পেয়েছ! জমিটাও নিজের নয়, অন্যের দয়ায় কোনওরকমে বেঁচে আছ। কেন এই অবস্থা ? তুমি ভেবেছ কখনও ?'

আঙুলটা কপালে ঠুকল মইদুল, ঠুকে হাসল।

অনিমেষ বলল, 'মিথ্যে কথা ! ভাগ্যে কিছু লেখা থাকে না। মানুষ নিজেই তার ভাগ্য তৈরি করে। দেশের মানুষকে সুস্থ সবল রাখার দায়িত্ব হল তার সরকারের। আমাদের এই দেশ একদিন ইংরেজের অধীনে ছিল। তারা ছিল বিদেশি। এখান থেকে শোষণ করে নিয়ে যাওয়াই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্ষমতা হাতে নিল যারা তারা এতগুলো বছর ধরে কী করল ? তারা গরিবের রক্তে নিজেদের সম্পদ আরও বাড়িয়েছে। কিন্তু দেশের কথা ভাবেনি, দেশের মানুষের জন্য কোনও চিন্তা করেনি। যার জন্য আজ তোমার জমি নেই, খাবার নেই। তুমি এদের সঙ্গে একা লড়তে পারবে না। এদের শক্তি অনেক। আর এদের মদত দিচ্ছে তোমার বড়কত্তার মতো ছারপোকারা। কিন্তু এদের শাস্তি দেওয়ার আর একটা উপায় আছে। এই হল সুযোগ। তুমি এবং তোমরা ইচ্ছে করলে এদের ছুড়ে ফেলে দিতে পারো রাস্তায়। কী করে ? তোমরা যদি সামনের নির্বাচনে ভোট না দাও ওদের তা হলে ওরা নির্বাচিত হতে পারবে না। মন্ত্রী না হতে পারলে দেখবে ওরা সব কেঁচো হয়ে যাবে।'

অনিমেষ একটু থেমে মইদুলকে জরিপ করল। ছেলেটির দৃষ্টি একটুও পালটায়নি। সেই একইভাবে উবু হয়ে বসে আছে সে। অনিমেষ আবার শুরু করল, 'বলদ চিহ্নে নয়, তোমাদের উচিত কাস্তে হাতুড়িতে ছাপ দেওয়া। আমরা চাই সমস্ত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আমরা চাই যার

BanglaBook.org

জমি নেই সে নিজের চাষের জমি পাবে, যে ফসল সে উৎপাদন করবে তার উপযুক্ত দাম পাবে, যে কোনও কৃষকের সন্তান শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে। দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে না। এই সব সম্ভব হবে যদি তুমি আমাদের নির্বাচিত করো।'

'বড় ভাল লাগে বাবু এ সব কথা শুনতে।' মইদুল দুলছিল।

'তা হলে বোঝো, জীবনটা তোমার স্বচ্ছন্দে এরকম করে ফেলতে পারো।'

'কিন্তু সেবার ওনারাও তো এ সব কথা শুনিয়ে ছিলেন, কিন্তু —।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল অনিমেষের, 'কারা ?'

'বড়কত্তার দল, জোড়াবলদ যাদের ছাপ দিলাম সবাই, তাঁরা। আপনি যে সব কথা শোনালেন তারাও এই সব খোয়াব আমাদের দেখালেন। আর তাই শুনে শুনে বড়কত্তা আমাদের কত উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কী হল, আমাদের কোনও উন্নতি হল ?' মইদুল ঘাড় নাড়ল।

অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না কংগ্রেসিরা কী করে এই সব কথা এদের বুঝিয়েছে। ওরাও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইছে নাকি ? এই মানুষটি যদি একই কথা ওদের মুখে শুনে থাকে তা হলে কোনওরকমেই অনিমেষের কথায় আস্থা রাখতে পারে না। খানিকটা চিন্তা করে সে আবার বোঝাতে চাইল, 'তা হলে ওরা মিথ্যে বলেছে এটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ। তোমার বড়কত্তা নিজের সম্পত্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন তোমাদের শোষণ করে।'

মইদুল হেসে উঠল আচমকা, যেন অনিমেষ খুব মজার কথা বলেছে, 'এ কী কথা বললেন, সবাই তো চায় নিজের অবস্থা ভাল হোক, নতুন কী!'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু দশজনের সম্পত্তি একজনের ঘরে গিয়ে জমা হবে কেন ? আমরা চাই সবাই সমান অবস্থায় থাকুক। লাঙল যার জমি তার। তোমরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও দেখবে দিন পালটাবেই।'

মইদুল বলল, 'এ সব একদম বাসি কথা। ভোটের আগে আপনি গাঁয়ে এসে আমাকে শোনালেন, আর পাঁচ বছর আপনার মুখই দেখতে পাব না। তখন আমাকে কে বাঁচাবে ? না ওই বড়কত্তাই। তাই খামোকা তাঁকে চটিয়ে লাভ কিছু নেই।'

অনিমেষ হতাশ হচ্ছিল। এই লোকগুলোকে কী ভাবে বোঝানো যায় ? নিজেদের স্থবির পরিবেশ থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষাটাই যেন মরে গেছে। আচ্ছা, লোকটাকে আহত করলে কেমন হয় ? ওর মনে ঘা দিলে যদি নড়েচড়ে বসে।

অনিমেষ বলল, 'দেখো কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না যদি সে নিজে বাঁচতে না চায়। তোমরা, এই গ্রামের মানুষরা যদি এক হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে না দাঁড়াও তা হলে চিরকাল এ ভাবেই পড়ে পড়ে মার খাবে। বড়লোকের সেবা করে তোমার কী লাভ হচ্ছে ? তোমরা এত ভীরু কেন ?'

খুব আস্তে মইদুল বলল, 'কী করতে বলেন !'

উৎসাহিত অনিমেষ জানাল, 'তোমরা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করো। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল নির্বাচন। ভোটের মাধ্যমে আমরা একটা সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জনদরদি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবছে। ভোট হল ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রধান অস্ত্র।'

হঠাৎ মইদুল খেপে গেল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল, গলা স্বর উঁচুতে উঠল, 'তখন থেকে এক কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করবেন না তো। ভোট-ফোট সব বুজরুকি। ও দিলেও যা না দিলেও তা। যে জেতার সে ঠিক জিতবেই। আর জিতে গেলে নীচের দিকে তাকাবে না। যতক্ষণ সবার পা খালি ততক্ষণ কাদা লাগুক কেউ কিছু ভাবি না। কিন্তু যেই জুতো দিলাম পায়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা চলা টিপুস টিপুস হয়ে গেল, হবেই। কী সব কথা বলছিলেন, সবাই সমান হবে, পেট ভরে খেতে পাবে, বলছিলেন না! ছাই হবে, যত্ত বুকুনি। ভোট-ফোট না, যদি সবাই জোট করে গিয়ে কেড়েকুড়ে নিতে পারি তবেই ফিরবে। ফালতু খোয়াব দেখাবেন না।'

শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। এই জীর্ণ শরীর থেকে এরকম কথা বেরিয়ে আসবে কল্পনাও করেনি সে। কোনওরকমে বলল, 'তবে সেটাই করছ না কেন!'

মাথা নাড়ল মইদুল, 'করলে কি আর আপনাকে এত কথা বলতে দিতাম! ওটা একটা মুখের কথা, সাহস নেই, শক্তিও নেই, আল্লাই বা মানবেন কেন!'

মইদুল তবু মুখ ফুটে এত কথা বলেছিল। গ্রামের অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। কেউ মুখ খোলে না। সবাই মরা মাছের মতো চোখ চেয়ে থাকে। সারা

BanglaBook.org

দিন গ্রাম ঘুরে বিকেলে একটা জমায়েত করল ওরা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীর পক্ষে জোরালো বক্তৃতা করে আবেদন জানাল ভোটের জন্য। কিন্তু অনিমেষ অনুভব করছিল এ সব কথা কাউকেই স্পর্শ করছে না। যাত্রা দেখার মতো ওরা ওদের দেখছে। প্রতি মুহূর্তেই সে মনে করছিল তাদের এই বলার ধরণ ও বিষয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের বক্তব্যের বোধহয় কোনও গরমিল নেই। কমিউনিজম কি এভাবে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় ?

মিটিং-এর শেষে ওরা যখন ফিরে আসছে তখন গ্রামের বড়কত্তা ওদের সাদরে আমন্ত্রণ করলেন জলপানের জন্য। সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। খিদেও পেয়েছিল খুব। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুরোধ এড়াতে পারল না ওরা।

মুড়ি নারকোল আর বাতাসা খেতে খেতে ভদ্রলোকের কথা শুনল অনিমেষরা, 'আজ সারাদিন তো ঘুরলেন আপনারা। দেখলেন কেমন ?'

অনিমেষ বলল, 'এ ভাবে মানুষ বেঁচে থাকে কল্পনাও করা যায় না।'

ভদ্রলোক বলল, 'এ ভাবে মানুষ বেঁচে আছে। আপনারা যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা তো এদের চেনেন না। এই গ্রামে, ধরেন, আটশো ভোট আছে। প্রতিবার জোড়াবলদ পায় সেগুলো। আগে যিনি দাঁড়াতেন তিনি আমাকে অতীব স্নেহ করতেন। তাঁর ছেলেটা শুনেছি লোক ভাল নয়। তাই আমারও পছন্দ নয়। এখন কী করবেন ঠিক করুন।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

'সরল কথা। আটশো ভোটের যারা ন্যায্য দাম দেবে তারাই এগুলো পাবে। যিনি এম.এল.এ. হবেন তিনি পাঁচ বছর ধরে কত পাবেন ভাবুন তো। হাজার রাস্তায় তাঁর পকেটে টাকা ঢুকবে। তাই হবার আগে আমাদের একটু মূল্য দিলে ক্ষতিটা কী, বরং নিশ্চিন্ত। একশো গুণ হয়ে টাকাটা ঘুরে আসবে তাঁর ঘরে।' হাসলেন বড়কত্তা।

'অসম্ভব। কী যা-তা কথা বলছেন ? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপনি ভোট বিক্রি করার প্রস্তাব দিচ্ছেন। আপনাকে তো জেলে পোরা উচিত।' অনিমেষের এক সঙ্গী চিৎকার করে উঠল।

'গণতন্ত্র!' হা হা করে হাসলেন বড়কত্তা, 'মজার কথা বললেন। ও সব তো বইয়ে থাকে। আরে মশাই কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট, যারা ভোটে দাঁড়ায় তারা একই টাকার এ-পিঠ ও পিঠ। ক্ষমতা পাবে বলে, পার্টির ফান্ড বাড়বে বলে, ক্যাডারদের চাকরি দেবে বলে আর নিজের পকেট ভারী করবে বলে—এই তো মতলব। তা যারা তাদের ভোট দিয়ে এ সব পেতে সাহায্য করবে তারা আঙুল চুষবে ?'

অনিমেষরা আর কথা না বলে বেরিয়ে এল। মাঠ ভেঙে দাসপাড়ায় ফেরার সময় অনিমেষের খুব ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল সারাদিনের পরিশ্রম কোনও কাজেই লাগল না। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে যে ভাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে তাতে দেশের মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন কতটা ঘটেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মইদুলের মতো মানুষেরা তাই ভোটের ওপর কোনও আস্থা রাখে না। কেড়ে নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু সেটা তো স্রেফ ডাকাতি, অরাজকতা।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনিমেষ আর একটি কথা ভাবছিল। নির্বাচনী প্রচার করতে এসে তারা জনসাধারণকে বোঝাচ্ছে আমাদের ভোট দিন, আমরা আপনাদের সুখের রাজ্যে নিয়ে যাব। কংগ্রেসিরাও নিশ্চয়ই একই কথা বলছে। এ যেন তিন-চারটে সাবানের কোম্পানি দরজায় দরজায় নিজের প্রোডাক্টের গুণাগুণ বলে বেড়াচ্ছে বিক্রি বাড়াবার জন্য। যে সব প্রার্থী দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ নেই। তারা, কর্মীরা, কয়েকদিনের জন্য মধ্যস্থতা করছে মাত্র। কোনওরকম বিশ্বাস থেকে এরা ভোট দেবে না। যদি দেয় তা হলে কথার চটকে ভুলে কিংবা কোনও প্রাপ্তির আশায়। দেশে নতুন সরকার গঠিত হলে তার সঙ্গে মইদুলদের কী সম্পর্ক থাকবে ? তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি যদি একটি সংগঠিত আদর্শের ধারক হয় তা হলে এই নির্বাচনের ব্যবস্থায় তার সঙ্গে কংগ্রেসের পার্থক্যটা কী থাকছে ? এ দেশের মানুষকে যে বিষাক্ত রাস্তায় হাঁটানো হয়েছে এতদিন তাতে কিছু না পেলে বা পাইয়ে না দিলে তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। এই দেওয়া-নেওয়া পদ্ধতিতে কী কখনও কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব ?

এই ক'দিন নির্বাচনী প্রচার অনিমেষকে আর একটি জিনিস শেখাল। কমিউনিস্ট নেতাদের বিখ্যাত উক্তিগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন হল একমাত্র অস্ত্র। এবং তার ব্যবহার করতে গেলে কোনওরকম কুণ্ঠা রাখা বোকামি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন

BanglaBook.org

যুদ্ধে কোনও কাজই অসঙ্গত নয়। নির্বাচনে জিততে হলে সবসময় থিয়োরি আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না। বড় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে ছোট শত্রুর সঙ্গেও সাময়িক বন্ধুত্ব করতে বাধা নেই। নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে গৃহীত পথ যদি কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন না হয় তো ক্ষতি কী। কারণ, দু'পা এগোতে হলে এক পা পিছিয়ে যেতে আপত্তি নেই। অস্থির অনিমেষ দাসপাড়া থেকে এক সকালে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গেল, কাউকে কিছু না বলেই।

চব্বিশ

কদমতলায় বাস থেকে নামতেই রিকশার হর্ন আর মানুষের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সঙ্গে একটি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, অনিমেষ চুপচাপ হেঁটে রূপমায়া সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রতি বছর শহরটা একটু একটু করে চেহারা পালটাচ্ছে। নতুন নতুন দোকান এবং তাদের সাজানোর ঢং-এর অভিনবত্ব চোখে পড়ছে। রূপমায়ার আগে নাম ছিল আলোছায়া। জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছিল সে এখানে, ছবিটার নাম দস্যু মোহন। হলটাকে ভালভাবে দেখল অনিমেষ। এতগুলো বছরেও একই রকম আছে। তবে আগে হিন্দি ছবি হত না, এখন তাই চলছে।

খুব চেনা রাস্তায় দীর্ঘদিন পরে হাঁটলে এক ধরনের অনুভূতি হয়। অনিমেষ খুশি-খুশি মেজাজে চারপাশে তাকাচ্ছিল। চৌধুরী মেডিক্যালের কাউন্টারে রামদা বসে আছেন। অনিমেষকে দেখে হাত তুলে ডাকলেন। ভদ্রলোকের হাসিটা খুব সুন্দর। কখনও চুলে তেল দেন না বলে সব সময় ফেঁপে থাকে সেগুলো। ওঁর ওষুধের দোকানের সামনে এলেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় অনিমেষের। নানান ট্যাবলেট ক্যাপসুল এবং ওষুধের বোতল দেখতে দেখতে একধরনের নিরাপত্তা আসে। এখানে বসে থাকলে কোনও অসুখ আক্রমণ করতে পারবে না। দোকানের মধ্যে ঢুকলে যে ওষুধ-মার্কা গন্ধটা নাকে আসে তা বেশ আরামদায়ক মনে হয় তখন।

রামদা হাসলেন, 'কবে আসা হল ?'

'এই মাত্র।' কাঁধের ব্যাগটা দেখাল অনিমেষ।

'এইভাবে, শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে ?' রামদা বিস্মিত।

'কাজে এসেছিলাম এ দিকে, হঠাৎ চলে এলাম। তা আপনাদের খবর কী ?'

'আমি সব সময় ভাল। ও হ্যাঁ, কে যেন বলছিল তুমি এখন পার্টি করছ ?'

'বাঃ, এখানেও খবর এসেছে ? খুব না, একটু একটু।'

'এইটেই খারাপ লাগে। যখন কিছু করবে তখন হয় পুরোদমে করবে নয় একদম ধারে-কাছে যাবে না। মাঝামাঝি থাকাটা মারাত্মক। জানো তো, অখিলদা মারা গেছেন!'

'অখিলদা, মানে কংগ্রেসের—!'

'হ্যাঁ, তবে ওঁকে তোমার অন্য পরিচয়ে চেনা উচিত ছিল। জলপাইগুড়ি শহরের খেলাধুলোর উন্নতি যে লোকটা না থাকলে হত না।'

অনিমেষের মনে পড়ল মানুষটাকে। যে কোনও স্পোর্টস বা খেলায় এই লোকটিকে না হলে চলত না। অর্থবান মানুষ, খেলার জন্য দু'হাতে অর্থ বিলিয়েছেন। এমনকী বৃদ্ধ বয়সেও নিজে ফুটবল খেলতে নামতেন। হাফপ্যান্ট পরা ফরসা হাসিখুশি সেই মানুষটি লেফট আউটে দাঁড়িয়ে এই বয়সেও এমন কিক করতেন যেটা রামধনু হয়ে গোলে গিয়ে ঢুকত। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল ?'

'মার্ডার! রাত্রে খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে—।' রামদা গম্ভীর হলেন।

'কেন ?'

'সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। ওরকম হাসিখুশি মানুষকে কি সুস্থ মাথায় মারা যায় ? পুলিশ কোনও হদিশ পাচ্ছে না। শহরটা কেমন পালটে যাচ্ছে। এখন কেউ কাউকে পছন্দ না করলে সহজেই সরিয়ে দিতে পারে।'

অনিমেষ রামদাকে দেখল। ওঁর সুন্দর মুখটা এখন বিমর্ষ। যতদূর জানা আছে রামদা কোনও রাজনীতিতে নেই। বাবুপাড়া পাঠাগারের সূত্রে গল্প-উপন্যাস পত্রিকা নিয়ে ডুবে থাকেন। তা হলে শহরটা ভেতরে ভেতরে পালটে যাচ্ছে! এটা কি রাজনীতির কুপ্রভাব ? প্রসঙ্গটা এড়াতে রামদা একটা কাশির লজেন্স বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ক'দিন থাকছ ?'

'ঠিক নেই।' বলে লজেন্সটা কাগজ থেকে ছাড়িয়ে মুখে ফেলল অনিমেষ।

রামদা তখনই একজন খদ্দেরকে ওষুধ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অনিমেষ বলল, 'চলি।' ঘাড়

BanglaBook.org

নেড়ে সম্মতি জানিয়েই রামদা আবার হাত তুলে দাঁড়াতে বললেন। গলায় ঝাঁজ লাগছিল অনিমেষের। ওর মনে পড়ে গেল আগে যখনই এখানে আড্ডা মারতে আসত তখন এই লজেন্সটা তার বরাদ্দ থাকত। কথাটা তার খেয়ালে ছিল না কিন্তু রামদা সেটা মনে রেখেছেন। তার নিজের মনের অবচেতনায় ব্যাপারটা থেকে গিয়েছিল বলেই ওটা নেওয়ার সময় সে অন্যমনস্ক-স্বচ্ছন্দতায় নিয়েছিল। রামদাকে আজ নতুন করে ভাল লাগল তার।

কাজ শেষ করে রামদা ওর সামনে এসে কাউন্টারের ওপর দু'হাত রেখে বললেন, 'তোমার দাদু এসেছিলেন।'

'দাদু?'

'হুঁ। এখন তোমাদের ওঁকে একা রাখা উচিত নয়।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'তুমি কিছু জানো না?'

'না।'

'সত্যি?'

'বিশ্বাস করুন।' অনিমেষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। দাদু তো এই সেদিন গয়া থেকে ওর কাছে ঘুরে ফিরে এসেছেন। চিঠিতেও তো কিছু লেখেননি।

'কিছুদিন হল ওঁর কানে একটা ঘা মতো হয়েছিল।'

'কানের ভেতরে?'

'না, লতিতে। কিছুতেই সারছিল না বলে ডক্টর সেনের কাছে যান। তিনি সাসপেক্ট করছেন—।' অনিমেষের দিকে তাকালেন রামদা। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু ভাবলেন। অনিমেষ বুঝল যে রামদা কোনও অপ্রিয় কথা বলতে দ্বিধা করছেন। সে একটা হাত বাড়িয়ে রামদার হাতে রাখল, 'বলুন, এখন আমি আর বালক নই।'

'ডক্টর সেন এটাকে একধরনের লেপ্রসি বলে সন্দেহ করছেন। কিন্তু, শোনো শোনো, আপসেট হয়ো না, এটা জাস্ট সন্দেহ। তোমার দাদুকে উনি যে সব পরীক্ষা করাতে বলেছিলেন তার একটাও করতে চাননি। সামান্য কয়েকটা টেস্টে এটা ধরা যাবে। আর আজকাল তার প্রচুর ওষুধ আছে, কোনও সমস্যাই নয়। আমার কাছে উনি এসেছিলেন কয়েকটা ওষুধ কিনতে আর ইঞ্জেকশন নিতে। ওঁকে অনেক বোঝাতে চাইলাম কিছুতেই শুনলেন না। বললাম, ডক্টর সেন ভুল করতে পারেন, আপনি আর একজনকে দিয়ে যাচাই করান, স্কিন টেস্ট করুন। বাট হি ইজ টোটালি এ চেঞ্জড ম্যান। তুমি যখন এসে পড়েছ ওঁকে ভাল করে বোঝাও।'

অনিমেষের মাথায় আর কিছু ঢুকছিল না। দাদুর কুষ্ঠ হয়েছে? থেকে থেকে শরীরে একটা কাঁপুনি আসছিল। কাউন্টারের ওপর দুহাতের ভর রেখে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর খুব নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু রামদা, ব্যাপারটা কি ঠিক?'

রামদা দ্রুত হাত নাড়লেন, 'এটা একটা অনুমানমাত্র। অনেক সময় শুধু ভিটামিনের অভাবে শরীরের ঘা শুকুতে চায় না, ডায়েবেটিস থাকলেও হতে পারে। ব্যাপারটা আসলে কী তা পরীক্ষা না করলে কী করে বোঝা যাবে? কিন্তু তার আগেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। শুনছি আজকাল বাড়ি থেকে বেরুও হচ্ছেন না। তুমি ওঁকে বোঝাও।'

রামদার দোকান থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নেবে কিনা ভাবল অনিমেষ। খবরটা শোনামাত্র শরীর কেমন অবসন্ন হয়ে গেছে। দাদুর যদি সত্যি কুষ্ঠ হয়ে থাকে তা হলে-কোনও হিসেব মেলাতে পারছিল না অনিমেষ। সে দ্রুত হাঁটা শুরু করল নিজেকে শক্ত করতে। রূপশ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে থানার পাশ ঘুরে করলা নদীর ধারে হনহন করে হেঁটে আসার পথে একটাও চেনা মুখ পড়ল না। অনিমেষ এই মুহূর্তে পরিচিত কাউকে দেখতেই চাইছিল না। কারও সঙ্গে কোনও ওজুরে কথা বলার মতো মেজাজও নেই।

বাড়িটাকে রং করা হয়েছিল অনেকদিন আগে কিন্তু এখনও বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সরু গলি দিয়ে হেঁটে এসে বাড়ির সামনে গেটটায় হাত রাখল অনিমেষ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঝিম মেরে আছে চারধার। এখন দুপুর। বাইরে সব দরজা জানলা বন্ধ। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় অত বড় এলাকা জুড়ে তৈরি বাগান এবং বাড়িতে কোনও মানুষ নেই। সামনের অংশে আগে ভাড়াটেরা থাকত। এখন সেগুলোও যে ফাঁকা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে দরজায় শব্দ করল।

BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ সাড়া নেই, তারপরই একটা সরু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, 'কে এল আবার, ও হেম, দ্যাখো না একবার।' অনেক কষ্টে বোঝা যায় এই গলায় সরিৎশেখরের। অনিমেষের মেরুদণ্ডে কেউ যেন বরফ ঘষে দিল। একী গলায় হয়েছে ওঁর! শ্লেষ্মাজড়ানো অথচ ভাঙা কাঁসির মতো বিরক্তি মাখানো এরকম সরু স্বর সরিৎশেখরের কণ্ঠ থেকে বেরুবে চিন্তাও করা যায় না।

পিসিমার গলা শুনল অনিমেষ, 'আপনি দেখুন না, আমার সময় নেই।'

'কেন কী রাজকার্য করছ তুমি, অ্যাঁ ?'

'আমার পিন্ডি চটকাচ্ছি। এগুলো না রাঁধলে গিলবেন কী ?'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ? রান্না শেখাচ্ছ আমাকে ?'

'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনার চাকরানি হয়ে জীবনটা গেল আমার। কেন, ওখান থেকে একটু উঠে গিয়ে দেখতে পারছেন না ?'

অনিমেষ চুপচাপ সংলাপগুলো শুনছিল। দাদু এবং পিসিমার সম্পর্ক প্রায় আগের মতো থাকলেও মনে হচ্ছে কোথাও যেন সুর কেটে গেছে। অনিমেষ আর একবার দরজায় টোকা দিল। গনগনে আঁচের মতো মেজাজ এগিয়ে আসছে বোঝা গেল। দুপদাপ পায়ের আওয়াজ হচ্ছে। শব্দ করে দরজা খোলার সময় হেমলতা বিড়বিড় করছিলেন, 'আসার আর সময় পায় না, ভরদুপুরেও—।'

দরজা খুলে যেতে ও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু একী হয়েছে পিসিমার চেহারা! শুকিয়ে প্রায় দড়ি পাকিয়ে গেছে শরীর। গায়ে সেমিজ নেই, সাদা ফিতে পাড় ধুতিটা গোড়ালি ঢাকেনি। গাল ভেঙে গেছে। বাইরের কড়া রোদ চোখে পড়তে দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়েছিল একটু পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন, 'বাবা দেখুন কে এসেছে !'

অনিমেষ নিচু হয়ে প্রণাম করতেই উনি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। হেমলতার মুখ অনিমেষের বুকে এবং তখনই ফোঁপানি শুরু হল। কান্নাটাকে আর ধরে রাখতে পারছেন না হেমলতা, দমবন্ধ গলায় শুরু উচ্চারণ করছেন, 'অনিবাবা, অনিবাবা!'

অনিমেষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সেই স্বর্গছেঁড়া থেকে শৈশবে এই মহিলার সঙ্গে চলে আসার পর থেকে অনেক মান-অভিমান এবং সুখের স্পর্শ পেয়ে সে যৌবনে পৌঁছেছিল। কিন্তু কখনও এমন করে হেমলতা ব্যক্তিগত আড়াল সরিয়ে তার বুকে মাথা ঠোকেননি। নিজের মাকে এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দু'একটা সুখ এবং দুঃখের স্মৃতিতে আধো আলোছায়ায় মুখ বুজে আছে। কিন্তু একদিকে সরিৎশেখরের ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে হেমলতার স্নেহের প্রশ্রয় তার বালককাল ও কৈশোর জুড়ে ছড়ানো—এ তো অস্বীকার করা যায় না। আজ হেমলতা তার বুকে এমন করে ভেঙে পড়তে অনিমেষের নিজেকে সামলানো মুশকিল হচ্ছিল।

কয়েক মুহূর্ত এই অবস্থায় থাকতেই ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল, 'কে এল, ও হেম, কে এল এখন ?'

হেমলতা ফিসফিস করে অনিমেষকে বললেন, 'অনেক কথা আছে অনিবাবা, তোকে পরে বলব।' তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গলা তুললেন, 'আপনার নাতি এসেছে, অনিবাবা। কী কালো হয়ে গেছে দেখুন।' কথাটা বলতে বলতেই হেমলতা ভেতরে ঢুকলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। যেন বিশ্বজয় করে এসেছেন এমন ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছিলেন। একটু আগের কান্নাটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যেন অনিমেষ এ বাড়িতে আসতেই তাঁর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, আর কোনও কিছু নিয়ে তাঁকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

অনিমেষ আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। এই ঘরের আসবাব, চেহারা, এমনকী গন্ধটা অবিকল একই রকম রয়েছে। স্বর্গছেঁড়া থেকে জলপাইগুড়িতে এসে সরিৎশেখর এই ছ' কামরার বাড়িটা প্রথমে তৈরি করেছিলেন মাথা গোঁজার জন্য। তারপর বড় বাড়ি হল, অনেক যত্নে সেটাকে তৈরি করলেন সরিৎশেখর। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওখানো গিয়ে থাকার ইচ্ছে হল না তাঁর। এখনও সেই পুরনো ঘরেই রয়ে গেছেন। অনিমেষ বাড়ির ভেতরে ঢুকেই চমকে গেল।

ভেতরে উঠোন জুড়ে যে কাঁঠালগাছটা ছিল সেটা আর নেই। অনেকটা জায়গা ন্যাড়া দেখাচ্ছে এখন। আর তার ঠিক মাঝখানে বেতের রং-ওঠা চেয়ারে আপাদমস্তক ঢেকে এই রোদে বসে আছেন সরিৎশেখর। একটা নস্যিরঙা চাদরে ওঁর মাথা ঢাকা, শুধু চোখ আর নাক বেরিয়ে আছে বাইরে। বারান্দার কোণে এসে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হল। অনিমেষের মনে হল একটা শীতল হাওয়া যেন তার শরীরে কনকনানি ছড়াচ্ছে। এই মাত্র সামান্য ক'দিনের ব্যবধানে একটা মানুষের চেহারায় এতখানি পরিবর্তন ঘটতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কাঁধের ব্যাগটাকে বারান্দার টুলের ওপর রেখে অনিমেষ উঠোনে নামল, 'কী হয়েছে আপনার ?'

BanglaBook.org

সরিৎশেখর চিৎকার করে উঠলেন। সেই গম্ভীর স্বর নেই, বাচনভঙ্গিতে যে ব্যক্তিত্ব অনেকের সাহস হরণ করত তা উধাও, চিনচিনে গলায় শব্দটা ছিটকে বের হল, 'কাছে এসো না, কাছে এসো না, দূর থেকে কথা বলো!'

অনিমেষ ভাল করে দাদুকে দেখল। নাক চোখ তো স্বাভাবিকই আছে। সে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল আবার, 'কেন, কী হয়েছে?'

' কেন, শোনোনি কিছু? এখানে আসার পথে কেউ তোমায় বলেনি?'

'না।' মিথ্যে কথাটা শক্ত গলায় বলল অনিমেষ।

'সেকী। লোকে আমায় আজকাল দেখলেই সরে দাঁড়ায়। পাড়ায় একটা কম্পাউন্ডার পাই না যে আমাকে ইঞ্জেকশন দেবে আর তোমাকে কেউ কিছু বলল না! কেন, তোমার পিসিমা তো দরজা খুলে অনেকটা সময় নিল, সে কিছু বলেনি?'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা রান্নাঘরের বারান্দা থেকে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি বলতে যাব কেন? আপনার দুর্গতির কথা আপনি বলুন। আমার তো আর ভীমরতি হয়নি আপনার মতো'।

'অ।' চাদরে মোড়া মাথাটা একটু দুলল। তারপর অনিমেষকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জানালেন, 'শোনো, আমার কুষ্ঠ হয়েছে। জানি, সব কুষ্ঠ সংক্রামক নয়। তবু আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই কেউ এখানে আসুক আমি পছন্দ করি না। তোমার বাবাকে আমি জানিয়েছি, কিন্তু সে কথা শুনতে চায় না। সপ্তাহে একদিন এসে তোমার পিসিমার কাছে খবর নিয়ে যায়।'

হেমলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শুনলি অনিবাবা, শুনলি। অন্য কাউকে উনি রোগ ধরাবেন না কিন্তু আমার বেলায় সে কথা একদম মনে পড়ল না। স্বার্থপর কীরকম দ্যাখ তুই। সেই যে ছেলেবেলা থেকে গু-মুত ফেলাচ্ছেন তা থেকে আর নিস্তার নেই।'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, 'নিজের শরীর তো আর আয়নায় দ্যাখো না, হয় তুমি নয় আমি, যে কেউ আগে যেতে পারি। আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। এই বয়সে তোমার যদি আমার রোগ হয় তা হলে কি এমন বেশি হবে। আমার তো এই শরীরের ওপর কোনও মায়া নেই। গয়ায় গিয়ে মুক্তপুরুষ হয়ে এসছি। কিন্তু আমার ওপর তো তোমার খুব মায়া আছে। তাই তোমাকে দূরে যেতে বলছি না। আর তা বললে যে ক'দিন বেঁচে আছি খাব কী?'

হেমলতার গলাটা আচমকা পালটে গেল, 'ওই আর এক ন্যাকাপনা হয়েছে, বাবা নিজে নিজের শ্রাদ্ধ করে এসেছেন। আর তাই জগতের ওপর শরীরের ওপর ওঁর কোনও মায়া নেই! তাই যদি তবে তো রোগ হয়েছে বলে মানুষের সামনে যাচ্ছেন না কেন? ভাত একটু শক্ত থাকলে খাবার সময় আমার পিণ্ডি চটকান কেন? এর নাম মুক্তপুরুষ, না? আপনার দুটো বউ যে আগে-ভাগে মরে গেছে সেটা তারা কপাল করে এসেছিল বলেই, বুঝলেন?'

অনিমেষ একটু কড়া গলায় বলল, 'পিসিমা, আপনি একটু চুপ করুন।' তারপর দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সরিৎশেখর চোখ বন্ধ করলেন। এখন ওঁর চামড়া কুঁচকে মুখের আদল দুমড়ে দিয়েছে। সময় বড় নির্মম। অনিমেষ আদেশের গলায় বলল, 'চাদরটা সরান, আমি দেখব।'

'কুষ্ঠ, কুষ্ঠ, অনেক পাপ করেছি সারাজীবন, তার ফল।' চাদর সরাবার চেষ্টা না করে সরিৎশেখর বিড়বিড় করলেন।

'আপনি অশিক্ষিতের মতো কথা বলছেন। সামান্য ক'দিন আগেও আপনি এরকম কথা বলতেন না। চাদরটা সরান।' সরিৎশেখর বুঝলেন আর প্রতিরোধ করে লাভ নেই। একান্ত অনিচ্ছায় তিনি মাথা থেকে চাদর সরালেন। সাদা কদমফুল দেখল অনিমেষ। আধ ইঞ্চি খোঁচা খোঁচা পাকা চুলে ছাওয়া মাথাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সরিৎশেখরকে চেনা যেত না আচমকা দেখলে। অনিমেষ সতর্ক চোখে সরিৎশেখরের কানের দিকে তাকাল। বাঁ কানটা সামান্য ফুলেছে। লতির পেছন দিকটা ঘা হয়েছে বেশ। বোধহয় কানের ভাঁজ থেকে চটচটে রস জড়ানো ক্ষত ছড়িয়েছে। একটা লালচে ওষুধ বোধহয় লাগানো হয়েছে সকালে। অন্য কানটা একদম স্বাভাবিক। কানের লতিতে, নাকের পাটায় লালচে ভাব বা ফোলা নেই। গলা, কপালের ওপরের চামড়ায় বয়সের জন্য যেটুকু বিধ্বস্ত তার অতিরিক্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনিমেষ এই অল্প বয়সে অনেক কুষ্ঠরোগী দেখেছে। জীবনের প্রথমবার সেই তিস্তার ওপরে নৌকায় বসে থেকে শুরু করে কংগ্রেসের হয়ে বন্যার সাহায্য দেওয়ার সময় পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে লক্ষ করেছে। আজ সেই সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে বুঝতে পারল রোগটা কুষ্ঠ নয়। কিন্তু ডাক্তারের সন্দেহ এবং দাদুর এই আচরণ শুধু অনুমানের ওপর তা কী করে হয়? অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার রক্তে চিনি আছে?'

BanglaBook.org

'চিনি ?'
'ব্লাড সুগার !' অনিমেষ জোর করে রসিকতার চেষ্টা করছিল।
'জানি না। থাকলেও থাকতে পারে।'
'পরীক্ষা করিয়ে দেখবেন ?'
'পয়সা নষ্ট করে লাভ কী ?'
'যদি রোগটা সেই কারণেই বেড়ে থাকে তা হলে স্বস্তি পাবেন। ঠিক চিকিৎসা হবে।'
'লাভ কী ?'
'মানে ?'
'এই শরীরটা নিয়ে আমি এক ফোঁটা চিন্তা করি না।'
'কিন্তু অন্য লোককে বিব্রত করছেন।'
'বিব্রত না হলেই হয়।'
'আপনি কানের কাছে ওই রোগ হয়েছে বলে চেঁচাবেন আর লোকে তা শুনবে না ? শুনলাম ইঞ্জেকশন নিতে গিয়েছিলেন।'
'কে বলল ?'
'একটু আগে আপনিই তো কম্পাউন্ডারের কথা বললেন।'
'অ। হ্যাঁ, ডাক্তার সেন অনুমান করছিলেন। যদি হয় তা হলে লেপ্রসির প্রাথমিক ওষুধপত্র এবং ইঞ্জেকশন লিখে দিতে বলেছিলাম।'
'ব্যস। নিজে নিশ্চিন্ত না হয়ে সেগুলো ব্যবহার করতে লাগলেন! দাদু, আপনি তো এরকম অবৈজ্ঞানিক চিন্তা কখনও করতেন না ?'
হঠাৎ সরিৎশেখর দুহাতে মুখ ঢাকলেন। কিছুক্ষণ তাঁর শরীরটা নিশ্চল হয়ে রইল। জলপাইগুড়িতে ভরদুপুরের খরা রোদেও হাওয়া বয়। সেই হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ নতুন চোখে দাদুকে দেখল। এই সেই সরিৎশেখর যিনি তার সামনে এতকাল বিশাল বৃক্ষের মতো মাথা উঁচু করে ছিলেন। এখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে কিছুতেই মন চায় না।
অনিমেষ বুকের গভীর থেকে ডাকল, 'দাদু!'
সরিৎশেখর খানিকবাদে মুখ তুললেন। একবার সতর্ক চোখে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন। হেমলতাকে ধারে-কাছে দেখতে না পেয়ে বললেন, 'বারান্দা থেকে টুলটা নিয়ে এসো।'
অনিমেষ সামনে বসলে সরিৎশেখর কিছুটা সামলে নিলেন, 'আমি আর পারছি না। এ ভাবে বেঁচে থাকতে আমি পারব না।'
অনিমেষ নড়ে উঠল, 'কী হয়েছে আমাকে বলুন।'
সরিৎশেখর একটা কালো পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন। শুধু ওঁর ঠোঁট দুটো নড়ছিল, 'সারা জীবনে আমি কিছু পাইনি। দু'বার বিয়ে করেছিলাম কিন্তু ভাগ্যে সইল না। বড় মেয়েটা সেই বাল্যকালে বিধবা হয়ে ঘাড়ে চেপে রইল। বড় ছেলে দুষ্টগ্রহের মতো সারাজীবন আমার চারপাশে ঘুরছে আর আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তোমার বাবা আমাকে টাকা দেয় কিন্তু আমি বুঝি সে বাধ্য হয়েই দেয়। কারণ তার মনে একটা নরমভাব আমার সম্পর্কে আছে। কিন্তু আমার সমস্যা নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। তার ভাইদের ব্যাপারে সে নাক গলাতে চায় না। ছোটজনের সম্পর্কে আমি কিছু ভাবি না। শুনেছি সে এখন মস্কোতে আছে।'
সরিৎশেখর একটানা কথা বলে দম নিতে থামলেন।
অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। ছোটকাকা প্রিয়তোষ এখন মস্কোতে ? কথাটা সে জানত না। কমিউনিজম শব্দটা যাঁর জন্য সে প্রথম শুনেছিল তিনি নাকি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছেন—এরকম কথা কানে এসেছিল। এতদিন কলকাতায় থেকেও ছোটকাকাকে সে দেখেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে খোঁজখবর নেয় কিন্তু তেমন উৎসাহ পায়নি। আবার এও শুনেছিল ছোটকাকা দিল্লিতে আছে। এখন দাদুর মুখে ছোটকাকার রাশিয়ায় থাকার খবর পেয়ে সব হিসেব গুলিয়ে গেল তার।
সরিৎশেখর বললেন, 'প্রিয় ইজ ডেড টু মি। যে ছেলে ওই অবস্থায় গিয়ে নিজের বাবাকে স্মরণ করে না তার কোনও অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। ছোট মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু সারাজীবন সে শুধু অসম্মানের কারণ হয়ে থাকল। তোমার মাকে নিয়ে এসেছিলাম নিজে পছন্দ করে, সেও চলে গেল। সারাজীবন আদর্শ নিয়ে কঠোর মানুষ হয়ে কাটিয়ে এই সব জুটল। ধর্মকর্ম কোনও দিন

BanglaBook.org

মানতে পারিনি। শান্তির জন্য সেখানে যাওয়া কাপুরুষতা বলে ভাবতাম। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমি শেষ হয়ে গেছি। তোমার বাবা যে টাকা দেয় তাতে চলে না। এর কাছে ওর কাছে হাত পাতি। নিজেকে কেমন ভিখিরির মতো মনে হয়। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে শুনতে পাই কেউ অবাক হয়ে বলছে এই বুড়োটা এখনও বেঁচে আছে! এতদিন যে ভাবে কাটিয়ে এসেছি এখন সেটা তাড়া করে বেড়ায় আমাকে। কেঁচোর মতো থাকতে ইচ্ছে করে না একদম। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে বুঝে তোমার জ্যাঠা যখন এসে জুড়ে বসেন তখন আমি প্রতিবাদ করতে পারি না। ভাবলাম নিজের শ্রাদ্ধ করে এলে শরীরের প্রতি জগতের প্রতি কোনও মায়া থাকবে না। ভুল সব ভুল। অনিমেষ, আত্মহত্যা করতে পারব না, কিন্তু দীর্ঘজীবন বেঁচে থাকার মতো পাপ আর কিছু নেই।'

অনিমেষ এতক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। অজান্তেই নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল সে। দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুষ্ঠরোগ একটা বাহানা?'

ঘাড় নাড়লেন সরিৎশেখর, 'কাজ হয়েছে খুব। যেই শোনে আমার কুষ্ঠ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে পালিয়ে যায়। তোমার জ্যাঠামশাই আর কাছ ঘেঁষছে না। ছোট পিসি আসবে না যদ্দিন বেঁচে আছি। শুধু তোমার বাবা মনে হয় কথাটা আধা বিশ্বাস করেছে। প্রতি সপ্তাহে আসে, আমার আপত্তি বলে কাছে আসে না। শহরের লোকজন প্রায় একঘরে করে দিয়েছে আমাকে। যতই আধুনিক হোক, মানুষ যখন কল্পনা করে নিজের শরীরের মাংস খসে খসে পড়ছে তখন সব আধুনিকতা ফুস করে উধাও হয়ে যায়। আমাকে এখন কেউ বিরক্ত করে না। আমার যা কিছু অভাব তাই নিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকি। শুধু তোমার পিসিমাকে ঠকাতে আমার খারাপ লাগছে। মেয়েটা আমার যাই হোক আমাকে ছেড়ে যাবে না। কুষ্ঠ বলে সে আমলই দেয় না।

অনিমেষ অবাক হয়ে গেছিল। এ ভাবে কোনও মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কখন! কেন? এইসময় হেমলতা হড়বড় করে বারান্দায় চলে এলেন, 'একদম ভুলে গেছি। হ্যাঁরে তুই খেয়ে এসেছিস?'

'কেন বলুন তো?'

'না হলে আবার রান্না শুরু করি। শুধু সেদ্ধভাত ছাড়া আমরা কিছু খাই না। গোয়ালাটা যা বাজার করে দেয়—।'

একটা বেজে গিয়েছিল খেয়াল আছে। এখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। অনিমেষের ভেবে নিতে একটুও সময় লাগল না। পিসিমা যদি রান্না শুরু করেন তা হলে ওঁর নিজের খেতে হয়তো সন্ধে হয়ে যাবে। সে স্বচ্ছন্দে বলল, 'আমি শুধু স্নান করব। আসার সময় খেয়ে এসেছি।'

'ঠিক বলছিস তো অনিবাবা?'

অনিমেষ হাসল, 'ঠিক বলছি। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'বেশ। তা হলে স্নান করে একটু বাতাসা দিয়ে জল খাস। স্নানটা করে নে বরং। গল্প করতে করতে বাবার আর খেয়াল নেই। আসুন খাবেন।'

অনিমেষ চমকে উঠল, 'এখনও খাওয়া হয়নি?'

'হবে কী করে? সকালে একটু সুজি দিয়ে দুধ দিয়েছিলাম তাই খেয়েই তো পেট ঢাক হয়ে আছে। সারাদিন একবারই তো ভাত খায়, তাও এই সময়। কই আসুন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।' হেমলতা ডাকলেন।

সরিৎশেখর কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন। অনেকটা বেঁকে গেছেন এরই মধ্যে। হাঁটতে গিয়ে টলে গেলেন সরিৎশেখর। অনিমেষ চট করে তাঁকে ধরে ফেলে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে হাঁটিয়ে আনল। সরিৎশেখর ফিসফিস করে বললেন, 'মনে রেখো আমার কুষ্ঠ হয়েছে।' অনিমেষ হাসল।

বারান্দার এক কোনায় টেবিলে খাবারের ব্যবস্থা। ধরে ধরে ওঁকে সেখানে বসিয়ে দিতেই একই স্বরে বললেন, 'মাঝে মাঝে এক একটা দুপুর উপোস দেওয়া ভাল, ওতে শরীর সুস্থ থাকে।'

অনিমেষ এবার আর হাসতে পারল না।

স্নান সেরে বাইরে বেরোতেই মনে হল পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। অথচ এখন আর খাওয়ার কথা বলা চলে না। চুল আঁচড়ে সে রান্নাঘরের সামনে আসতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। চামচে করে দাদু ভাত মুখে দিচ্ছেন আর পিসিমা একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ একটা ঢোক গিলতে গিয়ে দাদু কাশতে শুরু করলেন। সমস্ত শরীর বেঁকেচুরে একাকার, চোখ উলটে যাচ্ছে। পিসিমা দুহাতে বুক মালিশ করতে করতে বিড়বিড় করতে লাগলেন। অনিমেষ ভয় পেয়ে একলাফে দাদুর সামনে গিয়ে হাজির হল। সরিৎশেখরের সামনে বড় বাটিতে

BanglaBoi

ভাত ডাল আর একটা তরকারিগোছের কিছু গুলে একেবারে কাই করে দেওয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে শক্ত কিছু খেতে অসুবিধে বলে দাদুর জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাও তো গলায় আটকে গেছে ওঁর।

একটু সামলে ঘাড় নেড়ে দাদু উঠে পড়লেন। তারপর এগিয়ে বেসিনে ঝুঁকে পিসিমার দেওয়া জলে মুখ ধুতে লাগলেন। অনিমেষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বমির শব্দ শুনতে পেল। হুড়হুড় করে এতক্ষণের কষ্টের খাওয়া বেসিনে উগরে দিলেন, সরিৎশেখর। অনেকটা শ্লেষ্মা খাবারের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পর যেন খুব আরাম হল ওঁর। পিসিমার গলা শোনা গেল, 'আঃ, এতক্ষণে যা খেলেন সব বমি করে দিলেন। ছি ছি ছি। এই করলে শরীর টিকবে? দেখলি অনিবাবা, কাণ্ডটা দেখলি?'

তোয়ালেতে মুখ মুছে সরিৎশেখর আবার বাইরে এসে বসলেন। অনিমেষ দেখল দাদু এখনও হাঁপাচ্ছেন। কাছে গিয়ে বসতেই হাসবার চেষ্টা করলেন। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন বোধ করছেন!' দাদুর পেট তারই মতো শূন্য ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছিল।

'ভাল। পেটে কিছু পড়লেই খারাপ বোধ হয়।'

একটা প্লেটে বাতাসা আর জল নিয়ে পিসিমা সামনে দাঁড়াতেই অনিমেষ খেয়ে নিল। অত্যন্ত সামান্য; কিন্তু খেয়ে নিতেই খিদে বোধটা চাপা পড়ে গেল। পিসিমা জিজ্ঞাসা করল, 'ক'দিন ছুটি তোর?'

'পুজোর ক'টা দিন থাকব।'

''পুজো তো দুদিন বাকি। তা এখানে থাকবি না স্বর্গছেঁড়ায় যাবি?'

'আজ একটু ওখান থেকেই ঘুরে আসি।'

'সেই ভাল। আমি আজকাল আর মাছ ডিম রাঁধতে পারি না। এইরকম নিরামিষ ঘ্যাঁট তোর একদম ভাল লাগবে না।'

পিসিমা চলে যেতে দাদু বললেন, 'মানুষ সবসময় প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু একা একা থাকতে থাকতে একটা সময় আসে যখন অন্যলোকের ছায়াও সহ্য হয় না।'

অনিমেষ বুঝতে পারল। পিসিমা-দাদুর এখনকার যে জীবন তা তাদের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে নিজেদের মতো করে তৈরি। সেখানে একদিনের জন্য এসে দাঁড়ালেও সেই নিয়মটা ওদের পালটাতে হবে। আর তার পরে যখন আবার ওঁরা একা হয়ে যাবেন তখন এই পালটানো নিয়মটার কথা ভেবে ওঁরা কষ্ট পাবেন। তার চেয়ে স্বর্গছেঁড়ায় চলে যাওয়াই উচিত।

অনিমেষ দেখল দাদু ওর দিকে অদ্ভুত শান্ত মুখে চেয়ে আছেন। হঠাৎ যেন তার মাথায় একটা চিন্তা ছিটকে গেল। সে বলল, 'মাঝে মাঝে একটা দুপুর উপোস দেওয়া ভাল, ওতে শরীর সুস্থ থাকে।'

কথাটা শুনে সরিৎশেখর চমকে উঠলেন। তারপরই সরু গলায় হো-হো করে হাসতে লাগলেন। হেমলতা অনেকদিন পরে বাবার গলায় হাসি শুনে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, হঠাৎ হাসছেন যে?'

হাসি না থামিয়ে ঘাড় নেড়ে সরিৎশেখর বললেন, 'ও তুমি বুঝবে না।'

পঁচিশ

তিস্তার ওপর সুন্দর ব্রিজ তৈরি হয়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়ি থেকে স্বর্গছেঁড়া মাত্র এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আগের আসাম রোড এখন নাম পালটে ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। বাষট্টি সালের পর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যই রাস্তাগুলো চওড়া এবং ঝকঝকে চেহারা নিয়ে সীমান্ত অবধি চলে গেছে। স্কুলে পড়তে অনিমেষ দেখেছিল বসার জায়গা না থাকলে কেউ বাসে উঠত না। আর এবার দেখল ছাদেও লোক বসেছে। শহরের মধ্যে উঠেছিল বলে সে কোনওক্রমে জায়গা পেয়েছিল বসার, এখন মানুষের চাপে নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু গাড়িটা ছুটছে খুব দ্রুত, এখানেই কলকাতা থেকে ফারাক।

ডুয়ার্সে লোক বাড়ছে। মদেশিয়া, নেপালি বা রাজবংশী নয় ভাষা থেকেই বোঝা যায় পূর্ববাংলার মানুষেরা এখানে স্থায়ী বসতি করেছেন। ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা আচারেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় আসবে যখন উত্তরবাংলার সঙ্করসংস্কৃতি গড়ে উঠবে, যার সঙ্গে পূর্ব বা পশ্চিমবাংলার কোনও মিল থাকবে না।

BanglaBook.org

জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু জলপাইগুড়ি শহর, তিস্তার ব্রিজ ছাড়ালেই দু'ধারে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল। কৃচিৎ কখনও খড়ের চালের ঘর বা দূরে ছোট গ্রামের ইশারা, ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ির আধাশহর, এলাকাটুকু ছাড়ালে ঐই দৃশ্য পালটাবে না। আর ধুপগুড়ির পরই কেমন একটা পাহাড়ি গন্ধ নাকে আসে। গাছপালার চেহারা পালটে যায়। ডুডুয়া নদী ছাড়ালেই দু-পাশে জঙ্গল ঘন হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মাঝখানের চওড়া হাইওয়ে দিয়ে বাস যখন ছোটে তখন ঝিঁঝির শব্দ কানে আসে। দেখতে দেখতে অনিমেষের মনে হচ্ছিল, এই জায়গাগুলোর অদ্ভুত একটা নির্জন চেহারা আছে কিন্তু খুব শিগগির মানুষ তা নষ্ট করবে। যে ভাবে ডুয়ার্সে জনসংখ্যা বাড়ছে এরা আর নির্জন থাকবে বলে মনে হয় না। নিজের প্রয়োজন মেটাতে মানুষ অত্যন্ত নির্মম হতে পারে। যদি জানা যেত গোলাপের কুঁড়ি সুখাদ্য তা হলে আমরা কখনওই একটা ফুটন্ত গোলাপকে দেখতে পেতাম না।

এই মাঠ জঙ্গল ঝরনাগুলো চিরকাল একই রকম চেহারা নিয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এতগুলো সরকার এল গেল কিন্তু এই জায়গাগুলোকে দেশের জন্য ব্যবহার করার কথা কারও খেয়ালই হল না। ফলে এখানকার বিভিন্ন গাঁয়ে ছড়িয়ে থাকা গরিব রাজবংশীদের জীবন সেই অন্ধকূপে আটকে আছে। সে যেমন গতকাল ভোট ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, এদের কাছেও ভোটের বাবুরা পাঁচ বছরে একবার আসে, স্বপ্ন দেখায়, তারপর কাজ মিটিয়ে চলে যায়। কলকাতার আশেপাশের গ্রামগঞ্জ পশ্চিমবাংলাকে যা দিতে পারে ডুয়ার্সের এই অবহেলিত জায়গাগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সরকার যেমন এ ব্যাপারে উদাসীন তেমনই এখানকার মানুষরাও দেশ এবং নিজেদের সম্পর্কে নিস্পৃহ। কিন্তু একটা সময় আসবেই যখন এই নিঃস্ব মানুষগুলো জ্বলে উঠবে, তখনই অবস্থা পালটাতে পারে।

আংরাভাসা নদী পেরিয়ে এসে রাস্তাটা বাঁক নিতেই বুকের ভেতরটা আচমকা হালকা হয়ে গেল। খুব শান্ত একটা আরামবোধ তিরতির করে সমস্ত শরীরে জুড়ে বসল। অনিমেষ বাঁ দিকের দিগন্ত ছোঁয়া চায়ের গাছগুলোর দিকে তাকাল। এখন বিকেল। শেষ আলোর রঙে এক ধরনের মায়া জড়ানো থাকে। দূরের খুঁটিমারি জঙ্গলের মাথায় নেমে আসা সূর্যের দিকে তাকালে সেই মায়াটাকেও যেন স্পর্শ করা যায়। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ফ্যাক্টরির ছাদ চায়ের গাছের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই আলো মেখে। রাস্তায় এখন ঘরে-ফেরা কুলিকামিনের ভিড়। অনিমেষ ভিড় বাঁচিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল।

বুকের অ্যালবাম থেকে উঠে আসা ছবির মতো কোয়ার্টারগুলো দাঁড়িয়ে, কোথাও সামান্য পরিবর্তন হয়নি। এই বিকেলে মনে হচ্ছে কেমন একটা ঝিমুনি চারধারে। সামনের ফাঁকা মাঠে চাঁপা ফুলের গাছ দুটো প্রায় নিষ্পত্র হয়ে দাঁড়িয়ে। এখন কি আর ছেলেমেয়েরা ওই মাঠে খেলে না? রাস্তা থেকে নামতেই ওদের বাড়ির সামনে যে পাতাবাহারের গাছগুলো গার্ড অফ অনার দেবার মতো দাঁড়িয়ে থাকত তারা অনেককাল আগেই উধাও। এখন কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে চারধার।

বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজা দেখে সে মত পালটাল। একটু ঘুরে বাগানের টিনের দরজা খুলে ভেতরের উঠোনে ঢুকল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এদিকের লিচুগাছগুলো বেশ ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। উঠোন পরিষ্কার, তুলসীতলাটা নিকানো। কয়েক পা এগোতেই অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। সেই বুড়ো কাঁঠালগাছটা নেই। ঝাড়ি কাকুর মুখে শোনা অদেখা ঠাকুমাদের স্মৃতিজড়ানো ওই রসালো ফলের গাছটাকে না দেখে বুকের ভেতর কেমন হু-হু করে উঠল। তার নিজের শৈশবে ওই গাছ যেন স্বপ্নের মতো ছিল। মাটির তলায় কাঁঠাল পাকত যখন তখন সেটাকে খুঁড়ে বের করতে কী মজাই লাগত! গাছটা যেন তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। অনিমেষের মনে হল, এই বাড়ি থেকে তার ভাললাগার স্মৃতিগুলো একটা একটা করে এইভাবে সরে যাবে। মন খারাপ হয়ে গেল ওর।

উঠোন ধরে একটু এগোতেই রান্নাঘর চোখে পড়ল। দরজা খোলা। একটা বাচ্চা মদেশিয়া ছেলে পা ছড়িয়ে বসে কাঠ টুকরো করছে। একে আগে কখনও দেখেনি অনিমেষ। তাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটি বিস্মিত হয়ে গলা তুলল, 'মাইজি!'

ছোটমার গলা ভেসে এল, 'কী রে!'

ছেলেটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে অনিমেষের দিকে। বোধহয় কী বলবে ঠিক করতে পারছে না। অনিমেষ তাকে সুযোগ দিল না, কণ্ঠস্বর ভারী করে বলল, 'একটু বাইরে আসুন।'

কয়েক মিনিট নীরবে চলে গেল। তারপরে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে ছোটমায়ের শরীরের অর্ধেকটা দেখা গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে দেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে, গলা থেকে স্বরটা বেরিয়ে পড়েছিল, 'কে?'

BanglaBook.org

অনিমেষ হাসতেই মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল ছোটমা, 'ওমা তুমি! কী আশ্চর্য! কোত্থেকে এলে ? গলা শুনে আমি একদম চিনতেই পারিনি। ওরকম করে কথা বলতে হয়! আমি ভাবলাম কে এমন হুট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল!' একটানা কথাগুলো বলে গেল ছোটমা। অনিমেষ ছোটমাকে দেখছিল। একটা মানুষের চেহারা এত দ্রুত পালটে যেতে পারে! গোলগাল মুখ, শরীর বেশ ভারী, মাথার সামনের দিকের চুল একটু হালকা, দস্তুরমতো গিন্নিগিন্নি ভাব এখন। সেই রোগাটে অল্পবয়সী শরীরটা একদম হারিয়ে গেছে।

ছোটমা ওর দেখার ধরনে একটু নড়েচড়ে বলল, 'কী দেখছ অমন করে ?'

'মা কী ছিলেন কী হয়েছেন।' অনিমেষ হাসল।

'এই মায়ের সঙ্গে ইয়ার্কি ?' তারপরই গলা পালটে বলল, 'খুব মোটা হয়ে গেছি, না ? বিশ্রী দেখাচ্ছে ?'

'উঁহু, এতদিনে তোমাকে মা মা দেখাচ্ছে।' কথাটা বলার সময়েই অনিমেষের খেয়াল হল ছোটমার কোনও ছেলেপুলে হয়নি।

'যাক, বাঁচা গেল। তা হলে এখন একটু মান্যিগন্যি করবে। কিন্তু নিজের চেহারাটা কি আয়নায় দেখা হয় ? কী ছিরি হয়েছে!'

'কেন? খুব খারাপ দেখতে লাগছে?'

'রোগা, মাথায় বাবুই পাখির বাসা, মুখে একরাশ জঙ্গল। খেতে পাও না নাকি ? এই চেহারা নিয়ে তুমি দেশের কাজ করবে ?'

'দেশের কাজ ?' অনিমেষ চমকে উঠল, 'এ খবর তোমাকে কে দিল ?'

ছোটমা বলল, 'বলছি, আগে বারান্দায় উঠে আরাম করে বসো, হাত মুখ ধোও। তোমার বাবা বলল এবার আসবে না তুমি, কিন্তু আমার মন বলছিল ঠিক আসবে। দ্যাখো কেমন মিলে গেল। আঃ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

হাতমুখ ধোওয়ার পর ভেতরের বারান্দায় বসে মুড়ি-মুড়কি দিয়ে চা খেতে খেতে অনিমেষ ছোটমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনল। তার কাজকর্মের কথা এখানে পৌঁছে গেছে। এমনকী অ্যারেস্টেড হয়ে থানায় যাবার গল্পও। নীলার বাবা জানিয়েছেন এখানে। সে-চিঠি পাবার পর থেকে মহীতোষ নাকি খুব গম্ভীর হয়ে গেছেন। ছোটমা বলল, 'আমার সঙ্গে তো কোনওদিন মন খুলে কথা বলেন না কিন্তু তোমার জন্য উনি খুব ভেঙে পড়েছেন এটা বুঝতে পারছি। তোমার কি পড়াশুনা করার ইচ্ছে নেই ?' অনিমেষ তখন অন্য চিন্তা করছিল। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই অনেককাল। সে নিজে নীলাদের বাড়িতে যায় না আর উনিও ওর খোঁজখবর নিতে আসেন না। তা হলে এত খবর কোত্থেকে পেলেন উনি। নীলা এখন ইউনিভার্সিটিতে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসার আগে না এলেও চলবে তার। ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই অনিমেষের। তা হলে ? নিজের অজান্তেই দেবব্রতবাবুদের ওপর রেগে গেল অনিমেষ।

ছোটমা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি পড়াশুনা করবে না ?'

অনিমেষ বলল, 'এম-এ পরীক্ষা দেব, তোমাদের কোনও চিন্তা নেই।'

ছোটমা মাথা নাড়ল, 'তা হলে তোমার বাবা এত ভাবছে কেন ? এম. এ. পাশ করলেই তো তুমি বড় চাকরি পেয়ে যাবে, তাই না ?'

'নাও পেতে পারি।'

'কেন ?'

'এ দেশে এম. এ. পাশের চেয়ে চাকরির সংখ্যা কম, তাই।'

'আমি এতসব বুঝি না।'

'তোমাকে বুঝতে কে বলেছে। তারপর বলো, তোমরা সব কেমন আছ ?' প্রশ্নটা করা মাত্র ছোটমায়ের মুখের আলো নিভে গেল। খুব বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি জলপাইগুড়ি হয়ে আসছ ?'

'কেন ?'

'তোমার দাদুর —।' ছোটমা ইতস্তত করল একটু 'খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। কারও সঙ্গে মিশছেন না। দিদি লোকজনকে ধরে বাজার করায়। তোমার বাবা রবিবার রবিবারে দেখা করতে যান। তোমার দাদু ওনার সঙ্গেও কথা বলেন না। খুব মন ভেঙে গেছে তোমার বাবার। ভেবেছিলেন তোমাকে চিঠিতে জানাবেন, তারপর—।'

BanglaBook.org

ঠিক এইসময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা উঠে দাঁড়ালেন, 'উনি এসে গেছেন। শোনো, উনি বকাবকি করলে চুপ করে থেকো, মানুষটা খুব অশান্তিতে আছে।' দ্বিতীয়বার শব্দটা হতেই ছোটমা দ্রুত ছুটে গেলেন। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। মহীতোষের সঙ্গে এবার মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু কোনওরকম আড়ষ্টতা বোধ করছে না সে।

ঘরের ভেতরে জুতোর শব্দ এবং ছোটমায়ের চাপা গলা শুনতে পেল অনিমেষ। মহীতোষের গলা শোনা যাচ্ছে না। মিনিট কয়েক পরে মহীতোষ খালি পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই অনিমেষ কাছাকাছি হল। ছেলের দিকে এক পলক তাকিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন এলি?'

'মিনিট কুড়ি হবে।'

'এখন তো ট্রেন ছিল না, জলপাইগুড়ি হয়ে এলি?'

'হুঁ।'

'শুনেছিস?'

'হুঁ।'

'আমি গেলে আমার সঙ্গেও দেখা করেন না। একমাত্র বড়দি ছাড়া কথা বলার কেউ নেই। প্রথমে চিকিৎসা নিজেই করাতে গিয়েছিলেন, এখন তাও ছেড়ে দিয়েছেন। আমি কী করব বুঝতে পারি না। চোখের সামনে আত্মহত্যা করছেন উনি, আমি পাগল হয়ে যাব।' মহীতোষ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন। অনিমেষ দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ছোটমা ভাঁড়ার ঘরে বসে লণ্ঠন জ্বালছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। স্বর্গছেঁড়ায় সন্ধে নেমে গেছে। পাতলা তুলোর মতো আঁধারে বসে থাকা মহীতোষের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছের মতো লাগছে ওঁকে। ভাবভঙ্গিতে সেই তেজ একদম নেই। কেমন ম্রিয়মান হয়ে বসে আছেন মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে। ছোটমায়ের আশঙ্কা মতো দেবব্রতবাবুর চিঠি পেয়ে অনিমেষের ওপর ক্ষিপ্ত হবার কোনও প্রকাশ এখনও দেখা যাচ্ছে না। বাবাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখে অনিমেষের খারাপ লাগছিল। মহীতোষ এর মধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেছেন, মাথার চুল প্রায় সাদা।

'দেখা করেনি নিশ্চয়।'

মহীতোষের বলার ধরনে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি অনিমেষ, 'কে?'

'তোর দাদুর কথা বলছি।'

'ও। হ্যাঁ, হয়েছিল।' অনিমেষ কথাটা বলতেই মহীতোষ ঘুরে ছেলের দিকে তাকালেন। অনিমেষ টের পেল ছোটমাও সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। অনিমেষ এক ফলক চিন্তা করল সত্যি কথাটা বলবে কি না। দাদু যে আড়াল করে নিজেকে রেখেছেন সেটার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের নিজের মতন করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। দাদু যদি ও ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে শান্তি পান—। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল ও ভাবে কি শান্তি পাওয়া যায়? এও কি একরকম আত্মহত্যা নয়? দাদু অবশ্য তাকে নিষেধ করেছেন কারও কাছে ফাঁস করতে কিন্তু সেটা মান্য করার অর্থ হল দাদুকে আত্মহননে সাহায্য করা। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল বাবা যেভাবে ভেঙে পড়েছেন তাঁকে সাহায্য করা অবশ্যই কর্তব্য।

মহীতোষ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মুখের ওপর ছোটমার হাতে ধরা লণ্ঠনের আলো কাঁপছে। অনিমেষ খুব ধীরে ধীরে বলল, 'দাদু খুব কষ্টে আছেন।'

'শরীর কেমন দেখলি? লেপ্রসির চিহ্ন—।' কথাটা শেষ করে উঠতে পারলেন না মহীতোষ। ওঁর গলায় কান্না এসে গেছে বুঝতে পারল অনিমেষ।

কয়েক পা এগিয়ে বাবার মুখোমুখি আর একটা মোড়ায় বসল অনিমেষ। তারপর বলল, 'দাদুর কষ্ট আপাতত অর্থের। তুমি যা দাও তাতে কুলোয় না। জ্যাঠামশাই, ছোট পিসিমা তো আছেনই, আমরাও বোধহয় ওঁকে শান্তিতে থাকতে দিতে পারিনি।'

'জানি না। আমি তো ছেলে হিসেবে কখনও কর্তব্যে ত্রুটি করিনি। ওঁকে টাকা পাঠিয়ে সাধ্যের মতো যতটা সম্ভব ওঁকে দিই। কিন্তু প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাননি কেন? মুখেটুখে ঘা দেখলি?'

'না। কারণ ওঁর লেপ্রসি হয়নি।'

অনিমেষের কথা শেষ হতেই মহীতোষ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। ছেলের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। দুটো চোখ বড় হয়ে গেছে, মুখ হাঁ। ছোটমা লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী বলছ?'

BanglaBook.org

এবার অনিমেষ সমস্ত কথা খুলে বলল। দাদুর বাড়িতে যাওয়ার পর যা যা হয়েছিল সব। ভেবেছিল এসব শুনলে ছোটমা এবং বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তার বদলে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ঘটল। মহীতোষ শিশুর মতো কাঁদতে আরম্ভ করলেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে তাঁর ফোঁপানি সামলাতে পারছিলেন না। ছোটমা আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নেমে রান্নাঘরে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মহীতোষ শান্ত হলেন। কিন্তু অনিমেষ বুঝতে পারছিল এখনও কথা বলার মতো মনের অবস্থা তাঁর হয়নি। ব্যাপারটা ঘোরাতেই সে বলল, 'দেবব্রতবাবুর চিঠি পেয়েছ?'

'কার?' অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করলেন মহীতোষ।

'দেবব্রতবাবুর।'

'ও হ্যাঁ।'

কিন্তু তারপর আর কোনও কথা নেই। অনিমেষ ভেবেছিল এ কথা মনে পড়লেই মহীতোষ ওর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, কিন্তু এমন নিরুত্তাপ আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পেল না সে। দুজনে চুপচাপ বসে আছে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না অনিমেষ, অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ মহীতোষ বললেন, 'ওঁর মেয়ের সঙ্গে তোর দেখা হয়?'

'বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি, কেন?'

'তুই ওদের বাড়ি যাস না?'

'সময় পাই না—।'

'মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। এমন একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে যে মোটেই ওর যোগ্য নয়। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে খুব ঝগড়া হয়েছে ওর, তিনি মেয়ের মুখ দর্শন করবেন না বলে জানিয়েছেন।'

'নীলা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে?' অনিমেষ যেন আকাশ থেকে পড়ল। নীলার মতো প্রাকটিক্যাল মেয়ে এমন কাজ করল! তা হলে কি নীলা মোটেই প্র্যাকটিকাল ছিল না, ভান করত! কয়েকদিন আগে শচীন ওর সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল, তা কি এই ব্যাপারটাই। কাকে বিয়ে করল নীলা? অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল।

মহীতোষ নিজের মনেই বললেন, 'ছেলেমেয়েদের ওপর যদি ভরসা না রাখতে পারি তা হলে বেঁচে থাকব কী জন্য? দেবব্রতবাবু মেয়েটাকে মনের মতো করে গড়তে চেয়েছিলেন যাতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে কিন্তু তার বদলে কী পেলেন? সাবালক হলে প্রত্যেকের নিজের মতো চলার স্বাধীনতা আছে কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা উচিত, যারা তাকে ঘিরে এতদিন স্বপ্ন দেখে এল, তাদের প্রতি একটা দায়িত্বও রয়েছে। তোর জ্যাঠামশাই বা কাকা সেটা মনে রাখেনি কিন্তু আমার পক্ষে তো এড়ানো সম্ভব হয়নি।'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল এ সব কথা তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। কোনও কারণে মহীতোষ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারছেন না। কারণটা কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছেন উনি। নীলার ব্যাপারটায় এতখানি অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ যে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না। চুপচাপ সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। এর মধ্যে একসময় মহীতোষ উঠে বাথরুমে গেছেন। অন্ধকারে চোখ রেখে অনিমেষ বুঝতে পারল একটা বয়স হলে খুব নিকট সম্পর্কগুলোর মধ্যে ছোট বড় দেওয়াল তৈরি হয়ে যায়। তখন পরস্পরকে স্পর্শ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। দাদু পিসিমা যে বিচ্ছিন্ন জগতে বাস করছেন তার সঙ্গে বাবা এবং ছোটমায়ের খুব একটা ফারাক এখন নেই। আর এবার আরও সত্য হল, তার সঙ্গে ওঁদের ব্যবধানটা অনেক বেড়ে গেছে। হয়তো বাবা কিংবা দাদু ঠিক একই জায়গায় রয়ে গেছেন কিন্তু সে নিজে এমন দূরত্বে চলে গেছে যে ব্যবধান কমানোর কোনও উপায় নেই। কিন্তু এ জন্য কোনওরকম দুঃখবোধ তার হচ্ছিল না। আবার নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দ টের পাচ্ছিল না মোটেই।

রুটিন মতো মহীতোষ তাসের আসরে চলে গেলে অনিমেষ ভেবেছিল ছোটমায়ের সঙ্গে বসে গল্প করবে। কিন্তু এই ছোটমাকে দেখার পর থেকেই সেই কৈশোরের ছেলেমানুষ মেয়েটাকে সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এখন এই মহিলা অনেক গিন্নিবান্নি ধরনের, স্নেহপ্রবণ এবং বাবার সঙ্গে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক হয়ে গেছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সুন্দর কিন্তু অনিমেষ ওঁর সঙ্গে আড্ডা মারার মেজাজটাকে খুঁজে পেল না। রাত বেশি হয়নি দেখে সে বাড়ি ছেড়ে স্বর্গছেঁড়া ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল।

মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই অনিমেষ টর্চের আলোগুলো দেখতে পেল। রাস্তার দুধারে ঝাঁকড়া লম্বা গাছগুলোর গায়ে নীচ থেকে আলো ফেলা হচ্ছে যাতে বাদুড় শিকার করা যায়। মদেশিয়া

BanglaBook.org

ছেলেদের এই কর্মটি সে ছেলেবেলাতেও দেখেছে এবং এখনও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনিমেষের মনে হল পশ্চিমবঙ্গের এখানে ওখানে বিপ্লবের যত কথাই হোক, কমিউনিজমের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং প্রচার যাই চলুক না কেন, সাধারণ মানুষের ভঙ্গুর এবং অন্ধ আর্থিকদীনতাপ্রসূত আদিম জীবন একটুও পালটায়নি। মাঝে-মাঝে হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ির আলোয় ছেলেগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল সে। হাতে গুলতি নিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে রয়েছে।

এদিকে বিদ্যুৎ নেই কিন্তু ও পাশের স্বর্গছেঁড়া আলোয় ঝলমলে। চা-বাগানের কোয়ার্টার ছাড়িয়ে সে বাজার এলাকায় ঢুকল। চমকে যাওয়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে জায়গাটার। ঝকঝক দোকানপাট, মাইকে চাপা স্বরে গান বাজছে। এতরকমের দোকান স্বর্গছেঁড়ায় কখনও ভাবা যায়নি। হাঁটতে হাঁটতে চৌমাথায় চলে এল অনিমেষ। চারধার দিনের মতো পরিষ্কার। স্বর্গছেঁড়া তার সেই রহস্যময় চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছে। এখন একটা ছোট শহরের থেকে এর কোনও প্রভেদ নেই। ব্যাপারটা ভাল কিংবা মন্দ সেটা পরের কথা কিন্তু ব্যক্তি-চেহারা হারিয়ে গিয়ে যখন দলের মধ্যে কিছু ঢুকে পড়ে তখন এক ধরনের নিঃস্বতা বোধ হয়।

পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ করতে ইচ্ছে করছিল। ওরা কি আর রাস্তাঘাটে আড্ডা মারে না? এখনও তো রাত তেমন বেশি হয়নি। কয়েক পা এগোতেই থমকে গেল সে। তাদের পার্টির অফিস হয়েছে স্বর্গছেঁড়ায়। ওপরে পতাকা টাঙানো রয়েছে। অফিসঘরের সামনে রাস্তার ওপর কয়েকজন অচেনা মানুষ গুলতানি করছে। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল, সে কাউকে না জানিয়ে নির্বাচনী প্রচারকর্ম ছেড়ে চলে এসেছে। এইজন্য তাকে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত দিতে হবে। বলা যায় না পার্টিবিরোধী কাজের জন্য তাকে বহিষ্কার করাও হতে পারে। বহিষ্কার কথাটা মনে হতেই সুবাসদার কথা মনে এল। সে তো ভেতরে ঢোকার অনুমতিই পায়নি তাই বহিষ্কার হবার যোগ্যতাও নেই তার। শুধু দলের হয়ে কাজকর্ম করতে তাকে আর দেওয়া হবে না। একদম না বলে-কয়ে চলে আসাটা অন্যায় হয়েছে। নিয়মশৃঙ্খলা অবশ্যই মেনে চলা উচিত। এই কারণে শাস্তি পাওয়া সঙ্গত। কিন্তু গতকাল রাত্রে মনে হয়েছিল এই নির্বাচনীপ্রচার ব্যাপারটা পুরোটাই ভাঁওতা। কমিউনিজমে যারা বিশ্বাস করে তারা কেন জনসাধারণের কাছে ভোট ভিক্ষে করবে? প্রসববেদনার কথা কোনও মেয়েকে কি স্মরণ করিয়ে দিতে হয়? কমিউনিস্টরা যদি তাদের আচরণ এবং কাজকর্মে ওই মতবাদকে জনসাধারণের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পারে তা হলে নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ যতই প্রচার করুক না কেন মানুষ নিজের প্রয়োজনেই কমিউনিস্টদের ভোট দিতে আসবে। তা সম্ভব হচ্ছে না কারণ এ-দেশের কমিউনিস্টরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি।

পার্টি অফিসের সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকেরই নজর পড়েছিল। এমন সময় ভেতর থেকে নিজের নাম ভেসে আসতে শুনল অনিমেষ। আর তার পরেই বিশুকে দেখতে পেল দরজায়। চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে বিশুর। পাজামা, হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরায় মনে হচ্ছে একটা হ্যাঙারে সেগুলোকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। অনিমেষ এগিয়ে গেলে বিশু জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলি?'

'আজই।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

ছোট ঘর, শতরঞ্জিও পাতা। একদিকে কিছু পোস্টার স্তূপ করে রাখা। দু'তিনজন লোক একটা লিস্ট নিয়ে কাজ করছে। দেওয়ালে লেনিনের ছবি।

অনিমেষ বলল, 'এখানে পার্টির অফিস হয়েছে জানতাম না তো।'

বিশু বলল, 'কী জানিস তোরা। শহরে থেকে গ্রামের খবর রাখিস?'

ওদের ঘিরে আরও কয়েকজন এসে বসল। অনিমেষ বিশুর কথাটা গায়ে মাখল না। হেসে বলল, 'তুই পার্টি করছিস জানতাম না তো।'

বিশু বলল, 'আবার বলতে পারতাম কী জানিস তোরা —!' বলে হাসল, 'কিছু হল না, না পড়াশুনা না চাকরি, পার্টির কাজ করছি। একটা নিয়ে তো থাকতে হবে। তবে এটা করার জন্য একটা উপকার হয়েছে। সুনীল পালের স-মিলে সামনের মাস থেকে জয়েন করব।'

সুনলী পাল এ তল্লাটের একজন বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী। কিন্তু পার্টি করলে তিনি কেন চাকরি দেবেন সেটা বুঝতে পারল না অনিমেষ। বুঝিয়ে দিল বিশু, 'ওদের মিলে মারাত্মক ধরনের শ্রমবিরোধ হয়েছিল। শিবুদা, আমাদের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি, মিটিয়ে দেন। আজই এই প্রতিশ্রুতিটা পাওয়া যায়।'

BanglaBook.org

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু এটা তো প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘুষ।'

বিশু বলল, 'প্রতিক্রিয়াশীল ? বড়লোক হলেই প্রতিক্রিয়াশীল হবে! কী চিন্তা সব ! তা ছাড়া আমরা সমাজের চারধারে ছড়িয়ে পড়তে চাই। সে জন্য কিছু কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেই হবে। শুনেছি বিড়লা টাটাদের পি.আর. ও. যারা তারা এককালের পাকা কমিউনিস্ট।'

অনিমেষ নিচু গলায় বলল, 'তা হলে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে পার্টি করছ!'

'কে করছে না ? সবাই করছে। আমরা পাঁক তুলব আর নেতারা চাটনি খাবে ? এদেশের মানুষ কখনওই কমিউনিস্ট হবে না। তারা যেই নিজের স্বার্থে ঘা পড়বে তখনই কমিউনিজমকে বাতিল করবে। এইরকম ঠুকঠাক করতে করতে যতটুকু এগোনো যায় ততটুকুই ভাল।'

বেনোজল চারধারে। অনিমেষ উঠে পড়তে চাইল। বিশু এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে রাজি নয় তাকে। দরজায় দাঁড়িয়ে বাপির কথা জিজ্ঞাসা করল অনিমেষ। বিশু বলল, 'বাপি এখন বিগ বিজনেসম্যান। দশটা ট্যাক্সি, গোটা চারেক লরি। দুনম্বর করে লাল হয়ে গেছে। শালা এখন কংগ্রেসকে ব্যাক করে। আমরা চাইলেও পয়সাকড়ি দেয়। তুই কি কলকাতা থেকে এলি না জলপাইগুড়ি হয়ে — ?'

'আমি দাসপাড়ায় এসেছিলাম ইলেকশনের কাজে।'

'ইলেকশন ?'

'তোদের পার্টির হয়ে প্রচারের জন্য।'

'গুরু, তুমি আমাদের লোক ? শালা এতক্ষণ নকশা করছিলে ?' দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে অনিমেষকে, 'তবে ওখানে কংগ্রেসকে হারানো মুশকিল। কেমন বুঝলি ?' খুব অন্তরঙ্গ গলায় বলল বিশু।

'আমি না বলে-কয়ে চলে এসেছি।'

'সেকী, কেন ?'

'আমার মনে হয়েছে পার্টি যা করছে তার কোনও ভিত্তি নেই।'

'সবকিছুর মানে থাকে নাকি ? আমরা যদি ক্ষমতা পাই কোনওদিন তা হলে সুদে আসলে পুষিয়ে যাবে।'

'তাতে দেশের কী হবে ?'

'একটু একটু করে পালটাবে। এই রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয় এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়। তুই চলে এসে ঠিক করিসনি। আখেরে নিজেরই ক্ষতি করলি।' বিশু গম্ভীর হয়ে গেল।

সে-রাতে বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে এবং কিছুদিন পরে কলকাতামুখী ট্রেনের কামরায় বসে অনিমেষ একটা সিদ্ধান্ত নিল। আমরা যতই নানান ডিজাইনের বস্ত্র শরীরে চাপাই না কেন তাতে শরীরের কোনও হেরফের ঘটে না। পোশাকের চমকে ও ঔজ্জ্বল্যে চোখে সুখ লাগে হয়তো কিন্তু যতক্ষণ না শরীরটাকে সুস্থ করা যায় ততক্ষণ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবেই। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো শুধু পোশাকের কথাই ভেবে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য কিছু করার পথ কোথায় ? কলকাতায় ফিরে গিয়ে পার্টির নেতাদের খোলাখুলি কথাগুলো বললে কেমন হয়! পরক্ষণেই মনে হল তারও কি দু-পা এগোনো এক-পা পিছিয়ে যাওয়া নীতি অনুসরণ করা উচিত নয় ? এখন চুপচাপ দেখে যাওয়া দরকার। সে যেমন পার্টির এই পথ মেনে নিতে পারছে না তেমনি ওর মতো অনেকেই সে-কথা ভাবতে পারে। তাই সময় এলে পথ পরিষ্কার হতে বাধ্য। ফোঁড়া পেকে গেলে পুঁজ না বেরিয়ে থাকতে পারে ? অতএব এখন অপেক্ষা করা দরকার। এইসময় সে পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে পারে। মহীতোষ তাঁকে একটুও গালমন্দ করেননি। এ-থেকেই বোঝা যায় তাকে পেছনে জড়িয়ে রাখার মতো কেউ নেই। এই দেশে এম.এ. পাশ করা নিতান্তই অর্থহীন, তবু কাউকে খুশি করার জন্য আমাদের তো প্রতিনিয়ত অনেক অর্থহীন কাজ করে যেতে হচ্ছেই। এই যেমন পার্টি করছি এমন অহঙ্কার করা।

ছাব্বিশ

অনিমেষের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল বিমান। ঘরে সুদীপ ছাড়া আর কেউ নেই। এতক্ষণ গড়গড় করে কিছুটা মিথ্যে বলার পর অনিমেষ এখন ভেতরে ভেতরে নার্ভাস বোধ করছিল। এই সময়টার জন্যে সে মনে মনে অনেক রিহার্সাল দিয়ে আসা সত্ত্বেও বুঝতে পারছিল তার দেখানো কারণ খুব জোরালো নয়।

Banglabook.org

বিমান সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী মনে হচ্ছে ?'

নেভা চুরুট দেশলাই কাঠি দিয়ে ঠিক করতে করতে সুদীপ বলল, 'চট করে মনে হবে ও মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু মফস্বলের ছেলেদের মানসিকতা বড্ড ঘোলাটে। দেশের কাছাকাছি গেলে সব রকম দায়িত্ব বিস্মৃত হতে ওদের বেশি সময় লাগে না।'

বিমান বলল, 'অনিমেষ, আমি তোমার কথায় কোনও লজিক খুঁজে পাচ্ছি না। দাসপাড়ায় বসে তুমি খবর পেলে তোমার দাদুর অসুখ হয়েছে এবং কাউকে কিছু না জানিয়েই জলপাইগুড়ি চলে গেলে। সেখানে এতদিন থাকলে অথচ আমাদের কাউকে একটা চিঠি দিয়ে ব্যাপারটা জানাতে পারলে না। প্রথম কথা, দাসপাড়ায় তোমাকে ওই খবর দেবার জন্য কে বসে থাকবে ? দ্বিতীয়ত, খবর পেলে তোমার টিমকে জানানোর সময় ছিল না এটা অবিশ্বাস্য। তৃতীয়ত, জলপাইগুড়ি থেকে তুমি দাসপাড়ায় ব্যাক করতে পারতে কিংবা আমাকে চিঠি দিতে পারতে।'

অনিমেষ নিচু গলায় বলল, 'আপনাকে তো বললাম, খবরটা শুনে আমি এমন আপসেট হয়ে গেলাম যে কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। চিঠি দেবার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু কোন ঠিকানায় দেব বুঝতে পারিনি।'

সুদীপ বলল, 'তোমাকে তো এতটা নির্বোধ বলে মনে হয় না! তুমি এই কথাটা স্পষ্ট বলতে পারছ না কেন অত কাছাকাছি গিয়ে তোমার খুব মন কেমন করছিল দেশে যাওয়ার জন্য এবং তুমি জানতে যে পারমিশন পাবে না তাই কেটে পড়েছিলে চুপচাপ।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না, এ কথা ঠিক নয়।'

বিমান বলল, 'আমি তোমার ব্যবহারে মর্মাহত। তোমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের জন্য আমাকে অনেক কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। তুমি উধাও হয়ে গেলে, তুমি তো খুনও হয়ে যেতে পারতে! সেক্ষেত্রে পার্টি কী জবাব দিত ? মোদ্দা কথা তুমি পার্টির কাছে আমাকে অপদস্থ করেছ।'

হঠাৎ সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দাদুর খবরটা যদি আমরা যাচাই করি ?'

'স্বচ্ছন্দে।' অনিমেষ নড়েচড়ে বসল, 'শহরের অনেকেই জানে এখন।'

'কী হয়েছিল ওঁর ?'

'লেপ্রসি।'

অনিমেষ দেখল দু'জনেই একসঙ্গে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দু'জনের মুখের অবস্থা দেখে খুব কষ্টে হাসি চাপল সে। আমরা যতই মুখে প্রগতির কথা বলি না কেন, এইসব অকারণ আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু ব্যাপারটাকে সে কাজে লাগাল, 'ওই খবর পাওয়ার পর আমার মাথা ঠাণ্ডা থাকতে পারে ? আমার ছেলেবেলায় দাদুর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।'

গলার স্বর বদলে গেল বিমানের, 'দুঃখিত। কথাটা যদি ইউনিয়নের ঠিকানায় জানিয়ে দিতে তা হলে এই ভুল বোঝাবুঝি হত না। যা হোক, উনি কেমন আছেন ?'

'চিকিৎসা চলছে। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব শকিং।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি চেষ্টা করব যাতে পার্টি তোমার সম্পর্কে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত না নেয়। কিন্তু এটাই শেষ সুযোগ। আমাদের মনে রাখা উচিত পৃথিবীর যে কোনও ব্যক্তিগত সমস্যার চাইতে দলের কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' বিমান খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করল।

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'আমার মনে থাকবে।'

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি চুকে যাবে বুঝতে পারেনি অনিমেষ। সে নিশ্চিত ছিল ছাত্র ফেডারেশন তাকে বাতিল করে দেবে। সেটা হলে তার আপাতত কিছুই করার থাকছে না। দেশের জন্য কেউ যদি কিছু করতে চায় তা হলে তাকে একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের বিকল্প দল এখন একটাই। যদিও ঘোলাজলের মতো একই জায়গায় পাক খাচ্ছে তবু যা কিছু নাড়াচাড়া এই দলেই। বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের কাজকর্ম, মতবাদ এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনও রকম আশা করার কিছু না থাকলেও খুব সামান্য কাজ এই দলে থাকলেই করা যাবে। সেই দু-পা এগোনো এবং এক-পা পিছিয়ে যাওয়া ব্যাপার আর কি।

কলকাতায় ফিরে এসে তার মনে হয়েছিল কেউ তাকে মাথার দিব্যি দেয়নি যে রাজনীতি করতে হবে। তার সহপাঠীরা, কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষেরা এ সব না করে দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। এম. এ. পাশ করে একটা যে কোনও চাকরি জুটিয়ে নিয়ে হাজারটা সমস্যার মধ্যে ওইরকম কাটিয়ে দেওয়া যায়। আজকের ভারতবর্ষে কেউ কি দেশের কথা ভেবে রাজনীতি করে ? ব্রিটিশ আমলে যাঁরা দেশের কথা ভাবতেন তাঁদের স্বদেশি বলা হত। এখন বলা হয় না কেন ? ব্রিটিশের বিকল্প যদি

BanglaBook.org

প্রতিক্রিয়াশীল শোষকরা হয় তো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও তো স্বদেশি করা হতে পারে। মুশকিল হল, স্বাদেশিকতাকে এখন সংকীর্ণ মনোভাবের প্রকাশ বলা হয়। অথচ বৃহত্তর ব্যাপারটার কোনও মাথামুণ্ডু নেই এ-কথা জানলেও কেউ মানতে চাইবে না।

কেন তার মনে হয় আমাদের দেশের মানুষগুলো স্বাধীন নয়? কেন মনে হয় লক্ষটা সংস্কার এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা থেকে লাভবান হয় একটিমাত্র শ্রেণী। যদি এই দেশের মানুষের আর্থিক কাঠামোটা এক করা যেত তা হলে দেশের চেহারাটাই পালটে যেত। এটা ঠিক, আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় কোনও দলেরই সেই কাজ করা সম্ভব নয়। সুদীপরা বলবে সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে যেটুকু কাজ করা যায় তাই করা উচিত। অনিমেষের মনে হয় এ একধরনের ফাঁকিবাজি। বিরোধীদল হিসেবে কংগ্রেসের সমালোচনা বা বিক্ষোভ দেখানোর মধ্যে একধরনের বাহাদুরি আছে কিন্তু গঠনমূলক কাজকর্ম, যাতে দেশের সমগ্র মানুষ সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবে তা করা সম্পূর্ণ আলাদা। কমিউনিজমের থিয়োরি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি দেশের মাটি এবং মানুষের মনের চেহারা এক নয়। কিন্তু এ-সব চিন্তা তার মাথায় আসে কেন? অনেক ভেবেছে অনিমেষ, কিন্তু নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার স্বপক্ষে কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। চারপাশে এতরকম অসাধুতা যে নিজের মনের কাছেই দোষী হয়ে থাকতে হয়।

এই এবার জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার সময় চোখের সামনে টিকিট চেকারকে ঘুষ দেবার জন্য যাত্রীদের হুড়োহুড়ি করতে দেখল। যারা দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে তাদের কেউ তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পড়ে না। এ-সব দেখে তার মধ্যে কেন ছটফটানি শুরু হয়? সেই কোন শৈশবে বন্দেমাতরম শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে সমস্ত শরীরে এক ধরনের আবেগের কাঁটা উঠত, তাই বা কেন হত? সেই সময় রক্তে রোপিত স্বদেশি চিন্তাটা এতকাল নানান তাপে চেহারা পালটে কি তাকে এই ছটফটানি দিয়ে গেছে? তাই যদি হয় তবে সুদীপ-বিমানদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকাই উচিত। ওরা কিছু করুক না করুক কথাবার্তায় অনেক কিছু করার একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। এটুকুই লাভ। অনিমেষের খেয়াল হল আজ বিমানদের আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য দাদু তাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেন। এই একটি মানুষের কাছে তার ঋণ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে এবং পৃথিবীর কোনও দামে তা শোধ করা যাবে না।

কংগ্রেসের অবস্থা এখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। নেতৃত্ব চিরকালই বৃদ্ধদের হাতে থাকে। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসিরা বিধান রায়ের পর নিজেরা কে কতখানি স্থবির প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অন্ধ বিশ্বাস গান্ধীজির নামের মধ্যে একটা জাদুমন্ত্র আছে যার দ্বারা দেশের মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এই দেশ মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়। বিরোধীরা শুধু চিৎকারেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাই ওদের কাছ থেকে কোনও ভয় নেই, মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো রুটি ছুড়ে দিলেই যথেষ্ট। তাঁরা যে মেহনত করে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তার দাবিতে চিরকাল তাঁদের গদিতে বসিয়ে রাখা দেশবাসীর পবিত্র কর্তব্য। এইসব ধারণা থেকেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সৃষ্টি; যে গণতন্ত্রকে ধনিক-গণতন্ত্র বলা যায়। এই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি দিয়ে সমাজতন্ত্র হয় না। কংগ্রেস সেটি আমদানি করেছে। বামপন্থী দলগুলো যদি নির্বাচনে জেতে তা হলে ওই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির মধ্যে দিয়েই তাদের যেতে হবে।

বামপন্থী দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে সরাতে চাইছেন। ধনিক শ্রেণীর ব্যাকিং যদি না থাকে তা হলে ফললাভ কষ্টকর। আর সত্যিই যদি ফল পাওয়া যায় তা হলে বুঝতে হবে এতকালে দেশের মানুষ নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা বামপন্থীদের ভোট দিচ্ছে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু একটা সাইকেলকে প্যাডেল ঘোরালে সামনের দিকেই নিয়ে যাওয়া যায়, পেছনদিকে প্রয়োজনেও চালানো যায় না। নির্বাচনে জিতলে তাই বামপন্থীদের সম্পর্কে জনসাধারণ বাধ্য হয়ে মোহমুক্ত হবেন।

কিন্তু পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার অনিমেষ লক্ষ করছিল। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আগামী নির্বাচনের কথা স্মরণ রেখে কৃষক সভার মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। খাস জমি বণ্টন, বর্গাস্বত্ব, খাদ্য, কাজ, মজুরি হল তালিকাভুক্ত। একটু একটু করে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া থেকে নিম্নবিত্তশ্রেণী গণতান্ত্রিক অধিকার ও ক্ষমতা দখলের জন্য ভাবতে শুরু করেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক রাজনৈতিক নির্যাতন জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। জনগণের একাংশ এর থেকে মুক্তি পাবার আশায় ক্রমশ রাজনৈতিক পরিবর্তন কামনা করতে শুরু করেছে। এই

BanglaBook.org

চেতনাটাকে কাজে লাগাচ্ছে বামপন্থীরা। যদিও তাঁদের পথ বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির বাঁধা পথেই শেষ হবে কারণ ব্যবস্থাটা যে এক। তবু এই আলোড়নের সময় যুক্ত থাকাই যে কোনও কর্মীর উচিত। অনিমেষ বিমান-সুদীপের সঙ্গে মিশে গেল।

আজকাল অনিমেষের হাতে তেমন পয়সা-কড়ি থাকে না। এবার বাবার কাছে সে মুখ ফুটে বেশি টাকা চাইতে পারেনি। দাদুর অবস্থা দেখার পর তা সম্ভবও নয়। পরমহংসের মতো টিউশনি যে তার পক্ষে করা সম্ভব নয় এটা বুঝতে পেরেছে। সামান্য ক'টা টাকার জন্য ওরকম বাঁধা জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব। অথচ কোনও আশু সমাধান নেই।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসে অনিমেষ শুরু করল সেটা হল পড়াশুনা। এতদিন তার ঘরের টেবিল জুড়ে কমিউনিজমের ওপর লেখা নানান বই পত্রপত্রিকা ছড়ানো থাকত। সব কাজ চুকিয়ে রাত্রের খাওয়ার পর বই নিয়ে বসত অনিমেষ। পড়তে গিয়ে অনিমেষ প্রথমে ভেবেছিল সে অসীম সমুদ্রে পড়বে। দীর্ঘদিন সংশ্রব না থাকায় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাংলা এমন একটা বিষয় যে সামান্য মস্তিষ্ক থাকলে দখল নেওয়া কষ্টকর নয়। একমাত্র ভাষাতত্ত্ব বুঝতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। ব্যাপারটা ফাঁকিবাজি দিয়ে সম্ভব নয়। পালি প্রাকৃতও প্রথমে ওইরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পঠনের ফলে সব কিছুর মেডইজি বেরিয়ে যায়। অনিমেষ ঠিক করল, যাই হোক না কেন এম.এ-টা এবারেই সম্মানের সঙ্গে পাশ করতে হবে। কোনও ফলশ্রুতি নেই, পাশ করলেও অন্ধকার—এ সব জেনেও করতে হবে। কারণ নিজেকে অযোগ্য ভাবতে সে রাজি নয়। যে বাসনা নিয়ে এ দেশের মানুষ রাজনীতি করে সেই বাসনাতেই তাকে পাশ করতে হবে।

মাধবীলতা এখন অদ্ভুত চুপচাপ। দাসপাড়ার অভিজ্ঞতা এবং তার পরের ঘটনা অনিমেষ ওকে বুঝিয়ে বলেছে। মাধবীলতা শুনেছে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। যেন অনিমেষ যা করবে তা সে বুঝে-সুঝেই করবে। ক্রমশ মেয়েটা যেন তার ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে ফেলছে। এ নির্ভরতা প্রতি মুহূর্তের অর্থনৈতিক চাহিদার নয়, মানসিকতার। অনিমেষ কোনও অন্যায় করতে পারে না এরকম একটা বিশ্বাস ওর মনে অটল। সেই প্রথম দিকের জ্বলে ওঠা মেয়েটা যেন কোনও জাদুমন্ত্রে এখন সমর্পণের ভঙ্গিতে বসে থাকে তার কাছে। যদি কোনও কথায় বা কারণে ব্যথা পায় তা হলে চোখ তুলে শুধু চাহনিতেই বুঝিয়ে দেয় সে কথা। এরকম মেয়েকে আঘাত দেওয়া যায় না। অনিমেষ অনুভব করে, মাধবীলতা তার জীবনে থাকলে কোনও অশুভ শক্তি তার ক্ষতি করতে পারবে না।

ভিয়েতনামে আমেরিকা তার চূড়ান্ত আঘাতটি হানল। যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মরিয়া হয়ে যায় তখন তার অন্ধতা আসে। কিন্তু এই নৃশংস আঘাতেও ভিয়েতনামিরা ভেঙে পড়ল না। আমেরিকানরা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে সমস্ত বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ আমেরিকার বিরুদ্ধে ধিক্কারে উত্তাল। বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। এমনকী আমেরিকাতেও একই দৃশ্য দেখা গেল।

পর পর কয়েকদিন ওরা আমেরিকান দূতাবাস আর চৌরঙ্গি তথ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ করল, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কুশপুত্তলিকা পোড়াল। ট্রাফিক বন্ধ, নেতারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন ভিয়েতনামিদের স্বপক্ষে। অনিমেষরা স্লোগান দিচ্ছিল, দুনিয়ার, সর্বহারা এক হোক।

কিন্তু ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিরক্ত মানুষেরা চাপা উষ্মা প্রকাশ করছিল। অবশ্য এত বড় মিছিলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা বা সাহস কারও নেই। অনিমেষ শুনল, একজন চাপা গলায় আর একজনকে বলছে, 'শালা আমাদের হাজারটা সমস্যার সমাধানের নাম নেই, কোথায় ভিয়েতনামে আমেরিকা কী করছে তা নিয়ে কুমিরের কান্না কাঁদছে।'

অনিমেষ কথাটা বিমানকে বলতেই বিমান ক্রুদ্ধ হল। সুরেন ব্যানার্জী রোডের রেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই মানসিকতা কংগ্রেসি কুশাসনের ফসল। আমার ঘরে জল পড়ছে বলে অন্যের ঘরের আগুন নেভাতে ছুটব না?'

অনিমেষ বলল, 'আমরা প্রতিবাদ করছি ঠিক আছে। কিন্তু ভিয়েতনামিদের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।'

বিমান বলল, 'আমাদের সমর্থন ওদের কাছে পৌঁছে দিলে ওরা জোর পাবে।'

'তা ঠিক।' অনিমেষ বলল, 'অন্যভাবেআমরা যদি, সাহায্য করি তা হলে ওদের উপকার হয়, আমরাও কাজে কিছু করতে পারলাম বলে তৃপ্তি পাব।'

'কী ভাবে?'

'জামাকাপড়, ওষুধ, খাবার এ সব পাঠিয়ে।'

'ভাল। কিন্তু আমাদের ফরেন সার্ভিস সেগুলো পৌঁছে দেবে কি না কিংবা সরকার তাতে

BanglaBook.org

অনুমতি দেবে কি না তা তো জানি না। ঠিকই বলেছ, ভিয়েতনামি সংগ্রামীদের জন্য সাহায্য তোলা যায়।' বিমান বলল।

সংগ্রামী শব্দটার পাশে সাহায্য কথাটা খুব খারাপ শোনাল অনিমেষের কানে। সে বলল, 'না, লোকের কাছে ভিক্ষে করব না। আমরা একটা বড়সড় অনুষ্ঠান করে টিকিট বিক্রি করে টাকা তুলে ওষুধ কিনতে পারি। আপনি কথা বলে দেখুন।'

অনুমতি পাওয়া গেল। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন থেকে ভিয়েতনাম এইড কমিটি হল। সুদীপ কনভেনার, অনিমেষ সম্পাদক। কয়েকদিন ধরে জোর আলোচনা চলল। ঠিক হল মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠানটি হবে। সকালে হলে কম ভাড়া লাগে। যেরকম ভাবে হোক খরচ কমাতে হবে। সবাই একমত হল যে কোনওরকম হালকা গান-বাজনা বা নাটক হবে না। জনসাধারণকে উজ্জীবিত করতে পারে এইরকম অনুষ্ঠানসূচি করা দরকার। তখনই পালটা কথা এল, অর্থসংগ্রহ যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তা হলে জাগরণের গান-ফান হলে টিকিট বেশি বিক্রি হবে না। দেখা গেল, কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সংঘের সঙ্গে একদা যুক্ত থেকে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হয় পার্টি ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুষ্ঠান করছেন নয় ডানপন্থী কমিউনিস্ট বলে পরিচিত। ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল ফোরামে কোনও জনচিত্তজয়ী শিল্পী নেই। তা হলে? দু' একজন তাত্ত্বিক কিংবা প্রচুর কর্মী এবং বক্তা থাকা এক আর প্রকৃত শিল্পী থাকা অন্য কথা। তখন ঠিক হল কমিউনিজমের প্রতি অনুগত অথচ কোনও দলের সঙ্গে জড়িত নন এমন শিল্পীর সন্ধান করতে হবে। এই অবস্থায় সুদীপ প্রস্তাব দিল নাটক অভিনয় করানোর। কলকাতার প্রখ্যাত দল 'জনবাণী' সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহল এবং শ্রদ্ধা প্রচুর। কারণ এই দলের বিখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা এখন বাংলাদেশের নাট্যজগতের অন্যতম স্তম্ভ। চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসেবে সফল হলেও নাট্যকর্মেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তিনি। তাঁর দল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন তিনি। কিন্তু 'জনবাণী' দল সব সময় সর্বহারার পক্ষে নাটক করে। প্রতিটি নাটকই প্রচণ্ড জনসমর্থন পেয়েছে তার পরিবেশনা, প্রযোজনা এবং প্রধান অভিনেতা পরিচালক সুবিমল গুপ্তের জন্য। সুবিমলবাবুর নাটকগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রচণ্ড সমর্থন করছে জনমানস গঠন করতে। মাঝে মাঝে পার্টির হয়ে পথ-নাটকও করছেন তিনি। এবং সবচেয়ে বড় কথা ওঁর সাম্প্রতিক নাটক 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল।

অনিমেষ আরও দুজন ছাত্রের সঙ্গে সুবিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। মাধবীলতা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল যাওয়ার জন্য। সুবিমলবাবুর ফ্যান প্রত্যেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকের চোখে ঠেকবে বলে সে এল না। সুবিমলবাবুর বাড়িতে ঢুকে অনিমেষ হকচকিয়ে গেল। সুন্দর সাজানো গোছানো এবং চারপাশে বৈভব ছড়ানো। একজন সংগ্রামী কমিউনিস্ট মানসিকতার মানুষ এত আরামে এ দেশে থাকেন? ঘরের দেওয়ালে লেনিনের বিরাট ছবির পাশে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। চোস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে হাতে চুরুট নিয়ে সুবিমলবাবু মোটা গলায় বললেন, 'আরে বসো বসো। তোমরা ঠিক সময়েই এসেছ বলে খুশি হলাম। তুমি বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো?'

অনিমেষ প্রথম দেখল সুবিমলবাবুকে কিন্তু তার সঙ্গীরা বেশ গদগদ হয়ে পড়েছে। তারা বলল, 'না না, আপনি তুমিই বলুন।'

'ভেরি গুড। আমাদের দেশের তরুণ কমরেডদের দেখে খুশি হলাম। নাউ, টেল মি, তোমাদের প্রব্লেম কী?' মুখে চুরুট রেখেই কথা বললেন সুবিমলবাবু।

অনিমেষ নিজেই সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'প্রব্লেম নয়। ভিয়েতনামে আমরা কিছু ওষুধ পাঠাতে চাই।'

'খুব ভাল কথা। কনস্ট্রাকটিভ কাজ।'

'হ্যাঁ। এইজন্য অর্থ দরকার। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাজাতি সদনে একটি অনুষ্ঠান করে টাকাটা তুলব। আমরা চাই আপনি সাহায্য করুন।' অনিমেষ হাসল।

'কীভাবে?'

'ভিয়েতনাম লাল সেলাম অভিনয় করুন। আপনি পাশে দাঁড়ালে হাউসফুল হয়ে যাবে।'

'কবে?'

'বারো তারিখে সকালে হল পাওয়া যাবে।'

'তোমাদের বাজেট কত?'

'বাজেট?'

BanglaBook.org

'এ-বাবদ আমার দলকে কত দেবে ?'

'আমরা ভাবিনি কিছু। খরচ যতটা কমানো যায় তত আমরা সাহায্য পাঠাতে পারব।'

'বুঝলাম। বোধহয় ওইদিন আমি খালি আছি। ওয়েল, আমার দল কল শো-এর জন্য অনেক বেশি নেয়। যে ভাবে খরচ বাড়ছে সামলানো মুশকিল। তবু তোমরা তিন দিয়ো।'

'তিন, তিন হাজার ?' হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ।

'নো বারগেন।'

অনিমেষ পাথর হয়ে গেল। এই মানুষটি সর্বহারাদের বন্ধু ? কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে পথসভা করেন ? ভিয়েতনামিদের সমর্থক ? সে খুব নিচু গলায় বলল, 'এত টাকা দিলে আমরা তো কিছুই ওখানে পাঠাতে পারব না।'

'আই কান্ট হেল্প। একবার যদি সবাই জেনে যায় ওর কমে আমি শো করেছি তা হলে আমার বাড়ির সামনে একমাইল লাইন পড়ে যাবে কল শো-র। সবাই বলবে ওই টাকায় করুন। কাকে ঠেকাব তখন ? তুমি হয়তো ভাবলে আমার মুখে এ কী কথা! রাইট। কিন্তু আমার রাজনৈতিক চিন্তা আর প্রফেশনাল এটিকেট এক নয়। হতে পারে না। একজন সরকারিকর্মী যেমন সরকার বিদ্বেষী শ্লোগান দিলেও সরকারের কাজ করে মাইনে নেন পেটের জন্য। আমিও দুটোকে এক করতে পারি না।'

অনিমেষ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মনে মনে ভীষণ ভেঙে পড়ছিল সে। কোনও চিন্তা মাথায় আসছিল না। এ কী ধরনের কমিউনিজম-মনস্কতা ?

সুবিমলবাবু হঠাৎ হাসলেন, 'ঠিক আছে ? তোমরা এক হাজার দিতে পারবে ? ওনলি ওয়ান থাউজেন্ড।'

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল অনিমেষ, 'নিশ্চয়ই।'

'দেন, টিকিট বিক্রি করো। বারো তারিখ বললে না ? এগারোতারিখে বিকেলে টাকাটা পৌঁছে দিয়ো। আই উইল বি দেয়ার।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সঙ্গীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। অনিমেষের খারাপ লাগছিল নিজের কথা ভেবে। ভদ্রলোক যে ওকে নিয়ে খেলা করছিলেন তা সে বুঝতে পারেনি, না পেরে আজেবাজে চিন্তা করেছে। সুবিমলবাবুকে নিয়ে আজ সবাই গর্ব করে, তিনি কি ভিয়েতনামের সাহায্যে অনুষ্ঠানে না এসে পারেন ?

হু-হু করে একদিনের টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের আগের দিন টাকাটা পৌঁছে দেওয়া হল। মহাজাতি সদন টইটুম্বুর। সকালবেলাতেই 'জনবাণী' এসে গেছে। মেকআপ নিচ্ছেন তাঁরা। অনিমেষকে নানান ঝামেলা সামলাতে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। সুদীপের সঙ্গে সুবিমলবাবু কথা বলছিলেন। অনিমেষ দেখল উনি এখনও মেক-আপ নেননি।

অভিনয় শুরুর একটু আগে সুদীপ বলল, 'আজকের অনুষ্ঠানের আগে কেন এটা করছি তা দর্শকদের বলা দরকার। সুবিমলবাবুও বলবেন।'

পরদা উঠল। অত মানুষের সামনে এই প্রথম অনিমেষ কথা বলল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দর্শকদের এবং জনবাণীকে ধন্যবাদ দিল সে। তারপর সুদীপ এসে বলল সে সুবিমলবাবুকে অনুরোধ করছে কিছু বলার জন্য। সুবিমলবাবুর নামের আগে অনেক জনদরদি বিশেষণ দিল সে। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত অনিমেষ দেখল সুবিমলবাবু আর একজন সঙ্গীর ওপর ভর দিয়ে কোনওক্রমে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন, 'আমি অত্যন্ত অসুস্থ। ডাক্তার আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছেন। কিন্তু ভিয়েতনামের জন্য ছাত্রবন্ধুরা যখন এই অনুষ্ঠান করছেন তখন কি আমি শুয়ে থাকতে পারি ? না, আমি কোনও বিশেষণের যোগ্য নই। একটু অভিনয় করতে চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল লড়ে যাব, জনসাধারণকে বোঝাব তাঁরা কী অবস্থায় আছেন। আমি একজন সৈনিক মাত্র। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তবু না এসে পারলাম না। আমার দল অভিনয় করবে, আপনারা সহযোগিতা করুন। আমার সঙ্গে বলুন আপনারা, ভিয়েতনাম লাল সেলাম।' সঙ্গে সঙ্গে হল ফেটে গেল শব্দে, 'লাল সেলাম, লাল সেলাম।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে অনিমেষের মুখোমুখি পড়ে গেলেন সুবিমলবাবু। চুরুট বের করে বললেন, 'একটা দেশলাই দাও তো।'

চোয়াল শক্ত করে অনিমেষ বলল, 'আমার কাছে নেই।' আর একজন ছুটে এসে দিল তাঁকে। সেটা নিয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অনিমেষকে দেখলেন সুবিমলবাবু। তারপর অদ্ভুত কায়দায় হাসলেন,

BanglaBook.org

'দেশলাই-এর বাক্সটা দেখেছ ? বারুদমাখানো কাঠিগুলোকে জলবাতাস থেকে বাঁচানোর জন্য এই বাক্সটা দরকার। কোনটা দামি ? বাক্স না কাঠি ? দুটোই। তাই না ?'

কথাটা শেষ করে স্মার্টলি বেরিয়ে গেলেন হল থেকে। সেখানে তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করছে। তখন নাটক শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকান মিলিটারির অত্যাচার দেখে দর্শকরা ধিক্কার দিচ্ছে। জনবাণী দারুণ অভিনয় করছে, সুবিমলবাবুর বদলে যিনি করছেন তিনিই সর্বহারাদের কথা সমান দরদে মঞ্চে বলছেন।

অনিমেষ নাটক দেখছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে সাজানো, রঙিন বেলুনের মতো মনে হচ্ছিল। বেলুনটা বাড়ে না কারণ সে জানে তা হলে ফেটে যেতে পারে। কিন্তু একটা সূচ দরকার, অবিলম্বে।

সাতাশ

দাসপাড়ার উপনির্বাচনে কংগ্রেসপার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন। কলকাতার মানুষ খবরের কাগজের এই সংবাদটাকে তেমন গুরুত্বই দিল না, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, না-জেতাটাই ছিল আশ্চর্যের। ভোটের ফলাফল বের হলে অনিমেষরা হিসেব করেছিল মোট ভোটের সত্তর শতাংশ বাক্সে পড়েছে। বাকি ত্রিশভাগ যারা ভোট দেয়নি তাদের সমর্থন পেলে কী কাণ্ড হত বলা যায় না। দেখা গেল আগের বার বিরোধী প্রার্থী যত ভোট পেয়েছিল এবার তা থেকে হাজার খানেক বেড়েছে।

বিমান বা সুদীপ এই নির্বাচন নিয়ে কোনও কথা বলছে না। যা গিয়েছে তার সম্পর্কে ভেবে কিছু লাভ নেই। পার্টির নেতারা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ত্রুটিগুলো সামলে নেবেন সামনের বার। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করতে বিমান জবাব দিয়েছিল, 'পর্যালোচনা চলছে।'

সুবিমলবাবুর ব্যাপারটার পর থেকে অনিমেষ নিজের ভেতরে যেন আর উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছিল না। এই মানুষটির দ্বৈতসত্তার কথা জেনেও পার্টি তাঁকে মূল্যবান বলে মনে করে, কমরেডের সম্মান দেয়, এটা কেমন কথা ? ক্রমশই সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছিল। এখন অভ্যেসবশত ইউনিয়ন অফিসে যায়, কথা শোনে কিন্তু আলোচনায় উৎসাহ পায় না।

এই সময় ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান একটা যুদ্ধে লিপ্ত হল। সন্ধের পরই কলকাতা শহর অন্ধকারে ডুবে যায়, তড়িঘড়ি মানুষ ঘরে ফিরে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তেই পাকিস্তানের বোমারু-বিমান কলকাতার আকাশে দু-একটা বোমা টুক করে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে। তবে চিনের সঙ্গে যখন গোলমালটা লেগেছিল তখনকার মতো দিশেহারা অবস্থা এখন নয়। মানুষ জানে পাকিস্তান যতই গর্জাক ভারত দখল করার হিম্মত নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতবাসী কংগ্রেস সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে, বহুমুখী বিরোধীরাও মূক হয়ে আছে। তবু যুদ্ধটা ঠিক জমছে না।

এই যুদ্ধ অনেকটাই সাজানো, ফলাফল জানাই আছে—এইরকম বোধ পার্টির নেতাদের থেকে শুরু করে ক্যাডার পর্যন্ত সঞ্চারিত। সাধারণ মানুষও বেশ মজা পেয়ে গেছে। সিনেমা দেখার ভঙ্গিতে কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ে কারণ তারা সবাই জানে পাকিস্তানিরা কখনওই তাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধের কারণেই কংগ্রেস সম্পর্কে তিক্ততা ক্ষীণ হয়ে এল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের আঁচ গায়ে লাগল। হু-হু করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ভারতবাসীর মতো সব-সইয়ে জাত পৃথিবীতে বিরল। কোথাও কোনও প্রতিবাদ নেই, যেন যুদ্ধ হলে দাম বাড়াটাই স্বাভাবিক কথা। চোখের সামনে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে এবং সেটাকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই গ্রহণ করে সবাই। অনিমেষের মনে হয়, সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্টেই এ দেশের মানুষের মেরুদণ্ডটিকে খুলে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন-সাহেব দেশে চলে গেছেন।

যুদ্ধটা যখন থেমে গেল খুব আফশোস হচ্ছিল ওর। পাকিস্তান কেন পূর্ববঙ্গকে ব্যবহার করল না ? কেন ঢাকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু-বিমান উড়ে এসে কলকাতার ওপর বোমা ফেলল না ? যদি কোনও জাদুমন্ত্রে পাকিস্তানি সেনা পশ্চিমবাংলায় ঢুকে পড়ত তা হলে উত্তেজনার আগুন পোয়ানোর বিলাসিতা ছাড়তে হত এ দেশের মানুষকে। নিজস্ব সুবিধের ছকে সাজানো রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তখন হারিয়ে যেতে বাধ্য হত। প্রতিরোধ শক্তি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেই ওই সব নেতাদের ছুড়ে ফেলতে একটুও সময় লাগত না। এই দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে হলে সশস্ত্র যুদ্ধ চাই। ঘরে আগুন না লাগলে ঘরের প্রতি ভালবাসা টের পাওয়া যায় না। স্বার্থের পৃথক

BanglaBook.org

খোলসগুলোকে চূর্ণ করতে যুদ্ধ চাই, নইলে এই নিরাসক্তির ভান কখনওই ঘুচবে না।

অনিমেষ এখন বিশ্বাস করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কমিউনিস্ট পার্টির নেই। শুধু প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করলে হয়তো একটা সাময়িক সমর্থন পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, সেটিই করা হচ্ছে না। যা কিছু চটজলদি আবেগকে পরিচালিত করে সাধারণ মানুষ তাকেই গ্রহণ করে। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তাবড় তাবড় নেতাদের চালচলন কথাবার্তার সঙ্গে বেশিরভাগেরই ব্যক্তিগত জীবনের কোনও মিল নেই। তাঁদের দেখে কোনওরকম অনুপ্রেরণা যদি সাধারণ মানুষ না পায় তা হলে তাঁদের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল হবে কী করে? সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা কমিউনিস্ট পার্টির মতো সুশৃঙ্খল সংস্থা কংগ্রেস নয়। কমিউনিস্ট ক্যাডাররা নিঃস্বার্থ হয়ে নেতাদের হুকুম মেনে নেয়। এরকম শক্তিশালী একনিষ্ঠ কর্মী পেয়ে নেতারা কী করতে চান বোঝা যাচ্ছে না। দলের নীচের তলার কর্মীরা কাজ করে ভাবাবেগে, নেতাদের পদক্ষেপ হিসেব করে। তাঁরা আবেগ আনেন বক্তৃতার সময়, ব্যক্তিগত স্বার্থ হারাতে কেউ বিন্দুমাত্র রাজি নন।

মোটামুটি এই যখন দেশের রাজনৈতিক চেহারা তখন ঘোলাজলে পাক খেয়ে কী লাভ? অদ্ভুত হতাশাজনিত ক্লান্তি ক্রমশ অনিমেষকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এই সময় ছাত্র ইউনিয়নগুলো দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল। আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করে মনুমেন্ট পর্যন্ত গিয়ে নেতাদের বক্তৃতা শোনা—এই হল আন্দোলনের চেহারা। অনিমেষ দুদিন কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক, খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, দুনিয়ার ভুখা মানুষ এক হও, এক হও স্লোগান দিতে দিতে গিয়েছে মিছিলের সঙ্গে। মাধবীলতাও ছিল সঙ্গে।

মিছিল মনুমেন্টের নীচে পৌঁছালে জায়গাটা একসময় সমুদ্রের চেহারা নিল। বাঁশের খুঁটির ওপর লাল কাপড়ের মঞ্চে নেতারা বসে সেই সমুদ্র দেখছিলেন। মাধবীলতা এই প্রথম এতসব নেতাদের একসঙ্গে দেখতে পেয়ে বেশ উত্তেজিত। এঁরা বিধানসভায় প্রায়ই শোরগোল তোলেন। কিন্তু এই গান্ধীজিমার্কা আন্দোলনে কী ফলবে অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ এই কথাটুকু বোঝানোর জন্যই যদি এত আয়োজন তা হলে সেটা কি কংগ্রেসি নেতাদের আজ অজানা আছে? তারা যদি সেই তথ্যটিকে উপেক্ষা করতে পারে তা হলে এই মিছিলের বিক্ষোভে কী এসে যায় তাদের। জনসাধারণের প্রাণশক্তির হাস্যকর অপব্যবহার ছাড়া ব্যাপারটা অন্য কিছু মনে হচ্ছে না অনিমেষের কাছে।

পর পর দু'জন নেতা একই ভাষা এবং ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিলেন। দেশ আজ বিপন্ন, কংগ্রেসি সরকারের শোষণে দিশেহারা। এই সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো বলার সময় গলা কাঁপিয়ে, অনেকটা যাত্রার ঢঙে হাত নেড়ে একটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করে ফেললেন ওঁরা দুজনেই। কথা বলার সময় আবেগে মাঝে মাঝে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওঁদের চিৎকৃত ভাষণ যখন শেষ হল তখন বঙ্গে বর্গি পালার শেষে যে হাততালি পড়ে তারই অনুরণন মনুমেন্টের তলায় ছড়িয়ে পড়ল। বক্তৃতায় ক্লান্ত নেতাদের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা এইমাত্র ঘরে ঘরে অন্ন বিলিয়ে ফিরে এলেন। সবশেষে যিনি উঠলেন তাঁর জন্যেই জনতা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। এর আগেও দেখেছে সে, আজও দেখল। গানের অনুষ্ঠানে ছোট বড় শিল্পীরা একে একে গেয়ে যান, কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায় না, শ্রোতাদের মধ্যে। কিন্তু শেষ নামটি যেই ঘোষিত হয় এবং বিখ্যাত শিল্পী যখন মঞ্চে এসে দাঁড়ান তখন হাততালি পড়ে, যেন এতক্ষণে অনুষ্ঠানটি সার্থক হল।

এখন যিনি বলতে এলেন তাঁরও সেই ইমেজ। উনি যখন বলেন তখন যুক্তি দিয়ে বলবেন এটাই সবার ধারণা। এর আগের মিটিং-এ উনি প্রথমে বলেছিলেন বলে বাকি বক্তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কারণ তাঁদের কথা শোনার জন্য কেউ অপেক্ষা করেনি।

জনতাকে নড়েচড়ে বসতে দেখে অনিমেষ মাধবীলতাকে বলল, 'চিনতে পারছ ওঁকে?'

মাধবীলতা ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে, না?'

অনিমেষ বলল, 'অন্তত যাত্রা করবেন না এটা বলা যায়।'

মাধবীলতা বলল, 'তুমি অমন বেঁকা বেঁকা কথা বলছ কেন? তোমাদের পার্টির নেতা না?'

অনিমেষ তর্ক বাড়াল না। শুধু মাধবীলতার দিকে একবার তাকিয়ে বক্তৃতায় মন দিল। খুব শান্ত ভঙ্গি, প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করেন। আবেগের বাড়াবাড়ি নেই। যেটা বলছেন তা কেন বলছেন তা ওঁর জানা আছে। স্বভাবতই কংগ্রেসি সরকারকে আক্রমণ করে উনি কথা বলছিলেন।

BanglaBook.org

কিন্তু একসময় অনিমেষের মনে হল উনি খুব ভাল কথাশিল্পী। সুন্দর সাজানো কথা বিশ্বাসযোগ্য করে বলেন কিন্তু কোনও ধরাছোঁয়ার মধ্যে যান না। তাঁর কথায় এমন একটা জাঁকজমক আছে যে লোকে সেইটে বুঝতেই পারে না। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় কারাবরণ এবং তারপরে বাংলা বন্ধ।

ধর্মতল্যা থেকে ফেরার সময় অনিমেষ সিদ্ধান্ত নিল এই রাজনীতি থেকে সে কিছুদিন সরে থাকবে। দশহাজার লোককে পুলিশ এসপ্লানেড ইস্ট থেকে ধরে বাসে করে খিদিরপুরে নামিয়ে দিলে কী ধরনের রাজনৈতিক লাভ হয় তা ওর মাথায় ঢুকবে না। এই কি কারাবরণ ? অথবা সারা দেশ একদিনের জন্য অচল করে মোক্ষ লাভ হবে ? এতে কি মনে হবে দেশের মানুষ তাদের পাশে আছে ? এখনও যখন সাধারণ মানুষ মনে করে কমিউনিস্টদের ভোট দিলে তারা দেশটাকে রাশিয়া কিংবা চিনের হাতে তুলে দেবে ! পার্টির মধ্যে ইতিমধ্যেই বিরোধ শুরু হয়েছে। বেশ কিছু সক্রিয় কর্মী নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে বিরাগের পাত্র হয়েছেন। পার্টির মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা চলছে এ সংবাদ বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। অনিমেষ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, এম.এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া যাক মন দিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করে।

মৌলালির মোড়ে হেঁটে এসে মাধবীলতা বলল, 'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, কোথাও বসি চলো।'

অনিমেষ দেখল মেয়েটার মুখটা কালো হয়ে গেছে, চোখের তলায় বেশ কালি। ওর হঠাৎ মনে হল মাধবীলতার এই চেহারা সে কোনওদিন দেখেনি। মুখের মধ্যে একটা খসখসে ভাব এসে গেছে, চাহনিতে ক্লান্তি বোঝা যায়।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে তোমার ?'

মাধবীলতা ভ্রূ কুঁচকে সেই চাহনিটা ব্যবহার করল, 'আমার! কী হবে ?'

অনিমেষ বুঝতে পারল মাধবীলতা যদি নিজে থেকে কিছু না বলে তা হলে শত চেষ্টা করেও ওর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানা যাবে না।

মাধবীলতা হাসল, 'কী থেকে কী কথা! বললাম কোথাও চলো বসি, না তোমার কী হয়েছে! বসতে চাইলেই কিছু হতে হয় বুঝি !'

অনিমেষ একটা ছোটখাটো চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে বলল, 'চলো এখানে বসি। তবে শুধু চা খেতে হবে।'

মাধবীলতা বলল, 'সেটা আমি বুঝব।'

দোকানটা নিচু ধরনের। অবস্থা যে ভাল নয় তা চেহারা দেখেই মালুম হয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা আড্ডা মারছিল তারা বেশ উৎসুক চোখে ওদের দিকে তাকাল। অনিমেষ সেটা দেখেও গা করল না। একটা ছোঁড়া এলে মাধবীলতা তাকে দুটো করে টোস্ট আর চা দিতে বলল। তারপর অনিমেষের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিন্তু আজকাল সব কথা আমার কাছে বলো না!'

'কী কথা ?'

'বিমানদের সঙ্গে তোমার ঠিক মিলছে না, না ?'

'কী করে বুঝলে ?' অনিমেষ অবাক হল। এ সব কথা ও কখনও মাধবীলতার সঙ্গে আলোচনা করেনি।

'আমি কি ঠিক বলছি ?'

'মোটামুটি।'

'যাক। তা হলে তোমাকে বুঝতে আমার ভুল হয় না।'

অনিমেষ মাধবীলতার চোখে চোখ রাখতেই সে মুখ নামিয়ে নিল। কথাটায় এমন সুখ জড়ানো যে তা অনিমেষকেও স্পর্শ করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'আসলে আমি এই দলের কাজকর্ম মানতে পারছি না। এরা যেভাবে চলছে সেভাবে চললে এ দেশে কোনওদিনই কমিউনিজম আসবে না। বুঝেসুঝে অন্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।'

মাধবীলতা বলল, 'তুমি কি অন্য কোনও দলে যাবে ?'

অনিমেষ বলল, 'অন্য দল ? ধ্যুৎ! সেগুলো তো আরও খারাপ। না, কোনও দলফল নয়, ভাবছি এখন মন দিয়ে পড়ব।'

মাধবীলতা বলল, 'আমি তোমার রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাই না। তবে একটা অনুরোধ করব। হুট করে কিছু করে ফেলো না। তুমি যদি বিমানদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাও তবে ঝগড়া করে নয়, চুপচাপ কোনও সংঘর্ষ ছাড়াই সরে দাঁড়াও। একদিনে করলে সেটা ধরা পড়ে যাবে তাই কয়েকদিন সময় নাও।' তারপর হেসে বলল, 'কিন্তু এম.এ-র রেজাল্টটা যেন ভাল হয়।'

BanglaBook.org

অনিমেষ বলল, 'তোমার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবে না।'

মাধবীলতা দিয়ে যাওয়া টোস্টের ওপর গোলমরিচ ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'আমার বোধ হয় পরীক্ষা দেওয়াই হবে না।'

চমকে উঠল অনিমেষ, 'সেকী! কেন ?'

মুখ না তুলে মাধবীলতা বলল, 'ও সব ছেড়ে দাও। বাড়িতে চিঠি দিয়েছ ?' চোয়াল শক্ত হল অনিমেষের। কিছুক্ষণ ধরেই ও বুঝতে পারছিল মাধবীলতার কিছু হয়েছে, যার জন্য ওকে চিন্তা করতে হচ্ছে খুব এবং তার ছাপ পড়েছে চোখমুখে। এতদিন ব্যাপারটা লক্ষ করেনি বলে সে নিজের ওপরই বিরক্ত হল। খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি যদি কিছু না বলতে চাও তা হলে আমার পক্ষে এ সব খাওয়া অসম্ভব।'

হেসে ফেলল মাধবীলতা, 'ওমা! কী ছেলে মানুষ! এখন কি আর রাগ করে খাবার নষ্ট করার বয়স আছে! খোকা কোথাকার!'

'ইয়ার্কি মেরো না। তুমি যদি না চাও তা হলে অবশ্যই তোমার ব্যাপারে আমি কথা বলব না। কিন্তু সেটাই জানা দরকার।' অনিমেষ বলল।

মাধবীলতা বলল, 'অমনি রাগ হয়ে গেল!'

অনিমেষ বলল, 'আমাকে কি এতই অপদার্থ ভাব যে রাগ করবার যোগ্যতাও নেই!' টেবিলের ওপর দুই কনুই, হাতের ওপর চিবুক, মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে সামলাতে পারল না। বুকের মেঘ কখন যে টুক করে জল হয়ে চোখে গড়ায় তা যদি বোঝা যেত আগেভাগে। অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'এটা চায়ের দোকান!'

দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চট করে দু-চোখ সামলে নিল মাধবীলতা। কিন্তু তার ভেতরটা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগল আরও কিছুক্ষণ। ওরা নীরবে টোস্ট খেয়ে চায়ের কাপে হাত দিল। অনিমেষ কোনও কথা বলছিল না। মাঝে মাঝে তার মাধবীলতাকে এত গভীর মনে হয় যে সে হাজার চেষ্টা করেও ডুব দিয়ে তল দেখতে পাবে না। চটুল হালকা টাইপের মেয়েদের সহজেই উপেক্ষা করা যায় কিন্তু মাধবীলতাকে নয়।

চা খেয়ে দাম দিল মাধবীলতা। তারপর রাস্তায় নেমে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বাবার জন্যই বোধহয় আমার এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হবে না!'

'মানে ?'

'উনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি ওঁকে বলেছি এ সব চিন্তা ছাড়তে। আমার মুখে এরকম কথা উনি আশা করেননি। ফলে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। যা ইচ্ছে তাই বলছেন ! আমাকে এখান থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা করছেন। যে পাত্রটিকে ওঁরা নির্বাচিত করেছেন সে বোধহয় আমার কথা শুনে হাতছাড়া হয়ে গেছে, ফলে আরও দিশেহারা অবস্থা। আমি বলেছি পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করতে কিন্তু ভাবগতির দেখে মনে হচ্ছে তা করবে না।' মাধবীলতা মাথা সোজা করে হাঁটছিল। যেন কথাগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থাটাকে জরিপ করছিল।

অনিমেষের বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। সে মাধবীলতার জন্য কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। না, যে কোনও ভাবেই ওর এম.এ. পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

'কিন্তু, কেন ওঁরা এমন করছেন ?'

'ওঁরা আমার ভাবগতিক দেখে ভাল বুঝছেন না তাই।' হাসল মাধবীলতা, 'বোধহয় বুঝতে পেরেছেন আমি মনের দিক থেকে একা নই।'

'তাতে কী হয়েছে ?'

'কোনও পিতামাতাই মেয়েদের নির্বাচনের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। সর্বসময় ভাবে এই বুঝি বোকামি করল!'

'তুমি আমার কথা ওঁদের বলেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন ওঁরা ?'

'নাই বা শুনলে। শোনো, আমি গত রবিবার একটা স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়েছি। আমার এক বন্ধুর দিদি ওই স্কুলে কাজ করে। যদি চাকরিটা হয়ে যায় তা হলে বেঁচে যাব।'

'তুমি চাকরি করবে ? পড়াশুনা করবে না ?'

'সে পরে দেখা যাবে। প্রাইভেটেও পরীক্ষা দেওয়া যায়। হয়তো চাকরিটার জন্যই দিতে হবে।

BanglaBook.org

সে সব এখনই ভাবছি না। এখন যেটা সমস্যা হল সেটা হল একটা ভাল হোস্টেল। তোমার জানাশোনা কোনও হোস্টেল আছে?' মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না। তবে হোস্টেলের খোঁজ নিতে পারি। কিন্তু তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে?'

মাধবীলতা দাঁড়িয়ে পড়ল। দুপাশে বাড়ি ফেরা মানুষের ভিড়, হকারের চিৎকার। তারই মধ্যে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি চাইছ না বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে আসি?'

'তুমি কি যথেষ্ট ভেবেছ?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি।'

অনিমেষ একটুও ভাবল না। বলল, 'ওঁরা তোমাকে জোর করে অন্য কোথায় পাঠিয়ে বিয়ে দেবেন এটা আমি মানতে পারি? কিন্তু এতদিনের পরিচিত পরিবেশ আর আত্মীয়স্বজন ছেড়ে তুমি একা হোস্টেলে এসে উঠবে—এ ব্যাপারে তোমার কোনও দ্বিধা আছে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। নিজের কাছে পরিষ্কার হলে পৃথিবীতে কে কী মনে করল তাতে কিছু এসে যায় না।'

'আমার সব কিছু পরিষ্কার যদি তুমি পাশে থাকো। আমি কোনও অন্যায় করিনি। বা যদি না মানতে পারেন তা হলে সেটা দুঃখের। আমি তো হোস্টেলে একা থাকছি না! তুমি তো আছ। তুমি কখনও আমায় ফেলে না গেলেই হল।' মাধবীলতা হাসল। আত্মবিশ্বাস এবং লজ্জা একসঙ্গে চলকে উঠল যেন।

অনিমেষ বলল, 'বড্ড আফশোস হচ্ছে।'

মাধবীলতা ঘাড় বেঁকাল, 'কেন?'

'নিজেকে খুব অপদার্থ মনে হচ্ছে। তুমি যখন এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছ তখন আমার হাতে এক ফোঁটা জোর নেই। এখনও আমি বাবার পাঠানো টাকার ভরসায় থাকি। আমার উচিত তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচানো, কিন্তু দ্যাখো, শুধু কথা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারছি না। দেখি, কী করতে পারি।' শেষের কথাটা একটু চিন্তা-জড়ানো গলায় বলল অনিমেষ।

মাধবীলতা বলল, 'এই, তুমি কি চাও আমি এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদি?'

'মানে?'

'আর একবার ওইসব কথা বললে আমি এমন সিন করব যে মজা বুঝবে!'

'কিন্তু —।'

'কোনও কিন্তু নয়। আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এম.এ. পাশ করে—।' না ভেবে কথাটা শুরু করে হঠাৎ থেমে গেল মাধবীলতা।

'থামলে কেন?' হাসল অনিমেষ, 'বাংলায় এম.এ. পাশ করে কেউ চাকরি পায় না আমি পরীক্ষা দেব দু'তিন জন মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ করতে। কিন্তু চাকরি যদি করতে হয় তা হলে বি.এ. পাশের ডিগ্রিটাই যথেষ্ট। তা ছাড়া, যদি বলি রাজনীতি করতে চাই লোকে আমাকে হাম্বাগ ভাববে। যেন ওটা করার জিনিস নয়। এককালে যারা সিরিয়াসলি কমিউনিস্ট পার্টি করত, গণনাট্য করত, এমন কয়েকজনকে আমি জানি কী দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা সারাজীবনে চাকরি পাননি। অবস্থা যদি না পালটায় তা হলে এ দেশে যারা রাজনীতি করতে চায় তারা হয় না খেয়ে মরবে কিংবা চোরাপথে টাকা নিয়ে বিত্তশালী হবে। দ্বিতীয়টি আমার দ্বারা হবে না। অতএব আমার সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে হয়তো তুমি সারাজীবনের জন্য পাকাপাকি অশান্তি ডেকে আনলে।'

মাধবীলতা খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। শেষ হলে বলল, 'আমি এখন কোনও কথা বলব না। যদি চাকরিটা পাই তা হলে এর জবাব পাবে। আমি যা করব তা করেই দেখাতে চাই। আগে থেকে লম্বাচওড়া কথা বলে কোনও লাভ নেই। শুধু তুমি আমার একটাই কাজ করে দাও, এ মাসের মধ্যে একটা ভদ্র হোস্টেল খুঁজে দাও। চাকরিটা যেহেতু দক্ষিণেশ্বরের দিকে, নর্থে হোস্টেল হলে ভাল হয়।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আজ হঠাৎ মাধবীলতাকে ওর ভীষণ আপন মনে হচ্ছে। এই মেয়েটা শুধু অনিমেষের জন্যই তার সবরকম নিরাপদ জীবনের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে এর চেয়ে বড় অহঙ্কার আর তার কী আছে! কিন্তু এ কথাটা ভাবলেই নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়। তার সামনে কত কী করার আছে অথচ সে কিছুই পারছে না। একজন প্রেমিক হিসেবে যেমন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তেমনি, কোনও ফারাক নেই। দুটো হাত আছে কিন্তু তাতে একটাও আঙুল নেই। ক্রমশ একটা অপদার্থ ছাড়া

BanglaBook.org

নিজেকে অন্য কিছু মনে হচ্ছে না।

ট্রেনে উঠে মাধবীলতা বলল, 'শোনো, একদম মাথা গরম করবে না। সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'সব কিছু মানে ? আমি সুদ্ধ ?'

'আমার সব তো তুমিই।'

ট্রেন চলে গেলে অনিমেষ যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তার পা ভারী, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে হঠাৎ। মাধবীলতার শেষ কথাটা অন্য সময় শুনলে নিজেকে সম্রাট মনে হত, আনন্দে বুকের ভেতরটা আশ্বিনের সকাল হয়ে যেত। কিন্তু এখন, এখন সে খুশি হতে পারছে না কেন ? সেই যে দুপুরটা যার শরীরে রোদ নেই, মরা আলো ন্যাতানো, মাথায় মেঘের জলজ ছাতা, সময়টা যেন কাটতেই চায় না, ঠিক সেইরকম লাগছে।

হোস্টেলে ফিরেই শুনল তাকে কে একজন ডাকতে এসেছিল। দারোয়ান নাম বলতে পারল না। বলল, সাহেব ওপরে গিয়েছিলেন। সাহেব ? অনিমেষ অবাক হল। কোনও সাহেবের সঙ্গে তো তার আলাপ নেই। নিজের ঘরের তালা বন্ধ। অনিমেষ এ দিক ও দিক দেখল। কে এসেছিল না জানলে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল মাধবীলতার বাড়ি থেকে কেউ আসেনি তো ? ওর বাবা ? অনিমেষ ঠোঁট কামড়াল। যদি তিনি আসেন তা হলে সে কি তর্ক করবে না ভদ্রলোককে বোঝাবে যে তিনি মেয়ের ওপর ভুল করছেন!

ঠিক সেইসময় তমাল ঘর থেকে বেরিয়ে ওকে দেখে বলে উঠল, 'কখন ফিরলে ?'

'এই তো।'

'তোমার কাকা এসেছিলেন।'

'কাকা ?'

তমাল আবার ঘরে ফিরে গিয়ে একটা কার্ড বের করে এনে ওর হাতে দিল, 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন আগামিকাল সকালে যেন তুমি অবশ্যই যাও। গ্র্যান্ড হোটেলে আছেন।'

অনিমেষ চকচকে কার্ডটায় দেখল, প্রিয়তোষ মিটার লেখা, আর কিছু নেই।

আঠাশ

কার্ডটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল অনিমেষ। প্রিয়তোষ মিটার যে ছোটকাকা তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু এরকম আচমকা ছোটকাকা এই হোস্টেলে এলেন কোত্থেকে ? ওঁর তো এখানে থাকার কথাই নয়। সেই কবে বাইরে চলে গেছেন, মস্কো বোধহয়, দাদু তো সেরকমই বলছিলেন, কবে ফিরে এলেন ? কার্ডটায় আর কিছু লেখা নেই কিন্তু কাগজটা খুব দামি, ছুঁলেই বিদেশি বলে মনে হয়। ওর ইচ্ছে করছিল তমালকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু তমাল ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে। অনিমেষ নিজের ঘরে ঢুকল।

মিত্রকে মিটার বলা দুচক্ষে দেখতে পারে না অনিমেষ। বাঙালি পদবিগুলোকে এ ভাবে বিকৃত করলেই সাহেব হওয়া যায় ? দারোয়ান অবশ্য ওঁকে সাহেব বলেছে। তার মানে ছোটকাকার চেহারাটা পালটে গেছে ? সেই রোগাটে পাজামা পাঞ্জাবি! ভাবতে গিয়েই সচকিত হল। এই চেহারাটা তো সেই সময়ের যখন পুলিশ তাদের বাড়ি সার্চ করতে এসেছিল। কিন্তু তারপর যখন ছোটকাকা কলকাতা থেকে প্লেনে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন তখন তো রীতিমতোই সাহেব। মন্ত্রীর পেছন পেছন প্লেন থেকে নেমে এসেছিলেন ছোটকাকা। চোখ বন্ধ করতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল অনিমেষ, অ্যাশ কালারের স্যুট, লম্বা সরু নীল টাই, চোখে চশমা, হাতে বড় অ্যাটাচি ব্যাগ। তা হলে তো ছোটকাকা এতদিনে আরও কড়া সাহেব হয়ে গেছেন। আট নয় বছর তো হয়ে গেল। অনিমেষের মনে পড়ল পুলিশ আসার আগে যে রাতে ছোটকাকা নিঃশব্দে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সেই রাত্রে সে প্রথম একটা কাগজে 'মার্কসবাদী' শব্দটা দেখেছিল। ছোটকাকা তখন কট্টর কমিউনিস্ট ছিলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন তখন তিনি কী, বুঝতে পারেনি অনিমেষ। কংগ্রেসি বিরাম করের সঙ্গে যেমন দোস্তি তেমনি কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গেও ভাব করার চেষ্টা ছিল তখন। দালাল বলে একটা বিক্ষোভও হয়েছিল তখন। আর এখন ছোটকাকা কোন ভূমিকায় ? যে ভূমিকাতেই হোক সরিৎশেখর যখন প্রচণ্ড অর্থকষ্টে জর্জরিত তখন তিনি সাহেবি করে বেড়াচ্ছেন, এটাকে ক্ষমা করা অসম্ভব। অনিমেষ ঠিক করল সে গ্র্যান্ড হোটেলে যাবে না। যে মানুষ অবহেলায়

নিজের স্বার্থের জন্য বাবা দিদিকে ছেড়ে এতকাল বাইরে ডুব দিয়ে বসেছিলেন তাঁর সম্পর্কে আজ আর কোনও দুর্বলতা তার নেই।

সকালবেলায় একজন দাড়িকাটা পঞ্জাবি তার কাছে এল। অনিমেষ তখন বইপত্র নাড়াচাড়া করছে, দেখে অবাক হল। নমস্কার করে লোকটা বলল, 'সাব, গাড়ি লেকে আয়া।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কীসের গাড়ি?'

'সাব ভেজ দিয়া গ্রান্ড হোটেলসে।'

ছোটকাকা তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন। অনিমেষের আর অবাক হওয়ার মতো নার্ভ ছিল না। তাকে এত খাতির কেউ করতে পারে? সামনে দাঁড়ানো লোকটার বিনীত ভঙ্গি দেখে ও দ্বিতীয়-চিন্তা করল। যে কোনও কারণেই হোক ছোটকাকার তাকে দরকার। সে যতই এড়াতে চাইবে তিনি ছাড়বেন না। এই লোকটিকে ফিরিয়ে দেবার পর তিনি যদি নিজে আসেন তা হলে খামোকা বিব্রত হতে হবে। মুখের ওপর তাঁকে কালকের ভাবনাগুলো বলা যাবে না। সম্পর্কটাকে তিক্ত না করে মানসিক-সম্পর্কহীন একটা সাক্ষাৎকার সেরে আসাই ভাল।

ইচ্ছে করেই পাজামা পাঞ্জাবি পরল অনিমেষ। গ্র্যান্ড হোটেলে যেতে হলে যেসব পোশাকের কথা মনে পড়ে তা অবশ্যই ওর নেই। না থাকলে মানুষ যেমন একটা বোহেমিয়ান ভাব দেখিয়ে উপেক্ষা করতে চায় সেও তেমনি ইস্ত্রি-না করা পাঞ্জাবি গায়ে চাপাল। গাড়িতে বসে অনিমেষ বুঝতে পারল, এগুলোকে লাক্সারি ট্যাক্সি বলে। খুব যত্ন করে রাখা বলে বেশ আরামদায়ক। জিজ্ঞাসা করে জানল হোটেলের বড় সাহেবরা কলকাতায় থাকাকালীন দিনরাতের জন্য এরকম গাড়ি ভাড়া করেন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে এ-গাড়ির ভাড়া।

গ্র্যান্ড হোটেলে সে কখনও আসেনি কিংবা সে সুযোগই হয়নি। চৌরঙ্গি দিয়ে যেতে যেতে অনেকদিন সে ওদিকে তাকিয়েছে। একজন দীর্ঘদেহী পঞ্জাবি দারোয়ান দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, তার পাশের গালচে বিছানো আলো-ঝলমল প্যাসেজ দিয়ে সুবেশ মানুষরা যাতায়াত করেন। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মতন ওরও মনে হত ভেতরটা নিশ্চয়ই রহস্যময়। আজ সেই প্যাসেজ দিয়ে হাঁটবার সময় সে অকারণেই স্মার্ট হতে চাইল। ড্রাইভারই তাকে বলে দিয়েছে ছোটকাকার স্যুট নম্বর। কয়েকজন বিদেশি নারীপুরুষ হাসতে হাসতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। রিসেপশনে হদিস নিয়ে অনিমেষ ওপরে উঠে এল।

এই কলকাতা শহরের বুকেই এমন টিপটপ সাহেবি পরিবেশ অনিমেষের জানা ছিল না। মিছিল শ্লোগান অভাব-দৈন্যতার বাইরে ইংরেজি ছবির মতো ছিমছাম আবহাওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ নির্দিষ্ট নম্বরের সামনে এসে কপালের ঘাম মুছল। ঘর নয়, একটা পুরো স্যুট নিয়ে আছেন ছোটকাকা। নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ লাগছে এ জন্য। অথচ দাদু জলপাইগুড়িতে, ব্যাপারটা মনে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। না, আজকে এ সব চিন্তা করবে না সে। দেখা করতে এসেছে, দেখা করেই চলে যাবে।

বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। খুব সামান্য সময়, কিন্তু ছোটকাকাকে চিনতে পারল অনিমেষ। প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেছে চেহারার। একটু রোগাটে অথচ ছিমছাম শরীর। ঠোঁটের ওপর বেশ ঝোলা গোঁফ, মাথার চুল পাতলা কিন্তু যথেষ্ট লম্বাটে। চিনতে দেরি হওয়ার কারণ গোঁফ এবং চুলের রং লালচে আর গায়ের রং এত ফরসা যে চট করে বিদেশি বলে ভুল হতে পারে। সুন্দর একটা গন্ধ আসছে ওঁর শরীর থেকে। অনিমেষ প্রণাম করবে কি না বুঝতে না পেরে বলল, 'কেমন আছেন?'

ছোটকাকার মুখ এতক্ষণ অপরিচয়ের আড়াল সরাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শোনা মাত্রই দুহাতে ওঁর কাঁধ ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ব্বাস, ইউ, অনি, তুই কত বড় হয়ে গেছিস! একদম অ্যাডাল্ট? আরে রাস্তায় দেখলে তো আমি চিনতেই পারতাম না। আয়, আয়, ভেতরে আয়।' দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে ঘরে ঢোকালেন ছোটকাকা।

ওঁর স্পর্শে অনিমেষ একটু আড়ষ্ট হল; এ ভাবে অনেকদিন তাকে কেউ জড়িয়ে ধরেনি এবং ছোটকাকার শরীর থেকে এমন মূল্যবান গন্ধ বের হচ্ছে যাতে সে অভ্যস্ত নয়।

ঘরটা বেশ বড়। সুন্দর করে সাজানো। একটি মানুষ যত রকমের আরামের উপকরণ না পেলে বিরক্ত হবে তার সবগুলিই আছে। অনিমেষ ঘরে আর তিনজন মানুষকে দেখতে পেল। একবার তাকানোতেই মনে হচ্ছিল তাদের মধ্যে একজনকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ছোটকাকার উচ্ছ্বাস তাকে এত বিব্রত করছিল যে কিছু ভাববার সুযোগই পাচ্ছিল না। ছোটকাকা এখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'আরে অনি, তুই আমাকে ছাড়িয়ে গেছিস লম্বায়? এই সেদিন জন্মালি আঃ, সময়টা

BanglaBook.org

এত দ্রুত চলে যাচ্ছে যে তাল রাখা মুশকিল। দেখি তোর চেহারাটা কেমন হয়েছে! হুম, গুড, দাড়ি রেখেছিস কেন ? কারণ, শুধু রাখলেই হল, না, ওটার কিছু যত্ন-আত্তিও দরকার। এখন কী পড়ছিস যেন!'

'এবার এম.এ. দেব।' অনিমেষ কথাটা বলতেই প্রিয়তোষের চোখ কপালে উঠে গেল যেন, 'য়্যাঁ, এম. এ. ? নো, দেন ইউ আর কোয়াইট অ্যাডাল্ট। নাঃ, তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমি এবার বুড়ো হয়ে যাব।'

ছোটকাকা শিশুর মতো ওর হাত ধরে কথা বলছিলেন। অনিমেষ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওঁর সম্পর্কে নরম হতে লাগল। এই আচরণ যদি আন্তরিক না হয় তা হলে মানুষ সম্পর্কে কখনওই কারও বিশ্বাস করার কারণ নেই। হঠাৎ ছোটকাকা অপেক্ষারত তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। এ হল আমার ভাইপো। দীর্ঘকাল বাদে ওকে আমি দেখলাম। ন্যাচারালি—।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন মানুষ প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

ছোটকাকা বললেন, 'আপনারা আমাকে মিনিট দশেক সময় দেবেন। আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে নিচ্ছি। না না, আপনাদের উঠতে হবে না, আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছি। ততক্ষণ কিছু ড্রিঙ্ক বলছি আপনাদের জন্য।' টেলিফোন তুলে রুমসার্ভিসকে নির্দেশ দিয়ে ছোটকাকা ওকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ওঁকে এখন খুব স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে।

এটি শোওয়ার ঘর। অমন লোভনীয় বিছানা অনিমেষ কখনও দেখেনি। একপাশে সুন্দর বেঁটেখাটো সোফাসেট। ছোটকাকার সঙ্গে সেখানে বসল অনিমেষ। অনিমেষ দেখল ছোটকাকা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, 'একদিন আমি তোর মতন ছিলাম।'

'গতকাল। তোর হোস্টেলে গিয়েছিলাম। কত রাতে ফিরিস ?'

'কাল একটু দেরি হয়েছিল।'

'নো নো, আমি কিছু মনে করছি না এ জন্য। দেরি করে ফেরার বয়স তো এটাই। এবার কলকাতায় এসে আমার একটাই অভিজ্ঞতা হল, তুই বড় হয়ে গেছিল। প্রেম করছিস ?'

আচমকা প্রশ্নটা শনে অনিমেষ লাল হয়ে গেল। কোনওরকমে বলল, 'কী যে বলেন !'

ছোটকাকা তখনও হাসছেন দেখে কথা ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ঠিকানা কোত্থেকে পেলেন ?'

ছোটকাকা হাত নাড়লেন , 'সেটাও বেশ কাকতালীয়। অনেকদিন আগে জলপাইগুড়ি থেকে বাবার চিঠি পেয়েছিলাম। দ্যাট ওয়াজ লাস্ট ওয়ান। তাতে জেনেছিলাম তুই কলকাতায় স্কটিশে ভরতি হয়েছিস। এখানে এসে সে কথা মনে পড়তেই স্কটিশ কলেজে ফোন করলাম, ওরা কিছুই বলতে পারল না। তখন খেয়াল হল তুই কলকাতায় এলে নিশ্চয়ই হোস্টেলে উঠবি। কলেজ থেকে নাম্বার নিয়ে পর পর হোস্টেলগুলিতে রিং করতে লাগলাম। আলটিমেটলি তোকে পেয়ে গেলাম। আমার যদি খেয়াল হত তুই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিস অনেক আগেই তা হলে এ বুদ্ধি মাথায় আসত না এবং দেখাও হত না।'

'আপনি কি মস্কোয় আছেন ?'

'হ্যাঁ। এখন ওখানেই সেটল্‌ড।' তারপর গলা পালটে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবার খবর কী? কেমন আছেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এই বিলাসবহুল হোটেলে বসে দাদুর কথা জিজ্ঞাসা না করে ছোটকাকা তো সরাসরি জলপাইগুড়িতে চলে যেতে পারেন। কী উত্তর দেবে ঠিক করার আগেই ছোটকাকা একটা হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরলেন, 'বুঝতে পারছি প্রশ্নটা শুনে তুই ডিস্টার্বড্‌! তাই তো ?'

অনিমেষ খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিল, 'না, তা কেন হবে! আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্নটা করতে পারেন। দাদুর শরীর ভাল নেই।' উত্তরটা দিতে পেরে অনিমেষ স্বস্তি পেল। এখানে, এই হোটেলে বসে ছোটকাকাকে রূঢ় কথা বলে সে দাদুর সমস্যার কোনও সমাধান যখন করতে পারবে না তখন বলে লাভ কী।

'তুই সত্যিই বুদ্ধিমান।' ছোটকাকা উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে একটা সাদা বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই ভদকা খাবি ?'

'ভদকা ? না, না।'

'ঠিক আছে।' গ্লাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে ছোটকাকা বিছানার ওপর বসলেন এবার, 'তুই জানিস কিনা

BanglaBook.org

জানি না, জলপাইগুড়ি ছাড়ার পর আমি বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম। লাস্ট যে বার ওখানে যাই সে খবর তো তুই জানিস। তারপর নানান ঝামেলায় আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এইসময় বড়দার চিঠি পাই—বাবা চলে গেছেন। তখন আমার বাইরে যাওয়া ঠিকঠাক। সেদিনই দিল্লি যাব। ভাবলাম বাবা যখন নেই তখন আর জলপাইগুড়িতে ফিরে কী হবে! বড়দা টাকা চেয়েছিল তাই পাঠিয়ে দিলাম। মস্কোতে গিয়ে তোর বাবাকে চিঠি দিলাম। মেজদা যে আমার ওপর চটেছে তা উত্তর পেয়ে বুঝলাম আর সেই সঙ্গে জানলাম বড়দা আমাকে ব্লাফ দিয়েছে, বাবা বেঁচে আছেন। তুই বোঝ ব্যাপারটা! বাবাকে চিঠি দিয়েছি তারপর, উত্তর পাইনি। দিল্লি থেকে এক বন্ধুকে দিয়ে টাকা পাঠিয়েছিলাম, উনি রিফিউজ করেছেন। নাউ, আই হ্যাভ নাথিং টু সে। কেউ যদি আমাকে এজন্য দোষী করতে চায় করতে পারে এবং তাতে আমার কিছু এসে যায় না। বাবা ভাল নেই বললি, কী হয়েছে?'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল ছোটকাকা নিজেও জানেন তাঁর কথাগুলোর পেছনে খুব জোরালো যুক্তি নেই। তাই স্রেফ জেদের বশে কথাগুলো বলে যাওয়া। এবং ঘুরে ফিরে দাদুর কথা জানতে চাওয়ার মধ্যেই সেই দুর্বলতা প্রকাশিত।

অনিমেষ বলল, 'বয়স হয়েছে, টাকা পয়সা হাতে নেই, খুব কষ্টে চলতে হচ্ছে।'

ছোটকাকা বললেন, 'খুলে বল, ইন ডিটেইলস।'

অনিমেষ তাকাল, 'আপনার ভাল লাগবে না। এখন ওই বাড়িটুকু ছাড়া দাদুর কোনও সম্বল নেই। তাই পাবার জন্য আত্মীয়রা যাওয়া আসা করছে বলে দাদু সবাইকে বলেছেন ওঁর লেপ্রসি হয়েছে।'

'লেপ্রসি! বাবার কুষ্ঠ হয়েছে?'

'হয়নি। কিন্তু হয়েছে বলে বেড়ালে ভিড় এড়ানো যায় তা জানেন দাদু। আমি এবার গিয়ে দাদুকে চিনতে পারিনি। খুব বেশি দিন মনে হয় বাঁচবেন না।'

'বড়দি?'

'শরীর ভাল নেই। একবেলা খান। শুকিয়ে গেছেন।'

ছোটকাকা হাতের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করলেন। তারপর আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'শুনলাম তুই রাজনীতি করিস। এস. এফ.?'

বিস্মিত অনিমেষ কাকার মুখে হাসি দেখতে পেল, 'হ্যাঁ।'

'তুই সি পি এম-এর কাজকারবারে বিশ্বাস করিস?'

'খানিকটা।'

'খানিকটা? হোয়াই?'

'ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বলতে তো সি পি এম-ই। কিন্তু এই দলের কাজকর্ম আমার ভাল লাগে না, অথচ উপায় নেই।'

'ও। তা ভাল না লাগলে রাজনীতি করতে কে বলেছে! এম.এ. পাশ করে চাকরি জোগাড় করে সংসার কর।'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

ছোটকাকা ওর মুখের দিকে সকৌতুকে তাকালেন, তারপর হো-হো করে হাসতে লাগলেন। শেষে খুব ধীর গলায় বললেন, 'অনি, রাজনীতি করতে এসে কোনও আদর্শ বা ফর্মুলা সামনে রেখে এগোয় বোকারা। যখন যা তখন তা যে হতে পারে সেই ভাল পলিটিসিয়ান। গতকাল তোর হোস্টেলের একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে তোর সম্পর্কে জানতে পারলাম। তোকে দেখে আমি আমার অতীতকে দেখতে পাচ্ছি। পার্টি যখন নিষিদ্ধ হল তখন ওই একটা আদর্শ নিয়ে আমরা বেঁচেছিলাম। কিন্তু তাই যদি আঁকড়ে থাকতাম তা হলে আমাকে আজ খুঁজে পাওয়া যেত না। রাজনীতি করবি একটা মজবুত সিঁড়ির কাছে পৌঁছাবার জন্য। যেই সেই সিঁড়িটা পেয়ে যাবি আর পেছন দিকে তাকাবি না। তোদের এখানে যারা বড় নেতা তাদের অনেকের ব্যক্তিগত চরিত্র আমি জানি। সে সব জানলে তুই শিউরে উঠবি। যারা বাইরের ঘরে বসে আছে তাদের তুই চিনিস?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। না।

'এরা এসেছে আমার মন গলাতে। মস্কো যাওয়ার প্রবেশপত্র পাওয়া ওদের উদ্দেশ্য।

না, এরা সি পি আই নয়। আজ সারাদিন আমি দফায় দফায় মিটিং করব তোদের নানান নেতাদের সঙ্গে। তুই যেমন করেই হোক একটু সামনের সারিতে চলে আয়, তারপর তোর ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দে।'

BanglaBook.org

অনিমেষ আর পারছিল না। ছোটকাকা যে সব কথা বলে যাচ্ছে তা হয়তো সত্যি কিন্তু এ কীরকম চিন্তা-ভাবনা। চোখের সামনে জলপাইগুড়ির বাড়ির সামনে সেই বিক্ষোভটার ছবি ভেসে উঠল। ছোটকাকা যেটা এড়াতে বিরাম করের বাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। সে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কে. জি. বি-র এজেন্ট ?

'এ্যাঁ! গুড! এখন কি সি. আই. এ-র সঙ্গে কে. জি. বি-র এজেন্ট বলা আপ টু ডেট গালাগালি ? আরে বোকা, সি. আই. এ. কিংবা কে. জি. বি. অনেক বুদ্ধিমান সংগঠন। তারা এমন লোককে কাজ করতে পাঠায় না যাকে দেখে তুইও বুঝতে পারবি। তোর উদ্দেশ্য কী ?'

'কী ব্যাপার ?'

'কেন রাজনীতি করছিস ?'

'এ দেশের মানুষ যাতে শোষিত না হয়, কোনও ধাপ্পায় না ভোলে—'

ওর কথা থামিয়ে ছোটকাকা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা তো সি পি এমও বলছে —।'

'বলছে। কিন্তু এই সংবিধানের মধ্যে সেটা করা সম্ভব নয় তা ওরা জানে।'

'দেন, ইউ আর থিংকিং সাম আদার ওয়ে। সেটা কী ?'

'জানি না।'

'এনি আর্মড রেভ্যুলেশন ?'

'জানি না।'

'পাগলামি করিস না। এ দেশের মানুষের মনে লোভের পোকা থিকথিক করছে। এদের নিয়ে কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। আমি যা বললাম তাই কর।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আপনি ওঁদের দশ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।'

হাসল ছোটকাকা, 'দরকার হলে ওরা দশ ঘন্টা অপেক্ষা করবে।'

'আমি চলি।'

'যাবি ?'

'হ্যাঁ।'

ছোটকাকা একটা ব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বের করে ওর হাতে দিলেন, 'আমি আজ রাত্রেই ফিরে যাব। তোর যদি কখনও দরকার হয় এই ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিবি।' এটা অন্য ধরনের কার্ড, গতকালের মতো নয়। একসঙ্গে ইংরেজি এবং সম্ভবত রাশিয়ান, যা অনিমেষ বুঝতে পারল না, লেখা আছে। অনিমেষ ওটা পকেটে রেখে বেরিয়ে আসছে, ছোটকাকা আবার ডাকলেন, 'অনি, আমার একটা উপকার করবি ?'

'বলুন।'

' তোকে প্রমিস করতে হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে অনিমেষ সেটাকে ঝেড়ে ফেলল, 'বলুন।'

'আমি তোকে দুটো প্যাকেট দেব, তুই দুজনকে ও দুটো পৌঁছে দিবি ?'

'কাদের ?'

ছোটকাকা একটা স্যুটকেস খুলে দুটো সুদৃশ্য প্যাকেট বের করে অনিমেষের সামনে ধরে বললেন, 'ওপরে নাম লেখা আছে।'

খুব বেশি ওজন নয়, অনিমেষ প্যাকেট দুটোর নাম পড়তে গিয়ে খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করল। একটাতে সরিৎশেখর মিত্র, অন্যটায় ছোট্ট করে লেখা, তপু মানে তপু পিসি। অনিমেষ বিহ্বল চোখে ছোটকাকাকে দেখল। এতগুলো বছর চলে গেছে অথচ ছোটকাকা এখনও তপুপিসিকে মনে রেখেছেন ? একসময় ছোটকাকার ওপর সে রেগে গিয়েছিল তপুপিসিকে অবহেলা করার জন্য। অথচ একটা মানুষ যে গোপনে গোপনে আর একজনকে মনে রেখে দেয় চিরকাল, এটা জেনে সব গোলমাল হয়ে গেল তার। রূপশ্রী সিনেমার সামনে বাচ্চাদের নিয়ে তপুপিসি যেদিন পথের পাঁচালী দেখতে যাচ্ছিল সেদিনই বোধহয় ছোটকাকার সঙ্গে তার শেষ দেখা। কী নির্লিপ্ত হয়ে তপুপিসি ছোটকাকাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। আর নীল কাগজে ছোটকাকাকে লেখা তপুপিসির সেই চিঠিটা যেটাকে সে বাড়ি সার্চ করার আগে পুলিশের চোখ থেকে সরিয়ে রেখেছিল, যা কিনা পরে ছোটকাকার হাতেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তার কথা মনে পড়ল। সেই লাইন দুটো কখনওই ভুলবে না অনিমেষ, 'তোমার রাজনীতিই এখন সব, আমি আর কেউ নই। তাই তুমি যত ইচ্ছে রাজনীতি করো, আমি দায় তুলে দিলাম।'

'তপুর সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে ?'

প্রশ্নটা শুনেই ঘাড় নেড়ে না বলল অনিমেষ। তপুপিসি কি এখনও জলপাইগুড়ি গার্লস স্কুলে আছে ? কী জানি।

'ওর কোনও খবর জানিস না তুই ?'

'না।'

'তা হলে ?'

'যদি দায়িত্ব দেন তা হলে খুঁজে বের করে দিয়ে দিতে পারি।'

'এটুকু অন্তত কর।'

হঠাৎ অনিমেষের মাথায় চিন্তাটা চলকে উঠল, 'কিন্তু তপু পিসি যদি না নেয়!'

ছোটকাকা স্থির হয়ে গেলেন। এতক্ষণ যে মানুষটা প্রচণ্ড প্রতাপে নানান কথা বলছিল এই সময় তাঁকে কী নিঃসহায় দেখাচ্ছে। মৃদু গলায় বললেন, 'যদি না নিতে চায় তা হলে তিস্তায় ফেলে দিস।' তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'আমার ভাগ্যটা এমন। কোনও সম্পর্ককেই আমি সহজ স্বাভাবিক রাখতে পারলাম না অনি, তোকে দেখে আমার এই ভয়টাই হচ্ছে। আমি যে ভুল করেছি তুই তা করিস না।'

অনিমেষ প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

'তুই কি আজকে আবার আসবি ?'

'কখন ?'

'কখন বলি! সারাদিন ঝামেলা লেগেই থাকবে। এয়ারপোর্টে আসতে পারবি ছ'টা নাগাদ?'

'এয়ারপোর্ট ?'

'তখন কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে।'

'দেখি।'

'তুই সিগারেট খাস অনি ?'

দ্বিধা না করে উত্তর দিল অনিমেষ, 'মাঝে মাঝে।'

'দেন ওয়েট।' ছোটকাকা ঘরের কোনায় ফিরে গিয়ে একটা সুদৃশ্য প্যাকেট আর ছোট্ট অথচ সুন্দর লাইটার এনে ওর হাতে গুঁজে দিলেন। অনিমেষ প্যাকেটটা দেখল। রাশিয়ান সিগারেট। বিদেশি সিগারেট সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই। বন্ধুদের দেখেছে খুব লালায়িত হতে। লাইটারের বোতামে চাপ দিতেই একটা নীল হলকা বেরিয়ে এল। খুব দামি নিশ্চয়ই এটা। ছোটকাকা বললেন, 'গ্যাসের। ফুরিয়ে গেলে কিনে নিস।'

'আমার অত পয়সা নেই। এটা রেখে দিন। আমার কাজে লাগবে না।'

'কেনার দরকার নেই। ওটা গ্যাস শেষ হয়ে গেলে কাউকে দিয়ে দিস।'

বাইরের ঘরে বেরিয়ে আসতেই লোক তিনটে উঠে দাঁড়াল। তাদের মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য তারা একটুও অসন্তুষ্ট হয়নি। বরং বেশ নেশা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। একজন অকারণেই হাসছিল। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ—। ছোটকাকা বললেন, 'সরি, দেরি করিয়ে দিলাম আপনাদের। বসুন বসুন। কী খাচ্ছেন ? সিভাস রিগ্যাল ? আমার আবার ভদকা না হলে চলে না।' অনিমেষ বেরিয়ে যাচ্ছিল, ছোটকাকা ওকে দাঁড়াতে বললেন, 'আমার ভাইপো; অনিমেষ মিত্র, খুব ইনটেলিজেন্ট ছেলে।' লোক তিনটে তাকে নমস্কার করছে দেখে অনিমেষ প্যাকেট-হাতেই সেটা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ছোটকাকা তখন বলছেন, 'এম. এ. পড়ছে, ছাত্র ফেডারেশন করে। খুব অ্যাকটিভ।'

'আচ্ছা!' সেই চেনা চেনা লোকটি বলল, 'বিমানকে চেনো ?'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ জবাব দিল।

'কী নাম যেন ?'

'অনিমেষ মিত্র।'

'ঠিক আছে মিত্রসাহেব, মনে থাকবে।' লোকটি ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তবে ওকে মানে —, বুঝতেই পারছেন!'

'অফ কোর্স।' ছোটকাকা অনিমেষকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এদের যে তুই এখানে দেখলি কাউকে বলার দরকার নেই।'

'কেন ?' চাপা গলায় বলল অনিমেষ।

BanglaBook.org

'রাজনীতিতে সাফল্য পাওয়ার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হল চোখ খোলা আর মুখ বন্ধ রাখা। এটার সঙ্গে যে মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারে তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।' ছোটকাকা হাসলেন।

অনিমেষ খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আর হৃদয় ?'

'ওটার ব্যবহার নির্বোধরাই করে। ইমোশনাল ফুলদের জায়গা রাজনীতিতে নেই। ও-কে, চেষ্টা করিস এয়ারপোর্টে আসতে আর ইন কেস অফ এনি ডেঞ্জার চিঠি লিখবি। এই ভারতবর্ষের যে কোনও অসাধ্য সাধন মস্কোয় বসে করা যায়।' দরজা বন্ধ করলেন ছোটকাকা।

সেদিন দুপুরে ইউনিয়ন অফিসে গেল অনিমেষ। ইদানীং এই ঘরটাকে সে এড়িয়ে যাচ্ছে। বিমান, সুদীপ এবং অনেকে কথা বলছিল। ওকে দেখেই সুদীপ বলল, 'তোমার কী হয়েছে ? আজকাল অন্যরকম লাগছে।'

'কী হবে !' অনিমেষ হাসল, 'খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

'কী ব্যাপার ?' বিমান জিজ্ঞাসা করল।

'আমার কাকা এসেছেন মস্কো থেকে। এখানে পলিটিক্যাল কনফারেন্স আছে। ওঁর সঙ্গে থাকতে হয়েছিল।' অনিমেষ বলল।

বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'কী নাম বলো তো ?'

'প্রিয়তোষ মিত্র।'

'আচ্ছা! আমি ঠিক জানি না। তুমিও তো কখনও বলোনি।'

'এমন কী ব্যাপার যে বলব! তবে দেখলাম নেতারা জানেন।' অনিমেষ দেখল ওদের খুব পাজল্‌ড দেখাচ্ছে। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুদীপের সামনে রাখল, 'কাকা দিয়েছেন তোমাদের খেতে।'

নির্লিপ্তের মতো প্যাকেটটা তুলেই চেঁচিয়ে উঠল সুদীপ, 'আরে রাশিয়ান সিগারেট! এ প্যাকেট ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ কমিউনিজম।' সবাই হুমড়ি খেয়ে প্যাকেটটাকে দেখতে লাগল। সুদীপ সন্তর্পণে প্যাকেটটা খুলে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজে বলল, 'থ্যাঙ্ক অনিমেষ, আমি যেন মস্কোর গন্ধ পাচ্ছি।' চারপাশ থেকে আরও কতগুলো আগ্রহী হাত এগিয়ে এল সিগারেটের জন্য।

প্রচণ্ড একটা জ্বলুনি অনিমেষকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এল। তিরিশের বি বাসে চেপে এই প্রথম দমদমে যেতে যেতে অনিমেষ আজ সকাল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যত ভাবছিল ততই জ্বলুনিটা বাড়ছিল ! ছোটকাকা হঠাৎ মস্কো থেকে উড়ে এলেন কেন ? ওঁর ঘরে যাঁরা বসেছিলেন কিংবা যাঁদের সঙ্গে মিটিং করেছেন তাঁদের সঙ্গে ওঁর কী সম্পর্ক ? সকালবেলায় তার মস্তিষ্ক ঠিক কাজ না করায় ছোটকাকা একতরফা কথা বলে গেছেন। হয়তো তিনিই সঠিক, আজকাল যে সুবিধেবাদী-রাজনীতির শিকার সবাই তাতে ওই পথেই চলা লোভনীয়। কিন্তু অনিমেষের মনে হল ছোটকাকাকে কিছু কথা স্পষ্ট বলা দরকার।

এয়ারপোর্টে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল অনিমেষের। স্টেশনের যাত্রীদের থেকে এখানকার মানুষগুলোর হাবভাব আলাদা। কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর সে ছোটকাকাকে দেখতে পেল। সেই তিনটে লোক এখনও সঙ্গে আছে।

ওকে দেখে ছোটকাকা এগিয়ে এলেন, 'এসেছিস।'

'হ্যাঁ।'

'খুব দেরি হয়ে গেছে আমার। তোকে যা বললাম তা করিস।'

'কী ব্যাপারে ?'

'ওঃ, ওই প্যাকেট দুটোর কথা বলছি।'

'আচ্ছা!'

'আর, হ্যাঁ, এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস, আখেরে কাজ দেবে।' ইঙ্গিতে পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখিয়ে দিলেন উনি, 'মনে রাখিস, প্রত্যেকটা স্টেপ সামনে এগিয়ে যাবার জন্যই ফেলতে হয়।' কথাটা বলে ছোটকাকা ঘুরে স্যুটকেস হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অনিমেষ পেছন থেকে ডাকল।

'কী হল ?'

'এই লোকগুলোকে কি আপনি লোভ দেখিয়ে গেলেন ?'

BanglaBook.org

কথাটা শোনামাত্র ছোটকাকার মুখ বিস্ময়ে চুরমার। অবাক চোখে দেখছেন তিনি অনিমেষকে। তারপর কয়েক পা ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছিস?'

'আপনি যে রাশিয়ান সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়েছিলেন সেটা পাওয়ার জন্য আমার কমরেড বন্ধুরা লালায়িত হয়েছে। এঁরা নিশ্চয়ই আরও বড় কিছু প্রাপ্তির আশায় আপনার পেছনে ছুটছে। এদের নষ্ট করে আপনার কী লাভ হচ্ছে?' অনিমেষ খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'উত্তরটা তোকে দেব না। তোকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। তোরা কী চাস?'

'এই করাপশন থেকে দেশটাকে বাঁচাতে চাই। শুনুন, যে সব লোকেদের আপনি দেখে এসেছেন কিংবা নিজের মতো মনে করেন তার বাইরেও কেউ কেউ আছে।' অনিমেষ দৃঢ় প্রত্যয়ে জানাল।

'গুড। একই ভ্রান্ত আবেগ! অনি, ভারতবর্ষের এই সিস্টেমে তোর ওই কেউ কেউ লোকগুলো হয় না খেয়ে মরবে নয় একদিন দালাল হয়ে যাবে। অতএব ভেবে দ্যাখ। আই ফিল পিটি ফর ইউ।'

ছোটকাকা আর দাঁড়ালেন না। সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। অনিমেষের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ সে টের পেল তার কোনও জোর নেই। কীসের ওপর ভিত্তি করে এইসব লোভী মানুষগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলবে? সামনে যে কোনও পথ খোলা নেই। চুপচাপ রাজনীতি থেকে সরে যাওয়া সেও তো একরকম এস্‌কেপিজম। তা হলে? এই ঘোলাজলে পাক খাওয়া যেখানে অবধারিত সেখানে ছোটকাকাকে মুখের ওপর জবাব দেবার কোনও উপায় নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে বাস স্ট্যান্ড অনেকটা দূর। অনিমেষ হেঁটে যাচ্ছিল। ঠিক সেইসময় পেছনে গাড়ির শব্দ হওয়ায় সে ঘাড় ঘোরাল। গাড়িটা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সেই তিনজন। ছোটকাকাকে সি-অফ করে ফিরছেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলকাতায় যাবে তো?' অনিমেষ ঘাড় নাড়াল।

'উঠে এসো।' কথার মধ্যে একটা নকল ভালবাসা টের পাওয়া যাচ্ছে। অনিমেষ এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপরই হাসল, 'না। আপনারা যান। আমার এখানে একটু দরকার আছে। দেরি হবে।'

তিনটে লোক স্বাভাবিক হয়ে গেল। চলে যাওয়ার আগে সেই ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার কাকার সঙ্গে কথা হয়েছে। একদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। কোনও চিন্তা নেই।'

ছুটন্ত গাড়ির পশ্চাদ্দেশ দেখতে দেখতে অনিমেষ দাঁতে দাঁত চাপল, 'শালা।'

অনেক রাত্রে হোস্টেলে ফিরল অনিমেষ। উল্টোডাঙা থেকে সোজা হেঁটে এসেছে। ভীষণ ক্লান্তি শরীরে। আশেপাশের দোকান বন্ধ এখন। হোস্টেলের গেট আধভেজানো। হঠাৎ পাশের ল্যাম্পপোস্টের ছায়া থেকে কেউ দ্রুত সরে এল ওর কাছে। চমকে অনিমেষ তাকাতে হতভম্ব হয়ে গেল। সুবাসদা। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা। চাপা গলায় ডাকল সুবাসদা, 'অনিমেষ!'

'সুবাসদা! আপনি?' যতটা না দেখে তার চেয়ে ওর হাবভাবে অবাক হল সে।

'অনিমেষ, তুমি কি আমাকে একটা রাত থাকতে দিতে পারো?'

অনিমেষ একটু দ্বিধা না করে বলল, 'নিশ্চয়ই, আসুন।'

উনত্রিশ

দারোয়ানকে ম্যানেজ করে সুবাসকে নিজের ঘরে আনতে কোনও অসুবিধে হল না অনিমেষের। হোস্টেলের সবার খাওয়া হয়ে গেছে। রাত বেশি হওয়ায় দু-একটা ছাড়া প্রায় সব ঘরের আলো নিভে গেছে। অনিমেষ খাবার ঘর থেকে ঢাকা দেওয়া নিজের খাবারটা ওপরে নিয়ে এল। রুটিগুলো এরই মধ্যে শক্ত হয়ে গেছে, ঝোলে সেই বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ। জোর করে সুবাসকে রাজি করিয়ে ওই খাবার ভাগ করে খেয়ে অনিমেষ বলল, 'আপনি খাটে শুয়ে পড়ুন, আমি নীচে শুচ্ছি।'

'তোমার তক্তাপোশটায় দিব্যি দুজনে কুলিয়ে যাবে, ব্যস্ত হয়ো না।' সুবাস একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করে বলল, 'আচ্ছা অনিমেষ, আমরা দুজনেই তুমি বলব? এরকম পরিস্থিতি আগে হয়েছিল না? আপনি বলাটা বন্ধ করো ওতে দূরত্ব বেড়ে যায়।'

চারধার নিঃশব্দ, ট্রাম-লাইন ঘুমিয়ে পড়লে কলকাতা যুবতী বিধবার মতো মাথা নিচু করে থাকে খানিকক্ষণ। আশেপাশের বাড়িগুলোর আলো নিভে গেলে দূরে একটা চারতলার ঘরের জানালার কাচ ঝকঝক করছে। অনিমেষ চেয়ারে বসে সে দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণ সে সুবাসদাকে কোনও প্রশ্ন

BanglaBook.org

করেনি। এত রাতে হঠাৎ কী বিপদ হল তা জানতে কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু নিজে থেকে না বললে প্রশ্ন করতে খারাপ লাগছিল।

হঠাৎ সুবাস বলল, 'তোমার কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না তো?'

'কেন?'

'এই যে হঠাৎ এসে জুড়ে বসলাম!'

'যাঃ, তা কেন হবে।'

' তোমার বন্ধুরা, আমি বিমানদের কথা বলছি, তারা কৈফিয়ত চাইবেই।'

'কেন? এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া এখন আর কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।" কথাটা বলে অনিমেষ সুবাসের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'কেন?'

'আমার আর ভাল লাগছে না। আসলে আমি পার্টির কাজকর্ম আর মানতে পারছি না। এত স্বার্থান্বেষী মানুষ পার্টির ওপরতলায় ছেয়ে গেছে যে এই দলের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করা যাবে না। প্রতিমুহূর্তে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করার চাইতে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অনেক ভাল।' অনিমেষ বলল।

সুবাস ওকে ভাল করে দেখল। তারপর বলল, 'আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।'

আলোচনাটাকে হঠাৎ এ ভাবে থামিয়ে দেওয়ায় অনিমেষ অবাক হল। সুবাস কি ওর কথা বিশ্বাস করছে না?

ঘরের আলো নেভালেও একটা পাতলা আলো অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে থাকে। অনিমেষ সুবাসের পাশে চুপচাপ শুয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল তার ঘুম আসবে না। এতকাল একা শুয়ে শুয়ে এমন একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে যে এখন পাশে কেউ শুয়ে থাকলেই অস্বস্তি হয়। শুয়ে শুয়ে সে সুবাসের ব্যাপারটা চিন্তা করছিল। পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে সুবাস খাদ্য-আন্দোলন করেছে, অ্যাকশনে নেমেছে। এরকম একটা মুহূর্তে ও তাকে শিয়ালদার গলি থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পার্টির হয়ে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনের কাজ করেছে দীর্ঘদিন। সুবাসই তাকে বিমানদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আবার এই সুবাসকেই পার্টি থেকে দলবিরোধী কাজের জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে বিমানরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। দল থেকে বেরিয়ে সুবাসদা এখন কী করছে! কিছু কিছু কথা আবছা আবছা তার কানে আসছে। সেগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সুবাস কি সেই দলে আছে? আর আজ রাত্রে যে ভাবে সুবাস তার কাছে এসে আশ্রয় নিল তাতে বোঝা যায় কেউ বা কারা তার ক্ষতি করতে চাইছে এবং এই মুহূর্তে সুবাসকে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন? কথাগুলো মনের মধ্যে বুদ্‌বুদের মতো উঠছে অথচ এক হাতের মধ্যে শুয়ে সুবাস, তাকে জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না। কেউ যদি নিজে থেকে উন্মোচন না করে তা হলে খোঁচাতে সঙ্কোচ হয়। সুবাস যে ঘুমিয়ে পড়েছে এটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না এখন। অনিমেষ ঘুমুতে পারছিল না।

এখন পার্টির মধ্যে হাজারটা ফাটল। পাশাপাশির কংগ্রেসও স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। বর্তমান সরকারের খাদ্যনীতি একদল মানুষকে বেদম চটিয়েছে। লেভি ব্যবস্থার শিকার হয়েছে জোতদারেরা যারা এতকাল কংগ্রেসের খুঁটি ছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বৃহত্তর কলকাতায় রেশন ব্যবস্থা চালু করেছেন লেভির মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। আর এর ফলে সারা বাংলার জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বামপন্থীরা বিক্ষিপ্ত আন্দোলন শুরু করেছিল কয়েকটা জায়গায়। কৃষ্ণনগর এবং বর্ধমানে দুটো তাজা ছেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়ে সারা বাংলার মানুষের মনে কংগ্রেস সম্পর্কে অস্বস্তি এনে দিয়েছে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে কংগ্রেস যে দ্বিধায় পড়েছিল তা এখনও কাটেনি। নেহরু পরিবারকে আবার আঁকড়ে ধরা হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এখন একজন মহিলা যাঁকে মন্ত্রীসভার বয়স্ক সদস্যরা একদা স্নেহ করতেন বা বাধ্য হতেন স্নেহ করতে। কংগ্রেসের বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্ব যত তাড়াতাড়ি জনসাধারণ জানতে পারে তার ছিটেফোঁটাও মার্কসবাদী পার্টি সম্পর্কে জানা যায় না। মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেসি নেতা আজ কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। তাঁকে ঘিরে জোতদাররা সংগঠিত হচ্ছে আগামী নির্বাচনে লড়বার জন্য। নতুন নামকরণে তিনি কংগ্রেসের গন্ধ ছাড়তে পারেননি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রকৃত কংগ্রেসিদল প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর সঙ্গে বিরোধীদের সুবিধাবাদী অংশ হাত মেলাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোনও গোঁড়া পার্টি-ক্যাডার

স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হবে। তবু লড়ে যাওয়া, গণতন্ত্রে লড়ে যেতে হয়। একটা পার্টির অস্তিত্ব প্রমাণ করার সুবর্ণ সুযোগ হল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। পার্লামেন্ট হল শুয়োরের খোঁয়াড়—কথাটা মনে পড়তেই অনিমেষ হেসে ফেলল। সারা দেশ উৎসুক হয়ে আছে ওই খোঁয়াড়ে ঢুকে কাদা পাঁকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে। এই পরিস্থিতিতে সুবাসরা কী ভাবছে? কী করতে চাইছে ওরা?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিমেষ তা জানে না। উঠে দেখল সুবাস চেয়ারে বসে আছে, বাইরে এখনও তেমন রোদ ওঠেনি। সুবাস হাসল, 'ঘুম হল?'

অনিমেষ চট করে উঠে বসে দেখল সুবাস যাওয়ার জন্য তৈরি। সে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখন কি করছেন?'

'কী করছি মানে?'

'রাজনীতির কথা বলছি।'

'রাজনীতি কথাটা আবর্জনার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছে, ওতে সারও হয় না।'

'আপনি কি আমাকে স্পষ্ট কিছু বলতে চাইছেন না?'

'তুমি কিন্তু এখনও আপনি ছাড়তে পারলে না।'

'ঠিক আছে, সুবাসদা। আমি একটা রাস্তা খুঁজতে চাই। এ ভাবে ভাল লাগছে না। পার্টির সঙ্গে কাজ করা আমার পোষাবে না; ভেবেছিলাম এখন পড়াশুনা করব, ও সব মাথায় রাখব না। কিন্তু——।'

সুবাস কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তোমার যা অবস্থা তা আমাদের অনেকেরই। একসময় আমি ডেডিকেটেড ছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে আমি একমুখী ছিলাম। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এই দেশের পার্টির কর্তারা এক ধরনের গজকচ্ছপ কমিউনিজম জন্ম দিচ্ছেন। তোমার সঙ্গে একদিন চায়ের দোকানে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। হ্যাঁ, আমরা অন্যরকম চিন্তাভাবনা করেছি, কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চিনের পথেই সম্ভব। আমরা সেটা অর্জন করতে চাই। এই মেরুদণ্ডহীন মানুষগুলো কিন্তু আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে না। আমাদের আদায় করতে হবে। আমরা মনে করি বন্দুকের নলই হল মানুষের প্রকৃত শক্তির উৎস। অনিমেষ, আমরা একটা আগুন জ্বালতে চাই। যে আগুনে আমাদের নকল চামড়ার খোলস পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, একটা নতুন ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াবে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা নিয়ে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি এখনই সম্ভব?'

সুবাস বলল, 'এ সম্পর্কে মাও সে তুং-এর দেওয়া একটা চমৎকার উপমা মনে পড়ছে। আমরা এক থালা ভাত কি একবারে খেতে পারি? থালা ভাত তো ধীরে ধীরে গ্রাস করে খেতে হয়। তাই না?'

অনিমেষ ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সে উজ্জ্বল মুখে সুবাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুবাসদা, আমাকে একটু বিশদ করে বলুন।'

সুবাস বলল, 'এখন আমার সময় নেই ভাই, আটটার মধ্যে আমাকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে। তুমি এক কাজ করো, আমি তোমাকে একটা কাগজ দিয়ে যাচ্ছি। পড়লেই মোটামুটি বুঝতে পারবে আমরা কী চাইছি। যদি কোথাও অস্পষ্টতা থাকে আলোচনা করতে পারো।'

সুবাস ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে তার থেকে একটা লিফলেট জাতীয় জিনিস তুলে অনিমেষের হাতে দিল।

অনিমেষ সেটার ওপর চোখ রাখতেই সুবাস উঠে দাঁড়াল, 'বিমানদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করেছ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'না। মানে মৌখিকভাবে কিছু হয়নি।'

সুবাস বলল, 'আমি জানতাম তোমাকে সরে আসতেই হবে। সিদ্ধান্ত নেবার পর আশা করব তুমি সম্পর্ক রাখবে না। তাতে ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। আর একটা কথা, এখন থেকে যা করবে সাবধানে করবে। এই কাগজটা প্রকাশ্যে রাখার দরকার নেই।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি কি আজ সন্ধেবেলায় আসছেন? মানে এখানে থাকবেন তো?'

সুবাস বলল, 'না ভাই, আমাকে আজই বর্ধমান যেতে হবে।'

অনিমেষ একটু ভাবল, 'তা হলে আপনার সঙ্গে আমার কবে দেখা হচ্ছে?'

BanglaBook.org

দরজায় দাঁড়িয়ে সুবাস বলল, 'তুমি নিজের মন পরিষ্কার করো, আমি সময় হলেই যোগাযোগ করব।'

ঝড়ের মতো নেমে গেল সুবাস। অনিমেষ চুপচাপ বসে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। লিফলেটটা কয়েকটা পাতার—

'ভারতবর্ষের বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অতীত প্রতিশ্রুতিগুলো বিস্মৃত হয়ে ঔপনিবেশিক সংসদীয় কাঠামোয় নিজেদের মানানসই করে নিয়ে রাজ্য সরকার পাওয়ার জন্য বেশি মন দিয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে তরুণ কমিউনিস্টদের মধ্যে। আমরা ভারতবর্ষের অতীত বিপ্লবী পর্বের (তেভাগা সংগ্রাম ও তেলেঙ্গানার সশস্ত্র আন্দোলন) উৎস থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুনভাবে বিপ্লব পরিচালনা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বে জনগণের মধ্যে সবচেয়ে শোষিত ও পীড়িত অংশ কৃষক সমাজ এবং যেহেতু এ অঞ্চলে অতীতে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে এই কৃষক সাধারণেরই ছিল সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা, তাই আমাদের এই নতুন বিপ্লবে এই অবহেলিত শ্রেণীর পাশে দাঁড়াব আমরা।

তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল গ্রাম—এই তত্ত্বকে আরও একধাপ এগিয়ে লিনপিয়াও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকা শহরের মত, আর আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকা এই পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার তত্ত্ব প্রয়োগ করে তিনি গণমুক্তির সংগ্রামকে জোরদার করতে যে আহ্বান জানিয়েছেন আমরা সর্বান্তঃকরণে তা সমর্থন করি।

'আমাদের দেশের ইতিহাস হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বীর কৃষকশ্রেণীর বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হলেন কৃষক। এবং এঁরাই সবচেয়ে বেশী শোষিত। তাই সশস্ত্র কৃষক গেরিলাদল সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতা দখল করতে হবে। গত দুই শতকে কৃষক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমরা কাজে লাগাবো। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা-সিধু-কানু এই কৃষক বিদ্রোহের পূর্বসূরী।

'সংগঠন পর্যায় সম্পূর্ণ হলে কৃষক গেরিলার দল সশস্ত্র সংগ্রামের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলোকে বিস্তৃত করে জনযুদ্ধের প্রচণ্ড ঢেউ সৃষ্টি করতে পারবেন, গড়ে তুলবেন গণফৌজ, যে গণফৌজ দ্বারা গ্রামাঞ্চলে চার পাহাড়ের প্রতিক্রিয়াশীল শাসককে উচ্ছেদ করবে, শহরগুলোকে ঘিরে ফেলে দখল করে নেওয়া হবে এবং সমগ্র দেশে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে সর্বহারার একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

'শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরকালই সুবিধেবাদী। পৃথিবীর সব দেশেই সেটা দেখা যায়। শহরের এই শ্রেণীর কর্মীদের শ্রেণীচ্যুত হয়ে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের পাশে গিয়ে লড়াই করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

অনিমেষ বাকি লিফলেটটা শেষ করল। একবার নয়, বেশ কয়েকবার সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাগোড়া পড়ে নিল। পড়তে পড়তে ও শরীরের শিরায় শিরায় যেন নতুন পায়ের শব্দ পাচ্ছিল। একটা নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। এতদিন যে বিক্ষিপ্ত মানসিকতায় একই ঘোলাজলে সে পাক খাচ্ছিল তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সে। তার অজ্ঞাতে আরও কিছু মানুষ যে একই রকম চিন্তাভাবনা করছে এবং পরিষ্কার একটা পথের সন্ধান করে নিচ্ছে তা সে এতদিন জানতই না।

এই ক্লীব সমাজব্যবস্থা এবং মেরুদণ্ডহীন লোভী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য একটা সংগঠিত শক্তি দরকার। গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করেই সেটা সম্ভব। ওই স্বার্থপর মন্ত্রীগুলো যাঁরা বিভিন্ন পার্টির চূড়োয় কায়েম হয়ে আছেন দিনের পর দিন, তাঁদের ছুড়ে ফেলে না দিতে পারলে এই দেশে কখনওই মানুষের স্বাধীনতা আসবে না। উনিশশো সাতচল্লিশ আমাদের মুক্তির বছর নয়। সুবাসদারা যে পথে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে সেটাই আসল মুক্তির পথ। কিছু পেতে হলে অবশ্যই দিতে হয়। অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না। বিদেশি রাষ্ট্র যখন মাথার ওপর জুতো চাপিয়ে দেয় তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে মুক্তি পাওয়া অনেক সহজ। প্রতিপক্ষকে চিহ্নিত করতে একটুও অসুবিধে হয় না। কিন্তু এ লড়াই নিজেদের সঙ্গে নিজেদের লড়াই। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম।

অনিমেষের হঠাৎ মনে হল প্রাকবিপ্লব চিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থার হুবহু মিল আছে। লিফলেট-এ মাও সে তুং-এর লং মার্চের কথা বলা আছে। অনিমেষ আগেও সেই সংগ্রামী যাত্রার কাহিনী পড়েছে। কুও মিনতাং-এর নেতারা যখন ধারণা করেছেন চিনের মাটি থেকে

BanglaBook.org

কমিউনিস্টরা মুছে যাচ্ছে তখন উনিশশো চৌত্রিশ সালের ষোলোই অক্টোবর নব্বই হাজার লোকের মুক্তিফৌজ রাতের অন্ধকারে শুরু করেছিল সেই মহাযাত্রা। পনেরো বছর বাদে উনিশশো উনপঞ্চাশে যা চিনকে মুক্ত করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। নব্বুই হাজার কৃষক শ্রমিককে সংগঠিত করেছিলেন মাও সে তুং। মার্চ হত রাতের বেলায়। মুক্তিবাহিনী দু'ভাগে ভাগ হয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করল। যাত্রার চতুর্থ দিনে তারা আচমকা আক্রমণ করে চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নিল। মুক্তিফৌজের প্রধান বাহিনীর সঙ্গী ছিল যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শিশুরা। ছিল খচ্চরের পিঠে চাপানো কারখানার মেশিন, অস্ত্রশস্ত্র, সাংসারিক জিনিস। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে মুক্তিবাহিনীকে। গতি ধীরে হওয়ায় চিয়াং কাইশেক বারংবার আঘাত হেনে চলেছেন ওদের ওপর। দু'দিক থেকে মিছিলকে তাঁর সৈন্যরা আক্রমণ করছে আর মাথার ওপরে মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্ত বিমান থেকে বোমা বর্ষণ চলছে। কিন্তু কিছুতেই দমল না মুক্তিবাহিনী। মানুষ যখন উদ্বুদ্ধ হয় দেশপ্রেমে তখন কোনও প্রতিরোধ তার সামনে মাথা তুলতে পারে না। দেশের এ-পিঠ থেকে ও-পিঠ মিছিলটা এগোচ্ছে। কোনও বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে বোঝানো বা শিক্ষিত করার চেয়ে জনসাধারণকে একত্রিত করার, উদ্বুদ্ধ করার করার এমন কার্যকরী উপায় কেউ ভাবতে পারেনি। এ মিছিল আমাদের মুক্তির, এই বোধ মানুষকে উৎসাহিত করেছিল। নইলে তাতু নদীর ওপর সেদিন অমন ঘটনা ঘটতে পারত না।

নদীটার ওপর মাত্র একটাই সেতু এবং সেটা কাঠের। গণফৌজকে ওই নদী পেরিয়ে যেতে হবে। মিছিল যখন নদীর কাছাকাছি এসে পড়ল তখন চিয়াং কাইশেকের সৈন্যরা মেশিনগান সাজিয়ে বসে গেছে নদীর অন্য পারে। এদিকে চিয়াং-এর অপর বাহিনী ইঁদুরকলে মিছিলকে ঠেসে ধরবার জন্যে পেছন থেকে ধাওয়া করে এল। সেচুয়ানের পার্বত্যঅঞ্চলে এই ভীষণ নদীটির ওপর পুরনো আমলের ভাঙাচোরা কাঠের ঝুলনপুল পার হতে হবে গণফৌজকে। অপর পারে যে মেশিনগানগুলো প্রস্তুত সে খবরও এসেছে।

প্রথম দল এগিয়ে চলল দৃঢ় পদক্ষেপে। সেতুর মাঝামাঝি আসতেই শুরু হয়ে গেল গুলিবর্ষণ। চোখের নিমেষে মানুষগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, লাল হল তাতু নদীর জল। পরের দল বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এগোল ওই ছোট সেতুর ওপর দিয়ে কিন্তু মেশিনগান তাদের আলতো করে তুলে নিল এবারও। এবার গণফৌজ আরও মরিয়া হয়ে উঠল। মৃত্যু যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে মৃত্যুকে ব্যবহার করা যাক জীবনকে অর্জন করতে। এবার কোনও ছোট দল নয়, গণফৌজ নেমে পড়ল সার দিয়ে। মেশিনগানের আঘাতে মানুষ মরছে কিন্তু তার জায়গা নিয়ে পরের জন সেতুর ওপর আরও একটু এগিয়ে আসছে। তার মৃতদেহ যেখানে পড়ছে তা থেকে পরবর্তী মুক্তিসেনা আরও কয়েক পা মিছিলকে এগিয়ে দিচ্ছে। এবার চিয়াং-এর বাহিনী নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করল। ফ্লেম থ্রোয়ার ছুড়ে ওরা ঝুলনপুলের কাঠে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্বলছে সেতু। মাঝপথেই পুড়ে নদীতে পড়ে গেল প্রথম সারির মানুষগুলো। কিন্তু পিছু হঠল না চিনের মুক্তিফৌজ, সেই লকলকে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে তারা এক অমানুষিক কাণ্ড করল। জ্বলন্ত পুলের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে টুপটাপ নদীর বুকে ঝরে যেতে যেতে প্রথম দলটা সেতু পার হল। চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলন্ত শরীর ছুটে আসছে দেখে চিয়াং-এর সৈন্যরা হতভম্ব। কতখানি আবেগ মানুষের বুকে পাহাড় হলে এইভাবে আত্মাহুতি দেওয়া যায় তার সন্ধান ওরা জানত না। এই অতিমানবিক ঘটনা দেখে চিয়াংবাহিনীর সৈন্যরা ভয় পেল। তারা মেশিনগান ছেড়ে পালাতে লাগল এবার। দগ্ধ যারা তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু অর্ধদগ্ধ শ্রান্ত মুক্তিসেনারা এবার ওই পরিত্যক্ত মেশিনগানগুলোর দখল নিল। পাশে আর কোনও বাধা নেই। অবশিষ্ট বাহিনীকে চিয়াং-এরই মেশিনগানের গুলির ছাতির আড়ালে নিরাপদ রেখে ওরা নদী পার করিয়ে নিয়ে এল।

পথে বাধা ছিল অনেক। হিংস্র চিনবিরোধী পার্বত্য উপজাতিদের গুপ্ত আক্রমণের ভয়, সুবিশাল চোরা গহ্বরসঙ্কুল তৃণভূমি অতিক্রম করার সমস্যা। মুক্তিফৌজ ওই পথ পেরিয়ে এল মাও সে তুং–এরই মেশিনগানের গুলির ছাতির আড়ালে নিরাপদ রেখে ওরা নদী পার করিয়ে নিয়ে এল।

পথে বাধা ছিল অনেক। হিংস্র চিনবিরোধী পার্বত্য উপজাতিদের গুপ্ত আক্রমণের ভয়, সুবিশাল চোরা গহ্বরসঙ্কুল তৃণভূমি অতিক্রম করার সমস্যা। মুক্তিফৌজ ওই পথ পেরিয়ে এল মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে। ষোলো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের বরফ ডিঙিয়ে দু' হাজার মাইলের সেই ভয়ঙ্কর তৃণভূমি মাড়িয়ে হিংস্র উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের বিশে অক্টোবর গিয়ে পৌঁছাল পাংও আন্‌-এ। সৃষ্টি হল মুক্ত অঞ্চল। কোনসি প্রদেশের ইয়েনান হল সাতচল্লিশ সাত পর্যন্ত

BanglaBook.org

মুক্তিবাহিনীর রাজধানী। নব্বই হাজার মানুষ নিয়ে শুরু করা যাত্রা তখন তিরিশ হাজারে এসে ঠেকেছে কিন্তু সাফল্য তখন করায়ত্ত। তারপর সেই মুক্ত অঞ্চল ক্রমশ বিস্তৃত হতে লাগল। কিন্তু সেখানেও সমস্যা জমেছিল অনেক।

চিয়াং কাইশেকের শিক্ষিত সৈন্যরা মুক্ত এলাকা দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা আক্রমণ করছে মুক্তিসেনাদের। পার্টির নেতৃত্বে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা পিছু হটতে চাইলেন না। ভাবাবেগে বললেন, 'এত কষ্টে তৈরি করা এই মুক্ত অঞ্চলের এক ইঞ্চি জমিই বা আমরা ছাড়ব কেন ? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র শত্রুকে দিয়ে পালিয়ে যাব ? সব এলাকাতেই প্রতিরোধ করতে হবে।' মাও সে তুংকে তাঁরা বললেন, 'জঙ্গলে পাহাড়ে মার্কসবাদ বিকাশলাভ করে না।'

মাও সে তুং এই মতকে মানলেন না। শত্রুপক্ষ যখন অনেক আধুনিক অস্ত্রে শক্তিশালী তখন মুখোমুখি লড়াই করা ঠিক নয়। বিনা বাধায় শত্রুকে মুক্তাঞ্চলে ঢুকতে দাও। তারপর আমাদের এলাকার মাঝামাঝি এসে যখন ওই বিরাট বাহিনী ছাউনি গেড়ে বসবে তখন হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করব। সেই ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনীকে তারপর আলাদা আলাদা আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গেরিলাযুদ্ধের এই কৌশল বিপ্লবকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিল। মার্কসবাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ইউরোপ থেকে এত দূরে এশিয়ার একটা দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্দিষ্ট প্রয়োগে মাও সে তুং একটি জাতির জন্মান্তর সৃষ্টি করলেন।

লিফলেটের শেষ কথা—এই সংগ্রাম আমাদের একমাত্র পথনির্দেশিকা হোক।

অনিমেষ এখন চোখ বন্ধ করলেই সেই জ্বলন্ত ঝুলনপুলের ওপর ছুটে যাওয়া অগ্নিপুরুষদের দেখতে পাচ্ছিল। এই পথ, একমাত্র পথ।

ত্রিশ

দুদিন মাধবীলতা ইউনিভার্সিটিতে আসেনি। না বলে-কয়ে হঠাৎ ডুব দেবার মেয়েও নয়। অনিমেষ অস্থির হয়ে পড়ল। নিমতার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবার ইচ্ছা হলেও ঠিক সাহস হচ্ছিল না। সাহস না হবার কারণ ইদানীং ওদের বাড়িতে যে গরম হাওয়া বইছে তাতে ওর যাওয়াটা আগুনে আরও ঘি ঢালার মতো না হয়ে যায়। মাধবীলতার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সহপাঠীরা ইতিমধ্যে জেনে গেছে। কিন্তু অনিমেষ কারও সঙ্গে যেচে মাধবীলতাকে নিয়ে কথা বলেনি। তাই এখন কী করা যায় তা আলোচনার মতো কোনও বন্ধুকে পেল না সে। পরমহংস থাকলে একরকম হত কিন্তু সে এখন ইউনিভার্সিটিতে শুধু নামটাই রেখেছে। ওর বাবা রিটায়ার্ড হবার সময় ছেলেকে নিজের ব্যাঙ্কে বসিয়ে গেছেন।

গতকাল একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে ও কফিহাউসের দিকে হাঁটছিল। এমন সময় সুদীপ ওকে ডাকল, 'কী ব্যাপার অনিমেষ, তোমার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছিলাম তোমার খোঁজে হোস্টেলে কাউকে পাঠাব। তুমি রোজ ক্লাশ করছ ?'

শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'

'সেকী! তা হলে আমাদের সঙ্গে দেখা করছ না কেন ?'

'আজকাল আর সময় পাই না। পরীক্ষা আসছে।' কথাটা বলেই অনিমেষের মনে হল এটা কোনও যুক্তি নয়। বিমানরা এ-বছর পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের আশায় বসে আছে। ওদের তো পরীক্ষার জন্য কাজকর্ম করতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

সুদীপ চুরুট বের করল, 'তুমি কি আর ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইছ না ?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল অনিমেষ। না, আর মিথ্যে কথা বলে কী লাভ! সে স্পষ্ট বলল, 'না।'

'কেন ?' সুদীপ চমকে উঠল।

'আমার মনের সঙ্গে আপনাদের কাজকর্ম মিলছে না। যে-পথটাকে সমর্থন করতে পারছি না সে-পথে হাঁটতে আমার বিবেকে বাধে।'

'তুমি কি ভেবেচিন্তে কথা বলছ ?'

'না ভেবে বলছি এ ধারণা কেন হচ্ছে ?'

'কারণ তোমার সম্পর্কে পার্টির নেতাদের কেউ কেউ ইন্টারেস্টেড। তোমার কি কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ?'

BanglaBook.org

'না তো।' অনিমেষের মনে পড়ল সেই ভদ্রলোককে যিনি কাকার হোটেলে তাকে কৃতার্থ করতে চেয়েছিলেন।

সুদীপকে খুব হতভম্ব দেখাচ্ছিল, 'অনিমেষ, তুমি কি নেক্সট ইলেকশনে কনটেস্ট করছ না? তুমি নিশ্চয়ই জানো এবার তোমাকে কী পোর্টফলিয়ো দেওয়া হবে।'

'না সুদীপদা। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাদের পথ আমার জন্য নয়।'

সুদীপের মুখটা এখন ভেঙেচুরে একাকার। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

অনিমেষ হেসে বলল, 'চলি, যদি চান তো আমার রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেব। কারণ এখনও তো কমিটি মেম্বার আছি আমি।'

সুদীপ হঠাৎ বলে উঠল, ' তোমার সঙ্গে কি সুবাস সেনের যোগাযোগ হয়েছে?'

'কেন বলুন তো?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আপনি বুদ্ধিমান।' অনিমেষ আর দাঁড়াল না।

রাস্তায় নেমে মন খুব হালকা হয়ে গেল। ব্যাপারটা আজ নয় কাল পরিষ্কার করতেই হত। আজ সুদীপ নিজে এগিয়ে এসে সেটা সহজ করে দিল। সুদীপ নিশ্চয়ই এখন বিমানকে গিয়ে এ কথা জানাবে এবং তারপর বাম ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে অনিমেষের সম্পর্ক যে নেই এ কথা ঘোষণা করা হবে। অনিমেষের মনে হচ্ছিল, অনেকদিন জ্বর ভোগের পর যেন আজ তার শরীর নিরুত্তাপ।

কফিহাউসে ওদের ক্লাশের দু' তিনজন ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল, অনিমেষ ওদের টেবিলে গিয়ে বসল। একটু অন্যমনস্ক ছিল বলে প্রথমে টের পায়নি, খেয়াল হতে বুঝল ওরা যেন কথাবার্তায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা এতক্ষণ ওরা যা আলোচনা করছিল সে এসে পড়ায় তা পালটেছে। অনিমেষ বলল, 'আমি কি তোমাদের কোনও অসুবিধে করলাম?'

একজন যার নাম প্রশান্ত হাসল, 'না না, বসো।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে করলাম। তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলে?'

'ও ছেড়ে দাও। তোমার ভাল লাগবে না।'

'ভাল লাগবে না কেন?'

'আমরা সাধারণ মানুষ আর তুমি রাজনৈতিক কর্মী, তাই।'

'প্রথম কথা তুমি যেটি বললে আমি তা নই। আর একজন রাজনৈতিক কর্মী যদি সাধারণ মানুষ না হন তা হলে তিনি ক্রিমিন্যাল। বলো।'

রোগা মতন একটি ছেলে, অনিমেষ তার নাম জানে না, বলল, 'সব কথা তো সবার সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

অনিমেষ একটু হোঁচট খেল। সে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'সরি।'

প্রশান্ত বলল, 'না না অনিমেষ, তোমার কিছু মনে করার কারণ নেই। আমরা স্ল্যাং নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমার মতো সিরিয়াস ছেলের সামনে এ সব কথা বলা ঠিক নয় তাই বলছি না।'

'স্ল্যাং? মানে অশ্লীল কথা?' চোখ বড় বড় করল অনিমেষ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এরা তিনজন নিজেরা যা আলোচনা করতে পারছে সহপাঠী হয়েও সে আলোচনায় তাকে জড়াতে দ্বিধা করছে। সামান্য ইউনিয়ন করেই সে এ ভাবে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলেছে। এদের সঙ্গে মিশবার জেদ এল ওর। বলল, 'খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমি শুনতে পারি না?'

প্রশান্ত বলল, 'কথ্যভাষায় যে অশ্লীল গালাগাল চলে আসছে তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন পালটে যাচ্ছে। যেমন ধরো এককালে কেউ শালা শব্দটা ব্যবহার করে মনের ঝাল মেটাত। তখন গুরুজন বা মেয়েদের সামনে কথাটা ব্যবহার করতে সাহস হত না। এই শব্দটা প্রয়োগ করলে মারামারি পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখন ওটা জলের মতো সহজ, মেয়েরাও বলে। এবং এখনকার রকবাজ ছেলেরা শালা ব্যবহারই করে না। এরকম আরও আছে ভোঁদা, উজবুক, বুদ্ধু এইসব শব্দ ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে।'

রোগা ছেলেটি বলল, 'এখন দু-অক্ষর চার অক্ষরের শব্দ এগুলোকে রিপ্লেস করেছে। মজার কথা হল এরা যখন ওই শব্দগুলোকে উচ্চারণ করে তখন তার অর্থ বা অশ্লীলতা সম্পর্কে কোনওরকম সচেতন না হয়েই করে। জিভের ডগায় এত সহজে এসে যায় যে ওরা তা নিজেই জানে না। কোনওদিন দেখব গল্প-উপন্যাসেও শালা শব্দের মতো এগুলো খুব স্বচ্ছন্দে লেখা হচ্ছে।'

BanglaBook.org

অনিমেষের বেশ মজা লাগছিল বিষয়টা শুনতে। সত্যি কথাই, পথেঘাটে আজকাল কিছু ছেলে পুরুষাঙ্গের একটি প্রতিশব্দ বিকৃতভাবে শালার বিকল্প হিসেবে বাক্যে ব্যবহার করে। তা নিয়ে তাদের সত্যি কোনও বিকার নেই। ট্রামে–বাসে প্রকাশ্যে ওরা বলে যায় এবং আমরা সেগুলো নীরবে শুনে থাকি। একটা শব্দ শ্লীল কি অশ্লীল তা আমরাই ঠিক করে নিই, আমরাই তা পরিবর্তন করতে পারি।

অনিমেষ বলল, 'কথাটা ঠিক। তবে শুধু বাংলা ভাষা কেন, পৃথিবীর সব ভাষাতেই এটা হচ্ছে। লেখাতেও আসবে বইকী।'

রোগা ছেলেটি বলল, 'শব্দ থেকে যদি গন্ধ বের হয় তা হলে আমরা চিৎকার করি। কিন্তু কতগুলো নিরীহ শব্দ পাশাপাশি দাঁড়ালে নিরীহত্ব হারিয়ে অশ্লীল শব্দের চেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে। তখন?'

অনিমেষ বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

ছেলেটি হাসল, 'এটা অবশ্য আমার আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার লাইন আসে সেগুলোকে আপাতচোখে খুব নিরীহ দেখায় কিন্তু একটু ভাবলেই তা থেকে অন্য মানে বেরিয়ে আসে।'

ভুরু কোঁচকাল অনিমেষ, 'অন্য মানে মানে? কী যা তা বলছ?'

ছেলেটির হাসি থামছিল না। সে হাত নেড়ে বলল, 'এটা তো যে ভাবছে তার ভাবনার ওপর নির্ভর করে।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ হো-হো করে হেসে উঠল।

ছেলেটি ততক্ষণে খুব সিরিয়াস, বলল, 'তা হলে বুঝতেই পারছ যে শুনছে সে-ও কেমন করে শুনছে তার ওপর শ্লীল অশ্লীল নির্ভর করে।'

অনিমেষ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখ দরজার দিকে যেতেই সে চুপ করে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আসছি।'

মাধবীলতা তখন হল ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। অনিমেষকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এল, 'তোমার এখন কোনও কাজ আছে?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে চলো।' ওকে খুব চঞ্চল দেখাচ্ছিল।

'এখানে বসবে না?' অনিমেষ ওকে বুঝতে পারছিল না।

'না। বড্ড ভিড় এখানে, কথা বলা যাবে না।' মাধবীলতা হলের বাইরে বেরিয়ে আসতে অনিমেষ সঙ্গী হল। খুব চঞ্চল দেখাচ্ছে ওকে, মুখে ঘাম, কপালে খুচরো চুল এসে পড়েছে। দুদিন অনুপস্থিত এবং এইরকম চঞ্চলতার কারণ না জানা অবধি অনিমেষের স্বস্তি হচ্ছিল না। খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। জামাকাপড়ও আজ অন্যদিনের মতো উজ্জ্বল নয়।

কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'কলেজ স্কোয়ারে বসবে?'

একটু ভেবে মাধবীলতা জানাল, 'না, খিদেও পেয়েছে, বসন্তে চলো।' তারপর হেসে চিমটি কাটল, 'তোমার এখনও বয়স বাড়ল না।'

'মানে?'

'এই দুপুর রোদে কলেজ স্কোয়ারে কারা বসে মশাই?' ঠোঁট টেপা অবস্থায় গলা দিয়ে একরকম হাসির আওয়াজ তুলল মাধবীলতা।

বসন্তের বারান্দায় বসে দুটো মোগলাই পরোটার অর্ডার দিল মাধবীলতা। দিয়ে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেল। অনিমেষ দেখল ওর গলার নীলচে চামড়ার ভেতর দিয়ে জলটা যে নেমে যাচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। রুমালে মুখ মুছে একটু শান্ত হলে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলো তো কী হয়েছে?'

মাধবীলতা ওর চোখের দিকে তাকাল। কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত দুষ্টুমিমাখা হাসিতে মাধবীলতার চোখদুটোকে উজ্জ্বল দেখল অনিমেষ। কথা না বলে তাকিয়ে থাকা সময়টায় বড় অস্বস্তি হয়। সে পরিস্থিতিটাকে সহজ করার জন্য বলল, 'দু'দিন এলে না কেন, শরীর খারাপ হয়েছিল?'

মাধবীলতা মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে? বাড়িতে কোনও গোলমাল হয়েছিল?'

এবার একটু গম্ভীর হল মাধবীলতা, 'সে তো লেগেই আছে। দু'দিন দ্যাখোনি, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।'

BanglaBook.org

অনিমেষ বলল, 'হতাম যদি জানতাম আমি গেলে তুমি কোনও অসুবিধেয় পড়বে না। তবে আর দু'তিনদিন না এলে কী করতাম জানি না।'

'থাক, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। এই জানো, আমার চাকরিটা হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে বলল মাধবীলতা। 'হঠাৎই।'

খুব আনন্দ হল অনিমেষের। একটু জোরেই সে বলে উঠল, 'সত্যি?'

নিঃশব্দে হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল মাধবীলতা, 'হ্যাঁ।'

পরক্ষণেই অনিমেষের মনে বিষণ্ণতা ছড়াল, 'কিন্তু, তুমি কি পরীক্ষা দেবে না?'

মাধবীলতা বলল, 'কেন দেব না? ক্লাশ তো প্রায় শেষ হয়ে এল, বাকিটা মাঝে মাঝে এসে ম্যানেজ করে যাব। আর পড়াশুনার ব্যাপারে তুমি রইলে।'

'আমি?'

'বাঃ, একসময় আমি তোমার নোটস টুকেছি এবার তুমি করবে আমার জন্য।' বলে হাসতে লাগল মাধবীলতা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তোমাকে আমার জন্য মোটেই চিন্তা করতে হবে না মশাই। ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

অনিমেষ উজ্জ্বল হল, 'যাক, তোমার খুব ভাল কপাল। কেউ চাকরি পাচ্ছে এ খবর সচরাচর শোনা যায় না।'

মাধবীলতা বলল, 'কপাল যদি বলো তা হলে সেটা আমার একার নয়। আমাদের।'

অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে অপলকে তাকাল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল এখনই ওকে নিয়ে সরিৎশেখর এবং হেমলতার কাছে নিয়ে যায়।

মাধবীলতা বলল, 'এই, ওভাবে তাকাবে না।'

'কীভাবে?'

'জানি না। আমাদের এখনও অনেক কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওভাবে তাকালে আমার সবকিছু গোলামাল হয়ে যায়।'

অনিমেষ হঠাৎ বুকের মধ্যে এক ধরনের চাপ অনুভব করল। এই সময় অবধি তার যা কিছু ভাবনা চিন্তা তা সে একাই করেছে। ছেলেবেলা থেকেই একা একা থাকার জন্য এটা হতে পারে। কিন্তু মাধবীলতার বন্ধুত্ব পাওয়ার পর নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে হয়, যা এর আগে কখনও হয়নি।

পুরুষ মানুষ যদি কোনও নারীর আষ্টেপৃষ্ঠে জাড়ানো ভালবাসা না পায় তা হলে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন।

মাধবীলতা বলল, 'অনি, আবার কী ভাবছ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, ডাকটা কত মিষ্টি লাগল ওর। এই প্রথম তাকে অনি বলে ডাকল মাধবীলতা। সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি এবার থেকে তোমার দেখা পাব কী করে? তুমি রোজ কি আসবে?'

'কেন আসব না?'

'এতটা উজানে?'

'আসব। তোমাকে না দেখলে আমার ভাল লাগে না।'

'এই দু'দিন তো দেখলাম!'

রাগ করতে গিয়েও করল না মাধবীলতা, 'অমন করে বোলো না। দু'দিন ধরে এই চাকরিটার জন্য যা চরকিবাজি করেছি? আসতে পারিনি বলে আমারই খারাপ লেগেছে। ভেবেছি একেবারে এসে তোমাকে সুখবরটা দেব। দিলাম।'

খাওয়া হয়ে গেলে মাধবীলতা কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখল। তারপর বলল, 'চলো!' অনিমেষ বলল, 'কোথায়?'

'আমি যদি বলি নরকে, তুমি যাবে না?'

'চিন্তা করব। কারণ সেখানে নাকি বিশাল কড়াই-এ গরম তেল দিনরাত ফোটে, গেলেই চুবিয়ে দেবে।'

'ওঃ, কথায় তোমার সঙ্গে আমি পারব না। আমি শ্যামবাজার যাব। তুমি আমার সঙ্গে চলো।' প্লেট থেকে মৌরি তুলে দাঁতে কাটল মাধবীলতা।

'কাজটা কী?'

'বাসস্থান খুঁজতে।'

BanglaBook.org

'বাসস্থান ?' অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল।

'আমার একটা থাকার জায়গা চাই না ? দুটো লেডিস হোস্টেলের খবর পেয়েছি। চলো, গিয়ে দেখি সেখানে জায়গা আছে কি না।' গম্ভীর গলায় জানাল মাধবীলতা। এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ল অনিমেষের। চাকরি পেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে বলে জানিয়েছিল মাধবীলতা। সেটা যে এতটা স্থির সিদ্ধান্ত তা অনুমান করতে পারেনি। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কিছু করে ফেললে সারা জীবন মেয়েটাকে এ জন্য আফশোস করতে হবে। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কি এতই সিরিয়াস ?'

'মানে ?' ভুরু কোঁচকাল মাধবীলতা।

'এখনই হোস্টেলে থাকতে হবে এমন কিছু কি হয়েছে ?'

'তুমি কী বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না।'

'যদি অ্যাডজাস্ট করে বাড়িতে থাকা যায়—।'

'অনি, একটা মেয়ে ঠিক কীরকম পরিস্থিতি হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোস্টেলে উঠতে চায় তা তুমি বুঝবে না।' তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি ভয় হচ্ছে ?'

'ভয় ? কী ব্যাপারে ?'

'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তুমি জড়িয়ে পড়বে—।' মাধবীলতার গলা ভারী হয়ে আচমকা থেমে গেল।

সিসের বল যেন আচমকা কেউ অনিমেষের বুকের ভেতর গড়িয়ে দিল। সে দ্রুত মাধবীলতার হাত ধরে বলল, 'ছিঃ।'

কিছুক্ষণ সময় লাগল সহজ হতে। মাধবীলতা বলল, 'বাবা বলেছেন যদি বিয়ের ব্যাপারে আমি স্বাধীনতা চাই তা হলে আর একমাসের মধ্যে যেন নিজের ব্যবস্থা করে বাড়ি থেকে চলে যাই। শর্ত দিয়েছেন কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ওঠা চলবে না। অনেক ভেবেছি। তোমাকে ভালবাসার পর আর অন্য কোনও পুরুষকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না। এইসময় স্কুলের চাকরিটা না পাওয়া গেলে যে কী করতাম জানি না। আমি তোমার কাছে তো কখনও কিছু চাইব না অনি, শুধু অনুরোধ, কখনও আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে না।'

অনিমেষ এতক্ষণ চুপচাপ কথাগুলো শুনছিল। শুনতে শুনতে ওর মনে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে মাধবীলতার উপযুক্ত হতে হবে। এই মেয়েটির সামান্য অসম্মান মানেই তার বেঁচে থাকাটা লজ্জার। সে উঠে দাঁড়াল, 'চলো।'

মাধবীলতা মাথা নিচু করে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ নীরবে চলতে চলতে অনিমেষের হঠাৎ মনে হল এই মেয়েটির সঙ্গে সেই মেয়েটির কোনও মিল নেই। ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম আলাপের দিন যে মেয়েটি ওর সঙ্গে শেয়ালদা অবদি হেঁটে গিয়েছিল সে ছিল ঝরনার মতো তেজী ছটফটে। আর এখন যে ওর সঙ্গে হাঁটছে সে নদীর মতো গম্ভীর, গভীর। প্রথমজনের সঙ্গে কথার খেলা করা যায়, এর মধ্যে সব কথা ডুবিয়ে দিতে হয়।

অনিমেষ মনে মনে বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো।'

কলেজ স্ট্রিটের ভিড়ের মধ্যে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাধবীলতা ওর হাত স্পর্শ করল। হয়তো কাকতালীয় কিন্তু অনিমেষ শিহরিত হল। ওর মনে হল, মুখ ফুটে না বললেও মাধবীলতা ওর কথা বুঝতে পেরেছে।

রাজবল্লভ পাড়ার কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেল আছে, এটুকুই জানত মাধবীলতা। সেখানে পৌঁছাতে বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এল। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই হদিস পাওয়া গেল। গিরিশ এভিন্যুতে ঢুকে একটা গলির মধ্যে হোস্টেলটা। মাধবীলতাই কথা বলল। অনিমেষ বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মিনিট বাদে বেরিয়ে এসে হাসল, 'হল না।'

'সিট নেই ?'

'নাঃ। মাস কয়েক বাদে একটা খালি হতে পারে।'

'যাচ্চলে। মেয়েদের হোস্টেলেও এত ভিড় ?'

'কী কথা বলছ ?' মাধবীলতা কপালে ভাঁজ আনল, 'কলকাতায় মেয়েদের একা থাকার ক'টা জায়গা আছে মশাই! পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের হোস্টেল, কিন্তু কোনও মেয়ে একা থাকবে এটাই তোমরা ভাবতে পারো না। এবার দেশবন্ধু পার্কের কাছে যাব।'

'ওখানেও যদি না পাওয়া যায়!'

'অন্য কোথাও দেখতে হবে।'

BanglaBook.org

'ধরো, কলকাতার কোথাও যদি পাওয়া না যায়!'

'না আমি ধরতে পারব না। আমার দরকার তাই পেতে হবে।'

কিন্তু দেশবন্ধু পার্কেও জায়গা পাওয়া গেল না। হোস্টেলের পরিচালিকার কাছে জানা গেল আমহার্স্ট স্ট্রিটে আর একটি হোস্টেল আছে চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য। এছাড়া আরও দুটো মেস আছে উত্তর কলকাতায় যা মেয়েরাই চালান। মাধবীলতা নাছোড়বান্দা হল, আজই সে সবগুলোর খোঁজ নেবে। কারণ একদিন দেরি হলে অন্য কেউ সুযোগটা নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু অনিমেষ রাজি হচ্ছিল না। সন্ধে হয়ে আসছে, নিমতায় ফিরতে রাত হয়ে যাবে মাধবীলতার। এখন বাড়িতে যে টেনশন চলছে তাতে বেশি রাত করে ফেরা উচিত নয়। মাধবীলতাকে বোঝাল, হোস্টেলগুলোতে গিয়ে আজই খোঁজ নেবে সে, মাধবীলতার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি খালি থাকে কোথাও তা হলে সে ববস্থা করে ফেলবে। কথাটা শুনে মাধবীলতা ব্যাগ খুলে একশো টাকার নোট বের করল, 'তা হলে এটা রাখো, ব্যবস্থা করতে হলে তো টাকা লাগবে।'

অনিমেষ টাকাটার দিকে তাকাল। কথাটা সত্যি। ওই টাকাটা হাত পেতে নিতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ওর। তার উচিত নিজেই ওটা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখন তার পক্ষে সেটা অসম্ভব। মাধবীলতা বলল, 'এটা আমার জমানো টাকা। নাও।'

টাকাটা নিলেও মন থেকে কুয়াশা দূর হল না। টাকা দরকার। নিজে উপার্জন না করলে পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা মাঝে মাঝে মুশকিল হয়। সঙ্গে এর পালটা একটা যুক্তি মনে এলেও অনিমেষ স্বস্তি পেল না।

মোহনলাল স্ট্রিট ধরে ওরা হেঁটে আসছিল। হঠাৎ অনিমেষ নিজের নামটা শুনতে পেল। মহিলাকণ্ঠ, মাধবীলতাও শুনেছিল। পেছন ফিরে আবছা অন্ধকারে কাউকে দেখতে না পেয়ে অনিমেষ বলল, ' কেউ আমাকে ডাকল, না?'

'তাই তো শুনলাম।'

এমন সময় একটি বাচ্চা মেয়ে ছুটতে ছুটতে পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আপনাকে ডাকছে।'

' কে?'

'বউদি।'

অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাল। বউদিটি আবার কে? সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক বলছ তো? অন্য কাউকে ডাকতে বলেনি তো তোমাকে?'

মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে বেণী নাচাল, ' মোটেই না। ওপর থেকে তোমাদের দেখে বলল ওই লম্বা ভদ্রলোক আর হলুদ শাড়িপরা মেয়েটাকে ডেকে আন।'

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বউদির নাম কী?'

'জানি না। আমি অন্য বাড়িতে থাকি।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করব?'

'যাও একবার দেখে এসো। আমি দাঁড়াচ্ছি।'

'কিন্তু তোমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া কে না কে, অন্ধকারে ভুলও করতে পারে। চলো, একসঙ্গে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েই ফিরে আসি।' অনিমেষের কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাধবীলতা গলিতে ঢুকল। একটু এঁকেবেঁকে একটা দোতলা বাড়ির সিঁড়ির কাছে গিয়ে মেয়েটি বলল, 'ওপরে চলে যান।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে নীলা হাসছে।

একত্রিশ

সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি আর কালো জামা নীলার শরীরে, কিন্তু শরীরটাকেই চিনতে কষ্ট হয়। এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে নীলার চেহারায় অজস্র ধুলো জমা পড়েছে। গালের হনু সামান্য উঁচু হয়েছে, চোখ ভেতরে।

অনিমেষের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা হাসল। কোনও কোনও মেয়ে আছে সময় যার কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেও হাসিটাকে দখল করতে পারে না। নীলার এই হাসি সেইরকম, অহঙ্কারী। বলল, 'অমন করে কী দেখছ, এসো।'

BanglaBook.org

'তুমি! এখানে?' অনিমেষ এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে।

'এখানেই তো থাকি। আমাদের বাড়ি। এসো ঘরে এসো।'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাল। ওর চোখে কিছুটা কৌতূহল কিছুটা বিব্রত ভাব। ইশারায় ওকে নিশ্চিন্ত করে সঙ্গে আসতে বলল সে। নীলার পেছন পেছন বারান্দা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরে ঢুকে নীলা বলল, 'এ পাশের জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম তুমি যাচ্ছ। আমি তোমার নাম ধরে চেঁচিয়েছিলাম। তুমি বুঝতে পারোনি, না?'

'কেউ আমাকে ডাকছে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু —।' অনিমেষ হাসল। নীলার এই ঘরের সঙ্গে ওর হোস্টেলের কোনও ফারাক নেই। আসবাব বলতে একটা বড় তক্তাপোশ, বিছানায় চাদর পাতা, এক কোনায় আলনায় কয়েকটা ময়লা কাপড় ঝুলছে, ঘরের অন্য কোনায় স্টোভ এবং রান্নার জিনিসপত্র। ও পাশের ঘরে থেকে নীলা দুটো কাঠের চেয়ার টানতে টানতে নিয়ে এল। এসে বলল, 'এখনও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারিনি। বসো।'

বাবার মুখে নীলার ব্যাপারটা শুনেছিল সে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এই পর্যায়ে তা ভাবতে পারেনি। দেবব্রতবাবুর বাড়িতে সে যখন ছিল তখন দেখেছে ওঁরা কী বিলাসের মধ্যে বাস করতেন। সেই নীলা এখন যে ঘরটাকে আমার ঘর বলছে তার সঙ্গে ওই জীবনটাকে একটুও মেলানো যায় না। সে ঠিক করল নীলা যদি নিজে থেকে কিছু না বলে তা হলে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করবে না। নীলাকে চিরকাল এইরকম পরিবেশে দেখেছে এমন ভঙ্গি করবে।

মাধবীলতাকে বসতে বলে সে অন্য চেয়ারটা টেনে নিল। নিয়ে বলল, ' তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম মাধবীলতা।'

মাধবীলতা হেসে বলল, 'আপনাকে আমি চিনি।'

নীলা চোখ কপালে তুলল, 'ওমা, কেমন করে?'

'ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি। আপনি বোধহয় আমার সিনিয়র ছিলেন।'

নীলা চোখে হাসল, ' তোমরা এক ক্লাশে পড়ো বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো এক-বছরের সিনিয়ার হবই। কিন্তু আমি তো অনেকদিন ও পাট ছেড়েছি। আমাকে চেনার তো কোনও কারণ নেই। না না, তাই বলি কী করে, আমি যে অনেক ছেলের সঙ্গে ঘুরতাম, চেনা স্বাভাবিক।' হাসল আবার সে। তারপর অনিমেষকে বলল, 'তোমার চেহারা কিন্তু বেশ পালটে যাচ্ছে।'

'কী রকম হচ্ছে?'

'মফস্বলের গন্ধটা আর একদম নেই। বেশ অ্যাট্রাকটিভ হয়েছে।'

কথাটা বলার ধরনে এমন মজা ছিল যে মাধবীলতাও হেসে ফেলল। অনিমেষ বলল, 'তুমি একটুও পালটালে না।'

'কে বলল? তুমি এই ঘরে বসেও বলছ আমি আগের মতো আছি?'

অনিমেষ যদি ভুল না করে তা হলে সে তীক্ষ্ণ অভিমানটাকে স্পর্শ করল যেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হল সে। এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় সে। কিন্তু প্রশ্নটা করে নীলা ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'আমি তোমার কথা বলার ধরনটায় পরিবর্তন না হওয়াটাই বলতে চেয়েছিলাম, অন্য কিছু নয়।'

নীলা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তারপর খুব দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল, 'এদিকে এসেছিলে কোথায়?

মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হাসল। অনিমেষ সহজ গলায় বলল, 'ওর জন্য একটা হোস্টেল দেখতে, জায়গা পাওয়া গেল না।'

'তুমি কি বাইরে থাকো? এই, তখন থেকে তোমাকে তুমি বলে যাচ্ছি — কিছু মনে কোরো না। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো।' নীলা আবার সহজ।

'না না ঠিক আছে।' মাধবীলতা এমন ভাবে মাথা নাড়ল যেন তুমি বলাতে সে কিছু মনে করছে না কিন্তু নীলার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিল না সে। ব্যাপারটা যে নীলার বুঝতে অসুবিধে হয়নি তা অনিমেষের চোখ এড়াল না। কারণ নীলার ঠোঁটে হাসিটাকে চলকে উঠেই মিলিয়ে যেতে দেখল সে। এবার নীলা দরজার কাছে গিয়ে সেই বাচ্চা মেয়েটাকে ডেকে আনল। তারপর একটা ছোট কেটলি ঘরের কোনা থেকে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে নিচু গলায় কিছু বলতেই সে ঘাড় নেড়ে ছুটে গেল।

BanglaBook.org

সেদিকে তাকিয়ে নীলা বলল, 'জানো অনিমেষ, এই বাচ্চাটা আমাকে খুব ভালবাসে। ও না থাকলে আমি খুব অসুবিধের পড়তাম।'

'কে হয় তোমার ?'

'আমার! কেউ না। নীচের ভাড়াটেদের মেয়ে।'

মাধবীলতা বলল, 'আপনি কি আমাদের জন্য কিছু আনতে পাঠালেন ?'

নীলা বলল, 'কেন ?'

মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকাল। নীলা প্রশ্ন করছে একই ভঙ্গিতে এবং তাতে এক ধরনের জেদ ফুটে উঠছে। মাধবীলতা নিচু গলায় বলল, 'আমার ফেরার তাড়া ছিল।'

' বেশি দেরি হবে না। রাস্তার ওপাশেই চায়ের দোকান।' নীলা নিশ্বাস ফেলল।

নীলার বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা নেই, দোকান থেকে আনাচ্ছে, অনিমেষ কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। তা ছাড়া ও যতই সহজ ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করুক, কোথাও একটা অস্বস্তি আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। নীলার বর্তমান অবস্থার কারণ না জানলে কথাবার্তাও বেশিক্ষণ চালানো যায় না। সে হেসে বলল, 'তুমি বাড়িতে চা তৈরি করো না ?'

নীলা মাথা নাড়ল, 'সামনেই দোকান রয়েছে, ঝামেলা করে কী হবে ?'

'ভদ্রলোককে দেখছি না!'

'ও বেরিয়েছে। আসবে এক্ষুনি। তোমাদের তো আবার হাতে সময় নেই, না হলে বলতাম একটু বসে যাও।' নীলা কথাগুলো শেষ করতেই নীচে থেকে একটা লোক উঠে এল। আধবয়সী পাকানো চেহারা।

'দিদিমণি, আমি নন্দ।'

'নন্দ, নন্দ কে ?'

'অ। দাদাবাবু বুঝি আমার কথা বলেনি ?'

'না তো।'

'আমার নাম নন্দ বকসী। দাদাবাবু আমাকে সাবলেটের কথা বলেছিল। তা খুব ভাল ভাড়াটে আছে সন্ধানে। দেড়শো অবধি রাজি করানো যাবে মনে হয়। ঘরটা একটু যদি দেখান।' লোকটা খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল।

নীলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও ভাড়া দেবে বলেছে ?'

'ভাড়া মানে, আইনসম্মত ভাড়া নয়। সাবলেট।' নন্দ হাসল, 'যা বাজার পড়েছে দিদিমণি, চিন্তা করবেন না, দাদাবাবু আমাকে সব বলেছে। খুব ছোট ফ্যামেলি, স্বামী-স্ত্রী আর তিনটে বাচ্চা।'

নীলা বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু, একটু যদি ঘুরে আসেন অসুবিধে হবে ?'

'না না, বিন্দুমাত্র নয়। এই ঘণ্টাখানেক বাদে এলে হবে ?'

'হ্যাঁ।'

নন্দ বকসী চলে গেলে নীলা ঘুরে বলল, 'এমন জ্বালিয়ে মারে না লোকগুলো! বাড়তি ঘর আছে একটু জানালেই হল।'

অনিমেষ লুকোচুরিটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। নীলা অন্তত আর্থিক সুখে নেই। হঠাৎ ওর মনে হল মাধবীলতার জন্য ওরা হোস্টেল খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার চেয়ে নীলাকে বললে কেমন হয়! নীলারা যখন ঘরটা ভাড়া দিচ্ছেই তখন—। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে থাকবে তার সঙ্গে কথা না বলে প্রস্তাবটা করা উচিত হবে না।

এইসময় মেয়েটি চা নিয়ে এল। অনিমেষ দেখল যেভাবে হোস্টেলে বাইরে থেকে চা আনিয়ে ওরা ভাগ করে খায় সেভাবে নীলা দুটো কাপ আর একটা টিন থেকে বিস্কুট বের করে ডিশে ঢেলে এগিয়ে দিল।

চায়ের স্বাদ এত বারোয়ারি যে কারও ঘরে বসে খেতে ইচ্ছে করে না। নীলা সেটা বেশ আরামেই চুমুক দিতে দিতে আচমকা বলল, 'আমার একটা চাকরি দরকার অনিমেষ।'

'চাকরি!' অনিমেষ হোঁচট খেল।

'হ্যাঁ। ওর ওপর খুব প্রেশার পড়ছে। একা সামলে উঠতে পারছে না। অনেকগুলো স্কুলে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু হচ্ছে না। কোথাও মেয়েদের চাকরি খালি আছে জানলে আমাকে জানিয়ো, কেমন?' নীলা তক্তাপোশটার ওপর এসে বসল।

অনিমেষ আর পারছিল না, এবার জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, ' মেসোমশাই, মানে তোমার বাবা এ

BanglaBook.org

সব জানেন ?'

কপালে ভাঁজ পড়ল নীলার, 'এ সব মানে ?'

'তুমি চাকরি খুঁজছ। খুব প্রয়োজন—।'

'নাঃ। অন্তত আমরা বলতে যাইনি। সত্যি কথা বলতে কি বাবার সঙ্গে সেই বাড়ি ছাড়ার দিন থেকে আমার দেখা নেই।'

'নেই কেন ?'

'তুমি কিছু শোনোনি ?'

মহীতোষকে লেখা দেবব্রতবাবুর চিঠির কথা মনে পড়তে ইচ্ছে করেই সে না বলল না, 'শুনেছি মানে এইটুকু যে তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে বাড়ি থেকে চলে এসেছ, ব্যস।'

'তুমি সেটা শোনার পর আমাদের বাড়িতে যাওনি ?'

'না।'

'কেন ?'

'অস্বস্তি হচ্ছিল।'

'কেন ?'

'ওঁরা ব্যাপারটাকে কীভাবে নিয়েছেন জানি না তাই।'

'মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাপ-মা কী ভাবে নেয় ? ওঃ অনিমেষ, তুমি এখনও মফস্বলি রয়ে গেছ। তুমি গেলে অবশ্য খুব খাতির পেতে কারণ তোমার সঙ্গে আমি বের হইনি। কি ভাই, তুমি কিছু মনে করছ না তো !' শেষের কথাটা মাধবীলতার উদ্দেশ্যে বলা। সে ওটা শুনে সামান্য হাসল।

চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে অনিমেষ সোজা হয়ে বসল, 'এমন কী ব্যাপার হয়েছিল যার জন্য একদম বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল ?'

'পে-রে-ম।' চিবুকে, ঠোঁটে হাসি চলকে উঠল নীলার। নিজেকে নিয়ে এরকম ঠাট্টা চেনাশোনা মেয়ের মধ্যে একমাত্র নীলাই করতে পারে। অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল কিন্তু কথাটা এখনকার নীলার মুখে একদম মানাচ্ছে না। নীলা এই সামান্য সময়েই বেশ ভারী, সেই চটুলতা আর নেই। ইচ্ছাকৃত ভাবে পুরনো সময়টাকে ধরার চেষ্টা কথাবার্তায়।

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'তোমাকে যা দেখেছি তার সঙ্গে এই অবস্থাটা মেলাতে পারছি না।'

হঠাৎ ফোঁস করে উঠল নীলা, 'কেন পারছ না ?'

'কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

'সেটা তোমার অক্ষমতা, আমার নয়।'

এইসময় মাধবীলতা উঠে দাঁড়াল, 'তোমরা না-হয় কথা বলো, আমি চলি।'

নীলা বলল, 'ওমা তা কি হয়! তোমাকে ছেড়ে অনিমেষ এখানে গল্প করবে বসে, এটা কি ভাল দেখায় ?'

মাধবীলতা বলল, 'তাতে কী হয়েছে ?'

'আমার সহ্য হবে না।'

'এ আপনি কী বলছেন!'

'ঠিক বলছি। আচ্ছা তোমার সঙ্গে তো ওর বেশ জানাশোনা। কখনও তুমি ওকে আসতে বলেছ কোথাও আর ও সেখানে সময়মত আসেনি, এমনটা হয়েছে ?' প্রশ্নটা করে নীলা আড়চোখে অনিমেষের চেহারাটা দেখল।

মাধবীলতা হেসে ফেলল, 'মনে পড়ছে না।'

'তবেই দ্যাখো।' কথাটা মাধবীলতাকে বলে নীলা অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মনে পড়ে!'

'পড়ছে। সেদিন আমার পায়ে খুব —।'

অনিমেষকে থামিয়ে দিল নীলা, 'না, কোনও কৈফিয়ত শুনতে চাই না। যে কোনও কারণেই হোক তুমি আসতে পারোনি। আমি তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছি না যে তুমি সাফাই গাইবে। আসলে সেদিন আমাকে খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, একা ভেবে উঠতে পারছিলাম না বলে তোমাকে আসতে বলেছিলাম।'

নীলা ওদের বারান্দা অবধি এগিয়ে দিল। এতক্ষণ নীলার কথাবার্তা বলার ধরন অনিমেষের ভাল লাগছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বার তাকে বিদ্ধ করছিল, নীলার স্বামী কে ? এত বন্ধুদের সঙ্গে

BanglaBook.org

ঘুরে ও কোন ভাগ্যবানকে বিয়ে করল ? যাকে করল তার আর্থিক অবস্থা যখন এইরকম তখন এমন কী বিশেষ যোগ্যতা তার আছে! সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আর একদিন এসে তোমার মিস্টারের সঙ্গে আলাপ করে যাব।'

'যেয়ো।' আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই।

চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত নীলাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অনিমেষ। বেশ রাত হয়েছে। মাধবীলতা দ্রুত হাঁটছিল। অনিমেষ পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, 'কেমন দেখলে ?'

'কী ?' মাধবীলতা কিছু ভাবছিল। প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিল।

'নীলাকে।'

'ভালই তো।' হাসল মাধবীলতা, ' তোমার খুব বন্ধু ছিলেন উনি ?'

'তা একরকম বলতে পারো, আবার নাও পারো। কলকাতায় আসার পর হাসপাতাল থেকে গিয়ে যাদের বাড়িতে আমি থেকেছিলাম সেই ভদ্রলোকের মেয়ে নীলা। তখন ও অত্যন্ত আধুনিকা, আমার পক্ষে পাল্লা দেওয়া মুশকিল ছিল এবং সে চেষ্টাও আমি করিনি। আসলে আমি ওকে বুঝতে পারি না। প্রথম দিনই ও আমাকে বলেছিল, ওর নাম নীলা এবং সেটা অনেকের সহ্য হয় না। বোঝো!' অনিমেষ হাসল।

'মুখের ওপর সত্যি কথা বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেই মেয়ে যখন এরকম আর্থিক অনটনে রয়েছে স্রেফ জেদের বশে বিয়ে করে, আজ কেমন অস্বস্তি হয়।'

'কেন ? উনি যদি বৈভবের চেয়ে এই কষ্টটাকেই আনন্দের মনে করেন তা হলে তোমার চিন্তা করার কী আছে! ভালবেসে যখন কেউ সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে অনেক কিছু অবহেলায় ছেড়ে আসতে পারে। বিশেষ করে মেয়েরা।' মাধবীলতা গাঢ় গলায় কথাগুলো বলল।

কথাটা মানতে পারল না অনিমেষ, 'সব কৃতিত্ব মেয়েদের হবে কেন ? পৃথিবীর সিংহাসন এক কথায় ছেড়ে দিয়ে ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন যিনি তিনি পুরুষ।' কথাগুলো বলার সময়েই মনে হল মাধবীলতা কি নিজের কথাই বলছে না ? আজ যে হোস্টেল খোঁজার প্রয়োজন হল সেটা তো তাকে ভালবেসে, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সেইজন্যেই। অথচ তাকে এই মুহূর্তে কিছুই ছেড়ে আসতে হচ্ছে না। এ অবস্থায় ওর সঙ্গে তার তর্ক করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

মাধবীলতা কিন্তু অনিমেষের কথাটাকে তেমন আমল দিল না। শ্যামবাজারের মোড়ে পৌঁছে বলল, 'তুমি কিন্তু কালকের মধ্যে হোস্টেলের চেষ্টা করবে, করবে তো ?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তুমি ভেবো না। ওহো, তখন নীলার বাড়িতে বসে একটা কথা মাথায় এসেছিল। বলল বলব করেও বললাম না।' অনিমেষ জানাল।

'কী ?' মাধবীলতা মুখ তুলল।

'নীলারা যখন একটা ঘর ভাড়া দিতেই চাইছে তখন সেটা তুমি যদি নিতে তা হলে কেমন হত ! হয়তো একটু বেশি খরচ হত— ।' অনিমেষ তাকাল ওর দিকে।

'যাঃ, তা কি হয় কখনও! আমি খাব কোথায় ? স্কুলে যা মাইনে দেবে সবই বেরিয়ে যাবে।' তারপরেই গলা পালটে গেল মাধবীলতার, 'ওই মহিলাও আমাকে ভাড়া দিতেন না।'

'কেন ? আমি বললে নিশ্চয়ই দিত।'

'তুমি ঠিক বুঝবে না।'

'উঁহু, নীলাকে তুমি বুঝতে পারোনি।'

'তুমি বুঝেছ ?'

'অনেকটা।'

মাধবীলতা হাসল। তারপর নরম গলায় বলল, 'উনি যে খুব শীগ্‌গীর মা হতে যাচ্ছেন এটা বুঝতে পেরেছ ?'

অনিমেষ চমকে উঠল। যাচ্চলে! এতক্ষণ ওরা বসেছিল কিন্তু একবারও সে এ সব চিন্তা করেনি। চোখেও পড়েনি কিছু। এককালে মনে হত যে মেয়েদের সিঁদুর পরাটা বুঝতে পারে না। কে বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা সিঁথি দেখে ঠাওর করতে পারে না। মেয়েরা কী-একটা কায়দায় সেটাকে বেশ লুকিয়ে রাখতে পারে। আবার নীলার সামনে বসে থেকেও ওর আসন্ন মাতৃত্ব টের পায়নি। এটাও কি আজকাল লুকিয়ে রাখা যায় ? কিংবা মেয়েদের এইসব ব্যাপার মেয়েরাই বিশেষ চোখে দেখতে পায় যেটা পুরুষদের থাকে না।

BanglaBook.org

অনিমেষ হাসল, 'না পারিনি, হার মানছি।'

মাধবীলতা প্রসঙ্গ পালটাল, 'যা হোক, আমি হোস্টেলে থাকতে চাইছি আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে। কোথাও ঘর ভাড়া করে থাকলে নানান কথা উঠবে। একটা মেয়ে একলা আছে জানলে লোকের কৌতূহল বাড়েই। তা ছাড়া তুমিও তখন হুটহাট চলে আসবে আমার ঘরে সেটাও আমি চাই না।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল, 'আমি তোমার কাছে যাই এটা চাইছ না?'

'ভুল করলে। আমি হোস্টেলে থাকলে তুমি দেখা করতে যাবে বইকী। কিন্তু একটা ঘরে আমি একলা স্বাধীনভাবে আছি, সেখানে তুমি আসো এটা আমি চাই না।' মাধবীলতা নির্দ্বিধায় বলল।

'তুমি তা হলে আমাকে বিশ্বাস করো না!' অনিমেষের খুব খারাপ লাগছিল কথাগুলো শুনতে। আচমকা যেন মাধবীলতা সম্পর্কটাকে বদলে দিচ্ছে।

'তোমাকে নয়, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না।' মুখ নিচু করল মাধবীলতা। যেন গভীর চাপ থেকে হুশ করে ওপরে উঠে এল অনিমেষ, উঠেই মনে হল ওই চাপ কতটা কষ্টদায়ক এবং সেটা মাধবীলতাকে এই মুহূর্তে নুইয়ে ফেলেছে। এরকম অকপট স্বীকারোক্তি যে মেয়ে করতে পারে— অনিমেষের ইচ্ছে করছিল মাধবীলতার হাতটা জড়িয়ে ধরে কিন্তু এই হাজার মানুষের ভিড়ে তা সম্ভব নয়।

এইসময় একটা আটাত্তরের সি বাস এসে থামতেই মাধবীলতা বলল, 'আমি চলি।'

'কালকে আসছ?'

'দেখি।'

'না, এসো।'

মাধবীলতা হাসল। তারপর বাসে উঠে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল ভিড়ের মধ্যে যতক্ষণ অনিমেষকে দেখা যায়।

আমহার্স্ট স্ট্রিটের মেয়েদের হোস্টেলে জায়গা পাওয়া গেল। মাধবীলতা চলে গেল অনিমেষ থ্রি বি বাস ধরে সোজা চলে এসেছিল এখানে। চট করে হোস্টেল কিংবা মেস বলে মনে হয় না। লাল বাড়িটার সামনে চিলতে বাগান, শৌখিন মানুষের বাড়ি বলেই মনে হয়। রাত হয়েছে কিন্তু অফিস ঘরটা তখনও খোলা ছিল। অনিমেষ দেখল একজন বয়স্কা মহিলা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। চোখে চশমা, গোল মুখ, সাদা শাড়ি, বেশ ভারিক্কি ভাব। দরজায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন, 'আসুন।' গলার স্বরে ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট।

'আমি হোস্টেলের সুপারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বসুন।' অনিমেষ চেয়ার টেনে বসলে মহিলা হাসলেন, 'কী ব্যাপার বলুন।'

'আপনিই কি —?' অনিমেষ ইতস্তত করছিল।

'হ্যাঁ।'

'এই হোস্টেলে সিট খালি আছে?'

'আছে। গতকাল খালি হয়েছে।'

অনিমেষ স্নান করার তৃপ্তি পেল। যে ক'টা হোস্টেল ওরা আজ দেখেছে এইটে তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল। এখানেই যদি জায়গা পাওয়া যায় তা হলে সৌভাগ্যই বলতে হবে। সে মহিলার দিকে ঝুঁজে বলল, 'এই হোস্টেলে জায়গা পেতে হলে কোনও নিয়মকানুন পেরিয়ে আসতে হয় কি?'

'নিয়মকানুন?' মহিলার চোখে সামান্য বিস্ময়, 'হ্যাঁ, বোর্ডারকে অবশ্যই মহিলা হতে হবে।'

'সে তো বটেই। আমি তা বলছি না। আমি জানতে চাইছিলাম এটা কি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল না স্টুডেন্টস হোস্টেল?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'মূলত এটা ছাত্রীদের হোস্টেল ছিল তবে এখন কেউ কেউ চাকরিও করে।' মহিলা এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'যাঁর জন্যে জায়গা খুঁজছেন তিনি আপনার কে হন?'

'আত্মীয়।' উত্তরটা অনিমেষ আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল।

'আপনি কী করেন?'

'আমি এবার এম. এ. দেব। আমিও হোস্টেলে থাকি।'

'আত্মীয় মানে, আপনার বোন?'

বোনের মতো বলতে গিয়ে অনিমেষ সামলে নিল। এক পলক মাত্র, তবু তার মধ্যেই অনিমেষ ঠিক করে ফেলল সত্যি কথাই বলবে। ওরা অন্যায় কিছু করছে না অতএব তার মুখোমুখি হতে বাধা

BanglaBook.org

কী! সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমার এক সহপাঠিনী সম্প্রতি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। কোনও কারণে তার পক্ষে বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ওর জন্যেই জায়গা খুঁজছি।'

মহিলা এতক্ষণ যে ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন অনিমেষের উত্তর শোনার পর সেটা পালটে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি কিছুক্ষণ অনিমেষকে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে আত্মীয় বললেন কেন ?'

'আমি আত্মীয় বলেই ওকে মনে করি।'

আস্তে আস্তে মহিলার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'কিন্তু এখানে থাকতে হলে বাবা মা অথবা ওরকম কাউকে গার্জেন হতে হয়। তাই নিয়ম।'

'সেটা সম্ভব নয়। আমি শুধু এ কথাই বলতে পারি আপনার হোস্টেলের অন্য মেয়েরা যে আচরণ করে সে তার থেকে ব্যতিক্রম হবে না।' এইভাবে কথা বলতে অনিমেষের আর অসুবিধে হচ্ছে না। ওর চেতনায় একটা ক্ষীণ অনুভব হচ্ছিল যে এরকম কথা যেহেতু কোনও বয়স্কা মহিলার পছন্দসই নয় তাই মাধবীলতা এখানে জায়গা পাবে না। তা সত্ত্বেও সে সত্যি কথা বলতে চাইল। মাধবীলতা প্রাপ্তবয়স্কা, নিজের ভালমন্দ বোঝে তাকে কারও আশ্রয় বিনা এঁরা গ্রহণ করবেন না কেন ?' প্রয়োজনে সে তর্ক করে যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলার সময় এসেছে।

'উনি এম. এ. পড়ছেন বলছিলেন, তখন কি বাড়িতে থাকতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'এখন সেটা সম্ভব নয় ?'

'নয় বলেই তো এসেছি।'

'এ ব্যাপারে ওঁর বাড়ির লোক কোনও আপত্তি করবেন না তো ?'

'প্রাপ্তবয়স্কা বোর্ডার নিয়ে ঝামেলা হবে কেন ?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন মহিলা। তারপর বাঁ দিকের ড্রয়ার খুলে একটা ফর্ম বের করে অনিমেষের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'আপনি সত্যি কথা স্পষ্ট বলতে পেরেছেন বলে আমার কোনও আপত্তি থাকছে না। আই লাইক ইট। কিন্তু কোনও রকম বাজে ঝামেলা আমি চাইব না, সেটুকু মনে রাখবেন।'

একটা রূঢ় কথা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে অনিমেষ ফর্মটা ভরতি করতে গেল। সঙ্গে কোনও কলম নেই। ভদ্রমহিলা সেটা বুঝতে পেরে একটা কলম এগিয়ে দিলেন। নাম, বয়স, কী পড়ে অথবা অন্য কিছু করে কিনা, বাড়ির ঠিকানা, গার্জেনের নাম পর পর জানতে চাওয়া হয়েছে। সেগুলোর জবাব লিখতে লিখতে গার্জেনের নামের বেলায় অনিমেষ ইতস্তত করতে লাগল। ভদ্রমহিলা এতক্ষণ লক্ষ রাখছিলেন। এবার হেসে বললেন, 'আপনার নাম আর ঠিকানা লিখুন।'

ব্যাপারটা খুবই সামান্য কিন্তু নিজের নাম লিখতে গিয়ে অনিমেষ বুকের মধ্যে শিরশিরানি অনুভব করল। এই প্রথম কাগজে-কলমে মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়িত হল। মাধবীলতা কোনও অন্যায় করলে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাকে জানাবে। যেন অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব নিল সে আজ থেকে এইরকম বোধ হচ্ছিল।

ফর্ম ভরতি করে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কত দিতে হবে ?'

'এক মাসের চার্জ, আর আনুষঙ্গিক কিছু।'

পকেটে একশোটা টাকা আছে। অনিমেষ ইতস্তত করল। এতে অবশ্যই কুলোবে না। সে বলল, 'এক কাজ করুন, এখনই রসিদ লিখবেন না। আমার কাছে একশো টাকা রয়েছে। ওটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। আগামিকাল কিংবা পরশু বাকি টাকাটা দিয়ে দেব। ও সামনের মাসের প্রথম তারিখ থেকেই থাকবে। অসুবিধা হবে ?'

মহিলা বললেন, 'আপনার উচিত ছিল সঙ্গে টাকাটা আনা। যা হোক, এখন কিছু দিতে হবে না। দুদিনের মধ্যে টাকা দিয়ে যাবেন।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

ভদ্রমহিলা কোনও কথা বললেন না। কিন্তু অনিমেষ দেখল উনি ঠোঁট টিপে হাসছেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা হইচই শব্দ উঠল। কেশব সেন স্ট্রিট থেকে একদল ছেলে ছুটে আসছে। এ পাশের লোকজন পালাচ্ছে। তারপরই দুম দুম করে কয়েকটা বোমা ফাটল চৌমাথায়। চারধারে লোক আতঙ্কে আড়ালে যাচ্ছে। অনিমেষ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখল। একটা ছেলে, রোগা, ঢ্যাঙা, হাতে দুটো বোম নিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, শাসাচ্ছে কাউকে। তার ভয়ে জায়গাটা এখন মধ্যরাতের মতো নির্জন।

BanglaBook.org

অনিমেষের ইচ্ছে হল ওকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে এমন করছে! কিন্তু তখনই ছেলেটা আবার দৌড়ে কেশব সেন স্ট্রিটে ফিরে গেল। কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের খেয়াল হল এই জায়গাটা ভাল নয়। কাগজে দেখেছে প্রায়ই গোলমাল লেগে থাকে এখানে। বোমবাজি হয়। এই রকম জায়গায় মাধবীলতাকে থাকতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত হতে গিয়েই হেসে ফেলল সে। আজ নয় কাল, সারা বাংলাদেশেই যদি এরকম হয়ে যায়, তা হলে ?

বত্রিশ

পয়লা তারিখে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল অনিমেষের। বালিশে মুখ রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতেই মাথার ভেতর চিন্তাটা হঠাৎ নড়ে উঠল। আজ মাধবীলতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোস্টেলে আসবে। কথা আছে, সকাল আটটার মধ্যে অনিমেষ, বেলঘরিয়া স্টেশনে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। নিমতা থেকে মাধবীলতা রিকশা নিয়ে সেখানে আসবে। তারপর ট্রেন ধরে শিয়ালদায় নেমে ওরা হোস্টেলে যাবে। প্রথম দিন অনিমেষ সঙ্গে গেলে মাধবীলতার সুবিধে হবে।

অনিমেষ চেয়েছিল নিমতার বাড়িতে যেতে। শেষবার সে নিজে মাধবীলতার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। ভদ্রলোক জেদ ধরে আছেন সত্যি কিন্তু ভাল করে বোঝালে হয়তো বুঝতেও পারেন। কিন্তু মাধবীলতা তাতে কিছুতেই রাজি হয়নি। বলেছিল, 'আমার বাবা তোমাকে অপমান করবেন আমি সেটা দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। যা কিছু শুনতে হয় তা আমিই শুনব।'

অনিমেষ একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'ঠিক আছে। তবু একটা কথা বলি, জানি তুমি রেগে যাবে শুনলে, কোনও ভাবেই কি অ্যাডজাস্ট করা যায় না ?'

মাধবীলতা রাগল না। ওর ঠোঁটের আদল ফুটল শুধু। তারপর খুব নীচু গলায় বলল, 'আমি আর টেনশন সইতে পারছি না। প্রতিদিন একই কথা শুনতে শুনতে আমার নার্ভ সহ্যের সীমায় এসেছে।' তারপর খানিক চুপ করে বলল, 'তুমি এত চিন্তা করছ কেন। আমি নিজে একজন মেয়ে । বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আমাকে হাজারটা চিন্তা করতে হয়েছে।'

মাধবীলতা তাই একাই বাড়ি থেকে বের হতে চেয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি যাতে অনিমেষ না যায় তাই বেলঘরিয়া স্টেশনে ওকে অপেক্ষা করতে বলেছে। ব্যাপারটা অনিমেষের ভাল লাগেনি। মাধবীলতা তার জীবনের এই ঝুঁকির সঙ্গে ওকে জড়াতে চাইছে না এটা ভাবলেই নিজেকে অক্ষম বলে মনে হচ্ছিল। এ মেয়ে যা কিছু করবে তা নিজের দায়িত্বে করতে চায়। অনিমেষের অস্বস্তিটা এইখানেই।

অনিমেষ দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। হাতিবাগান থেকে বেলঘরিয়াতে পৌঁছাতে মিনিট চল্লিশেক লাগবে। ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল অনিমেষ। একটি মেয়ে আজ তার জন্যে জীবনের বাঁধা রাস্তার সব সুখ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসছে এটুকু ভাবলেই নিজেকে সম্রাট বলে মনে হয়। জামাকাপড় পরতে পরতে অনিমেষ ভাবছিল যদি মাধবীলতা কোনও কারণে বাড়ি থেকে না বেরুতে পারে তাহলে সে কী করবে ? যদি বাড়ির লোকেরা জোরজবরদস্তি করে ওকে আটকে রাখে ? অনিমেষ ঠিক করল, যদি বেলাদশটার মধ্যে মাধবীলতা স্টেশনে না আসে তা হলে সে কোনও নিষেধ মানবে না। সোজা মাধবীলতার বাবার মুখোমুখি হবে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল অনিমেষ। ঠিক এইসময়েই দরজায় শব্দ হল। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অনিমেষ বলল, ' কে ?'

এইসময় কেউ এসে কথা বললে দেরি হয়ে যাবে বলে অনিমেষ বিরক্ত হচ্ছিল। বাইরে থেকে কেউ সাড়া না দেওয়ায় সে একেবারে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দুহাতে দরজা খুলতেই চমকে উঠল। বাইরে এখন ঝকঝকে রোদ্দুর। আর সেই রোদ্দুর পেছনে রেখে মাধবীলতা দুই চোখে হাসছে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ শরতের আকাশ হয়ে গেল অনিমেষের। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কোনওরকমে বলল, 'তুমি!'

মাধবীলতা তখনও হাসছিল। সেই হাসিতে একই সঙ্গে আনন্দ আর সঙ্কোচ। দুটো চোখের চাহনি নিঃশব্দে অনেক কথা বলে দিচ্ছে ওর। একটা হলুদ শাড়ি পরে আসায় সমস্ত চেহারায় মিষ্টি ঔজ্জ্বল্য এসেছে। বিব্রত, অবাক অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাগ করেছ ?'

'কী আশ্চর্য! রাগ করব কেন ? কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে ?' অনিমেষের বিস্ময় তখনও কাটছিল না। এই সকালবেলায় মাধবীলতা ওপরে উঠে এল কীভাবে ? সাধারণত কেউ দেখা করতে

BanglaBook.org

এলে দারোয়ান এসে খবর দিয়ে যায়। অনিমেষ দেখল সুন্দরী একটি মেয়ে ভেতরে এসেছে, এ খবর ঘরে ঘরে জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। কারণ এক একটা অজুহাত দেখিয়ে অন্যান্য বোর্ডাররা বাইরে বেরিয়ে মাধবীলতাকে দেখছে। অস্বস্তি হল ওর। সেই সময় মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঘরে যেতে বলবে না?'

'আমার ঘর?' অনিমেষ নিজের ঘরটার দিকে তাকাল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মাধবীলতাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে গেল সে। খবরটা প্রচারিত হতে বেশি সময় লাগবে না। হোস্টেলের নিয়মকানুন তো আছেই, একটি অবিবাহিতা মেয়ে ছেলেদের হোস্টেলে একা বসে গল্প করছে এ খবর ইউনিভার্সিটিতে দারুণ মুখরোচক হবে। সে কোনও কথা না বলে দরজায় তালা লাগিয়ে বলল, 'চলো, বের হব।'

মাধবীলতার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'মানে?'

'আমাকে একটু বেরোতে হবে, কাজ আছে।' অনিমেষ কপট গলায় বলল। ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনিমেষ সিঁড়ির দিকে এগোল। হোস্টেলের এই ছাদের ঘরে আজ অবধি কোনও মেয়ের পদার্পণ হয়নি। যতটা করলে অভদ্রতা না মনে হয় ঠিক ততটা আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বারান্দায় ছেলেরা তোয়ালে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবীলতা অনিমেষের পেছন পেছন নীচে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, ' কোথায় কাজ আছে তোমার?'

' বেলঘরিয়া স্টেশনে।' অনিমেষ গম্ভীর গলায় বলল।

'ইয়ার্কি না?' এতক্ষণে সহজ হল মাধবীলতা, 'এমন মুখের ভঙ্গি করেছিলে না যে মনে হচ্ছিল এসে খুব অন্যায় করেছি।'

'অন্যায় কিছুটা হয়েছে বইকী ! ওইভাবে হুট করে ওপরে উঠে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। আফটার অল এটা ছেলেদের হোস্টেল।' গেটে এসে অনিমেষ চারধারে নজর বুলিয়ে দারোয়ানকে দেখতে পেল না।

রাস্তায় নেমে মাধবীলতা বলল, 'বাঃ, সেটা আমি জানব কী করে! এখানে এসে দেখলাম কেউ নেই। একটু ভেতরে ঢুকে তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতেই একজন ঘরটা বলে দিল। ডেকে দেবার কেউ না থাকলে আমি কি করব !'

'কিছু না! শুধু কতগুলো তৃষিত মফস্বলের ছেলের বুকে ঈর্ষা জাগিয়ে দিলে।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ভেতরে বসতে বললে না কেন?'

'নিজের ওপর বিশ্বাস নেই বলে।'

'অভদ্র!' বলে মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখখানা দেখল। আচমকা বেশ লাল দেখাচ্ছে। জরুরি কথা বলার ভঙ্গিতে সে বলল, 'এবার কাজের কথাটা বলো তো। সাতসকালে কেন এখানে হাজির হলে? আর একটু দেরি হলেই তো আমি বেরিয়ে যেতাম।'

মাধবীলতা তখনও স্বচ্ছন্দ নয়। অনিমেষের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'বলছি, কিন্তু তার আগে সত্যি করে বলো তুমি রাগ করোনি আমি তোমার ঘরে উঠে গিয়েছিলাম বলে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আচ্ছা মেয়ে তো! বললাম না আমি রাগ করিনি।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তায় চলে এসেছিল। সকালবেলায় কলকাতার চেহারাটা অনেক নরম থাকে। দোকানপাট এখনও খোলেনি, শুধু সিগারেট পানের দোকানগুলো ছাড়া। ফুটপাতে হাতিবাগান বাজারে যাওয়া-আসা মানুষের ব্যস্ততা। রোদ এখনও বাড়ির মাথায়। এইসময় কলকাতাকে একদম অনুত্তেজিত দেখায়। মাধবীলতা বলল, 'চলো, কোথাও বসে চা খেতে খেতে কথা বলি। সকাল থেকে স্থির হতে পারিনি।'

ওরা পাশাপাশি হেঁটে হাতিবাগানে এল। এখন ভাল রেস্টুরেন্টগুলোয় ধোওয়ামোছা চলছে। আটপৌরে চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়তে আসা মানুষের ভিড়। অনিমেষ রাধা সিনেমার পাশে দোতলায় একটা রেস্টুরেন্টে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'চা পাওয়া যাবে?'

ছোকরা মতো একটা লোক, তখনও বেয়ারার পোশাক পরেনি, বলল, 'দেরি হবে।'

'কতক্ষণ?' ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা কী বুঝল কে জানে, জিজ্ঞাসা করল, 'শুধু চা?'

অনিমেষ কিছু বলার আগেই মাধবীলতা বলল, ' টোস্ট পাওয়া যাবে?'

বোঝা যাচ্ছিল শুধু চা বললে লোকটা কাটিয়ে দিত। বাঁ দিকে হাত তুলে বলল, 'বসুন দশ মিনিট।'

BanglaBook.org

রেস্টুরেন্টে সবে ঝাঁট পড়েছে। চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর উলটে রাখা আছে। পেছন থেকে লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'কেবিনে গিয়ে বসুন।'

অনিমেষ রাস্তার ধারে কেবিনে ঢুকল। কেবিনটা ছোট। দেওয়াল ঘেঁষে টেবিল। পাশাপাশি দুজন বসতে পারে। ওরা বসতেই সামনের হাতিবাগান বাজারের ওপরটা চোখে পড়ল। পরদাটা গোটানো থাকা সত্ত্বেও এখানে আলো কম। চেয়ারে বসে মাধবীলতা বলল, 'জানো, কাল রাত্তিরে একদম ঘুমুতে পারিনি।'

অনিমেষ তাকাল। মাধবীলতাকে প্রথম থেকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। এখন কারণটা বুঝতে পারল। আজ অবধি কখনও সে ওকে ভোরে দেখেনি। তাই একটু আলস্যমাখানো অযত্ন মুখে চুলে। স্নানের পর মেয়েদের শরীরে যে টানটান তেজ থাকে তা ভোরবেলায় পাওয়া যায় না। ভোরবেলায় তাই মেয়েদের কাছের মানুষ মনে হয়। এতক্ষণ ওকে দেখার আনন্দে এবং উত্তেজনায় সমস্ত ব্যাপারটা গুলিয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে মাধবীলতার বেরিয়ে আসার কথা। অথচ সে এখন তার সামনে বসে। এদিকে বলছে গত রাত্তিরে সে ঘুমুতে পারেনি। কেমন একটা ভয় হঠাৎ এসে জুড়ে বসল। তা হলে কি কোনও কারণে মত পালটেছে মাধবীলতা ? গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম হয়নি কেন ?'

'কোনওদিন তো বাড়ির বাইরে থাকিনি। একা নতুন জায়গায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। নানান চিন্তা আসছিল আর ভেবেছি কখন সকাল হবে।' মাধবীলতা হাসল। হকচকিয়ে গেল অনিমেষ, 'নতুন জায়গা মানে ? তুমি কি গত কালই চলে এসেছ ?'

'হ্যাঁ।' মাধবীলতা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

' কেন ? কী হয়েছিল ?'

' চলে আসতে হল। ভয় ছিল গতকাল থেকেই আমাকে থাকতে দেবে কি না। কিন্তু সুপারকে বলতে দেখলাম রাজি হয়ে গেলেন। নইলে কী বিপদে পড়তে হত।'

'কী হয়েছিল ?' আবার প্রশ্নটা করল অনিমেষ।

'বাড়িতে গিয়ে মাকে বললাম তোমরা যদি চাও তা হলে আমি হোস্টেলে চলে যেতে পারি। মা বলল, তোমার বাবার সঙ্গে বুঝে নাও, আমি এর মধ্যে নেই। বাবা আমাকে দেখা মাত্র জানতে চাইলেন আমি কারও প্রেমে পড়েছি কি না। অস্বীকার করলাম না। তারপর যা হয়ে থাকে তাই হল। আমি নাকি ওঁর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি। দুধকলা খাইয়েছেন কালসাপকে। বললেন মত পরিবর্তন করতে। অসম্ভব শুনে জানিয়ে দিলেন আমার মুখ দর্শন করতে চান না। আমি যেন ওই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। আমারও খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওরা জানতেও চাইল না কোথায় যাচ্ছি। তবু একটা কাগজে নিজের ঠিকানাটা লিখে রেখে এলাম। ভাল লাগছে না একটুও।' মাধবীলতা মুখ নামাল।

অনিমেষের কষ্ট হচ্ছিল, গাঢ় গলায় বলল, 'দ্যাখো, পরে অনুশোচনা করার চেয়ে সময় থাকতেই শুধরে নেওয়া ভাল। হাজার হোক ওঁরা তোমার মা বাবা।'

মাধবীলতা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল, 'এই একটা কথা তুমি কতবার বললে! তুমি কিছুতেই বুঝছ না একটা মেয়ে বাড়ির প্রতিকুল মনোভাবের বিরুদ্ধে কতক্ষণ লড়তে পারে ? অনবরত চাপ দিচ্ছে সবাই বিয়ের জন্যে। উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে। হয় হ্যাঁ বল নয় না। আজ থেকে দু'বছর আগে হলে হ্যাঁ বলতে কোনও অসুবিধে হত না। স্বচ্ছন্দে বিয়ে হয়ে যেত আমার। বাবা বলতেন বড় ভাল মেয়ে, আমি দায় থেকে উদ্ধার পেলাম। কিন্তু এখন আমি কী করে রাজি হই! যে সব মেয়ে মনে করে মনের কোনও সতীত্ব নেই আমি সেই দলের নই। শরীরের চেয়ে মন আমার কাছে কম মূল্যবান নয়। যে চোখে আমি তোমাকে দেখেছি সেই চোখে আমি অন্য পুরুষকে দেখব কী করে ?' কথা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল মাধবীলতা।

অনিমেষ দেখল ওর মুখ কাঁপছে, আর তারপরেই চোখের দুটো কোণ চিকচিক করে উঠল। মাধবীলতার মুখে এখন ভাঙচুর। চোখ দুটো ভরা পুকুর। অনিমেষের বুকের মধ্যে পাথর গড়াতে লাগল। নিজের অজান্তেই ও একটা হাত মাধবীলতার কাঁধে রাখল, 'কেঁদো না, তোমার চোখে জল একদম মানায় না। আমি সহ্য করতে পারব না।'

সামলাতে সময় লাগল ওর। আঁচলে চোখ চেপে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বলল, 'আচ্ছা বলো তো, বাবা-মা কেন নিজের মেয়েকে এত সন্দেহ করে ? কেন নিজের জেদ মেয়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে আনন্দ পায় ? আমি কি ছেলেমানুষ ? আমার কি বোঝার বয়স হয়নি? আমি কি

BanglaBook.org

তোমাকে বিয়ে করার জন্যে এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ? এতদিন যেমন ছিলাম তেমনি কি ওদের কাছে আরও কিছুকাল থাকতে পারতাম না ? তবে কেন এত জোরজবরদস্তি!'

অনিমেষ জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ এখন পরিষ্কার। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুদিন যেতে দাও দেখবে ওঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। নিশ্চয়ই জেদ করবেন না আর। তুমি যদি কোনও অন্যায় না করো তা হলে কেউ তোমার দোষ দেবে না।'

'না, কথাটা ঠিক নয়। আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি এই খবরটা আত্মীয়রা জানা মাত্রই দুর্নাম রটাতে শুরু করবে। কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না।' মাধবীলতা মুখ নামিয়ে কথা বলছিল। এইসময় পায়ের শব্দ হল। খেয়াল হতেই অনিমেষ হাত সরিয়ে নিল মাধবীলতার কাঁধ থেকে। দু'হাতে দু' প্লেট টোস্ট আর দুটো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে লোকটা আশ্চর্য কৌশলে চলে এল। টেবিলে ওগুলো রেখে অভ্যস্ত হাতে পরদা নামিয়ে দিয়ে লোকটা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার চেহারা পালটে গেল। পরদাটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের একবার মনে হল উঠে সরিয়ে দেয় ওটাকে। সেইসময় মাধবীলতা বলল, 'তুমি আমাকে কখনও কষ্ট দিয়ো না।'

'এ কথা বলছ কেন ?'

'আমার যেন মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার কোথাও অস্বস্তি আছে।'

'কী রকম ?'

'আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটায় যেন তোমার কোথাও অস্বস্তি আছে। সত্যি করে বলো তো আমি কি তোমার ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি ?'

'লতা!' অনিমেষ প্রতিবাদ করতে চাইল।

'না অনি, আমি যা করছি নিজের দায়িত্বেই করছি। তোমার যদি মনে হয় জড়িয়ে যাচ্ছ তা হলে স্বচ্ছন্দে সরে যেতে পারো। আমার খুব কষ্ট হবে সারা জীবন হয়তো কাঁদব কিন্তু আমি তোমার গলার কাঁটা হয়ে আছি এ আমার সহ্য হবে না।' মাধবীলতার গলা বুজে এল।

অনিমেষ আর পারল না। চকিতে দুই হাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরল সে। বোধহয় একটা সুতোর আড়ালে নিজেকে ধরে রাখছিল মাধবীলতা, আর পারল না। অনিমেষের বুকে মুখ রেখে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। তার দু'হাত এখন অনিমেষের পিঠ আঁকড়ে ধরেছে। থর থর করে কাঁপছে শরীর। অনিমেষের সমস্ত শরীর এখন অচৈতন্য, মনের কোনও বাঁধ নেই, দু'হাতে মাধবীলতার মুখ তুলে স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

মাধবীলতার দুই চোখে জলের ধারা গড়াল, ঠোঁট কাঁপল, 'আমিও না।' এই প্রথম কোনও যুবতী শরীরকে বুকের ওপর অনুভব করল অনিমেষ। চোখের সামনে মাধবীলতার ভেজা স্ফীত ঠোঁট চুম্বকের মতো তাকে টানছিল। ধীরে ধীরে মুখ নামাল অনিমেষ। তারপর সেই উষ্ণ নরম সিক্ত ঠোঁটে আকণ্ঠ চুম্বন করল। দু'জনের চোখ এখন বন্ধ, সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন এই পরদা ঘেরা ছোট্ট কেবিন হয়ে গেছে। ঠোঁটের স্পর্শের মধ্যে দিয়ে অনিমেষ মাধবীলতার সব অন্ধকার মুছিয়ে দিল, মাধবীলতার সব না-বলা কথা জেনে নিল।

চেতনা ফিরতেই মুখ সরিয়ে নিল মাধবীলতা। আস্তে আস্তে তার হাত শিথিল হল। যেন একটু লজ্জা পেয়েই সে সরে বসতে চাইল। মুখে এখনও একটা মিষ্টি অথচ নোনতা সুখের স্বাদ, অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। আর তখনই সেই বন্ধ চোখের পাতায় আচমকা সেই দুপুরটা ছিটকে চলে এল। জলপাইগুড়ি শহরের বিরাম করের বাড়িতে সদ্য কিশোর অনিমেষ রম্ভার সামনে দাঁড়িয়ে। সামনের বিছানায় রম্ভা শুয়ে রয়েছে জ্বরতপ্ত শরীরে। মুখচোখ লাল, চুল উশকোখুশকো। অনিমেষ যখন তার অনুরোধে জ্বর দেখতে নিচু হয়েছিল তখনই সাপের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেছিল রম্ভা। সেই সদ্য কিশোরীর সতেজ আক্রমণ প্রতিহত করার আগেই দুটো জ্বরো ঠোঁট তাকে চুম্বন করেছিল। বিশ্রী, পোড়া বিড়ির স্বাদ পেয়েছিল যেন অনিমেষ। দাঁড়িয়ে উঠে নিজের ঠোঁটে ঘিনঘিনে ভাব অনুভব করেছিল। জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে সেই তার প্রথম চুম্বন। কিন্তু তার স্মৃতি অনেকদিন একটা অস্বস্তির চেহারা নিয়ে মনের ভেতর ছিল। আজ অনিমেষের মনে হল এতদিনে সেই বিশ্রী স্মৃতিটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত অনিমেষই সামনে রাখা প্লেট টেনে নিয়ে বলল, 'খাও।'

টোস্টে হাত না দিয়ে চায়ের কাপটা টেনে নিল মাধবীলতা। ধীরে ধীরে একবার চুমুক দিয়ে বলল, 'ভাল লাগছে না।'

'কেন, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' অনিমেষ হাত দিয়ে দেখল কাপটা আর গরম নেই।

মাধবীলতা তাই দেখে বলল, 'না, খাওয়া যাবে। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

বুঝল না অনিমেষ, ' কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'বাঃ, তুমিই তো চা খেতে চাইলে।'

'চেয়েছিলাম।'

অনিমেষ ওর চোখে চোখ রাখতে চাইল কিন্তু মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে নিল। অনিমেষ ধমকের সুরে বলল, 'খেয়ে নাও তো, সকাল থেকে কিছু খাওনি আর আজেবাজে বকা হচ্ছে। খাও বলছি।' টোস্টের প্লেটটা মাধবীলতার সামনে এগিয়ে দিল সে।

খাওয়া হয়ে গেলে মাধবীলতা বলল, 'আমি কিন্তু তোমার ভরসায় পরীক্ষা দেব!'

'আমার ভরসায়! আমি তো পড়াশুনা শুরুই করিনি।'

'এবার করো।'

'তুমি স্কুলে পড়ানো আর পরীক্ষার জন্যে তৈরি—দুটো পারবে?'

'পারতে হবেই।'

'আচ্ছা লতা, আমি ভবিষ্যতে কী করব বলে তুমি ভাবছ?'

'মানে?'

'আমি কী রকম চাকরি-বাকরি করব বলে তুমি আশা করো?'

মাধবীলতা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'ও সব আমি কিছুই ভাবিনি। একটা কিছু নিশ্চয়ই তুমি করবে, আর যাই করো আমি সমর্থন করব।'

'এ কোনও কথা হল? বাংলায় এম. এ. পাশ করে চাকরি পাওয়া যাবে না। অধ্যাপনা বা মাস্টারি করার মতো ব্রাইট রেজাল্ট আমার হবে বলে মনে হচ্ছে না। তখন কী হবে তাই ভাবছি।'

'আমার চাকরি তো রয়েছে।'

'আশ্চর্য মেয়ে!'

'কেন, আমার তো দুটো হাত-পাই আছে।'

'ইয়ার্কি কোরো না। আমার ব্যাপারে তুমি একটুও সিরিয়াস নও।'

'খুব বেশি সিরিয়াস বলেই কিছু ভাবি না।'

'তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। আমার বাড়ির লোক তোমাকে কী ভাবে নেবে তা জানি না। যদি—।'

'ও সব কথা থাক। তোমার দাদু পিসিমার কথা যা শুনেছি তাতে আমার বিশ্বাস ওঁরা আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসবেন।'

হঠাৎ অনিমেষের হাসি পেল। ওর মনে হল মেয়েদের মন সত্যিই বিচিত্র। এতদিনের রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে তারা যাকে বুঝতে পারল না, সে বিশ্বাস করছে দুজন অপরিচিত লোক তাকে গ্রহণ করবে। যুক্তি নয়, হৃদয়াবেগই মেয়েদের সাহসী করে তোলে।

কথা ঘোরাল অনিমেষ, 'আমার ভয় হচ্ছে হয়তো তোমাকে আমি সুখী করতে পারব না। সেদিন সুবাসদার সঙ্গে কথা হবার পর থেকে আমার চিন্তাভাবনা সব পালটে যাচ্ছে। যদি এমন সময় আসে যখন আমি বাঁধা-ধরা জীবনে না থাকি তা হলে তুমি কী করবে?'

'কিছু না। এখন যা করছি তাই করব।' মাধবীলতা অনিমেষের হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিনই মনে হয়েছিল তুমি সাধারণ নও। ঘরসংসারের বাঁধা জীবনে তোমাকে মানায় না। সেটা করতে গেলে তোমার ওপর অন্যায় করা হবে। তোমার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক তাই তুমি করবে। আমি কোনওদিন তোমার বাধা হয়ে দাঁড়াব না।'

'আচ্ছা, এত ছেলে থাকতে তুমি আমাকে ভালবাসলে কেন?'

'কী মনে হয় তোমার?'

'জানি না।'

'কেন, তুমি কেন ভালবাসলে?'

অনিমেষ মাধবীলতার চোখের দিকে তাকাল। সেই চোখ হাসছে। মনে মনে সে বলল, তোমায় না ভালবাসলে আমি মরে যেতাম। কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে। কারণ মাধবীলতার চোখের হাসি এখন ঠোঁটে ছড়িয়েছে। অনিমেষ হেসে ফেলল শব্দ করে। ওদের দশটা আঙুল এখন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে বিশ্বাসে।

BanglaBook.org

তেত্রিশ

'প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার আমরা কী চাই। আমরা যারা এখানে রয়েছি তারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করেছি। মার্কসবাদের রীতিনীতি পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঔপনিবেশিক সংসদীয় কাঠামোয় নিজেদের মানানসই করে নিয়ে কয়েকটা রাজ্য সরকার গঠন করতে পারলেই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করবেন। আমরা মনে করি এই পথে সাধারণ মানুষের মুক্তি কখনওই আসতে পারে না। এ দেশের মানুষের কাছে ভোটের যে প্রলোভন রাখা হয় তার ব্যবহার আমরা জানি। গরিব মানুষগুলো নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঁওতাবাজির কাছে বারংবার ঠকে, ভোলে। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস করে না। কমিউনিস্ট পার্টির ঠিক এই পথে এদের ব্যবহার করতে চলেছে।' এই অবধি বলে বক্তা একটু থামলেন।

ঘরে এখন পিন-ফেলা নৈঃশব্দ্য। অনিমেষ দেখল সবসমেত সাতজন এখন শ্রোতার ভূমিকায়। প্রত্যেকেই খুব গম্ভীর মুখে কথা শুনছে। সিঁথির এই বাড়িটায় আসতে ওরা খুব সতর্ক হয়েছিল। সুবাসদার সঙ্গে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে নেমে অনেকটা হেঁটে এই বাড়িতে আসা। যিনি কথা বলছেন তাঁর নাম মহাদেব সেন। কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বিতাড়িত যাঁরা হয়েছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। এই ঘরে আর যাঁরা উপস্থিত তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সরাসরি সম্পর্ক ছিল। সে অর্থে অনিমেষ একটু বাইরের লোক। বিশেষভাবে পছন্দ করা কিছু মানুষ এখানে সমবেত হয়েছেন। অনিমেষের উপস্থিতি সুবাসদার সুপারিশেই। এতক্ষণ বক্তা যে কথাগুলো বললেন সেগুলো প্রত্যেকেরই জানা। মহাদেববাবু বললেন, 'আমার মনে হয় এইসব তত্ত্বের কথা আমরা সবাই জানি। আমি সোজাসুজি কথাগুলো বলছি এবার। যেহেতু এই নির্বাচন ব্যবস্থা, সামাজিক অসাম্য এবং রাজনৈতিক দালালিতে আমরা আর আস্থাবান নই তাই আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু মানুষ নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। আমরা মনে করছি চিনের পথেই ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব। চেয়ারম্যান মাও-এর কথায় আস্থা রেখেই বলছি বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। বন্দুকের মাধ্যমেই বিপ্লব সাধিত হবে। আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে সশস্ত্র কৃষক গেরিলাদল সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতা দখল। একসঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষে বিপ্লব আনার মতো মানসিক এবং বাস্তব পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ক্ষমতা দখল এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলে তার অনুপ্রেরণা দাবানলের মতো আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। পরবর্তী পর্যায়ে এই কৃষক গেরিলাদল সশস্ত্র সংগ্রামের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলোকে বিস্তৃত করে সারা দেশে জনযুদ্ধের স্রোত বইয়ে দেবেন। গড়ে তুলতে হবে গণফৌজ, যে গণফৌজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করে তাদের উচ্ছেদ করবে।

'আমরা জানি প্রতিরোধ আসবেই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনও শ্রেণী বিনা আপত্তিতে কখনওই আসন ছাড়েনি। ইতিহাস এই কথাই বলে। এই আপত্তির চেহারা হল সশস্ত্র বলপ্রয়োগ। আগেকার সব আইন, সব গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে রেখে ওরা বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিপ্লবীদের ওপর। একটা কথা জেনে রাখুন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাঁচার এই লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে সামিল হবে আজকের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো। কারণ ইতিহাস বলছে যখনই কোনও কঠিন সমস্যা এসেছে ভারতবর্ষের পার্টিগুলোর এমন সুবিধেজনক ভূমিকা নিয়েছে যেখানে তাদের অস্তিত্ব স্থির থাকে। আমাদের এই জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

'আমাদের মূল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। অথবা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় শ্রেণী ক্রমাগত সংখ্যায় কমে না, উলটে বেড়ে যেতে পারে বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক শ্রেণী হল একমাত্র শ্রেণী যে অন্য শ্রেণীর মানুষকে গ্রহণ করতে পারে।

'তা হলে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে। আপাতত আমাদের এই সংগঠনকে 'অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ কম্যুনিস্ট রেভলিউশনারিজ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটামুটি এই ব্যানারে আমরা কাজ শুরু করব। আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি তাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তা হলে খোলাখুলি করতে পারেন।'

সুবাসদা বলল, 'আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আমরা যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করছি তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া কতটা পরিষ্কার তা জেনে নেওয়া দরকার। আমরা যা করতে চলেছি তা পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তো? আমি খারাপ দিকটার কথা বলছি।'

মহাদেববাবু বললেন, 'আমি তো তাই মনে করি।' তারপর নিজের মনেই হাসলেন, 'সুবাস, তোমার দোষ নেই, আমাদের চিন্তাভাবনা দীর্ঘকালের অভ্যেসে একই খাতে বয়ে চলেছে। কিন্তু এখন

BanglaBook.org

বোধ হয় সেটাকে পালটাবার সময় এসেছে। যারা জলে ঝাঁপ দেবে তারা তো জানেই জলে ডুবে যাওয়াই সম্ভব। এ নিয়ে তর্কের কী প্রয়োজন ? তুমি সতর্ক করছ যদি সে ভয় পায় তা হলে ঝাঁপ দেবে না, এই জন্যে ? সে ক্ষেত্রে সারাদেশের মানুষ যদি ভয় পায় তা হলে কোনওদিন কোনও কাজ হবে না। সাঁতার শিখতে হলে তো জলে নামতেই হবে। তা হলে এই সতর্কীকরণ কেন ? আর পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপারটা মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই বললে। ও ভাবে কোনও কাজ হবে না তা আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। কাজে নেমে লক্ষ্য এক হলে মানুষের প্রয়োজন তাদের একটা বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করে এবং সেটাই কাম্য।'

সুবাসদা এরকম কড়া অথচ পরিষ্কার জবাব পেয়ে আর কোনও কথা বললেন না। অনিমেষের একটা চিন্তা অনেকক্ষণ থেকে মাথায় পাক খাচ্ছিল। মহাদেববাবুর কথা শেষ হতেই সে জিজ্ঞাসা করল, ' কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কার হাতে ?'

'কোনও ব্যক্তি বিশেষের হাতে নয়। তুমি কি লেটেস্ট ইস্তাহার পাওনি ?' মহাদেববাবু তাঁর ঝোলা থেকে হাতড়ে একটা কাগজ বের করে অনিমেষের দিকে এগিয়ে ধরলেন। অনিমেষ সেটাতে চোখ রাখল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিটি অফ কম্যুনিস্ট রেভলিউশনরিজ কী করতে চায় তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। ইস্তাহারের বিষয়বস্তু নিয়ে গত দুদিন তার সঙ্গে সুবাসদার যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এমনকী গত রাতে কলেজ স্ট্রিটে মহাদেববাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর এ নিয়ে কথা বলেছে সে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত কিংবা বেরিয়ে আসা নেতারাই চিনের অনুসরণে সারা ভারতবর্ষে একটি অগ্নিবিপ্লবের সূচনা করতে চান। এখন তা ছড়িয়ে থাকা কিছু সতেজ মানুষের চিন্তায় আছে মাত্র। মহাদেববাবু এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে।'

'এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নেই ?'

'না।'

'আচ্ছা, এবার একটা খবর দিই। ঠিক এই মুহূর্তে কলকাতা শহর এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মতো ছোট ছোট দলে আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা একা নই। প্রদীপ জ্বালার আগে যেমন সলতে পাকানোর প্রয়োজন হয় তেমনি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বিপ্লবের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করা।

আমাদের কয়েকটা বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমত, সরকার আমাদের পছন্দ করবে না তা বলাই বাহুল্য। তারা একে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ বলে চিহ্নিত করবেই এবং বিনা বিচারে জেলে পুরবে আমাদের। এই জিনিসটি আমাদের এড়াতে হবে। আমরা চেষ্টা করব কোনও অবস্থাতেই যেন পুলিশের হাতে না ধরা পড়ি। যতটা সম্ভব গোপন কাগজপত্র যা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আছে তা নিজের কাছে না রাখাই ভাল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ওদের ছলনার অভাব হবে না। চেয়ারম্যানের যে কোনও রচনা কিংবা রেডবুক কাছে থাকলেই ওরা সুযোগ পেয়ে যাবে। কোনওভাবে যদি ধরা পড়তেই হয় তা হলে মনে রাখতে হবে যে কোনও অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়েও ঠোঁট খোলা চলবে না। পুলিশ প্রলোভন দেখাবেই এবং সেই ফাঁদে পড়ে সতীর্থদের নাম যে বিপ্লবী ফাঁস করে দেয় তার শাস্তি মৃত্যু। প্রত্যেক কমরেড যেন এই কথাটা মনে রাখেন।

'দ্বিতীয়ত, আমাদের আশেপাশের রাজনীতি-অসচেতন মানুষকে চট করে এইসব কথা না বলাই ভাল। তারা উত্তেজিত হবে, গ্রহণ করতে না পারলে গুজব ছড়াবে এবং শেষে তাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

অনিমেষ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্গে না পেলে কী করে বিপ্লব সম্ভব ?'

'অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন। চেয়ারম্যান যখন পদযাত্রা শুরু করেছিলেন তখন সাধারণ মানুষকে ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাতে হয়নি। তারা বুঝেছিল এটা তাদের প্রয়োজন এবং তা বুঝেছিল বলেই তারা নিজেরাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।' মহাদেববাবু উত্তর দিলেন।

'ঠিক কথা। কিন্তু এ দেশে তো কোনও বিদেশি শত্রু রাজত্ব করছে না কিংবা দেশি একনায়ক নেই। যারা সরকারে আছে তাদের নির্বাচন করেছে জনসাধারণই। এখনকার রাজনৈতিক দলগুলো মিটিং ডাকলে এখনও হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। এই মানুষগুলোকে সঙ্গে পেতে হলে কি তাদের বোঝাতে হবে না ?' অনিমেষের প্রশ্নটা সরাসরি।

'তুমি রেডবুক পড়েছ ?'

Banglabook.org

'হ্যাঁ।'

'প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করতে হয় তার একটা ধারণা নিশ্চয়ই হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় সব থিয়োরি সর্বত্র খাটে না। এ দেশের মানুষ অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী, ব্যক্তিপূজারি, এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পাইয়ে দেবার টোপ খেতে অভ্যস্ত। এই খোলস ছেড়ে আচমকা এরা বেরিয়ে আসবে এমনটা ভাবা যেন আকাশকুসুম চিন্তা। তাই আমরা যা চাইছি তা কি এদের বোঝানো প্রথম কর্তব্য নয়? বিপ্লব তো জনসাধারণকে নিয়েই।' অনিমেষ খুব ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

'যুক্তিপূর্ণ কথা এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু কীভাবে জনসাধারণকে বিপ্লব-সচেতন করা যায় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চিন্তা করছেন। আমরা নিশ্চয়ই জনসভা করে তাদের বোঝাতে পারি না কারণ সরকার তা হতে দেবেন না। তা ছাড়া জনসভার বক্তৃতা মানুষের বুকের ভেতর কতটা পৌঁছায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।' মহাদেববাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

অনিমেষের বাঁ পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মনে হয় এখানে আমরা একটা বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছি। এই শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার জন্যে আমরা যে চেষ্টা করব তা তো কোনও ব্যক্তিবিশেষের জন্যে নয়। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখে যদি জনসাধারণ সেটা বুঝতে পারে তা হলে মিটিং করে তাদের বোঝাতে যেতে হবে না। একটা সময় আসবে যখন তারা নিজেরাই সব মুখোশ খুলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এত নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'খুবই সহজ। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, নিঃস্ব। পৃথিবীতে এখন দুটো জাত আছে। একদল ধনহীন অন্যদল ধনবান। এই দুই দিলই কে তাদের বন্ধু এবং কে শত্রু তা চিনতে ভুল করে না। আজকের কৃষক শ্রমিক খুব সহজেই আমাদের বুঝতে পারবে। সমস্যা হবে মধ্যবিত্তদের নিয়ে। তারাই ঘোঁট পাকাবে। তবে ঝড় যখন সত্যিই উত্তাল হয় তখন একটা কলাগাছ কতক্ষণ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে!'

অনিমেষ কিন্তু এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবশ্যই এদিকটা চিন্তা করবেন এবং জনসাধারণকে সচেতন করার দায়িত্ব নেবেন। ট্রামে বাসে রাস্তায় মানুষকে দেখেও মনে হয় না তারা বিপ্লব এলে যোগ দেবে। কেউ যখন ঝামেলায় জড়াতে চায় না তখন কী করে এত নিশ্চিত হওয়া যায়!

এইসময় মহাদেববাবু প্রস্তাব রাখলেন, 'অনিমেষ, জানি না তুমি এতে সন্তুষ্ট হবে কিনা তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটা প্রস্তাব নিয়েছেন। তাঁরা প্রতিটি এলাকায় জনসাধারণকে জানাবার জন্যে দেওয়াল পোস্টার লেখার কথা বলেছেন। যে সমস্ত মানুষ এখনও মনস্থির করতে পারছেন না এইসব পোস্টার দেখে তারা নিশ্চয়ই সক্রিয় হবেন। এটাকে পরোক্ষভাবে জনসচেতন করার চেষ্টা বলতে পারো।'

কথাটা এমনভাবে বলা যে অনিমেষ চমকে মুখ তুলছিল। কিন্তু মহাদেববাবুর গলায় কোনও জ্বালা ছিল না। কথা শেষ করে তিনি হাসছিলেন।

অনিমেষ বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না —।'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলেন মহাদেববাবু, 'না না, না, তোমাকে এ জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে না। যৌবনের ধর্মই হল যাচিয়ে নেওয়া। তুমি ঠিক কাজই করেছ। তবে একজন গেরিলা সৈনিক হিসেবে কতগুলো নিয়ম পালন করতে হয়। অনেক কিছু চট করে মনের সঙ্গে না মিললেও মনে রাখতে হবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে তাই মান্য করা উচিত। নেতৃত্বকে প্রতি পায়ে অস্বীকার করা মানে বিপ্লবকে হত্যা করা। তুমি নিজেও একদিন এই সমস্যায় পড়বে। হয়তো তখন তোমাকেই খুব কঠোর ব্যবস্থা এ কারণে নিতে হতে পারে।

সুবাসদা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু বিপ্লবের নেতৃত্ব কার হাতে থাকছে?'

'জল যখন পাহাড় থেকে একবার নেমে পড়ে তখন সে কোনদিকে যাবে তা কি আগে থেকে অঙ্ক কষে বলা যায়?' মহাদেবদা বললেন।

'কিন্তু গরিব ভূমিহীন কৃষকেরা যদি নেতৃত্বে না আসে তা হলে তো বিপ্লব মধ্যবিত্ত-ভিত্তিক হয়ে যাবে, তাই না?'

'অবশ্যই। এবং তারা যে আসবে না তা আমরা জানছি কী করে?' অনিমেষের পাশের

BanglaBook.org

ভদ্রলোক বললেন, 'এটা তো তত্ত্বের কথা হল। যতদিন গরিব শ্রমিক কৃষক নেতৃত্বে না আসছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী যোদ্ধারা উপযুক্ত এবং আদর্শ সময় পেয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে ?'

অনিমেষের এ-সময়ে লেনিনের কথা মনে পড়ে গেল। লেনিন তো শ্রমিক কিংবা ভূমিহীন কৃষকের পরিবারের সন্তান ছিলেন না। অনিমেষ হেসে বলল, 'এই দেখুন, এখানে থিয়োরি আর জীবনের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই তত্ত্ব মানলে লেনিনের উচিত ছিল না রাশিয়ার বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া।'

পাশের ভদ্রলোক খুশি হলেন। অনিমেষকে বললেন, 'ঠিক কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে আপনার একটু আগের কথা যাতে আপনি ভারতবর্ষের মানুষের অন্ধতা এবং নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ব্যাপারটায় সন্দেহ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে একটা যুক্তি রাখছি। মার্কস বলেছেন, একমাত্র প্রচণ্ড ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব। এই ছবিটা কি বিপ্লবের আগের রাশিয়ার সঙ্গে মেলে ?'

কথাবার্তা খুব জমে উঠলেও মহাদেববাবু বোধহয় আর বাড়াতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় কিছু থিয়োরি সামনে রেখে কাজ শুরু না করলে আমাদের এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু সবসময় যে থিয়োরি আঁকড়ে থাকতে হবেই তারও কোনও মানে নেই। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের চলতে হবে। এ-ব্যাপারে কারও ভিন্নমত পোষণ করা নিশ্চয়ই উচিত নয়। আচ্ছা, এবারে কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের মধ্যে ওয়াল-পোস্টার লেখার অভিজ্ঞতা কারও আছে ?'

দু'জন ছেলে হাত তুলল।

মহাদেববাবু বললেন, 'খুব ভাল হল। বাইরের কাউকে দিয়ে এখনই পোস্টার লেখানো উচিত হত না। তোমরা রং নিয়ে আজ রাত থেকেই লেগে পড়ো। দমদম স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড় আর ওদিকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত দিন সাতেকের মধ্যে যতটা সম্ভব কভার করবে। মনে রাখতে হবে এমন সব দেওয়াল বেছে নেওয়া হবে যা সহজেই মানুষের চোখে পড়ে। ঘন ঘন লেখার দরকার নেই, মোটামুটি জায়গাটা কভার করলেই চলবে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ?'

ছেলে দুটির একজন বলল, 'সাতদিনে এতটা জায়গা, খুব বেশি মনে হচ্ছে না ? দু'জনের পক্ষে কি সম্ভব ?'

মহাদেববাবু বললেন, 'আমরা চেষ্টা করব। তোমাদের সঙ্গে আমরাও থাকব।'

সুবাসদা বলল, 'কী শ্লোগান লেখা হবে বলে দিন মহাদেবদা।'

মহাদেববাবু ঝোলা থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন এই শ্লোগানগুলো লেখা হবে। বুর্জোয়া সংবিধান নিপাত যাক, পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়, রেডবুক—মার্কসবাদ লেনিনবাদের সংকলন, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নল শক্তির উৎস, মাও সে তুং সূর্যের চেয়ে বড় কারণ তাঁর চিন্তাধারা পৃথিবীর সর্বত্র আলো দেয়, সংশোধনবাদ নিপাত যাক, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। তোমরা এই গুলো কপি করে নাও।' মহাদেববাবুর কাগজটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ওঁর পড়ার গুণে ঘরে একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল।

সুবাসদা বলল, 'মহাদেবদা, বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সরাসরি কিছু কথা থাকলে ভাল হত না ?'

মহাদেববাবু বললেন, 'এখন সাধারণ মানুষের মনে এই ব্যাপারটা একটু আলোড়ন তুলুক তাই কেন্দ্রীয় কমিটি চান। পরের স্টেজে ওগুলো আসবে।'

অনিমেষের পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'পুলিশ আমাদের লিখতে দেবে ?'

মহাদেবদা বললেন, 'না দেওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের তৈরি হয়ে যেতে হবে। দুজন লিখবে দুজন পাহারা দেবে। প্রথম দিকে শুধু পুলিশের কাছেই বাধা পাব কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস এবং সি পি এম প্রতিরোধ করবেই। সেজন্য সংগঠন শক্তি আরও জোরদার করতে হবে।'

আলোচনাসভা ভাঙলে সবাই এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আজ রাত বারোটার সময় দমদম স্টেশনের সামনে একটি ছেলে আসবে সরঞ্জাম নিয়ে। অনিমেষ আর সুবাসদা ওর সঙ্গী হবে। অন্য জন কাজ শুরু করবে সিঁথির মোড়ে। যে দুজন তার সঙ্গে থাকবে তারা সময় জেনে চলে গেল। অনিমেষ বেরিয়ে আসছিল কিন্তু মহাদেববাবু তাকে আর একটু বসে যেতে বললেন। সুবাসদাকে বললেন, 'তুমিও থাকো সুবাস।' তারপর ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে বললেন, 'সুবাস, আজকের সভা সম্পর্কে তোমার মতামত কী ?'

BanglaBook.org

সুবাস বলল, 'ভাল কাজ হয়েছে।'

'কিন্তু অনিমেষ, তোমার কি দ্বিধা আছে?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না। আমি এখন বিশ্বাস করি এই পথেই দেশের মুক্তি সম্ভব। এ দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিপ্লব অবশ্যই প্রয়োজন। এ কথা ঠিক, বিদেশি শক্তি, কিংবা প্রচণ্ড ডিকটেটরশিপ থাকলে কাজটা সহজ হত, আমরা সহজেই জনসাধারণকে সঙ্গে পেতাম কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

মহাদেববাবু বললেন, 'তোমায় একটা উলটো প্রশ্ন করি। কেন নেই?'

অনিমেষ বলল, 'দেখুন, স্কুলে পড়ার সময় আমি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। দেশপ্রেমের ব্যাপারটা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু খুব অল্প দিনেই আমার মোহভঙ্গ হয়। কংগ্রেস একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এটা জানতে দেরি হয়নি। তারপরেই কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আমি আকৃষ্ট হলাম। লেনিন, মার্কসের কথা এবং লেখা পড়ে বিশ্বাস করলাম এই হল একমাত্র পথ। কিন্তু এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা যখন একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম তখন অদ্ভুত বিষাদ এল। এদের কাজকর্মের সঙ্গে মার্কস কিংবা লেনিনের কোনও সম্পর্কই নেই। বুঝলাম সংসদীয় গণতন্ত্রের এই কাঠামোয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্যটা বেশি হতে পারে না। তখন মনে হত যদি একটা বিদেশি শক্তি আমাদের আক্রমণ করত, সব ভেঙে চুরমার করে দিত তা হলে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা যে শক্তি পেতাম তা থেকে নতুন ভারতবর্ষ গড়া যেত। বলতে গেলে আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় সুবাসদার মাধ্যমে এই কর্মসূচি জানতে পারলাম। ঠিক এইরকম রাস্তাই তো আমি খুঁজছিলাম। তাই দ্বিধা থাকবে কেন?'

মহাদেববাবু বললেন, 'তুমি যে কোনও মুহূর্তে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?'

'অবশ্যই।'

'তোমার বাড়িতে কে আছেন?'

প্রশ্নটা শুনে অনিমেষ মহাদেববাবুকে দেখল। বাড়ির কথা এখানে কেন? বোধহয় ওর চাহনি দেখেই মহাদেববাবু বিশদ হলেন, 'আমি তোমার অ্যাটাচমেন্টের কথা জানতে চাইছি।'

'আমার ঠাকুরদা, বাবা, মা এবং পিসিমা।'

'ভাইবোন নেই?'

'না।'

'তুমি পরিবারের একমাত্র সন্তান, ওঁরা তো তোমার ওপর নির্ভর করবেন!'

'আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি দাদু পিসিমা এবং বাবা মা পরস্পরের ওপর নির্ভর করতেই অভ্যস্ত। আর আমার দাদুর কথা বলছি, এ দেশের বর্তমান কাঠামো ভেঙে ফেলতে যদি বিপ্লবের ঢেউ আসে এবং আমি যদি সেই আয়োজনে থাকি তা হলে তিনি অখুশি হবেন না।' অনিমেষ বলল।

'বেশ। সমস্যা তা হলে আর কিছু রইল না।' অনিমেষের হাত ধরলেন মহাদেববাবু, 'তোমাকে যদি এই মুহূর্তে খুব বড় দায়িত্ব দেওয়া হয় তুমি নেবে?'

'বলুন।'

'গতকাল তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর কথাটা আমার মনে হয়েছে। আজ খোঁজখবর নিয়েছি, অবশ্য সুবাসও তোমার হয়ে বলেছে আমাকে। তোমার বাড়ি উত্তরবাংলায়। চা বাগানের মানুষদের তুমি নিশ্চয়ই কিছুটা চেনো। আমাদের কর্মসূচির প্রথম পদক্ষেপ শহরের মানুষকে পরিস্থিতি-সচেতন করা এবং গ্রামে বা মফস্বলে শ্রমিক-কৃষক সংগঠিত করে এগিয়ে যাওয়া। আমি আজই এ নিয়ে কথা বলব, তুমি যদি রাজি থাকো তা হলে যে কোনও মুহূর্তে তোমাকে ওখানে যেতে হতে পারে।'

'আমি রাজি।'

'খুশি হলাম।'

'আজ রাত্রে দেখা হবে তা হলে।'

পৃথকভাবে ওরা বেরিয়ে এসে চিড়িয়ামোড়ে দেখা করতেই সুবাসদা বলল, 'অনিমেষ, তুমি কি ভেবেচিন্তে সব কাজ করছ?'

প্রশ্নটায় একটু বিরক্ত হল অনিমেষ। প্রশ্নকর্তা যেহেতু সুবাসদা তাই সেটা প্রকাশ না করে বলল, 'এ কথা কেন বলছেন?'

BanglaBook.org

'তোমার এম. এ. পরীক্ষা সামনেই।'

'তাতে কী হয়েছে।'

'এখনই কলকাতা ছাড়লে পরীক্ষা দিতে পারবে ?'

অনিমেষ হাসল, 'সুবাসদা, আমি যে বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়ছি তার ডিগ্রি পাওয়া কিংবা না পাওয়ার কোনও পার্থক্য নেই। তা ছাড়া আমরা যা করতে চলেছি তা সম্ভব হলে এ ধরনের ডিগ্রির কোনও প্রয়োজন হবে না। আর শুধু পরীক্ষা দেওয়ার কথা যদি বলেন তা হলে তো তা যে কোনও মুহূর্তেই এসে দিয়ে যাওয়া যায়।'

'তা হলে এতদিন এম. এ. পড়ছিলে কেন ?'

'কিছু করতে হয় তাই। তা ছাড়া আমি এম.এ. পড়ছি এই ভাবনাটা অনেককেই নিশ্চিন্ত রাখত।'

'তোমার আর কারও কাছে জবাবদিহি দেওয়ার নেই ?'

প্রশ্নটা শুনেই অনিমেষের চোখের সামনে মাধবীলতার মুখ ভেসে উঠল। যে মেয়ে তার জন্যে এক কথায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আজ যদি সে পিছিয়ে আসত তা হলে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকার কোনও কারণ থাকত না। সে যাই করুক নিশ্চয় মাধবীলতা তাকে সমর্থন করবে। মাধবীলতা তার থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। অনিমেষ উত্তর দিল, 'সুবাসদা, সেটা দেওয়া হয়ে গেছে।'

সুবাসদা অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কার কাছে ?'

'আমার নিজের কাছেই।' অনিমেষ হাসছিল।

সুবাসদা জিজ্ঞাসা করল, 'সিগারেট আছে অনিমেষ ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না। তারপর চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে সিগারেটের দোকান খুঁজতে লাগল। এখন নিশুতি রাত। স্টেশনের দিকে গেলে অবশ্যই দু একটা দোকান খোলা পাওয়া যাবে কিন্তু এ তল্লাটে কোথাও আলো জ্বলছে না। কাশীপুর ক্লাবের পাঁচিলের ওপর ছেলেদুটো কাজ করছে। এ দিকটায় লোকজনের ঘন বসতি নেই বলে কাজেরও সুবিধে। অনেকটা জায়গা নিয়ে লেখা হচ্ছে— "বন্দুকের নলই শক্তির উৎস"। লক্ষ করেছিল অনিমেষ, ছেলেটার হাতের এক একটা টানে কী সহজে রেখাগুলো জ্যান্ত অক্ষর হয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক বারোটার সময় ওরা মিলিত হয়েছিল। দমদম স্টেশনের চত্বরটা তখন বাজারের মতো সরগরম। সুবাসদা একটু ইতস্তত করছিল ওখানে কাজ শুরু করতে। প্রথমেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না। ওরা তাই একটু সরে এসে লেখা শুরু করেছে। ছেলেদুটোর হাত খুব ভাল, এরই মধ্যে দুটো লেখা হয়ে গেছে।

রঙের কৌটো মাটিতে রেখে ছেলেদুটোর একজন বলল, 'বিড়ি খাবেন ?'

সুবাসদা হাত বাড়াল, 'বেশি থাকলে দাও।'

পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটি কাজে ফিরে গেল। সুবাসদা নিজেরটা ধরিয়ে অনিমেষের মুখের সামনে হাতের আড়ালে বাঁচানো আগুন এগিয়ে ধরল। অনিমেষ বিড়িতে টান দিতেই একটা কটু গন্ধ জিভে গলায় ছড়িয়ে পড়ল। শরীর গুলোচ্ছিল প্রথমে কিন্তু ক্রমশ ঠিক হয়ে এল। সুবাসদা বলেছিল, 'বিড়িটা অভ্যেস করাই ভাল। প্রথম কথা পয়সা খরচ কম, আর সবচেয়ে উপকারী যেটা সেটা হল, ক্যানসার হয় না।'

'বিড়ি খেলে ক্যানসার হয় না ?'

'শুনেছি সিগারেটের কাগজটার ধোঁয়াই সবচেয়ে ক্ষতিকর। বিড়িতে সেই ধোঁয়াটা নেই। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ক'জনার ক্যানসার হয় ?'

বিড়ির টান এখন ভাল লাগছে। অনিমেষ ভাবছিল এবার থেকে বিড়িই খাবে। পয়সা সাশ্রয়ের চিন্তাটাই মাথায় ছিল। হঠাৎ মনে হল মাধবীলতার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যদি সে বিড়ি খায় তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে! সত্যি, আমরা কতগুলো ব্যাপার নিজেদের ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিই এবং তার ব্যতিক্রম হলেই আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। যেমন সিগারেট খাওয়ার বদলে বিড়িটার চল যদি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই স্বাভাবিক হত তা হলে সে প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবত না।

সামনের রাস্তা দিয়ে এখন কদাচিৎই গাড়ি যাচ্ছে। নিস্তব্ধ এই রাত্তিরে দেওয়ালের গায়ে অক্ষরগুলো জন্ম নিচ্ছিল। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। লেখার ভঙ্গিতে একটা উদ্দাম বিদ্রোহের চেহারা আছে। বন্দুক শব্দটা দেখতে দেখতে অনিমেষের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠল। কিউবার

BanglaBook.org

জঙ্গলে এগিয়ে যাওয়া বিপ্লবীসেনার হাতের বন্দুকের শেষ টোটা ফুরিয়ে যাওয়ার পরে মরিয়া হয়ে সে শত্রুকে আঘাত করছে লাঠির মতো ব্যবহার করে। বন্দুকের বারুদের অভাব বুকের বারুদ পূর্ণ করেছে। সেই দেখা ছবিটাই এখন চোখের সামনে ভাসল। বিপ্লবে বন্দুক অনিবার্য। অথচ সে কখনও বন্দুক স্পর্শ করেনি। অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা না থাকলে শিক্ষিত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে চাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। দেশের সৈন্যবিভাগ শুধু এই ব্যাপারেই দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে একদম আনাড়ি হাতে বন্দুক ধরলে কয়েক মুহূর্তেই বিপ্লবের স্বপ্ন আকাশকুসুম হয়ে যাবে? তা হলে?

প্রদীপ জ্বালার আগে তাই সলতে পাকানোটা শেখা দরকার। এই প্রস্তুতিটা কী ভাবে হবে? নেতারা ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চয় চিন্তা করছেন। অস্ত্রশিক্ষা যখন একান্ত প্রয়োজন তখন তার শিক্ষকও দরকার। এ দেশে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। আর যাই হোক ধুতি সামলে রাইফেল ছোঁড়া যায় না। সে ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সাহায্য দরকার হবে। সেটা কী করে সম্ভব! ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ দূর থেকে গাদাবন্দুক দেখার অভিজ্ঞতা নিয়েই বেঁচে আছে।

পরের সমস্যা হল, শক্তির উৎস বন্দুক যদি হয় তা হলে সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত বাহিনীর সঙ্গে লড়তে গেলে আধুনিক অস্ত্রের প্রয়োজন। সেটা এ দেশে সংগ্রহ করা অসম্ভব। তা হলে? বিপ্লবের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো যদি না মেটানো যায়—। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ল অনিমেষ। টান না দেওয়ায় বিড়ি নিভে এসেছিল, বিরক্তিতে সেটাকে ছুড়ে ফেলল সে। সুবাসদা বোধহয় লক্ষ করেছিল ওর অন্যমনস্কতা, জিজ্ঞাসা করল,'কী হয়েছে?'

অনিমেষ সুবাসদার মুখের দিকে তাকাল। অনিয়মে মুখটা কালো হয়ে আছে। ঠোঁটে বিড়ির লাল আগুন জোনাকির মতো জ্বলছে। ওই আগুনটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হল সে নিশ্চয়ই খুব ভাবপ্রবণ। তা না হলে একসঙ্গে কাজে নেমে সুবাসদা যা চিন্তা করে না তাই সে করছে কেন? কোনও কাজ করতে গেলে তার মাথায় হাজারটা সম্ভাব্য ভাবনা চলে আসে।

সুবাসদা তাকিয়ে আছে দেখে অনিমেষ বলল, 'ভাবছিলাম এত বন্দুক পাওয়া যাবে?' কথাটা সহজ করার জন্যে বলে ফেলে হাসল সে। সুবাসদা বুঝতে পারল না অর্থ, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'বিপ্লবের জন্যে কত বন্দুক দরকার হিসেব করেছেন?' এবার শব্দ করে হাসল অনিমেষ। মনের ভেতর যে প্রশ্নটা এতক্ষণ পাক খাচ্ছিল সেটাকে এত সহজ ভঙ্গিতে বের করে দিতে পেরে স্বস্তি পেল সে। সুবাসদার মুখের রেখাগুলো সহজ হয়ে এল, 'যদি প্রয়োজন হয় তা হলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি বন্দুকে রূপান্তরিত হবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু সরকারের সঙ্গে লড়তে গেলে অস্ত্র দরকার।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। প্রয়োজন তীব্র হলে কোনও কিছুই বাধা হয় না।'

ওদিকে ততক্ষণে লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। ছেলেদুটো জিনিসপত্র গুটিয়ে একটু সরে এসে নিজেদের শিল্পকর্ম দেখছিল। সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে লেখা। অনিমেষ মনে মনে তারিফ করল। বেশ তেজ আছে অক্ষরগুলোর মধ্যে । ওরা পরবর্তী জায়গার জন্যে এগিয়ে গেল। শেঠ লেনের মুখে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে ওরা কাজে লেগে গেল। কোথাও সামান্য শব্দ নেই। 'পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়' লেখার আয়োজন চলল।

পাশের একটা রকে অনিমেষ বসেছিল। সুবাসদা রাস্তার উলটো দিকে জলবিয়োগ করে এসে দাঁড়াতেই গলি থেকে পাঁচ ছ'জন লোক দৌড়ে এসে ওদের সামনে থমকে দাঁড়াল। লোকগুলো অনিমেষদের বোধহয় এখানে আশা করেনি। একটু থতমত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা দু'তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটে গেল এ পাশ ও পাশ। ওরা চলে যাওয়া মাত্র দূরে কোথাও আওয়াজ উঠল। চিৎকার করছে কেউ এবং ক্রমশ শব্দটা বাড়তে লাগল। অনিমেষ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ' লোকগুলো কারা হতে পারে বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না। ওয়াগন ব্রেকার কিংবা ডাকাত হতে পারে।'

'কী করবেন?'

শব্দটা এগিয়ে আসছিল। যেন অনেক লোক কাউকে তাড়া করে আসছে। ছেলেদুটোর একজন বলল, 'আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হবে না।'

BanglaBook.org

সুবাসদাও মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। জলদি পা চালাও।'

আঁকার জিনিসপত্র হাতে নিয়ে ওরা চিড়িয়ামোড়ের দিকে জোরে হাঁটতে লাগল। ওরা যখন রেডিয়ো গলির মুখে পৌঁছেছে ঠিক তখন সামনের রাস্তায় দুটো হেডলাইটকে ছুটে আসতে দেখল। অনিমেষ চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'লুকিয়ে পড়ো চটপট।'

সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিপটা পাশে এসে দাঁড়াল শব্দ করে। দু'তিনজন লোক লাফ দিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যান্ডস আপ!'

অনিমেষ সেই মুহূর্তেই আড়চোখে দেখতে পেল তার পাশে শুধু আঁকিয়ে ছেলে দুটোর একজন ভীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সুবাসদা কথাটা বলেই কী করে যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কে জানে। লোকগুলোর নির্দেশ মান্য করার সময় ওদের হাতে চকচকে অস্ত্র নজরে পড়েছিল। একজন মোটামতো লোক জিপে বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাত্রে এখানে কী করছেন ?'

দুটো হাত মাথার ওপরে, অনিমেষ বলল, 'প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হয় ?'

লোকটা অত্যন্ত বিরক্ত হল, 'যা প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিন।'

'কাজ ছিল।'

'কী কাজ ?'

'লেখালেখি।'

'লেখালেখি ? রাত্তিরবেলায় রাস্তায় ঘুরে আপনারা পদ্য লিখছেন ?'

'পদ্যের আপনি কিছু বোঝেন ?'

'শাট আপ! আমাকে পদ্য বোঝানো হচ্ছে ? নাম কী!'

'অনিমেষ মিত্র।'

ততক্ষণে দু'জন পুলিশ ওকে সর্বাঙ্গে হাতিয়ে দেখেছে। ওর সঙ্গী ছেলেটিও বাদ পড়েনি কিন্তু তার হাত থেকে ওরা দুটো রং মাখা তুলি উদ্ধার করে বীরদর্পে অফিসারটির দিকে এগিয়ে গেল। নাম শুনে অফিসারটি ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের লোকটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করে মাথা নাড়ল, তারপর তুলি দুটো দেখতে পেয়ে বলল, 'কোন পার্টি ?'

'পার্টি-ফার্টি নয়।'

'পার্টি নয় তা হলে তুলি দিয়ে কী লেখা হচ্ছিল ?'

'লেখা হয়নি, লিখব বলে ভাবছিলাম।'

'ভাবছিলেন ? কী সেটা ?'

'কলকাতাকে আরও সুন্দর করে তুলুন, কলকাতা তিলোত্তমা হবেই, কলকাতার অন্য নাম ভালবাসা, এইসব।'

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র হো-হো করে হাসতে লাগল অফিসার। পুলিশগুলোও দাঁত বের করল দেখাদেখি। হাসি শেষ করে অফিসার বলল, 'হয় মাথা খারাপ নয় কবিটবি হবে। নামটাও যেন কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি হাত নামাতে পারি এবার ?'

'নামান। থাকা হয় কোথায় ?'

এতক্ষণ একটা জেদের ঘোরে কথা বলছিল অনিমেষ। অফিসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতেই সে থিতিয়ে গেল। ঠিকানা জানার পর এরা যদি তাকে সেখানে নিয়ে যেতে চায় তা হলে — না ভুল ঠিকানা বলা চলবে না।

ঠিক সেই সময় শেঠ লেন থেকে তিন চারজন লোক খুব উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা দমদম রোড দিয়ে এদিকেই আসছিল। অফিসার সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা আবার কে ?'

পুলিশের জিপ দেখে লোকগুলোর উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। পুলিশ পুলিশ বলে চিৎকার করে ওরা ছুটে আসতে কনস্টেবল তিনজন এগিয়ে গেল অনিমেষদের পাশ থেকে। লোকগুলো একই সঙ্গে হাউমাউ করে কথা বলছিল। অফিসারের ধমকে ওরা একটুও শান্ত হচ্ছিল না। অনিমেষ বুঝল একটু আগে মারাত্মক কিছু হয়ে গেছে শেঠ লেনের ভেতর। কয়েকটা লোক একটা বাড়ির দরজা ভেঙে ডাকাতি করেছে। বাধা দিতে গিয়ে বাড়ির একটি ছেলে খুন হয়েছে। ওরা যখন এইসব কথা পুলিশকে জানাচ্ছে তখন অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়ে আঁকিয়ে ছেলেটি ফিসফিস করে বলল, 'চলুন পালাই।'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওদের দিকে নজর বোলাল। অফিসারের সামনে নালিশ জানাতে আসা লোকগুলো দেওয়ালের মতো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। কনস্টেবলগুলো অনেকটা

Banglabook.org

দূরত্বে মন দিয়ে কথা শুনছে। এখন যদি পালানো যায় তা হলে ধরা পড়ার সুযোগ কিছুটা কম। যদিও পালাবার রাস্তা একটাই, পেছনের রেডিয়ো গলি কিন্তু সেটা অনেকটা দূর অবধি সোজা দেখা যাচ্ছে এবং রাস্তার আলোগুলো খুব উজ্জ্বল। ওই গলি দিয়ে দৌড়ালে এরা অনেকক্ষণ দেখতে পাবে। ছোটার সময় যদি পা বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে হয়ে গেল। কিন্তু সুবাসদারা কোথায় গেল ? অনিমেষ কাছেপিঠে লুকোবার জায়গা দেখতে পেল না। পাশের ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবেন ?'

'পালানো যাবে না।'

'যাবে।'

চোখের ইঙ্গিত করে ছেলেটি আচম্বিতে দৌড় শুরু করল। অনিমেষ জায়গাটা লক্ষ করেনি। পেছনের নর্দমার পাশ দিয়ে সরু একটা পথ বাড়িগুলোর মধ্যে ঢুকে গেছে। রেডিয়ো গলি নয়, ছেলেটি ওই সরু পথের মধ্যে ছুটে গেল। এক পলকও নয়, অনিমেষ বুঝে নিল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। ওর সঙ্গীর ছুটে যাওয়ার জবাবদিহি তাকেই করতে হবে। নিজের অজান্তেই পা চালাল অনিমেষ। সে যখন নর্দমা পেরিয়ে সরু পথটার মুখে, ঠিক তখনই পুলিশগুলোর নজর পড়ল এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে হই হই আওয়াজ উঠল। একটা থান ইট অনিমেষের শরীর ঘেঁষে তীব্র বেগে ছুটে দেওয়ালে লেগে টুকরো হল। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে অনিমেষ দেখল কতগুলো শরীর তার দিকে ছুটে আসছে।

অন্ধকার গলির ভেতরে অনিমেষ ঢুকে পড়ল। একপাশে সরু নর্দমা অন্যদিকে সাঁচির বেড়ার ঘর। এদিকটা যাতায়াতের পথ নয়। অনিমেষ প্রাণপণে ছুটছিল। পায়ের তলায় ভাঙা ইট, রাজ্যের আবর্জনা, একটুও আলো চোখে পড়ছে না। সঙ্গী ছেলেটির কোনও অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তাটা কোথায় গিয়েছে এ সব ভাববার কোনও অবকাশ নেই, অনিমেষ অন্ধের মতো ছুটছিল। দু' তিনটে মোড় পেরিয়ে হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল সে। সামনে চকচক করছে জলকাদা। অর্থাৎ নর্দমাটা এখানে অনেকটা চওড়া হয়ে গিয়েছে এবং আর এগিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। প্রায় খাঁচায় পড়া ইঁদুরের মতো অনিমেষ পেছন দিকে তাকাল। অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে এবার। কনস্টেবলগুলো কি এই পথে ঢুকে পড়েছে ? হঠাৎ আঁকিয়ে ছেলেটির ওপর মেজাজ গরম হয়ে গেল অনিমেষের। কী দরকার ছিল এ ভাবে পালানোর ? অফিসারটি বেশ ভালই ব্যবহার করছিল, তা ছাড়া শেঠ লেনের লোকগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত ভদ্রলোককে। ছেলেটা যদি এই পথেই আসে তা হলে যাবে কোথায় ? অনিমেষ নর্দমাটা পার হবার চেষ্টা করল না। উলটোদিকে একটা তেতলা বাড়ির পেছন দিক। চিৎকার চেঁচামেচিতে দোতলার ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। এ পাশে সাঁচির বেড়ার ঘরগুলোর দিকে চকিতে নজর বোলাতে গিয়ে একটা ছোট ফাঁক চোখে পড়ল। কোনওরকম দ্বিধা না করে অনিমেষ সেই ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেল। বাঁশের কোনায় লেগে জামার হাতাটায় টান পড়তেই কেউ চিৎকার করল, ' কে ?'

জামাটাকে ছাড়িয়ে অনিমেষ দ্রুত এগোতেই একটা উঠোন দেখতে পেল। যে কে বলে ডেকেছিল তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সবাই যদি জেগে ওঠে তা হলে আর দেখতে হবে না। ও পাশের পথটায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পুলিশগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে নর্দমাটার কাছে এসে গেছে। অনিমেষ চারপাশে খালি বারান্দা দেখতে পেল। তারপর দ্রুত পা চালাল বাইরে বেরুবার পথটার দিকে। গলিটা সরু, দু'পাশে বস্তিবাড়ি। বাঁ দিকের পথটা নিশ্চয়ই দমদম রোডে গিয়ে পড়েছে। ওদিকে এগোলে পুলিশের জিপের সামনে পড়তে হবে। কয়েক পা পেছনে এগোতে কাশির শব্দ কানে এল। অনিমেষ দেখল একটা দাওয়ার ওপর দ হয়ে বসে আছে কেউ, কাশিটা তারই গলা থেকে আসছে। অনিমেষের মনে হল লোকটা তাকে দেখেছে। কিন্তু দেখলে তো তার দিকে সরাসরি তাকাত। ও ভাবে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে কেন ? অনিমেষ কী করবে বুঝতে না পেরে আর এক পা এগোতেই লোকটি বলল, 'খোকা এলি ?'

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। লোকটি কারও জন্যে অপেক্ষা করছে এত রাত্রে। কিন্তু তাকে এত কাছে দেখেও ভুল করছে কেন ? গলার স্বরে বোঝা যায় বেশ বয়স হয়েছে, 'ও খোকা, এলি নাকি ?'

নিজের অজান্তেই অনিমেষ বলল, 'হুঁ।'

'রাত কত হল ? এত দেরি করতে হয় বাপ, আমি যে ঘুমোতে পারি না।' বৃদ্ধ খকখক করে কাশতে লাগল এবার। ঠিক এইসময় ও পাশের বস্তিতে কথাবার্তা শোনা গেল। পুলিশগুলো ওখানে ঢুকল কি না কে জানে !

BanglaBook.org

'ও খোকা যা ঘরে যা, ও পাশে আবার হইচই হয় কেন ?'

বুড়োর গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। জায়গাটায় দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়। অনিমেষ ইতস্তত করছিল। এতক্ষণে সে বুঝে গেছে বৃদ্ধ চোখে দেখতে পায় না। এত রাত্রেও ছেলের পথ চেয়ে জেগে বসে আছে। কোনও কিছু কিন্তু না করে সে দাওয়ায় উঠে এল।

দরজাটা ভেজানো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না। অথচ ভেতরে যেতেও কুণ্ঠা হচ্ছিল। কারণ ঘরের ভেতরে আর কে আছে সে জানে না। তাকে দেখে নির্ঘাত চিৎকার উঠবেই, এ বাড়ির সমস্ত লোকই আর অন্ধ হতে পারে না। অতএব ভেতরে পা দেওয়া মানে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া। কিন্তু পুলিশগুলো কি ওদেরই শেঠ লেনের হত্যাকারী বলে ঠাউরেছে ? সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

অনিমেষ নিঃশব্দে বুড়োর দিকে এগিয়ে গেল। বুড়োকে সব কথা খুলে বললে কেমন হয়? বিনা কারণে পুলিশের রোষে পড়েছে জানলে যদি বুড়োর দয়া হয়। কিন্তু মুক্ত খোলার আগেই দরজায় শব্দ হল। অনিমেষ চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজায় একটি রোগা শরীর দাঁড়িয়ে আছে। এতে রোগা যে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। আধো অন্ধকারেও সেই মুখচোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপরই চিৎকার করার জন্যে মুখ হাঁ হল। অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত জড়ো করতেই শব্দটা বের হল না।

'আমাকে বাঁচান।' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল অনিমেষ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে। রক্তহীন শরীর, কোটরে ঢোকা চোখ, বয়স বোঝা মুশকিল। বৃদ্ধা ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল এবার। গলার স্বরে যেটুকু আওয়াজ হয়েছে তাতেই বোধহয় বুড়োর খটকা লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড বাজল, 'কে, কে এল ? খোকা এল না ? অ খোকা !'

ও পাশের বস্তি এখন জেগে উঠেছে। পুলিশগুলো বোধহয় সবাইকে ডেকেডুকে কিছু বলছে। রাত বেশি বেশি বলেই বোধহয় মানুষের উৎসাহ কম। পুলিশ বস্তি থেকে বেরিয়ে সরু গলিটায় টর্চ ফেলতে লাগল। আর একটু এগোলেই এই বারান্দাটা নজরে এসে যাবে।

'আমাকে বাঁচান, আমি নির্দোষ!' অনিমেষ আবার প্রার্থনা করল।

' কে কথা বলে ? বুড়োর গলায় সন্দেহ এবার।

' খোকা।' তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর বাজল ওই রোগা শরীর থেকে।

'অ খোকা, শুয়ে পড় বাবা, রাত ফুরিয়ে এল।' তৃপ্তির গলা এবার।

টর্চের আলো এগিয়ে আসছে। অনিমেষ দেখল বৃদ্ধা দরজার থেকে সরে দাঁড়াল সামান্য। এবং প্রথম সুযোগেই সে ঘরের ভেতর চলে এল। ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, কারণ বৃদ্ধা এর মধ্যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে জানতে চেয়েছে, 'কে তুমি ?' গলার স্বর উচ্চগ্রামে নয় কিন্তু খুব জেদি এবং শীতল।

'আমি রাজনীতি করি না।' শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার আগে অনিমেষের একটুও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাই নিজের কানেই শব্দটা ঠেকল।

' ভোটের লোক ?'

'না না। আমরা অন্য রাজনীতি করতে চাই।'

'অ্যাই কে তুই ?' বাইরে হাঁক উঠল।

'আমি নিবারণ দাস, আপনারা কে ?' বুড়োর গলা।

'পুলিশ। এখানে বসে আছিস কেন ?'

'ঘুম আসে না বাবু। চোখে দেখি না ঘুমও আসে না।'

আর একটি হেঁড়ে গলা বোধহয় জরিপ করেই বলল, 'এ শালা অন্ধ।'

'এদিকে কাউকে আসতে দেখেছিস ?'

'আমি তো চোখে দেখি না বাবু।'

'ফালতু সময় নষ্ট করছিস। ফিরে চল।'

কয়েক মুহূর্ত বাদেই গলিটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনিমেষ। এতক্ষণের উত্তেজনায় শরীর আর খাড়া থাকতে চাইছিল না। সেই হাঁটু গেড়ে অন্ধকারে বসে পড়ল। সেই সময় বাইরে থেকে বুড়োর চাপা গলা ভেসে এল, 'অ খোকার মা, খোকা আজ আবার কী করে এল, পুলিশ আসে কেন ?'

'ঘুমোও তো, চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ো না।' বৃদ্ধা থমকে উঠল।

'হ্যাঁ, এইবার ঘুম আসছে মনে হয়।' বুড়ো বিড়বিড় করল।

BanglaBook.org

সাদা কাপড়টাকে ঘরের এককোণে হেঁটে যেতে দেখল অনিমেষ। এই অন্ধকারেও সে ঘরের মধ্যে দারিদ্রের একটা গন্ধ টের পাচ্ছিল। কেমন একটা চিমসে হাওয়া পাক খাচ্ছে এখানে। এবং তখনই সে টের পেল এখানে শুধু ওরা দু'জনই নেই, আরও কয়েকটা নিশ্বাস পড়ছে মেঝেতে। ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল অনিমেষ। হ্যাঁ, বৃদ্ধা যেদিকে গিয়ে বসেছে সেদিকের মেঝেতে তিনটে শিশু শুয়ে আছে।

'তুমি চোর ডাকাত নও তো?'

'আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?'

'চেহারা দেখে আজকাল কিছু বোঝা যায় না।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কোনও অন্যায় করিনি। আমরা রাস্তায় পোস্টার লিখছিলাম এমন সময় পুলিশ তাড়া করল। আমাদের লেখাগুলো ওদের পছন্দ নয়।'

'কী লেখা?'

'আমরা এ দেশের নিয়মগুলো ভাঙতে চাই। এইসব মন্ত্রী, নেতাদের সরিয়ে এমন একটা সরকার আনতে চাই যেখানে ধনী দরিদ্রের কোনও পার্থক্য থাকতে না।'

'জানি না তুমি সত্যি বলছ কিনা, কিন্তু তোমাকে হুট করে এই ঘরে ঢুকতে দিলাম কেন জানো?'

'আপনার দয়া।'

'মোটেই না। বাইরের বুড়ো মানুষটা যদি ভুল বুঝেও নিশ্চিন্ত হয় তা হলে বাকি রাতটা একটু ঘুমুতে পারবে। উটকো লোককে এ ভাবে ঘরে ঢোকানো অন্যায় কিন্তু অন্ধ মানুষটার জন্যে—' বৃদ্ধার গলা বুঝে এল। সামান্য কান্নার আওয়াজ ঘরে পাক খেল। অনিমেষ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধা বলল, 'ভোর হবার আগেই তুমি চলে যেয়ো। মানুষটার জাগবার আগেই।'

'আচ্ছা।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রাত ঘন হলে কতগুলো নিজস্ব শব্দ সৃষ্টি করে। সেগুলো মাঝে মাঝে কানে আসছিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। সুবাসদারা ধরা পড়ল কি না বোঝা যাচ্ছে না। যদি ধরা পড়ে তা হলে শেঠ লেনের ঘটনায় ফেঁসে যাওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম রাতেই কী বিভ্রাট হল!

'তোমার মা বাপ নেই?' ঘরের কোণ থেকে গলা ভেসে এল।

'কেন?'

'রাত্তিরে বাড়ি ফিরছ না, তাদের চিন্তা হবে না?'

হঠাৎ অনিমেষের বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে এল। সত্যি, কলকাতা শহরে তার জন্যে চিন্তা করার কেউ নেই। কথাটা মাথায় আসতেই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা মুখ মনের মধ্যে চলকে উঠল। যতক্ষণ সে অন্যায় করবে না ততক্ষণ সেই মুখ আমৃত্যু তাকে সমর্থন করে যাবে। অনিমেষ বলল, 'চিন্তা তো হবেই! কিন্তু ভাল কাজ করতে গেলে তো ঘরে বসে থাকলে চলবে না।'

'তুমি মদ খাও?'

'না।'

'বিয়ে করেছ?'

'না।'

উত্তরটা শোনা মাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সেই শব্দ এতদূরে বসেও যেন অনুভব করল অনিমেষ। বুড়োর গলায় খোকা ডাকটা এই মুহূর্তে তার কাছে জলের মতো স্পষ্ট। খুব নরম গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কে?'

'আমার নাতি নাতনি।'

'ওদের মা বাবা?'

'মা চলে গেছে, বাপ মাতাল, অর্ধেক দিন বাড়ি ফেরে না। আমরা দুজন এদের পাহারা দিই। ঝি-এর কাজে আর ক'টা টাকা পাই!' এবার নিশ্বাস ভীষণ ভারী।

তারপর সব চুপচাপ। অনিমেষ আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। কখন ভোর হয় এই আশায় বসে থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোনও চিন্তা নেই।

'তোমরা কি লড়াই করে ভাল দিন আনবে, না আমাদের কাছে ভোট চাইতে আসবে?' হঠাৎ বৃদ্ধা স্বাভাবিক গলায় কথা বলল।

'আমরা ভোটে বিশ্বাস করি না।'

BanglaBook.org

'তা হলে ?'

'আমরা লড়াই করব।'

'পারবে ?'

'পারতে হবেই।'

'কী জানি বাবা।'

নিশ্বাসের শব্দ, আবার সব শান্ত। কিন্তু সেটা খুব সামান্য সময়ের জন্যেই। গলির ভেতর আওয়াজ উঠল। জড়ানো গলায় কেউ গান গাইছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষ দেখতে পেল বৃদ্ধা তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। আর তারপরেই বাইরে বুড়োর কণ্ঠ বাজল, ' কে এল ? খোকা এলি ? শুয়ে পড় বাপ।'

তীরের মতো বৃদ্ধা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। তারপরেই হাউমাউ করে কান্না উঠল। পুরুষ কণ্ঠে আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার গলা, 'আঃ চুপ কর, পাড়ার লোক জাগবে, মদ খেয়ে কাঁদতে লজ্জা করে না, তুই না পুরুষ মানুষ!'

তারপরেই খোলা দরজা দিয়ে বৃদ্ধা একটা দড়ি পাকানো শরীরকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে এল। লোকটাকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ওর নেই। এমনকী ঘরে যে অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে সে খেয়াল করার ক্ষমতাও ওর নেই।

ছেলেকে বাচ্চাগুলোর পাশে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল বৃদ্ধা। শোওয়া মাত্র ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল তার।

অনিমেষ দাঁড়িয়েছিল বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলল, 'রাত শেষ হয়ে এসেছে, তুমি যাও।'

সেই সময়েই বুড়োর গলা বাজল, 'ও খোকার মা, খোকা দুবার এল কী করে, আগে কে এসেছিল ?'

'কেউ না। ঘুমোও তো।' খিঁচিয়ে উঠল বৃদ্ধা।

'কিন্তু আমি যে শুনলাম— ।'

'ভুল শুনেছ।'

অনিমেষ নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বৃদ্ধা পেছন পেছন এসেছে। আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। বারান্দার এক কোণে বুড়ো গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। বস্তির মানুষ জাগব জাগব করছে এইবার। অনিমেষ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার কাছে আমি ঋণী হলাম।'

বৃদ্ধা বলল, 'কী কথার ছিরি ! তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো।' বলে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

এক মুহূর্ত অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভারতবর্ষের একটা ক্ষুদ্র শরীরকে ঘরের মধ্যে রেখে ভোর হয়ে আসা সময়ে সে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল।

চৌত্রিশ

খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে গেল। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের কিছু মানুষ যারা এতকাল টুকরো টুকরো ভাবনা চিন্তা করছিল তারা ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। তলায় তলায় যে উত্তাপ জন্ম নিচ্ছে তার খবর চাপা থাকল না। কিন্তু ব্যাপারটার বাস্তবতা সম্পর্কে শাসকদল এবং কমিউনিস্ট পার্টির যথেষ্ট সন্দেহ থাকায় ওরা তেমন আমল দিচ্ছিল না। কিন্তু ক্রমশ বাতাস ভারী হয়ে আসছিল।

অনিমেষের ওপর নির্দেশ ছিল যে কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট এড়ানো জন্যে তৈরি থাকতে এবং বিকল্প থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তাকে সন্দেহ করছে এমন ভাবার কোনও কারণ দেখে না অনিমেষ। এম. এ. পরীক্ষা এসে গেল বলে। অথচ পড়াশুনা হচ্ছে না বললেই হয়। পার্টির কাজে অনেক সময় কুড়ি ঘণ্টাই কেটে যাচ্ছে আজকাল। মাঝে মাঝে রাত্রে হোস্টেলে ফেরাই হয় না। এ ব্যাপারে কাউকে কৈফিয়ত দেবার নেই বলেই বাঁচোয়া। বিভিন্ন গ্রুপ মিটিং-এ তাকে থাকতে হচ্ছে। মহাদেববাবুর ইচ্ছে অনিমেষ উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোর দায়িত্ব নিক। এ ব্যাপারে অবশ্য অনিমেষেরও আপত্তি নেই। কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শিলিগুড়ি ইউনিট এখন বেশ জোরদার হয়েছে। মোটামুটি ভাবে একই চিন্তাভাবনার শরিক মানুষগুলোর সঙ্গে অনিমেষের আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে।

Banglabook.org

শিলিগুড়ির কিছু দূরে একটি স্থান নির্বাচন করা হয়েছে মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে পাকিস্তান আর এক পাশে নেপাল। ভৌগোলিক বিচারে গেরিলা বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স হবার পক্ষে অতি উপযুক্ত জায়গা। দুটি বিদেশি রাষ্ট্র থাকায় কতগুলো বিশেষ সুবিধে পাওয়া যাবে। এলাকার চতুর্দিকে জঙ্গল এবং নদী পার হলেই নেপাল। মোটামুটিভাবে ওখানকার অধিবাসীরা কৃষিজীবী, বাঙালি বর্ণহিন্দু সংখ্যায় অল্প। এক ধরনের তেজি ভাব আছে মানুষের আচার ব্যবহারে। এলাকাটির নাম নকশালবাড়ি।

নকশালবাড়ি ফাঁসিদেওয়া খড়িবাড়ি অঞ্চলে কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষকদের সশস্ত্র করে ওই এলাকাকে মুক্ত অঞ্চলে পরিণত করার কাজ গোপনে চলেছে। চিনের মতো কেবলমাত্র গ্রামেই মুক্তাঞ্চল গঠন এবং তারপর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের কোনও একটি জায়গা যদি লাল অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয় তখন অন্যান্য অংশের নিষ্পেষিত কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেই। ওদিকে অন্ধ্রের ওয়ারাঙ্গেলের জঙ্গল এলাকায় ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবী বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও একটা বিশেষ অভাব অনুভূত হচ্ছিল। আসন্ন বিপ্লবের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য একজন সর্ব-ভারতীয় বিশ্বাসযোগ্য নেতা এগিয়ে আসছিলেন না। একজন লেনিন বা মাও সে তুং, হো চি মিন কিংবা ফিডেল কাস্ত্রো দূরের কথা, চোখের সামনে চে গুয়েভারার মতো সংগ্রামী পুরুষের অভাব চোখে ঠেকছিল। অনিমেষরা মনে করে নেতা বিপ্লব তৈরি করে না, বিপ্লবই নেতার জন্ম দেয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মী বিভিন্ন রাস্তার কথা ঘোষণা করতে লাগলেন। মতবাদের নানারকম ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীরা কিছুটা থমকে পড়ছিল যার পরিণতিতে দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠল। অবশ্য এ কথা ঠিক তখন কোনও দল হিসেবে সংগঠন পূর্ণতা পায়নি। তবু শাখাগুলো চোখে পড়তে লাগল। একজন সর্বভারতীয় অবিসংবাদিত নেতার অভাব সবাই এক মুহূর্তে অনুভব করছিল।

কীভাবে বিপ্লব শুরু হবে, বিপ্লব চলাকালীন দলের ক্রিয়াকলাপ কী স্তরে থাকবে? যেহেতু নকশালবাড়ি আন্দোলন কৃষিভিত্তিক আন্দোলন তাই শ্রমিকদের সঙ্গে এর সংযোগ কীভাবে সাধিত হবে? এ ধরনের তত্ত্বগত প্রশ্ন অনেকের মনে জাগছিল। কিন্তু অনিমেষরা এ নিয়ে বেশি ভাবছিল না। শ্রেণীশত্রু যে সে যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে বিনা দুর্বলতায়। কোনওরকম আপস করা চলবে না। বিদেশে নির্বাচিত গেরিলাদের পাঠিয়ে সমরশিক্ষায় শিক্ষিত করে নিয়ে এসে গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করতে হবে। একটা যুদ্ধ জয় করতে হলে বিরাট বাহিনী নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় যদি তার উপযুক্ত রণকৌশল না থাকে। ইতিহাসে এর প্রমাণ ভূরি ভূরি মেলে। সঠিক রণনীতি থাকা সত্ত্বেও রণকৌশলের অক্ষমতার কারণে বিপ্লব মাথা থুবড়ে পড়েছে। ১৯১৭ সালের রাশিয়া বা মাও সে তুং-এর চিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের মূল কারণ সঠিক রণকৌশলের পরিকল্পনা। এই রণকৌশল যে সব সময় তাত্ত্বিক পথেই চলবে তা মনে করার কোনও কারণ নেই। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লবের প্রয়োজনেই তার রূপ নির্ধারিত হবে। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেনিনের অভ্যুত্থানের আহ্বান কিংবা মাও সে তুং ১৯১৭-১৮ সালে দলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কসবাদী প্রথাগত রণকৌশলের পরিবর্তে গ্রামে গ্রামে মুক্তাঞ্চল গঠন করার যে ডাক দিয়েছেন তা এই সত্যতাই প্রমাণ করে। অনিমেষেরা এই রণকৌশলের ব্যাপারে তত্ত্বের সঙ্গে কোনও রকম আপস করবে না বলে ঠিক করল, যদি বিপ্লবকে থিতিয়ে দেয়। ফলে পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে অন্য মতবাদের সঙ্গে চাপা রেষারেষি সে অনুভব করছিল। কিন্তু যাই হোক না কেন, একটা বিশ্বাস প্রত্যেকের মধ্যে ছিল, একবার যখন চাকা গড়াবে তখন সমস্ত হাত এক হয়ে তাকে মদত দেবে। মতবাদ যাই হোক না কেন, এ কথা তো ঠিক সবার মূল লক্ষ্য হল ভারতবর্ষে সর্বাত্মক বিপ্লব যা রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পালটে দেবে।

কলকাতা শহরের আশেপাশে ছোট ছোট দল তৈরি হয়ে গেল। একদিকে দমদম সিঁথি বরাহনগর বেলঘরিয়ায়, অন্যদিকে বেলেঘাটা যাদবপুর টালিগঞ্জ এলাকায় কাজকর্ম জোরদার হতে লাগল। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ এখন অস্থির। সরকারের চাপানো লেভির চাপে ছোট বড় জোরদাররা কংগ্রেস সম্পর্কে বিমুখ হচ্ছে। একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেসি নেতাকে দল থেকে বিতাড়িত করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওই নামে পালটা দল গঠন করেছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের নিয়ে। সারা দেশের জোতদাররা তাঁকে সমর্থন করছে। সাধারণ জনসাধারণ জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম, আইনশৃঙ্খলার অভাবে বিপর্যস্ত। অনিমেষরা বুঝতে পারছিল, এই সময়েই কাজ শুরু করা উচিত। এখন এগিয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে সহজেই সঙ্গে পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

বেলঘরিয়াতে আজ গ্রুপ মিটিং ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই সভাগুলো করতে হয়। এতদিন পুলিশের ভয় ছিল, এখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও ভয়ের কারণ হয়েছে। একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। এ খবর তারাও টের পেয়েছে। হয়তো এখনও বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু স্বস্তিও হচ্ছে না। আজকের মিটিং-এ অনিমেষরা স্থির করল এলাকা দখল করতে হবে। একটা রাস্তা থেকে একটা পাড়া এবং সবশেষে সমগ্র এলাকা দখলে নিয়ে আসতে হবে। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়া হবে না। তবে পুলিশি অত্যাচার শুরু হলে গেরিলা কায়দায় তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এখন বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর বোমা তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি দমদমে একটা গোপন ডেরায় বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ হয়ে দুটি ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর বোমা ও মশলা বাজেয়াপ্ত করার পর তাদের তৎপরতা বেড়ে গেছে। কলকাতার পাঁচটি গোপন কেন্দ্রে পাইপগান তৈরি হচ্ছে অনবরত। পাকিস্তান যুদ্ধের কিছু মালপত্র ব্ল্যাকমার্কেটে রয়ে গেছে। সেগুলো কিনতে হলে ভাল টাকা পয়সা দরকার। প্রতি এলাকায় যথেষ্ট সম্পন্ন পরিবারগুলো কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হবে। তবে কোনও অবস্থাতেই দরিদ্র সাধারণ মানুষকে যাতে বিরক্ত করা না হয় এই বলে সতর্ক করে দিল অনিমেষ। কিন্তু এলাকা দখল করতে গেলে প্রথম প্রতিরোধ করবে রাজনৈতিক দল। এখন শহরতলির এইসব এলাকা তথাকথিত কমিউনিস্টদের দখলে। পাকিস্তান থেকে আসা বাঙালিরা কলকাতার এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন স্বাধীনতার পর থেকেই। তাঁরা নিঃস্ব অবস্থা থেকে আবার যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছেন তখন কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে অনেক ক্ষোভ জমছিল। যার ফলশ্রুতি হিসেবেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি এঁদের সমর্থন গেছে। বিধান রায়ের আমলে কংগ্রেস নির্বাচনের সময় এই আসনগুলোকে বাদ দিয়েই তাদের জয়ের হিসেব করত। অতএব এইসব এলাকার কমিউনিস্ট সংগঠন কখনও স্বেচ্ছায় কর্তৃত্ব হস্তান্তর করবে না। এ ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ এড়ানো যাবে না। মিটিং-এ একটি ছেলে প্রশ্ন তুলল, 'অনিমেষদা, বোমা ছোঁড়া কিংবা পাইপগান চালানো অভ্যেসের ওপর নির্ভর করে। আমরা খবর পাচ্ছি অ্যাকশন শুরু হলে কিছু ছেলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইবে। এই ছেলেরা এতকাল সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এককালে এরা অনেকেই কংগ্রেসের পোষা গুন্ডা বলে চিহ্নিত কিন্তু নিজেদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এদের কি নেওয়া ঠিক হবে?'

কয়েকদিন আগে মহাদেবদার সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে অনিমেষের। যারা সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত তাদের আন্দোলনে নিলে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝতে পারে। উত্তরে মহাদেববাবু দলের একজন তাত্ত্বিক নেতার বক্তব্য জানিয়েছিলেন, 'আন্দোলন শুরু হলে কে ভাল কে মন্দ বিচার করা যথেষ্ট বোকামি হবে। মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যে কোনও হাতের সাহায্য নিতে হবে। যারা সমাজবিরোধী বলে পরিচিত তাদের মধ্যে এক ধরনের বন্য-শক্তি কাজ করে, যেটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে কল্পনাতীত ফল পাওয়া যায়। কোনও একটা মহৎ কাজে অংশ নিচ্ছি এই বোধ একবার ওদের মনে সঞ্চারিত হলো ওরা আমাদের গর্ব হয়ে দাঁড়াবে।' কথাটা অনিমেষ মিটিং-এ বুঝিয়ে বলল। যদিও এ-ব্যাপারে তার নিজেরই কিছু দ্বিধা আছে তবু এখানে সে প্রকাশ করল না। ছেলেটি এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কোনওরকম রাজনীতি-সচেতনতা ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা মুনাফা লুটবার জন্য ব্যগ্র এই ছেলেগুলো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে তা আমাদের পক্ষে বিরাট ক্ষতি হয়ে দাঁড়াবে না?'

অনিমেষ হাসল, 'সারা ভারতবর্ষের মানুষ যদি আজ বিপ্লবে অংশ নেয় তা হলে কি আমরা তাদের পরীক্ষা করব যে তারা রাজনীতি-সচেতন কিনা? মার্কসবাদ না বুঝলে বিপ্লবে অংশ নেবার কোনও অধিকার নেই এই রকম শর্ত রাখব কি? আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা উঠলে তার সম্ভাবনা তো সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। অত্যন্ত শিক্ষিত মার্কসবাদে দীক্ষিত নেতারা কি ঠিক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? সে ঝুঁকি তো আমাদের নিতে হবেই। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি অশিক্ষিত মানুষ এবং আপাত চোখে যাদের সমাজবিরোধী বলা হয় তাদের থেকে মুখোশ পরা শিক্ষিত মানুষের চরিত্র অনেক বেশি তরল হয়।'

শেষ প্রশ্ন হল, 'প্রতিরোধ যদি মার্কসবাদী দলগুলো থেকেই আসে তবে তাদের মোকাবিলা করতে হলে বলপ্রয়োগ করতেই হবে। এই ঘটনা কি বিপ্লবের ক্ষতি করবে না?'

উত্তর দিতে অনিমেষ একটুও ভাবল না। নিজের বুড়ো আঙুলটা ওপরে তুলে ধরে বলল, 'যদি কোনও বিষাক্ত ঘায়ে এটিতে পচন ধরে তা হলে তাকে কেটে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধা করব না। নিজের আঙুল বলে মায়া দেখালে কয়েকদিন পরে সমস্ত শরীরটায় পচন ধরবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের

BanglaBook.org

চাইতে সংশোধনবাদীরা আমাদের কাছে বেশি ক্ষতিকর।'

এলাকা দখল করতে হলে কী কী করতে হবে তার বিশদ পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হল। কোনওমতেই হঠকারিতা করা চলবে না। এবং দলের সংকেত না পেলে কেউ এমন কাজ করবে না যা অন্যের সন্দেহ উদ্রেক করবে।

মিটিং শেষ করে বাইরে বেরিয়েই অনিমেষের মাধবীলতার কথা মনে পড়ল। এই জায়গাটা থেকে ওর বাবার বাড়ি এমন কিছু দূরে নয়। অথচ সেই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে মেয়েটা আর একবারও এখানে ফিরে আসেনি। মাধবীলতা অনিমেষের সঙ্গে কথা বলার সময় ভুলেও এইসব প্রসঙ্গ তোলে না। এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত শীতল হয়ে গেছে সে।

এখন প্রত্যহ দেখা করার সুযোগ বা সময় হয় না। মাধবীলতার দৈনিক রুটিন অনিমেষের জানা। সময় পেলেই সে সেখানে হাজির হয়। অনিমেষ লক্ষ করেছে তাকে দেখা মাত্র মাধবীলতার মুখ কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই মুখটির জন্যে পৃথিবীতে অনেক কাজ করে যাওয়া যায়। অনিমেষের নতুন চিন্তাধারার কথা মাধবীলতা জানে। যে মেয়ে এককালে বলত, আমার বড় ভয় করে, সে এখন খুব বদলে গেছে। এখন সে চুপচাপ ওদের কাজকর্মের কথা শোনে।

বেলঘরিয়া থেকে বেরিয়ে মানিকতলায় আসার কথা ছিল। মহাদেবদা রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের একটা বাড়িতে থাকবেন। খুব জরুরি দরকার। যাদের সঙ্গে মিটিং করছিল এতক্ষণ তাদের একটি ছেলে ওকে সাইকেলে করে বি.টি. রোডে পৌঁছে দিয়ে গেল গলিপথে। চারধারে এখন নির্বাচনের হাওয়া লেগে গেছে। সাধারণ মানুষের ধারণা এবারও কংগ্রেস জিতবে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অবশ্য কেউ এখন ভালমন্দ ধারণা করতে পারছে না, তবু নেহরু পরিবারের ওপর সারাদেশের একটা অন্ধ ভরসাবোধ আছে। সেই সুবাদেই জয় সম্পর্কে ওরা নিশ্চিন্ত। সাইকেলে আসতে আসতে অনিমেষ নির্বাচনের পোস্টার দেখছিল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট প্রার্থী তাঁর প্রচারের সমর্থনে লেনিনের বাণী ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাপারটাই অনিমেষের কাছে বিস্ময়ের মনে হয়। যা বিশ্বাস করি না, যে সব কথা জীবনে কখনও প্রয়োগ করব না তাই দেওয়ালে, পোস্টারে লিখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করব নির্বাচিত হবার বাসনায়! এইসব লেখার পাশে নতুন লেখা এখন কারও চোখে না পড়ে থাকছে না। অনিমেষও দেখল নির্বাচনী পোস্টারের পাশে প্রায়ই জ্বলজ্বল করছে—পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়। নির্বাচন বয়কট করুন। সাধারণ মানুষ এখনও মুখ না খুললেও বাতাসে একটা চাপা উত্তেজনা ক্রমশ জমছে এটা টের পাওয়া যায়।

মানিকতলার মোড়ে নেমে রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে হেঁটে এল অনিমেষ। এটা ওর পুরনো পাড়া। কলকাতায় এসে এখানকার হোস্টেলে উঠেছিল স্কটিশে পড়ার সময়। অনেকগুলো বছর কেটেছে এখানে। এই পাড়াটা সেইরকমই রয়ে গেছে, শুধু হোস্টেলের সেই ছেলেরা আর নেই। লাহা বাড়ি ছাড়িয়ে বাঁদিকের দোতলা বাড়ির দরজায় টোকা দিল সে। রাস্তাটা এখন খালি। সবে সন্ধে হয়েছে কিন্তু কোনও কারণে পথের আলো জ্বলেনি। অনিমেষ দেখল দরজার ডান দিকে একটা কলিং বেলের বোতাম রয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণনা অনুযায়ী যে সে ঠিক বাড়িতেই এসেছে তাতে কোনও ভুল নেই। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই সে আবার শব্দ করতে ওপরের ব্যালকনি থেকে একজন ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কাকে চাই?'

'আমি অনিমেষ।'

ওপরে তাকিয়ে পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন। তার কয়েক মুহূর্ত বাদেই সেই মানুষটি দরজা খুলে ওকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। একতলার পেছন দিকের ঘরে মহাদেবদারা বসে আছেন। সুবাসদাও রয়েছে। সেই পোস্টার মারার রাতের ঘটনার পর সুবাসদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। অনিমেষ সে প্রসঙ্গ তুলবে ভাবতেই মহাদেবদা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একা এলে?'

'একাই তো! কেন বলুন তো?'

'কাউকে দ্যাখোনি পেছনে আসতে?'

অনিমেষ অন্যমনস্ক ছিল কিন্তু পেছন পেছন কেউ এলে নিশ্চয়ই টের পেত সে। একটু চিন্তা করে সে বলল, ' চোখে পড়েনি।'

'কিন্তু এই গলিতে একজন আছে; তোমাকে যে এখানে আসতে নিষেধ করব তারও তো কোনও উপায় ছিল না। ঠিক আছে, বেলঘরিয়াতে কেমন কাজ হল আজ?' মহাদেবদা চিন্তিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

BanglaBook.org

'ভাল। খুব সিরিয়াস ছেলে সব। হুলিগানদের দলে নেবে কিনা প্রশ্ন করেছিল।' অনিমেষ জানাল।

'নিতেই হবে। রিস্ক থাকছে বটে, এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আর হুলিগান কারা? যারা বোম মারছে, ছিনতাই করছে, তারাই আবার কোনও গরিব বৃদ্ধার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। তাই এখন আর ও সব নিয়ে কিছু চিন্তা করা উচিত নয়।'

মহাদেবদা কথা শেষ করে সুবাসদার দিকে তাকালেন। সুবাসদা একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'অনিমেষ, আমাদের কাছে খবর এসেছে তুমি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়েছ। সাম হাউ পুলিশ তোমার খবর জেনে গিয়েছে। তোমার আর ওই হোস্টেলে থাকা উচিত নয়। যে কোনও মুহূর্তেই তোমাকে অ্যারেস্ট করতে পারে।'

'আপনাদের খবর ঠিক আছে?'

মহাদেবদা বললেন, 'আমাদের খবর যেমন পেয়ে যাচ্ছে ঠিক ওদের কিছু কিছু খবরও আমরা পাচ্ছি।'

খবর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এ কথা সত্যি। দেশজুড়ে যে একটা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে এই খবর এখন সরকারের জানা। সাধারণ মানুষও যে ও ব্যাপারে অজ্ঞ তা বলা চলে না। যেহেতু কংগ্রেসি সরকার নানা ঝামেলায় বিব্রত তাই অনিমেষদের সুবিধে হচ্ছে একজন বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতাকে দল থেকে বিতাড়িত করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্য-নীতি অনুযায়ী সারা দেশের জোতদাররা এখন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন। তাঁরা ভিড় করেছেন দলচ্যুত গান্ধীবাদী নেতার চারপাশে। নতুন দল গড়ে উঠেছে তাঁর নেতৃত্বে। তবু পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে এ কথা বলা যাবে না। খবরের কাগজে পুলিশ কর্তৃক উগ্রপন্থীদের ডেরা আবিষ্কার—এ সব খবর প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। পরিস্থিতি অবশ্যই নিশ্চিন্তের নয়।

অনিমেষ হাসল, 'আপনাদের সাজেশন কী?'

সুবাসদা বলল, ' তোমার থাকার বিকল্প ব্যবস্থা আছে?'

'না। দু-একজন বন্ধুর মুখ মনে পড়ছে অবশ্য।'

'তাদের কারও কাছে আজ রাত্রে থেকে যাও। হোস্টেলে ফিরো না।'

'কিন্তু আমার জিনিসপত্র তো ওখানে পড়ে আছে।'

'ওগুলোর কথা পরে চিন্তা করা যাবে।'

মহাদেবদা বললেন, 'অনিমেষ, তোমার এখন কলকাতা থেকে চলে যাওয়া দরকার। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আগে থেকেই চিন্তা করছিলাম। এটাই মনে হয় উপযুক্ত সময়। তুমি উত্তরবাংলায় চলে যাও। ওখানে টেনশন কম থাকবে, মনের মতো কাজ করতে পারবে আর পুলিশের ঝামেলা থেকে অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে?'

মহাদেবদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কবে যাবে?'

'আজ নয় কাল। শিলিগুড়ির স্টেশনপাড়ায় একজনের সঙ্গে দেখা করবে। তাকে সব খবর দেওয়া হয়ে গেছে। হি উইল টেল ইউ এভরিথিং।'

'আজ রাত্রে রওনা হওয়ার একটু অসুবিধে আছে।' কথাটা বলার সময় মাধবীলতার মুখ মনে পড়ল অনিমেষের। ওকে একটুও না জানিয়ে হুট করে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হবে।

'কালই যেয়ো। এই সময়টা বাইরে বেশি ঘুরে বেড়িয়ো না। উত্তরবাংলায় তোমার চেনা এলাকায় কাজ করতে নিশ্চয়ই সুবিধে হবে। তা ছাড়া কলকাতা ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। আমাদেরও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'আমাদের যোগাযোগ থাকবে কি করে?'

'সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুবাস যাচ্ছে বীরভূমে, আগামী মাসে বোলপুরে একটা গোপন মিটিং আছে। খবর পাবে, তখন দেখা হবে। আচ্ছা, আজ আর রাত কোরো না।' মহাদেবদা ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে রাস্তাটা দেখতে বললেন।

অনিমেষ বলল, 'সুবাসদা, আমায় যদি কালই চলে যেতে হয় তা হলে হোস্টেলের জিনিসপত্রগুলোর কি হবে? আমি তো আজ —।'

'একটা ঠিকানা দাও, পৌঁছে দেওয়া হবে।'

BanglaBook.org

অনিমেষ এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাধবীলতার ঠিকানাটা দিল। সুবাসদা বলল, 'ওটা তো গার্লস হোস্টেল, তাই না ?'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ সুবাসদার মুখে চোখ রাখল, কোনও ভাবান্তর দেখতে পেল না। রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এখন ফাঁকা। কোথাও রেডিয়ো বাজছে তারস্বরে। অনিমেষ ওর পুরনো হোস্টেলের সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিল। সামনে পেছনে তাকিয়ে সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেল না। মহাদেবদার খবর কতটা সত্যি কে জানে। নাকি তাড়াতাড়ি যাতে সে উত্তরবাংলায় যায় তাই এ সব কথা বললেন ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না, এরকম ছেলেমানুষি মহাদেবদা করবেন না। আজ রাত্রে কোথায় থাকবে ভাবতে লাগল অনিমেষ। পরমহংসের মুখ মনে পড়ল। ওর বাড়িতে গিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই না বলবে না। কিন্তু হোস্টেলে ফেরা যে দরকার ছিল। খাটে তোশকের তলায় কিছু টাকা রয়েছে, ও গুলোর প্রয়োজন। অনিমেষ ঠিক করল পরমহংসকে রাজি করাবে তার হোস্টেলে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসতে। তমালকে একটা চিঠি লিখে দিলে সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে। হোস্টেলের সামনে পুলিশ থাকতে পারে কিন্তু তার ঘরের সামনে নিশ্চয়ই কেউ পাহারা দিচ্ছে না। এখন ঘটনা কী দ্রুত মোড় নিচ্ছে অথচ আজ হোস্টেল থেকে বেরুবার সময় এ সব সে টেরই পায়নি।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে অনিমেষ ডান দিকে মোড় নিল। বিবেকান্দ রোড ধরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গিয়ে ট্রাম ধরে পরমহংসের বাড়িতে যাবে। রাত হয়েছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওর টিউশনি শেষ হয়েছে।

অনিমেষ সাবধানে পথ হাঁটছিল। হঠাৎ ওর অস্বস্তি শুরু হল। মনে হল কেউ ওর পেছন পেছন হাঁটছে। ঘাড় ঘুরিয়ে কোনও সন্দেহজনক মুখ দেখতে পেল না সে। হাসল অনিমেষ, মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে এইরকম গোলমেলে চিন্তা আসে। তবু নিশ্চিন্তে সে ফুটপাত পালটাল। একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে পয়সা দিয়ে সিগারেট কিনল। কিনেই চট করে ঘুরে দাঁড়াল। খুব দ্রুত উলটো ফুটপাতের মানুষগুলোকে লক্ষ করতে গিয়ে অনিমেষের চোখ একটি মুখের ওপর স্থির হল। লোকটা চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। অনিমেষ দৃষ্টি সরাচ্ছিল না। লম্বা, রোগা লোকটা যে একটু অস্বস্তিতে পড়েছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এমনিতে খুব নিরীহ দেখাচ্ছিল তাকে, শুধু কিছুতেই আর এদিকে চোখ ফেরাচ্ছিল না। অনিমেষের তবু সন্দেহ ছিল যে মহাদেবদার কথামতন এই লোকই সেই লোক কিনা। সে হঠাৎ এগিয়ে পাশের কালোয়ারের গলিতে ঢুকে পড়ল। এখানকার হোস্টেলে থাকার সময় এই গলি দিয়ে ওরা শর্টকাট করত কলেজে যেতে। দুপাশে লোহালক্কড়ের দোকান, গলিটাও সরু। দ্রুত পায়ে বেশ কিছুটা গিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরতেই অনিমেষ পেছনে তাকাল। লোকটি হন্তদন্ত হয়ে ফুটপাত পেরিয়ে গলিতে পৌঁছে গেছে। ওর একটা হাত কোমরের কাছে সতর্ক ভঙ্গিতে রাখা।

অনিমেষ পা চালাল। আর সন্দেহ করার কিছু বাকি থাকল না। পুলিশ তার পেছনে লেগে গেছে। এখন এই লোকটাকে কোনওভাবে না কাটাতে পারলে পরমহংসের বাড়িতে যাওয়া যাবে না। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে সে বিবেকানন্দ রোডে এসে পড়ল। রাস্তাটা পার হয়ে স্কটিশের গলিতে ঢুকে পেছনে ফিরতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। কালোয়ারেরর গলি থেকে বেরিয়ে এ পাশ ও পাশ দেখছে। অনিমেষ একটা থামের পাশে নিজেকে গুটিয়ে লক্ষ করতে লাগল। লোকটা দুদিকের ফুটপাত ভাল করে যাচাই করে রাস্তা পার হচ্ছে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। অনিমেষ থামটা ছেড়ে পা বাড়াবার আগেই দেখতে পেল রাস্তার এধারে দাঁড়ানো একটা জিপের পাশে গিয়ে লোকটা হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। ওটা যে পুলিশের গাড়ি তা বুঝতে সময় লাগল না। কারণ চার-পাঁচটা পুলিশ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। অনিমেষ আর অপেক্ষা করল না। ফুটপাত ধরে সোজা ছুটতে লাগল স্কটিশের দিকে আর তখনই পেছনে হইচই শুরু হল। পুলিশগুলো ছুটছে এবার।

রাস্তাটা বাঁক নিতেই চোখের সামনে লাল বাড়িটা যেন ছিটকে চলে এল। অনিমেষের মনে পড়ল সেই সন্ধের কথা। স্কটিশ হোস্টেলের সেই আফ্রিকান ছেলেটির সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওরা একজন মহিলাকে এখানে নামিয়ে দিয়েছিল। এই মুহূর্তে মহিলার নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু পঁয়ত্রিশ আর চারটে শূন্য-টেলিফোনের এই নম্বরটা মনে করতে একটুও অসুবিধে হল না। একটুও ইতস্তত করল না অনিমেষ। চিৎকার চেঁচামেচিটা এগিয়ে আসছে। এখনই রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। সামনে এগুলে লুকোবার কোনও জায়গা নেই। অনিমেষ গম্ভীর মুখে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে লাল বাড়িটার ভেতরে ঢুকে আড়ালে দাঁড়াল। পুলিশগুলো সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল খানিক, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। ঠিক এমন সময় পেছনে একটা গলা আচমকা কথা বলে ওঠায় অনিমেষ চমকে উঠল। 'কাকে চাই ?'

BanglaBook.org

অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ধুতি ফতুয়া পরে তার দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছেন। কিছুতেই নামটা মনে করতে পারল না অনিমেষ। থম্বোটোর নাম মনে পড়ছে, এমনকী ভদ্রমহিলার হাসিও, কিন্তু—। অথচ আর বেশি ইতস্তত করলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। বাইরে বেরুলে আর রক্ষে থাকবে না এ তো স্পষ্ট।

কুলকুল করে ঘামতে লাগল সে। তারপর কোনও রকমে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করল, 'এ বাড়িতে থ্রি ফাইভ ফোর জিরো ফোন কোন ফ্ল্যাটে জানেন?'

'টেলিফোন? কী দরকার?' বুড়োর গলায় সন্দেহ।

'আমি টেলিফোন অফিস থেকে আসছি।'

মিথ্যে কথাটা খুব দ্রুত অনিমেষের জিভে এসে গেল।

'অ। দোতলায় বাঁ দিকে। ওই একটিই টেলিফোন আছে এ বাড়িতে। নাম্বার-ফাম্বার জানি না।' ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেন।

অনিমেষ আর দাঁড়াল না। সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। কলিং বেলে হাত রাখল সে। জলতরঙ্গ বাজল। অনিমেষের মনে হল বুড়োটা যদি এখন বাইরে বের হয় আর পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে তা হলে তা আর উপায় থাকবে না। ব্যস্ত হয়ে আবার সে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে একজন বৃদ্ধা উঁকি মারল, 'কী চাই?'

আর কী আশ্চর্য ব্যাপার, মুখ খুলতেই নামটা জিভে এসে গেল। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'শীলা সেন আছেন?

'আপনার নাম?

'অনিমেষ মিত্র।' পরিচয় দিয়েই অনিমেষের মনে হল শীলা সেন হয়তো বুঝতেই পারবেন না সে কে। এত বছরের অদর্শন সেই সামান্য পরিচয়কে ভুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই সে আর একটু জুড়ে দিল 'স্কটিশ কলেজের হোস্টেলে আমি থাকতাম।'

মিনিট তিনেক অপেক্ষা করতে হল অনিমেষকে। এখন এক সেকেন্ড এক ঘণ্টার মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে। পুলিশগুলো যদি নীচের সেই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে তা হলে এখানে চলে আসতে পারে। আর শীলা সেন এত দেরিই বা করছেন কেন? যদি ভদ্রমহিলা তাকে চিনতে না পারেন তো হয়ে গেল। তখন রাস্তায় এমন অবস্থা যে এগিয়ে গিয়ে লুকোবার উপায় নেই আর মাথায় শীলা সেনের কথাও আচমকা এসে গেল।

আধখোলা দরজার সামনে অনিমেষ যখন প্রায় অসহিষ্ণু তখনই আহ্বান এল। মহিলা তাকে ভেতরে আসতে বলল। সাজানো টেবিল-চেয়ার দেখে বোঝা যায় এটাই বসবার ঘর। অনিমেষ তার একটায় বসতে গিয়ে দেখল সেখানে ধুলো পুরু হয়ে আছে। অনেক দিন কারও হাত পড়েনি এখানে। বৃদ্ধা বলল, 'দিদিমণি এখানে আসতে পারবে না।' তারপর একটু উদাসী গলায় জানাল, 'তেনার শরীর খারাপ।'

অনিমেষের নজর বাইরের দরজার দিকে ছিল, শেষ কথাটা শুনে খুব হতাশ হল সে। শীলা সেন যদি অসুস্থ হন তা হলে ভেতরে আসতে অনুমতি দিলেন কেন? এই বাড়িতে কি আর লোকজন নেই? কেমন চুপচাপ চারধার। অনিমেষ বলল, 'আমি কি ওঁকে দেখতে যেতে পারি?'

'সে-কথাই তো বলল। আমার সঙ্গে আসুন।'

মাঝখানে একটা অবিন্যস্ত ঘর। কিছু পুরনো দিনের আসবাব। ঘরটা পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে অনিমেষের মনে হল কেউ যেন কোনার ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। কিন্তু তার শরীর এত ক্ষীণ যে অস্তিত্ব বোঝার আগেই সে তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করল।

এমন ঝকঝকে তকতকে ঘর অনিমেষ কখনও দেখেনি। এই বাড়ির চরিত্রের সঙ্গে এই ঘর একদম মানায় না। বৃদ্ধা একটা সোফা দেখিয়ে বসতে বলে অন্য ঘরে চলে গেল। ঘরে কেউ নেই। কোনার দিকে সুন্দর সাজানো বিছানা। বিছানার পাশে একটা স্ট্যান্ডে টেলিফোন। ঘরের সমস্ত দেওয়াল এবং ছাদ প্লাস্টিক রং করা। দেওয়ালের গায়ে লম্বা রঙিন কার্পেট। এমনকী ঘরের মেঝেতেও রঙিন টাইল সাজানো। এই ঘরের মালিকের শৌখিন মেজাজ এক পলকেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। অনিমেষ সোফায় বসতে যাচ্ছিল এমন সময় পাশের একটা দরজা খুলে গেল। হাউসকোট পরে যিনি ঢুকলেন তাঁকে দেখে চমকে উঠল অনিমেষ। সামান্য কয়েকটা বছরের ব্যবধানে একটি মানুষের চেহারা কি এত দ্রুত পালটে যেতে পারে? অনিমেষ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

BanglaBook.org

'কী খবর! এতদিনে মনে পড়ল ? ওমা! এ যে দেখছি সোমথ পুরুষ হয়ে গেছ!' শীলা সেন হাসলেন।

অনিমেষ খুব কষ্টে চোখ খোলা রাখছিল। এ কাকে দেখছে সে! হাউসকোটের আড়ালে যে বিশাল শরীরটা পায়ে পায়ে হেঁটে খাটের দিকে এগোচ্ছে তার সঙ্গে থস্নোটোর বন্ধু শীলা সেনের কোনও মিল নেই। মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা, চোখে গগল্‌স্। মুখে যেন থোকা থোকা মাংস কেউ ছুড়ে মেরেছে। বীভৎস একটা মাংসের পিণ্ড হয়ে শীলা সেন খাটে বসলেন। বসে আবার হাসলেন, 'আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চমকে উঠেছ ?' মুখের ওপর বাড়তি মাংসের মাঝে পোড়া ভাঁজ হাসিটাকে করুণ করে তুলছিল।

এই সামান্য বয়সে অনিমেষ মানুষের অনেক রকম মুখ দেখেছে। তিস্তার বুকে নৌকোয় বসে অথবা সেই বন্যার সময় রিলিফ দিতে কুষ্ঠরোগীদের গ্রামে গিয়ে অনেক গলিত বিকৃত মুখ তাকে দেখতে হয়েছে। সে সব স্মৃতির আর বুকের মধ্যে কোনও ভয়ঙ্কর ছাপ নিয়ে বেঁচে নেই। কিন্তু এই মুখ তাকে এমন নাড়া দিল যে অনিমেষ চোখ বন্ধ করতে পারলে বড় আরাম পেত।

'কী হয়েছে আপনার ?' নিজের কণ্ঠস্বর অচেনা ঠেকল অনিমেষের।

'ও কিছু না। তুমি কেমন আছ ?'

'আমি ভালই! কিন্তু —।'

'হঠাৎ কী মনে করে ?'

'এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম —।'

'কী করছ এখন ? পড়াশুনা শেষ হয়েছে ?'

'না। বোধহয় শেষ হবে না।'

'সেকী ! কেন ?'

'সে অনেক কথা। কিন্তু আপনার এ অবস্থা কেন ?'

'সেও অনেক কথা।' বলে হাসলেন শীলা সেন। ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হতেই অনিমেষ চমকে উঠল। শীলা সেন বললেন, 'আবার কে এল!'

কয়েক মুহূর্ত বাদেই সেই মহিলা দরজায় এল। ঘরে ঢুকে সোজা শীলা সেনের কানের কাছে মুখ রেখে কিছু বলল। ওই বিকট শরীর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন শীলা সেন, 'সেকী! এখন পুলিশ কেন ? দরজা খুলেছিস ?'

'না, ফুটো দিয়ে দেখলাম।' বৃদ্ধার কথা শেষ না হতেই বাইরে শব্দ হল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার উঠে দাঁড়ালেন শীলা সেন। অনিমেষ তখন মাথা নামিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। সেদিকে তাকিয়ে শীলা সেন বললেন, 'আমাকে নিয়ে চল, আমি কথা বলব।'

'তুমি আবার যাবে কেন —।'

'আঃ, যা বলছি তাই কর।' শীলা সেন ধমক দিলেন। মহিলা ওঁর হাত ধরলে শীলা সেন পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগলেন বাইরের ঘরের উদ্দেশে। কিন্তু হাঁটতে যে ওঁর কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওঁরা ঘরের বাইরে যাওয়ামাত্র অনিমেষ চট করে উঠে দাঁড়াল।

এখন থেকে অবিলম্বে পালানো দরকার। পুলিশ নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাট সার্চ করবে এখন। সে সাজানো ঘরটার চারপাশে চোখ বোলাল। এই ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বের হবার আর কোনও দরজা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। বাথরুমের দরজা খুলে সে তার ভেতরে একটা ছোট জানলা দেখতে পেল। জানলাতে কোনও গরাদ নেই কিন্তু এখান থেকে লাফিয়ে নীচে নামা তার পক্ষে অসম্ভব। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো অসহায় লাগছিল অনিমেষের। এ রকম বোকার মতো ধরা দেওয়ার চেয়ে ওই জানলা দিয়ে একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়! সে জানলা দিয়ে ঝুঁকে নীচের দিকটা জরিপ করল। জানালার অনেক নীচে একটা পাইপ দেওয়াল বেয়ে নেমে গেছে। সেটা হাতের নাগালে পেলে একটা চেষ্টা করা যায়। তবে তার আগে বাথরুমের ছিটকিনি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে হবে কিছুটা সময় পাওয়ার জন্যে।

দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভেতরে গলা পেল অনিমেষ। শীলা সেন বেশ যন্ত্রণার গলায় কথা বলছেন। সামান্য অপেক্ষা করেই সে বুঝতে পারল পুলিশ এই ঘরে আসেনি এখনও। বাড়ি সার্চ করলে তারা শীলা সেনকে এ ভাবে ছেড়ে দিত না। খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল বিছানায় বসে শীলা সেন হাঁপাচ্ছেন। তাঁর মুখ অনিমেষের দিকে ফেরানো।

BanglaBook.org

'খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি! এলে তো একেবারে পুলিশ পেছনে নিয়ে এলে!' শীলা সেনের কণ্ঠস্বরে তারল্য নেই।

'উপায় ছিল না। তাঁরা আছেন?'

'না, ভয় নেই। নিশ্চিন্তে বসো।'

অনিমেষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শীলা সেন কীভাবে পুলিশকে কাটালেন সে জানে না, কিন্তু বীভৎস চেহারার মানুষটির কাছে সে ভীষণ কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। সোফায় বসলে শীলা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমার পেছনে পুলিশ কেন?'

'সে অনেক কথা।' অনিমেষ ঠিক কী বলা উচিত ভাবছিল।

'তা তো বুঝলাম। তুমি চুরি ডাকাতি করেছ এটা তো আর ভাবতে পারছি না। কিন্তু ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তুমি খুব ভয়ঙ্কর লোক। শুনে আমি হেসে বাঁচি না। নাক টিপলে দুধ বের হবে যার তাকে ভয়ঙ্কর বলা হচ্ছে!' শীলা সেন হাসতে চেষ্টা করতেই মুখটা আরও বীভৎস হয়ে গেল। এতক্ষণে এই দৃশ্য অনিমেষের সয়ে গেছে। অনিমেষ বলল, 'আমার কিন্তু যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

'তাই নাকি। সত্যি?'

ওঁর বলার ধরনে অনিমেষ এবার মজা পেল। আগের শীলা সেনের সুন্দর মুখে এই ধরনের রসিকতা চমৎকার মানিয়ে যেত। এখন কণ্ঠস্বর একই থাকলেও মুখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এই মুহূর্তে শীলা সেন নিশ্চয়ই সেই কথা ভুলে গেছেন। অনিমেষ এমন ভাব করল যেন মুখের এই বিকৃতি তারও খেয়াল নেই।

'সত্যি কথাটা বলো তো এবার। পুলিশ খুঁজছে কেন?'

'বলছি। কিন্তু কী বলে ওদের বিদায় করলেন?'

'বললাম আমার বাড়িতে কেউ আসেনি। আমি অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে থাকি। খামোকা আমার কাছে কেউ আসতেই বা যাবে কেন? যে অফিসার এসেছিলেন তিনি বোধহয় এককালে আমার খবর রাখতেন। তাই তোমার সম্পর্কে অনেক সতর্ক করে দিয়ে বিদায় হলেন। কী হয়েছে?'

শীলা সেনের শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নিল অনিমেষ। কীভাবে এই মহিলাকে ও সব কথা বলা যায়। বললেও ইনি কিছু বুঝবেন বলে তার ভরসা হচ্ছে না। অথচ না বলে বসে থাকা শোভনীয় নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একজন সাধারণ মানুষকে যদি তাদের উদ্দেশ্যের কথা সে না বোঝাতে পারে তা হলে —।

'আমরা এ দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থাটা মানতে পারছি না। ভেতরে ভেতরে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি দেশ জুড়ে বিপ্লবের জন্যে। বুঝতেই পারছেন যারা এখন ক্ষমতায় আছে তারা আমাদের যেমন শত্রু আমরাও তাদের। আমাদের থামিয়ে দেওয়ার জন্যেই পুলিশ পেছন নিয়েছে।' অনিমেষ কথাগুলো বলার সময় মহিলার মুখের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিল। মুখের বিকৃতির জন্যে সেখানে কী প্রতিক্রিয়া হল বোঝা গেল না।

'কাগজে তা হলে তোমাদের কথাই লিখেছে?'

'কী লিখেছে?'

'আমি তো পড়ি না, আমাকে পড়ে শোনায়। কী যেন কথাটা, হ্যাঁ, উগ্রপন্থী, তোমরা তাই?'

'উগ্রপন্থী!' অনিমেষ হেসে ফেলল, 'না। কথাটা হওয়া উচিত সঠিক পন্থী।'

'কিন্তু কীভাবে তোমরা দেশটাকে পালটাবে?'

'এদের হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে।'

'কী যে হাসর কথা বলছ!'

'কেন?'

'এদের কত পুলিশ, মিলিটারি। কত বন্দুক কামান। তোমরাই যতই দল গড়ো এদের সঙ্গে কখনও পুরো! অসম্ভব। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর আত্মহত্যা করতে যাওয়া একই ব্যাপার।'

'যে কোনও বিপ্লবের আগে এ কথাই মনে হয়। কিন্তু মানুষের মনের ভেতর যদি আগুন থাকে তা হলে বাইরের কোনও শক্তিই তাকে নিভিয়ে দিতে পারে না। জনসাধারণ পরিবর্তন চাইলে তা হতে বাধ্য।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন শীলা সেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'তার মানে তোমরা একটা ভাল কাজ করতে চাইছ। বেশ, করো।'

BanglaBook.org

'আপনি আমার খুব উপকার করলেন আজ।'

'না জেনে করেছি। আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। ওমা, দেখো, তখন থেকে শুধু বকবক করছি অথচ—।' খাটের পাশে রাখা একটা বোতামে চাপ দিতেই ভেতরে কোথাও আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল সেই মহিলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, 'হ্যাঁরে, তোরও কি বোধবুদ্ধি লোপ পেল! চা খাবার নিয়ে আয়।'

অনিমেষ বাধা দিল, 'না না, এখন কিছু খাব না। অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার চলি।'

'যাবে, কোথায় যাবে?'

'মানে?'

'আজ রাত্রে তোমার এখান থেকে বের হওয়া উচিত নয়। পুলিশ যে সামনের রাস্তায় নেই তা কে বলতে পারে।'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু আবার কী। এখন তো আর হোস্টেলেও ফিরে যাওয়া চলবে না। কোথায় আছ এখন?'

'এতদিন হোস্টেলেই ছিলাম, আজ রাত থেকে অনিশ্চিত।'

'তোমার বাড়ির লোক জানে?'

'জানি না।'

'তোমাদের তো চা-বাগান ছিল।'

'কস্মিনকালেও নয়। আমার বাবা চা বাগানে কাজ করেন।'

'ওঁরা তো কেউ কলকাতায় নেই!'

'না।'

'তা হলে আর ওঠার জন্যে ছটফট করছ কেন? কাউকে যদি খবর দেবার থাকে কিছু তা হলে টেলিফোনে দিয়ে দাও।' খাটের উলটো দিকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন শীলা সেন।

টেলিফোনটা এতক্ষণ নির্জীব ছিল কিংবা কাঠের বাক্স-বন্দি থাকায় অনিমেষের চোখে পড়েনি। এখন সেটা নজরে আসতেই হুড়মুড় করে নানা চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ল। কাল যদি উত্তরবাংলায় চলে যেতেই হয় তা হলে আজই মাধবীলতার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু এত রাত্রে ওর হোস্টেলে গিয়ে দেখা পাওয়ার বোধহয় সম্ভাবনা নেই। হয়তো জরুরি বললে টেলিফোনে ডেকে দিতে পারে। অনিমেষ উঠে শীলা সেনের খাটটা ঘুরে টেলিফোনের পাশে এসে দাঁড়াল।

ও পাশে রিং হচ্ছিল। অনিমেষ রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে শীলা সেনের দিকে আড় চোখে তাকাল। একটা সাদা পাথর কেটেকুটে মানুষের আদল আনা হয়েছে মাত্র, এখনও মুখ নাক চোখ স্পষ্ট হয়নি এরকম একটা ছবি মনে পড়ল। এতক্ষণে সে নিশ্চিত, মহিলা চোখে দেখতে পান না বা পেলেও তা অতি সামান্য।

'হ্যালো!' ও পাশে গলা শুনতে পেল সে। মনে হয় সেই সুপারের গলা, ঈষৎ চিন্তিত এবং কিছুটা বিরক্ত।

'হ্যালো!' নিজেকে জানান দিয়ে নম্বরটা মিলিয়ে নিল অনিমেষ।

'কে বলছেন?'

'আমি অনিমেষ মিত্র। আপনার একজন বোর্ডার মাধবীলতার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।' অনিমেষ নামটা বলবার সময় শীলা সেনের দিকে তাকাল। না, সেখানে কোনও রকম কৌতূহলের প্রকাশ নেই।

'মাপ করবেন, এত রাত্রে কাউকে ডেকে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি কাল সকাল সাতটার পর টেলিফোন করবেন। আচ্ছা—।' ভদ্রমহিলার কাঠ কাঠ গলা শেষের দিকে নীচে নেমে এল। উনি বোধহয় রিসিভার নামিয়ে রাখছেন ভেবে অনিমেষ তড়িঘড়ি অনুনয় করল, 'শুনুন, প্লিজ, আমি জানি এত রাত্রে টেলিফোন করা উচিত নয় কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হচ্ছে। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি। এখন না জানালে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।'

কয়েক পলক নীরবতা, তারপর মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম আর একবার বলুন।'

'অনিমেষ মিত্র।'

'একটু ধরুন!' ও পাশে রিসিভার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার শব্দ হল। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার যন্ত্রণায় কাটল অনিমেষের। এ ঘরেও কোনও শব্দ নেই। শীলা সেনের শরীর একই ভঙ্গিমায় খাটের ওপর বসে রয়েছে।

BanglaBook.org

ও পাশে গলা বাজল, 'দেখুন, এত রাত্রে আমরা টেলিফোন অ্যাটেন্ড করতে চাই না। তবে আপনার নাম ওর ফর্মে আছে বলে,—আর একটু ধরুন আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল অনিমেষের। যাক, ফাঁড়া তা হলে কাটল। আজব মহিলা বটে। ফর্ম ভেরিফিকেশন করে তবে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

একটু বাদেই মাধবীলতার গলা শুনল সে। গলায় প্রচণ্ড উদ্বেগ, 'হ্যালো!'

'আমি বলছি।' অনিমেষ মৃদু হাসল।

'কী ব্যাপার?' মাধবীলতা আরও অবাক।

'খুব জরুরি বলে করতে হল। তোমার অসুবিধে হল না তো?'

'সে ঠিক আছে। কী হয়েছে?'

'আমাকে নর্থ বেঙ্গলে চলে যেতে হচ্ছে।'

'নর্থ বেঙ্গল?'

'তোমাকে সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম।'

'ও। কিন্তু এখনই—!'

'কলকাতায় থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।'

'কোত্থেকে বলছ?'

অনিমেষ আর একবার শীলা সেনের দিকে তাকাল। প্রতিক্রিয়া কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অনিমেষ জবাব দিল, 'একজনের বাড়ি থেকে। আজ এখানে থাকতে হবে, বাইরে পুলিশ ঘুরছে।'

'কখন যাবে?'

'কালই।'

'যাওয়ার আগে দেখা হবে না!'

'জানি না, হয়তো নয়। তোমার কাছে আমার জিনিসপত্র কেউ পৌঁছে দিয়ে আসবে, সেগুলো রেখে দিয়ো।'

'আচ্ছা।'

'আর শোনো, পুলিশ যদি তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্রেফ অস্বীকার করবে। ওরা যে যাবেই তা বলছি না, তবে যদি যায়—।'

'ওসব চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কী করে হয়ে গেল—?'

'হয়ে গেল, কেন হল জানি না।'

'আমি কি তোমার কাছে যাব?'

'কখন?'

'এখন।'

'এত রাত্রে?'

'এমন কিছু রাত হয়নি। তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'উঁহু। এখন এলে পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করবে। তা ছাড়া হোস্টেলে তোমাকে থাকতে হবে।'

হঠাৎ শীলা সেনের গলা কানে ভেসে এল, 'ওকে কাল ভোরে আসতে বলো। তা হলে তোমার পক্ষে এখান থেকে বেরুনো সহজ হবে।'

অনিমেষ চমকে ওঁর দিকে তাকাল। উনি যে এতক্ষণ তার কথা শুনছিলেন বোঝা যায়নি। কার সঙ্গে সে টেলিফোনে কথা বলছে অনিমেষ না জানানো সত্ত্বেও কী করে অনুমান করলেন?

ও পাশে মাধবীলতা চুপ করে ছিল। অনিমেষ বলল, 'অবশ্য তুমি যদি ঝুঁকি নিতে পারো তা হলে কাল যত তাড়াতাড়ি পারো ভোরেই চলে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মাধবীলতা। অনিমেষ তাকে শীলা সেনের বাড়ির ঠিকানা এমন করে বুঝিয়ে দিল যাতে পথে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে সামনে আসতেই শীলা সেন বললেন, 'এখানে উঠে বসো আরাম করে।' হাত দিয়ে খাটের একটা ধার দেখিয়ে দিলেন।

সেই সময় পেছনে পায়ের শব্দ হল। অনিমেষ তাকিয়ে দেখল একটা ট্রেতে ওমলেট আর চা নিয়ে এসেছে সেই মহিলাটি। ছোট একটা টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রাখতেই শীলা সেন বললেন, 'খাবার এনেছিস? কী দিলি?'

'ওমলেট।'

BanglaBook.org

'শুধু ওমলেট ? একটু মিষ্টি আনতে পারলি না ?'
'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন ?' অনিমেষ প্রতিবাদ করল।
'ওগুলো খেয়ে নাও।'
খিদে পেয়েছিল খুব। অনিমেষ ইতস্তত করল না।
খাওয়া হয়ে গেলে শীলা সেন হাসলেন, 'মেয়েটি কে ?'
'আমার সহপাঠিনী।'
'উঁহু।'
'তা হলে ?'
'আরও বেশি, অনেক বেশি। তা না হলে এই রাত্রে সে আসতে চাইত না।'
অনিমেষ কথা বলল না। অবাক হয়ে মহিলার বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এমন করে দেখতে বোধহয় একমাত্র মেয়েরাই পারে।
শীলা সেন আবার বললেন, 'তোমার এ সব কথা সে পরিষ্কার জানে ?'
'নিশ্চয়ই।'
'তবু সে ভালবেসেছে, না ?' দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট টের পেল অনিমেষ। শীলা সেনের মুখ এখন সামান্য ঝুলে পড়েছে। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ আর পারল না। খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এরকম অবস্থা কী করে হল ?'
দ্রুত মাথা তুললেন শীলা সেন, 'কী রকম অবস্থা! খুব খারাপ লাগছে দেখতে, তাই না ? শুনেছি আমাকে একবার দেখলে অনেকে রাত্রে ঘুমুতে পারে না। তোমারও সেরকম হতে পারে।'
'আপনি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন।'
হঠাৎ খুব ক্লান্ত দেখাল শীলা সেনকে। ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর কেমন অসাড় গলায় বললেন, 'পাশের ঘরে যে লোকটা রয়েছে তাকে দেখেছ ?'
অনিমেষ স্মরণ করতে পারল। অত্যন্ত রোগা একটি মানুষকে এক পলকের জন্যে দেখেছিল সে। মুখ মনে নেই, লক্ষও করেনি।
'হ্যাঁ, একজন ছিলেন। কে উনি ?'
'আমার স্বামী, পতিদেবতা।'
'ও।'
'আমার শরীরের এই কারুকার্য ওঁরই কীর্তি।'
'সে কী!' আঁতকে উঠল অনিমেষ।
'অবাক হচ্ছ কেন ? উনি স্বচ্ছন্দে এক বোতল অ্যাসিড আমার ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন, একটুও হাত কাঁপেনি। এখনও স্বচ্ছন্দে ওই ঘরে শুয়ে বসে দিন কাটান।'
'কিন্তু কেন ?'
'পুরুষ মানুষ তাই।'
'এ কী বলছেন ?'
'কিছু মনে কোরো না, তোমরা চাও মেয়েরা তোমাদের জন্যে প্রাণ ঢেলে সব কিছু করবে কিন্তু তাদের যদি সামান্য বিচ্যুতি ঘটে তোমরা সহ্য করবে না।'
'তাই বলে সবাইকে একরকম ভাবা ঠিক নয়।'
'আমি তো দেখলাম না। যারা আমাকে পয়সা দিত, জানত শুধু পয়সার সম্পর্ক, তারাও দেখতাম অধিকারের থাবা বসাত। ঘেন্না ধরে গেছে।'
'তা হলে আমাকে আশ্রয় দিলেন কেন ?'
চমকে উঠলেন শীলা সেন, 'তুমি ? কী বলছ ?'
'আমিও তো পুরুষ মানুষ!'
'হয়তো, কিন্তু আমার কাছে তুমি ছোট ভাই। যেদিন তোমাকে প্রথম ট্যাক্সিতে দেখি সেদিনই মনটা কেমন করে উঠেছিল। তোমাকে আমি পুরুষ মানুষ বলে ভাবব কী করে! যে ভাববে—যাকে ফোন করলে দেখছ না তার দুরবস্থা!'
'আপনি যার কথা বলছেন সে আমাকে ভালবাসে!'
'তাই তো মরে! মেয়েদের কাছে ভালবাসার চেয়ে বড় মরণ আর কিছু নেই ভাই। সব চলে যাচ্ছে জেনেও অন্ধ হয়ে থাকতে হয়।'

BanglaBook.org

কথাগুলো অনিমেষের ভাল লাগছিল না। এ সব শরৎচন্দ্রীয় কথাবার্তা এ যুগে অচল হয়ে গেছে। এখন মেয়েরা অনেক স্বাবলম্বী। কিন্তু এ নিয়ে শীলা সেনের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'ওঁর আক্রোশের কারণ কী?'

'জলে নামো ক্ষতি নেই, খবরদার চুল ভিজিয়ো না। আচ্ছা, আমাকে যখন প্রথম দেখলে তোমার খারাপ লাগেনি তখন?'

'ঠিক খারাপ নয়—।'

'লজ্জা করছ কেন? সত্যি কথা বলো। একটা বাঙালি মেয়ে অচেনা নিগ্রো ছেলের সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে ফিরছে, আমাদের সমাজে তা কখনও সম্ভব? হ্যাঁ, অভাবে পড়ে আমি ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম। ওঁরই বন্ধু ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিজে কোনওদিন চাকরি-বাকরি করেননি, ব্যবসা ছিল, সেটা ডুবে গেলে আমাকে পাঠালেন বন্ধুর সঙ্গে। চেহারা ছাড়া আমার কোনও গুণ ছিল না। তা লোকেই বা ছাড়বে কেন? এই চেহারাটাকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে পয়সা পাচ্ছিলাম। একটু ছোঁয়া একটু হাসিতেই কাজ হত প্রথম প্রথম। কিন্তু সব কিছুর তো সীমা আছে। লোভ বড় খারাপ জিনিস। একবার মাথা তুললে আকাশছোঁয়া হয়। আমার এই পাশ কাটানো লোকে শুনবে কেন? শরীর দিতে হল। উনি সব জেনেশুনে ন্যাকা সেজে বসেছিলেন। টাকায় ভেসে যেতে লাগল। কোনওদিন জিজ্ঞাসা করেননি, নিষেধ করেননি। কিন্তু এ সব করতে করতে আমি ডুবলাম। প্রেমে পড়ে গেলাম একজনের। সে সব জেনেশুনে আমায় নিল। প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা আমার তখন। আর একবার যখন প্রেমে পড়েছি তখন আর অন্য পাঁক গাঁটতে ইচ্ছে করে?'

হাসলেন শীলা সেন, 'তোমার জাতভাই এতদিন কিন্তু কিছু বলেননি। যেই দেখলেন আমার মন অন্যরকম হয়েছে তখনই শাসন শুরু করলেন। কিন্তু তখন আমি নিষেধ শুনব কেন? পরিণতি তো চোখের ওপর দেখছ।'

'এ তো খুন করার চেষ্টা!'

'তাই তো।'

'পুলিশ কিছু বলেনি?'

'বলতে চেয়েছিল, আমি দিইনি।'

'কেন?'

'আমার জীবনে এত নোংরা ছড়ানো যে পুলিশ আমাকে খারাপ মেয়ে বলে প্রচার করতেই পারত। জ্ঞান হলে, এই চেহারায় ফিরলে যখন কেস উঠল তখন মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিলাম। কোর্টে গেলে সত্যি কথাটা বলে লোকটাকে জেলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু আমার কী হত? এই অবস্থায় যখন সারাজীবন বেঁচে থাকতে হবে তখন একটা আশ্রয় চাই। নিজের হাতে কেউ নিজের সর্বনাশ করে?'

'কিন্তু এত বড় অন্যায় করে উনি শাস্তি পাবেন না?'

'কে বলল পাবে না। কেঁচোর মতো কুঁকড়ে আছে সারাক্ষণ। হাসপাতালে আমার পা ধরে প্রাণ ভিক্ষে চেয়েছে। এ বাড়ি থেকে ওর বেরুনো নিষেধ। মজা কী জানো, আমার শরীরের পোড়া ঘা যত শুকিয়ে এল তত ওর শরীর ভয়ে ভাবনায় শুকিয়ে যেতে লাগল। এখন ওই ইজিচেয়ার আর বাথরুম এইটুকু হাঁটতেই ওর প্রাণ বেরিয়ে যায়।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি—'

'একটায় নেই, অন্যটায় এত কম যে দেখতে ইচ্ছে করে না। চোখ বুজেই থাকি।'

'অপারেশন করার কথা ভাবছেন না?'

'শিশির জানে সে সব। আমাকে নাকি অনেকবার অপারেশন টেবিলে গিয়ে উঠতে হবে। প্লাস্টিক সার্জারি না কী যেন বলে—। তারপর চোখ।'

'শিশির কে?'

হাসলেন শীলা সেন, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ। রূপ চলে যাওয়া তো একরকম, কিন্তু এরকম বীভৎস চেহারার মেয়ের কাছে যে পুরুষ আসে, চিন্তা করো, সে আমার কে হতে পারে? শিশিরের জন্যেই তো উনি অ্যাসিড ঢেলেছিলেন। আমি অনেক আপত্তি করেছি কিন্তু কিছুতেই শুনছে না শিশির। আবার আমাকে কেটেছেঁটে সুন্দর করতে চায়। কী জ্বালা বলো!'

কথা বলার ভঙ্গিতে এমন আদুরেপনা ছিল যে অনিমেষ হেসে ফেলল শব্দ করে। শীলা সেন বললেন, 'কী হল?'

BanglaBook.org

'একটু আগে মেয়েদের কথা বলছিলেন না, ভালবাসার চেয়ে বড় মরণ তাদের আর কিছুতেই নেই, কিন্তু এখন দেখছি কোনও কোনও ছেলেও—'

মাংসপিণ্ড বিকৃত হয়ে সারা মুখে ছড়ানো, তবু শীলা সেনের লজ্জা অনিমেষের চোখ এড়াল না। নিচু গলায় বললেন, 'তাই তো মরণে এত সুখ অনিমেষ।'

পঁয়ত্রিশ

দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেছিল অনিমেষ। মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়েছিল গাড়ি। বেশির ভাগ কামরায় জানলা দরজা বন্ধ। এই লাইনে যারা যায় আসে তারা এই স্টেশনটি সম্পর্কে একটু আতঙ্কগ্রস্ত। ছিনতাইকারিরা নাকি লাইন দিয়ে প্লাটফর্মের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রেন ছাড়লেই ঘড়ি-টড়ি টেনে নেয়। কিন্তু অনিমেষ তাদের কাউকে দেখতে পায়নি। বরং কামরার দরজা খোলা না পেয়ে তার উঠতে কষ্ট হয়েছিল। একটু ছুটোছুটি করার পর সামনে যে দরজা পেয়েছিল তাতেই উঠে পড়েছিল সে। চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরোতে ঘুরোতে মাধবীলতা অনেক দূরের মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

বালি-ব্রিজের ওপর ট্রেনটা আসামাত্র গুম গুম শব্দ উঠল। ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে অনিমেষ। ভারী ব্যাগটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে বুঝতে পারল খুব ভুল হয়ে গেছে। এটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নয়। মিলিটারির জন্য সংরক্ষিত যে কয়েকটা বগি প্রতি ট্রেনে থাকে এটি তার একটি। কামরাটা ফাঁকা। মাত্র জনা পাঁচেক পুরো দস্তর ইউনিফর্ম পরা মিলিটারি শুয়ে বসে তাকে দেখছে। মিলিটারিদের কামরায় সাধারণ মানুষ ওঠে না, ভয়েই ওঠে না। বেআইনি তো বটেই, তা ছাড়া অন্য একটা ভয়ও কাজ করে। কিন্তু এখন ট্রেন পূর্ণ গতিতে চলেছে, সেই বর্ধমানের আগে কোনও বিরতি নেই। সারারাত গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে থেকে ধরা পড়তে হল— অনিমেষের পেটের ভেতর চিনচিনে ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল।

পাঁচজনই তার দিকে তাকিয়ে, সতর্কতা মেশানো কৌতূহল চোখগুলোতে। অনিমেষ হাত জোড় করে নমস্কার জানাল, 'মাফ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি এটা জেনারেল কম্পার্টমেন্ট নয়। ওদের মধ্যে যার কাঁধে ফিতে আঁটা সে উঠে বসল, 'হিন্দিমে বলিয়ে।'

'ম্যায় হিন্দি আচ্ছা নেহি বলনে সেকতা—।'

'কোই ফিকির নেহি, ট্রাই করো।'

'ইয়ে মিলিটারিকে কম্পার্টমেন্ট হ্যায় হাম নেহি জানতা থা। আপরোক মুঝে মাফি কি দিজিয়ে, নেক্সট স্টেশন মে উতার যাউঙ্গা।'

'লুক বিফোর ইউ লিপ। দেখনা চাহিয়ে থা।'

'আই অ্যাম সরি।'

'কাঁহা যানা হ্যায়?'

'শিলিগুড়ি।'

'টিকেট লে লিয়া ক্যা?'

অনিমেষ পকেট থেকে টিকিটটা বের করে দেখাল।

'হোয়াটস ইয়োর প্রফেসন?'

'স্টুডেন্ট।'

'তো ঠিক হ্যায়, বৈঠ যাইয়ে।' হাত বাড়িয়ে পাশের খালি জায়গা দেখিয়ে দিল লোকটা। এতটা আশা করেনি অনিমেষ। বিরাট মোচওয়ালা লোকটিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে সিটের ওপর ব্যাগটা রেখে সন্তর্পণে বসল সে। ট্রেন হু-হু করে ছুটছে। অনিমেষ দেখল সব কটি চোখ তাকে লক্ষ করছে।

'ক্যা পড়তা হ্যায় আপ?'

'এম. এ।'

'শাবাশ। বহুৎ পড়িলিখি আদমি হ্যায় আপ। ম্যায় তো কলেজকা শকল নেহি দেখা। ম্যায় ত্রিলোক সিং, আপকি শুভ নাম?'

'অনিমেষ মিত্র।'

BanglaBook.org

সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল লোকটা। শক্ত হাতগুলো এগিয়ে এল হাত মেলাতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আড়ষ্টতা কেটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিমেষ বুঝতে পারল লোকগুলো খুব হাসিখুশি, গল্প করতে ওস্তাদ। ভারতীয় সামরিক বিভাগে এরা নিচু তলায় কাজ করে। কিন্তু কোনওরকম কম্‌প্লেক্স নেই। আমি একজন জোয়ান, দেশরক্ষা আমার কর্তব্য এই বোধ প্রত্যেকের। এতদিন এইসব কথা শেখানো বুলির মতো মনে হত অনিমেষের, কেউ বললে হাসি পেত। কিন্তু এখন এই বিশ্বাসী মুখগুলোর মুখে ওইসব কথা শুনে সে কোনও অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পেল না।

ত্রিলোক সিংকে জিজ্ঞাসা করল অনিমেষ, 'আপনার দেশ পঞ্জাবে ?'

'নেহি জি। হরিয়ানায়। গাঁওকা আদমি হাম।'

'কতদিন চাকরি করছেন ?'

'বিশ সাল হয়ে গেল।'

'আপনাদের গ্রামের অবস্থা কেমন ?'

'গ্রামের অবস্থা যেমন হয়, ভাল। আমরা তিন ভাই। আমি মিলিটারিতে, আর একজন দিল্লিতে ট্যাক্সি চালায় আর বড় ভাই খেতির কাজ করে। আমাদের গ্রামের প্রতিটি বাড়ির একজন ইন্ডিয়ান আর্মিতে কাজ করে।'

'আপনি বিয়ে থা করেছেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে কামরায় হাসির রোল উঠল। প্রতিটি মুখের দাঁত দেখা যাচ্ছে। ত্রিলোক সিং-এর পাশের লোকটি বলল, 'আরে শাদির কথা কী বলছ, ওর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই নিয়েই তো আমাদের সমস্যা।'

অনিমেষ অবাক হল। এই লোকটির স্বাস্থ্য দেখে বয়স মাপা মুশকিল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ভাবা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সমস্যা কেন ?'

লোকগুলো আবার এক চোট হেসে নিল। ত্রিলোক সিং হাসছে না কিন্তু ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আপত্তিতে।

'সমস্যা নয়! ওর মেয়ের বয়স পনেরো, জামাইয়ের সাতাশ। এদিকে ওর জরুর বয়স মাত্র উনত্রিশ। জামাই চায় শাশুড়ি মাঝে মধ্যে তার বাড়িতে গিয়ে থাকুক। সেটা কি সম্ভব ?'

ত্রিলোক সিং হাত পা নেড়ে বলল, 'এ সব কথা শুনবে না। বহৎ বুরা বাত। আমার জামাই মাটির মানুষ। ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু গ্রামে নিজেই ট্রাকটর চালায়। আমার বউকে মায়ের মতো সম্মান দেয়।'

'ইয়ে কেতাব কি বাত হ্যায়। আমরা দশমাস বাড়ির বাইরে থাকি। আমাদের বউরা কে কী করছে জানতে পারব ? আর উনত্রিশ বছরের শাশুড়ি আর সাতাশ বছরের জামাই—কম্বিনেশনটা খুব খারাপ।'

লোকটা কথা শেষ করতে না করতেই ত্রিলোক সিং হাত তুলে তেড়ে গেল তার দিকে। আর সবাই হইচই করে ওদের ছাড়িয়ে দিতে দেখা গেল ব্যাপারটা যে স্রেফ মজা তা ত্রিলোকও জানে। বেশ খুশ মেজাজে সে ফিরে এসে বসল। বসে বলল, 'বাংগালকা ইয়ে কানুন আচ্ছা নেহি হ্যায়।'

'কী ব্যাপারে ?'

'এই যে তোমরা ত্রিশ চল্লিশ সাল তক বিয়ে করো না, মেয়েরা ত্রিশ সাল হলেও একা একা ঘুরে বেড়ায়। খুব খারাপ। আরে যৌবন তো আসে পনেরো বছর বয়সে। পনেরো থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে যদি তাকে এনজয় না করলে তো তার এসে কী লাভ। পাকা কলা খেতে ভাল লাগে, কিন্তু হেজে গেলে কি আর স্বাদ পাওয়া যায় ?'

'বিয়ে করবে কী করে ? খাওয়াবে কী ?'

'পরিশ্রম করো। রোজগার করো।'

'এ দেশে পরিশ্রম করলেই ভাল রোজগার করা যায় না।'

'কেন ? আমরা পারি তোমরা পারবে না কেন ? এই দ্যাখো, আমার বড় ভাই চাষবাস দেখে। তা থেকে যে ফসল আসে তাতে সারা বছরের খাওয়া হয়ে যায়। আমার টাকা আর ভাইয়ের টাকায় অন্যসব খরচ মিটে যায়। আরে বড়লোক হবার কী দরকার, ভালভাবে দিন কাটাতে পারলেই তো হল।'

'তোমাদের কোনও সমস্যা নেই ?'

'কী সমস্যা ?'

BanglaBook.org

'জোতদারদের অত্যাচার, পলিটিক্যাল পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা, যা আয় তার থেকে ব্যয় বেশি, চারধারে ধান্দাবাজ লোক অথচ কিছু করা যাচ্ছে না—এ সব সমস্যা নেই।'

ত্রিলোক সিং একটু ভাবল। তারপর বলল, 'এ সমস্যা তো সব জায়গায়। কিন্তু সমস্যা আছে বলে তোমরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকো তা হলে দোষ তোমাদের। বাঙালিরা কাম করে না শুধু বাত করে। অথচ আমি সুভাষ বোসের নাম জানি, তিনি হিন্দুস্থানের শের ছিলেন। আমার ঠাকুরদা তাঁকে দেখেছেন। তিনি কী করে সারা দুনিয়ার সম্মান পেলেন?'

'দ্যাখো, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার পর দশ ডবল হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে জলের মতো লোক এসেছে। চাষের জমি সব জোতদার বড়লোকের হাতে। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে যে টাকা পাবে তাতে তার একারই পেট ভরে না। এখানে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আরামে থাকে। সরকার তাদের মদত দেয়। মানুষের সামনে যখন কোনও রাস্তা থাকে না তখনই সে দিশেহারা হয়। তোমরা জানো না তাই এ কথা বলছ।'

ত্রিলোক সিং কিন্তু অনিমেষের কথা মানতে চাইল না। অনিমেষ লক্ষ করল দেশের সরকারের বিরুদ্ধে এই লোকটির কোনও বিরূপ মনোভাব নেই। ওর মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিল, ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব মানুষ বিতাড়িত হয়ে এ দেশে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। ক্ষতিপূরণ, কম মূল্যে জমি পেয়ে তাঁরা এ দেশে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির অণুমাত্র পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়নি। পঞ্জাব-হরিয়ানায় চাষবাসের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছে সরকারের সরাসরি চেষ্টার ফলে। যা এ প্রান্তের মানুষ ভাবতে পারে না। ভারতীয় সামরিক বিভাগে শিখ রেজিমেন্ট আছে কিন্তু বেঙ্গলি রেজিমেন্ট রাখা হয়নি। তাই ত্রিলোক সিং এ দেশের সমস্যা বুঝতে পারবে না। অথচ আশ্চর্য, আমরা একই দেশের অধিবাসী। বিপ্লবের চিন্তা করলে এদের নিশ্চয়ই বাদ দিয়ে ভাবা যাবে না।

হঠাৎ অনিমেষের মনে হল ত্রিলোক সিং এবং তার সঙ্গীরা রাজনীতির ব্যাপারটা এড়িয়ে কথা বলছে। এ ব্যাপারে তাদের একটা সতর্ক মনোভাব আছে। ভারতীয় সামরিক বিভাগের চাকরির প্রধান শর্ত হল কোনওরকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না, রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশে মতামত ব্যক্ত করাও অপরাধ। অতএব এরা এ বিষয় সযত্নে পরিহার করবেই। এবং অনিমেষ যদি এ সব কথা বেশি বলতে থাকে তা হলে হয়তো তাদের অভদ্র ব্যবহার করতে বাধবে না।

বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি থামলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। বাইরে যাত্রীরা ট্রেনে ওঠার জন্য ছুটোছুটি করছে। দু' তিনজন এই কামরার দরজায় এসে উঁকি মেরেই ভয়ে সরে যাচ্ছে। এ দেশে এখনও মিলিটারিদের সম্পর্কে প্রচুর ভীতি ছড়িয়ে আছে। অনিমেষ ব্যাগে হাত দিতেই ওরা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আরে যাচ্ছ কোথায়?'

'এটা তোমাদের কামরা, আমি বর্ধমান নেবে যাব বলেছিলাম!'

'তা বলেছিলে, তুমি যাবে কোথায়?'

'শিলিগুড়িতে।'

'তা হলে এখানে নামছ কেন? বসো। এখন তুমি আমাদের বন্ধু হয়ে গেছ। এখানেই আরাম করো।'

অনিমেষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাইরে যা ভিড় তাতে অন্য কামরায় কী রকম জায়গা পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ ছিল। তা ছাড়া এই মিলিটারি কামরায় সে স্বর্গের চেয়েও নিরাপদ। কোনও পুলিশের অনুচর যদি এই ট্রেনে থাকে তা হলে সে ভুলেও সন্দেহ করবে না একজন 'উগ্রপন্থী' মিলিটারি কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে। দুপুরের খাওয়াটা ওরাই জোর করে খাওয়াল। রুটি আর সবজি। লোকগুলো ওই সামান্য খাবার খুব নিষ্ঠার সঙ্গে খেয়ে নিল তৃপ্ত মুখে। অনিমেষ মন খুলে খেতে পারল না, এ ধরনের রান্নায় সে অভ্যস্ত নয়। বাস্তবিক, এরা যে এত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে তা সামনাসামনি না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। আমাদের বাঙালি বাড়িতে এই খাবার পরিবেশিত হলে বাড়ির সবাই বিদ্রোহ করত। অথচ এরা, 'আওজি, খানা খা লেও' বলে এমন ভাব করছিল যেন বিয়ে বাড়ির ভোজ খেতে ডাকছে।

জানলায় বসে দুপুরের বর্ধমান জেলা দেখতে লাগল অনিমেষ। গুসকরা, বোলপুর—। বোলপুরে সামনের মাসে আসতে হবে। মাটির রং পালটে যাচ্ছে। বর্ধমান থেকে বীরভূম। সামনের

BanglaBook.org

মাসে মাধবীলতা এখানে আসবে। বোলপুরে নয়, ও আসবে বর্ধমান স্টেশনে, এসে অনিমেষের জন্য অপেক্ষা করবে। অনিমেষ বোলপুরে না নেমে একটু এগিয়ে বর্ধমানে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে।

গতরাতে একটুও ঘুম হয়নি অনিমেষের। শীলা সেনের বাইরের ঘরে ওর বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল। রাত্রের খাওয়া খেয়েছিল শীলা সেনের সঙ্গেই। একটা রাত ওই বাড়িতে সে থাকল কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। খাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার সময় মাঝের ঘরে লোকটাকে দেখেছিল সে। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন চোখে হাত চাপা দিয়ে। অনিমেষ যে এসেছে, এতক্ষণ তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে এবং রাত্রে ওই বাড়িতেই থাকছে—এ সব ব্যাপারে সামান্য আগ্রহ দেখাননি তিনি। অনিমেষের মনে হয়েছিল একটা পাথরের পুতুলকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। অথচ ওই পুতুলটাই শীলা সেনের শরীরে অ্যাসিড ঢেলেছে—ভাবলেই শরীর গরম হয়ে যায়। শরীর বেচে পয়সা আনতে পাঠানো যায় কিন্তু কোথাও যদি বিনামূল্যে মন দিয়ে দেওয়া যায় তা হলে আর সহ্য করা যাবে না। লোকটাকে যদি বেধড়ক পেটাতে পারত তা হলে অনিমেষ খুশি হত।

অপরিচিত বিছানা, সারাদিনের উত্তেজনা ও অস্বস্তিতে ক্লান্ত শরীরে ঘুম আসছিল না। সারারাত এ পাশ ও পাশ করেছিল অনিমেষ। মধ্যরাতে কোথাও শব্দ হলে চমকে উঠেছে। বাল্যকালে ছোটকাকার সন্ধানে গভীর রাতে পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। সেই দৃশ্যটা বার বার চোখের ওপর ভাসছিল।

শেষরাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিমেষ খেয়াল নেই। চোখ মেলে দেখল সামনে মাধবীলতা। মাধবীলতা? চমকটা এতখানি যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। মাধবীলতা হাসল, 'কেমন আছ?'

তড়াক করে উঠে বসল অনিমেষ। দরজা ভেজানো। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে মাধবীলতা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দেখল সে। এখনও রোদ ওঠেনি। কলকাতার ভোর ভীষণ আদুরে, এখনও সে আদর সারা আকাশে মাখানো।

'কখন এলে?'

'মিনিট দশেক।'

'ক'টা বাজে?'

'ছ'টা।'

'কে দরজা খুলল?'

'বাঃ, তুমি একদম কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছিলে। বেশ কয়েকবার শব্দ করার পর একজন খুব রোগা ভদ্রলোক দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই? আমি তোমার নাম বলতে তিনি তোমাকে দেখিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সেই থেকে এখানে বসে আছি। এ ঘরে আছ অথচ তুমি শুনতে পেলে না, অন্য লোক দরজা খুলল!'

অনিমেষ লজ্জিত মুখে বলল, 'শেষরাতে হঠাৎ ঘুমটা এল—কিন্তু তুমি এই ভোরে এলে কী করে এখানে?'

'পায়ে হেঁটে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম।'

অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কোথাও মালিন্য নেই, সামান্য ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ওর পায়ের কাছে একটা সুন্দর ব্যাগ, ব্যাগটা ভারী। ওটা কী—ইঙ্গিত করল অনিমেষ।

'তোমার জিনিসপত্র আছে, ব্যাগটা অবশ্য আমার। তোমার ট্রাঙ্ক নিয়ে তো আর হাঁটা যাবে না। সেগুলো আমার কাছে রইল। কাজ চালানোর মতো জিনিসপত্র এটায় দিয়েছি।'

'তোমার কাছে ওরা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কাল রাত্রে সব জিনিসপত্র আমাকে দিয়ে এসেছে।'

'আমাকে আজই চলে যেতে হবে শিলিগুড়িতে।'

'জানি। কিন্তু এই বাড়িটা কার?'

'আমার পরিচিত এক মহিলার। তোমাকে কখনও বলিনি বোধহয়। এখন অ্যাসিডে পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছেন, অথচ এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন।' কী পরিস্থিতিতে তাকে এখানে আসতে হয়েছিল অনিমেষ সংক্ষেপে মাধবীলতাকে বলল। কাল রাতে শীলা সেন তার সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছেন এতটা সে আশা করেনি। মাধবীলতা গালে হাত দিয়ে এ সব কথা শুনছিল। অনিমেষ চুপ করলে

BanglaBook.org

বলল, 'কাল তুমি ফোন করলে যখন তখন আমি ভাবতেই পারিনি এতসব কাণ্ড হয়ে গেছে। তোমার টেলিফোন নামিয়ে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় দারোয়ান এসে জিনিসপত্র দিয়ে গেল। সঙ্গে একটা চিঠি।'

'চিঠি ? কার চিঠি ?'

'ঠিক চিঠি নয়, জাস্ট একটা ইনফরমেশন। শিলিগুড়ির স্টেশন পাড়ায় ঢুকে অনন্ত ভাণ্ডারের উলটো দিকে বারীন সরকারের সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বলা হয়েছে।'

'দেখি কাগজটা ?'

'আমি পুড়িয়ে ফেলেছি ?'

'কেন ?'

'বাঃ, এ সব প্রমাণ কাগজে কলমে থাকা কি ভাল ?'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এমন শ্রীময়ী মুখ আজ অবধি তার চোখে পড়েনি। এ মেয়ে ইচ্ছে করলেই স্থায়ী নিরাপদ তকমাওয়ালা স্বামীর স্ত্রী হতে পারত। অথচ—! অনিমেষের নিশ্বাস ভারী বোধ হল। নিজেকে মাঝে মাঝে এমন অপরাধী মনে হয়। ভালবেসে মেয়েরাই এমন করে বৈরাগী হতে পারে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল দুই হাতে মাধবীলতার মুখ স্পর্শ করতে, হাতের বৃত্তে ওই শক্তিকে আস্বাদ করতে। নিজেকে সংযত করল অনিমেষ। প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে তো আবার স্কুলে যেতে হবে।'

'আজ যাব না।'

'কেন ?'

'গিয়ে পড়াতে পারব না বলে।'

অনিমেষ আবার হোঁচট খেল। সেই সময় পায়ের শব্দ হতে সে যেন একটু স্বস্তি পেল। হাত পায়ে রাস্তা মেপে শীলা সেন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আরে আসুন আসুন। আপনি আবার কত কষ্ট করে এতদূর এলেন কেন ? আমরাই যেতাম।'

'কেন! আমি তো ভাই নিজেই সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। তোমার বন্ধু এসে গেছে শুনলাম—।' শিলা সেনের সমস্ত শরীর আলখাল্লা জাতীয় পোশাকে ঢাকা, মাথায় কালো রুমাল, চোখে রঙিন চশমা। তবু এই সকালেই তাঁকে দেখে সহ্য করা মুশকিল।

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ। মাধবীলতা ওর নাম, আর ইনি শীলা সেন।'

শীলা সেন বললেন, 'বাঃ, বেশ সেকেলে নাম তো, মাধবীলতা। শুনলেই মনে হয় খুব শান্ত। তুমি খুব সুন্দর দেখতে, তাই না ?'

অনিমেষ দেখল মাধবীলতা হাসি চাপছে ঠোঁট বুজে। সে বলল, 'দারুণ সুন্দর দেখতে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতা প্রতিবাদ করল, 'যাঃ, একদম বিশ্বাস করবেন না। আমি মোটেই সুন্দরী নই।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি বসুন।'

মাধবীলতা এগিয়ে গিয়ে ওঁর হাত ধরে সোফার ওপর এনে বসাল। অনিমেষ দেখল মাধবীলতা স্বচ্ছন্দে শীলা সেনের পাশে গিয়ে বসেছে। ওঁর বিকৃত চেহারার জন্য মাধবীলতার কোনও মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। শীলা সেন বললেন, 'তুমি বাথরুমে যাবে তো অনিমেষ ? তা হলে ভেতরের ঘরে গিয়ে ডান হাতে বাথরুমের দরজা পাবে।'

অনিমেষের প্রয়োজন ছিল। সঙ্গে টুথব্রাশ পেস্ট নেই কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল মাধবীলতা ব্যাগ নিয়ে এসেছে। সে এগিয়ে এসে ব্যাগটা তুলতে যেতে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী খুঁজছ ?'

'ব্রাশ, পেস্ট!'

'সামনের খাপে আছে।'

শীলা সেন বললেন, 'এই না, ওগুলো তোমার খাপেই থাক। আমি তোমার জন্যে নতুন ব্রাশ বাথরুমে বের করে দিয়েছি, পেস্ট তোয়ালে ওখানে পাবে। তোমার জিনিস কিছুই বের করতে হবে না।'

অনিমেষ বলল, 'সে কী! আমারটা যখন পেয়ে গেছি তখন খামোকা একটা নতুন ব্রাশ নষ্ট করার কী দরকার!'

শীলা সেন বললেন, 'তা তো বলবেই ভাই। এখন নিজের জিনিস পেয়ে গেছ এখন আর আমাতে মন উঠবে কেন!' ইঙ্গিতটা এমন সরাসরি যে মাধবীলতা মুখ ঘোরাল এবং অনিমেষের মুখে

BanglaBook.org

আচমকা রক্ত জমল। একটু সময় দিলেন শীলা সেন। এখন তাঁর গলার স্বর অন্য রকম লাগছিল, 'নষ্ট হবে কেন বলছ! ব্রাশটা না হয় আমি তুলে রাখব, ভাবব কখনও যদি আবার এখানে আসো তখন তুমি ব্যবহার করবে। আমার ভাই-এর একটা স্মৃতি না হয় থাকল।'

ওই মুহূর্তে প্রায়-অন্ধ এই মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি অনিমেষের আর ছিল না। সে দ্রুত ভেতরের ঘরে চলে এল। ডান দিকের দরজাটা বন্ধ। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাঁ দিকের ইজিচেয়ার শূন্য, একটা খাট রয়েছে একপাশে, সেটাও খালি। অর্থাৎ মিঃ সেন এখন বাথরুমে ঢুকেছেন। লোকটা অদ্ভুত, কেমন কেঁচোর মতো রয়েছে বাড়িতে। গতরাত থেকে ওঁর অস্তিত্ব একবারের জন্যও টের পায়নি অনিমেষ। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ফিরে আসছিল অনিমেষ, এমন সময় দরজাটা খুলল। লিকলিকে রোগা শরীরে একটা ধুতি লুঙ্গির মতো জড়ানো, হাতে কিছু ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে মাথা নিচু করে বের হলেন ভদ্রলোক। অনিমেষের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালেন। অনিমেষ চুপচাপ বাথরুমে ঢুকে গেল। তার সঙ্গে কথা না বললে সে নিজে থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবে না। এক চৌবাচ্চা জল দেখে স্নান করার ইচ্ছে হল ওর। আজ সারাদিন আর স্নান করার সুযোগ নাও জুটতে পারে। এখন জলে একটু হিমভাব কিন্তু কলকাতার নভেম্বর মাসে শীতের কোনও অস্তিত্ব নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্নান করে বেরিয়ে আসবার সময় নজরে পড়ল জল যাওয়ার ঝাঁঝরির কাছে কিছু একটা পড়ে আছে। কৌতূহলে ঝুকে দেখল একটা সোনার তাগা সেখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। একটা খাঁজে লেগে থাকায় ওটা নর্দমার ভেতর চলে যায়নি। অনিমেষ হাতে তুলে নিয়ে দেখল তাগার ভেতরটা ফাঁপা কিন্তু জিনিসটা যে সোনার তাতে সন্দেহ নেই। পেছন দিকে সুন্দর অক্ষরে লেখা আছে বিশ্বনাথ সেন। শীলা সেনের স্বামীর হাত থেকে পড়েছে এটা? অনিমেষের একবার ইচ্ছে হল ওটাকে নর্দমাতেই ফেলে দেয়। শরীর রোগমুক্ত করার জন্য এর মাধ্যমে দৈবের উপর নির্ভর করার কোনও প্রয়োজন নেই ভদ্রলোকের। যে মানুষ অমন অপরাধ করেছে তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। শেষ পর্যন্ত ওটাকে পকেটে রেখে বেরিয়ে এল অনিমেষ। বেরিয়েই দেখল কেঁচোর মতো লোকটা অধীর আগ্রহে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বেরনো মাত্র ছুটে গেল ভেতরে। অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা পাগলের মতো বাথরুম হাতড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে ডাকল, 'এই যে, শুনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গেল লোকটা। ভয়ে ভয়ে তাকাল অনিমেষের দিকে। পকেট থেকে তাগাটা বের করে মুখের সামনে ঝুলিয়ে ধরল সে। প্রায় বুলেটের মতো ছুটে এল লোকটা, এসে ছোঁ মেরে তাগাটা নিয়ে চলে গেল পাশের দরজা দিয়ে। নেবার মুহূর্তে কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল মুখটা, একটা ঘা খাওয়া শঙ্খচূড়ের মতো মনে হয়েছিল অনিমেষের। এই মুখ যে কোনও পাপকর্ম অবলীলায় করে যেতে পারে, অথচ বাথরুম থেকে যখন প্রথম বের হলেন ভদ্রলোক তখন কত নিরীহ দেখাচ্ছিল। খুব অস্বস্তি নিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে এসে অনিমেষ দেখল শীলা সেনের সঙ্গে মাধবীলতার ভাব হয়ে গেছে।

সামনের টেবিলে চা টিকোজিতে ঢাকা। মাখন লাগানো রুটিতে মাধবীলতা চিনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। শীলা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি একেবারে স্নান করে এলে?'

'হ্যাঁ। আবার সুযোগ পাব কিনা জানি না।'

'কখন ট্রেন তোমার?'

'নটা পঁয়ত্রিশ।'

'সকালে?'

'হ্যাঁ।'

চায়ের কাপ এগিয়ে দিল মাধবীলতা। শীলা সেনের হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত।'

শীলা সেন বললে, 'সেকী, এখন তো সাতটাও বাজেনি।'

'আমার মনে হয় দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রেনে ওঠা উচিত। শিয়ালদা স্টেশন নিরাপদ নাও হতে পারে।'

তাই ঠিক হল। এখন সকাল। ওরা এখান থেকে বেরিয়ে চৌত্রিশ নম্বর বাসে চেপে দক্ষিণেশ্বর চলে যাবে। সেখান থেকে ট্রেন উঠবে অনিমেষ। হাতে যথেষ্ট সময় আছে, তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।

বিদায় নেবার সময় শীলা সেন কোনও কথা বলতে পারলেন না। শুধু মাধবীলতার হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ফিসফিস করে বললেন, 'সাবধানে থেকো। ওর জন্যে তোমার সাবধানে থাকা দরকার।'

BanglaBook.org

এই একটি কথা ভীষণ ভার হয়ে দাঁড়াল। ওরা নীরবে হেঁটে এল বিবেকানন্দ রোড অবধি। অনিমেষ সতর্ক ছিল। কোনও সন্দেহজনক মানুষকে চোখে পড়ল না। বড় রাস্তায় এসেই একটা খালি ট্যাক্সি ধরল মাধবীলতা। অনিমেষ প্রতিবাদ করল, 'সময় আছে, বাসেই যাওয়া যাবে বেশ।'

মাধবীলতা কোনও কথা শুনল না। ট্যাক্সিতে বসে বলল, 'তুমি চলে যাচ্ছ, একটুখানি সময় অন্তত তোমার পাশে বসি। বাসে তো হাজার লোকের চোখ থাকবে।'

বিবেকানন্দ রোড থেকে দক্ষিণেশ্বর আসতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই পথটুকু ওরা একটাও কথা বলেনি। মাধবীলতা ওর পাশে বসে একটা হাত মুঠোয় ধরেছিল চুপচাপ। ট্যাক্সি থেকে নামার আগে অনিমেষ বলেছিল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

মাথা নেড়েছিল মাধবীলতা, না।

ফাঁকা দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখনই ঠিক হয়েছিল সামনের মাসে পৌষমেলার দিন বর্ধমান স্টেশনে এই ট্রেনে অনিমেষ ফিরবে। মাধবীলতা সেইমতো অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে ওরা একসঙ্গে বোলপুরে যাবে।

ট্রেনে ওঠার আগে টিকিট কেটে প্রায় নিঃসম্বল অনিমেষের পকেটে জোর করে দুশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল মাধবীলতা। বলেছিল, 'আমি চাকরি করছি কার জন্যে, একটুও লজ্জা করবে না। শোনো, গিয়ে চিঠি দিয়ো। তোমার চিঠি না পেলে আমি কিন্তু কলকাতায় থাকতে পারব না। দেখবে, গিয়ে হাজির হব।'

রাজার মতো শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেল অনিমেষ। পাঁচজন সামরিক মানুষ তাকে বন্ধুর মতো আগলে নিয়ে এল। সন্ধেবেলায় শিলিগুড়ির স্টেশন পাড়ায় অনন্ত ভাণ্ডারের সামনের বাড়িটার দরজা খুলে লম্বা চুল, ময়লা পাঞ্জাবি, একটা হাত সামান্য নুলো এক ভদ্রলোক ওকে স্বাগত জানালেন, 'আপনি অনিমেষ মিত্র? আমার নাম বারীন সরকার। ভেতরে আসুন, আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।'

ছত্রিশ

বারীনকে ভাল লাগল অনিমেষের। একটু আত্মভোলা টাইপের, কাজের নেশা মাথায় চাপলে সময়ের ঠিক থাকে না। বিবেকানন্দ মার্কেটে ওঁর একটা ছোট স্টল আছে। স্টলটা শিলিগুড়িতে বেশ বিখ্যাত। এক হাতে সাইনবোর্ড লেখা থেকে শুরু করে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর কভার এঁকে যান বারীন ওখানে বসে। পয়সা-কড়ি তেমন পান কিনা সন্দেহ আছে কারণ তাঁর পোশাক যথেষ্ট ময়লা, দাড়ি অবিন্যস্ত এবং সংসারে একমাত্র মা থাকলেও কোনও দামি আসবাব নেই।

কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে পরিচয় হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অনিমেষ তাঁকে পছন্দ করে ফেলল। কোনও রাখ-ঢাক নেই কথাবার্তায়। এমন একটা স্পষ্ট আন্তরিকতা আছে যে, নিজেকে দূরে রাখতে ইচ্ছে করে না। বারীনের মা খুব ঠাণ্ডা মানুষ। বললেন, 'তোমার বোধ হয় খেতে একটু অসুবিধা হবে। আমি মাছ মাংস রাঁধতে পারি না।'

কথাটা শোনামাত্র হেমলতার মুখ মনে পড়ে গেল। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট তফাতে হেমলতা এবং সরিৎশেখর রয়েছেন। মাছ মাংস রান্নায় হেমলতারও এখন আপত্তি। বারীনের বাড়িতে অনিমেষের বেশ স্বস্তি হল।

দুপুর পেরিয়ে গেলে অনিমেষ বারীনের সঙ্গে বের হল। পায়জামা পাঞ্জাবি যথেষ্ট ময়লা। কাঁধে ঝোলা, বারীন ওকে রাস্তাঘাট বোঝাচ্ছিলেন। শিলিগুড়িতে আসা যাওয়ার পথে কিছুক্ষণ থেকেছে অনিমেষ, আজ ভাল করে চেয়ে দেখল। বেশ জনবহুল শহর, ব্যবসাপাতির দৌলতে জলপাইগুড়ি থেকে অনেক এগিয়ে আছে। কলকাতার পর এমন বিভিন্ন জাতের মানুষ বোধ হয় বাংলা দেশে আর কোথাও দেখা যাবে না।

সকালে দেখা হওয়ার পর বারীন অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু যে জন্যে অনিমেষ এখানে এসেছে তা নিয়ে কথা তোলেননি। বারীনের বয়স অনুমান করা মুশকিল। যদিও দাড়িতে পাক ধরেছে তবু পঞ্চাশ ছাড়িয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ আজ কথা বলার সময় অনিমেষ জেনেছে বারীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই। পার্টি যখন বেআইনি ঘোষিত হল তখন পালিয়ে বেড়িয়েছেন অনেককাল। অনিমেষের একবার মনে হয়েছিল

BanglaBook.org

ছোটকাকা প্রিয়তোষের কথা বারীনকে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু একটা কথা ভেবে সে নিজেকে সংযত করল। প্রিয়তোষ আজ যেখানে বিচরণ করছেন তাঁর সঙ্গে বারীনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যখন অনিমেষই নিজের কাকাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না তখন বারীন তো আরও পারবেন না। সে ক্ষেত্রে খামোকা ওঁর কথা তুলে কী লাভ! আজ এই কয়েক ঘণ্টায় বারীনকে দেখে অনিমেষের মনে হয়েছে ভদ্রলোক অত্যন্ত নিরাসক্ত। কোনও ব্যাপারই তাঁকে তেমনভাবে স্পর্শ করে না। কোনও কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ অভিযোগ নেই। এরকম নির্লিপ্তির সঙ্গে এর আগে তার পরিচয় হয়নি।

বারীনের স্টলে বসার জায়গা বলতে কয়েকটা মোড়া ছাড়া কিছু নেই। স্টলটা খোলাই ছিল। একটা বাচ্চা ছেলে টিনের পাতে রং বোলাচ্ছিল। বারীনকে দেখে বলল, 'সকাল থেকে তিনজন লোক অনেকবার খুঁজতে এসেছে।'

'কারা ?' দোকানের ভেতরে ব্যাগটাকে রেখে অনিমেষের দিকে একটা মোড়া এগিয়ে দিলেন বারীন।

'নাম জানি না। চেহারা দেখেছি।'

'তারে নামে জানি না শুধু চোখে দেখেছি।' হাসলেন বারীন, 'এখানে যারা আসা-যাওয়া করে তাদের কেউ ?'

'একজনকে দেখেছি এখানে আসতে।'

'যার গরজ আছে সে নিশ্চয়ই আবার আসবে। আসুন, আমরা আরাম করে বসি। এই হল আমার ব্যবসাকেন্দ্র। লোকে অবশ্য একে আড্ডাখানা বলে। তা নিন্দুকেরা তো কত কথাই বলে থাকে।' বারীন একটা মোড়ায় বসে হাসলেন।

অনিমেষ ঢোকার সময় এলাকাটা দেখেছিল। চারধারে বেশ বড়সড় দোকান, জামাকাপড়েরই বেশি। প্রত্যেকের ব্যবসা যে খুব চালু তা বোঝা যায়। এ সবের মধ্যে বারীনের দোকান মূর্তিমান বেখাপ্পা। কিছু সাইনবোর্ড আর টিনের পাত, রঙের সরঞ্জাম চারপাশে ছড়ানো। কুড়িয়ে বাড়িয়ে দুশো টাকারও সম্পত্তি হবে না। ব্যাপারটা অনিমেষ লক্ষ করেছে দেখে বারীন বললেন, 'কী, আমার দোকানের চেহারা দেখা হচ্ছে ? ওটা আমারই মতন, কখন বাজারে অচল আধুলির মতো হাতঘষা খাচ্ছে টের পাওয়া যায়নি। ভাড়া সাকুল্যে পঁচাত্তর। ছেড়ে দিলে দশ বারো হাজার দক্ষিণা পাওয়া যাবে। কিন্তু তা হলে শিলিগুড়ির লেখক শিল্পীদের আড্ডা মারার জায়গা জুটবে না যে। এখানে তো ভাই কফিহাউস নেই।'

'ভাড়া বাকি নেই তো ?' অনিমেষ ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না।

'ছিল। সবাই চাঁদা করে মিটিয়ে দিয়েছে। এটি হল দোকানের কর্মচারী। বিশ টাকা মাইনে নেন, টিকে আছেন কাজ শেখার প্রবল আগ্রহে। শিল্পী হবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা আছে ওর মধ্যে। কানু, দু' কাপ চা খাওয়াবি ?' বারীন পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে ছেলেটির সামনে ধরলেন। অনিমেষ দেখল কাজে ব্যাঘাত হওয়ায় ছেলেটি একটু বিরক্ত হলেও খুব যত্নে তুলিটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে পয়সাটা তুলে নিল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'কাল সকালে সাইনবোর্ডটা ডেলিভারি না দিলে টাকা দেবেন না বলেছে। মনে থাকে যেন!'

'কাল সকাল কেন, আজ বিকেলেই তারা ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারে। তুই তো সব করেই ফেলেছিস।' হাসলেন বারীন। অনিমেষ দেখল টিনের পাতাটায় শুধু একটা রংই পাতলা করে বোলানো হয়েছে, তাতে এখনও কিছু লেখা হয়নি। ছেলেটি বেরিয়ে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিন্তু এখনও আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি!'

'কী কথা ?' বারীন তাকালেন।

'আমি কী জন্যে এসেছি তা তো আপনি জানেন।'

'হবে'খন। এত ব্যস্ততা কেন ?'

'একটা দিন খামোকা নষ্ট করে লাভ কী ?'

'নষ্ট হল বলে মনে হচ্ছে কেন ? এই যে আমরা পরিচিত হলাম, কথা বলছি, এটাই তো একধরনের লাভ। ওই যে কবিরা এসে গেছে, সময় হলেই আমরা ও ব্যাপারে কথা বলব, কেমন ?'

বিকেলবেলায় অনিমেষের মনে হল সত্যি বারীনের সহ্যশক্তি আছে। যারা একবার আসছে তারা আর নড়ার নাম করছে না। কেউ কবিতা লেখে, কেউ গল্প, কেউ আবার নাটক করে। পৃথিবীর সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা বকবক করে যাচ্ছে সমানে। কোনও বিষয়ে বেশিক্ষণ আটকে থাকছে না তারা এবং এত দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছে যে, আগের বিষয় নিয়ে কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যাচ্ছে

BanglaBook.org

না। অনিমেষ একটা জিনিস অনুভব করল। এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে এদের জেহাদ প্রচণ্ড। যে সমস্ত লেখক বড় বড় কাগজে লেখেন তাঁরা নাকি ইতিমধ্যে বিক্রিত হয়ে গেছেন। তাঁদের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করা ভুল হবে। বারীন চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল এদের কথা। হঠাৎ নরম গলায় শুধোলেন, 'ও সব কাগজে লেখেননি এমন কোনও মহান লেখকের নাম তোমাদের জানা আছে?'

দু' তিনটে নাম বিভিন্ন মুখে উচ্চারিত হল। অনিমেষ এঁদের কোনও লেখা কখনও পড়েনি। বারীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাটা কাটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'প্রতিবাদ মানেই অন্ধ হওয়া নয়। বরং উদারতাই আসল ভিত্তি। যে যোগ্য তার স্বীকৃতি দেওয়াই সুস্থতা। তোমরা যাঁদের নাম করলে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা সমরেশ বসুর কাছাকাছি পৌঁছয় না। মনে মানলেও মুখে তোমরা মেনে নিচ্ছ না। ভোঁতা ছুরি দিয়ে কিন্তু আলুও কাটা যায় না। অক্ষমতাই মানুষকে অন্ধ করে।'

রাত দশটা নাগাদ ভিড় কমল। এতক্ষণ অনিমেষ এখানে রয়েছে কিন্তু বারীন কারওর সঙ্গেই ওর আলাপ করিয়ে দেননি যারা এসেছিল তারা তাকে দেখলেও কেউ যেচে কথা বলেনি। ক্রমশ এদের একঘেয়ে কথাবার্তা শুনে অনিমেষের মাথা ধরে গিয়েছিল। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়াবার জন্যে সে মার্কেটের বাইরে বড় রাস্তায় এসেছিল। শিলিগুড়িতে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

এত রাতে রাস্তা ফাঁকা। দোকানপাট সব বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-একটা পানের দোকান থেকে আলো আসছে পথে। অনিমেষ বারীনের দোকানে ফিরে এসে দেখল সাইনবোর্ডটায় শেষবার তুলি বোলাচ্ছেন বারীন। ওকে দেখে মুচকি হাসলেন, 'কী, মাথা ধরে গিয়েছিল বুঝি?'

'না, অনেকক্ষণ একভাবে বসেছিলাম, এই একটু —।'

'দেশের যুবশক্তির চেহারা দেখা হল?'

'যুবশক্তি?'

'এই যে নব্য যুবকবৃন্দ আমার এখানে এসেছিলেন তাদের দেখা হল?'

'হুঁ।'

'তোমার খিদে পেয়েছে?'

'খিদে? না।'

'তোমায় তুমি বলে ফেললাম ভাই। তুমিও আমাকে তুমি বোলো।'

'ঠিক আছে।'

কর্মচারী ছেলেটিকে বিদায় করলেন বারীন। এখন মার্কেট চুপচাপ। অনিমেষের খুব ক্লান্তি লাগছিল। সারাটা দিন একদম ফালতু কাটল। বারীনের উদ্দেশ্য কী বুঝতে পারছে না সে। অথচ লোকটি সম্পর্কে তার মোটামুটি শ্রদ্ধাই জাগছে। কথাবার্তা, চালচলন অবশ্যই অনিমেষকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু যে জন্যে সে এসেছে তার কথা ভদ্রলোক একবারও তুলছেন না কেন?'

বারীন এবার দোকান বন্ধ করে ওকে নিয়ে বড় রাস্তায় এলেন। এসে বললেন, 'এগারোটা বাজতে দেরি আছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'এবার খেয়ে নিলে হত।'

'কোথায়?'

'ওই মোড়ের মাথায় একটা পঞ্জাবির দোকান আছে। খুব ভাল তড়কা তৈরি করে। চলো, ওখানেই খেয়ে নিই।'

'আপনি কি রাত্তিরে বাইরে খান?'

'আপনি নয়, তুমি। না না, বাইরে খাব কেন? আজ খাচ্ছি। কারণ বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে বলা যায় না। ততক্ষণ বুড়ি মাকে জাগিয়ে রাখা উচিত হবে না, কী বলো?'

অনিমেষ সম্মতির মাথা নাড়ল। তার মানে আজ রাত্রে বারীন তাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। তবু কিছু কাজ করা যাবে ভেবে এতক্ষণে ভাল লাগল অনিমেষের। পঞ্জাবির হোটেলে খাওয়া চুকিয়ে সে জোর করে দাম মেটাল। বলল, 'প্রথম দিনটা আমার জন্য বরাদ্দ থাক।'

বারীন বললেন, 'বেশ বুদ্ধিমান ছেলে দেখছি? খুব অল্পেই কাজ সারলে।' তারপর হোটেলের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, এবার উঠি, আর মিনিট পাঁচেক আছে এগারোটা বাজতে। নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বারীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গরম জামা কাপড় কিছু আনোনি সঙ্গে?'

'এনেছি, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে বের হইনি।'

BanglaBook.org

'আনা উচিত ছিল। শিলিগুড়িতে এই সময় রাত্তিরে খুব ঠাণ্ডা পড়ে। আর এই একটা জিনিস কোনও রসিকতা বোঝে না। যা হোক, আমার ঝুলিতে বোধহয় কিছু পাওয়া যাবে।' নিজের ব্যাগ থেকে বারীন একটা সোয়েটার আর আলোয়ান বের করলেন। দুটোই খুব সুন্দর অবস্থায় নেই। সোয়েটারের মাঝে মাঝে ছোট ফুটো চোখে পড়ল।

বারীন ওকে জোর করে আলোয়ানটা গায়ে জড়াতে বলে নিজে সোয়েটারে মাথা গলিয়ে নিলেন। প্রথমে একটু অস্বস্তি হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে অনিমেষ বুঝতে পারল বারীন তার উপকারই করেছেন।

এয়ারভিউ হোটেলের সামনে এসে বারীনের চেহারা পালটে গেল। হাবভাবে বেশ সতর্কতা, অনিমেষকে দোকানের আড়ালে দাঁড়াতে বললেন। একটা পুলিশের জিপ দ্রুত চলে গেল শহরের দিকে। তেমাথায় কোনও লোকজন নেই। শুধু হোটেলের নীচে একটা পানের দোকান খোলা। সেখানে রেডিয়োতে কোনও বিদেশি স্টেশন বাজছে। চুপচাপ দুজনে ওখানে মিনিট পাঁচেক দাঁড়ানোর পর বারীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সিগারেট খাও না?'

'খাই।'

'খাচ্ছ না যে?'

ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজিত ছিল অনিমেষ। বারীন তাকে কিছু না জানালেও ওঁর ভাবভঙ্গিতে এই উত্তেজনা অনিমেষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। এই সময় এরকম প্রশ্ন শুনেও ও অবাক হয়ে গেল। সে হেসে বলল, 'সঙ্গে নেই, তাই।'

'তা হলে নেশাখোর নও।'

'ঠিক নেশা বলা যায় না।'

'কোনও কিছুর কাছে মুচলেকা লিখে দেওয়া কখনওই উচিত নয়।'

অনিমেষ বারীনের দিকে তাকাল। কথাগুলোয় কি দুটো মানে রেখে বারীন বলছেন? ঠিক সেই সময় একটা টেম্পো খুব ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়িটার একটা লাইট নেবানো, অন্যটা একচক্ষু দৈত্যের মতো জ্বলছে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে ইঞ্জিনের ভেতর মাথা গলিয়ে কিছু দেখছে। বারীন অনিমেষের হাত ধরে দ্রুত আড়াল ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। তারপর এক হাতে অদ্ভুত দক্ষতায় টেম্পোর পেছনে উঠে সটান শুয়ে পড়লেন। অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু ড্রাইভার বনেট বন্ধ করার আগেই দ্রুত এবং নিঃশব্দে বারীনের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার পর দেখল তলায় একটা ত্রিপল পাতা আছে। খুব খারাপ লাগছে না তাই। বারীন চাপা গলায় বললেন, 'মাথার ওপরে কত তারা অথচ আমরা কখনওই লক্ষই করি না, না?'

বুকের মধ্যে তখনও উত্তেজনা, বারীনের কথা শুনে অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। টেম্পোটা আবার চলতে শুরু করেছে। সামান্য ঝাঁকি লাগছে শরীরে। এই সময় বারীন তার কাছে তারার গল্প করছেন? সে আকাশের দিকে তাকাল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখে ফুটবে। ছোটবড় অজস্র তারায় আকাশ ঝকঝকে হয়ে রয়েছে। এত তারা একসঙ্গে কখনও দেখেনি অনিমেষ। এ ভাবে মাটিতে শুয়ে মুখ আকাশের দিকে করে তাকানোও হয়নি জীবনে। কিছুক্ষণ দেখলে মনে হয় যেন খুব ধীরে ধীরে আকাশটা অজস্র টর্চ জ্বেলে তার দিকে নেমে আসছে। এরকম নির্মেঘ, ঠাণ্ডা আকাশ, অনেকটা অজস্র পিন ঢোকানো কুশনের মতো, কোনওদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। তারাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষের সমস্ত শরীর শিহরিত হল। সে নিজের লোমকূপগুলো ফুলে উঠছে অনুভব করল। বাল্যকালে এক রাত্রে মাধুরী তাকে বলেছিলেন তিনি নাকি আকাশের তারা হয়ে ওকে লক্ষ রাখবেন। মৃতা মায়ের ওই কথাটাকে সে অনেককাল বিশ্বাস করত। কখনও কোনও দুঃখ কিংবা সুখ তাকে সেই বয়সে আলোড়িত করলে সে ছুটে যেত সেই তারার কাছে, গিয়ে কাঁদত কিংবা হাসত। বড় হলে, সময় যখন সব কিছু খেয়ে নিল, তখন সেই তারাটাও তার কাছ থেকে হারিয়ে গেল। এখন এই রাত্রে টেম্পোতে শুয়ে অজানা জায়গায় যাওয়ার সময় এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের সামনে মাধুরী হঠাৎ চলে এলেন। এতকাল অনেক চেষ্টা করেও যার মুখ মনে করতে পারেনি, জলপাইগুড়ির শ্মশানে দাহ করে আসার পর মায়ের যে চেহারাটা একটু একটু করে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই মা এখন তার দুচোখের সামনে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। মাধুরী হাসছেন। কিন্তু মাধুরী কি এমন দেখতে? অনিমেষ মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাকে দেখছিল। সম্পূর্ণ দেখা হলে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। মাধুরীর মুখ বলে এতক্ষণ যাকে সে কল্পনায় দেখছিল তা যে মাধবীলতার এটা বুঝতে পেরে সে পাথর হয়ে শুয়ে রইল।

BanglaBook.org

সেই সময় বারীন খোলা গলায় বললেন, 'তুমি দেখছি দারুণ রোমান্টিক। আকাশের তারা দেখতে দেখতে কখনও কেউ কেঁদেছে বলে শুনিনি।'

অনিমেষ দ্রুত চোখের জল মুছল। তারপর হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'আমরা কতদূর এলাম ?'

'শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে গেছি। এবার উঠে বসতে পারো।'

অনিমেষ ধীরে ধীরে মাথা তুলল। একপাশে অন্ধকার মাখানো জঙ্গল, অন্যদিকে ধু-ধু মাঠ দেখা যাচ্ছে। এ সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। সে বারীনকে বলল, 'আপনি কিন্তু ভাল নাটক করেন!'

'আবার আপনি! তুমি বলতে বাধে নাকি ?'

'চট করে বয়স্কদের তুমি বলতে অস্বস্তি হয়।'

'চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। হ্যাঁ, কী বলছিলে, নাটক ? এক-আধটু ওরকম না করলে বৈচিত্র্য আসবে কেন ? আমরা আর মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'এটা কোন এলাকা ?'

'আর একটু এগোলেই শুকনা টি এস্টেট পড়বে।'

ঘুমন্ত একটা লোকবসতির কাছে এসে গাড়িটা থেমে যেতেই ওরা নেমে এল। ড্রাইভারের সঙ্গে একটাও কথা হয়নি ওদের। কয়েক সেকেন্ড থামার পর গাড়িটা সোজা বেরিয়ে গেল। এখানে ঠাণ্ডা খুব। বেশ হিম পড়ছে। আলোয়ান মুড়ি দেওয়া সত্ত্বেও একটা কাঁপুনি অনুভব করল অনিমেষ। বারীনদা দ্রুত পায়ে হাঁটছেন। সামনে অনেকগুলো কাঠের বাড়ি। এক নজরে অনিমেষ বুঝল টিম্বার মার্চেন্টদের এলাকা এটা।

পেছনের সারির একটা বাড়ির কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ ফুঁড়ে একটা লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'বারীনদা!'

'হ্যাঁ ভাই।'

'আসুন।'

লোকটি ওদের পথ দেখিয়ে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিয়ে গেল। দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলতেই আলো চোখে পড়ল। লোকটি বলল, 'বারীনদা এসে গেছেন।'

ওদের পেছন পেছন অনিমেষ ভেতরে ঢুকল। মাঝখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেটাকে ঘিরে জনা দশেক মানুষ বসে আছেন। ওদের দেখে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আসুন, আসুন বারীনবাবু, উনি এসেছেন ?'

বারীন বললেন, 'হ্যাঁ, টেম্পোয় শুইয়ে নিয়ে এলাম। এই হল অনিমেষ মিত্র, জলপাইগুড়ির স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের ছেলে, এখন কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে।'

অনিমেষ নমস্কার করল কিন্তু এ ধরনের সৌজন্যবোধ প্রত্যেকের কাছে পাওয়া গেল না। যে দুজন ভদ্রলোক প্রথম কথা বলছিলেন তাদের একজন উঠে এসে ওর দু-হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আসুন, আসুন ভাই। আমরা আপনার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেছেন সে খবর আমরা অবশ্য আগেই পেয়ে গেছি।' ভদ্রলোক ওকে মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অনিমেষ দেখল ঘরের সবাই খুব সতর্ক চোখে তাকে দেখছে। যে সব মুখ এখানে আছে তাঁদের সবাই বাঙালি নন। বয়সের পার্থক্যটাও স্পষ্ট। পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, 'আপনার তো কলকাতা থেকে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি! মিলিটারি কম্পার্টমেন্টে এসেছেন।'

অনিমেষ অবাক হল। কলকাতা থেকে সে কীভাবে এসেছে এ খবরও এখানে পৌঁছে গেছে! গম্ভীর গলায় সে বলল, 'না, কোনও অসুবিধা হয়নি। ভুল করে ওদের কামরায় উঠে পড়ে ভালই হয়েছে।' তারপরই ওর নজরে পড়ল বারীন এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সে ডাকল, আপনি বলতে গিয়ে সামলে নিয়েই বলল, 'এসো বারীনদা, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

মাথা নাড়লেন বারীন, 'দূর! ওখানে বসার যোগ্যতা আমার আছে নাকি! সাইনবোর্ড এঁকে খাই, তাই করতে দাও। তোমাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল, দিলাম। আমি এবার চলি। তোমার থাকার ব্যবস্থা এখানেই হবে। তোমার জিনিসপত্র পৌঁছে যাবে ঠিক সময়ে। চলি ভাই, তোমরা কাজ করো।' বারীন আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনিমেষ বিস্মিত চোখে ওঁর যাওয়া দেখল। বারীন তা হলে সক্রিয়ভাবে যোগ দেননি অথচ গোপনে তাদের সাহায্য করছেন। লোকটির প্রতি ওর সমর্থন আরও বেড়ে গেল।

একটু পরেই কাজের কথা আরম্ভ হল। কথা বলতে বলতেই অনিমেষ এদের অনেকের নাম জেনে গেল। মোটামুটি উত্তরবাংলার বিভিন্ন জেলার সক্রিয় কর্মীরা আজকের সভায় উপস্থিত।

Banglabook.org

আন্দোলনের প্রথম ধাপ কীভাবে সংগঠিত করা হবে, এ ব্যাপারে কলকাতার কী নির্দেশ তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হল। কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে। এলাকায় এলাকায় আরও বেশি ক্যাডার ছড়িয়ে দিতে হবে। তারা কৃষকদের বোঝাবে। যখনই সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে তখনই অ্যাকশন শুরু হবে। ও পাশে ফাঁসিদেওয়া নকশালবাড়িতে ক্রমশ আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। একজন অবাঙালি মানুষের কথা অনিমেষকে ভীষণ আকৃষ্ট করল। তিনি বললেন, 'আমার ছেলেরা প্রস্তুত। কিন্তু সেটা শুধু আমার এলাকায়, অন্য এলাকাগুলো একসঙ্গে তৈরি না হলে কোনও রকম প্রতিরোধ টিকবে না। প্রস্তুতির কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে নেওয়া উচিত।'

অনিমেষ তাঁকে সমর্থন করে বলল, 'আমরা শুধু কৃষকদের কথাই বলছি। জমি দখলের ব্যাপারটা তাদের দিয়েই করতে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না উত্তরবাংলার গরিব মানুষের ষাট ভাগই কৃষিজীবী নয়। এতগুলো চা বাগানে ছড়িয়ে থাকা মদেশিয়া ওঁরাও মানুষগুলোকে সঙ্গে পাওয়া দরকার। সরাসরি পুলিশ কিংবা মিলিটারিদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। গেরিলা যুদ্ধই আমাদের একমাত্র রাস্তা। আর তা করতে হলে কৃষক ছাড়া অন্য শ্রমিকদেরও উৎসাহিত করা দরকার। আপনারা এই দিকটা দেখেছেন?'

সবাই স্বীকার করল, তা দেখা হয়নি। বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা কংগ্রেসি বা আর. এস. পি. ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে গিয়ে কাজ করার অসুবিধে আছে। তা ছাড়া জমি দখল করে তার অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের যত সহজে উদ্বুদ্ধ করা যাবে শ্রমিকদের তো তা যাবে না। তাদের সামনে পাওয়ার প্রত্যাশা কিছু রাখা যাচ্ছে না।

অনিমেষ উত্তপ্ত হল, 'আপনারা এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর লাইনে কথা বলছেন। সাধারণ মানুষ কি শিশু যে তাদের ললিপপের লোভ দেখিয়ে কাজ করাবেন? সেটা পাওয়া হয়ে গেলেই আমাদের সম্পর্কে ওদের আগ্রহ মিটে যাবে। এ ভাবে দেশে বিপ্লব হবে না।'

একজন বললেন, 'কিন্তু আমাদের নেতা বলেছেন এই বিপ্লব হল কৃষি বিপ্লব। জোতদারের কাছ থেকে জমি জবরদখল করে নিয়ে তার সূত্রপাত হবে। অতএব সেই দিকটায়ই জোর দেওয়া হচ্ছে।'

'কিন্তু বিপ্লব তো শুধু কৃষকরাই করবে না, শ্রমিকরা যখন সংখ্যায় ভারী তখন তাদেরও দলে থাকা দরকার।'

অনিমেষের এই কথাটাকে অবাঙালি ভদ্রলোক সমর্থন করলেন। উত্তরবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন যে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে এর চেয়ে ভাল এলাকা পাওয়া যাবে না। চা বাগানগুলো বেশির ভাগই জঙ্গলে ঘেরা এবং একটার থেকে আর একটা বেশ দূরে দূরে। এই ব্যাপক এলাকায় মিলিটারিকে লুকিয়ে থেকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা সম্ভব।

প্রায় চারটে অবধি আলোচনা চলল। অনিমেষ ওপর দায়িত্ব পড়ল চা বাগানগুলো দেখার। এটা যে হবে তা সে কলকাতা থেকেই অনুমান করেছিল। অবাঙালি ভদ্রলোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। খুব দ্রুত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। যাতে চূড়ান্ত মুহূর্ত এলে আর কোনও জড়তা না থাকে। যে যার কাজের এলাকা ভাগ করে নিল। শিলিগুড়ির এই তল্লাটটা অনিমেষের পরিচিত নয়। সে তিস্তার অপর পারে চা বাগানগুলোর শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব নিল।

এই সিদ্ধান্তের পর আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। অনিমেষ ভোর হওয়ামাত্র ট্রাক ধরে শিলিগুড়িতে চলে এল। সেই অবাঙালি ভদ্রলোকও ওর সঙ্গে এলেন। অনিমেষ জানতে পারল, প্রচুর অস্ত্র আসছে সীমান্ত পেরিয়ে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যে সব অস্ত্র চোরাই পথে এসেছিল সেগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর জন্যে অর্থ দরকার। স্বদেশিরা যেমন বলপ্রয়োগ করত, এ ক্ষেত্রে তাই করতে হবে। এইভাবে যদি কিছুদিন চলে তা হলে পুলিশের মোকাবিলা করতে কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্য কৃষকরা তীর ধনুক নিয়েই মরিয়া হতে পারে। অনিমেষ ভাবছিল, এ সবই ঠিক, অস্ত্র প্রচুর থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো যারা ব্যবহার করবে সেই মানুষগুলোকে অবিলম্বে তৈরি করা দরকার।

সাঁইত্রিশ

মাধবীলতা,

তোমার নাম লিখতে গিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি হল। আদ্যক্ষরটি তোমার মধ্যে মিলেমিশে এমন জড়িয়ে আছে, কী জানি তাই তোমাকে এত ভাল লাগে হয়তো! তোমাকে এই প্রথম চিঠি লিখলাম। লিখতে গিয়ে টের পেলাম প্রতিটি শব্দ লেখার সময় আমি তোমার স্পর্শ পাচ্ছি।

BanglaBook

আমি তোমাকে চিঠি লিখছি স্বর্গছেঁড়া চা বাগান থেকে আট মাইল দূরে একটা গ্রামে বসে। অবশ্য গ্রাম বললেও বোধহয় জায়গাটাকে বেশি সম্মান দেওয়া হবে। স্বর্গছেঁড়ার এত কাছে আছি কিন্তু এখনও ছোটমার সঙ্গে দেখা করার সময় পাইনি। কথাটা পড়লেই তোমার ভ্রূ কুঁচকে যাবে জানি, কিন্তু বিশ্বাস করো, এখানে এসে নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না। তবে দেখা করার সময় না পেলেও তাঁর দেখা আমি পেয়েছি। সেদিন গাড়িতে ময়নাগুড়ি থেকে ফিরছিলাম। ডুডুয়া নদী পার হয়ে আংরাভাসার ওপর দিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিয়ে যখন চা-বাগানের শরীর জড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে মিশে থাকা কোয়ার্টারগুলোর সামনে দিয়ে চলে আসছে তখন দেখলাম ছোটমা আমাদের সেই বাড়িটার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। এক পলক মাত্র, তার মধ্যেই গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে এল। দূরত্বটা এমন যে চিৎকার করলেও বোধহয় শোনা যেত না।

এই প্রথম উত্তরবাংলায় এসে নিজের অস্তিত্বকে গোপন রাখতে হচ্ছে। তবে চারধারে এত সাপের মুখ যে ছোবল আসতে কতক্ষণ! সতর্ক থাকাই মঙ্গল।

এখানে এসে বেশ কিছুদিন রয়েছি। নিজের সম্পর্কে একটা গোপন সত্য আবিষ্কার করেছি। জানো, ছোটবেলায় আমি খুব রোমান্টিক ছিলাম। ভীষণ ভাবপ্রবণ। এই স্বর্গছেঁড়াকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। এর গাছপালা নদী এমনকী বাতাসকেও আমি অনুভব করতাম। মনে আছে প্রথম যখন দাদুর সঙ্গে এই জায়গা ছেড়ে যাই তখন রুমালে স্বর্গছেঁড়ার মাটি বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলাম। জলপাইগুড়ির বাড়ির উঠোনে সেই মাটি রেখে রোজ দেখতাম আর ভাবতাম স্বর্গছেঁড়ায় আছি। কিংবা স্বর্গছেঁড়ার সেই কাঁঠাল গাছ, তালগাছ, চা-বাগানের মধ্যে ঘুঘুর ডাক, যা কিনা পৃথিবীর যে কোনও ঐশ্বর্যের বিনিময়েও ছাড়তে কষ্ট হত, এখানে এসে দেখলাম তারা সবাই একই রকম আছে, ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আমার সেই মনটাকে কিংবা চোখটাকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন সেইসব ভাবপ্রবণতার কথা ভেবে হাসি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা বড় দ্রুত পালটে যায়। দৃষ্টিও। আমার সেই আমিটা সম্পর্কে শুধু মমতাই দেখানো যায় কেননা বাস্তবে সে অচল। যে চা-বাগানের গলিতে দুপুর বিকেল চুপচাপ পাখির আওয়াজ শুনে কাটাতে ভাল লাগত সেটা ছিল নিতান্তই অর্থহীন। এখন সেই শূন্যগর্ভ ভাললাগা নয়, কাজের গতি যদি একবার রক্তে মেশে তখন নতুন চোখ খুলে যায়, কিংবা পুরনো চোখ অন্ধ হয়ে যায়। না হলে কাজ হয় না।

জানো, আমি আর একটা জিনিস ক্রমশ টের পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমি খুব নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কোনও কিছুই আমাকে তেমন স্পর্শ করে না। যেমন ধরো, এই স্বর্গছেঁড়া, এককালে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড় বলে ভাবালুতায় ভুগতাম তা আর নেই। এতবার ওপর ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করেছি কিন্তু বুকের মধ্যে কোনও কাঁপুনি হয় না। চা-বাগানের গলিকে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে নিরাপদ জায়গা বলে ভাবছি। আংরাভাসা নদীর ধার দিয়ে যে খুঁটিমারির জঙ্গল লাল সূর্যের বলটাকে মাথায় নিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে, তার মতো গোপন শেল্টার আর কিছু নেই। মিটিং বলো, গোপন গেরিলা ট্রেনিং বলো এই জঙ্গল মায়ের মতো আশ্রয় দেবে।

ছোটমা কিংবা আমার বাবা শ্রীযুক্ত মহীতোষ মিত্র মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছেন। দশ মিনিটেই পৌঁছে যেতে পারি। পুলিশ আমার অস্তিত্ব জেনে যেতে পারে এই আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলেও দেখা করতেই হবে এমন টান বোধ করি না। খুব খারাপ শোনাচ্ছে কথাটা কিন্তু সত্যি কথা এটাই। ছোটমা কিংবা বাবা তো সে অর্থে আমার বাল্যকালে দূরের মানুষ ছিলেন, জলপাইগুড়ির শহর থেকে আমার বর্তমান ডেরার অবস্থান ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই। কই, একদিনও তো দাদু ও পিসিমাকে দেখতে যাবার কথা আমার মনে পড়ল না। এই দুটি মানুষ তো আমার এই শরীরটাকে তিল-তিল করে বড় হতে সাহায্য করেছেন। এইসব আত্মীয়স্বজন, চেনা জায়গা কিংবা তার মতো অন্তরঙ্গ ছবি সম্পর্কে অদ্ভুত উদাসীনতা আজকাল আমাকে নির্লিপ্ত করেছে।

মাধবীলতা, কথাটা কি তোমার সম্পর্কেও খাটে না ? তুমি আমাকে ভালবেসেছ। আমি জানি তুমি কতখানি আন্তরিক। এই আমার জন্যেই তুমি একটানে সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছ, হোস্টেলে রয়েছ। কিন্তু কী আশায় ? পৃথিবীর যে কোনও যুবতীর মতো তোমার বাসনা হওয়া উচিত একটি সাজানো সুন্দর গৃহের। আমাকে নিয়ে। কিন্তু প্রতিটি দিন আসছে আর আমি সেই গৃহ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছি। তোমাকে ভালবেসেছি অথচ তোমাকে শান্তি দেবার বদলে অথই উদ্বেগে রেখে এসেছি। কাউকে ভালবাসলে এ ভাবে দূরে চলে যাওয়া যায় ? তা হলে ভালবাসতে গেলামই বা কেন ?

BanglaBook.org

এইসব ভেবেচিন্তে মনে হয় আমি বোধহয় এখন স্বার্থপর হয়ে গেছি। স্ব অর্থে পর। জীবন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো চেহারা নিয়েছে। আর এত বুঝেও এ থেকে বেরিয়ে আসার অভ্যেসটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

ভীষণ একা লাগছিল, তোমাকে চিঠি লিখলাম তাই। এত বড় চিঠি কখনও লিখিনি। আমার সব সময় ভয় যে, আমাকে ভালবেসেছ, শুধু এই কারণে তুমি আরও বড় বিপদে না পড়ো। হয়তো সত্যি যদি পড়ো তখনও আমি কিছুই করতে পারব না। সময় আমাদের সবক'টা আঙুল ক্ষইয়ে দিয়েছে। আমরা কারও হাত জড়িয়ে ধরতে পারি না, শুধু ঠেকাই মাত্র।

আবার কখন লিখব জানি না। যদি বেঁচে থাকি তা হলে বর্ধমান স্টেশনে দেখা করব পৌষমেলার দিন। যদি দ্যাখো নির্দিষ্ট সময়ে আমি এলাম না তা হলে তুমি কখনও বোলপুরে যাবে না।

জানি, নিজের নিরাপত্তার জন্যেই এত বিশদ ভাবে লেখা আমার অন্যায় হল। হয়তো নিয়ম ভাঙলাম। এবং জেনেশুনেই।

তাই এই চিঠি জমিয়ে রেখো না।

— তোমার অনিমেষ

পুনশ্চ। এখনও তোমার দেওয়া টাকা শেষ হয়নি।

একটানে চিঠিটা শেষ করল অনিমেষ। হাত টনটন করছিল। এখন রাত গভীর। শুধু টি-উ-প টি-উ-প একটি শব্দ কোনও পাখির গলায় সমানে বেজে যাচ্ছে। চিঠিটা ভাঁজ করে বুকপকেটে রাখতে না রাখতেই দরজায় শব্দ হল। ভেজানো দরজা খুলে একটি কৃষ্ণকায় যুবক ঘরে ঢুকে পরিষ্কার হাসল। লণ্ঠনের আলোয় তার চকচকে দাঁত দেখতে পেল অনিমেষ। যুবকটির নাম সিরিল ওঁরাও। শুকনা থেকে আসার সময় সেই অবাঙালি ভদ্রলোকের পরিচয়ে অনিমেষ এর সন্ধান পেয়েছে। আপাতত এরই আশ্রয়ে। অত্যন্ত কাজের ছেলে। সিরিল বলল, 'চলুন।'

অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বারীনকে আলোয়ান ফেরত দেওয়া হয়নি কিন্তু তাতেও শীত মানছে না। সোয়েটার তলায় আছে। অনিমেষ দেখল আশেপাশে কোথাও আলো নেই। বাইরের ঘরের দেওয়ালে দুটো সাইকেল হেলান দিয়ে রয়েছে। সাইকেলে কাঁচা রাস্তা মিনিট তিনেক গেলেই ফুরিয়ে গেল। খুঁটিমারির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তা যেটা নাথুয়া থেকে এসেছে সেখানে সাইকেল চালানো খুব স্বচ্ছন্দের। রাস্তাটা একটু ঢালু, চাকা গড়গড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। আর এই গতির জন্যেই হাওয়ার কামড়ে কাঁপুনি আসছিল শরীরে। দাঁতে দাঁত ধরে রাখতে পারছিল না অনিমেষ। রাত্তিরের জঙ্গলে একধরনের অচেনা শব্দ হয়। ওরা দুজনে নিঃশব্দে সেই শব্দ শুনতে শুনতে প্যাডেল ঘোরাচ্ছিল। হঠাৎ সিরিল আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনিমেষ এগিয়ে এসেছিল কিছুটা, ওকে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে সাইকেল থামাল। ততক্ষণে সিরিল তার কাছে চলে এসেছে। তারার আলোয় ওর মুখটাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। চাপা গলায় সে বলল, 'সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না।'

অনিমেষ ভ্রূ কুঁচকে সামনের পথটাকে দেখল। রাতেরও নিজস্ব একটা আলো থাকে। চাঁদ না থাকলে সেই আলো আরও মোহিনী হয়। অনিমেষ দেখল পথটাও পাশের জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছে কিন্তু কোনও বিপদ রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। সিরিল নিচু গলায় বলল, 'হাতি বেরিয়েছে।'

'হাতি?'

'হ্যাঁ। কিছুদিন হল ভুটান থেকে একদল এই অঞ্চলে নেমে এসেছে। অত্যন্ত মারকুট্টে এই দলটা। মনে হচ্ছে সামনের মেছুয়া পুলের মুখটায় ওরা রয়েছে।'

'কী করে বুঝলেন?' অনিমেষের কাছে পুরো ব্যাপারটাই কেমন ভৌতিক বলে মনে হচ্ছিল। চোখে দেখা যাচ্ছে না, এমনকী কোনও শব্দও নেই।

'ওই দিকে তাকান।' সিরিল আঙুল তুলে দেখাল। সদ্য ত্যাগ করা বিষ্ঠা রয়েছে রাস্তার একপাশে। তার আয়তন এবং পরিমাণ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই পথ দিয়ে হাতি গেছে। 'আমরা আর একটু হলে ওদের সামনে গিয়ে পড়তাম। তা হলে আর দেখতে হত না। খুব জোর বেঁচে গেছি।'

'তা হলে যাব কী ভাবে! আর কোনও রাস্তা আছে?'

'আছে। হাতি বেরিয়েছে বলেই সেই রাস্তায় যাওয়া যায়। তার আগে চলুন সাবধানে গিয়ে সন্দেহটাকে মিটিয়ে আসি।' সিরিলের সঙ্গে খুব আস্তে সাইকেল চালাতে লাগল অনিমেষ। যে

BanglaBook.org

কোনও মুহূর্তে দিক পরিবর্তনের জন্যে দুইজনেই তৈরি। রাস্তার বাঁকে এসে ওরা আরও ধীর হল। তারপরই দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

সামনেই মেছুয়া পুল। পুলটার গায়ে ছোট ছোট কালো টিলা নড়ছে। অন্তত গোটা কুড়ি হবে। অনিমেষের মনে হল চাপ চাপ অন্ধকার রাস্তাটাকে ঢেকে দিয়েছে। নিঃশব্দে সরে এল ওরা। একটু পিছু হটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। জিপ যাওয়া-আসার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই কাঁচা পথগুলো তৈরি করা হয়েছে। দুপাশে ঘন জঙ্গলের গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছিল অনিমেষ। অবিরাম শিশির পড়ছে এখানে। সিরিল বলল, অন্য সময় হলে ভয় পেতাম এই রাস্তায় যেতে। কিন্তু হাতি বেরিয়েছে যখন তখন মাইল দুয়েকের মধ্যে কোনও বন্যজন্তু থাকবে না। একটু ঘুর হবে তবু এ ছাড়া উপায় কী ?'

'বন্যজন্তু! এখানে এখনও বাঘ আছে নাকি ?'

'মাঝে মাঝে আসে যায়। কখন থাকে বলা যায় না।'

অনিমেষ প্রায় আধঘন্টা প্যাডেল ঘুরিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সামনে ধানখেত। সাইকেল চালানো যাবে না, ওরা হাতে করে হেঁটে এল। তারপরেই নদী। মেছুয়াপুলের তলা দিয়ে যেটা বয়ে এসেছে সেটা এখানে বেশ চওড়া। সেদিকে তাকিয়ে সিরিল বলল, 'এর কাজ করুন, আপনি এখানে থাকুন, আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি।' সাইকেল মাটিতে রেখে সে প্যান্ট গোটাচ্ছিল।

অনিমেষ বলল, 'আমার যেতে কোনও অসুবিধে হবে না। চলুন।'

'না। ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ ?'

'ঝুঁকি ? আপনি কি আমাকে খুব বাবু ভাবছেন ?' একটু উষ্ণ হল অনিমেষ।

'না না। আমি আপনার কথা বলছি না। দুজনে যদি যাই তা হলে এসে হয়তো দেখব এই সাইকেল দুটোই নেই। কিছু তো বিশ্বাস নেই। যত রাতই হোক কেউ হয়তো কোনও কারণে বাইরে এসে দেখল লোকজন নেই আর এই দুটো পড়ে আছে, সে কি হাত গুটিয়ে থাকবে ?'

'তা হলে এদের নিয়ে গেলেই হয়!'

'পারবেন না। স্রোত কীরকম দেখতে পাচ্ছেন ? আমি আসছি।' সিরিল জলে নেমে গেল। স্রোত যে খুব জোরদার তা বোঝা যাচ্ছিল। অনেকবার হোঁচট খেয়ে অনেকটা পিছু হটে ওকে ওপারে উঠতে হল। তারপর প্রায় দৌড়েই মিলিয়ে গেল সে।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হল অনিমেষকে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থা তার। হাত পা নেড়ে শরীর গরম করার চেষ্টা করে যাচ্ছে সে সমানে। দৃশ্যটা ভাবতেই হাসি পেল। এই নির্জন রাতের ফাঁকা মাঠে একটা লোক পাগলের মতো নাচছে একা একা। কেউ দেখছে না জানলে আমাদের লজ্জাবোধ অনেক কমে যায়।

আবছা অন্ধকারে অনিমেষ ওদের দেখতে পেল। খুব দ্রুত দুটো মানুষ আসছে। ওরা অনেকটা এগিয়ে জলে নেমে স্রোতের টানে টানে নদী পার হয়ে এপারে এল। সাইকেল ছেড়ে অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে দেখল ঠাণ্ডা জল থেকে উঠে এসে ওরা ঠক ঠক করে কাঁপছে। সেই অবস্থায় প্যান্ট ঠিক করতে করতে সিরিল হাসল, 'বেশি দেরি হয়নি তো ?'

'না, না, ঠিক আছে।'

'এঁকে আপনি চেনেন ?'

অনিমেষ দেখল ওর সঙ্গের মানুষটি মুখ টিপে হাসছেন। বয়স হয়েছে কিন্তু শরীর খুব মজবুত। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ হাত বাড়িয়ে দিল, 'কেমন আছেন ?'

'চলছে। আমাকে চিনতে পেরেছেন মনে হচ্ছে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি কিন্তু খবরটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সন্দেহ ছিল আপনি হয়তো চিনতে পারবেন না। অনেক বছর আগে সামান্য সময়ের জন্য আমাদের দেখা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, সেদিন আমরা আত্মরক্ষার জন্যে চা-বাগানের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু সিরিল একবারও আপনার নাম বলেনি।'

'এটুকু সাসপেন্স রাখা হয়েছিল। দেখছিলাম আপনার স্মৃতিশক্তি কেমন ? আপনি এখানে আছেন মহীবাবু জানেন না নিশ্চয়ই।'

'না।'

জুলিয়েন বললেন, 'চলুন, এই ঠাণ্ডায় না দাঁড়িয়ে কোথাও বসে কথা বলা যাক। ঠাণ্ডাটা খুব

BanglaBook.org

পড়েছে আজ।'

'এখানে বসার জায়গা আছে?'

'আছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

জুলিয়েনের পেছনে ওরা সাইকেল নিয়ে হাঁটছিল। যেতে যেতে জুলিয়েন বললেন, 'আপনি এখানে এসেছেন খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু দিনদুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে আপনার গোপনীয়তা থাকত না। তাই এই ব্যবস্থা।'

'আপনি একটু বেশি ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে।'

'মোটেই না। আমার ওপর ভাল নজর রাখা হয়েছে।'

কথা বলতে বলতে ওরা একটা বসতি এলাকায় চলে এসেছিল। জঙ্গলের পাশে কয়েক ঘর মানুষের অস্থায়ী ডেরা এটা। তারই একটির দরজায় গিয়ে জুলিয়েন টোকা দিলেন। কোনও সাড়া এল না। কয়েকবার নিষ্ফল চেষ্টা করে বলপ্রয়োগ করলেন জুলিয়েন। মাটির ঘর, ছ্যাঁচার বেড়ার দরজা অল্পেই খুলে গেল। জুলিয়েন মদেশিয়াদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুধুয়া আছিস?'

এবার একটি স্ত্রীকণ্ঠ কথা বলল। ঘুম জড়ানো বিরক্তি। জুলিয়েন নিজের পরিচয় দিতেই একটা টিবড়ি জ্বলে উঠল। জুলিয়েন আবার প্রশ্ন করতে জানা গেল বুধুয়া ঘরে নেই। জুলিয়েন ওদের ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। অনিমেষ সাইকেল বাইরে রাখছিল কিন্তু সিরিল তাকে নিষেধ করল। বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করবে। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে দেখল ঘরটা নেহাত ছোট নয়। বাইরের আকাশের নীচ থেকে এ ঘরে এসে খুব আরাম লাগল তার। অনিমেষ দেখল এ ঘরের বাসিন্দাদের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। আসবাব বলে কিছু নেই। বাঁশের খাটিয়ার ওপর একটা তেলচিরকুটে বিছানায় নিশ্চয়ই ওই স্ত্রীলোকটি মধ্যবয়সী এবং বাঁ চোখের ওপর বড় আব আছে। ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল সে।

জুলিয়েন বললেন, 'তুই শুয়ে পড়। আমরা এখানে বসে একটু কথা বলে চলে যাব।'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নেড়ে আবার খাটিয়ায় ফিরে গেল। তারপর সেখান থেকে একটা ময়লা কাপড় তুলে এনে মাটিতে বিছিয়ে দিল।

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুধুয়া কি এখন রোজ রাত্রে বের হচ্ছে?'

নীরবে ঘাড় নেড়ে স্ত্রীলোকটি খাটিয়ায় ফিরে যেতেই বাচ্চাটা ককিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বুকের আঁচল সরিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দিল কোলে তুলে নিয়ে। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়ে অনিমেষের খেয়াল হল এই শীতেও ওদের শরীরে কোনও গরম জামাকাপড় নেই।

ওরা তিনজনে কাপড়টার ওপর বসতেই টের পেল মাটি থেকে ঠাণ্ডা উঠছে। জুলিয়েন বললেন, 'এই পরিবারটি চা-বাগানের কর্মী ছিল। বুধুয়া লোকটা খুব রগচটা। বছর তিনেক আগে স্ট্রাইকের সময় ম্যানেজারের কুঠিতে ঢিল ছোড়ার অপরাধে ওর চাকরি যায়।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রমাণ করল কী করে?'

'খুব সহজেই। গুদাম থেকে যখন কাজ করে বের হচ্ছে তখন ওর থলিতে কিছু চা প্যাকেট ভরে দেওয়া হয়েছিল। বেচারা তা জানত না। গেটে ধরা পড়ে চুরির অপরাধেই চাকরি গেল। আসল রাগটা এখানে অন্যভাবে মেটানো হয়।'

'ইউনিয়ন থেকে কিছু করা হয়নি?'

'না। আমরা আজ এই ইউনিয়ন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। আমাদের জন্যে ওরা ফালতু ঝামেলায় জড়াবে কেন? আর প্রমাণ তো হাতেনাতেই পেয়েছিল। ছ'মাসের মধ্যে ওকে কোয়ার্টার ছেড়ে এখানে চলে আসতে হল। ব্যবস্থা তো দেখতে পাচ্ছেন। কাজকর্ম পাচ্ছে না অথচ পেট মানবে না। রোজ রাত্রে শেষ পর্যন্ত সহজ উপায়টা বেছে নিয়েছে।'

'মানে?'

'চুরি। যেদিন ধরা পড়বে এরা ভেসে যাবে।'

'আপনারা কিছু করছেন না কেন?'

জুলিয়েন বড় বড় চোখ মেলে অনিমেষকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের হাত-পাগুলো খুব ছোট অনিমেষবাবু। আর এরকম বুধুয়া তো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। আপনি ক'জনের জন্যে করতে পারেন?'

এইসময় সিরিল কথা বলল, 'জুলিয়েন এখন সাসপেনশনে আছে।'

অনিমেষ অবাক হল। এতক্ষণ লোকটির সঙ্গে কথা বলে এই বিপদের একটুও আঁচ পায়নি সে।

BanglaBook.org

স্বর্গছেঁড়ার শ্রমিকনেতা জুলিয়েনের সেই চেহারাটা এখন সে স্পষ্ট মনে করতে পারে। কুলিদের বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে ছোটমা আর বাবার সঙ্গে সে চা-বাগানের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এই জুলিয়েনের মুখোমুখি হয়েছিল। খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিল সেদিন জুলিয়েন। মিশনারি স্কুলে পড়ে আসা এই মদেশিয়া যুবকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সেদিন অনিমেষ। তখন তো সবাই এঁর কথা মানত। আর আজ তো একদম অন্য কথা শুনছে সে।

জুলিয়েন বললেন, 'কলকাতার খবর বলুন।'

অনিমেষ একটু একটু করে প্রস্তাবিত দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা বলল জুলিয়েনকে। এবার সংগ্রাম মুখোমুখি। সৈনিক চাই। ভারতবর্ষের মানুষের মেরুদণ্ডটি ফিরিয়ে আনার জন্য একটা ব্যাপক চেষ্টা করতে হবে। জুলিয়েন বললে, 'এ সব কথা আমরা জানি অনিমেষবাবু। কিন্তু এখানে অবিলম্বে সংগঠন করা দরকার। আপনারা কবে নাগাদ মুখোমুখি হবার কথা ভাবছেন?'

'সামনের মাসে বোলপুর থেকে ঘুরে এসে বলতে পারব।'

জুলিয়েন বললেন, 'ব্যাপারটা এখন আর গোপন নেই। তবে মজার ব্যাপার হল, যে শুনছে সে বিশ্বাস করছে না। পুলিশকে আমার ভয় নেই। কিন্তু সক্রিয় হয়ে কেউ কিছু করলে সব প্রথম বাধা দেবে অন্য পার্টির লোকজন। বিপদটা এখানেই। আমরা যদি সবাই এক সঙ্গে কাজ করতে পারতাম তা হলে একদিনে দেশের বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্টদের সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হওয়ার নয়।'

অনিমেষ বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ থাকা দরকার। কীভাবে হবে?'

জুলিয়েন বললেন, 'এই ঘরে। এখানে দেখা হওয়া দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।'

অনিমেষ বলল, 'প্রত্যেকটা চা বাগানে স্কোয়াড তৈরি করতে হবে। খুব নির্ভরযোগ্য কিছু ছেলেকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে।'

জুলিয়েন বললেন, 'কী ধরনের অ্যাকশন এখানে করার কথা ভাবছেন?'

'দেখুন, কৃষকরা জোতদারের কাছ থেকে জমি দখল করবে, এটা করতে তারা স্বভাবতই উত্তেজিত হবে। কিন্তু আমরা শ্রমিকদের বলতে পারি না যে তোমরা চা বাগান দখল করো। ফ্যাক্টরি দখল করে সাতদিনও তারা চালাতে পারবে না। তাদের ব্যক্তিগতভাবে উত্তেজিত করে কিছু করা যাচ্ছে না। কিন্তু এমন কাজ করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ চমকে যায়। প্রত্যেকের অন্ধ বিশ্বাসের ভিত যেন নড়ে যায়। কাজগুলো করতে হবে জনসাধারণের স্বার্থ-বিরোধী মানুষের বিপক্ষে। ফলে পুলিশ যদি অ্যাকশনে নামে তা হলে আমরা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাব। এক সময় তারা এগিয়ে আসবে, পাশে এসে দাঁড়াবে।'

সিরিল হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, 'তা হলে পানিরামের গদি লুট করলে হয়। শালা রক্তচোষা। এই বাগানের অনেক মানুষ ওর কাছে ধার নিয়ে মাথা বিকিয়ে আছে। সুদ দিতে দিতে সবার মাইনে খতম হয়ে যায়।'

অনিমেষ বলল, 'পানিরামের তো ভাটিখানা ছিল।'

জুলিয়েন বললেন, 'এখনও আছে। টাকার পাহাড়ে বসে আছে লোকটা। এই চা বাগানের মানুষগুলোকে কিনে রেখেছে।'

'ওর গদিতে টাকা থাকে?'

'থাকে। সোমবার সকালে ব্যাঙ্কে যায় ওর গাড়ি।'

'আমাদের এখন প্রচুর টাকার দরকার।'

জুলিয়েন বললেন, 'সিরিল ঠিক বলেছে। সাধারণ মানুষের ধারণা পানিরাম শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী। পুলিশ ওর কেনা। সেই পানিরামকে যদি লুঠ করা যায় তা হলে লোকে ধাক্কা খাবে। সাহস পাবে।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু সাধারণ মানুষকে বুঝতে দিতে হবে এটা কোনও সাধারণ ডাকাতের কাজ নয়। সারা দেশ জুড়ে আগামিকালের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের এটা প্রতিবাদ। অ্যাকশনের সময় এ-সব কথা সেখানে লিখে আসতে হবে।'

'কিন্তু পানিরামের বন্দুক আছে।' সিরিল বলল, 'ও তো বাধা দেবেই।'

'বাধা দিলে জোর খাটাতে হবে।' অনিমেষ খুব শান্ত গলায় বলল, 'যদি কোনও উপায় না থাকে তা হলে পানিরামকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন আর সিরিল অনিমেষের দিকে তাকাল। জুলিয়েন সম্মতির মাথা নাড়লেন।

BanglaBook.org

তারপর বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। একজন রক্তচোষাকে মেরে ফেললে আরও দশটা ভয় পেয়ে যাবে। এই লোকটাকে চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক দুবেলা মেরে ফেলার কথা ভাবে। কিন্তু আমাদের এই গরিব মানুষের বুকে অসহায়তা ছাড়া কিছু নেই। ওরা শুধু কল্পনা করতেই পারে। কিন্তু কেউ যদি ওদের করতে না পারা কাজটা করে দেখায় তা হলে সে ওদের আপনজন হয়ে যাবেই। আপনি ঠিক বলেছেন।'

অনিমেষ জুলিয়েনের এই ব্যাখ্যায় খুব খুশি হল। সে বলল, 'কিন্তু পানিরামের মতো মানুষ খুন হলে যে পুলিশি তৎপরতা শুরু হবে তা সামলাতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

জুলিয়েন হেসে দুটো হাত ছড়িয়ে দিলেন, 'আমাদের চারপাশে এত জঙ্গল। পুলিশের ক্ষমতা কি খুঁজে বের করে সেখান থেকে। আর থানাগুলো এত দূরে দূরে যে পুলিশ আসার আগেই আমরা খবর পেয়ে যাব। কিন্তু আসল ব্যাপারটার কথা কী ভাবছেন?'

অনিমেষ বলল, 'কী ব্যাপার? অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরি করা?'

জুলিয়েন মাথা নাড়লেন, 'না। ওতে আমাদের খুব কষ্ট হবে না। কারণ, এই সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরক্ত ছেলের অভাব নেই এ দেশে। আর যৌবনে মানুষ এরকম কাজ করার জন্যে সব সময় উত্তেজিত হয়। আমি সে-কথা ভাবছি না। আমি অস্ত্রের কথা ভাবছি। এ-সব কাজ তো আর ছুরি কাটারি নিয়ে হয় না। আমাদের প্রচুর অস্ত্র দরকার।'

অনিমেষ বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু অস্ত্র তো আর এমনি এমনি পাওয়া যাবে না। সেগুলো কিনতে হবে আর তার জন্যে টাকা দরকার। পানিরামের কাছ থেকে মেরে বা ভয় দেখিয়ে সেই টাকা আমাদের পেতে হবে। একটা পানিরাম খুন হলে দেখবেন অন্য পানিরামরা ভয়েই টাকা দিয়ে দেবে।'

সিরিল বলল, 'আর একটা সহজ উপায় আছে।'

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী উপায়?'

'সব চা বাগানের সাহেব কন্ট্রাকটারবাবু আর বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বন্দুক পিস্তল রাইফেল আছে। আমরা যদি সেগুলো গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে আসি, তা হলে আমাদের অনেক অস্ত্র হয়ে যাবে।' সিরিল একটা উপায় বার করতে পেরেছে বলে খুশিতে হাসল।

অনিমেষ বলল, 'মন্দ বলেননি। প্রথম দিকটায় আমরা এইভাবে চালাতে পারি। তা হলে ডুয়ার্সে কার কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে তার একটা লিস্ট করা দরকার। তাই না?'

'খুব সহজ। সদরের সরকারি অফিসে ওই লিস্ট আছে।'

অনিমেষ বলল, 'তা হলে আমরা তৈরি হই। তবে আমি বোলপুর থেকে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করলেই ভাল হয়।'

জুলিয়েন বললেন, 'ঠিক আছে। এখন আপনি কী করবেন?'

'আপার ডুয়ার্সে যেতে হবে। ও দিকে আপনার জানাশোনা কেউ আছে?'

'নিশ্চয়ই। আপনি কবে যাবেন?'

'ধরুন কালকেই।'

জুলিয়েন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর হেসে বললেন, 'আপনার সাহস আছে। এইভাবে একা একা ঘুরছেন, যদি সঠিক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না হয় তা হলে বিপদে পড়তে পারেন। ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'আপনি যাবেন?' অনিমেষ বিস্মিত, 'বাড়ির লোকজন?'

'ছাড়তেই হবে যখন, তখন একটু আগেই ছাড়ি। অবশ্য এখনই কাউকে কিছু বলছি না।' জুলিয়েন কথা শেষ করতেই অনিমেষ হাত বাড়াল। ওরা যখন খুব আন্তরিক করমর্দন করছে ঠিক তখনই দরজাটা ধীরে ধীরে ফাঁক হল। ওরা তিনজনেই ঘাড় ঘুরোতেই একটি মুখ উঁকি দিয়েই সরে যাচ্ছিল। জুলিয়েন ডাকল, 'বুধুয়া!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটি মানুষ আরশোলার মতো হেঁটে এল ভেতরে। অনিমেষ দেখল লোকটার কপাল থেকে রক্ত বের হচ্ছে, হাতে একটা বোঁচকা। এই লোকটাই চুরি করতে গিয়েছিল।

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাথা ফাটল কী করে?'

বুধুয়া মুখ নিচু করল। জুলিয়েন উঠে ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললেন, 'তেমন কিছু নয়। বিশল্যকরণী পাতার রস লাগিয়ে নে। আর এই ব্যবসা ছাড়তে হবে।'

BanglaBook.org

খুব নিরীহ গলায় লোকটা বলল, 'খাব কী?'

জুলিয়েন এবং অনিমেষ পরস্পরের দিকে তাকাল। সিরিল জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কার সর্বনাশ করলে?'

সঙ্গে সঙ্গে হাসল বুধুয়া, 'সর্বনাশ আর কোথায় করতে পারলাম। পানিরামের ঘরে গিয়েছিলাম আজ। দুটো থালা নিয়ে এসেছি।'

নামটা উচ্চারণ করা মাত্র অনিমেষরা চমকে উঠল।

ওরা খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ হেঁটে জুলিয়েন বিদায় নেবার জন্য দাঁড়ালেন। অনিমেষ বলল, 'এ-সব চুরি ছ্যাঁচড়ামিতে ওদের গা সয়ে গেছে, এবার আমাদের ডাকাতি করতে হবে।'

আটত্রিশ

খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এতটা হবে অনিমেষ ভাবেনি। যারা এর আগে কখনও রাজনীতির সঙ্গে সামান্যও যুক্ত ছিল না তারাও দলে আসতে শুরু করেছে। এক ধরনের ছেলে থাকে পরিবারে তারা ঠিক আমল পায় না নানান রকম ব্যর্থতার জন্যে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মন আছে। সেই মনই তাদের টেনে আনছে। আগে হলে অনিমেষ এ নিয়ে সূক্ষ্ম বিচারে বসত, এরকম উচ্ছ্বাসকেই হাউই বলে বাতিল করত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেকসময় মরা মরা বলতে বলতেও তো রাম শব্দটা বেরিয়ে পড়ে। অ্যাডভেঞ্চার করা হোক কিংবা তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসই হোক, এই করতে গিয়ে যদি কিছু ছেলে সিরিয়াস হয়ে যায় সেইটেই সবচেয়ে বড় পাওয়া। জুলিয়েনকে সঙ্গে পেয়ে কাজ করতে সুবিধে হচ্ছে। দীর্ঘকাল এদিকে ইউনিয়ন করায় ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোতে জুলিয়েন বেশ পরিচিত। চা-শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত, হপ্তার বা মাসের মাইনেতে যাদের সংসার চলে তাদের জুলিয়েন সরিয়ে রাখছিলেন। বলেছিলেন, 'এই সব মানুষ খুব সুখে নেই কিন্তু নিশ্চিত আয় থেকে সরে আসার ঝুঁকি কেউ নেবে না। বরং চা বাগানে যারা নানান কারণে অবাঞ্ছিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।'

বাঙালিদের সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনিমেষের একধরনের বিরক্তি এসে গেছে। তাঁরা যেন নেতা হতেই জন্মেছেন। দলে যে ক'জন এসেছেন তাঁরা শুধু নানান ধরনের যুক্তি তুলে জ্ঞান দিতে চান। কাজ করবার খুব উদ্যম তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। বরং দলের মধ্যে একটা উপদল গঠন করার ব্যাপারে বেশ তৎপরতা চোখে পড়ে।

শিলিগুড়ির সঙ্গে অনিমেষের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। প্রায়ই তাকে যেতে হচ্ছে সেখানে। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এ দিকে নির্বাচন এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন পার্টি থেকে প্রচার শুরু করার আয়োজন চলছে। অনিমেষদের দল নির্বাচন বয়কট করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নির্বাচন বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদীদের একটা নতুন ধরনের খেলনা মাত্র কিংবা এমন একটা মাদকদ্রব্য যা দিয়ে দেশবাসীকে পাঁচ বছরের জন্যে বুঁদ করে রেখে দেওয়া যায়। অবশ্য নির্বাচনকে প্রতিরোধ করার কোনও নির্দেশ এখন পর্যন্ত পার্টি থেকে আসেনি।

এই যে প্রস্তুতি চলছে সেটা আর এখন গোপন নেই। বিভিন্ন পার্টি থেকে তাদের হঠকারী উগ্রপন্থী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হলেও সরাসরি সংঘর্ষে এখনও ওরা লিপ্ত হয়নি। কিন্তু হাওয়া গরম হয়ে উঠছে দ্রুত। অনিমেষের আশঙ্কা, পুলিশের আগে তাদের হয়তো অন্য পার্টিগুলোর সঙ্গে লড়তে হবে। সংগঠন যত জোরদার হচ্ছে অন্য পার্টিগুলো ততই নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন বোধ করছে। এই সঙ্গে আর একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছে। যে সব ছেলেকে ওরা দলে টানছে তাদের কোনও কাজ না দিয়ে কতদিন আর চুপচাপ বসিয়ে রাখা যায়। মার্কসবাদের ব্যাখ্যা বা গেরিলাযুদ্ধের প্রকরণ শোনার মতো মানসিক ধৈর্য এদের নেই। জোর করে বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। শুধু ডুয়ার্স কেন, সারা পশ্চিমবাংলায় পার্টিতে এই ধরনের হুলিগান ঢুকছে। নেতাদের বক্তব্য, ভাঙচুর পাথরের টুকরো গড়াতে গড়াতেই মসৃণ হয়। কিন্তু এদের সামলে রাখা যে খুব মুশকিল তা অনিমেষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

কিন্তু যে জিনিসটা অনিমেষকে ভীষণ বিচলিত করছিল তা হল বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট দল গঠন করার মধ্যেই তাদের সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এখন অবধি কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। দেশে বিপ্লব দরকার, কেন দরকার কীভাবে সেটা সম্ভব এইসব কথা যাদের

BanglaBook.org

বোঝাত হবে তাদের কাছে এখনও পৌঁছানো যায়নি। যায়নি তার একটা বড় কারণ যে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সরাসরি প্রচার করতে গেলে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বাধা দেবে। তা ছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় তা সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করবে না। এবং এই সরকার তো তাদের চেনাশোনা মানুষই চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়ার ব্যাপারে খুব একটা মানসিক জোর পাবে বলে মনে হয় না। লোকাল কমিটির বক্তব্য, স্রোত যদি জোরদার হয় তা হলে জল নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এখনই তাড়াহুড়ো করে বোকামি না করে উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। বিপ্লব হলে সাধারণ মানুষ নিজের স্বার্থেই পথে নামবে। হয়তো ঠিক, তবু অনিমেষের অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না।

জুলিয়েনের ওপর সমস্ত ভার দিয়ে অনিমেষ ট্রেনে চাপল। রিজার্ভড বার্থ কিংবা সিট নয়, বারোয়ারি কামরায় উঠল সবার নজর এড়াবার জন্যেই। শিলিগুড়ি থেকে অনেকেই যাচ্ছে বোলপুরে। যতটা সম্ভব পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কারণ বোলপুরের মিটিং অত্যন্ত গোপনে হচ্ছে। প্রথমে বসার জায়গা পায়নি অনিমেষ। শেষে একটা বাঙ্কের ওপরে বাবু হয়ে বসতে পারল একসময়। এবং এই ট্রেনের দুলুনিতে হঠাৎ মনে হল খুব ক্লান্ত লাগছে। এই দিনগুলোয় নিশ্বাস ফেলার সময় পায়নি। কিন্তু যত দ্রুত ভাল কাজ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছিল ঠিক ততটা কি হয়েছে? এতদিন এখানে রইল অথচ সে স্বর্গছেঁড়া বা জলপাইগুড়ির বাড়িতে যায়নি। প্রথম দিকে এড়িয়ে ছিল, শেষের দিকে সত্যি আর সময় হয়নি। অনিমেষ খবর পেয়েছে, মহীতোষ জেনে গেছেন সে উত্তরবাংলায় আছে। পরিচিতজনেরা নিশ্চয়ই খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। স্বর্গছেঁড়া ছাড়া সব জায়গাতেই সে প্রকাশ্যে ঘুরেছে অতএব তাকে দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। খবরটা ওঁকে বিহ্বল করে দেবে। নিশ্চয়ই ভেবে কোনও কিনারা করে উঠতে পারবেন না। যারা খবর দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কথাও জানিয়েছে। বাবার জন্যে অনিমেষের খারাপ লাগছিল। বাঁধা লাইনে তাকে ঘিরে যে আশা উনি করেছিলেন সেটা পূর্ণ করা সম্ভব হল না। কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওঁর! অনিমেষ এ নিয়ে ভেবেছে। প্রথমে নিশ্চয়ই খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, তারপর একসময় নির্লিপ্ত হয়ে কোনও সম্পর্ক না রাখার জন্যে ছোটমাকে হুকুম করবেন। হয়তো জ্যাঠামশাইকে দাদু যেভাবে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন সেইভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। অনিমেষ জানে সে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে বললে তা মহীতোষের কাছে আরও দুঃখজনক হবে। বরং তার নিজের কথা লিখে সে বাবাকে একটা চিঠি দেবে। পাশাপাশি সরিৎশেখরের মুখ মনে পড়লে অনিমেষের কিন্তু অস্বস্তি হয় না। সে যে সব ছেড়েছুড়ে সক্রিয় রাজনীতির অনিশ্চয়তায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই খবর মোটেই সরিৎশেখরকে চিন্তিত করবে না। একটা মানুষ দীর্ঘজীবন যাপন করে শেষ পর্যন্ত কী লাভ করে তা সরিৎশেখরের চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

অনিমেষ এই রাতের ট্রেনে একা একা যেতে যেতে শুধু একজনের জন্যে অস্বস্তি অনুভব করছিল। মাধবীলতা তাকে ভালবাসে এবং তার মূল্য দিতে একটুও পিছপা নয়। অথচ অনিমেষ যে রাজনীতি করে তার ছায়ায় সে পা রাখছে না। অনিমেষের সঙ্গে জড়িয়েও সে আড়ালে আড়ালে থাকছে। একটি মানুষকে নিঃশর্তে ভালবেসে মাধবীলতারা সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে। তার কাজকর্মের সঙ্গে নিজের মানসিক সংযোগ না থাকলেও তা নিয়ে বিরক্ত করে না। কিন্তু উত্তরবাংলায় দিনরাত এই অনিশ্চিত উত্তেজনায় কাটিয়ে আজ অনিমেষের মনে হচ্ছিল মাধবীলতাকে মুক্তি দেওয়া দরকার। এ ভাবে সে যদি তার জন্যে অপেক্ষা করে তা হলে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয়। একজন আমার মুখ চেয়ে রয়েছে অথচ আমি তার জন্যে কিছুই করতে পারছি না এই বোধ তাকে কিছুতেই শান্তি দিচ্ছিল না। মাধবীলতাকে কখনও বিয়ে করতে পারবে কিনা তা সে জানে না। শুধু মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ? অনিমেষ জানে, ভাল করে বুঝিয়ে বললেও মাধবীলতার কোনও পরিবর্তন হবে না। ও সেই দলের মেয়ে নয় যারা প্রেমিক অক্ষম বুঝলেই সুড়সুড় করে বাবার আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে করে সংসারী হবে। মুশকিলটা এখানেই। তবুও, অনিমেষ মনে মনে ঠিক করল, এ বার সে সরাসরি মাধবীলতাকে নিষেধ করবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে। প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে। অন্তত ওই নরম মনের মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্যে তাকে রূঢ় ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া তার নিজেরও মুক্তি নেই।

রামপুরহাট ছাড়তেই ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় বাড়ল। পৌষমেলার জন্যে সবাই বোলপুরে যাচ্ছে। আগে কখনও বোলপুরে সে যায়নি। পৌষমেলার কথা কাগজেই পড়েছে। বোলপুর স্টেশনের চেহারা দেখে ওর মনে হল এখানে সভা করে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। এত মানুষের ভিড়ে পুলিশের

BanglaBook.org

পক্ষে সন্দেহ করার কোনও কারণ থাকবে না। মেলার মানুষের জঙ্গলে তারা স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারবে। শিলিগুড়ির খবর অনুযায়ী রাত দশটায় বোলপুর ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গোয়ালপাড়া বলে একটা গ্রামে তাকে যেতে হবে। সেখানে গ্রামের ভাটিখানার পাশ দিয়ে নদীর দিকে একটু এগোলে বাঁ হাতের চার নম্বর বাড়িটা আলোচনার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোনও কারণে স্থানের পরিবর্তন হলে বোলপুর কোঅপারেটিভ স্টোর্সের সামনে বিকেল পাঁচটায় এলেই জানা যাবে। সবাইকে জানানো হয়েছে যে তারা যেন বোলপুরে পৌষমেলা দেখতে যাচ্ছে এমন প্রকাশ পায়। অনিমেষ এ ব্যাপারে অবশ্য খুবই আশ্বস্ত। শান্তিনিকেতন দেখার এমন সুযোগ পাওয়া গেল সেটা উপরি লাভ। তার ওপর সঙ্গে মাধবীলতা থাকায় তাদের তো ভ্রমণবিলাসী বলেই মনে হবে। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত হতে গিয়েই অস্বস্তিতে পড়ল অনিমেষ। আবার সে লতাকে বর্মের মতো ব্যবহার করছে। না, এই শেষ, মাধবীলতা যদি বর্ধমানে আসে তা হলে তো আর সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। বোলপুরে মিটিং শেষ হলে যে সময় হাতে থাকবে তখন সে মাধবীলতাকে বোঝাবে, পরিষ্কার হয়ে নেবে।

বর্ধমানে ট্রেনটা থামতেই বুকের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ এরকম উত্তেজনা তার সমস্ত শরীর মনকে আক্রমণ করবে একটু আগেও সে টের পায়নি। মাধবীলতাকে দেখতে পাবে শুধু এই কারণেই তার অবচেতন মন এত অধীর ছিল? এই তো সেদিন সে কলকাতা ছেড়ে গেল! তবে? অনিমেষ নিজেকে সংযত করল। ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াবার পরও কিছুক্ষণ বসে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে দুপাশে তাকাল। প্রচুর মানুষ বিপরীত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে সবাই পৌষমেলার যাত্রী। স্পেশাল ট্রেন না দিলে কোনও ট্রেনেই এত লোকের জায়গা হবে না। অনিমেষ কুলিদের সামলে এগোল। মাধবীলতাকে চোখে পড়ছে না। আর একটু খোঁজাখুঁজির পর অনিমেষ আবিষ্কার করল তার শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। মাধবীলতা কি আজকের তারিখটার কথা ভুলে গেছে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। তন্ন তন্ন করে প্লাটফর্মটা খুঁজে সে ওভারব্রিজের নীচে এসে দাঁড়াল। মাধবীলতার কিছু হয়েছে! হয়তো খুব অসুস্থ হয়ে শুয়ে রয়েছে হোস্টেলে। এও তো হতে পারে, ওর বাবা জোর করে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। কিংবা যদি মাধবীলতা এতদিনে তার ভুলটা বুঝতে পেরে থাকে। কথাটা ভাবতেই অনিমেষের বুকের ভেতরটায় দাউ দাউ চিতা জ্বলে উঠল। কোনও চিন্তা আর মাথায় সুস্থভাবে আসছে না। শুধু মনে হল এই ট্রেনটায় তার কলকাতায় চলে যাওয়া উচিত। সরাসরি হোস্টেলে পৌঁছে মাধবীলতার খোঁজ না করলে সে শান্তি পাবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে সে শূন্য চোখে ওপরে তাকাতেই নড়ে উঠল। প্রথমে কী দেখেছে তা বুঝতেই কয়েক পলক গেল। তারপর চোখের সামনে কয়েক লক্ষ পদ্ম ভোরের রোদ পেয়ে ঝকমকিয়ে উঠল। যেন বুকের চিতায় কেউ নরম হাত রাখল। অনিমেষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সেই উজ্জ্বল হাসিতে মাখামাখি মুখটাকে নীচে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। সামান্য সময়, তারপরেই মাধবীলতা ওভারব্রিজটা প্রায় দৌড়ে পার হয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিল। অনিমেষের মনে হল একটা ঝরনা যেন উদ্দাম বেগে তার দিকে ছুটে আসছে।

অনিমেষ একটুও নড়ল না। মাধবীলতাকে দেখে ওর যে শান্তি বুকে ছড়াচ্ছিল তা ক্রমশ অভিমানের ছায়ায় যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ও তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছে কিন্তু অযথা এই উদ্বেগে রেখে মজা পাচ্ছিল। সামনে এসে দাঁড়াল মাধবীলতা, 'ওমা, তোমার চেহারা কী হয়েছে? আয়নায় মুখ দেখেছ?'

'তাই এতক্ষণ চিনতে পারোনি?' অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল।

'পারিনি তো! ঢ্যাঙা, রোগা আর কী কালো হয়ে গেছ।' মাধবীলতার মুখ সত্যি সিরিয়াস, 'খুব অত্যাচার করেছ বুঝতে পারছি। খাওয়া-দাওয়া করতে না?'

'ওখানে তো কোনও শরৎচন্দ্রের নায়িকা ছিল না যে আমাকে পিঁড়ি পেতে খাওয়াতে খাওয়াতে হাওয়া করবে!' অনিমেষ মুখ ঘোরাল।

'খুব কথা শিখেছ। একটু আগে যখন দেখতে পেলাম তখন সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে না দেখতে পেয়ে তুমি না কেমন বোকা বোকা মুখ করে তাকাচ্ছিলে।' মাধবীলতা ঠোঁট টিপে হাসল।

'খুব আনন্দ লাগছিল তাই দেখে?'

অনিমেষের গলার স্বরে এমন একটা পাঁচিল ছিল যে মাধবীলতার হাসি চট করে নিভে গেল।

BanglaBook.org

সে চট করে অনিমেষের হাত ধরল, 'এই, রাগ করেছ আমার ওপরে? আসলে আমারই ভুল। এখানে এত ভিড় যে ভাবলাম দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তার চেয়ে ওভারব্রিজের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালে তোমাকে আমি ঠিক দেখতে পাব। তা করতে গিয়ে তোমাকে যেই দেখতে পেলাম বুকের ভেতরটা এমন করতে লাগল যে—। আসলে তোমাকে লুকিয়ে তোমায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগছিল। এই, রাগ কোরো না, প্লিজ!'

অনিমেষ দেখল এই পদ্মের মতো মুখ উদগ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গম্ভীর অনিমেষ নিজের অজান্তেই হেসে ফেলল। না, এ মেয়ের ওপর সে কখনওই রাগ করতে পারবে না।

স্পেশাল ট্রেনটা ছেড়ে দিতে হল। এত ভিড় যে ঝুলে যাওয়ারও উপায় নেই। পরের ট্রেনটা প্রায় ঘণ্টা আড়াই পরে। এতক্ষণ এখানে চুপচাপ বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ওরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। অনিমেষ আড়চোখে মাধবীলতাকে দেখছিল। তাকে যাই বলুক মাধবীলতা নিজেও কিন্তু বেশ রোগা হয়েছে। তবে এবার ওকে খুব প্রাণবন্ত লাগছে। উচ্ছ্বাস একটু বেশি। অনিমেষকে দেখে ওর খুশি হওয়ার ব্যাপারটা আর চেপে রাখছে না। বাসস্ট্যান্ড অবধি ওরা হেঁটে এল। আসতে আসতে অনিমেষ জানতে পারল মাধবীলতার বাবা একদিন হোস্টেলে এসেছিলেন। মেয়েকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি চান মাধবীলতা সুখী হোক। এই ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হলে ওরা স্বচ্ছন্দে সারাজীবন আমেরিকায় থাকতে পারে। ছেলেটি সেখানেই সেটলড। মাধবীলতা তার বাবার কথা মন দিয়ে শুনে বলেছে সেটা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক তিতিবিরক্ত হয়ে ফিরে গেছেন। এবং যাওয়ার আগে অনিমেষের নাম জেনে গেছেন; মাধবীলতাই বলেছে। মেয়ে যে এমন মারাত্মক ভুল করছে তা তিনি বিশ্বাস করতেই পারছেন না। নিশ্চয়ই হোস্টেলে গিয়ে অনিমেষ সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন এবং কে জানে স্বর্গছেঁড়ায় অভিযোগ জানিয়ে চিঠিও দিতে পারেন। এ সব বলে মাধবীলতা হাসল, 'তোমাকে বোধহয় আমি খামোকা ঝামেলায় ফেললাম।'

'কী রকম?'

'এবার বাবা-মায়ের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'সে দায় বোধহয় আর নেই। কিন্তু তুমি কী ঠিক করছ?'

'মানে?'

'তোমার বাবা একটুও অসঙ্গত কথা বলেননি।'

'বুঝতে পারছি না।'

'তোমার এ সব পাগলামি না করে অন্য কোথাও বিয়ে করে সংসারী হওয়া উচিত। আমার কথা ছেড়ে দাও। এইসব করতে করতে কখন কী হবে কেউ বলতে পারে না। আমার জন্যে তুমি বসে থাকবে কেন?' এ সব কথা বলার জন্যে অনিমেষের মানসিক প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বলতে হবে ভাবতে পারেনি। সুযোগ এসেছে যখন—অনিমেষের কথাগুলো বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মাধবীলতাকে বাঁচাতে এগুলো বলতেই হবে।

'বেশ, আমি তা হলে এখান থেকেই কলকাতায় ফিরে যাই।' মাধবীলতার চোখের দৃষ্টি পালটে গেল। মুখ গম্ভীর এবং ঠোঁটের কোনায় ভাঁজ পড়ল।

'এখান থেকে ফেরার দরকার নেই। বোলপুরে চলো। সত্যি বলছি, এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার দরকার। যত দিন যাচ্ছে আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।' শেষ কথাটা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল অনিমেষ।

মাধবীলতা তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদৃষ্টে সে অনিমেষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী হয়েছে?'

'কেন?'

'এরকম উন্মাদের মতো কথা বলছ!'

'উন্মাদ?'

'তুমি কি আমাকে একটুও চিনতে পারোনি?'

মাধবীলতার মুখ দেখে অনিমেষের মনে হল এ বিষয়ে আর একটা কথা বলা মানে রাস্তার মধ্যেই একটি দৃশ্য তৈরি করা। তা ছাড়া ওই মেঘ জড়ানো মুখের দিকে সে আর তাকাতেও পারছিল না। বলল, 'বড্ড খিদে লেগেছে। ট্রেনে কিছুই খাওয়া হয়নি। চলো কিছু খাই।'

BanglaBook.org

মাধবীলতা কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে ভাবল। তারপর অন্যরকম গলায় বলল, 'এরকম কথা আর কখনও বোলো না। আমি আলু বেগুন ময়দা নই।'

কথাগুলো যেন মাধবীলতাকে কাঠিন্যের পরদায় ঢেকে দিল। স্টেশনে দেখা সেই উজ্জ্বল মেয়েটা যেন চট করে ডুব দিল গভীরে। অনিমেষ আর এ ব্যাপারে কথা বলতে সাহস পেল না। বাসস্ট্যান্ডেও প্রচুর ভিড়। ছাদে লোক বসেছে। ডাবল ভাড়ায় ট্যাক্সি ছুটছে! সেদিকে তাকিয়ে মাধবীলতা বলল, 'এদিকে এসো।'

মাধবীলতা উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে যেতেই অনিমেষ অনুসরণ করল। পাশের একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে একগাদা খাবারের হুকুম দিল মাধবীলতা। আগে হলে প্রতিবাদ করত অনিমেষ, কিন্তু এখন চুপচাপ খেয়ে নিল। মাধবীলতা নিজে একটা সিঙাড়া আর চা ছাড়া কিছু নিল না।

মেয়েরা চিরকালই ছেলেদের খাইয়ে একধরনের সুখ পায়। ব্যাপারটা শরৎচন্দ্র-মার্কা সুখ বলে ঠাট্টা করত অনিমেষ। কিন্তু এই মুহূর্তে এ-সব কথা বলতে বাধল তার। এখন মাধবীলতার মুখের দিকে তাকালে একটা ঠাণ্ডা স্রোতের স্পর্শ পাচ্ছিল সে। এ মেয়েকে কী করে বোঝানো যায়, বোঝাতে গেলে নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয়। অথচ অনিমেষ বুঝতে পারছে, বুঝলে মাধবীলতার উপকার হত।

কোনওরকমে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সিতে জায়গা পেয়ে গেল ওরা। ড্রাইভারের পাশে চারজনকে বসিয়েছে। অস্বস্তিতে দম বন্ধ হবার জোগাড় কিন্তু কোনও উপায় নেই। পুরো ট্যাক্সিতে এগারোজন লোক। ভাড়া ডবল। মাধবকীলতা জানলার পাশে বসলেও তার শরীরের চাপ অনিমেষের ওপর। নিজেকে পাশের লোকের ওপর প্রায় চাপিয়ে দিয়েও অনিমেষ ওকে স্বচ্ছন্দ রাখতে পারছে না। মাধবীলতার শরীরের স্পর্শ অনিমেষকে বিব্রত করছিল। বিব্রত মাধবীলতাও। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ট্যাক্সিটা বর্ধমান ছাড়িয়ে বীরভূমে ঢুকল। মাধবীলতা নিচু গলায় বলল, 'তোমার মাথায় কোনও বুদ্ধি নেই।'

'সে তো জানা কথাই, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল কেন?'

'আমি যদি সরাসরি বোলপুরে গিয়ে নামতাম আর তুমি যদি এতদূর এগিয়ে না আসতে তা হলে এত ঝামেলা পোয়াতে হত না।'

'সাবধানের মার নেই বলে একটা কথা আছে।'

'তোমার আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। পুলিশ যেন তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে!' মাধবীলতা ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল। ট্যাক্সির ভেতর খুব গুলতানি চলছে। সহযাত্রীরা সব কলকাতা থেকে আসছে। ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে অনিমেষের খেয়াল হল আজ রাত্রে কোথায় থাকবে তাই ঠিক হয়নি। সারারাত মাধবীলতাকে নিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এদিকে যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে কোনও হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কথাটা মাথায় ঢোকামাত্র অনিমেষের অস্বস্তি শুরু হল। একা থাকলে সব কিছু ম্যানেজ করা যায় কিন্তু একজন মহিলাকে নিয়ে তো তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আর একটা সমস্যার কথা তার খেয়ালে আসেনি। হোটেলে যদি একটা ঘর পাওয়াও যায় তা হলে মাধবীলতার সঙ্গে এক ঘরে রাত্রে থাকাটা কী ভাবে সম্ভব? না, তার ব্যক্তিগত সঙ্কোচ নেই, নিজের ওপর আস্থা আছে তার। কিন্তু মাধবীলতা নিজে কী ভাবে নেবে ব্যাপারটা? ওরকম গভীর মনের মেয়ে এই ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে কি পারবে! হঠাৎ ওর মনে হল মাধবীলতাকে এখানে আসতে বলেই সে ভুল করেছে। আগে থেকে ভেবে কোনও কাজ করছে না বলেই শেষমেষ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে সে।

বোলপুরে মাটিতে নামতেই মেলার গন্ধ পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রী আজ নাকি ভাষণটাষণ দিয়ে গেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের তৎপরতা এখন বেশ হবে। আর মাধবীলতা বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ রাখছিল। রোদের তেমন তেজ নেই এখন। কিন্তু এই মুহূর্তে ভাল করে স্নান সেরে খেতে ইচ্ছে করছে। মাধবীলতা বলল, 'মেলা তো রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন তো কোথাও গিয়ে উঠতে হবে। চলো দেখি।'

'হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে?'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো পাওয়া যাবে না।'

অনিমেষ একটা রিকশাওয়ালাকে ডাকল। লোকটি খুব তৎপরতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় বাবু? ট্যুরিস্ট লজ?'

অনিমেষ বলল, 'ট্যুরিস্ট লজে জায়গা পাওয়া যাবে?'

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ হাঁ হয়ে গেল, 'আপনারা জায়গা বুক করেন নাই?'

'না। হঠাৎই এসে পড়লাম তাই।'

'এখানে বাবু মাছি ঢোকার জায়গা নেই কোথাও। ট্যুরিস্ট লজ, হোটেল, বোর্ডিং সবখানে লাইন দিয়ে লোক বসে আছে। কোনও চান্স নেই।'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাল। অবস্থা খুব খারাপ। মাধবীলতা একটু এগিয়ে এল, 'আচ্ছা ভাই, এসেছি যখন তখন কোথাও থাকতে হবে তো। তুমি এখানকার লোক, একটা জায়গার কথা বলো না!'

রিকশাওয়ালার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'না দিদি, ভদ্দরলোকের থাকার জায়গা নাই। সারা বছর সব ফাঁকা পড়ে থাকে কিন্তু পৌষমেলার সময় যেন হাভাতের ভিড়ে পড়ে যায়।'

অনিমেষ বলল, 'একটা রাত তো, যেমন হোক একটা জায়গা পেলেই হয়ে যাবে। সারাক্ষণ তো মেলাতেই ঘুরব আমরা। একটু দ্যাখো না।'

লোকটি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'উঠে আসেন, দেখি কী করা যায়।'

স্বস্তিতে বসতে পেরে আরাম লাগল। হিমমাখা হাওয়ায় রিকশা সাঁতারে যাচ্ছে যেন। অনিমেষ বলল, 'দ্যাখো কপালে কী আছে!'

মাধবীলতা হাসল, 'আমি যখন সঙ্গে আছি তখন বিফল হবে না।'

বোলপুর ডিঙিয়ে শান্তিনিকেতনকে পাশ রেখে রিকশাওয়ালা শ্রীনিকেতনের রাস্তায় চলে এল। প্রায় মিনিট দশেক ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর ডান দিকে একটা মাটির রাস্তায় ঢুকে পড়ল সে। অনিমেষ দেখল সুন্দর সুন্দর বাড়ি হয়েছে এদিকে। মেলায় ভিড়-ভাট্টার ছোঁয়া খুব একটা লাগেনি এখানে। শুধু ট্যুরিস্টরা বড় রাস্তা দিয়ে শ্রীনিকেতনে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা ওদের বসে থাকতে বলে একটা বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। অনিমেষ দেখল বাড়িটার সদর দরজা জানলা বন্ধ। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় যে এখানে লোকজন থাকে না। খানিক বাদে একটি দারোয়ান গোছের লোককে সঙ্গে নিয়ে রিকশাওয়ালা ফিরে এল। এসে এক গাল হাসল, 'আপনারা তো একটা রাতই থাকবেন?'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

রিকশাওয়ালা বলল, 'নেমে আসেন। সব কথা হয়ে গেছে। এ হল এ বাড়ির মালি। বাড়ির বাবু বোম্বেতে থাকেন। এবার আসবেন না তারা। আপনাদের একটা ঘর খুলে দিচ্ছে, আরাম করে থাকুন।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে?'

'তিরিশ টাকা। এত শস্তায় আরামের জায়গা আর কোথাও পাবেন না বাবু। তবে একটা কথা, জানলা খুলতে পারবেন না।'

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'মানে সবাই জানে এখানে কেউ থাকে না। জানলা খুললে পাশের বাড়ির লোক টের পেয়ে গেলে মালিকের কানে যাবে। মানে, একটু গোপনে গোপনে থাকতে হবে বাবু। একটা রাত, শীতকাল, কোনও অসুবিধা হবে না।'

'তোমায় কত দিতে হবে?'

'সে যা হয় দেন। আপনাদের যা মন চায়।'

অনিমেষ দুটো টাকা দিতে গিয়ে কী ভেবে তিন টাকা দিল। মুখ দেখে মনে হল লোকটা আরও বেশি আশা করেছিল। এতক্ষণ মালি কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ ওদের দেখছিল। অনিমেষরা রিকশা থেকে নামতেই বাড়ির ভেতর ফিরে চলল সে। রিকশাওয়ালা ফিরে যেতেই অনিমেষরা বাড়ির ভেতর ঢুকল। সামনে বাগান আছে কিন্তু ভাল করে যত্ন নেওয়া হয় না বোঝা যাচ্ছে। সদর দরজা নয়, পাশের খিড়কি দরজা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় বাড়ি, ভেতরে বাঁধানো চাতাল। চাতালের ওপাশে ঠাকুর চাকরের ঘর আর এদিকে ভেতরে যাওয়ার দরজা। মালি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা দরজা খুলে প্রথম কথা বলল, 'এই ঘরে থাকবেন।'

অনিমেষ দেখল ঘরটা বেশ সুন্দর। বেশ বড় খাট বিছানা চেয়ার সাজানো আছে। ওরা বসা মাত্র লোকটি বলল, 'শুনলেনই তো, জানলা খুলবেন না। আর আমি ছাড়া কেউ ডাকলে সাড়া দেবেন না।'

BanglaBook.org

অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু স্নান করব কোথায় ?'

'ওপাশে বাথরুমে আছে।' লোকটি একটু এগিয়ে অ্যাটাচ্‌ড বাথ দেখিয়ে দিল। মাধবীলতা বলল, 'যাঁর বাড়ি তিনি আসেন না।'

'আসেন। তবে এবার আসবেন না। কিন্তু কেউ যদি তাঁর হয়ে আসেন তা হলে চুপচাপ আপনাদের চলে যেতে হবে।'

'সে কী!' আঁতকে উঠল অনিমেষ।

'দ্যাখেন, ভেবে দ্যাখেন।'

মাধবীলতা বলল, 'আর ভাবতে পারছি না। কেউ এলে আমরা চলে যাব।'

'ভাল কথা। আপনারা খেয়ে এসেছেন ?'

'না। এদিকে হোটেল আছে ?'

'আছে। তবে আমি এনে দিচ্ছি।'

'না না। আমরা গিয়ে খেয়ে আসব।'

'সেটা ঠিক হবে না। বারবার যাওয়া-আসা করলে লোকে দেখবে। একবারে বেরিয়ে গিয়ে রাতে ফিরবেন। টাকা দিন।'

মাধবীলতা ব্যাগ খুলে দশ টাকা বের করে দিতে লোকটি বলল, 'ভাড়াটা'। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ওটাও এখনই দিতে হবে ?'

'হ্যাঁ বাবু। দিতেই তো হবে, আগে আর পরে।'

লোকটি টাকা নিয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল এই বড় বাড়িটার বন্ধ ঘরে সে আর মাধবীলতা ছাড়া আর কেউ নেই। সঙ্কোচ কাটাতে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেমন বন্দি বন্দি লাগছে নিজেকে, না ?'

মাধবীলতা তখন হাতের ঘড়ি খুলে টেবিলে রাখছিল। এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কার বাড়িতে কারা এল! লোকটা বোধহয় মাঝে মাঝেই ঘরটা ভাড়া দেয়।'

'কী করে বুঝলে ?' অনিমেষ এগিয়ে এল।

মাধবীলতা আঙুল দিয়ে একটা লেডিস রুমাল দেখিয়ে দিল। কোচকানো রুমালটা টেবিলের কোণে পড়ে আছে। মালিটার চোখ এড়াল কী করে ?

অনিমেষ মাধবীলতার কাঁধে হাত রাখতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। তারপর বলল, 'খুব খিদে পেয়ে গেছে। আমি স্নান করে আসি।' কথা শেষ করেই সে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল।

রাত জেগে ট্রেনে আসা, দেরিতে স্নান খাওয়ার জন্যে অনিমেষের আলসেমি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু মাধবীলতার পীড়াপীড়িতে ওকে উঠতে হল। বাইরে মিষ্টি রোদের আলপনা, এখন ঘরে বসে থাকার নাকি কোনও মানে হয় না। অথচ অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল এই ঘরে মাধবীলতার মুখোমুখি বসে গল্প করতে। এরকম নির্জনে থাকার সুযোগ ওদের আগে কখনও হয়নি। বেশ সংসারী সংসারী লাগছে। কিন্তু মাধবীলতার বাইরে যাওয়ার জন্যে যে ছটফটানি তার একটা কারণ ওর চোখ এড়াচ্ছিল না। ব্যাপারটা খুব অস্বস্তির। বিশেষ করে মাধবীলতার মতো মেয়ে, যে এক কথায় নিজের বাড়ি ছেড়ে তার জন্যে হোস্টেলে এসে উঠেছে, সে এই নির্জন ঘরে তার সঙ্গে থাকতে যেন ভয় পাচ্ছে। ব্যাপারটা মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। অনিমেষের মনে হল, যত শক্ত হোক, মেয়েরা কোনও কোনও জায়গায় এক। আগাম কিছু চিন্তা করে দুর্ভাবনায় ভোগে অথচ সেটা আটেই মুখে প্রকাশ করবে না।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে অনিমেষের মনে হল আজকের দুপুরটা সত্যিই চমৎকার। পৌষমেলায় এখানে বোধহয় প্রতি বাড়িতে অতিথি আসে। বাড়িগুলোর সামনের লনে কিংবা বাগানে রোদ পোয়ানোর ভিড় দেখলেই তা বোঝা যায়। বেশ উৎসবের মেজাজ এখন শান্তিনিকেতনে। শ্রীনিকেতন থেকে যে রাস্তাটা সোজা শান্তিনিকেতনের ভেতরে চলে গেছে ওরা সেই পথ ধরল। বেশ ভিড় এখানেই। পাশাপাশি হাঁটতে মাধবীলতা বলল, 'দারুণ!'

'কী দারুণ ?'

'জায়গাটা।'

'তাই বলো।'

'কেন, তুমি কী ভেবেছিলে ?'

BanglaBook.org

'আমি তো অনেকরকম ভেবে থাকি। সেগুলো তো আর সত্যি হয় না।'

'যেমন?'

'ধরো, আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি যেমন করে বাইরে আসার জন্যে ছটফট করছিলে তাতে নিজেকে রাক্ষস-টাক্কস মনে হচ্ছিল।' অনিমেষ খুব লঘু গলায় বলল।

মাধবীলতা চট করে অনিমেষের মুখ দেখে নিল। হলুদ শাড়ি আর ফরসা গালে এমন একটা শ্রীমাখানো ওর চেহারায় যে অনিমেষ সেই দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর চোখ ফেরাতে পারল না। মাধবীলতা মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তুমি কিস্যু বোঝো না।'

'বুঝি না?'

'না। আমরা যদি সারা দুপুর ঘরে বসে থাকতাম তা হলে দারোয়ানটা যা অনুমান করেছিল তা সত্যি বলে ভাবত। আমরা যে এখানে বেড়াতে এসেছি, ঘরে বসে থাকতে নয়, এটা ওকে বোঝানো দরকার ছিল।'

'যাচ্চলে! ও যে আমাদের সম্পর্কে এত ভাবছে তা তুমি জানলে কী করে?'

'আমরা যখন রিকশা ছেড়ে দিলাম তখন থেকে লোকটা আমার মাথার দিকে তাকাচ্ছিল। যে কেউ বুঝতে পারবে আমি বিবাহিতা নই।'

'সিঁদুরের কথা বলছ? আমরা তো খ্রিস্টানও হতে পারি।'

'বাজে বোকো না। বিবাহিতা মেয়েদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

অনিমেষ চমকে মাধবীলতাকে দেখল। ও মাথা নিচু করে হাঁটছে। তর্ক করতে পারত অনিমেষ। শুধু দারোয়ানের জন্যেই ঘর ছাড়া হতে হল এটা সে মানতে পারছে না। কিন্তু মেয়েরা কখনও কখনও সত্যি কথাটা আড়াল করতে একটা কিছু বাহানার ঘোমটা টানে. জেনে শুনে সেটা নিয়ে টানাটানি করে কী লাভ?

সারাটা দুপুর ওরা শান্তি নিকেতন দেখল। আজ খুব ভিড়। বেশির ভাগ ঘরবাড়ির দরজা বন্ধ। কিন্তু ছড়িয়ে থাকা ভাস্কর্যগুলো, মাঠঘাট, ছাতিমতলা, শ্যামলী অথবা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-সংগ্রহশালা দেখতে দেখতে সময়টা কখন ফুরিয়ে গেল। মাধবীলতা বলছিল, 'রবীন্দ্রনাথ এখানে ছিলেন আর তাঁর চারপাশে সেইসব বিখ্যাত মানুষ ঘিরে আছেন—কথাটা ভাবলেই কেমন শিহরণ লাগে।'

অনিমেষ বলল, 'ধরো, এই পথ দিয়ে নন্দলাল হেঁটে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখে রামকিঙ্কর শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে গেছেন। দিনু ঠাকুর, দীনবন্ধু এনড্রুজ, প্রভাত মুখার্জী, জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে একটু এ-দিকে গেলেই দেখা হয়ে যাবে। আর এইসব ছেড়েছুড়ে অপারেশনের জন্যে শেষবার কলকাতায় যাওয়ার আগের ভোরে ছেলেমেয়েরা তাদের গুরুদেবকে গান শোনাচ্ছে বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথের চোখে জল। সেই ভোরটায় তাঁর শান্তি নিকেতন কখনওই শান্তির ছিল না তাঁর কাছে।'

মাধবীলতা বলল, 'আমি এই প্রথম এলাম এখানে। আমাদের জন্যে কেউ এত সুন্দর জায়গা তৈরি করে গিয়েছিলেন, পড়াশুনা শুধু ভালবাসা থাকলে কতটা আন্তরিক হতে পারে — এখানে না এলে বুঝতাম না।'

"অথচ দ্যাখো, ছেলেবেলা থেকে আমরা গল্প শুনতাম এখানকার ছেলেরা নাকি মেয়েলি, এই গরু সরে যা— বলে, অথচ এখানে এসে একজনও তো তেমন চোখে পড়ল না।'

'আমার কিন্তু এখানে এসে একটা লাভ হয়েছে।'

'কী?'

'তোমাকে।'

'মানে!'

'তুমি যতই বিপ্লবের কথা বলো, দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন চাও, আসলে ভেতরে ভেতরে তুমি খুব রোমান্টিক।'

'কী করে বুঝলে?'

'রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে তোমার মুখ চোখ অন্যরকম হয়ে যায়। ঠিক কি না বলো?' দু'চোখে ঝকঝকে হাসি মাধবীলতার।

অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াল। 'যা কিছু সচল তাই তো বিপ্লবের অবলম্বন। জড়পদার্থ কখনও বিপ্লব করতে পারে না। প্রকৃত বিপ্লবী যে সে কিন্তু মনে মনে ভীষণ রোমান্টিক। চে গুয়েভারা কিংবা মাও

BanglaBook.org

সে তুং তো কাঠখোট্টা লোক ছিলেন না। অবশ্য রোমান্টিক যে সেই বিপ্লবী হবে এমন আশা করা যায় না, কিন্তু বিপ্লবী যে, তাকে কিন্তু রোমান্টিক হতেই হবে। রোমান্স মানে জানো তো?' মাধবীলতার দিকে দুষ্টুমিচোখে তাকাল অনিমেষ।

'সুন্দরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং অজানাকে জানতে চাওয়া।'

'বাঃ, গুড। এরকম সুন্দরী মহিলাকে যখন জানতে চেয়েছি তখন অবশ্যই আমাকে রোমান্টিক বলা যায়।'

'আমি মোটেই সুন্দরী নই। আর তোমাদের জানার আগ্রহটা একবার মিটে গেলেই তো প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।'

'সেটা যাকে জানতে যাচ্ছি তার বিশালতার ওপর নির্ভর করে।'

মাধবীলতা ভ্রুকুটি করল। তারপর হাতে রাখা শালটা খুলে শরীরে জড়িয়ে নিল। এখন বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব বাতাসে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সারা দুপুর ধুলো মেখে শরীর বেশ ক্লান্ত। কাছাকাছি কোনও রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ছিল না যে সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যায়। কোঅপারেটিভের সামনের মাঠটা বাসে বাসে ভরতি। সারা বাংলা ছাপমারা বাসগুলো মেলার যাত্রী নামিয়ে এখানে জিরোচ্ছে। অনিমেষরা কোঅপারেটিভের সামনে এসে দাঁড়াতেই আলো জ্বলে উঠল। তেরাস্তার মোড় এটা। কোনও খবর থাকলে এই সময়েই এখানে সেটা পাওয়ার কথা। মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? চলো, মেলায় যাই।'

অনিমেষ বলল, 'মেলা তো সারা রাত ধরে চলবে। একটু জিরিয়ে যাই। পা ব্যথা করছে।'

'বাব্বা, এটুকু হেঁটেই পা ব্যথা। তা হলো চলো কোথাও বসি।'

অনিমেষ এখন এই জায়গা ছেড়ে যেতে রাজি নয়। অথচ সে কথা মাধবীলতাকে বলাও যাচ্ছে না। মাধবীলতা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে, আর মেলায় যাওয়ার কথা তুলল না। অনিমেষ দেখছিল স্রোত বয়ে যাচ্ছে রাস্তায়। এত মানুষের ভিড়, রিকশার আওয়াজ ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। প্রায় মিনিট কুড়ি দাঁড়ানোর পর অনিমেষের মনে হল সব ঠিকঠাকই আছে। না হলে কেউ না কেউ এতক্ষণে এসে যেত। গোয়ালপাড়া এখান থেকে কত দূর কে জানে। মাধবীলতার সামনে খোঁজখবর নিতে বাধছে। আবার এই ব্যাপারটা মাধবীলতাকে লুকিয়ে করতেও সঙ্কোচ হচ্ছে ওর। সে বলল, 'চলো, এবার মেলার দিকে যাওয়া যাক।'

ভিড় বাঁচিয়ে পাশে হাঁটছিল মাধবীলতা। হঠাৎ বলল, 'তোমার কোনও কাজে বাধা দিইনি আমি। বলতেই তো পারতে এখানে দাঁড়ানোটা তোমার একটা কাজের মধ্যে পড়ে।'

অনিমেষ কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। ও দেখল, কথাটা বলার পর তার উত্তর শোনার আগ্রহ মাধবীলতার মুখে নেই। সে চারপাশের বাগান লোকজন আগ্রহ নিয়ে দেখছে। মেলার মাঠ যত এগিয়ে আসছে তত শব্দ বাড়ছে। মাইক বাড়ছে। জমজমাট ভিড় আর অজস্র দোকানের আলো মানুষদের চুম্বকের মতো টানছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা চিন্তা বিদ্যুৎচমকের মতো অনিমেষের মাথায় ঝলছে উঠল। আজ রাত্রে ওদের যে গোপন মিটিং হচ্ছে সেখানে মাধবীলতাকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তা হলে এই সময়টা মাধবীলতা কোথায় থাকবে? মিটিং কতক্ষণ চলবে আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। মাধবীলতা অবশ্য জানে অনিমেষ গোপন মিটিং-এ যোগ দিতে শান্তিনিকেতনে এসেছে। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও আলোচনা করেনি, ঔৎসুক্য দেখায়নি। এই রাত্তিরে একা যুবতী মেয়েকে রেখে যাওয়াটা অত্যন্ত দায়িত্বহীন ব্যাপার হবে অনিমেষ বুঝতে পারছিল। অবশ্য তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাধবীলতাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে বলে সে মিটিং-এ যেতে পারে। একা থাকার ঝুঁকি থাকছে বটে কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মেলায় ঢুকে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধবীলতা। তেষ্টা পেয়েছিল। ওরা দু কাপ চা নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খাচ্ছে এমন সময় খুব চাপা গলায় নিজের নামটা শুনতে পেল অনিমেষ। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে, হাতের কাপের চা চলকে উঠল। অনিমেষ মুখ ঘুরিয়ে দেখল ওর, ঠিক পাশেই একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। আলোয়ানে মোড়া শরীর এবং মাথার ফাঁক দিয়ে শুধু এক গাল দাড়ি আর চোখ দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত; কিন্তু অনিমেষ চিনতে পারল।

অনিমেষ বলল, 'বলো।'

সুবাসদা বলল, 'তোমার এ ভাবে ঘুরে বেড়ানোটা ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন?'

BanglaBook.org

'বোলপুর স্টেশনে আমাদের দু'জন ছেলেকে পুলিশ ধরেছে। মেলা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও।' সুবাসদা যেন নিজের মনেই কথা বলছিল। অনিমেষ আড়চোখে মাধবীলতার দিকে তাকাল। চা খেতে খেতে মাধবীলতা এর মধ্যে একটু সরে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টি অন্য দিকে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে অনিমেষের সঙ্গে সুবাসদার কথাবার্তায় অসুবিধে না হওয়ার জন্যে এইরকম ভঙ্গি করছে।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মিটিং হচ্ছে তো?'

সুবাসদা বলল, 'হ্যাঁ। কারণ যারা ধরা পড়েছে তারা জানত না কোথায় মিটিং হবে। ঠিক সময়ে নির্দেশ পাবে জেনে এসেছিল। মেয়েটি কে?'

'আমার আত্মীয়।' কথাটা আচমকা মুখে এসে গেল অনিমেষের।

'বিশ্বাস করা যায়?'

অনিমেষ নীরবে ঘাড় নাড়ল।

'তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ'। কিন্তু কী ব্যাপার?'

সুবাসদা আলোয়ানের নীচ থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করে অনিমেষের হাতে দিয়ে দিল, 'এটা ওর কাছে রাখতে বলো। সাবধানে।'

'কী আছে এতে?'

'এমন কিছু যা সঙ্গে থাকলে আমার বিপদ হবে। মনে হচ্ছে আমি খুব সেফ নই। তোমরা কোথায় উঠেছ?'

'একটা বাড়িতে।'

'ওকে সেখানে ফিরে যেতে বলো। মিটিং-এর পর আমি গিয়ে জিনিসটা ফেরত নিয়ে নেব। তোমরা আর দাঁড়িয়ো না।' কথাটা শেষ করেই সুবাসদা চোখের পলকে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

মাধবীলতা চায়ের দাম দিয়ে অনিমেষের দিকে ফিরতেই সে খালি কাপটা নামিয়ে রেখে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল। সামান্য ভ্রূকুটি কিন্তু মাধবীলতা ওটাকে নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

অনিমেষ বলল, 'কী আছে জানি না তবে খুব গোপনে রাখতে হবে। তুমি রাখতে পারবে?'

মাধবীলতা বলল, 'না পারলে কী করবে? আমি রাখব জেনেই তো তুমি প্যাকেটটা নিয়েছিলে।'

অনিমেষ বলল, 'আমি তোমাকে জড়াতে চাইনি কিন্তু।'

'ঠিক আছে। কথা বাড়িয়ো না।' মাধবীলতা প্যাকেটটাকে কাপড়ের আড়ালে এমনভাবে চালান করে দিল যে অনিমেষ স্বস্তি পেল। এক মুহূর্ত মেলার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'আমার পক্ষে মেলায় ঘোরা ঠিক হবে না। তুমি কী করবে?'

'আমি একা একা ঘুরতে পারব না। ভাল লাগে একা একা ঘুরতে?'

'তা হলে?'

'তোমার মিটিং কটায়?'

'দেরি আছে।'

'তা হলে চলো বাড়িতে ফিরে যাই।'

'এখন বাড়িতে ফিরে কী করবে?'

'গল্প করব। মুখোমুখি বসে।' মুখ টিপে হাসল মাধবীলতা।

'আমি যখন বেরিয়ে আসব তখন একা থাকতে পারবে?'

'কী আশ্চর্য। ঘরটার তো দরজা জানলা আছে। আর সেটা এই খোলা আকাশের চেয়ে নিশ্চয়ই বেটার, তাই না?'

খারাপ লাগছিল মেলা ছেড়ে যেতে কিন্তু প্যাকেটের ভেতরে কী আছে না জেনে এ ভাবে ঘুরে বেড়ানোর ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। একটা খালি রিকশা দেখতে পেয়ে অনিমেষ ডাকল। মাধবীলতা প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী ভেবে চুপ করে গেল।

বিপরীতমুখী ভিড় ঠেলে ওরা যাচ্ছিল। রিকশায় ওঠার পর যেন ঠাণ্ডাটা আরও বেড়ে গেল। অনিমেষের শীতবস্ত্র এই ঠাণ্ডার পক্ষে মানানসই নয়। উত্তরবাংলায় যা গায়ে দেওয়া যায় তা এখানে বয়ে আনার কথা মনে ছিল না। মাধবীলতার গায়ে চাদর আছে কিন্তু বোধহয় মেয়েদের শীতবোধ একটু কম।

BanglaBook.org

রিকশাটা বড় রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে ওরা কাঁচা পথটা হেঁটে আসছিল। দুপাশের বাড়িগুলোর আলো জানলা দরজা বন্ধ থাকায় বাইরে আসছে না। ওরা গেট সরিয়ে বাগানে ঢুকল। অন্ধকার ঝুপসি হয়ে রয়েছে বিরাট বাড়িটায়। কোনও মানুষ আছে কি না টের পাওয়া যাচ্ছে না। খিড়কি দরজা দিয়ে ওরা চাতালে ঢুকে দেখল একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ওদের শব্দ পেয়ে দারোয়ান মুখ বের করে বলল, 'ও আপনারা। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?'

অনিমেষ বলল, 'রাত্তিরে আবার বের হব তাই একটু বিশ্রাম নিতে এলাম।'

'খাওয়াদাওয়া কোথায় করবেন?'

অনিমেষের খেয়াল হল রাত্তিরে সে একাই বেরুবে। অতএব মাধবীলতার জন্যে খাবার দরকার। সে একটু এগিয়ে আলো জ্বালা ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে ভেতরে উনুন জ্বলছে। লোকটি আটা মাখছিল।

'ভাবছি খেয়েই বের হব। তুমি তো নিজের খাবার বানাচ্ছ। আমাদের জন্যে কয়েকটা রুটি আর তরকারি করে দাও না। দামটা নিয়ে নাও।'

'ডিম খাবেন?'

'ডিমের ঝোল রুটি? বাঃ, খুব ভাল।'

'করে দেব?'

'টাকাটা এখন নেবে?'

'থাক খেয়েই না হয় দেবেন।'

লোকটি ওদের পেছনে পেছনে ঘর অবধি এল। দরজাটা ভেজানো ছিল। অনিমেষ সেটা খুলে দেখল টেবিলে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

দারোয়ান বলল, 'বিজলি আলো জ্বালবেন না বাবু। লোকে টের পাবে।'

একটু বিরক্ত হলেও অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে।'

দরজা ভেজিয়ে লোকটি বিদায় হলে অনিমেষ বলল, 'কেমন চোর চোর লাগছে নিজেকে। এ ভাবে মাথা নিচু করে থাকতে ভাল লাগে না।'

'উপায় না থাকলে কী করা যাবে। লোক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এই শীতে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কথা ভাবো তো!' মাধবীলতা গায়ের চাদর খুলে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে চিন্তা করছিল। তারপর কী ভেবে সেটাকে একটা আলমারির মাথায় রেখে দিল।

'ব্যবস্থা না করে যারা আসে তাদের তো ভুগতেই হবে।' অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখল সেটা কাজ করছে না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভুতুড়ে আলো ম্যাড় ম্যাড় করছে।

মাধবীলতা বলল, 'আমরা কি ব্যবস্থা করে এসেছিলাম?'

'আমাদের সঙ্গে বাচ্চা নেই।'

'নেই!'

বলে হেসে ফেলল মাধবীলতা।

অনিমেষ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'ইয়ার্কি কেন! তোমার মতো বৃদ্ধ রাশভারী মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে পারি?' মাধবীলতা খাটের ওপর গুছিয়ে বসল।

অনিমেষ বলল, 'আমি বৃদ্ধ রাশভারী?'

'তা নয় তো কি? ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটা ছেলে সব সময় গোমড়া মুখ করে থাকবে? যেন পৃথিবীর সব দুশ্চিন্তা তার মাথায়। চমৎকার!'

'কথাটা এই প্রথম কেউ আমাকে বলল।'

'তোমার দুর্ভাগ্য।'

'হঠাৎ এ-কথা মনে হচ্ছে কেন?'

'হঠাৎ নয়। আজ অবধি আমাকে নিয়ে তুমি কোনও সিনেমা দেখতে যাওনি। এই বয়সে ছেলেরা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন নিয়ে আলোচনা করে, সমরেশ বসুর 'বিবর' নিয়ে তর্ক করে, তুমি করো না। তোমার ব্যবহার একটু অ্যাবনরম্যাল না?'

কথাটা অনিমেষের মাথায় কখনও আসেনি। সে মাধবীলতার প্রতিবাদ করল না। হেসে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

BanglaBook.org

'কিছু নয়। এগুলো করছ না বলে আমার অবশ্য বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।' মাধবীলতা হাসবার চেষ্টা করল।

অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসে মাধবীলতার মাথায় হাত রাখল, 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ কেন?'

'ঝগড়া? কই না তো!'

'তা হলে এত কড়া কথা শোনাচ্ছ যে! সবাই তো একরকম হতে পারে না।'

'একরকম হওয়ার কথা আমি বলিনি।'

প্রায় অজান্তেই অনিমেষ মাধবীলতার মাথায় হাত দিয়েছিল। মাধবীলতার মুখ এখন গম্ভীর অথচ ছেলেমানুষির কতগুলো রেখা সে মুখে অদ্ভুত মায়ায় খেলা করছে। অনিমেষ খুব ধীরে ওর চুলে হাত বোলাতে লাগল। মাধবীলতা মুখ নামিয়ে অনিমেষের বাজুতে গাল রাখল। নরম এবং উষ্ণ চাপ অনিমেষকে বিহ্বল করে তুলছিল। সে মুখ ফিরিয়ে মাধবীলতার দিকে তাকাতেই দেখল তার দু'-গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। বিস্মিত অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাঁদছ?'

মাথা নেড়ে না বলল মাধবীলতা কিন্তু চোখের জল মোছার কোনও চেষ্টা করল না। অনিমেষ কিছুক্ষণ ওইভাবে নীরবে বসে থেকে ধরা গলায় বলল, 'লতা এখনও সময় আছে। তুমি ভেবে দ্যাখো।'

মাধবীলতার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। সে মুখ সামান্য তুলে অনিমেষের দিকে তাকাল। অনিমেষ বলল, 'তুমি যাই বলো না কেন আমি তো ক্রমশ অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। জানি না কোনওদিন আমাদের বিয়ে-থা করার সুযোগ আসবে কিনা। কলকাতা শহরে একটি যুবতী মেয়ের পক্ষে কোনও নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি ছাড়া অনন্তকাল অপেক্ষা করার সম্ভব নয়।'

'সেটা আমি বুঝব।' মাধবীলতার গলার স্বর শক্ত।

'না। আমাদের এই সমাজে একটা মেয়ে একলা বিপ্লব করতে পারে না।'

'বললাম তো সমস্যা আমার। আমি তোমার বিপ্লবের ব্যাপারে যখন কথা বলছি না তখন তুমি আমাকে আমারটা ভাবতে দাও।'

'কিন্তু?

'কীসের কিন্তু?'

'আমার জন্যে একটা মেয়ে এ ভাবে অপেক্ষা করছে অথচ তাকে এক ফোঁটা সুখ দেবার ক্ষমতা আমার নেই!'

'সুখের তুমি কী জানো?'

অনিমেষ বলতে চাচ্ছিল কিছু কিন্তু মাধবীলতা খুব দ্রুত তার মুখের হাত চাপা দিল 'কথা বোলো না। আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই সুখ তো সারাজীবন ধরে সমুদ্রের মতো দুলতে পারে না, এক বিন্দুতে মুক্তোর মতো স্থির হয়ে থাকে। আমার কাছে এই মুহূর্তটুকুর চেয়ে দামি আর কিছু নেই।'

অনিমেষ দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরতেই মাধবীলতা মুখ উঁচু করে তাকে চুম্বন করল। মুহূর্তেই সব বাঁধ ভেঙে গেল অনিমেষের। এই মেয়ে যার মুখ হাজার পদ্মের চেয়ে সুন্দর, যার শরীর স্বপ্নের আলোয় উজ্জ্বল তাকে এমন করে কাছে পেয়ে তার সমস্ত বিবেকের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার যেমন ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকে না তেমন ভাবে সে টালমাটাল হল। মাধবীলতার মতো মেয়ে যে কিনা প্রতিটি কথা ওজন দিয়ে বলে, অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায় না, নিজেকে যন্ত্রণা দিয়েও মুখ খুলে কষ্টের কথা বলে না, সে অনিমেষকে আঁকড়ে ধরল লতার মতো আন্তরিকতায়। যেমন করে প্রথম বৃষ্টি পতনের সময় মাটি সোঁদা গন্ধ ছড়ায়, যেমন করে রোদ্দুরে পুজোর গন্ধ এলে কাশগাছ সাদা ফুলে মুড়ে যায় ঠিক তেমনি করে সে নিজেকে খুলে ধরল। ঝড়ের মতন সে সমস্ত কৃপণতা ছেড়ে অনিমেষকে গ্রহণ করল আকণ্ঠ এবং আশরীর।

ঝড় থেমে গেলে চারধার কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ভেঙে যাওয়া প্রকৃতির ছড়ানো ছিটানো চেহারায় এমন একটা রিক্ততা থাকে যা বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। মাধবীলতা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। অনিমেষ সেদিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। উত্তেজনার মুখে যে বোধটির হদিস থাকে না সেটি এখন তাকে আচ্ছন্ন করল। সে উঠে বসতেই মাধবীলতার হাত তাকে আঁকড়ে ধরল। অনিমেষ দেখল মাধবীলতার মুখ এখনও অন্যদিকে ফেরানো অথচ তার প্রতিটি নড়াচড়া সে টের পাচ্ছে।

'উঠো না।' মাধবীলতার গলার স্বর পালটে গেছে।

অনিমেষ আবার নিঃশব্দে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণ উন্মাদনায় যেগুলো টের পায়নি সেগুলো অনুভবে এল। মাধবীলতার শরীরের গন্ধ, স্পর্শ এবং পাশাপাশি থাকার এক আবেগ তাকে আচ্ছন্ন করল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল যে আজ তার জীবনের অন্যতম পাওয়ার দিনটিকে সে ব্যবহার করতে পারল না। এমন তাড়াহুড়ো করে কোনওরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া যৌবনের ব্যবহার সে কখনও চায়নি। অথচ বাস্তবে তাই হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে অনিমেষ কথা বলল। নিজের গলার স্বর এখন নিজের কাছেই অচেনা লাগছে, 'তুমি রাগ করেছ?'

মাধবীলতা তখনও একই ভঙ্গিতে শুয়ে, বালিশ থেকে মুখ সরায়নি, শুধু তার একটা হাত অনিমেষের হাত আঁকড়ে আছে। প্রশ্নটা কানে যেতে ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে দিয়ে চিত হল। তারপর খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

কেন? অনিমেষ ধাক্কা খেল। এই কেন-র উত্তর সে কী করে দেবে? এখন উত্তর না দেবার চেয়ে প্রশ্ন করার লজ্জায় সে চুপ করে রইল।

মাধবীলতা কিন্তু বিষয়টা থামাতে চাইল না, 'উত্তর দিলে না যে!'

অনিমেষ বলল, 'আমি এইভাবে চাইনি।'

মাধবীলতার ঠোঁট নড়ল, 'ও।'

অনিমেষ খোলাখুলি বলল, 'তোমার যোগ্য হয়ে, তোমার মর্যাদা দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করার সঙ্গে আজকের এই ঘটনা মেলাতে পারছি না। বিশ্বাস করো, আমি এক মুহূর্তও চিন্তা করিনি এরকম কিছু ঘটতে পারে।'

মাধবীলতা তার দুই চোখ অনিমেষের মুখের ওপর রেখে বলল, 'তুমি কি আমার যোগ্য নও? তুমি কি আমার অমর্যাদা করেছ? আমি ছাড়া অন্য কাউকে তুমি স্ত্রী বলে ভাবতে পারতে?'

'না, কখনও না।'

'তা হলে?'

'কী তা হলে?'

'নিজেকে এত অপরাধী ভাবছ কেন? তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনতে আমার খারাপ লাগছে।'

'কিন্তু —' আশঙ্কার কথাটা বলতে গিয়ে অনিমেষ চুপ করে গেল। মাধবীলতা হেসে ফেলল, 'তোমাকে বিব্রত করব না।'

অনিমেষ বলল, 'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।'

মাধবীলতা দু'হাতে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল, 'তোমাকে কিচ্ছু বুঝতে হবে না তুমি শুধু এমনি করে ভালবেসো।'

অনিমেষ এখন শান্ত। মনের মধ্যে যে কাঁটা ফুটেছিল তার দপদপানি না কমলেও এই মুহূর্তে মাধবীলতার আলিঙ্গনে সে অনাস্বাদিত শান্তি পেল। নারী-পুরুষের আলিঙ্গনে কামবোধ ছাড়াও আর এক ধরনের আনন্দ আছে, তার অস্তিত্ব জেনে সে পূর্ণ হল।

দরজায় শব্দ হতে মাধবীলতা লাফ দিয়ে উঠে বসল। অনিমেষ দেখল সে দ্রুত বেশবাস চুল ঠিক করে নিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে দরজা খুলে দিচ্ছে। দারোয়ান খাবারের থাল নিয়ে ঘরে ঢুকে ওদের দিকে একবার রসালো চোখে তাকিয়ে ওগুলো রেখে বেরিয়ে গেল।

মাধবীলতা দরজা ভেজিয়ে বলল, 'এসো খেয়ে নেবে।'

অনিমেষের আলস্য লাগছিল, 'একটু বাদে।'

'উহু, তোমার দেরি হয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে।'

কথাটা মনে করিয়ে দিতেই অনিমেষ তড়াক করে খাট থেকে নামল। নেমে ঘড়ি দেখল। সত্যি প্রায় সময় হয়ে গেছে। এখান থেকে গোয়ালপাড়া যেতে হলে কত সময় লাগবে তার জানা নেই। শুনেছে কো-অপারেটিভ অফিসের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা শান্তিনিকেতনের উলটোদিকে চলে গেছে সেটি দিয়ে মাইল খানেক যেতে হবে।

সে দেখল মাধবীলতা তার সামনে খাবারের থালা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে না?'

'এখন ভাল লাগছে না। পরে খেয়ে নেব।'

BanglaBook.org

'কী আশ্চর্য। নাও, খেয়ে নাও।'

'নাগো। তুমি খাও।'

'কী ব্যাপার?'

'বলছি তো পরে খাব। তুমি আর দেরি কোরো না।'

অনিমেষ আর কথা বাড়াল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বলল, 'লোকটাকে বলে যাচ্ছি কাল ভোরে বাসনপত্র নিয়ে যাবে।' আর সেইসময় টাকা দিয়ে দেব। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো। আমি শিগগিরই ফিরে আসছি।'

'ঠিক আছে।' অনিমেষকে এগিয়ে দিতে দরজায় দাঁড়াল মাধবীলতা।

অনিমেষের খুব খারাপ লাগছিল মাধবীলতাকে এ ভাবে একা ফেলে যেতে। অন্তত একটু আগের ঘটনার পরে তার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু নিজেকে শক্ত করল সে। দরজা খুলে একবার পেছনে তাকাতেই মাধবীলতা মুখ তুলে হাসল, 'এসো, আমি তোমার জন্যে জেগে থাকব।'

ঊনচল্লিশ

সন্ধে পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সেটা পেরোলেই শান্তিনিকেতন শীতের কোলে মুখ লুকোয়। আজ মেলার মাঠে সারা রাতের উৎসব। কিন্তু এই শ্রীনিকেতনের পথে অথই ঘুম। এরকম একটা কাণ্ড এই শহরে হচ্ছে তা বোঝা যাবে না এ পথে হাঁটলে। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই, আশেপাশের বাড়ির জানালা দরজা বন্ধ। অনিমেষের হাঁটতে খুব ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল।

পকেটে যা পয়সা আছে তাতে একটা রিকশা অনায়াসেই করা যেতে পারে। কিন্তু সন্ধেবেলাতেই বোঝা গেছে শীতের রাতে রিকশায় চাপা কী বোকামি হবে। ঠাণ্ডাটা জোরে জোরে হাঁটলে কমে যায়। কিন্তু জোরে হাঁটার মতো মেজাজই আসছে না আজ। বারবার ঘুরে ফিরে মাধবীলতার মুখ ওর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। স্ফীত অধর, মুদিত চোখ—এ অন্য মাধবীলতা। সমস্ত শরীর এখন সেই মাধবীলতার স্পর্শে আচ্ছন্ন। জীবনে এই প্রথমবার একটি নারী শরীরের রহস্যে আচমকা ঢুকে পড়ল। এখন বেরিয়ে এসেও মনে হচ্ছে কিছুই জানা হল না কিন্তু প্রথম অভিযানের রহস্যটুকু আর রইল না।

শান্তিনিকেতনের রাস্তায় এই নির্জন রাতে হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের মনে হল, আজ একটু আগে কোথায় যেন গিঁট পড়ল। দাদু পিসিমা বাবা কিংবা ছোটমা যে গিঁঠ দিতে পারেনি, রক্তের সম্পর্কে যে টান তাকে জড়াতে পারেনি যেন সেই অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করছে। মনে হচ্ছে সে আর একা নয়। মাধবীলতা যতই বলুক এ ব্যাপারে অনিমেষের কোনও দায়িত্ব নেই কিন্তু অনিমেষ সে-কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। না, কোনও অপরাধবোধ নয়, পেছনে ছায়া রেখে হেঁটে যেতে ইচ্ছে হয় না, ছায়া থাকবে পায়ের তলায়।

বোলপুর কোঅপারেটিভ স্টোর্সের সামনে গিয়ে সে যখন পৌঁছাল তখন কুয়াশারা হিম হয়ে ঝরছে। অনুমানে বোঝা যায় গোয়ালপাড়ার রাস্তাটা বাঁ দিকে। তবু কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া দরকার। সে দেখল একটা খালি রিকশা বেশ কুঁড়েমি করে বাঁ-দিক থেকেই আসছে। ওকে দেখে লোকটা থামল, 'মেলায় যাবেন বাবু?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। গোয়ালপাড়ায় যাবার রাস্তা এদিকে?'

লোকটা নীরবে ঘাড় নাড়ল, তারপর প্যাডেল ঘুরিয়ে মেলার দিকে চলে গেল। বোধহয় এত রাতে সে গোয়ালপাড়ায় যেতে রাজি নয়। দুপাশের বাড়িগুলো ঘুমুচ্ছে। সুন্দর রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে অনিমেষের মনে হল এখন যদি কেউ ওকে প্রশ্ন করে কী কারণে সে গোয়ালপাড়া যাচ্ছে, তা হলে উত্তর দেবার কিছু থাকবে না। সুবাসদার কথা মতো যদি পুলিশ সতর্ক থাকে তা হলে এই পথেই তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। কারণ সে ছাড়া যখন আর কোনও মানুষকে দেখা যাচ্ছে না তখন ...। অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। অথচ চোখের সামনে অন্য কোনও পথও দেখা যাচ্ছে না। সরাসরি হেঁটে যাওয়ার মধ্যে বেহিসেবি ঝুঁকি আছে, অন্তত রাতের এই সময়ে। আরও আগে, লোকজন পথে থাকতে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। অনিমেষ রাস্তার এক ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দুপাশের ঘরবাড়ি কমে এসে খোলা মাঠ দেখা দিল। পিচ ফুরিয়ে গিয়ে কাঁচা মাটির পথ এখন পায়ের তলায়। বাঁ দিকে দূরে কালো জঙ্গলের রেখা। একটা সাঁকো মতো পেরিয়ে অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। এবার পথটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে সোজা অন্যটা ডান

দিকে নালার পাশ ধরে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। তালগাছের মতো লম্বা লম্বা একহারা গাছ ঝাপসা আকাশের পটভূমিকায় চোখে পড়ছে। এতক্ষণ আকাশ এক ধরনের ঘোলাটে আলো ছিল কিন্তু এখন কুয়াশারা যত ঘন হচ্ছে তত সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। এবং, এই ফাঁকা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল অনিমেষের। নিজের দাঁতের ওর কর্তৃত্ব হারিয়ে গেল হঠাৎ।

দুটো পথের কোনটি গোয়ালপাড়ায় গেছে? নিজের ওপর তার খুব রাগ হচ্ছিল বিকেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে রাখা উচিত ছিল। চারপাশ ফাঁকা, শীতের কামড় খুব, অনিমেষ একটা গলা শুনতে পেল। কেউ গান গাইতে গাইতে আসছে। চমৎকার গলায় শ্যামাসঙ্গীত গাইছে কেউ। অনিমেষ নিজেকে আড়াল করার কোনও উপায় না দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটু বাদেই লোকটা সামনে এসে ওকে দেখে গান থামাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ মনে হচ্ছে?'

অনিমেষ ওকে দেখে আশ্বস্ত হল। লোকটি ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বারংবার দেখছে দেখে সে হেসে বলল, 'গোয়ালপাড়া কোন দিকে?'

'উদ্দেশ্যটা কী?'

অনিমেষ বুঝল লোকটি মাতাল। পুলিশের চরও হতে পারে। কিন্তু এখন তো কিছু করার উপায় নেই। তবু রহস্য করে সে বলল, 'দুটো রাস্তা তো, কোনটা কোন দিকে তাই জানতে চাইছি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে উঠল লোকটা, 'উঁহু বাবা, ফাঁকি দিয়ে পথ জেনে নেওয়া হচ্ছে! ঠিক রাস্তা জানতে পারে না বলেই তো মানুষ মরে। মেলা থেকে?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।

'খবর কে দিল?'

'কীসের খবর?'

'জ্ঞান দেখি টনটনে। মচকায় কিন্তু ভাঙে না। আরে বাবা মায়েদের কাছে পোয়াতিদের লজ্জা করার কিছু নেই। চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

'গোয়াল পাড়ায়?'

'আবার কথা! কিন্তু রাত হল কত? বেশি মাল না নিলে তো আর শুঁড়ির ছেলে দোকান খুলবে না। দশটায় বন্ধ করে, আজ মেলা বলে যদি । তা আপনি নতুন লোক, আপনাকে দেখিয়ে মন ভজানো যাবে।'

লোকটা হাঁটা শুরু করল। পেছনে অনিমেষ। তবু সন্দেহ, তাই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি গোয়ালপাড়ায় যাচ্ছেন?'

'আর কোথায় যাব বাবা। আমার মক্কা বলো আর কাশী বলো তা হল ওই গোয়ালপাড়া। এত বড় দিশি মালের কারখানা বীরভূমে ক'টা আছে? না, ভেজাল পাবে না, কেউ মাল খেয়ে মরেনি আজ পর্যন্ত, না খেয়ে মরেছে।'

'না খেয়ে?'

'আমার বন্ধুরা কেউ মাল খায় না। বাপ মা ভাই কাকা কেউ না। কিন্তু আর্ধেক লোক টেঁসে গেছে এর মধ্যে। আমি শালা মাল খেয়ে চরে বেড়াচ্ছি।'

'আপনার বাড়ি ওখানেই?' অনিমেষ এতক্ষণে লোকটাকে বুঝে নিয়েছে। সে ভাব জমাবার চেষ্টা করল।

লোকটা প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। গুম হয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করল। পরিবর্তনের কারণ অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। দরকার নেই বেশি কথা বলে। একবার গ্রামটা চোখে পড়লেই সঙ্গ ছাড়বে সে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে লোকটা নিজের মনেই বলল, 'এ শালা আমার চেয়ে বড় মাতাল। মেলা থেকে ঠিক গন্ধে গন্ধে ছিটকে এসেছে। আবার বলে কি না ওটা আমার বাড়ি কিনা! মালখানাকে যে বাড়ি বানায় সে শালার সঙ্গত করতে নেই।'

অনিমেষের হাসি পাচ্ছিল কথাগুলো শুনে। সে চট করে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'বড় মাতাল ছোট মাতালের মাথায় হাত বোলায়। আমার পয়সায় মাল খাওয়ার মতলব?' লোকটা আরও জোরে পা চালাল।

অনিমেষ ইচ্ছে করে দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। লোকটা পড়ি মরি করে ছুটছে। ক্রমশ একটা গ্রামের আদল নজরে এল। অন্ধকারে আবছা ঘর বাড়ি। গ্রামের গায়ে এসে অনিমেষের খেয়াল হল, সেই মাতাল লোকটা উধাও হয়ে গেছে। কাছাকাছি তার অস্তিত্ব নেই। মাতালরা নাকি নেশার সময়

BanglaBook.org

খুব উদার হয়, এই লোকটি সেরেফ খাওয়াতে হবে ভেবে এমন করল! কাঁচা লাল মাটির পথ, মাটির ঘরদোর, গ্রামে ঢুকে অনিমেষ চমক খেল। সেই ছেলেবেলা থেকে বাংলাদেশের যে গ্রামের ছবি বইয়ে দেখে আসছে তাই এখন চোখের সামনে। এই ছবির সঙ্গে উত্তরবাংলার গ্রামের কোনও মিল নেই। অবশ্য এখন এই রাতে ঘরের বাইরে কোনও মানুষ নেই। যেন একটা পরিত্যক্ত গ্রামে সে একা হাঁটছে। নির্দেশ মিলিয়ে মিলিয়ে সে সঠিক বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই সিটি শুনতে পেল। অনিমেষ এই গোপন ইশারার হদিস জানে; এ সময় যা করা উচিত তাই করল সে।

ভোর রাতে সভা ভাঙল। নির্বাচন সামনে। সেটা বয়কট করার জন্য সামগ্রিক প্রচার করতে হবে। দলনেতারা আশংকা করছেন কংগ্রেস নয়, সি পি এম থেকেই তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করা হবে। অর্থাৎ এখন ঘরে বাইরে যুদ্ধ। যতটা সম্ভব বেশি ক্যাডার বাড়াতে হবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হল। জনসাধারণের ক্ষতিকর মানুষ, যেমন জোতদার, সুদখোর ইত্যাদিদের প্রয়োজনে শেষ করে দেওয়া হবে। সাধারণত এরা পুলিশ এবং সরকারের সমর্থনপুষ্ট। এইসব মানুষের হাত থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই পেলে দলের প্রতি সমর্থন বাড়বে। সারা দেশ জুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শাসন ব্যবস্থার ঠুনকো কাঠামোটা ভেঙে পড়বে এবং বিপ্লবের প্রসন্ন সময় উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, কতগুলো পুরনো বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট যা কিনা বুর্জোয়া মানসিকতাপ্রসূত, সেগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে মোহমুক্ত করতে হবে। রেনেসাঁর কাল যাকে বলা হয় সেইসময় এবং তারপর থেকে যাঁদের মহান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, দেশের নানা জায়গায় ঘটা করে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই সেই সম্মানের যোগ্য ছিলেন না। বুর্জোয়া শক্তিগুলো দেশের মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখার জন্যে তাঁদের ব্যবহার করেছে। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা রাজনৈতিক বিপ্লবের পাশাপাশি শুরু করা দরকার।

বাঙালির ইতিহাস বড় জোর দেড়শো বছরের। খুব বেশি দূর নয়, পলাশির যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি বাঙালিও উপস্থিত ছিলেন না। এমনকী সিপাহিযুদ্ধের সময় সারা দেশ যখন আলোড়িত তখন কোনও বাঙালির নাম শোনা যায়নি। প্রথম বাঙালি যিনি আমাদের সামনে নিজের কৃতিত্বে উঠে এসেছেন তিনি কি রামমোহন রায়! ইতিহাস প্রতাপাদিত্যের কথা বলে। কিন্তু ভদ্রলোক একজন লেঠেল সর্দার ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন না। এবং তার বাঙালিত্ব নিয়েও সন্দেহ আছে। এদেশের রাজারা, কুচবিহার বা বর্ধমান-এঁরা কেউ বাঙালি নন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় একজন বড় জমিদার ছাড়া কিছু নন। অর্থাৎ দেড়শো বছর আগে আমাদের চতুর্থ পূর্বপুরুষ মাথায় গামছা বেঁধে হয় চাষ করতেন কিংবা সেই চাষ তদারক করতেন। আমাদের যা কিছু বোলবোলা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। অর্থাৎ বাঙালির কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। একশো দেড়শো বছরের হঠাৎ উঠতি জাতির ফুটুনি তাই চোখে পড়ার মতো। স্রেফ একদল নিরক্ষর চাষি, জেলে কিংবা কুচুটে ব্রাহ্মণ এতকাল নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছিল। ইংরেজ আসার পর অব্রাহ্মণরা তাদের চাটুকারিতা করার জন্যে ইংরেজি শিখে নিলেন চটপট। এই বিদ্যা চাকরি পেতে সুবিধে দিল। ব্রাহ্মণরা নিজেদের গোঁড়ামিতে কিছুদিন ইংরেজদের থেকে দূরে সরে থাকার পর দেখল এতকাল যাদের তারা ধর্মের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল তারা অবস্থাপন্ন হয়ে যাচ্ছে চটপট ইংরেজি শিখে। শেষ পর্যন্ত তারাও লাইন ধরল। ফলে এতকালের মরে থাক। একটি জাত রাতারাতি চাকর হয়ে গেল। তা এইরকম একটা জাত থেকে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কিংবা বিদ্যাসাগর উঠে আসেন তখন তাঁদের অস্বীকার করা কি যায়! হয়তো মাত্র দেড়শো বছর আমরা মানুষ হয়েছি কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শিল্প সংস্কৃতিতে আমরা অনেকের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো উপযুক্ত হতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন, যে শিল্প সংস্কৃতির কথা এতকাল আমরা জানি তার সম্যক চেহারাটা সাধারণ মানুষের কতটা উপকারে লাগছে। অনিমেষ এ ব্যাপারে একমত যে বড় মানুষদের তৈরি এই সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোনও যোগ নেই। আকাদেমিতে যে সব কৃষিবিপ্লবের নাটক হয় তা যদি গ্রামে দেখানো হয়, সত্যিকারের কৃষকরা ক্যারিকেচার দেখছে বলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। হয়তো তার মন সব কিছুতেই সায় দিচ্ছে না কিন্তু বৃহৎ কিছু ফললাভের জন্যে সামান্য ভুলগুলো সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকা ভাল।

ইতিহাস একটু অন্যরকম করে লেখা দরকার। ইংরেজরা আমাদের মানুষ করেছে এটা সূর্যের মতো সত্য। ওরা আসার পর আমরা জীবনধারণ ও যৌন কাজের বাইরে অন্য কিছু জগতের কথা ভাবতে শিখলাম। কিন্তু তার বদলে গোলামিটাও রক্তে ঢুকে গেল। প্রিন্স দ্বারকানাথ পাল্লা দিয়েছেন

BanglaBook.org

ওদের সঙ্গে। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খুলেছেন, ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন ইংরেজদের কাছে জেনে। এবং মদ খেয়েছেন ও মেমসাহেবের কাছে প্রণয় জেনেছেন। ফলত তিনি প্রিন্স। বিদ্যাসাগর কিংবা রামমোহন, যতই বাঙালিয়ানা চাপাই না কেন, তাঁদের চরিত্রে ইংরেজি শিক্ষা মেরুদণ্ডের মতো কাজ করেছে। ফলে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর আমরা পিতৃমাতৃহীন হয়ে গেলাম। ভারতবর্ষের মানচিত্রে কোনও স্থান রইল না বাঙালির। ওদিকে ঊষর মরুভূমির মানুষ রাজস্থানি কিংবা পার্শি সিন্ধিরা ইংরেজের চাকর না হয়ে তাঁদের মন জুগিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর দেশটা তাই ওদের হাতেই চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথ যদি এ-দেশে না জন্মাতেন তা হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হত। এই মানুষটি নিজে বীজ সৃষ্টি করে তা থেকে বিরাট মহীরুহ দাঁড় করিয়ে গেলেন একা। অবশ্যই বিবেকানন্দের নাম তাঁর পাশে উচ্চারণ করা যায়। এবং এই দুজন ব্যতিরেকে বাকিটা সব অন্ধকার। শ্রীহট্টের মানুষ চৈতন্যদেব যে ধর্মবিশ্বাসে বাঙালিকে উদ্বেলিত করেছিলেন তার ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু? নদিয়া থেকে উড়িষ্যায় চলে যেতে হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উন্মাদনায়। তা হলে? তবে ওই ঈশ্বরমুখী মানুষটিকে নবজাগরণের প্রতীক বলে ঐতিহাসিকরা আমাদের আফিং খাইয়ে যাচ্ছেন।

অনিমেষ সভার শেষে সরাসরি কিছু নির্দেশ জেনে নিল। এখন আর কোনও কুণ্ঠার সময় নয়। খুব শিগগির একটা স্কোয়াড যাচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গেরিলা ট্রেনিং-এর জন্যে। কিছু কিছু অস্ত্র যাতে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায় তার আয়োজন হচ্ছে। এ-সবের জন্যে যে অর্থ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা অনিমেষদেরই করতে হবে।

মিটিং-এর পর সুবাসদার সঙ্গে যখন কথা বলার জন্য অনিমেষ উঠে দাঁড়াল ঠিক তখনই লোকটার দিকে তার নজর পড়ল। এতক্ষণ এই বড় ঘরটায় এত লোকের মধ্যে সে খেয়াল করেনি। দেখে হতবাক্ হল সে। লোকটারও প্রায় সেই অবস্থা। তারপর চট করে নিজেকে সামলে লোকটা বলল, 'মাল-ফাল খাইনি বুঝতেই পারছেন।'

'আমিও সেটার সন্ধানে এখানে আসিনি তাও দেখছেন!'

'আরে বাপ, আমি তো মশাই আপনাকে দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলাম এ শালা নিশ্চয়ই খোঁচড়। কী করে কাটানো যায় তাই ছিল আমার ধান্দা।' অনিমেষ হাসল, 'আপনি না এলে আমার এখানে আসতে একটু অসুবিধে হত। খুব চমকে দিয়েছেন কিন্তু।'

এই সময় সুবাসদা ওদের কাছে এল, 'অনিমেষ, তুমি কি আজই ফিরে যাচ্ছ?'

'তাই তো ইচ্ছে আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কলকাতায় না যাওয়াই ভাল। কীভাবে ফিরবে ঠিক করেছ?'

'দুপুরের ট্রেন ধরব।'

এই সময় লোকটা বলল, 'যাবেন কোন দিকে?'

সুবাসদা বলল, 'আপনিও তো নর্থ বেঙ্গলে যাবেন। এক সঙ্গে যেতে পারেন আপনারা।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নর্থ বেঙ্গলে কোথায় যাবেন?

'রায়গঞ্জ। আপনি?'

'শিলিগুড়ি।'

'বাঃ গুড।' লোকটা হাসল, 'কিন্তু ট্রেনে না যাওয়াই ভাল।'

'তা হলে কীসে ফিরবেন?'

'সে ব্যবস্থা করেছি। বোলপুরে একটা লরি এসেছে কুচবিহার থেকে। সেটা আজ সকালেই ফিরবে। ওটাতেই এলাম ওটাতেই যাব।'

'আপনার সঙ্গে গেলে জায়গা হবে?'

'সারা ভারতবর্ষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছি আর আপনি তো মশাই মোটে পঞ্চাশ কেজির লোক হবেন?' লোকটা অনিমেষের সঙ্গে হাত মেলাল।

এখন বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা। চারধার সাদা হয়ে গেছে। মাথার ওপর আকাশটা তাই ঘোলাটে, এমনকী শুকতারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওরা ছোট ছোট দলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুবাস, অনিমেষ এবং সদ্য পরিচিত মানুষটি চুপচাপ গ্রামের বাকি পথটুকু পার হয়ে একটা ছোট্ট নদীর কাছে এল। এটা ওরা যে দিক দিয়ে গ্রামে ঢুকেছিল তার বিপরীত দিক। এ গ্রামে শীতকাল বলেই হয়তো কোনও কুকুর এই ভোর রাতে ডাকছে না, কোনও মানুষ পথে হাঁটছে না। লোকটা বলল 'আমি কিছু

BanglaBook.org

গুল মারিনি। এখানকার দিশি মদের দোকান খুব বিখ্যাত।'

'আপনি জানলেন কী করে?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'জেনে নিয়েছি। এই যে নদী, এটা ডিঙিয়ে আলপথ দিয়ে কিছুটা গেলে যে গ্রামটা পড়বে তার নাম তালতোড়। ওটা ছাড়িয়ে আর একটু হাঁটলেই কোপাই।'

লোকটার পেছন পেছন নদী পার হল ওরা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল। সুবাস বলল, 'আপনি যখন সব জানেন তখন গাইড হয়ে আগে আগে হাঁটুন, আমরা পেছনে আসছি।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'তা কেন, একসঙ্গে পা ফেলি আসুন।'

সুবাস বিরক্ত হল, 'দুর মশাই, এতদিন পর এর সঙ্গে দেখা হল, দুটো ব্যক্তিগত কথাও থাকতে পারে। বুঝছেন না কেন?

লোকটা বলল, 'তা তো বটে।' বলে একটু এগিয়ে হাঁটা শুরু করল। অনিমেষ অনেক দূরে গ্রাম দেখতে পাচ্ছিল। এদিকটায় শুধু মাঠ আর মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। শীতের সময় বলেই বোধহয় এখনও অন্ধকার হালকা হয়নি। সুবাস কিন্তু অনিমেষের সঙ্গে কথা বলছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনিমেষ বলল, 'সেই প্যাকেটটা নিতে আমার সঙ্গে যেতে হবে তো?'

সুবাস মাথা নাড়ল, 'না। ওটা ফিরিয়ে দিতে হবে না।'

'কী আছে ওতে?' অনিমেষ বুঝতে পারছিল না।

'রিভলবার।' বলে সুবাস কাঁধের ঝুলি থেকে একটা ছোট অস্ত্র বের করে অনিমেষকে দেখাল, 'ঠিক এই রকম।' তারপরই অনিমেষকে একদম পাথর করে দিয়ে সামনে গুলি ছুড়ল। অনিমেষ দেখল চলতে চলতে সেই মুহূর্তে লোকটা ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়েছিল এবং গুলিটা সরাসরি তার বুকে বিদ্ধ হতেই সে যেন কিছুটা শূন্যে উঠে গিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের কাছে ছুটে গেল সুবাস। লোকটার ডান পকেটে একটা ছোট অস্ত্র ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। তখনও গুলির শব্দ সেই নির্জন রাতের ফাঁকা মাঠে গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। অনিমেষ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। যে ধাতস্থ হবার আগেই সুবাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দৌড়ে চলো।'

ঠিক খেয়াল নেই কতটা পথ কীভাবে ওরা পেরিয়ে এসেছে। শান্তিনিকেতনে ঢোকার মুখে সুবাস পা থামাল। অনিমেষের চোখের সামনে তখনও যেন সেই শরীরটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। এ ভাবে আচমকা হত্যা করার কোনও কারণ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। লোকটি তাদের দলের না হলে এই গোপন মিটিং-এ প্রবেশ করার সুযোগ পেল কী করে? তা হলে?

সুবাস বলল, 'ভোর হয়ে আসছে। তুমি ফিরে যাও।'

অনিমেষ সরাসরি প্রশ্ন করল, 'লোকটা কী অন্যায় করেছিল?'

সুবাস বলল,' কথা বলার বেশি সময় নেই। ও পুলিশের চর। আমাদের সঙ্গে কাজ করার ভান করে এসেছে। আমি জানি ও ট্রেনেই এসেছে ট্রেনে যাবে। লরির ব্যাপারটা স্রেফ বানানো। তোমাকে কিংবা আমাকে আজ শ্রীঘরে ঢুকতে হত।'

অনিমেষ বলল, 'আমি ভাবতে পারছি না—।'

সুবাস বলল, 'চোখ কান খোলা রাখো অনিমেষ। যখনই বুঝবে কেউ পথের বাধা হচ্ছে তখনই তাকে সরিয়ে দেবে। সেন্টিমেন্ট মানুষকে সব সময় দাম দিতে বাধ্য করে। লোকটার সম্পর্কে আজ বিকেলেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যা হোক, আমি এখান থেকেই চলে যাচ্ছি। তুমি পুল পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তাটা ধরো।'

' কিন্তু প্যাকেটটা—।'

'বললাম তো, ওটা তোমার জন্যে। গুলি লোড করাই আছে। সঙ্গে একটা কার্তুজে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া আছে। আবার দেখা হবে।'

সেই ফিকে চাঁদের আলোয় অনিমেষ সুবাসকে উলটো পথে হাঁটতে দেখল। তারপর দ্রুত পা চালাল শ্রীনিকেতনের দিকে। কনকনে ঠাণ্ডাতেও এখন আর অনিমেষের শীতবোধ ছিল না।

হিমে স্নান করা বাড়িগুলোর কাছে এসে অনিমেষ একবার দাঁড়াল। হঠাৎ প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে। নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। নাক মুখ বরফের মতো ঠাণ্ডা। সমস্ত এনার্জি যেন শরীর থেকে নিংড়ে নিয়েছে রাতটা। পুবের আকাশ এখন ঈষৎ লালচে। বাগান পেরিয়ে সে খিড়কি দরজার কাছে এসে দেখল সেটা বন্ধ। কয়েকবার আস্তে শব্দ করলেও ভেতরে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়িটা যেন নিঝুম হয়ে আছে। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল সে মাধবীলতার কাছে আর কখনওই পৌঁছাতে পারবে

BanglaBook.org

না। অন্যের গড়া দুর্গে মাধবীলতাকে রেখে বেরিয়ে গেলে ফিরে এসে কখনওই আর দরজাটা খোলা পাবে না। ব্যাপারটা ভাবতেই হিম যেন বুকে ছড়াল। সে খুব জোরে আঘাত করতে লাগল দরজায়। এখন এই ক্যাকভোরে এই শব্দ চতুর্গুণ হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। হতাশ অনিমেষ ভেতরে পায়ের আওয়াজ পেল এবার। দরজা খুলল মাধবীলতা। তার চোখে মুখে উদ্বেগ। নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

অনিমেষ উত্তর না দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মাধবীলতার হাত নিজের দু-হাতে টেনে নিল। মাধবীলতা বলল, 'ওমা তুমি একদম জমে গেছ। এসো, তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো।'

চাতালের পাশে সব ক'টা দরজা বন্ধ। দারোয়ানটার ঘুম ভাঙার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বন্ধ ঘরের উত্তাপ বড় আরামের। অনিমেষ সরাসরি খাটে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ঘুমোওনি?'

মাধবীলতা ঠোঁট টিপে মাথা নাড়ল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না।' অনিমেষ সহজ হবার চেষ্টা করছিল।

'তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। শুয়ে পড়ো।'

'শুয়ে আর কী হবে। একটু বাদেই তো বের হতে হবে।'

'তুমি কি আজই ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেন কখন?'

'বোধহয় বারোটা।'

'তা হলে তো অনেক দেরি আছে।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে পূর্ণ চোখে দেখল। তারপর বলল, 'তোমার কিছু বলার নেই?'

'না। তুমি ভাল থেকো শুধু এইটুকু।'

বালিশে মাথা রেখে অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। মাধবীলতা এসে ওর পাশে বসল। বসে বলল, 'তোমাকে কিন্তু আজ অন্যকরম দেখাচ্ছে।'

'একটা লোককে চোখের ওপর মরে যেতে দেখলাম।'

'সেকী! কেন?'

'লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। লতা, জানি না তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে কি না। বোধহয় না হওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'তোমায় দেখলে আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি।'

'জানতাম না তো।'

'আজ ফিরে এসে দরজা বন্ধ দেখে সেটা অনুভব করলাম। আমি দূরে থাকলে মনে হয় তুমি আমার জন্যে আছ। কিন্তু কাছে এলেই ভয় হয় যদি হারিয়ে যাও।'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে ওর মুখ অনিমেষের গালের ওপর রাখল। দু'হাতে অনিমেষের মাথা আঁকড়ে ধরে নিজের শরীরের তাপে অনিমেষের শীতলটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'আমি আছি, আমি থাকব।'

দশটা নাগাদ ওরা টাকা পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা নিল না ওরা। জিনিসগুলো দু'হাতে বয়ে বড় রাস্তায় চলে এল। বেরুবার আগে মাধবীলতা প্যাকেটটা বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'সেই ভদ্রলোক তো এলেন না?' অনিমেষ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল, 'ওটা আমারই জন্যে। কী আছে জানো এতে?'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়াল।

'রিভলভার।' অনিমেষ সযত্নে জিনিসটাকে লুকিয়ে রাখল। আর রাস্তাতে গিয়ে ওর মনে পড়ে গেল। বড় রাস্তায় এসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জিনিসপত্র ওরা হোস্টেল থেকে এনে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'সেগুলো ঠিক আছে?'

'কেন?'

BanglaBook.org

'আমি একটা জিনিস একদম ভুলে গিয়েছিলাম। দুটো প্যাকেট আমার কাকা আমাকে দিয়েছিলেন দুজনকে দেবার জন্যে। মনেই পড়ছে না ওগুলো নিয়ে আমি কী করেছি। তুমি কি ছোট দুটো প্যাকেট ওগুলোর মধ্যে পেয়েছ?'

'না তো।'

'কী আশ্চর্য! তা হলে গেল কোথায় ওগুলো!'

'খুব দরকারি কিছু!'

'জানি না। আমাকে পৌঁছে দিতে দেওয়া হয়েছিল। যাঃ, খুব খারাপ লাগছে।'

'তা হলে আমি ভাল করে খুঁজে দেখব।'

'দেখো তো।'

ওরা খানিকটা এগোবার পর মাধবীলতা বলল, 'শোনো, আমার মনে হচ্ছে তোমার একা ট্রেনে ওঠা উচিত হবে না।'

'কিছু হবে না।'

'হলে কিছু করার থাকবে না। আজ কাকে মেরে ফেলা হয়েছে তার খবর পুলিশ পেলে নিশ্চয়ই হাওয়া খুব গরম হবে।'

অনিমেষ দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ। তা হলে কী করা যায়?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'পাগল! তোমার স্কুল আছে না?'

'থাক।'

'কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে কী লাভ হবে?'

'স্বামী-স্ত্রী দেখলে পুলিশ সন্দেহ করবে না।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে দেখল। একটা খালি রিকশা দেখতে পেয়ে মাধবীলতা ততক্ষণে সেটাকে থামিয়েছে। ওটায় চেপে মাধবীলতা আঁচলটা মাথায় তুলে দিল। সামান্য একটু কাপড়ের আড়াল কিন্তু অনিমেষের মনে হল পৃথিবীর সব সৌন্দর্য এর কাছে মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল। মাধবীলতা নিঃশব্দে অনিমেষের হাতে চিমটি কাটল, 'এই, কী দেখছ?'

অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে নিল, কোনও কথা বলল না। মাধবীলতা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। অনিমেষের বুকের ভেতরে একটা লোহার বল গড়াচ্ছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছিল সে।

বাস স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অনিমেষ রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল। ঠিক সামনেই একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে লেখা সাঁইথিয়া। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে সময়টা জেনে নিল অনিমেষ। সাঁইথিয়া যেতে সে সময় লাগবে তাতে নিশ্চিতভাবেই সেখান থেকে ট্রেনটা ধরা যাবে। সাঁইথিয়া স্টেশনে নিশ্চয়ই কোনও বিপদের ঝুঁকি নেই।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'বাসে সাঁইথিয়া যাব। তুমি ঠিকই বলেছ, রিস্ক নিয়ে কোনও লাভ নেই।'

'তুমি কি চাইছ আমি তোমার সঙ্গে না যাই?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?

'তুমি জানো লতা।'

অনিমেষ আর কথা বাড়াল না। চট করে সাঁইথিয়ার বাসটায় উঠে জায়গা খুঁজতে লাগল। একদম পেছনের দিকে একটা সিট পাওয়া গেল। ব্যাগটা সেখানে রেখে নেমে এসে দেখল মাধবীলতা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, রিকশাটা তখনও চলে যায়নি। ঠিক সেই সময় আর একটা প্রাইভেট বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াল। ওপরে সাদা কাগজে 'স্পেশাল' শব্দটা লেখা। তার নীচে শান্তিনিকেতন-কলকাতা। কন্ডাক্টর তার দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। 'বর্ধমান, কলকাতা।'

অনিমেষ বলল, 'চমৎকার। কী সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল। তোমার আর ট্রেনে করে ফিরে দরকার নেই। নিশ্চয়ই স্টেশনে লোক পিলপিল করছে। এই বাসটার খবর পেলে আর দেখতে হবে না। উঠে এসো চটপট।' মাধবীলতার জিনিস নিয়ে অনিমেষ ভরতি হয়ে যাওয়া বাসটায় উঠে পড়ল। প্রথম দিকের লেডিস সিটে সেটা রেখে জানলা দিয়ে ডাকতে মাধবীলতা ভারী পায়ে উঠে এল।

অনিমেষ বলল, 'একদম টানা চলে যাবে। কষ্ট পাবে না।'

BanglaBook.org

'কষ্ট!' মাধবীলতা হাসল।

ওদিকে সাঁইথিয়ার বাস হর্ণ দিচ্ছে। অনিমেষ বাস থেকে নেমে পড়তেই মাধবীলতা পেছনে ডাকল। জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়াল অনিমেষ। মাধবীলতা চট করে ব্যাগ খুলে একটা খাম বের করে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'কী এটা?'

'তোমার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম। দরকার হবে।'

অনিমেষ খামটা খুলতে যাবে, এমন সময় বাসটা আবার সজোরে হর্ন বাজাল। দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠল সে। ততক্ষণে প্রায় ভরতি হয়ে গেছে। লোকেরা এখন দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। ভিড় সাঁতরে কোনওরকমে নিজের সিটে গিয়ে বসতেই সে মাধবীলতাকে দেখতে পেল। কলকাতার বাসের জানলায় ওর মুখ।

মাধবীলতা হাসবার চেষ্টা করছে, 'কবে দেখা হবে বললে না!'

'লিখব।' চেঁচিয়ে বলল অনিমেষ।

মাধবীলতা কী বলল শুনতে পেল না অনিমেষ। কারণ, তখন সশব্দে বাসটা চলতে শুরু করেছে। একপলকেই মাধবীলতার উদগ্রীব মুখটা মুছে গেল সামনে থেকে। মাধবীলতার বিপরীতমুখী বাসে বসে খামটা খুলে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। পাঁচটা একশো টাকার নতুন নোট খামের ভেতরে। সঙ্গে একটা সাদা কাগজে দুটো অক্ষর লেখা, 'ভাল থেকো।'

চল্লিশ

খুব পাকা জুয়াড়িও ভাবতে পারেনি, কংগ্রেস এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে গরিষ্ঠতা হারাবে। কয়েকটি ব্যাপারে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়েছিল তার জন্যে এমন ভরাডুবি হবে তা বিরোধীরাও আশা করেনি। মুশকিল হল কংগ্রেস হারলেও কোনও দলই একক গরিষ্ঠতা পেল না।

আদর্শের যে কেতাবি কথাবার্তা এতকাল পার্টিগুলো শুনিয়েছে তা বেমালুম ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী চিন্তার শক্তির সঙ্গে হাত মেলাল এবার। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত এক নেতার তৈরি জোতদারের সমর্থন পুষ্ট মুষ্টিমেয় এম.এল.এ. নিয়ে নির্বাচিত দলকে সামনে রেখে ময়দানে জনসভা করল মার্কসপন্থীরা। কারণ, মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের অন্যান্য দলগুলো বিশ্বাস করতে পারছিল না। অল্প ক'দিন আগে ভোট পাওয়ার জন্যে যারা খেয়োখেয়ি করেছে তারাই একসঙ্গে দাঁত বের করে হাসল।

অনিমেষরা দেখল, শুধু মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্যে কম আসন পাওয়া গান্ধীবাদী নেতাকে শিখণ্ডী করে কমিউনিস্ট পার্টি রাইটার্স বিলডিং-এ বসার স্বপ্ন সার্থক করল। এমনকী স্বরাষ্ট্র দপ্তর পাওয়ার জন্যে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে উপমুখ্যমন্ত্রী নামে একটি নতুন পদের উপঢৌকনে সন্তুষ্ট হতে হল। কিন্তু প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল, এ সবই হচ্ছে জনসাধারণের চাপে। নেতারা গোলাম হোসেনের গলায় ঘোষণা করলেন, জনসাধারণের রায় মাথা পেতে নিলাম। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল।

পার্টির বিরুদ্ধে এতকাল যে অভিযোগ বিক্ষুব্ধরা করত তা আরও সত্য বলে প্রমাণিত হল তাদের কাছে। যারা ইতিমধ্যে পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা আশা করছিল এ রকম আদর্শহীন দল থেকে এবার অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু কার্যত তা হল না। পার্টির এই আচরণের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হল। যে কোনও অপরাধী তার সমর্থনে বড় যুক্তি তৈরি রাখতে পারে যদি তাকে জেরা করার সুযোগ না দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পার্টিকে জেরা করা মানে দলবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া।

অনিমেষরা আশা করেছিল নির্বাচনে হেরে গেলে মার্কসবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের মেকি পথ ছেড়ে আসবে। বস্তুত এ সম্পর্কে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। একটি রাজ্য সরকার হাতে পাওয়া মানে কোনওভাবেই দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা নয়। এই শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তখন একটি রাজ্য সরকার কিছুই করতে পারে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল মার্কসবাদীরা এতেই সন্তুষ্ট হয়ে পড়ছেন। কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে আবেদন নিবেদন চলছে।

অনিমেষরা বুঝে নিল যা করবার তাদের একাই করতে হবে। এ দেশে থিয়োরি আর প্র্যাকটিসের মধ্যে যে আকাশ-জমিন ফারাক তা ওরা যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল তারা হাড়ে

BanglaBook.org

হাড়ে টের পাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে বল গড়াতে শুরু করেছে। উত্তেজনা মানুষকে একত্রিত করে। অনিমেষরা পশ্চিম বাংলা ছাড়িয়ে এখন সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কিন্তু এ-কথা ঠিক, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ জনসাধারণের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছিল। তাঁরা চাইছিলেন সরকারে গিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র, আমলাদের চেহারা, বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশের আসল রূপ কৃষকদের সামনে ভালভাবে তুলে ধরতে। নির্বাচনের আগে তাঁরা কৃষকদের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলোর প্রতি এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব তাঁরা বোধ করছিলেন। কিন্তু সরকারে গিয়ে এ সব সংস্কার করতে গিয়ে অন্য শরিক দলের কাছ থেকে এঁরা বাধা পেলেন। অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ এবং বর্গাচাষি উচ্ছেদ বন্ধের একটা চেষ্টা তাঁরা করলেন যা বিচার ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের বাধা অকেজো হল।

১৮ই মার্চ ১৯৬৭ তারিখে মার্কসবাদীরা শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার উদ্যোগে একটি কৃষক সভা করেন। জমির ওপর ভূমি মালিকদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান, কৃষক সমিতির মাধ্যমে জমির সুষম বন্টন জোতদারদের উৎখাত করার জন্যে কৃষকদের সশস্ত্র করার একটা কর্মসূচি নেওয়া হল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আন্দোলন তুঙ্গে, যখন যুক্তফ্রন্টের পুলিশ কৃষকদের নির্মমভাবে হত্যা করছে তখন সরকারে থেকেও মার্কসবাদীরা সামান্য প্রতিবাদ ছাড়া কিছু করতে পারেনি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালালেও তাঁরা মন্ত্রিত্বে থেকে যান এবং সেই পথেই কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেন।

প্রথম বিস্ফোরণ সাতষট্টি সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে, শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়িতে। দলে দলে গরিব, শুকিয়ে যাওয়া কৃষকরা বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে বেনামি জমি দখল করতে। জোতদাররা প্রতিরোধ করল বন্দুক হাতে। কিন্তু মানুষ যখন মরিয়া হয় তখন সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। সে সময় তাকে দাবিয়ে রাখা শক্ত। কৃষকরা ব্যাপক হারে জমি দখল করতে লাগল। জোতদারের হাত শক্ত করল পুলিশ। স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাওয়া গরিব কৃষকের রক্ত ঝরল; তারা চেষ্টা করল পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে, জোতদারকে নিরস্ত্র করতে। কিন্তু বিনিময়ে মহিলা এবং শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করল পুলিশ। নকশালবাড়ির মাটিতে যে রক্ত ঝরল তার প্রতিবাদে কোনও রাজনৈতিক দল কিন্তু গলা খুলল না। যুক্তফ্রন্টে বাস করে মার্কসবাদীরা কিছুটা প্রতিবাদ জানানোর ঝুঁকি নিয়ে চুপ করে গেল। কারণ তখন সারা দেশে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে মার্কসবাদীরা নাকি খুব কট্টর। তাঁদের মনোভাব জঙ্গি। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্য চিন্তা করতে পারে না। ফলত তাঁদের সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি অন্য শরিক দলের মধ্যে সঞ্চারিত হল। তারা এদের বিরুদ্ধে আস্থা হল। তাই নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে মার্কসবাদীরা এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হল না। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টকে বাঁচানো গেল না। পরস্পরকে প্রতিনিয়ত সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করে একটি পরিবার কখনও টিকে থাকতে পারে না।

নকশালবাড়িতে যে আন্দোলনের সূচনা হল তা সেখানেই আপাত দৃষ্টিতে থেমে গেলেও সারা দেশে তার প্রতিক্রিয়া হল ব্যাপক। এই আন্দোলনের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ত্রিপুরা, তামিলনাড় , উত্তরপ্রদেশ, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে ভূমি হীনদের জন্যে জমি দাবি, জোর করে বাড়তি জমি দখলের চেষ্টা, উচ্ছেদ হওয়া বর্গাদাররা মাঠের ফসল কেটে নিতে চেষ্টা করতে লাগল। নকশালবাড়িতে যে রক্ত ঝরেছিল কৃষকের শরীর থেকে তা যেন সমস্ত নিরস্ত্র কৃষকদের বুকে ছড়িয়ে পড়ল।

অনিমেষ এতদিন সংবিধানের কাজে ব্যস্ত ছিল। শিলিগুড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ। নকশালবাড়ির আন্দোলনের পর সারা দেশে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। বেশির ভাগ সময়েই তাকে এবং তার সঙ্গীদের গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হল। একটা ব্যাপার অনিমেষকে প্রায়ই চিন্তিত করত। এত কাছে নকশালবাড়িতে যে ঘটনা ঘটে গেল তার কোনও প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্ত কিংবা শ্রমজীবীদের মধ্যে হচ্ছে না। যেন, এ সব করে কৃষকেরা জমি পাচ্ছে তাতে আমাদের কী—এইরকম প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। অনিমেষরা আজ সারা দেশে ব্যাপকভাবে নকশালবাড়ির সমর্থনে পোস্টার ফেলছে। ছোট ছোট জনসভা করছে। ওরা ধরে নিচ্ছিল এইভাবে ওরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারবে।

খুঁটিমারি জঙ্গলের মধ্যে অনিমেষের সাময়িক আস্তানাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। সিরিল প্রায়ই খবর আনছিল যে স্বর্গছেঁড়া অঞ্চলে পুলিশি তৎপরতা বাড়ছে। এখন সারা দেশ গরম। কাগজ খুললেই পুলিশের সঙ্গে নকশালপন্থীদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কথাটা ভাবলে অনিমেষের

BanglaBook.org

অবাক লাগে। যেহেতু নকশালবাড়িতে প্রথম বিস্ফোরণ তাই একটা দলের নাম চিহ্নিত হয়ে গেল নকশালপন্থী বলে ? অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কেউ নিহত হলে তাকে বলা হয়েছে নকশাল। কেন ? অবশ্যই নিজেদের নকশালবাড়ির কৃষকদের উত্তরসূরী বলতে গর্বিত বোধ করার কারণ আছে কিন্তু সমস্ত দেশে যখন বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে তখন একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নিজেদের পরিচয় আবদ্ধ করা কেন ? এ সবই বুর্জোয়া মানসিকতার ফসল কিন্তু তারাও ক্রমশ সেটা মেনে নিচ্ছে।

নির্দেশ এসেছে এই এলাকায় যত ব্যক্তিগত মালিকানায় বন্দুক আছে তা জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে। সেই লিস্ট এখন অনিমেষের হাতে। আজ রাত্রে প্রথম অ্যাকশনে বের হবে সে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটুও উত্তেজনা বোধ হচ্ছিল না। সিরিল এবং সে ছাড়া এই তথ্যটি কাউকে জানানো হয়নি। বিকেল হয়ে যাওয়া এই সময়টায় অনিমেষ একা বসেছিল। বড় বিষণ্ণ লাগে এই সময়টা। তার ওপর জলো বাতাস বইছে। ভুটানের পাহাড় থেকে মেঘ ভেসে আসছে ক'দিন থেকে। প্রথম বর্ষণ শেষ হবার পর কিছুদিন প্রকৃতি চুপচাপ ছিল। এখন যে বর্ষা নামবে তা চলবে একটানা। সময়টা অবশ্যই অ্যাকশনের পক্ষে উপযুক্ত।

সন্ধের খানিক বাদে জুলিয়েন এল। সঙ্গে সিরিল। মালবাজার-মেটেলি অঞ্চলে কাজ করছে জুলিয়েন। আজ ওর আসবার কথাও নয়। অনিমেষ হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এখানে ?'

'কিছু টাকার দরকার। কিছু ভাল মাল আসছে পাকিস্তান থেকে।'

'কী আছে ?'

'যা আছে তাতে একটা থানা উড়ে যাবে।'

অনিমেষ বলল, 'ভালই হল। চলুন, দেখি কপালে কী আছে আজ।' তারপর সে জুলিয়েনকে আজকের পরিকল্পনার কথা খুলে বলল। সিরিল চুপচাপ শুনছিল, শেষ হলে বলল, 'আজ রাত্রেই এখান থেকে হাওয়া হয়ে যেতে হবে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কার গাড়ি ?'

'পানিরামেরই। ওর গ্যারেজে তিনটে জিপ আছে। চাবি কার কাছে থাকে আমি জেনে এসেছি।'

জুলিয়েন বলল, 'কাজ শেষ হলে কোথায় যাওয়া হবে ?'

'শিলিগুড়ি চলে যাব।'

'মোটেই তা করতে যাবেন না। শিলিগুড়ি এখন খুব গরম। রাত্রে জিপ দেখলে পুলিশ ছাড়বে না।'

'কিন্তু একটা বড় শহরে গিয়ে গা ঢাকা না দিলে মুশকিল হবে। শিলিগুড়ি ছাড়া আর কিছু তো মাথায় আসছে না।'

'জিপ নিয়ে সোজা নাগরাকাটায় চলে যান। সেখানে রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের ট্রেন ধরে হাসিমারায় ফিরে আসবেন। ওখান থেকে ভুটানের বর্ডার মিনিট পনেরোর রাস্তা।

পুলিশ জিপ খুঁজে পেলে ভাববে শিলিগুড়ির দিকেই গিয়েছেন। আবার উলটো রাস্তায় ফিরে যেতে পারেন এ-কথা ওদের মাথায় ঢুকবে না।'

নাগরাকাটায় অনিমেষ কখনও যায়নি। হাসিমারায় গিয়েছে ওখান থেকে ফুন্টশিলিং খুব কাছে। পাশেই নদীর ওপর বিরাট বাঁধের কাজ হচ্ছে। সেখানে ওদের কিছু লোক আছে। আস্তানা পেতে অসুবিধে হবে না। জুলিয়েনের পরিকল্পনা তাই ওর খুব পছন্দ হল। লোকটার মাথায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপারটা চমৎকার খোলে।

রাত বারোটায় একদম মৃত হয়ে যায় স্বর্গছেঁড়া। কোথাও সামান্য শব্দ নেই। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েছে। অনিমেষ আর জুলিয়েন স-মিলগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। সিরিলকে বলা হয়েছে মেছুয়া পুল থেকে স্কোয়াডের বাকি সবাইকে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেখানে চলে আসতে। অনিমেষের একটুও উত্তেজনা আসছিল না। সে একবার পেটের ভেতর গোঁজা অস্ত্রটা দেখে নিল। সুবাসদার দেওয়া জিনিসটা খুব ভাল। একদিন বৃষ্টির রাত্রে সে নিয়ম-কানুন মেনে পরীক্ষা করেছিল। হাত কাঁপেনি, কিন্তু একটি গুলি ছোড়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া তার কোনও সম্বল নেই। বরং জুলিয়েনের হাতের ঝোলার মধ্যে যে মালগুলো আছে তা অনেক নিরাপদ। অ্যাকটিভ করে ছুড়ে দাও। একসঙ্গে অনেকটা জায়গা উড়ে যাবে।

অনিমেষ চারপাশে তাকাল। সামনেই ওদের স্কুল। এখন অবশ্য নামেই স্কুল, আসলে কিছু ভাঙাচোরা টিনের ঘর আর পুজো মণ্ডপ। আসল স্কুল হচ্ছে ও পাশে মাঠের গায়ে। কিন্তু এখানেই

BanglaBook.org

ভবানী মাস্টার ওদের পড়াতেন। সেই সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট এই স্কুলের সামনে সে জাতীয় পতাকা তুলেছিল। কানের পরদায় এখনও বন্দেমাতরম চিৎকারটা মাখামাখি হয়ে আছে। অনিমেষ হাসল, সে-সব শৈশব-স্মৃতি সুদৃশ্য রাংতায় মোড়া যেন।

ছায়ায় ছায়ায় সিরিল বেরিয়ে এল, 'রেডি।'

জুলিয়েন বলল, 'তুমি চলে যাও আগে। হাওয়া দেখলে সিটি দেবে। আমরা আসছি।'

মোট আট জন। অনিমেষ এদের প্রত্যেককে চেনে। একটা সুবিধে এই যে এদের কারও নাম পুলিশের খাতায় নেই। কিন্তু ছেলেগুলোর মুখচোখ দেখে অনিমেষ বুঝতে পারছিল এরা ঠিক স্বাভাবিক নেই। সে ওদের সামনে গিয়ে বলল, 'কমরেডস, আজ আমরা যা করতে যাচ্ছি তা এই দেশের জন্যেই। মনে কোনও সঙ্কোচ রাখবেন না কেউ।'

ছেলেগুলো কোনও কথা বলল না। অনিমেষ জানে সিরিল ওদের যা বোঝানোর বুঝিয়েছে। দুটো দলে ভাগ হয়ে ওরা রাস্তা পার হল। বৃষ্টির জল মাথায় জমছে। ভাগ্যিস এখন মেঘ ডাকছে না, কারণ বিদ্যুৎ ঝলসালে অসুবিধেয় পড়তে হত।

চৌমাথায় এসে ওরা পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। পানিরামের বাড়ি দেখা যাচ্ছে: নিঝুম এই রাতে সেখানে একটাও আলো নেই। এই সময় সিটি বাজল। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আচমকা কানের পরদায় স্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে ঢুকে যেতেই অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পাঁচিলটা কাঁধ বরাবর। ওরা সবাই ডিঙিয়ে এ পারে চলে এল। গেটে ভেতর থেকে তালা দেওয়া। একজন একটা ছোট লোহার রডের চাপ দিয়ে তালাটাকে খোলার চেষ্টা করতেই শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ডেকে উঠল ভেতরে। ততক্ষণে তালা খুলে গেছে। ওরা চট করে বাড়ির দেওয়ালের দিকে সরে এল। কুকুরটা তখন প্রবল শব্দে ডেকে যাচ্ছে। একটা মানুষের গলা শোনা গেল। কুকুরটাকে ধমকাচ্ছে।

কিন্তু আরও মরিয়া হয়ে উঠল ওর গলার শব্দ। অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে লোকটা ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকটা দেখতে চেষ্টা করে হাঁকল, 'দারোয়ান, দারোয়ান!'

গেটের ডান দিকে দরজা-বন্ধ একটা ছোট ঘর থেকে উত্তর এল, 'জি সাব।'

'শালা শুয়ারকি বাচ্চা! রাতভোর নিদাতা। দেখো বাহার মে কেয়া হুয়া।'

অনিমেষ দেখল ছোটঘরের দরজাটা খুলে গেল। একটা মাঝবয়সী লোক সন্দেহ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। অনিমেষরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চট করে নজর পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু অনিমেষ চট করে ভেবে নিল, লোকটাকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ওপরের লোকটা তখনও ঝুঁকে আছে বারান্দায়। কুকুরের চিৎকারও কমেনি। গেটের তালা যে ভাঙা হয়েছে দারোয়ান বোধহয় ভাবতে পারেনি কারণ সেটা ফাঁক করা ছিল না। একটু অসতর্ক হয়েই লোকটা ঘুরে দেখার জন্যে এ পাশে এল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ওর খুব অস্বচ্ছন্দ হচ্ছিল, তা ছাড়া রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে উঠে আসার আলসেমিও হয়তো চোখে জড়িয়ে ছিল। অনিমেষরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে লক্ষ করছিল। কাছাকাছি আসতেই সিরিল আচমকা ওর মাথায় আঘাত করল। একটাও শব্দ বের হল না, কাটা কলাগাছের মতো লোকটা মাটির নেতিয়ে পড়ল। ওরা দ্রুত শরীরটাকে কার্নিশের নীচে নিয়ে এল যাতে ওপর থেকে এ ব্যাপারটা দেখা না যায়।

তখনি ওপর থেকে চিৎকার এল, 'দারোয়ান, সব ঠিক হ্যায়?'

কোনও উত্তর না পেয়ে লোকটা খিঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ হারামি, কাঁহা হ্যায় তুম?'

অনিমেষ ইশারায় সবাইকে চুপ করে থাকতে বলে গুটি গুটি করে বারান্দায় উঠে এসে সদর দরজার পাশে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ হাঁকাহাঁকির পর বোধহয় লোকটার মনে সন্দেহ ঢুকল। কুকুরটাকে টানতে টানতে সে ভেতরে ঢুকে গেল। জুলিয়েন অনিমেষের পাশে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা অ্যালার্ট হবার আগে আমাদের ঢোকা উচিত।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। ওরা কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না। ওয়েট করুন।'

ভেতরে তখন অনেকগুলো গলা কথা বলছে। তারপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনিমেষরা ততক্ষণে প্রস্তুত। বিরক্ত গলায় কিছু বলতে বলতে কেউ দরজাটা খুলতেই কুকুরটা তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বারান্দার শেষ প্রান্তে পৌঁছবার আগেই আর্ত চিৎকার করে বেচারাকে শুয়ে পড়তে হল। সিরিলের সঙ্গীদের মধ্যে একজন এত চটপটে হাতে কাজ শেষ করতে পারবে তা অনিমেষও ভাবতে পারেনি। ফলে যে লোকটা দরজা খুলেছিল সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখে

BanglaBoi.org

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অনিমেষ লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পানিরাম কোথায় ?' তিন-চারবার কথা বলার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত লোকটা আঙুল দিয়ে ভেতরটা দেখিয়ে দিল।

সময় নষ্ট করল না অনিমেষরা। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে অন্দরে ঢুকে পড়ল। বেশ বড় বাড়ি। চারপাশের ঘরঘুলোর কিছু মুখ কৌতূহলে বাড়িয়ে হকচকিয়ে গেল।

অনিমেষ চিৎকার করল, 'আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন নইলে এই লোকটিকে মেরে ফেলা হবে।' অস্ত্রটি বের করে লোকটির শরীরে ঠেকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। পিল-পিল করে পাঁচ-ছয়জন নারী পুরুষ জড়োসড়ো হয়ে ঘরের কোনায় এসে দাঁড়াল। সিরিল গিয়ে ঘরগুলো দেখে এল। এসে ঘাড় নাড়ল, কেউ নেই।

ঠিক তখনই একটা গুলির শব্দ হল আর অনিমেষ দেখল ওদের দলের একটি ছেলে ছিটকে পড়ে গেল। অনিমেষ দ্রুত মুখ তুলে একটা মোটা লোককে দেখতে পেল। দুই হাতে বন্দুক নিয়ে আবার টিপ করছে। কিন্তু বোঝার আগেই বিস্ফোরণ ঘটে গেল ওপরে। জুলিয়েনের হাত শূন্য থেকে নেমে আসার আগেই দোতলার কাঠের রেলিং-এর একাংশ খসে গেল, বন্দুকধারী উবু হয়ে বসে আর্তনাদ করতে লাগল।

দুজনকে এদের পাহারায় রেখে অনিমেষরা ওপরে উঠে এল। সিরিল চটপটে হাতে লোকটিকে তুলে ধরল, 'কেয়া পানিরামজি, কেয়া হুয়া ?'

সর্বাঙ্গ রক্ত ঝরছে, হাতের বন্দুক পড়ে গেছে, লোকটা তখনও গোঙাচ্ছে। মরে যাওয়ার মতো আহত হয়নি বোঝা যায়। অনিমেষের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, সে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'গুলি করলেন কেন ?'

'ডাকু-উ-উ।' পানিরাম তখনও কাঁপছিল।

জুলিয়েন বলল, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না। শব্দ পেয়ে লোকজন ছুটে আসতে পারে। চটপট—জলদি!'

বেশিক্ষণ সময় লাগল না দুটো বন্দুক হাতাতে। পানিরামের শোয়ার ঘরের সিন্দুকে টাকার স্তূপটা পাওয়া গেল। দুটো বাজারের থলেতে পুরে নিল সেগুলোকে। সিরিল সোনার গয়নাগুলোর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, নিষেধ করল অনিমেষ, 'ওগুলো নিলে ঝামেলা বাড়বে। তুমি গাড়ির চাবি জোগাড় করো।'

এক লাফে নীচে নেমে গেল সিরিল। অনিমেষ দ্রুত বারান্দায় গিয়ে বাইরের দিকটা দেখল। আশেপাশে লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে এ তল্লাটের মানুষের। আর এখানে থাকা যায় না।

ভেতরের বারান্দায় আসতেই জুলিয়েনের গলা পাওয়া গেল, 'আজ বদলা হল পানিরামবাবু। এতদিনে যে রক্ত শুষেছেন গরিব মানুষের তার হিসেব মেটালেন আজ।' কথাটা শেষ করে ইঙ্গিত করতেই সিরিলের সেই সঙ্গীটি যে কুকুরটাকে ঠাণ্ডা করেছিল তার হাত চলল। অনিমেষ দেখল বসে থাকা বিরাট শরীরটা লাশ হয়ে গেল।

অনিমেষের দিকে তাকিয়ে জুলিয়েন হাসল, 'উপায় ছিল না। শালা আমাদের চিনতে পেরেছিল। বাঁচিয়ে রাখলে বেশি দাম দিতে হত।'

অনিমেষ আবিষ্কার করল এই ছারপোকাটির মৃত্যু চোখের ওপর দেখে তার একটুও খারাপ লাগল না। বরং অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল নার্ভগুলো। চট করে মনে পড়ে গেল নীচের মাটিতে ওদের একজন শুয়ে আছে। ওরা এবার নীচে নেমে এসে ছেলেটির পাশে দাঁড়াল। এক পলকেই বোঝা যায় প্রাণ গুলি লাগা মাত্রই চলে গেছে। বুকের ওপর অনেকটা রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে। জুলিয়েন নিচু গলায় নির্দেশ দিতেই ছেলেরা শরীরটাকে তুলে নিল। ঘরের কোনায় দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে যে ঘর থেকে বের হবে তাকেই পানিরাম বানিয়ে দেব!'

ওরা বারান্দায় এসে দেখল অন্তত জনা পনেরো লোক গেটের বাইরে জমা হয়ে গেছে। দু-একজন গেট ঠেলে ঢুকব ঢুকব করছিল, ওদের দেখে কী করবে বুঝতে পারছে না। যদিও এখানে বেশ অন্ধকার, মুখের আদল পরিষ্কার দেখা যায় না, তবু কোনও সুযোগ নিতে চাইল না অনিমেষ। শূন্যে মুখ করে গুলি ছুড়ল আচমকা। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জটলাটার মধ্যে। কে আগে পালাতে পারে সে চেষ্টা চলল এবার।

BanglaBook.org

পাশের গ্যারেজ থেকে একটা জিপ নিয়ে সিরিল তখন প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, 'দুটো গাড়ি পাওয়া গেল না। একটার আবার ইঞ্জিন খারাপ।'

ওরা সন্তর্পণে মৃত ছেলেটিকে জিপের পেছনের দুই সিটের মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে উঠে বসল এক এক করে। জায়গা কম হচ্ছিল কিন্তু তা নিয়ে কেউ কোনও কথা বলল না। জিপ চলতে আরম্ভ হবার আগে অনিমেষের মনে পড়ে গেল। এক মিনিট দাঁড়াতে বলে সে লাফিয়ে নেমে পকেট থেকে কালো চক বের করে সাদা দেওয়ালের ওপর দ্রুত হাতে লিখল 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' 'গরিব মানুষের শত্রু পানিরামরা সাবধান।'

চটপট লিখে জিপে উঠতেই জুলিয়েন বলল, 'হাতের লেখার প্রমাণ রেখে গেলেন।'

অনিমেষ গম্ভীর গলায় বলল, 'আজ থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যখন তখন সারা শরীর দিয়েই তো প্রমাণ রাখছি।'

গেট পার হবার সময় জুলিয়েন দাঁড়িয়ে ঝোলা থেকে বস্তুটি বের করে পানিরামের বাড়ির ওপর ছুড়ে মারল। প্রচণ্ড শব্দে স্বর্গছেঁড়া কেঁপে উঠতেই ওরা রাস্তায় এসে পড়ল। একটি মানুষকেও কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে না। জিপ ছুটল নাগরাকাটার দিকে। অনিমেষ একটা পা বাইরে রেখে সামনের সিটে কোনওমতে বসে আছে। তার পাশে জুলিয়েন। জুলিয়েনের পায়ের নীচে থলে ভরতি টাকা। পেছনের একটি ছেলের হাতে বন্দুক দুটো।

কেউ কোনও কথা বলছিল না। মুখে কোনও শব্দ কেউ না করলেও প্রত্যেকেই মৃতদেহটির কথা ভাবছিল। যাবার সময় সে সবার মতোই সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়েছিল। এখন তার শরীর নিথর, জিপের মেঝেতে থলের মতোই পড়ে আছে। প্রথম অ্যাকশনেই একটা বড় দাম দিতে হল। অনিমেষ এই কুড়ি-একুশ বছরের ছেলেটিকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু ছেলেটির কথা যত ভাবছিল সে, তত তার ভেতরে ক্ষরণ হচ্ছিল। ওর সঙ্গীরাও এখন চুপচাপ। ডানদিকে বানারহাটকে রেখে ওরা ডায়না নদীর ওপর উঠে আসতেই অনিমেষ সিরিলকে গাড়িটা থামাতে বলল। চুপচাপ সে নীচের নদীটার দিকে তাকাল। অনেকটা জায়গায় চর পড়ে আছে। মাঝখানে সরু ফিতের মতো জলের রেখা। সে ফিরে এসে বলল, 'গাড়িটাকে ব্যাক করে নদীর বেড়ে নিয়ে যাওয়া যায় না?'

'হ্যাঁ, ও পাশে একটা রাস্তা আছে।'

'তাই করুন।'

ওরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সিরিল ধীরে ধীরে গাড়িটা পিছু নিয়ে গেল। অনিমেষ সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাল। সে যা ভেবেছে এরাও কি তাই ভেবেছে! না হলে কী কারণে জিপটাকে নীচে নিয়ে যেতে বলল তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না কেন? আঘাত সব মানুষের ভাবনা এক খাতে বইয়ে দেয়?

ওরা নিঃশব্দে নীচে নেমে এল। বড় বড় বোলডারের পাশ দিয়ে সরু প্যাসেজ দিয়ে জিপটাকে কোনও মেতে নদীর ওপর নিয়ে এল সিরিল। ছেলেটা খুব ভাল গাড়ি চালায়। ওরা সেই আবছা অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে ঠিক ব্রিজের নীচে একটা নরম জায়গা পেল। অনিমেষ দেখল জায়গাটা অনেকটা বালি, পাথর-টাথর বড় একটা নেই।

সিরিল গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'আমরা সবাই একমত তো?'

সবাই জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতেই সিরিল খানিক ইতস্তত করল, 'সোমরার ডেডবডি ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা—।'

জুলিয়েন বলল, 'অসম্ভব। সেটা করলে পুরো দল ধরা পড়ে যাবে।'

অনিমেষ সিরিলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী ইচ্ছে?'

হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সিরিল। সবাই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। অনিমেষ বুঝতে পারছিল এদের অনেকের কান্নাই সিরিল প্রকাশ্যে কাঁদছে। অনেক চেষ্টার পর নিজেকে শান্ত করল সিরিল, 'শুধু আমার কথা শুনে সোমরা বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমি ওর মায়ের সামনে কখনও যেতে পারব না। ঠিক আছে, এখানেই হোক।'

বালি নরম বলে অসুবিধে হল না। ওরা সবাই মিলে হাত চালাল। জিপের মধ্যে একটা ছোট ত্রিপল পাওয়া গেল। গর্তটা ফুট চারেক খুঁড়তে প্রায় দেড় ঘণ্টা খরচ হয়ে গেল। এখন এখানো কোনও শব্দ নেই। নদীর দুধারে জঙ্গল। মাঝে মাঝে এক একটা ভারী লরি ওপরের ব্রিজ দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। আশেপাশে কোনও জনবসতি নেই। ঠিক ব্রিজের নীচে থাকায় কোনও চলন্ত গাড়ির নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। এক সময় খুঁড়তে খুঁড়তে জল বেরিয়ে এল। খোঁড়া বন্ধ করে

BanglaBook.org

জুলিয়েন ছেলেদের বলল কিছু মাঝারি সাইজের বোলডার জড়ো করতে। তারপর গাড়ি থেকে ত্রিপলটা বের করে গর্তের মধ্যে সুন্দর করে বিছিয়ে দিল। ত্রিপলের একটা দিক অনেকখানি বাইরে বের করে রাখল সে।

সিরিল এবার তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে জিপ থেকে সোমরার শরীরটাকে পরম যত্নে বয়ে নিয়ে এল সেখানে। এই পাতলা অন্ধকারকেও বোঝা যাচ্ছিল ছেলেটার মুখ অত্যন্ত স্বাভাবিক যেন গভীর ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখছে সে।

অনিমেষ জানে না এই কালো ছেলেটি রাজনীতি বুঝত কিনা। লেখাপড়া কতদূর শিখেছে, আদৌ শিখেছে কিনা তাও তার জানা নেই। কিন্তু একটা নতুন ভারতবর্ষ তৈরি করার যে স্বপ্ন এখন তাদের চোখে এ তার শরিক ছিল। কিংবা এ সবের কিছুই সে তেমন করে জানত না। বন্ধুর কথায় হয়তো অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু অনিমেষের মনে হল আসন্ন বিপ্লবের ভিত তৈরি করতে সে একটা ইট পাতল।

জুলিয়েনের মাথা ঠিক ছিল। চটপটে হাতে সে ছেলেটির পকেট দেখে নিল। একটা চারমিনারের প্যাকেট, দেশলাই আর গোটা তিনেক টাকা ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বুকের ওপর নেতানো ক্রুশ দেওয়া চেনটাকে সযত্নে খুলে নিয়ে সে সিরিলের হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়ল। তারপর কপালে, দুই কাঁধে হাত ছুঁইয়ে অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষ সঙ্গীদের দিকে এগিয়ে এল, 'কমরেডস। এটা অত্যন্ত বেদনার যে আমাদের একজন সাথি আজ প্রথম অ্যাকশনের দিনেই শহিদ হলেন। আসন্ন বিপ্লবের সূচনায় এই মৃত্যু আমাদের যদিও নিঃসঙ্গ করল কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমাদের উদ্যমকে আরও শক্তিশালী করবে। যা সত্য তা আমাদের মানতেই হবে। আসুন, আমরা সবাই কমরেড সোমরার কাছে শপথ করি, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমরা যেন তাঁর আত্মার অপমান না করি।'

সবাই এসে সোমরাকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসল। সেই নির্জন মধ্যরাতের নদীর চরে শিরশিরে বাতাস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। প্রত্যেকের হাত সোমরার শরীর স্পর্শ করতেই অনিমেষের মনে হল এখনও তাপ আছে মৃতদেহে। অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, 'আপনারা আমার সঙ্গে উচ্চারণ করবেন—যতদিন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস না হচ্ছে ততদিন আমরা বিশ্রাম করব না।'

খুব গম্ভীর বিষণ্ণ কিন্তু দৃঢ় গলায় শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হল। তারপর অত্যন্ত যত্নে সোমরার শরীর গর্তের ভেতরে ত্রিপলের ওপর শুইয়ে দিয়ে ত্রিপলের অন্য প্রান্তটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। সামান্য বালি ছড়িয়ে দিয়ে এক এক করে বোলডারগুলো সাজানো হল শরীরের ওপর। এবার প্রত্যেকে বালি চাপিয়ে দিতে লাগল গর্তে। জুলিয়েন চাপা গলায় বলল, 'কমরেড সোমরা যুগ যুগ জিয়ো।' ওরা সাড়া দিল, 'যুগ যুগ জিয়ো।' 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম—লাল সেলাম, লাল সেলাম।'

'কমরেড সোমার লাল সেলাম—লাল সেলাম, লাল সেলাম।'

সেই রাত্রিরে কতগুলো বুকের গভীর কষ্টের মধ্যে ভীষণ উত্তাপ জন্ম নিচ্ছিল। প্রতিটি শব্দ যেন জ্বলন্ত মশালের মতো ওদের সমস্ত শরীরে সেই তাপ ছড়াচ্ছিল। একসময় যখন সেই গর্তটির কোনও অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না তখন ওরা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

নাগরাকাটা স্টেশনের মাইলখানেক আগেই ওরা জিপটাকে বড় রাস্তা থেকে ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিল। সিরিল চাইছিল ওটাকে জ্বালিয়ে দিতে, কিন্তু জুলিয়েন নিষেধ করল। আগুন জ্বাললেই অনেক দূর থেকে মানুষ আকৃষ্ট হবেই। তা ছাড়া ভোর হয়ে আসছে। নিজেদের অস্তিত্ব সবাইকে জানিয়ে দেওয়া কখনও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো দু-একদিনের মধ্যে জিপটা কারও নজরে পড়তে পারে।

যতটা সম্ভব জিপ থেকে হাতের ছাপ মুখে ফেলা হল। সিরিল ইঞ্জিনের তারগুলো ছিঁড়ে রেখে দিয়ে দাঁত বের করে হাসল। অনেকক্ষণ পরে তাকে স্বাভাবিক চেহারায় দেখে অনিমেষের ভাল লাগল। মুশকিল হল বন্দুক দুটো নিয়ে। ওগুলো প্রকাশ্যে বয়ে নিতে দেখলে অনেকের সন্দেহ হতে পারে। জুলিয়েন পথ বাতলাল। নাগরাকাটায় ঢোকার মুখে ওর পরিচিত এক ডেরায় বন্দুক জমা রেখে যাবে। বিশ্বাসী লোক প্রয়োজনে পেতে অসুবিধে হবে না। টাকাগুলো আপাতত ব্যাগেই থাক।

BanglaBook.org

কিন্তু অনিমেষ এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। ধরা পড়লেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু জুলিয়েন এত টাকা কোথাও রেখে যেতে রাজি নয়। টাকার পরিমাণ কত তাও জানা নেই। এখন গুনে দেখারও সময় নেই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল টাকা নিয়ে জুলিয়েন একাই চলে যাবে। প্রয়োজনটা আপাতত ওর মারফত জানতে পেরেছিল অনিমেষ। মালপত্র কেনার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি হাত বদল হয় ততই মঙ্গল। জুলিয়েন অবশ্য আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে নিল। ঠিক হল নাগরাকাটা থেকে দলটা আপাতত ভেঙে যাবে। ঠিক দশ দিন পরে ফুন্টশিলিং-এ সবাই দেখা করবে। জায়গাটা ঠিক করে নেওয়া হল।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ওরা হাঁটা শুরু করল। নাগরাকাটার মুখে এসে জুলিয়েন অনিমেষের দিকে হাত নাড়ল। তারপর বাঁ দিকে নেমে গেল সঙ্গীকে নিয়ে। ওদের দুজনের হাতে দুটো বন্দুক আর দুটো ব্যাগ। লোকটার সাহস আছে প্রচণ্ড। জঙ্গল ছাড়ার আগে সে প্রস্তাব দিয়েছিল এখন যেহেতু কারও বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই তাই প্রয়োজনের খরচ চালাতে অর্থের প্রয়োজন হবেই। সে ক্ষেত্রে পানিরামের টাকা থেকে প্রত্যেককে একশো করে টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। অনিমেষের এতে সায় ছিল না। সাধারণ ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে যেন ব্যাপারটা। যদিও তার নিজের কাছে সামান্য কিছু অর্থ আছে কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, অন্যান্যদের পকেটে কিছু নাও থাকতে পারে। তবু ওখান থেকে টাকা নেওয়াতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু জুলিয়েন বোঝাল, 'আমরা তো যুদ্ধের জন্যেই টাকাটা নিচ্ছি। যদি শুধু মাত্র টাকার অভাবেই কেউ ধরা পড়ি তা হলে বিপ্লবটা করবে কে? আমরা বিলাসের জন্য এই টাকা নিচ্ছি না। প্রয়োজন মেটাতে নেওয়া, বন্দুকের গুলি কেনার মতোই স্বাভাবিক।'

সেই মতো কিছু টাকা সে সবাইকে দিয়েছিল। ব্যাগের টাকার পরিমাণ দেখে বোঝা গিয়েছিল, যে টাকাটা ওরা খরচের জন্যে নিল তা মূল টাকার দুশো ভাগের এক ভাগও নয়।

সকালে যে ট্রেনটা এল সেটা একদম ফাঁকা। অনিমেষ আর সিরিল অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বসল। সিরিল টিকিট কাটতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে নিষেধ করল অনিমেষ। এই ভোরে কাউন্টারে গেলে রেল কর্মচারীটি মনে রাখবে তাদের। মাত্র দুজন লোক চাদর মুড়ি দিয়ে এক কোনায় ঢুলছিল। অনিমেষ ঠিক করল সামনের কোনও স্টেশনে টিকিট কেটে নেবে। এ সব ট্রেনে চেকার বড় একটা ওঠে না।

জানলার ধারে বসার পর প্রথম ক্লান্তি বোধ করল অনিমেষ। একটা পুরো রাত কীভাবে উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেছে টের পাওয়া যায়নি। এখন শরীরে ভার বোধ হচ্ছে। সিরিল ট্রেনে উঠেই একটা বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এর মধ্যেই তার ঘুমন্ত শরীর থেকে মৃদু নিশ্বাস বের হচ্ছে। মুখ শিশুর মতো শান্ত। একে দেখলে কে বলবে যে গতরাতে এক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়েছে। কিন্তু ক্লান্তিবোধ করলেও অনিমেষের ঘুম আসছিল না। জানলার বাইরে পৃথিবীটা একটু একটু করে ফরসা হয়ে কচি চেহারা নিয়েছে। নরম কলাপাতার মতো রোদ জঙ্গলের শরীরে। দুপাশে গাছ-গাছালি আর চা বাগান রেখে ট্রেন ছুটছিল হাসিমারার দিকে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। আজ অনিমেষরা যেমন সলতে পাকানোর কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতবর্ষের সবদিকেই এরকম ছোট ছোট দল এইরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে। এ ভাবে কতগুলো রক্তচোষা বাদুড়কে সরিয়ে দিতে পারলেই ব্যবসায়ীরা ভয় পাবে। আর নির্যাতিত জনসাধারণ বুঝতে পারবে তারা ওদের বন্ধু। অবশ্যই প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে তারা। এইসব ছোট ছোট মশালগুলো একসময় বিরাট অগ্নিকুণ্ডের চেহারা নেবে সারা দেশ জুড়ে। নির্যাতিত মানুষের সেই পথে নেমে আসা স্রোতে ভেসে যাবে বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদীর দুর্গ। এই সময় যদি কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাদের সঙ্গে আসত তা হলে বোধহয় ব্যাপারটা আরও দ্রুততর হত। কিন্তু অনিমেষ মাথা নাড়ল, এই ভাল, জনসাধারণ এদের চেহারাটা আরও ভাল করে চিনুক। তা হলে তাদের শক্তি আরও জোরদার হবে।

আজ এই মুহূর্তে স্বর্গছেঁড়ায় কী হচ্ছে অনুমান করতে চাইল সে। ওই ছোট্ট শান্ত জায়গার মানুষগুলো তাদের স্মৃতিতেও এমন ঘটনার কথা খুঁজে পাবে না। পানিরামের মৃত্যুর খবর পেয়ে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে, চা বাগানে যে সব গরিব শ্রমিক গলায় ফাঁস পরেছিল তারা নিশ্চয়। স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস ফেলছে। অনুমান করা যায় এখন পুলিশ ছুটে গিয়েছে বানারহাট থেকে। দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করেছে পানিরামের বাড়ির সামনে। ডাকাতির গল্প মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে লেখাগুলোও পড়ছে লোকে। যদি কেউ তাদের চিনে ফেলে পরোয়া নেই। অন্তত ওই

BanglaBook.org

লেখাগুলো স্বর্গছেঁড়ার গরিব কুলি-মজুরদের মনে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। তারা যদি বুঝতে পারে। অনিমেষরা ওদের ভাই তা হলে আর কীসের ভয়!

একচল্লিশ

হাসিমারায় বসে কলকাতার খবর পাওয়া মুশকিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলের খবর আসতে লাগল। সমস্ত দেশ একটু একটু করে নকশালবাড়ি হয়ে উঠছে। বীরভূম মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা তো বটেই, খোদ কলকাতায় এখন পুলিশের সঙ্গে সংগ্রাম চলছে। বেলঘরিয়া যাদবপুর বেলেঘাটার কিছু কিছু জায়গা প্রায় মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। রেডিয়ো শুনলে অবশ্য মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই সব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। যে খবরটা সবচেয়ে আনন্দের তা হল সাধারণ মানুষ নকশালপন্থীদের জন্যে মৌন সমর্থন রাখছে। ঘরছাড়া ছেলেগুলোকে আশ্রয় বা খাবার দেওয়ার ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্রয়ের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

সাধারণ মানুষ এখনও সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে যোগ দেয়নি। কিন্তু এ ভাবে যদি এগিয়ে যায় তা হলে তাদের দরজা খুলবেই। স্বর্গছেঁড়ায় এর মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে বলে খবর এসেছে। পুলিশ নাকি পানিরামের হত্যার বদলা নিতে ওই অঞ্চলে চিরুনি-অপারেশন চালিয়েছে। ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছে। কিন্তু ওদের কাউকে পুলিশ ধরতে পারেনি। তবে খুঁটিমারির জঙ্গলে ডেরাও পুলিশ আবিষ্কার করেছে। এই মুহূর্তে অনিমেষ, সিরিল এবং জুলিয়েনকে পুলিশ গরুখোঁজা খুঁজছে। স্বর্গছেঁড়ার ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে গেছে খুব কিন্তু সাধারণ মানুষ যে স্বস্তি পেয়েছে তা হাটেবাজারে গেলেই বোঝা যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, অনিমেষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করার পর পুলিশ চা-বাগানে গিয়েছিল। মহীতোষকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কী কথাবার্তা হয়েছে অনিমেষ খবর পায়নি তবে থানা থেকে ফিরে এসে মহীতোষ লম্বা ছুটি নিয়ে ছোটমাকে সঙ্গে করে জলপাইগুড়িতে চলে গেছেন। কথাটা শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অনিমেষ। এত কাছাকাছি দীর্ঘকাল থেকেও সে বাবার সঙ্গে দেখা করেনি। করেনি যাতে ওঁরা না জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হল। অনিমেষ এখানেই ছিল এবং পানিরাম-হত্যার সঙ্গে জড়িত জেনে বাবার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? খুবই সামান্য সময়, অনিমেষ তারপর ব্যাপারটাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করল।

নদীর ওপর তাঁবু পেতে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। অনিমেষের আপাতত আশ্রয় এখানেই। ওর বয়সী যে ছেলেটি কন্ট্রাকটরের অধীনে কাজ করছে তার সঙ্গে দলের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়েছিল কিছুদিন আগে। আশ্রয় চাইতে সে একটুও আপত্তি করেনি। শুধু বলেছিল, 'সহজ হয়ে ঘোরাফেরা করুন। নদীর বেডে পুলিশ আসবে না। আমি বলব আপনি আমার মাসতুতো ভাই'। সিরিলকে সেই কাজে লাগিয়েছিল। কুলিরা মাথায় করে যে পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার তদারকির কাজ। ফলে এখানে এসে আর সবার সামনে সিরিলের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। যা কিছু খবর ওই ছেলেটির মাধ্যমেই পাচ্ছে অনিমেষ। একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছেলেটির বুকে উত্তাপ আছে, নাম করুণাসিন্ধু।

তবু এর মধ্যে একদিন শিলিগুড়িতে গেল অনিমেষ। করুণাসিন্ধু নিষেধ করেছিল, 'আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে যখন তখন যাওয়া ঠিক হবে না।' কিন্তু এ ভাবে হাত পা গুটিয়ে নদীর ওপর তাঁবুর ভেতরে ইঁদুরের মতো লুকিয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। পরবর্তী বিপ্লবকর্মের ব্যাপারে কথা বলা দরকার। সমচিন্তাযুক্ত দলগুলো এখন একত্রিত হয়েছে কি না, আন্দোলনের নেতৃত্ব এখন কোনও যোগ্য হাতে গিয়েছে কি না, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে একটা সুষ্ঠু ধারণায় আসা হয়েছে কি না —এইসব জানতে আগ্রহ হচ্ছিল তার। একজন পানিরামকে হত্যা করে সেই তল্লাটের কিছু মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেখানেই শেষ কথা নয়। আশেপাশে তাকালে মনে হয় না, সাধারণ মানুষ তাদের বিপ্লব নিয়ে তেমন ভাবছে। এ-কথা ঠিক, একদিনে সেটা সম্ভবও নয় কিন্তু তার আয়োজন করা দরকার।

আকাশে মেঘ করেছিল। তাঁবুতে বসে চিঠি লেখা শেষ করল অনিমেষ। নাম সই করল না, কেউ চিঠিটা পড়লে রাজনীতির গন্ধ পাবে না। কিন্তু যাকে চিঠি লিখছে সে বুঝবে। মাধবীলতাকে লেখা এটি তার চতুর্থ চিঠি। শান্তি নিকেতন থেকে ফিরে আসার পর সে একতরফা চিঠি লিখে যাচ্ছে। মাধবীলতার কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার উপায় নেই। মাধবীলতাকে নিজের আস্তানার ঠিকানা

BanglaBook.org

দেওয়ারও উপায় নেই। অনিমেষ চিঠিটা ভাঁজ করে ফেলার আগে আর একবার পড়ে নিল। এবার সে সম্বোধন করেনি, সরাসরি শুরু, 'তুমি কেমন আছ জানি না, তবে আমার জন্যে তুমি ভাল থাকবেই এটা জানি। কেমন স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে তবু তোমার কাছেই তো আমি স্বার্থপর হতে পারি ?

'ছটফট করছি কাজ শুরু করতে কিন্তু কিছুদিন হল চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় দেখছি না। এ যে কী যন্ত্রণা তা তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমরা যা করতে চাইছি তা হবেই। পৃথিবীটা পালটে যাবেই। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তা করতে হবেই।

'শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর বেশি করে তোমার কথা মনে পড়ছে। চোখ বন্ধ করলেই তোমার মুখের প্রতিটি টান দেখতে পাই। আইন কিংবা ধর্ম কী বলবে জানি না কিন্তু আমি চিৎকার করে বলতে পারি তুমি আমার স্ত্রী।

'কিন্তু আমি তোমাকে আমার সঙ্গে কাজ করতে বললাম না কেন ? কেন তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখলাম ? যে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে। হয়তো একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের এটা অপরাধ। যে কমিউনিজমে বিশ্বাস করে তার কর্তব্য আর একজনকে সেই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু আমি যখন বুঝলাম তুমি আমার এই 'আমি'টাকেই গ্রহণ করেছ, আমার আর সব কাজকর্মে তুমি বাধাও দেবে না, মুখ ফুটেও কিছু বলবে না তখন তোমার ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাইনি। শুনেছি বিখ্যাত গুরুদেবদের শিষ্যরা নাকি বন্ধুবান্ধবদের গুরুভাই করতে ব্যগ্র হয়। সেরকম করতে চাইনি আমি।

'কিন্তু তোমার সমস্ত ভালমন্দের জন্যে আমি নিজের কাছে দায়বদ্ধ অথচ এই মুহূর্তে যদি তুমি অসুস্থ হও তবু আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারব না। এ যে কী যন্ত্রণা তা কী করে বোঝাই।

'কবে দেখা হবে জানি না, আদৌ দেখা হবে কি না তাও জানি না, কিন্তু আমি প্রতিমুহূর্তে তোমার স্পর্শ পাচ্ছি।'

ইনল্যান্ড লেটারের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে মাধবীলতার নাম ঠিকানা লিখে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল করুণাসিন্ধু আসছে। এখন সকাল। চারদিকে ফিনফিনে রোদের ছড়াছড়ি। নদীর ওপর শুকনো নুড়িতে অবশ্য এখনও দুপাশের পাহাড়ের ছায়া মাখামাখি। কিন্তু মুখ তুললেই সোনাগলা রোদ্দুর। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। চওড়া নদীর দুধারে গাছে মোড়া বড় পাহাড়। নদীর জল এখন একপাশ দিয়ে ছোট্ট শরীর নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কুলিরা এখনও কাজে নামেনি।

করুণাসিন্ধু কাছে এসে বলল। 'কপাল ভাল বলতে হবে।'

'কেন ?'

'আপনি শিলিগুড়িতে যাবেনই।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তৈরি হয়ে নিন। আধঘন্টার মধ্যে আমাদের একটা জিপ ছাড়ছে। সন্ধে নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসবে। আমি একটু গায়ে পড়ে কাজটার দায়িত্ব নিলাম। অতএব আপনি সঙ্গে যেতে পারেন।'

কথাটা শুনে অনিমেষ স্বস্তি পেল। বারোয়ারি ট্রেন কিংবা বাসে যাওয়ার চেয়ে প্রাইভেট জিপে যাওয়া অনেক নিরাপদ এবং সময়ও কম লাগবে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে করুণাসিন্ধু বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'বলুন।'

'দাড়িটা কেটে ফেলুন।'

চমকে নিজের গালে হাত দিল অনিমেষ, 'সে কী ?'

করুণাসিন্ধু হাসল, 'লোকে নিজেকে লুকোতে দাড়ি রাখে। তাই দাড়ি দেখলেই অনেকে সন্দেহের চোখে তাকায় আজকাল। তা ছাড়া আপনাকে যারা চেনে তারা দাড়ি দেখেই অভ্যস্ত। শিলিগুড়িতে যখন যাচ্ছেনই তখন একটু সতর্ক হয়ে থাকা ভাল।'

অনিমেষ ইতস্তত করছিল, 'এ কত বছরের দাড়ি জানেন ? আমি জীবনে কখনও গালে খুর লাগাইনি।'

করুণাসিন্ধু ঠাট্টার গলায় বলল, 'এত হাজার বছরের জঞ্জাল যখন সরাতে নেমেছেন তখন আর সামান্য দাড়িতে মায়া করছেন কেন ?'

কথাটা শুনে অনিমেষের ভ্রূ কুঁচকে গেল দেখে গলা পালটিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমি কিছু মিন করতে চাইনি।'

BanglaBook.org

করুণাসিন্ধুর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ব্যবহার করতে অনিমেষকে বেশ পরিশ্রম করতে হল। গালের কয়েক জায়গায় কেটেকুটে গেল। কিন্তু মুখ মোছার পর সে নিজেকে আয়নায় দেখে নিজেই চিনতে পারছিল না। মসৃণ গাল একটি সুশ্রী মোলায়েম তরুণকে হাজির করছিল। সিনেমার পোস্টারে এরকম মুখ দেখা যায়। করুণাসিন্ধু ক্যাম্পখাটে বসে ওর পরিবর্তন লক্ষ করছিল, এবার বলল, 'অ্যাদ্দিন আপনি দাড়ির আড়ালে বয়সটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবার এখন ধরা পড়ে গেলেন।'

অনিমেষ হাসল কিন্তু প্রতিবাদ করল না। তার চেয়ে বয়সে বড় অনেকেই তাকে দাদা এবং আপনি বলে থাকে। সেটা যে দাড়ির জন্যেই বোঝা যেত। কিন্তু কারও ভুল ভাঙিয়ে দিত না সে। যে যা বলে খুশি হয় তাই হতে দেওয়া উচিত। করুণাসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'চলুন'।

জিপে ওরা চারজন। বাড়তি দুজনের একজন করুণাসিন্ধুর মালিকের ছেলে, অন্যজন ড্রাইভার। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই ছেলেটিকে লক্ষ করছিল অনিমেষ। বছর কুড়ি বয়স হবে, বেশ মোটাসোটা। করুণাসিন্ধু ওর কথা বলে রেখেছিল তাই কোনও প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়নি। হাসিমারা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ছেলেটি বলল, 'বাবা কি আজই ফিরতে বললেন ?'

করুণাসিন্ধু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ধ্যুৎ, এতদিন বাদে শিলিগুড়ি গিয়ে রাত না কাটিয়ে ফিরে আসা যায় ?'

'আপনি আজ ফিরবেন না ?'

'আমি মানে আমরা সবাই। বাবাকে বলব গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল!'

'কেন ? কোনও কাজ আছে ওখানে ?'

'কাজ ? ধ্যুৎ, আপনি একদম বেরসিক। আপনি এর আগে শিলিগুড়িতে গিয়েছেন ?' প্রশ্নটা অনিমেষকে উদ্দেশ করে।

সঠিক উত্তর দিল সে, 'না। মানে থাকার জন্যে যাইনি।'

নিচু হয়ে ছেলেটি একটা ব্যাগ খুলে বোতল বের করল। ভুটানের সামচিতে তৈরি শস্তা দামের রাম। তারপর করুণাসিন্ধুকে বলল, 'আপনি তো মাল খান না ?'

'না স্যার।' করুণাসিন্ধু দ্রুত ঘাড় নাড়ল।

'আপনি ?'

'গোঁড়ামি নেই কিছু তবে এখন খাব না।' অনিমেষ জানাল।

'কেন ?'

'সকালবেলায় চা-ই ভাল লাগে।'

ছেলেটি আর কথা বলল না। ব্যাগ থেকেই গেলাস আর জল বের হল। প্রথম এক চুমুকে শেষ করে হাসল, 'আজ মশাই অনেকদিন বাদে স্বাধীনতার আলো দেখেছি। শালা বুড়ো শকুনটা মদ ছুঁতে দেয় না আমাকে। অথচ সতেরো বছর বয়স থেকে মালাবৃত হয়ে আছি। তখন থেকে সাইটগুলোতে আমি যেতাম একা একা। তা একবার রাত্তিরে শকুনটা গিয়ে হাজির। আমরা মাল খেয়ে বোতলগুলো একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিতাম। শকুন সেটায় ঝুঁকে দেখল প্রায় বুজে গেছে বোতলে। ব্যাস, আমার স্বাধীনতা চৌপাট হয়ে গেল। আজ অনেকদিন পর ফিফটিনথ আগস্ট হল।'

করুণাসিন্ধু বলল, 'কিন্তু কাজটা যদি না হয়!'

'সেজন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করবেন।'

এরকম একটি বাচ্চা ছেলের মুখে এমন পাকা পাকা কথা শুনতে শুনতে অনিমেষের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবে ছেলে বেশ তৈরি। এখন গেলাস হাতে ধরে রেখেছে, বেশ সময়ের ব্যবধানে চুমুক দিচ্ছে। অনিমেষ বাইরে তাকাল। চা বাগান সবুজ গালচের মতো দিগন্তে ছড়ানো। মাঝখানের শেড-ট্রিগুলোয় পাখির ঝাঁক। খুব স্পিডে গাড়ি ছুটছে, রাস্তা ফাঁকা। একসময় নীরসাড়া ছাড়িয়ে স্বর্গছেঁড়ার কাছে এসে গেল ওরা। করুণাসিন্ধু ওর দিকে তাকাতেই সে একটু পেছনে সরে বসল। বলা যায় না কিছু, যদি কারও নজর খুব তীক্ষ্ণ হয় তা হলে মুশকিল।

হঠাৎ ছেলেটি বলল, 'আপনি কী করেন মশাই ?'

করুণাসিন্ধু বলল, 'পড়াশুনা করে। কলকাতায়। এখানে বেড়াতে এসেছে।'

ছেলেটি বলল, 'কী হবে পড়াশুনা করে ? শালা পরের গোলামি করে করে জাতটা ডুবে গেল। ব্যবসা করুন, মাল কামান। শকুনকে দেখছেন না ? ক্লাশ থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল বলে শুনেছি।'

অনিমেষ বলল, 'শকুন কে ?'

BanglaBook.org

'যার গাড়িতে আপনি চড়েছেন, মাই ফাদার। সব সময় ভাগাড়ে নজর। যতদূরেই থাক কিছুতেই অ্যাভয়েড করতে পারি না। দাঁড়ান, দাঁড়ান, এই গাড়ি থামা তো।' ছেলেটি ব্যগ্র হয়ে বাইরে তাকাল।

অনিমেষ গুটিয়ে গেল। ওরা এখন স্বর্গছেঁড়ার চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। পকেট থেকে টাকা বের করে ছেলেটি ড্রাইভারকে দিল, 'নায়ারের হোটেলে যা, পাঁচটা রামের বোতল আনবি।'

ড্রাইভার ওর বাপের বয়সী কিন্তু স্বচ্ছন্দে তুই তোকারি করছে সে। টাকা নিয়ে চলে গেলে ছেলেটি বলল, 'যান, আপনারা চটপট চা খেয়ে নিন। সকাল হলে বাঙালি ছাগলের মতো চা চা করে ডাকে, হ্যা হ্যা।'

অনিমেষের ইচ্ছা করছিল ঠাস করে একটা চড় মারে ছেলেটার গালে। ওর শরীর শক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু করুণাসিন্ধু ওর হাত ধরল, 'না, একেবারে শিলিগুড়িতে গিয়েই খাব।' ছেলেটি সামনে বসে থাকায় ওদের দেখতে পাচ্ছিল না। করুণাসিন্ধু হাত ছেড়ে দেবার আগে চোখ টিপল তাকে।

অনিমেষ দেখল চৌমাথা একদম নির্জন। দোকানপাট কিছু কিছু খুলেছে বটে কিন্তু রোজ সকালকার স্বাভাবিক ভিড় নেই। একটু বাদেই ড্রাইভার ফিরে এল শূন্য হাতে, 'নেই মিলা ছোটোসাব।'

'নেই মিলা? কিঁউ?' খিঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'নায়ার বোলতা থা পুলিশ বহুত ঝামেলা কিয়া। ইঁহা এক আদমি খুন হুয়া আউর উসি বারে মে পুলিশ বহুত ঝামেলা কিয়া। তিন চার আদমিকো আরেস্ট কিয়া। নায়ারকো বহুৎ তংক্‌ কিয়া।'

দুটো কাঁধ নাচাল ছেলেটি বিরক্তিতে। তারপর বলল, 'নায়ারকে আমার নাম বলেছিলি?'

'হাঁ সাব।'

ঠিক তখনি নায়ারকে দেখতে পেল অনিমেষ। নিরীহ মুখ করে বিরাট শরীর নিয়ে এদিকে হেঁটে আসছে। অনিমেষ আর একটু মুখ ঘুরিয়ে বসল। ছেলেটার গলা শোনা গেল, 'কী মশাই, মেরে ফেলবেন নাকি?'

'আর বলবেন না স্যার, পুলিশ আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। পানিরাম খুন হয়ে গেছে জানেন তো?'

'পানিরামবাবু?'

'হ্যাঁ। ক'দিন আগে রাত্রে ডাকাতি হয়। সাধারণ ডাকাতি নয়।' নায়ারের গলা নীচে নেমে এল, 'নকশাল। মাল লুট করেছে আর পুলিশ তার বদলা নিচ্ছে আমাদের ওপর। এখানকার ক'টা নিরীহ ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'নকশাল! সে তো কলকাতায় হচ্ছে শুনেছি, এখানে এল কোত্থেকে?'

'তলে তলে ছড়িয়ে পড়েছে। দু' একজনের নাম শোনা যাচ্ছে। এখানকার চা-বাগানের এক বাবুর ছেলে নাকি ওদের মধ্যে আছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না স্যার, ছেলেটাকে আমি চিনি, খুব শান্ত ছিল।'

'নকশাল-ফকশাল না, সব মাল কামানোর ধান্দা।'

'না স্যার। ব্যাপারটা লাইট না, একটু সাবধানে থাকবেন।'

'সাবধানে থাকব কেন?'

'ওরা লিখে গেছে বড় ব্যবসায়ীদের খুন করবে।'

'কিন্তু এখনই তো আপনি আমাকে খুন করছেন। একটা পাঁইট হবে না?'

'কোনওরকমে একটাই ম্যানেজ করে এনেছি স্যার।'

'বেঁচে থাকুন, বেঁচে থাকুন।' ছেলেটির গলায় হাসি গলছে, 'এতদিন বাদে স্বাধীনতা পেলাম আর শুকনো থাকব এতটা পথ?'

টাকা দিয়ে জিপ চলা শুরু করল। চোখের ওপর স্বর্গছেঁড়া মিলিয়ে যাচ্ছে। ডানদিকে চা-বাগানের কোয়ার্টার্সগুলো দেখা যাচ্ছে। অনিমেষ ওর বাড়িটার দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ, বারান্দায় একটা নেড়ি কুকুর শুয়ে আছে। কেমন খাঁ-খাঁ করছে জায়গাটা।

বোতল খুলতে খুলতে ছেলেটা বলল, 'এই আর এক নকশা শুরু হয়েছে মশাই, নকশাল। এল গেল কত শাল এখন দেখি নকশাল। মাল গোটানোর ধান্দা। সব শালা সি আই এ-র কারবার।'

করুণাসিন্ধু অনিমেষের হাত ধরল, 'সি আই এ?'

BanglaBook.org

'আমেরিকার চর মশাই। এইসব করে দেশে একটা ঝামেলা ক্রিয়েট করে ওরা। পৃথিবীর সব দেশেই নাকি এইরকম করে। কাল রাত্রে শকুনকে বলছিল হাসিমারার ওসি।' ছেলেটি বলল।

'ওসি এসেছিল নাকি ?'

'হ্যাঁ। শকুনকে বলতে এসেছিল কোনও উটকো লোককে যেন কাজে নেওয়া না হয়। শকুনের বন্দুকটা থানায় জমা দিতে বলছিল।'

'কেন ?'

'তেনারা নাকি বন্দুক ছিনতাই করে দেশে বিপ্লব করবেন। পেছনে বিছুটি পাতা ঘষে দিতে হয় হারামিদের।' শেষের কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

অনিমেষ খুব কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা শুনলে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল হয়। কিন্তু এখানে কিছু করতে গেলে পুরো ঝক্কিটা করুণাসিন্ধুর ঘাড়ে পড়বে। বেচারা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে তাদের সাহায্য করছে, ওকে বিপদে ফেলে লাভ নেই।

জলপাইগুড়ি শহর বাঁ পাশে রেখে ওরা শিলিগুড়ির পথ ধরল। যেতে যেতে অনিমেষের চোখে লেখাগুলো পড়ছিল। খুবই অযত্নে কিন্তু যেখানেই জায়গা পাওয়া গেছে সেখানেই এদিকের ছেলেরা লিখেছে, 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম। নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।'

অর্থাৎ এদিকে সংগঠন খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা খুব ভাল কথা, বেশ আশার কথা।

শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছে অনিমেষ করুণাসিন্ধুর কাছে বিদায় নিল। ঠিক হল বিকেল চারটের সময় স্টেট বাসের টার্মিনাসের সামনে সে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে। সামনের সিটে ছেলেটা তখন প্রায় আউট কিন্তু তবু তার তাল ঠিক আছে। বলল, 'আজ বিকেল নয়, কাল সকাল আটটায় দেখা হবে। আজ আমরা ফিরছি না।'

করুণাসিন্ধু পেছন থেকে চোখ টিপল। ছেলেটার কথায় গুরুত্ব দিতে নিষেধ করল সে। অর্থাৎ আজই ফিরে যেতে হবে। জিপ চলে গেলে অনিমেষ হাঁটা শুরু করল। সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই, কেমন হালকা লাগছে তাই। শিলিগুড়ির সব রাস্তাঘাট সে চেনে না। কিন্তু মোটামুটি একটা আন্দাজ রেখে সে এগোচ্ছিল। দুপাশের বাড়ির দেওয়ালগুলোয় আন্দোলনের নানান শ্লোগান লেখা। অথচ লোকজন যে সেগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ছে এমন দৃশ্য তার চোখে পড়ল না। হয়তো দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সবাই। কিন্তু কিছুদূর যেতে যেতে আর এক ধরনের পোস্টার চোখে পড়ল অনিমেষের: 'হঠকারী দূর হঠো', 'সি আই এ-র দালাল নকশাল নিপাত যাক্', 'দেওয়ালে লিখে বিপ্লব হয় না হবে না।' যারা এই শ্লোগান লিখেছে তারা নিজেদের অস্তিত্ব লুকোয়নি। চোয়াল শক্ত হল অনিমেষের। কংগ্রেস থেকে এইসব কথা লিখলে তার একটা মানে বোঝা যেত কিন্তু। সংশোধনবাদের শীর্ষবিন্দুতে না পৌঁছালে এইরকম বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিরোধ শুরু হচ্ছে এবং তা হচ্ছে আর একটি মার্কসবাদীদের সঙ্গেই। চমৎকার!

রাস্তার পাশে ডাকবাক্সে মাধবীলতাকে লেখা চিঠি ফেলে বারীনদার দোকানের কাছাকাছি এসে অনিমেষ দাঁড়াল। মার্কেটের ভেতরে চট করে ঢুকতে রাজি নয়। ওখানে পরিস্থিতিটা কেমন তা না জানলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। সে রাস্তার দুপাশে তাকাল। খুবই স্বাভাবিক জীবন। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অনিমেষ। যদি কোনও পরিচিত মুখ চোখে পড়ে তা হলে ভাল হয়। তারপর যেন দোকান খুঁজছে এমন ভঙ্গিতে মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটু এগোতেই বারীনদার দোকান নজরে এল। বন্ধ। ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। কী ব্যাপার ? এত বেলা পর্যন্ত তো বারীনদার দোকান বন্ধ থাকার কথা নয়। কিছু হয়ে গেল নাকি ? পুলিশ এখানে হানা দিয়েছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, বারীনদার বাড়িতে যাওয়া উচিত হবে না। ওদের যে আড্ডায় খবরা-খবর পাওয়ার জন্য দেখা করতে যাওয়ার কথা সেখানে এখন কী অবস্থা কে জানে! এর আগে যতবার সে এসেছে এই বারীনদার মাধ্যমেই কাজ হয়েছে।

ভেতরে ভেতরে একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল অনিমেষ। কী করবে বুঝে ওঠার আগেই সে ছেলেটাকে দেখতে পেল। রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটু আলো দেখা গেল এই ভঙ্গিতে অনিমেষ পা চালাল। ছেলেটি বোধহয় অনেক আগে থেকেই তাকে লক্ষ করছিল কারণ অনিমেষ এগোনো মাত্রই সে অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। দূরত্ব কমতে দিচ্ছে না অথচ হাঁটাচলায় ব্যস্ততাও দেখাচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনিমেষও আর ব্যস্ত হল না।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাছে এসে ছেলেটা দাঁড়াল। লেবেল ক্রসিং বন্ধ। সার দিয়ে দুপাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ভিড়-ভাট্টায় একাকার। অনিমেষ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার ?'

BanglaBook.org

'খুব খারাপ। বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে।'
'সে তো বুঝলাম কিন্তু হয়েছে কী?'
'দাদাকে শুইয়ে দিয়েছে ওরা।'
'খুলে বলো।'
বারীনদা মার খেয়েছে জানতে পেরে মাথা গরম হয়ে গেল অনিমেষের। সে ছেলেটিকে নিয়ে প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া প্লাটফর্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা এককালে রমরমা ছিল। এখন স্টেশন হিসেবে এর কোনও গুরুত্ব নেই। ফলে লোকজন চোখে পড়ে না।
ছেলেটি বলল, 'পার্টির বাবুরা খুব শাসিয়ে গিয়েছিল দাদাকে। নকশালদের সঙ্গে নাকি দাদা যোগাযোগ রাখে। দাদা অস্বীকার করেছিল কিন্তু ওরা বিশ্বাস করেনি। তারপর পুলিশ এসে একদিন খুব জেরা-টেরা করে গেল। আমি ভাবলাম আর দোকানে আড্ডা বসবে না। কিন্তু কোথায় কী, ওই ছেলেগুলোর আসা বন্ধ হল না। শেষে এই গতরাতে ওরা এসে হামলা করল, বোমা মারল আর দাদাকে দোকান থেকে বের করে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। বলে গেছে দোকান যেন খোলা না হয় আর।'
'ওদের চেনো?'
'হ্যাঁ, পার্টির বাবুরা।'
'বারীনদা এখন কোথায়?'
'বাড়িতেই। সকালে আমাকে পাঠাল হালচাল দেখতে। আমি এসে আপনাকে দেখতে পেলাম। এখন যে কী হবে বুঝতে পারছি না।'
অনিমেষ আর সময় নষ্ট করল না। ছেলেটিকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে একটা রিকশা নিয়ে সটান বারীনদার বাড়ির দিকে রওনা হল। বারীনদার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করা দরকার। ওখানে গেলে বিপদ হবে কি না সে ভাবনা এখন মাথা থেকে উড়ে গেছে।
এক ডাকেই সাড়া পাওয়া গেল। জানলা দিয়ে শব্দ ভেসে এল, 'কে?'
'আমি অনিমেষ।'
কয়েক মুহূর্ত, বারীনদার মা দরজা খুললেন। একটু অচেনার ভাব কিন্তু সেটা খুব দ্রুত কেটে গেল, 'ছেলেকে মারল কেন ওরা?'
'আমি জানি না।' অনিমেষ মাথা নিচু করল।
'আমি ওকে জানি। ও তো কোনও দোষ করেনি, তবে মারল কেন?' বৃদ্ধার গলা এখন থমথম করছে। ঠিক সেইসময় অনিমেষ বারীনদার গলা শুনতে পেল, 'ওকে ভেতরে আসতে দাও মা।'
খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই বৃদ্ধা একপাশে সরে দাঁড়ালেন। অনিমেষ বারীনদার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল। সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ, বারীনদা শুয়ে আছেন। চোখ নাক এবং ঠোঁট ছাড়া মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওকে দেখা মাত্র বললেন, 'অনেকদিন পর রেস্ট নিচ্ছি ভাই। এ ভাবে শুয়ে থাকা তো হয় না।'
বারীনদাকে যারা আঘাত করেছে তাদের অনিমেষ চেনে না কিন্তু এই মুহূর্তে তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। সে এগিয়ে যেতে বারীনদা বিছানার একটা পাশ দেখিয়ে বললেন, 'বসো ভাই।'
অনিমেষ বুঝতে পারল বারীনদার নড়াচড়া করতেই অসুবিধে হচ্ছে। সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল?'
'ইংরেজরা বলে না— এ সবই খেলার একটা অঙ্গ— তাই। জলে নামব কিন্তু বেণী ভেজাব না, তা আর ক'দিন চলে। কিন্তু তুমি খবর পেলে কী করে! তোমার তো এখন হাসিমারায় থাকার কথা।'
অনিমেষ অবাক হল, 'হাসিমারার কথা আপনি জানেন?'
'জেনেছি।'
অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। সে প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'আপনার দোকানে গিয়ে দেখলাম সেটা বন্ধ। বেরিয়ে এসে আপনার অ্যাসিস্টেন্টের দেখা পেলাম।'
'তুমি দোকান ঘুরে এসেছ?' হঠাৎ বারীনদা উত্তেজিত হলেন।
'হ্যাঁ, কেন?'
'খুব অন্যায় করেছ, তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'
'আমি বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

'আঃ, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার দোকানের ওপর ওদের নজর আছে। এ বাড়ির মুখে গলিতেও ওরা আছে। তুমি এখান থেকে যখন বেরোবে তখন সতর্ক হয়ে বেরিয়ো।' বারীনদা যেন হাল ছেড়ে দিলেন।

'আপনি কি আমাকে খুলে বলতে চাইছেন না?'

'অনিমেষ, এ সব নিয়ে কম চিন্তা করাই ভাল। তবু যখন জানতে চাইছ বলছি। কিছুদিন হল সি পি এম নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছে। এরা সি আই এ-র চর, বিদেশি টাকায় গোলমাল করতে চাইছে, এইসব প্রচার ছিলই। এখন পাড়া দখল নিয়ে বোমাবাজি শুরু হয়েছে। এমনকী কোথায় নকশাল অ্যাকশন করবে তাও আগেভাগে পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে যাচ্ছে। তুমি জানো আমার দোকানে এখানকার গল্পলিখিয়েরা আড্ডা মারে। তারা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বাইরের কেউ জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা এসে আমাকে শাসিয়ে গেল। পরদিনই এল পুলিশ। ওরা কী করে খবর পেল তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দল থেকেই খবর বেরিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে উলটোপালটা বোঝাতে পারলেও ওদের বোঝাতে পারছিলাম না। কারণ ওরা বুঝতে পারছে যে অ্যাদ্দিন জনসাধারণের সামনে ওদের যে চেহারাটা ছিল তা তোমরা কাগুজে বাঘে পরিণত করে দিয়েছ। নিজের অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্যে ওরা তাই মরিয়া হয়ে পড়েছে।' বারীনদা নিশ্বাস ফেলল। সামান্য সময় নিল দম নেবার জন্যে। অনিমেষ চুপচাপ মানুষটিকে দেখছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওরাই আপনাকে মেরেছে?'

বারীনদা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'তা হলে? কে মারল?'

'তোমরা।'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। মনুমেন্টের ওপর থেকে পড়ে গেলেও এমন ধাক্কা খেত না।

বারীনদা বললেন, 'ওই ইংরেজদের কথাটা, এ সবই খেলার অঙ্গ। এইভাবেই মেনে নিয়েছি। তুমি কি জানো আন্দোলন এখন দ্বিমুখী হয়ে গেছে। দুটো দল পাশাপাশি কাজ করছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। এখন মেইন লাইন যাদের হাতে তাদের বক্তব্য হল, খতম অভিযান চালিয়েই আমরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করব,' 'ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে খতম অভিযানের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালানো যায়', 'এই খতমের সংগ্রামের প্রশ্নে যারা আমাদের বিরোধিতা করবে তাদের আমরা পার্টিতে থাকতে দেব না।' কিন্তু এ সব করতে গিয়ে আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে সরে আসছি। সাধারণ মানুষ এখন আমাদের ভয় পাচ্ছে। একজন কনস্টেবলকে খুন করে কতটা বিপ্লব করা যায়? পুলিশের যে কর্তারা নকশাল হত্যার মদত দিচ্ছে তাদের গায়ে হাত পড়ছে না কেন? কলকাতায় যে সব এলাকায় সংঘর্ষ চলছে সেগুলো গরিব মধ্যবিত্তদের জায়গা। পার্কস্ট্রিট বড়বাজার এলাকায় কেন অ্যাকশন হচ্ছে না? আমি এ সব প্রশ্ন তুলেছিলাম।'

'তারপর?'

'সি পি এম থেকে শাসিয়ে গেল, পুলিশ জেরা করল, আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাচ্ছি। তোমার বন্ধুরা সন্দেহ করলেন আমি গোপনে ওদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। শুধু সন্দেহের বশে ওরা আমাকে মেরে গেল। যাচাই করার প্রয়োজন কেউ বোধ করছে না আজকাল।'

অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। শুরুতেই যদি পার্টির মধ্যে ভাঙন দেখা যায় তা হলে কাজ হবে কী করে? পার্টির মূল উদ্দেশ্য, ব্যাপক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে শহরে ধর্মঘট সংঘটিত করে শাসনযন্ত্রকে চলৎশক্তিহীন করে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন গেরিলা স্কোয়াডগুলোকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করে গণমুক্তি ফৌজে পরিণত করা। কিন্তু বিভেদ যদি গোড়াতেই আসে তা হলে এ সব হবে কী করে?

বারীনদা বললেন, 'অনিমেষ, এখন পার্টির মধ্যে হু-হু করে বেনোজল ঢুকছে। গুণ্ডামি করার এমন সুযোগ ক'জনে ছাড়ে! ঝাড়াই বাছাই করার সুযোগ আর নেই। আমার খুব ভয় হচ্ছে অনিমেষ।'

'আপনাকে মারার সিদ্ধান্ত কি পার্টি থেকে নেওয়া হয়েছিল?'

'আমার তো মনে হয় না। আসলে এখন দু-তিন চারজন মানুষ যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাই ঠিক। আবার দুটো ভাগ হয়ে যাওয়ায় দু'দলের দুই রকম সিদ্ধান্ত। কলকাতায় বিদ্যাসাগর বা সুরেন ব্যানার্জির মূর্তি ভেঙে কী লাভ হচ্ছে? অনিমেষ, আমার মনেহচ্ছে কেউ কিংবা কারা অত্যন্ত

BanglaBook.org

চতুরভাবে আমাদের আন্দোলনকে হত্যা করার জন্যে এইসব কাজ করাচ্ছে। আমরা তাদের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছি।'

'কারা?'

'আমি জানি না।'

'আপনাকে মারল তার বিচার হবে না?'

'ছেড়ে দাও। আজ সকালে মহাদেববাবু খবর পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁকেও বলে দিয়েছি এ নিয়ে কোনও ঝামেলা না করতে।'

'মহাদেবদা এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ওহো তুমি জানো না। খুব মুশকিলে আছেন ভদ্রলোক। এখুনি ওঁর একটা শেল্টার দরকার। আমি খাড়া থাকলে—।'

'কোথায় আছেন উনি?'

ঠিকানাটা জেনে নিয়ে অনিমেষ উঠল, 'বারীনদা, আমি খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরছি আপনার গায়ে হাত তুলল কেন ওরা! এ ভাবে ভাঙন শুরু হল, কেন এই ভাঙন?'

'নেতৃত্ব নিয়ে। বাঙালি কাউকে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না।'

গলির মুখে এসে অনিমেষ দুপাশে তাকাল। দুটি ছেলে নিরীহ মুখ করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। অনিমেষ বিপদের গন্ধ পেল। এই ধরনের মুখগুলো অনেক কথা বলে দেয়। তার একটা হাত জামার মধ্যে ঢুকে রিভলভারের স্পর্শ নিল।

'কোথায় এসেছেন?' একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

'বারীনদাকে দেখতে।'

'কী নাম?'

'কেন?'

'ঝামেলা না করে নাম বলুন।'

'নামে কী দরকার, নিয়ে চল।' দ্বিতীয় জন অসহিষ্ণু গলায় বলল।

অনিমেষ চোয়াল শক্ত করল, 'কেটে পড়, সুবিধে হবে না।'

'যা বে ফোট্!' কথাটা শেষ করার আগেই ছেলেটার হাতে চকচকে ছুরি ঝলসে উঠল। অনিমেষ আর দ্বিধা করল না। দ্রুত সরে গিয়ে রিভলভার বের করে চিৎকার করল, 'নড়লেই শেষ করে দেব। ছুরি ফেল।'

ছেলেদুটো আচমকা রিভলভার দেখে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে ওদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। ছুরিটা মাটিতে পড়ল ঠক করে। অনিমেষের কানে দ্রুত জানলা দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ এল। আশেপাশের বাড়ির লোক শামুকের খোলে মুখ লুকোচ্ছে। অনিমেষ আর সময় নষ্ট করল না। সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে একটা রিকশায় উঠে চালাতে বলল। লোকটা তার হাতে রিভলভার দেখে জোরে জোরে প্যাডেল ঘুরোতে লাগল। অনিমেষ পেছনে তকিয়ে দেখল ছেলেদুটো তখনও নড়ছে না। ওরা যেন কী করবে বুঝতে পারছে না। রিভলভারটা লুকিয়ে রাখল অনিমেষ। কিন্তু এতক্ষণে অনেকেই এটার অস্তিত্ব জেনেছে। জানুক, আর লুকোচুরি করে কী হবে। মাইল দুয়েক এলোমেলো ঘুরে রিকশাটা ছেড়ে দিল অনিমেষ। পকেট থেকে পয়সা বের করে ভাড়া দিতে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা মাথা নেড়ে প্রায় ছুটে চলে গেল খালি রিকশা নিয়ে। লোকটা ওর কাছ থেকে পয়সা নিল না কেন? ভালবেসে নিশ্চয়ই না। রিভলভারটা দেখতে পেয়ে লোকটা ওকে ভয় পেয়েছে। অনিমেষের খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কেনও মানে হয় না। সে বেশ কিছুটা এগিয়ে একটা পঞ্জাবির দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে নিল।

এখন ভর দুপুর। অনিমেষ নির্দিষ্ট ঠিকানায় মহাদেবদাকে খুঁজে পেল। একমুখ দাড়ি, মহাদেবদাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। ওকে দেখে বললেন, 'কিছুতেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তোমার খবর যারা জানে তারা তো এখন আমার শত্রু।'

'মানে?'

'আমরা এখন বিরোধীপক্ষ অনিমেষ। যা হোক, তুমি কেমন আছ?'

'চলছে।'

'তুমি কোন দলে অনিমেষ? খতমপন্থী না বিরোধী?'

'ঠিক করিনি।'

BanglaBook.org

'আমার একটা থাকার জায়গা দরকার ক'দিনের জন্যে। তুমি সেরকম কোনও জায়গার সন্ধান জানো?'

অনিমেষ একটুও দ্বিধা করল না, মাথা নাড়ল সম্মতির।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

মহাদেবদা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন, 'গত সপ্তাহে বরানগরে পুলিশ সুবাসকে মেরে ফেলেছে।

বিয়াল্লিশ

মহাদেবদার সঙ্গে রিকশায় যেতে যেতে অনিমেষ চোখ বন্ধ করে বসেছিল। বন্ধ চোখের পাতায় সুবাসদার মুখ। সেই উজ্জ্বল উদ্দাম সুবাসদা। কলকাতায় প্রথমে পা দেবার পর যে তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আহত হবার পর, যাকে সে প্রথম চিনেছিল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সেই সুবাসদা আজ নেই। কেমন ফাঁকা লাগছিল অনিমেষের। তার জীবনের বড় বড় বাঁকগুলো সে সুবাসদার হাত ধরেই ঘুরেছে। বিপ্লবের স্বপ্ন ছিল যার চোখে, স্বপ্ন অন্য মানুষের চোখে ছড়িয়ে দিতে যে জানত, বিপ্লব শুরু হওয়ার আগেই তাকে চলে যেতে হল। সত্য বড় নিষ্ঠুর, দুরমুশের মতো মানুষকে বিশ্বাসে বাধ্য করে। অনিমেষের বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। এখনও তার পেটের ওপর সুবাসদার দেওয়া অস্ত্র, তার আত্মরক্ষার কিংবা আক্রমণের জন্য সুবাসদার ভালবাসা, এখনও প্রমাণিত হয়নি সে এর কতটা যোগ্য!

আজ শিলিগুড়িতে এসে একটার পর একটা খারাপ খবর পেল অনিমেষ। বারীনদার মার খাওয়া, পার্টির ভাঙন এবং সুবাসদার মৃত্যু। অনিমেষের কথা বলতে আর ভাল লাগছিল না। শিলিগুড়িতে আজ যে উদ্দেশ্যে আসা তার কোনওটাই সম্ভব হল না। এখন মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। করুণাসিন্ধু ঠিকই বলেছিল, শিলিগুড়ি এখন সত্যিই গরম হয়ে আছে। কিন্তু এবার তার সঙ্গে আছেন মহাদেবদা। ওঁর মতো ডেডিকেটেড নেতাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসছে না, এক করুণাসিন্ধু যদি রাজি হয়। এ ভাবে প্রকাশ্যে রিকশায় যাওয়াটাও বিরাট ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া তো কোনও উপায়ও নেই।

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে খুশি হল অনিমেষ। করুণাসিন্ধুদের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। পাশের একটা সিগারেটের দোকানে খুচরো পয়সা দিয়ে করুণাসিন্ধু এগিয়ে এল, 'আপনার জন্যখুব চিন্তায় ছিলাম—।' তারপর একজন অপরিচিত মানুষের উপস্থিতি ভেবে চুপ করে গেল আচমকা।

অনিমেষ রিকশা থেকে নেমে করুণাসিন্ধুর সামনে এসে নিচু গলায় বলল, 'আপনার কাছে একটা সাহায্য চাই। এঁকে শেল্টার দিতে হবে ক'দিন।'

'আমার ওখানে তো আর জায়গা নেই।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী আশ্চর্য, আপনি একা আছেন বলে কেউ কিছু ভাবছে না কিন্তু আর একজন গেলে—একটা অন্যায় অনুরোধ হয়ে যাচ্ছে না?'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। ইনি ধরা পড়লে আমাদের লজ্জার শেষ থাকবে না।'

'কে ইনি?'

'মহাদেবদা।'

'মহাদেববাবু?' করুণাসিন্ধুর মুখ দ্রুত পালটে গেল। সে আরও নিচু গলায় অনিমেষের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে মাথা নেড়ে জিপের দিকে এগিয়ে গেল। এবার একটু হালকা হল অনিমেষ। সে রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে বলল, 'নেমে আসুন মহাদেবদা, এই জিপটায় উঠতে হবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'হাসিমারার কাছে একটা রিভারবেডে। এই ছেলেটি ওখানে কাজ করে।'

মহাদেবদাকে সঙ্গে নিয়ে জিপের দিকে এগিয়ে যেতে অনিমেষের মনে পড়ল করুণাসিন্ধুর ছোটমালিকের কথা। সে যদি মহাদেবদাকে দেখে বিগড়ে যায়! করুণাসিন্ধু কীভাবে ম্যানেজ করবে ওকে?

BanglaBook.org

জিপের ভেতর তাকিয়ে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। পেছনের সিটে পা গুটিয়ে ছোটমালিক হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। করুণাসিন্ধু বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড় ন।'

অনিমেষ ছেলেটিকে ইশারা করে দেখাতে করুণাসিন্ধু বলল, 'পুরো আউট হয়ে গেছে। কাল সকালের আগে ডিস্টার্ব করবে না। অবশ্য আউট না হলে আজ বিকেলে ফেরা যেত না। উঠে পড় ন।'

ওরা পেছনে উঠে বসতেই জিপ ছেড়ে দিল। বিশ্রী টোকো গন্ধ ছড়াচ্ছে ছেলেটির মুখ থেকে। অনিমেষের শরীর গুলিয়ে উঠছিল। মহাদেবদা একটা কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন। চশমাটা বাঁ হাতে ধরা। বাইরে শিলিগুড়ি শহর সরে সরে যাচ্ছে। অনিমেষ ছেলেটির দিকে তাকাল, মৃতদেহের মতো নিঃসাড়। এটাকে মাঝরাস্তায় কোনও জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিলে কেমন হয়। ড্রাইভারটা না থাকলে তাই করত সে। মহাদেবদাকে ড্রাইভার লক্ষ করছিল, কী ভাবছে কে জানে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ যাওয়ার পর মহাদেবদা বললেন, 'বারীনের খবর শুনেছ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ। তারপর মহাদেবদার মুখের দিকে তাকাল।

মহাদেবদা চোখ বন্ধ করেই বললেন, 'মুঠোটা খুলে গেছে অনিমেষ, আঙুলগুলো যে যার ইচ্ছে মতন কাজ করছে। শত্রুপক্ষের এখন মহা সুবিধে।'

'কেন এমন হচ্ছে?'

'মত পার্থক্য। আমরা বিপ্লব করি কিংবা খেলি, আমাদের প্রত্যেকের যে নিজের নিজের মত আছে। আমরা চাই প্রত্যেকে আমারটাই মানুক।'

'তা হলে আমরা কি হেরে যাব?'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললেন মহাদেবদা, 'কে বলল হেরে যাব? নো, নেভার। যারা আজ ভুল করছে তাদের বাদ দিয়েই আমরা এগিয়ে যাব।'

'কিন্তু একমত হবার কি উপায় নেই?'

'আছে, যদি প্রয়োজনটা এক হয়। একটা কনস্টেবলের গলা কেটে কিংবা একটা মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে এ দেশে বিপ্লব আসতে পারে না। এতে প্যানিক ছড়ানো যায়। এ সব করে আমরা ইতিমধ্যে জনসাধারণকে আমাদের সম্পর্কে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। ওদের বাদ দিয়ে বিপ্লব হবে কী করে তা এরা চিন্তা করছে না। কিন্তু একবার পাহাড় ছেড়ে বেরিয়ে এলে ঝরনা আর ফিরে যেতে পারে না। অতএব আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মুশকিল হল সমুদ্রের পথটা এখন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' মহাদেবদা হাসবার চেষ্টা করলেন।

'সারা দেশ জুড়ে একটা সেন্ট্রাল কমিটি তা হলে গঠন হল না?'

'না।'

'তা হলে?' গলা কেঁপে গেল অনিমেষের।

'অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

যেন যুদ্ধ শুরু করার মুখে জানা গেল কারও রাইফেলে গুলি নেই। অনিমেষ দাঁতে দাঁত চাপল। না, এ হতে পারে না। হাজার হাজার ছেলে আজ ভবিষ্যৎ না ভেবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তারা কিছুতেই থেমে থাকতে পারে না। যাঁরা থিয়োরি নিয়ে মাথা ঘামান তাদের বিরোধের জন্য এতগুলো আগুন নিবে যেতে পারে না। যেতে যেতে মহাদেবদার কাছে আরও অনেক খবর শুনল অনিমেষ। কলকাতা বীরভূম এবং মেদিনীপুরে পুলিশ এখন নকশাল-হত্যার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়েছে। ছেলেদের ধরতে পারলে কুকুর বেড়ালের মতো প্রকাশ্যে হত্যা করছে তারা। দলের সবাই এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে ছেলেদের আশ্রয় দিচ্ছিল, খাবার দিচ্ছিল কিন্তু এখন যেন তারা সন্ত্রস্ত। এক একটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ চিরুনির মতো তল্লাশ চালিয়ে সন্দেহজনক ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে মদত দিচ্ছে পুনর্নির্বাচিত মার্কসবাদে দীক্ষিত এক বামপন্থী দল। তাদের নেতা ময়দানে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে একদিনে নকশাল আন্দোলন ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। বাইরে থেকে আন্দোলন ভাঙার এই প্রচেষ্টা বোঝা যায় কিন্তু দলের ভেতর থেকে সবকিছু ভেঙে দেবার জন্য সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে। মহাদেবদা বলতে পারলেন না কোনও বিদেশি শক্তি কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা আছে কিনা, কিন্তু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরে একটা গুজব খুব ছড়াচ্ছে। গুজবটা হল নকশাল আন্দোলন বিদেশি শক্তির পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। ঠিক এইরকম আন্দোলন পৃথিবীর নানান দেশে সময়ে সময়ে হয়েছে। এতে আর কিছু না হোক সেই দেশের সরকার এমন বিব্রত হয় যে তা

থেকে সেই শক্তি হয়তো মুনাফা পেতে পারে। কিন্তু অনিমেষ তো বটেই, মহাদেবদাও এ ব্যাপারে কোনও তথ্য জানে না।

মহাদেবদা চুপ করে গেলে অনিমেষ দেখল জিপ স্বর্গছেঁড়া ছাড়িয়ে গেল। করুণাসিন্ধু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ সামনে তাকিয়ে আছে। এ পাশে ছোটমালিক নিঃশব্দে পড়ে আছে। করুণাসিন্ধু নকশাল আন্দোলনের সমর্থক। ওর পরিচয় এবং মানসিকতা অনিমেষ জানে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে করুণাসিন্ধু আন্দোলনে নামেনি। সে সাহায্য করছে কিন্তু তাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে নেই অনিমেষের। মহাদেবদার কথায় জানা গেছে যে পুলিশ তাঁকে ধরলেই হত্যা করবে। কথাটা করুণাসিন্ধুও শুনেছে। যদি কোনও কারণে তার মতটা পালটে যায়! একা বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। ফুন্টশিলিং-এ ওদের সমবেত হবার দিনটা এসে গেল।

দু-পাশ জঙ্গল, একটানা ঝিঁঝিঁ শব্দ করে যাচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পৃথিবী থেকে শেষ আলোটুকু মুছে যায়নি। অনিমেষ সামনের দিকে তাকিয়েছিল। ড্রাইভার এবং করুণাসিন্ধুর মাথার মাঝখান দিয়ে সামনের কাচ ভেদ করে সরু পিচের রাস্তাটা দেখছিল সে। আর মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। হঠাৎ অনিমেষের চোখে পড়ল অনেক দূরে ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা কালো বিন্দু নড়ছে। একটু বাদেই বোঝা গেল ওটা একটা মানুষ। লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, যেন জিপটি চিনতে পেরেই হঠাৎ দু-হাত তুলে নাচতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে লোকটা ওদের থামতে বলছে। ড্রাইভার চাপা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে সামনে হাতি বেরিয়েছে।'

করুণাসিন্ধু বলল, 'হাতি?'

কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষ ওকে চিনে ফেলেছে। সে চিৎকার করে গাড়িটাকে থামাতে বলল। ড্রাইভার যেন একটু অবাক হয়ে গাড়িটা থামাতেই অনিমেষ লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল সিরিলের কাছে। সিরিল উত্তেজিত, তার কালো মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমে সে যেন অনিমেষকে চিনতেই পারল না। পরক্ষণেই দাড়িটা কামানো হয়েছে বুঝতে পেরেই সে তার হাত চেপে ধরল। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে, তুমি এখানে কেন?'

'নেমে পড় ন চটপট, ওদিকে যাবেন না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'আপনারা চলে যাওয়ার পর পুলিশ ক্যাম্পে ক্যাম্পে সার্চ শুরু করেছে। ওরা নাকি আমাদের কথা জেনে গেছে। আমি কোনও মালপত্র নিয়ে আসতে পারিনি।'

সিরিল মুখ দিয়ে বাতাস টানছিল।

অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়ল। ওরা যে রিভারবেডের ক্যাম্পে আছে তা পুলিশ জানল কী করে? কোনওরকম সন্দেহ তারা উৎপাদন করেনি, তা হলে! যাওয়ার সময় ছোটমালিক বলেছিল যে দারোগা ক্যাম্পে এসেছিল। সেটা কি এই উদ্দেশ্যেই? এখন নিশ্চয়ই ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া যায় না। অথচ মহাদেবদা সঙ্গে আছেন। যেমন করেই হোক ওঁকে বাঁচাতে হবে। সে সিরিলের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শাবাশ কমরেড, তুমি এখানে না এলে আমরা বিপদে পড়তাম।'

সিরিলের কালো মুখে সাদা মুক্তো ঝলসে উঠল।

অনিমেষ একটু চিন্তান্বিত গলায় বলল, 'কিন্তু মুশকিল হল আমার সঙ্গে মহাদেবদা আছেন। ওঁকে বাঁচানো দরকার। কোথায় যাওয়া যায়!'

'মহাদেবদা কে?'

'আমাদের প্রথম সারির নেতা। কলকাতা থেকে এসেছেন। পুলিশ ওঁকে পেলেই মেরে ফেলতে পারে।' অনিমেষ কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল। জিপটা খানিক দূরে, করুণাসিন্ধু গাড়ি থেকে নেমে বনেটে ঠেস দিয়ে ওদের দেখছে। অনিমেষ ওকে ডাকল। করুণাসিন্ধু বেশ গম্ভীর মুখে কাছে আসতেই অনিমেষ বলল, 'আপনাদের ক্যাম্পে পুলিশ আমাদের জন্যে বসে আছে। এ অবস্থায় আমি মহাদেবদাকে নিয়ে এখানে যেতে চাইছি না।' অনিমেষ জানাল।

'কী করবেন?'

'আমাদের হাসিমারায় পৌঁছে দিন।'

করুণাসিন্ধু মাথা নাড়ল, 'এখন আর সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আপনাদের জন্যে আমি আর ঝুঁকি নিতে রাজি নই। অনেক করেছি।'

BanglaBook.org

'করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ অবস্থায় যদি এখানে ছেড়ে দেন তা হলে সেই করার কোনও মূল্য থাকবে না।' অনিমেষ যথেষ্ট নরম গলায় বলল।

'দেখুন ইতিমধ্যেই আমার যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন বলে হয়তো অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি আর রিস্ক নিতে চাই না।' করুণাসিন্ধু ফেরার জন্যে ঘুরতেই অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু হাসিমারা পর্যন্ত ফিরে যেতে আপনার আপত্তি কেন?'

করুণাসিন্ধু বলল, 'ড্রাইভার পুলিশের কাছে ঘটনাটা জানিয়ে দেবে।'

অনিমেষ আবেদনের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।'

'না, ভাববার কিছু নেই। অনেক হয়েছে।'

'আপনি আন্দোলনের বিপক্ষে যাচ্ছেন!' অনিমেষের গলা শক্ত হল।

'আন্দোলন? সে তো শিকেয় উঠেছে। আমি আর এই হঠকারিতার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই না।'

করুণাসিন্ধু ফিরে যাচ্ছিল। অনিমেষ খুব দ্রুত মন স্থির করে নিল। সে সিরিলের মুখের দিকে তাকাতেই সিরিল মাথা নাড়ল। যেন তার মনের কথা সিরিল বুঝে নিয়েছে। যতটা সম্ভব নিরাসক্ত মুখ করে জিপের কাছে এগিয়ে গেল। ভেতরে মহাদেবদা যেন কিছুটা আন্দাজ করেই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ড্রাইভার ওদের দেখছে। জিপের বাইরে দাঁড়িয়েই করুণাসিন্ধু বলল, 'আপনি নেমে আসুন। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি নই।'

হতভম্ব মহাদেবদার গলা শোনা গেল, 'কী হল?'

ততক্ষণে অনিমেষরা করুণাসিন্ধুর পেছনে এসে গেছে। এবং কিছু বোঝার আগেই সিরিল ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে করুণাসিন্ধুর গলায় হাতের প্যাঁচ দিয়ে পেছনে টানার চেষ্টা করতেই সে ঘুরে ল্যাথি মারতে চাইল। কিন্তু সিরিল আরও চটপটে। সে দু'হাত এক করে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল করুণাসিন্ধুর মাথায়। ওরকম রোগা ছেলে যে এমন জোরে আঘাত করতে পারে তা অনিমেষ ভাবতে পারেনি। দেখা গেল করুণাসিন্ধুর শরীরটা টলতে টলতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। অনিমেষ দেখল সিরিলের কালো মুখে আবার মুক্তো ঝলসাচ্ছে।

ড্রাইভার ব্যাপারটা দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। করুণাসিন্ধু পড়ে যেতেই সে ইঞ্জিনটা চালু করল। কিন্তু অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে রিভলভার ঠেসে ধরল, 'যা বলব তা না শুনলে মরতে হবে তোমাকে।'

রিভলভার দেখে লোকটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে সে জানাতে চাইল সে কথা শুনবে। অনিমেষ রিভলভারটা মহাদেবদার হাতে দিয়ে বলল, 'এটার দিকে লক্ষ রাখুন, আমরা ওটার ব্যবস্থা করছি।'

করুণাসিন্ধুর শরীরটাকে ওরা দুজনে ধরাধরি করে রাস্তা থেকে নেমে এল। দুপাশে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে এখন বেশ অন্ধকার। মানুষের চোখের আড়ালে ওরা করুণাসিন্ধুকে শুইয়ে দিল। তারপর জিপে ফিরে আসতেই খেয়াল হল আর একজনের কথা। এই অবস্থায় আর কোনও ঝুটঝামেলা বাড়ানো উচিত নয়।

ছোটমালিকের নেশা কেটে গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু এখনও তার চোখ বন্ধ কিন্তু মুখে অস্পষ্ট শব্দ বের হচ্ছে। ওরা তার শরীরটা নিয়ে নীচে নামতে দূরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। অনিমেষ বলল, 'কেউ কথা বলবেন না। গাড়িটা দাঁড়ালে বলবেন ইঞ্জিনে গোলমাল হয়েছে। লোক গেছে খবর দিতে।'

দ্রুত ওরা ছোটমালিককে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। এইসময় গোঙানি শুরু হয়ে গেল। ছোটমালিক জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে?' অর্থাৎ এর জ্ঞান ফিরে এসেছে। মাটিতে শুইয়ে দিতেই সে উঠে বসতে চাইল। অনিমেষ আর ঝুঁকি নিল না। সজোরে একটা লাথি মারল ছোটমালিকের পেটে। কক্ করে একটা শব্দ করেই শরীরটা নিথর হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে গাড়িটা হেড লাইটের আলোয় রাস্তা আলোকিত করে হুস করে বেরিয়ে গেল। জিপটাকে তারা নিশ্চয়ই দেখেছে কিন্তু থামবার কোনও চেষ্টা করল না। অনিমেষ সিরিলকে আর একবার করুণাসিন্ধুর খোঁজ নিতে বলল। কয়েক মিনিট বাদেই সিরিল এসে জানাল সব ঠিক আছে।

ওরা রাস্তায় উঠে এল। চারধার চুপচাপ, এমনকী ঝিঁঝিগুলোও শব্দ করছে না। এবার সিরিল চাপা গলায় বলল, 'ড্রাইভারকে শুইয়ে দিন।'

'গাড়ি চালাবে কে?'

'আমি পারি!'

BanglaBook.org

'ও হ্যাঁ।' অনিমেষের নিজের ওপরেই রাগ হল, এই উত্তেজনার সময় সে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি! সে এগিয়ে মহাদেবদার কাছ থেকে রিভলভারটা চেয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'নেমে দাঁড়ান।'

সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জোড়া করে লোকটা ককিয়ে উঠল, 'আমি কিছু জানি না বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন।'

'তোমাকে কিছু জানতে হবে না। নেমে এসো।'

অনিমেষের আদেশ সত্ত্বেও লোকটা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। আর সময় নষ্ট করা যায় না। সিরিল গিয়ে ওকে টানতেই যেন গড়িয়ে নেমে এল লোকটা। ওর শরীরে ভয়েতেই কোনও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সিরিল ওকে ঠেলতে ঠেলতে জঙ্গলে নিয়ে চলল। অনিমেষ বুঝল তাকে যেতে হবে না। ড্রাইভারের ব্যবস্থা সিরিল একাই করবে।

এতক্ষণ মহাদেবদা চুপচাপ দেখছিলেন, এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটা কে?'

'ওর নাম সিরিল। খুব অ্যাকটিভ।'

'দেখতেই পাচ্ছি। ওর জন্যে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।'

একটু বাদেই সিরিল হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। এই অন্ধকারেও ছেলেটার ভাবভঙ্গি দেখে অনিমেষ বুঝতে পারল ওর চেহারাটা যেন আমূল পাল্টে গেছে। সেই নিরীহ ভাবটুকু উধাও। এসেই জিপে লাফিয়ে উঠল। অনিমেষরা জায়গা নিতেই একেবারে ইউ টার্ন করে জিপ ঘুরিয়ে ছুটে চলল হাসিমারার দিকে।

এখন গাড়িতে তিনজন কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছিল না। অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না এখন কোথায় যাওয়া যায়! আজ রাত্রের মতো একটা শেল্টার দরকার। কাল সকাল হলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তা ছাড়া, এতক্ষণে বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কোথাও বসে খেয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু এদিকে বেশি গাড়ি চলে না বলেই বোধহয় কোনও চটি নেই। খেতে হলে হাসিমারায় যেতে হবে। যদি পুলিশ তাদের গন্ধ পেয়ে থাকে তা হলে হাসিমারায় গিয়ে খাওয়া মানে যেচে জেলখানায় ঢোকা।

অনিমেষ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাওয়া যায়?'

মহাদেবদা বললেন, 'এদিকে তোমার জানাশোনা কেউ নেই?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। তারপরেই ওর খেয়াল হল জলপাইগুড়িতে চলে গেলে কেমন হয়! ওখানে যে-কোনও পরিচিতের বাড়িতে কয়েকদিন থাকা যেতে পারে। নিজের বাড়ির কথা একবার মনে এলেও সে এখন মহীতোষের মুখোমুখি হতে চাইল না। কথাটা সিরিলকে বলতেই সে ঘাড় নাড়ল, 'অতদূর যাওয়ার মতো তেল নেই বোধহয়। মুশকিলে পড়ে যেতে হবে।'

'তা হলে?'

'ফুন্টশিলিং-এ চলুন।'

হাসিমারা এসে গেল। এই রাতে তেমন দোকানপাট খোলা নেই। তেমাথা থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিল ওরা। ফুন্টশিলিং-এ হোটেল আছে। জায়গাটা ভূটানে। অতএব ভারতীয় পুলিশের কোনও এক্তিয়ার নেই। অনিমেষ কিছুটা স্বস্তি পেল। এ দেশের পুলিশ ও দেশের সরকারকে অনুরোধ করে ওদের ধরতে চাইলে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

সামনে পেছনে কোনও গাড়ি নেই। যেন ওদের জিপটা একাই অন্ধকার সাঁতরে চলছে। কিন্তু হঠাৎ জিপটা নড়ে উঠল বেয়াদপভাবে। রাস্তার একপাশে জিপটাকে কোনওরকমে দাঁড় করিয়ে সিরিল লাফিয়ে নামল। তারপর ঘুরে এসে বিষণ্ণ গলায় জানাল, 'তেল নেই।' অনিমেষ দাঁতে দাঁত চাপল। এইটুকু আসতেই তেল যদি শেষ হয়ে যায় তা হলে সে কীভাবে জলপাইগুড়ি যেত? ওরা জিপ থেকে নেমে এল। গাঢ় অন্ধকারেও আকাশের রং পরিষ্কার থাকে। তার নিস্তেজ আলোয় মানুষ অভ্যস্ত হলে পরস্পরের মুখ বোঝা যায়। অনিমেষ সিরিলকে জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে কোনও পাম্প নেই?'

'জানি না।'

মহাদেবদা বললেন, 'থাকলেও সেখানে যাওয়া সেফ হবে না। ফুন্টশিলিং এখান থেকে কতদূর?'

দেখা গেল সঠিক আন্দাজ কারও নেই। তবু যেটুকু আঁচ করা যায় তাতে এখন হাঁটা শুরু করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

মহাদেবদা বললেন, 'জিপটার কী গতি হবে? এটা এখানে থাকলে পুলিশ আমাদের হদিস জেনে যাবে।'

BanglaBook.org

কথাটা শোনা মাত্র অনিমেষ স্থির হল। করুণাসিন্ধুর জ্ঞান ফিরে আসতে নিশ্চয়ই দেরি হবে না। আর তারপরেই সে পুলিশের মন পাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে। এই রাত্রেই পুলিশ যদি বেরিয়ে পড়ে তা হলে হদিস পেতে দেরি হবে না। কথাটা মাথায় আসামাত্রই দূরে হেডলাইট দেখা গেল। ওরা আর জিপের কাছে না দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ে রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে চলে এল। দুধার আলোয় ভাসাতে ভাসাতে একটা গাড়ি আসছে। গাড়িটা বেশ স্পিডে খানিক এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর হেড লাইট জ্বালা অবস্থায় ব্যাক করে এল ওদের জিপটার কাছে।

রাস্তা থেকে বেশি দূরে না থাকায় স্পষ্ট গলা কানে এল, 'জিপটা এ ভাবে পড়ে আছে কেন?'

'বোধহয় খারাপ হয়ে আছে।'

'কিন্তু এখানে খারাপ হবে কেন? নাম্বারটা আমার চেনা। নেমে দ্যাখো তো কী ব্যাপার!'

'খারাপ হয়েছে স্যার, না হলে লোক থাকত।'

'দূর, যা বলছি তাই করো! এটা কনট্রাক্টরবাবুর জিপ।'

বোঝা যাচ্ছে বেশ অনিচ্ছায় একটি লোক নেমে এল গাড়ি থেকে। অনিমেষ শক্ত হয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা পুলিশের। এই রাত্রে এ পথে পুলিশের গাড়ি কেন এল তার মাথায় ঢুকছে না। অনিচ্ছুক লোকটা বাতিল জিপের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বলল, 'কেউ নেই স্যার।'

'সে তো বুঝতেই পারছি, চাবি আছে?'

'হ্যাঁ স্যার আছে।' বলে লোকটা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। তারপর ইঞ্জিনের বিকট একটা গোঙানি শোনা গেল। সেটাকে থামিয়ে লোকটা নিশ্চিন্ত-গলায় জানাল, 'তেল নেই বলে এখানে রেখে গেছে। গাড়ি অলরাইট।'

'তেল নেই? যারা এসেছিল তারা জানত না তেল নেই?'

'বোধহয়।'

'কিন্তু যাওয়ার সময় তো গাড়িটাকে দেখিনি!'

'তা ঠিক স্যার। তবে এ নিয়ে ভাববার কী আছে?' বাতিল জিপ থেকে লোকটা নেমে এসে নিজেদের গাড়ির দিকে এগোল। কিন্তু অফিসার তাকে আবার ফিরিয়ে দিল, 'চাবিটা নিয়ে এসো। তেল আনতে কেউ চাবি ফেলে গেছে বলে কখনও শুনিনি। সামথিং ফিশি ব্যাপার আছে। চলো গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।' ওদের গাড়ি থেকে চাবি খুলে নিয়ে লোকটা ফিরে যেতেই গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল হাসিমারার দিকে।

আবার সব চুপচাপ, অন্ধকার আরও ঘন হয়ে নির্জনতা আনল। ওরা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল।

অনিমেষ বলল, আর ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের।'

সিরিল বলল, 'রাস্তা দিয়ে তো হাঁটা যাবে না।'

মহাদেবদা বললেন, 'ওরা কিন্তু সহজেই বুঝবে আমরা ফুন্টশিলিং-এ গিয়েছি। যাদের জঙ্গলে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাদের স্টেটমেন্ট পেয়ে গেলে তো আর কোনও কথা নেই। ফুন্টশিলিংটা অ্যাভয়েড করাই ভাল।'

অনিমেষ একটু উত্তেজিত হল, 'ফুন্টশিলিং অ্যাভয়েড করবেন আবার এদিকে হাসিমারাতেও যাওয়া যাবে না। তা হলে?'

মহাদেবদা হাসলেন, 'উত্তেজিত হয়ো না। ভেবে দ্যাখো, এই অবস্থায় হাসিমারাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। কারণ ওরা ভাববেই না যে ওদের নাকের ডগায় আমরা যেতে পারি।'

হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে বাজল। পায়ের তলায় পথটা কাঁপছে। সিরিল হাত দিয়ে রাস্তাটা ছুঁয়ে বলল, 'ফুন্টশিলিং থেকে একটা গাড়ি আসছে।'

মহাদেবদা বললেন, 'সাধারণ গাড়ি হলে লিফট চাওয়া যায় না?'

সিরিল হাসল, 'এরকম ফাঁকা জায়গায় থামাবেই না।'

অনিমেষ বলল, 'ওটাকে থামাতে হবে। দরকার হলে গায়ের জোরে ওই গাড়িতে উঠতে হবে।'

মহাদেবদা বললেন, 'কীভাবে করবে? ওটা তো স্পিডে আসছে। হাত দেখালে থামবে?'

সিরিল মাথা নাড়ল। তারপর অনিমেষকে বলল, 'মনে হচ্ছে লরি আসছে। কোনওভাবেই থামাতে পারবেন না। রাত্তিরে ওরা অচেনা লোককে ভয় পায়। তার চেয়ে চলুন হাঁটতে শুরু করি।'

BanglaBook.org

ততক্ষণে গাড়ির হেডলাইট ডাইনির চোখের মতো জ্বলছে অন্ধকারে। ক্রমশ গর্জন করে গাড়িটা ছুটে এল। ওরা জিপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে চলে যেতে দেখল। একটা মালবোঝাই লরি।

কোন দিকে যাচ্ছে ওরা কেউ জানে না। কিন্তু মূল পিচের পথটা ছাড়িয়ে এসেছে ওরা অনেকক্ষণ। এদিকে জঙ্গল তেমন গভীর নয় কিন্তু ডুয়ার্সের বনের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায় না। অনিমেষের শরীর ক্লান্তিতে টলছিল। সিরিল আগে আগে যাচ্ছে, মাঝখানে মহাদেবদা পেছনে অনিমেষ। নিজের শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বুঝলেও অনিমেষ মুখে প্রকাশ করেনি। কারণ মহাদেবদার পক্ষে এই দুর্গম পথে হাঁটা যে অসম্ভব হয়ে পড়ছে এটা ওরা টের পাচ্ছিল। চটি এবং ধুতি পরে এ ভাবে জঙ্গলে হাঁটা যায় না। পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে ওদের। এক সময় মহাদেবদা ভেঙে পড়লেন। মাটিতে উবু হয়ে বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?' মহাদেবদা কোনও শব্দ করলেন না। অনিমেষ ওঁর শরীরে হাত দিল, বেশ গরম। মহাদেবদার জ্বর হয়েছে ?

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি হাঁটতে পারবেন ?'

এবার মাথা নাড়লেন মহাদেবদা, 'না।'

'তা হলে ?'

'তোমরা এগোও, আমি ভোর অবধি এখানেই বিশ্রাম নিই।'

'তা কি হয়! এই জঙ্গলে কী বিপদ আছে জানি না, তা ছাড়া আপনাকে আমরা ছেড়ে যেতে পারি না।'

হঠাৎ সিরিল মহাদেবদার দুই বগলে হাত দিয়ে ওঁকে সোজা করে দাঁড় করাল, 'আপনি আমার পিঠে উঠুন।'

মহাদেবদা চমকে উঠলেন, 'না। তা হয় না!'

'কেন হবে না ? আপনার বয়স হয়েছে আর ওজনও বেশি নয়। আমার মাল বয়ে নেবার অভ্যেস আছে।' কথা শেষ করে মহাদেবদার আপত্তি সত্ত্বেও সিরিল ওঁকে পিঠে তুলে নিল। অনিমেষ অবাক চোখে ব্যাপারটা দেখল। এই কালো প্রায় অশিক্ষিত ছেলেটি প্রতি মুহূর্তে তাকে নতুন করে শিক্ষা দিচ্ছে। ওর পিঠে উঠেও মহাদেবদা আপত্তি জানাচ্ছিলেন। সিরিল স্বচ্ছন্দ গলায় বলল, 'চলুন। আপনি আগে যান।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ?'

সিরিল হাসল, 'জানি না।'

সারাটা জঙ্গল যেন ওরা মাড়িয়ে এল। যদিও মাঝে মাঝেই ওরা বিশ্রাম নিয়েছে কিন্তু অনিমেষের মনে হল ওর শরীরে এখন একটুও শক্তি নেই। মাথা ঘুরছে, খিদে এবং পরিশ্রমে শরীর টলছে। এদিকে আকাশ এখন প্রায় পরিষ্কার। অন্ধকার চলে যাওয়ার আগে সামান্য সময় ধন্দ বাড়ায়। এটি সেই মুহূর্ত। টলতে টলতে অনিমেষ এগোচ্ছিল। পেছনে সিরিলের দিকে তাকাবার সাহস কিংবা ইচ্ছে ওর নেই। একটা প্রমাণ সাইজের মানুষকে কী অবলীলায় বয়ে আনছে ওই ছিপছিপে ছেলেটা, একটুও কষ্টের কথা বলেনি। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের চোখের সামনে সব টলছিল এখন। কোমর থেকে পা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সে হঠাৎ চোখ বন্ধ করল। সামনে ওটা কী ? পেছন থেকে সিরিলের গলা পাওয়া গেল, 'ব্যস, আ গিয়া।'

অনিমেষ নিজের দৃষ্টি কয়েকবারের চেষ্টায় সহজ করে ভালভাবে তাকাল। একটা ছোট্ট একতলা ঘর। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা জঙ্গলের শেষ। ঘরটা যে একটা স্টেশন তা বুঝতে অসুবিধে হল না। কারণ ও পাশে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। দু-তিনটে লোক এই প্রায় ভোর হওয়া সময়টায় প্রায় গুটিসুটি মেরে প্ল্যাটফর্মে বসে আছে। কোনও রেলের লোককে নজরে পড়ল না।

সিরিল মহাদেবদাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিতেই অনিমেষ দেখল ওর মুখ ফ্যাকাসে। মহাদেবদা এখন অনেকটা সুস্থ কিন্তু ছেলেটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। যেন এতক্ষণ পিঠে বোঝা ছিল বলেই সে চলতে পারছিল, বোঝা নামিয়ে সে বেসামাল হয়ে পড়েছে। সিরিলের কাঁধে হাত দিল অনিমেষ, 'কী হয়েছে ?'

মাথা নাড়ল সে, 'কিছু হয়নি।'

জোর করে ওকে মাটিতে বসিয়ে অনিমেষ নিজেও বসল। এখানে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু জায়গাটার হালচাল বোঝা যাচ্ছে না তাই সামান্য সময় অপেক্ষা করা দরকার।

BanglaBook.org

মহাদেবদা বললেন, 'কোনও ট্রেন এলে উঠে পড়তে হবে। কোনদিকে যাচ্ছে জানার দরকার নেই। এই এলাকাটা অবিলম্বে ছাড়া দরকার।'

'মনে হচ্ছে বাঁ দিকটা শিলিগুড়ি, ডান দিকটায় আসামের পথ।'

'আসাম! এখান থেকে আলিপুরদুয়ার কতক্ষণ লাগবে?'

'ঘন্টা দুয়েক।'

'গুড। চল ওখানেই যাই। তুষার সেন ওখানে থাকে, স্কুলে পড়ায়। ওটা খুব ভাল শেল্টার হবে।'

'তিনজনেই যেতে পারব?'

'হ্যাঁ। ওর বাড়িতে বুড়ি মা ছাড়া লোকজন নেই।'

ঠিক এই সময় একটা জিপ সজোরে এসে ব্রেক চাপল স্টেশনের সামনে।

তিন-চারজন পুলিশ লাফিয়ে নেমে স্টেশনে ঢুকে গেল। হাঁকাহাঁকির পর দেখা গেল রেলের লোকজন বেরিয়ে এসেছে। অফিসার কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। অনিমেষরা পাথরের মতো চুপচাপ ওদের দেখল। সন্দেহ না থাকলে ওরা এখানে আসবে না এবং শেষ পর্যন্ত নীচ থেকেই ওরা ঘুরে গেল। এ সবই যে তাদের তল্লাশে তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

শেষ পর্যন্ত পুলিশের গাড়িটা ফিরে গেল কিন্তু যাওয়ার আগে দুজন কনস্টেবলকে এখানে রেখে গেল। একজনের হাতে রাইফেল অন্যজনের হাতিয়ার লাঠি। মিনিট কয়েক তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে পায়চারি করে শেষ পর্যন্ত পাশাপাশি বসে গল্প করতে লাগল।

মহাদেবদা বললেন, 'ঝুঁকি নিতেই হবে। এদের সামনে দিয়েই ট্রেনে উঠতে হবে। মনে হচ্ছে ম্যানেজ করা যাবে।'

সিরিল কী বুঝল বোঝা গেল না, আস্তে আস্তে উঠে নীচে নামতে লাগল। অনিমেষ চাপা গলায় তাকে ডাকলেও ততক্ষণে সিরিল নেমে গেছে। যেন কোনও উত্তেজনার সঙ্গে সংস্রব নেই এমন ভঙ্গিতে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল সে। অনিমেষরা দেখছিল ওকে। কনস্টেবলের সামনে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করল সিরিল। বেশ বিরক্ত হয়ে কোনও উত্তর দিল না তারা। সিরিল বোকা বোকা ভাব করে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। খানিকবাদেই একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল স্টেশনে। তিন-চারজন যাত্রী ব্যগ্র চোখে বাঁদিকে তাকাচ্ছে। তারপরেই ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। মহাদেবদা চাপা গলায় বললেন, 'চলো, এগিয়ে যাই।'

দু'পায়ে যেন লোহার ওজন, অনিমেষ কোনওরকমে নীচে নেমে এল। এবার মহাদেবদাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ এবং সেই মুহূর্তেই পুলিশ দুটোর নজর পড়ল ওদের দিকে। বোধহয় চেহারার বিবরণ আগেই পেয়েছিল ওরা, কারণ দেখা মাত্র সোজা হয়ে দাঁড়াল দুজনেই। নিজেদের মধ্যে কথা বলেই একজন রাইফেল উঁচিয়ে চিৎকার করল, 'হল্ট!'

অনিমেষরা সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন রাইফেল তাগ করে দাঁড়িয়ে, অন্যজন লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এমনভাবে আসছে যে সঙ্গীর লক্ষ্য থেকে সে এদের আড়াল না করে। দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল লোকটা, 'কাঁহাসে আতা হ্যায়?'

অনিমেষের নজর তখন রাইফেলধারীর দিকে। তার পেছনে বেড়ালের পায়ে হেঁটে এসেছে সিরিল। লোকটার একাগ্র নজর এদিকেই। এক পলকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সিরিল। আচমকা আক্রমণে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা, রাইফেলটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলভার বের করে লাঠিধারীকে পাথর করে দিল অনিমেষ। তখন গাড়ি প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে।

যদিও যাত্রী কম তবু সবার চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটল। কিন্তু কেউ এক পা এগিয়ে এল না। অনিমেষ মহাদেবদাকে গাড়িতে উঠতে বলে সিরিলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতেই অন্য পুলিশটা চোঁ চোঁ দৌড় শুরু করল। অনিমেষ যখন ওদের কাছে পৌঁছেছে তখন সিরিল মাটিতে আর তার ওপর দু'পা দিয়ে পুলিশটা বসে আছে। ওর হাত দুটো সিরিলের গলায় সাঁড়াশির মতো বসে যাচ্ছে। উন্মাদ হয়ে গেল অনিমেষ। জোরে রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করল পুলিশটার মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হল মাথা থেকে, চুপচাপ শুয়ে পড়ল লোকটা।

'সিরিল!' অনিমেষ চাপা গলায় ডাকল। চিত হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা। চোখ বিস্ফারিত, মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। অনিমেষ দু'হাতে ওকে ঝাঁকাতে লাগল। একটা নিশ্বাস টেনে স্থির হয়ে গেল

কালো শরীরটা। এক মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু অনিমেষের বুকের ভিতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। সিরিল নেই, ওদের বাঁচাতে ছেলেটা লড়ে গেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সারা রাতের ক্লান্তির কথা আমল দেয়নি। সেই মুহূর্তে অনেক শব্দ বাজল কানে। ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে। মহাদেবদার গলা পাওয়া গেল, 'অনিমেষ উঠে এসো।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। ট্রেনটা সাপের মতো এগিয়ে যাচ্ছে! কামরায় কামরায় মুখগুলো এখন ওর দিকে তাকিয়ে। রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে গেল ট্রেনটার দিকে। সামনে মহাদেবদার হাত, হাতটা সরে গেল। অনিমেষ পরের কামরার হাতল ধরার জন্যে লাফ দিতেই হাঁটুতে সেই ব্যথাটা আচমকা চলকে উঠল। নিজের শরীর এক পলকেই নিজের নয়, ট্রেনের গায়ে আঘাত খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল অনিমেষ। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে কেন্নোর পায়ের মতো ট্রেনের চাকাগুলোকে ছুটে যেতে দেখল সে। তারপর সব অন্ধকার।

একটা রেললাইন, তার ওপরে ছোট ছোট গাছ যার ওপর আকাশটা উপুড় হয়ে আছে। এমন একটা স্থিরচিত্র দুচোখের সামনে, অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। পরক্ষণেই মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভবে এল। হাত চলে এল অজান্তেই, অনিমেষ চটচটে উষ্ণতা স্পর্শ করতেই আবার চোখ খুলল। আঙুলগুলো গড়িয়ে রক্ত ঝরছে। এক মুহূর্ত মাত্র, অনিমেষ চট করে সোজা হয়ে বসল। যন্ত্রণাটা এখন যত তীব্রই হোক না কেন, অনিমেষ সাদা চোখে চারধারে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। দশ-বারোজন দেহাতি মানুষ গোল হয়ে ঘিরে তাকে দেখছে। সে উঠে বসতেই একটা অস্ফুট শব্দ হল কারও কারও মুখে, ভাবটা এমন যে লোকটা বেঁচে আছে। একজন চেঁচিয়ে কাউকে ডাকল।

কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতেই মানুষের বৃত্তটা বড় হল। অনিমেষ বুঝতে পারছিল তার আঘাত বীভৎস রকমের, কারণ লোকগুলোর চোখে দারুণ বিস্ময়। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথায় চিন্তাটা চলকে উঠল। পালাতে হবে, এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাওয়া দরকার। আশেপাশে কোথাও রেলগাড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, এমনকী সেই ছুটে যাওয়া পুলিশটাও নেই। অনিমেষের চোখের ওপর এখন একটা লালচে পরদা আসতেই সে রগড়ে নিল চোখ। ও পাশে সিরিলের শরীর মাটিতে শক্ত হয়ে পড়ে আছে, পুলিশটার দেহের পাশে।

অনিমেষ এক পা এগোতেই মানুষগুলো যেন চিন্তিত হল। কোন দিকে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে সে জানে না। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা বোকামি হবে। সে পা ফেলল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, বারংবার ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে চোখ, কাঁধ থেকে মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, অনিমেষ জঙ্গলের দিকে এগোল। বৃত্তটা এর মধ্যে ভেঙে গেছে। অনিমেষ এগিয়ে যেতে লোকগুলো কৌতূহলী হয়ে ওর পেছনে হাঁটা শুরু করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের নিষেধ করতে গিয়ে উত্তেজিত হল অনিমেষ, 'কেউ আসবে না, খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে বোমা আছে, সবকটাকে মেরে ফেলব!'

চিৎকারটা শুনে লোকগুলো প্রথমে থতিয়ে গেল। কিন্তু অনিমেষ হাঁটা শুরু করতেই ওরা এগোতে লাগল। সঙ্গে একটা পেনসিল কাটা ছুরিও নেই, অনিমেষ এবার দৌড়াবার চেষ্টা করল। আর তার ফল হল বিপরীত। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো চিৎকার করে উঠল, 'ভাগতা হ্যায়, ডাকু ভাগতা হ্যায়।' আচম্বিতে একটা পাথর এসে ছিটকে পড়ল পিঠে। মাথা থেকে যন্ত্রণাটা যেন এবার সারা শরীরে ছড়াল। অনিমেষ ঘুরে তাকাল। লোকগুলো এবার তার দিকে ছুটে আসছে। প্রত্যেকের হাতে পাথর। সে না তাকালে এতক্ষণে ওগুলো ছোড়া হয়ে যেত। এখন তাকাতেই হাতগুলো নেমে এল কিন্তু পাকড়ো পাকড়ো চিৎকারটা কমল না।

অনিমেষ দু'হাত জোড় করল, 'শুনুন, আপনারা ভুল করবেন না, আমি ডাকাত নই, আমি আপনাদের মতোই একজন মানুষ। আমি নিজের জন্যে কখনও খুন করিনি। আপনারা বিশ্বাস করুন।'

'পাকড়ো পাকড়ো, মার ডালা সিপাইকো।' পেছনে আরও গলা পাওয়া যেতেই সামনের লোকগুলো উজ্জীবিত হল। অনিমেষ বুঝতে পারছিল এদের এখনই থামানো দরকার। সে মরিয়া হয়ে চিৎকার করল, 'শুনুন, আমি ডাকাত নই। আমরা এই দেশের জন্য কাজ করছি। আপনাদের অবস্থা আমরা পালটাতে চাই। সারা দেশে আজ আমরা লড়ছি। আপনারা নিশ্চয়ই নকশালবাড়ির নাম শুনেছেন।'

'ন-ক-শা-ল।' শব্দটা অস্পষ্ট শোনা গেল মানুষগুলোর মুখে। সেই মুহূর্তে দূরে পালিয়ে যাওয়া পুলিশটাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সমানে চিৎকার করছে সে, 'পাকড়ো পাকড়ো!'

BanglaBook.org

অনিমেষ আবার কিছু বলতে গিয়ে হতাশ হল। সে লোকগুলোর হাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার শেষ চেষ্টা করল। এতক্ষণে চোখ অন্ধ, রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে মুখে। অনিমেষের ছুটন্ত শরীরে ছোট ছোট পাথর ছিটকে পড়ছিল। একসময়ে মাথার পেছনটা ঝনঝন করে উঠতেই অনিমেষ বসে পড়ল। পরমুহূর্তেই অনেকগুলো হাত একসঙ্গে নেমে এল ওর শরীরে। অনিমেষ শেষবার চেষ্টা করল কথা বলতে। হাতগুলো এখন নির্মম।

সারা শরীর আগুনে পুড়ছে এমন অনুভব হল অনিমেষের। চোখ বন্ধ, চেষ্টা করেও দুটো পাতা খুলতে পারল না সে। একটু বাদে বুঝতে পারল কোনও চলন্ত জিনিসের ওপর সে শুয়ে আছে। দুর্বল একটা চিন্তাশক্তি কোনওরকমে টিকে ছিল মাথায়, সেটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিল সে। ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল, দু' একবার হর্ন, কোনও ছুটন্ত গাড়িতে শুয়ে চলেছে সে। গাড়িটা কার, কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন কোনও ভাবনা মাথায় এল না। আচ্ছন্নের মতো বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে যাবার পর সে কাঁধে নরম স্পর্শ পেল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে একটা কিছু তার শরীর স্পর্শ করছে বারংবার। পেটের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটো তোলার চেষ্টা করল সে। কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, দুটো হাত একসঙ্গে ওপরে উঠেই পড়ে গেল। কব্জিতে সাড় নেই। দুটো কবজি একসঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়ে আছে। অর্থাৎ এখন সে বন্দি। আর একবার চোখ খোলার চেষ্টা করল সে প্রাণপণে। অস্পষ্ট সাদা যেন সামনে ঝুলছে। সে কি অন্ধ হয়ে গেল। অনিমেষ চেষ্টা করল মনে করতে কোনও আঘাত তার চোখে লেগেছিল কিনা। ভাবতে পারছে না, কিছুই মনে পড়ছে না।

মুখ ঘোরাল সে। একটা বোধ তার হচ্ছিল, মাথার বাঁ দিকটা ফেটেছে। ডান দিক দিয়ে পাশ ফেরার চেষ্টা করল সে এবার। যে জিনিসটার সে স্পর্শ পাচ্ছে সেটা মানুষ। অথচ সেই মানুষটা এমনভাবে ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে গড়িয়ে পড়ছে যে বোঝাই যাচ্ছে তার নিজের কোনও শক্তি নেই। অনিমেষ চাপা গলায় ডাকবার চেষ্টা করল, 'কে?'

কোনও উত্তর এল না। গাড়ির একটানা ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া কোনও কিছু কানে বাজছে না। পাশের মানুষটি কোনও সাড়া দিল না। মাথার মধ্যে ফিকে অন্ধকার হঠাৎ দুটো টুকরো হয়ে গেল। পাশের মানুষটাকেও তা হলে তারই মতো বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কে হতে পারে? চিন্তাটা স্পষ্ট হতে শক্ত হয়ে গেল সে। সিরিল নয়তো! আর কেউ তো তাদের সঙ্গে ছিল না। মহাদেবদা তো সেই ট্রেনেই চলে গেছেন। সিরিল যদি হয় তা হলে তো—! জোর করে চোখ বন্ধ করে আচমকা পাতাগুলো খুলতেই অস্পষ্ট একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখটা যে সিরিলের তা বুঝতে অসুবিধে হল না ওর। সিরিলের মৃত শরীরের পাশে সে শুয়ে যাচ্ছে। আহ্, সিরিল! সেই উজ্জ্বল ছেলেটা! অনিমেষ চোখ বন্ধ করতেই আর একটা আওয়াজ এই প্রথম তার কানে ঢুকল। অস্ফুট যন্ত্রণার অভিব্যক্তি কারও গলায় বাজছে। মাঝে মাঝেই ককিয়ে উঠছে সে। কে হতে পারে? নির্ঘাত সেই পুলিশটা। নিশ্চয়ই তাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই গাড়িতে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

গাড়িটা কখন থেমেছিল টের পায়নি অনিমেষ। স্পষ্ট একটা গলা কানে এল, 'ডেড?' শব্দ হল, কেউ গাড়িতে উঠল। মচমচ শব্দটা কানে যেতে অনিমেষ স্থির হয়ে গেল। বেশ জোরে কেউ লাথি মারল তার পাছায়। অনিমেষ অনেক কষ্টে শক্ত হয়ে থাকল। লোকটার গলা কানে এল, 'মরে গেছে মনে হচ্ছে।'

'ভাল করে দ্যাখ।' হুকুমটা এল বাইরে থেকে।

'নড়ছে না। কিন্তু এখনও রক্ত বের হচ্ছে।

'মড়ার শরীর থেকে রক্ত বের হয় না। তা হলে বেঁচে আছে।' একটা হাত গলা এবং বুকের ওপর কিছুক্ষণ হাতড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মরেনি স্যার, অজ্ঞান হয়ে আছে।'

'হরমোহনের কী অবস্থা?'

'গোঙাচ্ছে।'

'ওটাকে নামিয়ে আন।'

'কাকে স্যার!'

'নকশালটাকে। শেষ করে নিয়ে যাই।'

'গুলি করবেন স্যার?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। এখানে ধারে কাছে কেউ নেই।'

'কী দরকার স্যার। জলপাইগুড়িতে পৌঁছুবার আগেই পাশের বডিটার মতো শক্ত হয়ে যাবে। এ কেস টিকবে না।'

'নকশালদের তুই চিনিস না।'

'তা হলে স্যার গাড়িতেই গুলি করুন। কষ্ট করে নামালে আবার ওটাতে হবে তো।'

'তা ঠিক। তবে এমন ভাবে গুলি করবি যাতে গাড়িতে দাগ না হয়। বুঝলি ?'

'আমি করব স্যার ?'

'আমি তুমি আবার কী কথা ? জলদি কর। করা দরকার সেটাই আসল কথা। এই শালা নকশালদের ঝাড়েবংশে শেষ করা দরকার।'

পায়ের আওয়াজ একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। আসাটা খুব স্বচ্ছন্দ নয় বুঝতে পারা যাচ্ছিল। এবার ওরা গুলি করবে, অনিমেষ এটুকু ভাবতে পারল। গুলিটা গায়ে লাগলেই সে মরে যাবে। অথচ তার হাত নাড়ার সামান্য ক্ষমতা নেই। গুলিটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অনিমেষ নিজের অজান্তেই ভয়ের কথা ভুলে গেল। এই মুহূর্তে, সম্পূর্ণ অসচেতনতায় মাধবীলতার মুখ চলকে উঠল সামনে। মাধবীলতার সেই আদুরে হাসিটাকে বন্ধ চোখের পাতায় অনুভব করতে করতে কান ফাটানো শব্দটা তার শরীর কাঁপিয়ে দিল। পেটের ভেতর আর একটা যন্ত্রণা জন্ম নিল মাত্র। কিন্তু চোখের সামনে থেকে মাধবীলতা এখন উধাও, তার চেতনা মুছে যেতে যেতে একটা সুতোয় যেন ঝুলতে লাগল। সিপাহিটা বলল, 'হয়ে গেছে স্যার।'

'মরেছে ?'

'একদম পেটের ভেতরে।'

'রক্ত পড়ছে ?'

'গলগল করে।'

'মুছে ফ্যাল।'

'মুছব ? মুছব কীসে ?'

'সেই জন্যেই তো বাইরে বের করে কাজটা শেষ করতে বলেছিলাম। এত কুঁড়ে হলে চলে! এখন ওই রক্তের দাগ নিয়ে তো আর ফেরা যাবে না।'

'যেতে যেতে রক্ত বের হতেও তো পারে।'

'তা পারে। রক্ত বের হলে আমরা কী করব। ঠিকই তো!'

'তা হলে নামি স্যার ?'

'বেশ, নাম।'

দুটো শরীরকে ওরা পাশাপাশি রাখছিল। এমন সময় একটা গলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'স্যার, মরেনি এখনও।'

'মরেনি ? এই যে বললি মরে গেছে।'

'তাই তো ভেবেছিলাম তখন।

'ভেবেছিলাম! এরকম ভাবলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে ?'

'তবে বেশিক্ষণ টিকবে না স্যার। হয়ে গেল বলে।'

'এখন তো কিছুই করা যাবে না। পাবলিক দেখছে, এটা হাসপাতাল। এই যে, আপনারা কী দেখছেন এখানে ? যান যান, নিজের কাজে যান। ডেডবডি দ্যাখেননি কখনও ? যান।—আসুন ডক্টর।'

'দুটোই ডেড কেস ?'

'অলমোস্ট।'

'অলমোস্ট মানে ? এ দেখছি এখনও মরেনি। খুব সিরিয়াস কেস। অনেকগুলো উন্ড হয়েছে দেখছি। এই, একে তোল শিগ্‌গির।'

অফিসারের গলা শোনা গেল, 'ঝামেলা বাড়াচ্ছেন কেন ? মুখে যেতে যেতে ঠেঁসে যাবে। এখন জামাই আদর করে কী লাভ ?'

তা সত্ত্বেও অনিমেষ যেন টের পেল সে দোলনায় দুলছে। অথবা পালকিতে চড়ে যাচ্ছে কোথাও। শারীরিক যন্ত্রণার বোধগুলো কখন নেতিয়ে গিয়েছিল। অনন্ত শূন্যে সে যেন একা ভেসে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, কাউকে কিছু করার ক্ষমতা অথবা ইচ্ছেটুকুও তার নেই। আঃ, কী আরাম!

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অনিমেষ চুপচাপ দরজার দিকে তাকিয়েছিল। এখানে সে কতদিন এসেছে হিসেব নেই। যেটুকু অনুমান তাতে দুটো মাসের হিসেব সে পাচ্ছে না। জ্ঞান হবার পর শরীরের কষ্টগুলো ওকে পাগল করে তুলেছিল। এখন সেগুলো থিতিয়েছে। সব সময় অবসন্ন লাগে। আজ সকালে প্রথম পা রেখেছিল মাটিতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শরীর টলতে লাগল। নিজেকে এখন ঝাঁঝরা লাগছে।

মাথায় চুল নেই বললেই হয়। ক'বার কামানো হয়েছে সে জানে না। ব্যান্ডেজ খুলে এখন হাওয়া লাগানো হচ্ছে। হাত দিতেই বোঝা যায় খুব বড় অপারেশন হয়ে গেছে। পেটের কাটা দাগ এখন শুকনো। কিন্তু শরীরে জোর নেই এক ফোঁটাও। যে নার্স অথবা ডাক্তার তাকে দেখতে আসেন তাঁরা কথা বলেন না বাড়তি। মেশিনের মতো কাজ করে যান তাঁরা। অনিমেষ চেষ্টা করেও জানতে পারেনি সে কী অবস্থায় আছে। তবে দরজার দিকে তাকালেই পাহারাদার চোখে পড়েছে।

প্রথম বার পায়ে গুলি লাগার পর দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। কলকাতার সেই হাসপাতালে থাকার সময় মনের ওপর চাপ পড়ত খুব। এখন একটা দিন এল কি গেল তাতে কিছুই এসে যায় না। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চিন্তা করার ক্ষমতাটাই তার হারিয়ে গেছে। বোধ যদি ভোঁতা হয়ে যায় তখন যন্ত্রণা অনুভবে আসে না। যেমন সকাল থেকে সে একটা চিরকুট পড়ার পর থেকেই সেটা নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। অবশ্য ঘর মোছার পর যে লোকটা ওটা এনেছিল সে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যে লিখেছে তাকে অনিমেষ মনে করতে পারছে না। আজ দুপুরে নাকি তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন নিয়ে যাবে তখন যেন সে চুপচাপ থাকে। সেখানে বেশি পুলিশ যাবে না। তাই যে চিঠি লিখেছে সে জানিয়েছে একটা চেষ্টা হবে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। সে যেন সজাগ থাকে।

দরজার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ সকাল থেকে ব্যাপারটা ভেবে কূল পাচ্ছিল না। কেনই বা তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে কিংবা কেনই বা তাকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে? ছিনিয়ে যারা নেবে তারা কোথায় তাকে রাখবে? মুশকিল হল, এই সব ভাবনা চিরকুট পড়ার পর থেকেই মাথায় তুবড়ির মতো ফিনকি দিয়ে উঠেই নিবে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ ভাবলেই কান-মাথা গরম হয়ে শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

'এখন কেমন আছ হে?'

একটি বয়স্ক গলা জুতোয় শব্দ তুলে পাশে এসে দাঁড়াল। অনিমেষ তার ইউনিফর্মটা দেখল। মোটাসোটা লোকটার কোমরে রিভলভার ঝুলছে। অনিমেষ মুখ ফেরাল। লোকটি হিকহিক করে একটু হাসল, 'নাও, মুক্তি। ডাক্তার তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এবার শ্বশুরবাড়িতে চলো। ওঠো।'

কোনও প্রতিবাদ না করে অনিমেষ উঠে বসতে চেষ্টা করল। শরীর কাঁপছে। লোকটা বলল, 'এখনও কাহিল দেখছি। আরে বাবা মিছিমিছি কষ্ট করছ তুমি। আমার সঙ্গে হাত মেলাও দেখবে তুমি ড্যাং ড্যাড্যাং করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। কী, হাত মেলাবে?'

অনিমেষ তাকাল লোকটার দিকে। কী বলতে চাইছে ধরতে পারল না সে। লোকটা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মহাদেব কোথায়?'

মহাদেব! অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়ল। মহাদেব কে? তারপরেই মহাদেবদার কথা মনে পড়ল। মহাদেবদা রেলের কামরায় দাঁড়িয়ে তাকে চিৎকার করে ডাকছিলেন। সেই মহাদেবদার কথা জিজ্ঞাসা করছে এরা। অনিমেষ আর কিছু ভাবতে না পারলেও এটা স্থির করতে পারল মহাদেবদার কথা কিছুতেই বলা উচিত নয়। সে নীরবে মাথা নাড়ল। জানি না।

'হারামির বাচ্চা! একশো বার প্রশ্ন করলাম তবু এক উত্তর। মেরে পেছনের ছাল ছাড়িয়ে নেব যখন তখন বুঝতে পারবে। আরে বাবা, বলেই ফেলো না বাবা লোকটা কোথায় লুকিয়েছে? কেউ জানতে পারবে না, মাইরি বলছি, আমার প্রমোশনটাও হয়ে যাবে আর তুমিও ছাড়া পেয়ে যাবে। বলো ভাই!' লোকটি ওর কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু অনিমেষ ততক্ষণে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এই প্রশ্নটা তাকে অনেকবার করা হয়েছে? কিন্তু তার এ কথা একটুও মনে পড়ছে না কেন? স্মৃতিশক্তি কি একদম অকেজো হয়ে গেছে! অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

BanglaBook.org

'তোমরা তো একসঙ্গে হাসিমারা থেকে হাওয়া হয়েছিলে। আরে বাবা, ওই করুণাসিন্ধু সে-কথা আমাদের বলেছে। মহাদেব ট্রেনে উঠে পড়েছিল, তুমি পারোনি। লোকটা কী স্বার্থপর দ্যাখো, তোমাকে একা ফেলে বেশ কেটে পড়ল। তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে সেইটে বলে দাও ভাই।'

অনিমেষ চোখ খুলল, 'আমি জানি না।'

নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগল তার। সরু এবং কাঁপা কাঁপা হয়ে গেছে কখন।

'শালা! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। তখনই টেঁসিয়ে দিলে ভাল হত। ঠিক আছে, এক ঘন্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে ভেবে দ্যাখো বলবে কি না। তারপর তোমার হচ্ছে। এখন ওঠো, থিয়েটার করে আসবে চলো।'

থিয়েটার! অনিমেষ অবাক হয়ে তাকাতেই লোকটা ওর কাঁধ ধরে টেনে দাঁড় করাল। সমস্ত শরীরে ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেল তার। এবার পেছন থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে ওর কোমরে একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে টানতে লাগল।

তাল রাখতে অনিমেষের অসুবিধে হচ্ছিল। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো সে টাল খাচ্ছিল। অফিসার ওর পাশে হেঁটে এসে নিজের মনেই বলল, 'মালের হাল যা দেখছি তাতে হাতকড়া পরাবার কোনও দরকার নেই।' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'গাড়িতে তোল। যত আদিখ্যেতা হয়েছে আজকাল। কেউ মরলেই নিয়ে যেতে হবে দেখাতে।

গাড়ির দরজা ধরে নিজেকে সামলাল অনিমেষ। কে মরেছে? সে অফিসারের দিকে তাকাতেই তাকে প্রায় তুলে ভ্যানের পেছনে ফেলে দেওয়া হল। দুটো সিপাই বন্দুক নিয়ে ওর সঙ্গে উঠল। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হওয়ামাত্র গাড়ি ছেড়ে দিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর নিজেকে সামলাতে পারল অনিমেষ। পুলিশ দুটো নির্বিকার মুখে বসে আছে। মাথার পাশে ছোট্ট জানলার মতো চৌকো গর্ত। অনিমেষ তাতে চোখ রাখল। দিনবাজার ছাড়িয়ে শিল্প-সমিতিপাড়ার দিকে যাচ্ছে গাড়ি। দু-ধারে নির্বিকার লোকজন হাঁটছে বা আড্ডা মারছে। দেওয়ালের গায়ে গায়ে লেখা "নকশালবাড়ি লাল সেলাম।'

একসময় গাড়ি থামল। সিপাই দুটো দরজা খুলে নীচে নেমে দড়ি ধরে টানতে অনিমেষ নেমে এল। এই সময় অফিসারটি হাসতে হাসতে এসে ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল, 'যাও, শেষবার দেখে নাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।'

অনিমেষ গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকজন দেখতে পেল। সবাই চুপচাপ বসে আছে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। চিতা সাজানো হয়ে গেছে। চিতার পাশেই মাটিতে কাপড়ের ওপর একটি দেহ শুয়ে আছে। সিপাই ওকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে এল শরীরটির কাছে। অনিমেষ পাথর হয়ে গেল।

সরিৎশেখর শুয়ে আছেন। খুব স্বাভাবিক মুখের চেহারা, যেন ঘুমাচ্ছেন। তাঁর শরীর একটা কাপড়ে বুক অবধি ঢাকা, চোখ বন্ধ। দাদু মারা গেছেন? অনিমেষের চিবুক বুকের ওপর নেমে এল। ঠিক সেই সময় অনিমেষ কনুইতে হাতের স্পর্শ পেল। অনিমেষ মুখ তুলল, ছোটমা।

ছোটমায়ের মাথায় ঘোমটা, মুখ পাথরের মতো। নিচু গলায় বলল, 'কাছে চলো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছিল।'

আচ্ছন্নের মতো অনিমেষ ছোটমায়ের সঙ্গে দাদুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো চন্দন মাখা তুলসীপাতা দাদুর চোখে লাগানো। অনিমেষের বুকের ভেতর হু-হু করছিল কিন্তু আশ্চর্য, তার চোখে জল আসছিল না। কাঁদতে চাইছিল সে কিন্তু কিছুতেই কান্না আসছিল না। ছোটমায়ের গলা শুনতে পেল সে, 'উনি তোমাকে দুদিন দেখতে গিয়েছিলেন কিন্তু ওরা দেখতে দেয়নি। তবে উনি জেনে গেছেন তুমি ভাল হয়ে গেছ।'

এই সময় শ্মশানবন্ধুরা দাদুর শরীরটাকে চিতায় শোওয়াবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ছোটমা অনিমেষের বাজু থেকে হাত সরায়নি। চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে।' অনিমেষ ছোটমায়ের দিকে তাকাল। ছোটমা বলল, 'তোমার দাদুর শেষ ইচ্ছে ছিল।'

অনিমেষ মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। বেশ কিছুটা দূরে মহীতোষ বসে আছেন দুহাতে মুখ ঢেকে। বাবার কাছে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে ওর। কিন্তু ছোটমা ওকে চিতার পাশে টেনে নিয়ে গেলেন। দাদুর শরীর আগুনের অপেক্ষায়। ছোটমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'দু মিনিটের জন্যে হাতকড়া খোলা যাবে না?' অফিসারটির গলা শোনা গেল, 'হাতকড়াতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

'আপনারা কি মানুষ!' হিস-হিস করে উঠল ছোটমা।

BanglaBook.org

হাতকড়া পরা অবস্থায় মুখাগ্নি করল অনিমেষ। চিতা জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। হঠাৎ অনিমেষের চোখের সামনে বহু বছর আগের সেই ছবিটা ছিটকে চলে এল। এই শ্মশানে সে একদিন মায়ের মুখে আগুন ছুঁইয়েছিল। মায়ের শরীরের রক্ত তার হাতে শুকিয়েছিল। লাল আগুনের আড়াল থেকে মায়ের ছড়ানো চুল দেখা যাচ্ছিল। সেদিন সে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। মহীতোষ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আজ, দাদুর চিতার দিকে তাকিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সেই প্রিয় শরীরটা, জন্ম থেকেই যা ছিল তার আশ্রয় তা এখন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে আগুনে। চোখ বন্ধ করল সে।

হরিধ্বনি চলছিল তখনও। এমন সময় কানের পাশে ফিসফিসে গলা পেল অনিমেষ, 'কোমরের দড়িটা কেটে দিলেই আপনি ডানদিকে দৌড়ে যাবেন। ওখানে গাড়ি স্টার্ট করা আছে। আমরা ওদের বোম মারব।'

চিতায় কাঠ শব্দ করে ফাটছে। অনিমেষ বিস্ময়ে ছেলেটির দিকে তাকাল। শ্মশান বন্ধুদের মধ্যে একজন এরকম পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে! কিন্তু সে দৌড়ে যাবে কী করে? স্বাভাবিক ভাবেই সে হাঁটতে পারছে না। তা হলে? সে মাথা নাড়ল, না। ছেলেটি বলল, 'সে কী! সবাই রেডি, এখন না বলছেন কেন?

'আমি পারব না।'

'বোকামি করবেন না।'

অনিমেষ পেছনের দিকে তাকাল। পুলিশ দুটো অন্যমনস্ক হয়ে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু অফিসারের একটা হাত কোমরে ঝোলানো রিভলভারের ওপর। চোখ তার দিকে সতর্ক। অনিমেষ বুঝতে পারল পালিয়ে যাওয়ামাত্র তাকে গুলি খেতে হবে। এখন তার শরীরের যা অবস্থা তাতে গুলির হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শুধু তাকে মেরেই এরা শান্ত হবে না, যারা এই পরিকল্পনা করেছে তারাও বিপদে পড়বে। অনিমেষ এটুকু ভাবতে পারল এটা খুব বোকামি হবে। হ্যাঁ, হঠকারিতা বোধ হয় একেই বলে। নিজের জন্যে সে চিন্তা করছে না, এই ছেলেগুলোকে বিপদে পড়তে সাহায্য করা কিছুতেই উচিত হবে না। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে অফিসারটির দিকে এগিয়ে গেল, 'চলুন।'

অফিসার বলল, 'ছোঁড়াটা তোমাকে কী বলছিল?'

'আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। চলুন।'

'ভাবভঙ্গি ডাউটফুল। পরে দেখব। এই, চলে এসো সব।' অফিসার গাড়ির দিকে এগোলেন। অনিমেষের মাথার ভেতরটা টনটন করছিল। মাঝে মাঝেই সব সাদা হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির দরজায় হাত রেখে ওর মহীতোষের কথা মনে পড়ল। এখন দূরত্বটা অনেক বেড়ে গেছে। বাঁ দিকে নদীর গায়ে দাদুর শরীর এখন পূর্ণ-আগুনে গলে গলে পড়ছে। ডানদিকে সেই একই অবস্থায় মহীতোষ বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি এখন অনিমেষের দিকে। চোখাচোখি হলেও চোখ সরিয়ে নিলেন না। বিমর্ষ ওই চোখ দুটো যেন অনিমেষকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। বাবার সঙ্গে কোনওদিনই তার আন্তরিক সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু বাবা একলা, খুব একলা এ-কথা অনিমেষ বুঝল। আজ পুলিশের ভ্যানে ওঠার সময় সে যেন এই বোঝার ব্যাপারটা বাবাকে নতুন করে বোঝাতে পারলে খুশি হত। এই সময় সে ছোটমাকে এগিয়ে আসতে দেখল। পেছনে চিতার উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে ছোটমাকে খুব দীপ্ত দেখাচ্ছে। ভ্যানের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল ছোটমা, 'ওকে শ্রাদ্ধের দিন বাড়িতে আনা যাবে।'

অফিসার ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'কেন?'

'পরশু ওকে কলকাতায় চালান করা হবে। ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট তো। ওঠো, উঠে পড়ো।'

অনিমেষ ভ্যানে উঠে বসামাত্র সিপাই দুটো দরজা বন্ধ করল। তারের জানালার মতো ফোকর দিয়ে অনিমেষ বাইরে তাকাতেই চিতাটাকে চোখে পড়ল। দাদুর শরীর আর দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যেই একটা গোল পিণ্ডের মতো হয়ে গেছেন সরিৎশেখর। দাদু নেই। দাদুর চলে যাওয়াতে ওর কোনও কষ্ট হচ্ছে না। শেষ সময়ে উনি যে কষ্ট পাচ্ছিলেন তার চেয়ে চলে যাওয়া ওঁর পক্ষে অনেক ভাল হল। কিন্তু মুখাগ্নিটা ওকেই করতে বলে গিয়েছিলেন কেন? তার এত কথা জানার পরও কি দাদুর কোনও মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়নি? বাবা মহীতোষের যে তার সম্পর্কে অভিমান রাগ কিংবা আক্ষেপ হয়েছে এ-কথা স্পষ্ট। কিন্তু দাদু কি তাকে সমর্থন করতেন?

চিতাটা এখন চোখের আড়ালে চলে গেছে। পিচের রাস্তায় উঠে এসেছে গাড়ি। এমন সময় কান ফাটানো শব্দ হল। গাড়িটা সামান্য নড়ে উঠল, বোধ হয় সামনের কাচগুলোই ঝনঝন করে পড়ে

BanglaBook.org

গেল। অনিমেষের পাশে বসা সিপাই দুটো চেঁচিয়ে উঠল, 'বোমা মারতেছে।'

দরজাটা ভাল করে এঁটে অনিমেষকে আঁকড়ে ধরে বসে রইল ওরা। পুলিশ ভ্যানের ওপর বোম চার্জ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পালটা ফায়ারিং-এর শব্দ কানে এল। বোধ হয় সামনের সিটে বসে থাকা অফিসার গুলি ছুড়ছেন। ড্রাইভার বোধ হয় আচমকা আক্রমণেই গতি কমিয়েছিল, এখন সেটা বাড়িয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব হারিয়ে গেল। শহরের মধ্যে এসে গাড়িটা খুব শান্ত ভঙ্গিতে চলতে লাগল। অনিমেষ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করল। আর তখনই আচম্বিতে দু চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল গালে। ওরা ওকে ভালবেসেই ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু শুধু ভালবাসা কখনওই ধারালো হয় না যদি তাতে বাস্তবের শান না দেওয়া থাকে। ঠোকর খাওয়ার আগে আমরা যে সেটা বুঝতেই চাই না।

হাসপাতালে নয়, জলপাইগুড়ি থানায় এসে থামল ভ্যানটা। প্রথমে বেশ উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পেল অনিমেষ। মানুষজনের ছুটোছুটি, গাড়ির আওয়াজ থেকে বোঝা গেল আর একদল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। অনিমেষের পাশের সিপাই দুটো দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় অফিসার ওদের কাছে এলেন, 'গর্তে মুখ লুকিয়ে ছিলি কেন তোরা? ফায়ার করতে পারিসনি?'

'কী করে করব? গাড়ি যে থামেনি।'

'থামেনি! এই করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো যায়? এই যে হিরো, নেমে এসো। এবার তোমার চামড়া দিয়ে তবলা বানাব। বন্ধুদের দিয়ে আমার ওপর বোম মারানো হচ্ছিল! পালিয়ে যাওয়ার মতলব? নামো!' চিৎকার করে উঠল অফিসার।

অনিমেষ এটুকু বুঝতে পারছিল তার ওপর ঝড় নেমে আসছে। কিন্তু যতটা পারা যায় নিজেকে ততটা নির্লিপ্ত রাখতে চাইছিল সে। কিন্তু ভ্যান থেকে নামতে গিয়েই মাথাটা এমন টলে উঠল যে, সে তাল রাখতে পারল না। হুড়মুড় করে পড়তে পড়তে সে একবার মাত্র আকাশটাকে দেখতে পেল।

স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর অনিমেষ শুয়েছিল। জ্ঞান ফিরতেই বুঝতে পারল তার হাত এবং পা ভাল করে বাঁধা। তবে ঘরটায় আলো আসছে। প্রথমে ওর মাথায় একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এল না, বরং পেট চিনচিন করছে, বেশ ক্ষুধা বোধ হল তার। এখন বোধ হয় বিকেল। কারণ ক্রমশ আলো কমে আসছিল। এই সময় লোহার দরজা খুলে অফিসারটি ঘরে ঢুকল, 'ঘুম ভাঙল?'

অনিমেষ কোনওরকমে উঠে বসল, বসে বলল, 'খাবার দিন।'

'খাবার! ও গড! তোমার খাবার দরকার। খিদে পায় তা হলে! কী খাবে, এখানে যা পাওয়া যায় সব এনে দেব! মহাদেব কোথায়?' লোকটা পা ফাঁক করে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'এক প্রশ্ন বার বার করছেন কেন?'

চাবুকের মতো হাতটা নেমে এল, 'অ্যাই বাঞ্চোত, বলবি কিনা বল।'

প্রচণ্ড যন্ত্রণা মাথা থেকে ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়ল। অনিমেষ দাঁতে দাঁত টিপে সামলাতে থাকল নিজেকে। তার মুখ হাতের টানে এখন ওপরের দিকে। অফিসার গরগর করল, 'সবকটাকে ধরব আজ। পুলিশকে মারার তাল হচ্ছিল। বিপ্লব করছেন। পেচ্ছাপ করে দিই বিপ্লবের মুখে। হাঁ কর হাঁ কর বলছি।'

হঠাৎ শরীরের মধ্যে অস্থিরতা টের পেল অনিমেষ। ঘেন্নায় গুলিয়ে উঠছে পেট বুক, সর্বাঙ্গ। তার মাথা এখনও অফিসারের হাতের মুঠোয়। সেই অবস্থায় সে সজোরে সমস্ত ঘেন্না জড়ো করে ছুড়ে মারল। এক দলা থুতু লোকটার শরীরে মাখামাখি হতেই প্রথমে হতভম্ব হয়ে হাত ছেড়ে দিল লোকটা। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে অনিমেষের ওপর, শকুনের মতো।

তেতাল্লিশ

'আজ আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসছেন।' মিষ্টি গলায় বলল একজন অফিসার। তার সাদা ইউনিফর্ম কলকাতা পুলিশের। জায়গাটা লালবাজার।

একটু আগে একটা খবরের কাগজ ওরা ওকে দিয়ে গিয়েছিল। তার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে একজন বিখ্যাত নকশাল নেতার গ্রেপ্তারের খবর ছাপা আছে। অনেক চেষ্টার পর তাঁকে ধরা সম্ভব হয়েছে। ভদ্রলোক খুব অসুস্থ। নকশালবাড়ির আন্দোলন ওঁকে গ্রেপ্তারের পরই শেষ হয়ে গেল

BanglaBook.org

বলে পুলিশ আশা করছে। খবরটার সত্যতা সম্পর্কে অনিমেষ চিন্তা-ভাবনা করল না। কোনও বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করার ক্ষমতা সেই হাসপাতালেই সে হারিয়ে এসেছে। মুশকিল হল, পুলিশগুলো এই ব্যাপারটা বুঝছে না। কলকাতায় ওকে নিয়ে আসবার পর মহাদেবদার ঠিকানা জানার জন্যে ওরা ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে। নিজের পক্ষে লড়বার মতো সামান্য ক্ষমতা তার অবশিষ্ট নেই, এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে তার কষ্ট হয়।

অফিসারের কথাটা শোনার পর সে একটু অবাক হল। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে এ-খবর এরা এই প্রথম খুব ঘটা করে জানাল। কে আসছে ? কলকাতায় যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে তা কাউকেই তো সে জানাতে পারেনি। জানাতে গেলে পুলিশ তাকে নাজেহাল করত। মাধবীলতার কথা বারংবার তার মনে পড়েছে কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছে সে।

'কে আসছে ?' অনিমেষ মাথা তুলল।

'আপনার স্ত্রী!'

'আমার স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ, অবাক হচ্ছেন কেন ? আপনি বিবাহিত নন ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, হ্যাঁ। মাধবীলতা আসছে। এরা মাধবীলতার কথা জেনে গেছে ? বুকের মধ্যে এক ধরনের ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। মাধবীলতা কেমন আছে এখন ? কতদিন ওর কোনও খবর পায়নি সে। নাকি কোনও সূত্রে খবর পেয়ে মাধবীলতা নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে! ইস, যদি কোনও সূত্রে ওকে নিষেধ করা যেত!

'শুনুন, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি আর চুপ করে থাকবেন না। মহাদেববাবুর খবর আপনি যা জানেন বলে দিন। আপনার স্ত্রী এখন অসুস্থ, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আমরা তার ওপর চাপ দিই।' অফিসারটি নরম মুখে বলল।

'অসুস্থ ?'

'কী আশ্চর্য, আপনি জানেন না ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। মাধবীলতার অসুস্থতার খবর সে জানে না।

'আপনি জানেন না তিনি সন্তানসম্ভবা ?' অফিসার হাসল।

একটা বরফের তীক্ষ্ণ ছুরি আচমকা অনিমেষের হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরল। কী বলছে লোকটা? সত্যি কথা ? নাকি এদের অসংখ্য মিথ্যের মতো এটাও এক ভাঁওতা ? মাধবীলতা মা হতে যাচ্ছে ? অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। শান্তিনিকেতনের সেই রাতটা এখন অজস্র শুঁড়ওয়ালা অক্টোপাসের মতো তাকে জড়িয়ে ধরছিল। সেই রাত কি আজ মাধবীলতাকে—। অনিমেষ কিছু ভাবতে পারছিল না। সেই রাতের ঘটনার পর তার এক মুহূর্তও এই চিন্তা মাথায় আসেনি। কখনও ভাবেনি মাধবীলতা ওই এক মুহূর্তের উত্তেজনায় মা হয়ে যেতে পারে।

অফিসারটি মাধবীলতাকে তার স্ত্রী হিসেবে ভাবছে। অবশ্যই। কিন্তু এটা দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আন্তরিকতার ভিত্তিতে তৈরি। আইন কিংবা সমাজ স্বীকৃতি দেবে না। তা ছাড়া সে মাধবীলতার পাশে ছিল না, কখনও পাশে আসতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না বা নেই, তা হলে মাধবীলতা ঘটনাটিকে মেনে নিল কী করে। খুব স্বচ্ছন্দে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারত। কেন করল না ?

অফিসারটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ এখন একা। নির্জনে নিজেকে খুনি আসামির মতো মনে হচ্ছে তার। নিজের দুর্বলতার বোঝা মাধবীলতার কাঁধে চাপিয়ে সে নিশ্চিতভাবে এতকাল কাটিয়ে গেল। চিন্তাটা এতক্ষণ একমুখী ছিল, এবার তার অন্য কথা মনে পড়ল। মাধবীলতা কলকাতায় মেয়েদের হোস্টেলে এসে উঠেছিল। তার বিয়ে হয়নি এ-কথা সবাই জানে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পর যখন তার শরীরে মাতৃত্বের চিহ্ন ফুটে উঠল তখন কী করেছিল সে ? হোস্টেলে নিশ্চয়ই তাকে থাকতে দেয়নি। কোথায় আছে এখন মাধবীলতা ? কুমারী মেয়ে মা হতে যাচ্ছে—ওর বাবা কখনওই তা মেনে নেবেন না। অনিমেষ ছটফট করতে লাগল।

একটু বাদে অফিসার ফিরে এল, 'চলুন।'

অনিমেষ উঠল। এখন ওঠার সময় সমস্ত শরীর নড়বড় করে ওঠে। কোমরের হাড়ে ব্যথাগুলো খচখচ করে। হাঁটতে গেলে মাথায় টং টং করে লাগে। বাঁ দিকে একটু হেলে লেংচে লেংচে হাঁটে অনিমেষ। অনেকটা পথ তাকে পার হয়ে আসতে হল। ওর পাশে হেঁটে এলেও অফিসার একবারও সাহায্যের কথা বলল না। কিন্তু অনিমেষ যখন জিরিয়ে নেবার জন্যে থামছিল তখন মৃদুস্বরে

BanglaBook.org

জানাচ্ছিল, 'মহাদেববাবুর ঠিকানাটা বলে দিলেই তো সব গোলমাল মিটে যায়। এত কষ্ট করতে হয় না।' অনিমেষ জবাব দেয়নি। আশেপাশের লোকজন, সবই পুলিশেরই লোক, এদিকে লক্ষই করছে না। এরকম ঘটনা রোজ ওরা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছিল।

দোতলায় উঠতে পারল না অনিমেষ। একজন সিপাই ওকে প্রায় পাঁজাকোলা করে ওপরে তুলে দিয়ে গেল। দুটো ঘর পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে অফিসারটি থামল। তারপর হেসে বলল, 'আপনার স্ত্রী ভেতরে আছেন, আসুন।'

অনিমেষের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল। অফিসারের পেছনে পেছনে সে ঘরে ঢুকল। একটা সাধারণ আলো জ্বলছে কারণ ঘরটির কোনও জানালা চোখে পড়ছে না। সামনেই একটা চেয়ার, অনিমেষ তার হাতল ধরে দাঁড়াতেই মাধবীলতাকে দেখতে পেল। ঘরের আর এক প্রান্তে একা বসে আছে সে। সেখানে অন্য কোনও চেয়ার নেই। এতবড় ঘরের দুপাশে দুটো চেয়ার সাজানো— সেইটেই চোখে পড়ার মতো।

অনিমেষকে দেখেই মাধবীলতা উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তার মুখ থেকে একটা চাপা আর্তনাদ আচমকা বেরিয়ে এল। অনিমেষ মাধবীলতাকে দেখল। একটা হাত মুখের ওপর চাপা, বিস্ফারিত। হ্যাঁ, শরীরের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতন। বিশেষ করে কোমরের নীচের স্ফীতি চোখে পড়ছে সহজেই। অনিমেষ কোনওরকমে উচ্চারণ করল, 'লতা!'

মাধবীলতার কানে শব্দটা যেতেই যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বিদ্যুতের মতো কাছে চলে এল সে ওই শরীর নিয়ে, 'অনিমেষ, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ?'

অনিমেষ হাসবার চেষ্টা করেও পারল না।

'তুমি ভাল আছ অনি ?'

এবার পেছনে মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। মেঝেতে কার্পেট পাতা, হাঁটাচলায় আওয়াজ হয় না। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জনা চারেক মানুষ ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে ইউনিফর্ম না থাকলেও চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তারা পুলিশ। অফিসারটি এবার এগিয়ে এলেন, 'অনেকদিন বাদে আপনাদের দেখা হল, তাই না ? অবশ্য অনিমেষবাবু যদি নিজে আপনার কথা আমাদের জানাতেন তা হলে অনেক আগেই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারতাম। অনেক কষ্টে আপনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে হয়েছে মাধবীলতা দেবী। তবে দেরি হল বলে আফশোস করে লাভ নেই, বেটার লেট দ্যান নেভার। আপনার এ অবস্থায় অনিমেষবাবু আপনাকে ছেড়ে আছেন কী করে তাই বুঝতে পারছি না।'

মাধবীলতার গলার স্বর পালটে গেল, 'আপনারা ধরে রেখেছেন বলেই ওকে এখানে থাকতে হচ্ছে, জেনেশুনে এরকম কথা বলছেন কেন ?'

'ঠিক কথা। আমরা ধরে রেখেছি ক'টি মাস মাত্র। তার আগে উনি আপনার ত্রিসীমানায় ঘেঁষেননি স্বইচ্ছায়। আমরা ভেবেছিলাম উনি আপনাকে স্ত্রী হিসেবে ক্লেইম করবেন না, অবশ্য সেটা ভুল হয়েছে, উনি করেছেন। আপনি ভাগ্যবতী!' অফিসার হাসল।

'মানে ?'

'মাধবীলতা দেবী, আপনার স্কুলে কিংবা আগে যে হোস্টেলে থাকতেন সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে আপনার মিত্র হবার কোনও নোটিফিকেশন নেই। কবে আপনাদের বিয়ে হল সে-খবর কারও জানা নেই। অথচ আপনার শরীর বলছে আপনি মা হতে যাচ্ছেন। ব্যাপারটি যদি বৈধ না হয় তা হলে — ।'

অনিমেষ চাপা গলায় কথা বলল, 'কেন বাজে কথা বলছেন, মাধবীলতা আমার স্ত্রী, এ কথা আগেও বলেছি।'

'গুড। সে-কথাই আমি বলতে চাইছি। মুখের কথাই যথেষ্ট। আমরা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আপনাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেন না। আপনার স্ত্রীর, আপনার কথা মেনেই বলছি, আপনার স্ত্রীর কাছে এই সময় থাকা উচিত। আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

'কী ভাবে ?'

'আপনি জানেন মহাদেব একজন নটোরিয়াস লোক। তার ঠিকানা আপনি জানেন। জানি সেখানে সে এখন নাও থাকতে পারে তবু আমরা তার একটা ক্লু পেতে পারি। এটা আমার প্রস্তাব, আপনি যদি ঠিকানাটা বলেন আমরা এক্ষুনি আপনাকে ছেড়ে দেব এবং ব্যাপারটা কেউ জানতে

BanglaBook.org

পারবে না। আপনার কোনও ফেলো কমরেডরা টেরও পাবে না। এই সময় ওঁর সঙ্গে আপনার থাকা উচিত।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'আপনারা মিথ্যে চেষ্টা করছেন।'

'তা হলে আপনি কোঅপারেশন করবেন না?'

'যা ইচ্ছে ভাবুন।'

অফিসার বিরক্তিতে কাঁধ নাচাল। তারপর ছোট ছোট পা ফেলে মাধবীলতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আপনি কি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

মাধবীলতা বলল, 'ও যা ভাল মনে করছে তাই করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার বলে উঠল সামান্য গলা তুলে, 'তা হলে আপনাকে অ্যারেস্ট করছি।'

অনিমেষ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন?'

'আপনার সঙ্গে আঁতাতের জন্যে। দেশদ্রোহিতার জন্যে।'

'দেশদ্রোহী?'

'নাকি বিপ্লব? থুঃ। সাধারণ মানুষ আপনাদের নাম শুনলে ভয় পায়। একটা অর্গানাইজড ডাকাতের দল আপনারা। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে চেয়েছেন। অনিমেষবাবু, দিস ইজ লাস্ট টাইম, আপনার স্বপ্নের আন্দোলন ভেসে গেছে, যারা পারছে বিদেশে পালাচ্ছে, বেশিরভাগই ধরা দিচ্ছে, নেতারা জেলে—এখন আর আপনাদের অস্তিত্ব কিছু নেই। তাই বলছি, খামোকা জেদ করবেন না। মহাদেববাবুর ঠিকানাটা বলুন।'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাল। কী রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, গালের হাড় উঁচু, শরীর ফ্যাকাসে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে বুকের আড়ালে রাখতে। মাধবীলতা ওর দিকে তাকাতেই সে দু'চোখে যেন ইচ্ছেটাকেই বোঝাতে লাগল। সে কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় আছ এখন?'

'দেখুন, কী চমৎকার দায়িত্বজ্ঞান! আপনি কোথায় আছেন সে খবর আপনার স্বামী রাখেন না, অবশ্য আপনার স্বামী যদি হন! কী হল চুপ করে আছেন যে?'

অনিমেষের মাথায় গনগনে আগুন ছড়িয়ে পড়ল, 'এই যে, আপনি যা বলার আমাকে বলুন।'

'শাট্ আপ, চেঁচাবেন না। — আপনি চুপ করে আছেন কেন?'

'আমার কথা বলতে ঘেন্না করছে!'

অনিমেষ দেখল অফিসারের ডান হাত চাবুকের মতো বাতাস কেটে মাধবীলতার গালে আছড়ে পড়ল। লোকটা মাধবীলতাকে চড় মারল! নিজের শরীরের কথা খেয়ালে থাকল না অনিমেষের, প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল অফিসারটির ওপর। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই সে নিজেকে শূন্যে ভাসতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল সে। ব্যথাটা এমন মারাত্মক যে ককিয়ে উঠে নিঃসাড়ে মেঝেতে পড়ে থাকল। ওকে টেনে তোলা হল। তারপর টানতে টানতে চেয়ারে বসিয়ে কতগুলো বেলট দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হল যাতে সামান্য নড়াচড়া না করতে পারে। কোমরের তলায় শরীরের অবশিষ্ট অঙ্গগুলোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল না অনিমেষ। এতক্ষণ মাথার ভেতরটা চৈত্রের আকাশ হয়েছিল, এবার একটু একটু করে চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে আসতেই সে মাধবীলতার দিকে তাকাল। সে কি ঠিক দেখছে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত, অনিমেষ একবার জোরে চোখ বন্ধ করে আবার স্বচ্ছ হবার চেষ্টা করল। মাধবীলতার মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দুটো হাত উঁচু করে দুটো লোহার বালার সঙ্গে বাঁধা। বালা দুটো ওপরের কড়িকাঠে ফাঁস দেওয়া একটা দড়ির সঙ্গে নেমে এসেছে। দুটো হাত ওপরে টানটান থাকায় ওর শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে। সন্তানের আবাসস্থল এখন কুৎসিত দেখাচ্ছে। মাধবীলতার চিবুক শক্ত, দাঁতে ঠোঁট চেপে আছে সে।

'এই শুয়োরের দল, সাবধান বলছি, ওকে ছেড়ে দাও।' অনিমেষের চিৎকার শুনে দাঁত বের করে হাসল লোকগুলো।

মাধবীলতার সামনে এখন অফিসার ছাড়া আর একজন দাঁড়িয়ে। রোগা, লম্বা, মুখের দিকে তাকালে বিশ্বাস করা যায় দু হাতে দুটো শিশুর গলা টিপতে পারে হেসে হেসে। লোকটি বলল, 'মা জননী, আমার নও, পেটের বাচ্চাটার, এবার দিগম্বরী হও, দর্শন করি।'

অনিমেষ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল। কোমরের তলায় কোনও সাড় নেই, দু-হাত বাঁধা, পেছনের লোক চেয়ারে ধরে রাখায় সে একটু নড়াতেও পারল না।

BanglaBook.org

মাধবীলতা ধীরে ধীরে মুখ তুলল, 'আপনারা কী চান ?'

অফিসার একটু নড়ল, তার গলায় অদ্ভুত পেলবতা, 'সামান্যই, ওকে বলুন ঠিকানাটা জানাতে। এ সব ঝামেলা কার ভাল লাগে বলুন!'

'আমার ওপর অত্যাচার করছেন কী অধিকারে ?'

'যে অধিকারে ওরা মানুষ খুন করে, পুলিশের গলা কাটে! যে অধিকারে বিয়ে না করেও আপনার শরীরে এরা সন্তান দেয়— ।'

হঠাৎ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মাধবীলতা, 'শোনো, আমি মরে গেলেও তুমি এদের কিছু বোলো না। আমার জন্যে তুমি হেরে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি!'

লম্বা লোকটা হা হা করে হাসতেই অফিসার চোখ টিপে তাকে ইঙ্গিত করল। সে হাত বাড়িয়ে মাধবীলতার পড়ে থাকা আঁচল কুড়িয়ে নিল। তারপর মিউজিক্যাল চেয়ারের ভঙ্গিতে পাক খেতে লাগল হেলে দুলে। শাড়ি খুলে আসছে মাধবীলতার শরীর থেকে, লোকটা ছড়া আওড়াচ্ছে, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চলছে চলবে।' অনিমেষ আর তাকাতে পারছিল না। কিন্তু পেছন থেকে ওর মুখ দুহাতে চেপে তুলে ধরল, 'সামনে তাকাও!'

অনিমেষ বাধ্য হয়ে দেখল। দেখেই শেষবার শক্তি ব্যবহার করে নিষ্ফল হল। না, সে হেরে গেল। নিজেকে একটা অপদার্থ নির্জীব ক্লীব মনে হতে লাগল ওর। এখন মাধবীলতার শরীরে শাড়ি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে মাধবীলতা মাথা পেছনে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষের মুখ লোকটার হাতে ধরা, সে চোখ বন্ধ করতেই আচমকা কপালে তীব্র জ্বলুনি বোধ করল। অস্ফুট চিৎকার করতেই লোকটা একটা চুরুট ওর সামনে নাচাতে লাগল। অনিমেষের কপাল জ্বলে যাচ্ছিল। লোকটা বলল, 'চোখ বন্ধ রাখলে চলবে না। দেখতে হবে— সব দেখতে হবে।'

এই সময় লম্বা রোগা লোকটা এগিয়ে এসে চুরুটটা নিয়ে মাধবীলতার কাছে ফিরে গেল। অফিসার এবার অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী মশাই, বলবেন, না দেখবেন ?'

অনিমেষ উত্তর দিল না। সে বুঝতে পারছিল তার কাছ থেকে কিছু শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা মাধবীলতার ওপর অত্যাচার চালাবে। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তা সহ্য করা যে কোনও মেয়ের পক্ষেই কষ্টকর। শুধু তার জন্যেই মাধবীলতাকে এই জঘন্য অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। একজন সন্তানসম্ভবা মহিলার পক্ষে এই অত্যাচার মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এরা তা জেনেও করছে। অথচ মাধবীলতা একটুও মুখ খুলছে না। সে এখন কী করবে ? চোখের ওপর এই অত্যাচার দেখতে আর পারছে না সে। মহাদেবদা এখন আলিপুরদুয়ারে আছেন কি না সে জানে না। যদি খবরটা দিয়েই দেয় তা হলেও মহাদেবদার ক্ষতি নাও হতে পারে। কিন্তু মাধবীলতা বেঁচে যাবে। এক পলক চিন্তাটা মাথায় আসতেই সে ঠোঁট খুলেছিল। অফিসার তার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হঠাৎ মাধবীলতার আর্তনাদ শুনতে পেল সে। লম্বা লোকটা মাধবীলতার কোমরে চুরুটটা চেপে ধরেছে। কিন্তু আর্তনাদ যন্ত্রণার হলেও মাধবীলতার গলা অনিমেষকে কাঁপিয়ে দিল, 'তুমি কিছু বোলো না গো, আমার জন্যে তুমি ছোট হয়ো না—আঃ, আ—!'

অনিমেষ মুখ বন্ধ করার আগে একদলা থুতু মাটিতে ফেলল। পেছনের লোকটা তখুনি একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করল, 'সামনে তাকাও, চোখ বন্ধ করলে মুশকিলে পড়বে।'

অফিসার এবার এগিয়ে এল ওর দিকে, 'থুতু ফেলা হচ্ছে ? এখনও বিষদাঁত ভাঙেনি না! শেষবার বলছি, কথা বলুন। আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না আপনাদের আর কোনও চান্সই নেই। আন্দোলন-ফান্দোলন দেওয়ালে দেওয়ালে শুরু হয়ে সেখানেই থেমে গেছে। সাধারণ মানুষ চাইছে না আপনাদের, সবাই বুঝে গেছে এটা সি আই-এর টাকায় একরকমের ধান্দাবাজি। আপনাকে আমি স্বচ্ছন্দে মেরে ফেলতে পারি, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। নাউ ডিসাইড!'

অনিমেষ কথা বলল না, কথা বলার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সে চোখ খুলে রাখতে বাধ্য হচ্ছিল কিন্তু দৃষ্টি এখন প্রায় সাদা। মাঝে মাঝে মাধবীলতার শরীর যিশু খ্রিস্টের আদল নিচ্ছে, নিয়েই আবার ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

অফিসারের গলা কানে এল, 'দেখুন, এই ভদ্রলোক আপনাকে ভালবাসেন না। আপনার শরীরে সন্তান এনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন। সামান্য একটা কথা বলে দিলে আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব জেনেও উনি মুখ বন্ধ করে আছেন। তার মানে, আপনার ওপর অত্যাচার হলেও এঁর

BanglaBook.org

কিছুই এসে যায় না। এঁর আসল চেহারা চিনে নিন। আপনার কি এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ? ঠিক আছে, আমরা ওপরের দড়ি গুটিয়ে নিচ্ছি। তা নিলে আপনার শরীর মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে যাবে, এই রকম শরীরে সেটা বেশ ডেঞ্জারাস হবে, কী বলেন ? হয়তো একটা অ্যাবরশন হয়েও যেতে পারে। ইন দ্যাট কেস, ইটস বেটার ফর আস। ইনি যদি আপনার সন্তানের বাবা হন তা হলে তার জন্ম হলে স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।'

মাধবীলতা কোনও কথা বলল না। কথাগুলো অনিমেষের মাথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ঢুকে একসময় জোড়া লাগতেই সে চিৎকার করে উঠল। শেষবার সব বাঁধন ছিঁড়ে সে মাধবীলতার কাছে পৌঁছবার জন্যে মরিয়া হল। কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না সে। কিন্তু পেছনের লোকটির অসহিষ্ণু হাত তার চেতনাকে মুছিয়ে দিল। তলিয়ে যাওয়ার আগে অফিসারটির আক্ষেপ শুনতে পেল সে, 'আঃ, এ সময় তোমাকে মারতে কে বলল ? ও অজ্ঞান হয়ে থাকলে আজ আর কোনও কাজ হবে!'

জেলখানায় অনিমেষের সঙ্গে মাধবীলতাকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মাধবীলতা যে এসেছে তা অনিমেষের জানার কথা নয়। কিন্তু এখন পশ্চিমবাংলার জেলগুলো নকশাল ছেলেতে ভরে গেছে। সবার বিরুদ্ধে এক রকমের অভিযোগ নয় এবং সবাই এক ধরনের ব্যবহার পায় না। ফলে বাইরের খবর ভেতরে আসছিল নানান পথে। অনিমেষ জানল, মাধবীলতা তিন চার দিন এসে ফিরে গেছে। আত্মীয় বন্ধুরা দেখা করতে এলে নির্দিষ্ট দিনে কয়েকদিনের একটি বিশেষ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় সাক্ষাৎকার ঘটে। মুখোমুখি নয়, এই জেলে একটা জালের আড়াল রাখা হয়। পুলিশ বসে থাকে সামনে। তবে বিশেষ কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই অনুমতি দেওয়া হয়নি, অনিমেষ তাদের একজন।

ক্রমশ এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়ছে অনিমেষ। কারও সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। মাধবীলতা এসেছিল এই খবর পেয়ে তার এক ধরনের উত্তেজনা হয়েছিল। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল ওকে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কথা ভেবে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অনেক হল, মেয়েটার ওপর আর বোঝা চাপাতে চায় না সে। মাধবীলতা দেখা করতে এসেছিল মানে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। বুকের ভেতর একটা জানার বাসনা তীব্র হয়, মাধবীলতার সন্তান সুস্থভাবে হয়েছে কি ? হলে তাকে নিয়ে সে কোথায় আছে ? কেমন আছে ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার কোনও অধিকার নেই এ সব জানতে চাওয়ার। সে এই জীবনে কোনওদিন মেয়েটাকে আশ্রয় দিতে পারবে না যখন তখন—! চুপচাপ শুয়ে বসে দিন কাটে অনিমেষের ছোট্ট সেলে। তার সঙ্গী ওরা খুব সুন্দর নির্বাচন করেছে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ত ছেলেটি। সুন্দর চেহারা। কিন্তু কথা বলতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। খাবার খাইয়ে দিতে হয়। পুলিশ ওর শরীর থেকে সমস্ত কেড়ে নিয়েছে। এই ঘরের দেওয়াল ছাদ দরজার মতোই ছেলেটির অস্তিত্ব তার কাছে। এ বরং ভাল। এরকম কাঠের মানুষ বলেই তাকে বিরক্ত হতে হয় না। সপ্তাহে একদিন ওর মা আসেন। তখন একে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় সাক্ষাতের জন্যে। ভদ্রমহিলা কাঁদেন আর ছেলেকে খাওয়ান। ছেলে কিছু টের পায় না—কাঠের পুতুলের যেমন বোধশক্তি থাকে না।

অনিমেষের কথা জেলের সবাই জেনে গেছে। বস্তুত ওদের সেলটা এখন এই জেলের বন্দিদের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশি অত্যাচারের পরিণাম হিসেবে এই সেলের দুজন বন্দি সম্পর্কে অনেকেরই মমতা। একজন পৃথিবীতে থেকেও চিরকালের জন্যে মুছে গেছে আর একজনের মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কোমরের তলা থেকে শরীরের বাকি অংশ আর কাজ করছে না। মুখে একরাশ দাড়ি, চুল খোঁচা খোঁচা, দু হাতে ভর করে লেংচে লেংচে এগোতে হয়। ক্রমশ পা দুটো সরু হয়ে আসছে। জেলখানায় ডাক্তার আছে কিন্তু চিকিৎসার তৎপরতা নেই। অনিমেষ বুঝতে পারে সে আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এর ওপর মাথায় এক ধরনের যন্ত্রণা মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে ওঠে। সেই অপারেশনের পর থেকেই এটা একটু একটু করে বাড়ছে। তখন চিন্তাশক্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার। এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। অথচ আত্মহত্যা করার কথা ভাবলে কী রকম কাপুরুষ মনে হয় নিজেকে। কিন্তু দু-হাতের ওপর ভর করে ব্যাঙের মতো থপ-থপ করে মেঝেতে লাফিয়ে যাওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত তাকে অবসাদ এনে দেয়। নিজের অর্ধেক শরীরটাকে টেনে আনার পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়ে সে। এর চেয়ে তার সঙ্গী ছেলেটির অবস্থায় যদি সে থাকত তা হলে অনেক ভাল হত। সম্পূর্ণ বোধশক্তিহীন হলে পৃথিবীর কোনও কষ্টই আর কষ্ট মনে হত না।

জেলখানায় বসে অনিমেষ খবর পেল মহাদেবদা নিহত হয়েছেন। উত্তরবাংলা থেকে কলকাতায় এসে বেলেঘাটার এক গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এ খবর ফাঁস হয়ে যায়। মাঝ রাতে পুলিশ তাঁকে বন্দি করে। খবরটা এই রকম, তাঁকে ভ্যানের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়। আবার এও শোনা যাচ্ছে, গড়ের মাঠে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলা হয়। হতবুদ্ধি হয়ে তিনি যখন এগোচ্ছিলেন তখন পেছন থেকে গুলি করে তাঁকে মেরে ফেলা হল। বেশ দেরিতে পাওয়া খবর, কিন্তু অনিমেষ বুঝতে পারল মহাদেবদার মৃত্যুর জন্যেই পুলিশ তার ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

এখনও নাকি পুলিশ বনাম নকশালদের সংঘর্ষ চলছে। ডেবরা, গোপীবল্লভপুর কিংবা বরানগর সিঁথির নাম শোনা যাচ্ছে। এ সবই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ভারতবর্ষে এই আন্দোলন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যাঁরা গলাকাটা আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের পুলিশ হয় হত্যা করেছে নয় করছে। আর যাঁরা এ তত্ত্বে বিশ্বাসী নন তাঁদের বিভিন্ন জেলে ছুড়ে ফেলছে। এরকম ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্রতি সপ্তাহে হিন্দি ছবি মুক্তি পাচ্ছে এবং লোকে তাই দেখার জন্যে স্বচ্ছন্দে লাইন দিচ্ছে।

অনিমেষ বুঝতে পারছে বিরাট ভুল হয়ে গেছে। নিজেদের প্রস্তুত না করে, দেশের মানুষকে সঙ্গী না করে শুধু মাত্র বুকভরা উত্তেজনা এবং বিদেশি শ্লোগানকে পাথেয় করে তারা সত্যিই হঠকারিতা করে ফেলেছে। সে এখনও মনে করে এ-দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছ থেকে কোনও কিছু আশা করার নেই। এই রাজনৈতিক কাঠামোয় তারা শুধু একটা লেবেল-আঁটা পার্টিমাত্র। সেই দলে না থেকে সে ঠিক কাজই করেছে। কিন্তু তার পালটা পথ বেছে নিয়ে তারা যেভাবে এগিয়েছিল সেটাও গোলকধাঁধায় শেষ হল। প্রতিটি প্রদেশের মানুষের মানসিকতা জীবনযাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এদের প্রত্যেককে একটা সুতোয় বাঁধতে পারা আকাশকুসুম কল্পনা। এ সব তথ্য নতুন নয়, আগেও জানা ছিল। কিন্তু উত্তেজনা মানুষকে অন্ধ করে। তখন মনে হয়েছিল প্রয়োজন বুঝতে পারলেই মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গী হবে। ব্যর্থ তারাই, কারণ দেশের মানুষকে তারা বোঝাতে পারেনি।

অবসাদ আর অবসাদ। নিজের শরীরের দিকে তাকালে অবসাদে আচ্ছন্ন হতে হয়, নিজের দেশের দিকে তাকালেও একই অবস্থা। অনিমেষের মাঝে মাঝে তাই মনে হচ্ছে তার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও পার্থক্য নেই। এ ভাবে লেংচে লেংচে পাছা ঘষটানি দিয়ে চলছে দেশটা। তাকে দাঁড় করাবার কোনও ওষুধ কারও জানা নেই, আবার এই মুহূর্তে সে মরবেও না। এই জেলের নকশালপন্থী ছেলেদের অনেকেই তার মতন বিমর্ষ। কিন্তু কেউ কেউ এখনও খুব সিরিয়াস ভাবনাচিন্তা করে। তবে যত দিন যাচ্ছে তত ওরা ওকে এড়িয়ে থাকছে। তার শরীরের এই অবস্থায় সে যে কোনও সাহায্যে আসতে পারবে না এ-কথা ওরা বুঝেই তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করছে না। তা ছাড়া নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয়েছিল তার ভুলভ্রান্তিগুলো নিয়ে এরা আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়।

মাসের পর মাস চুপচাপ চলে যাচ্ছে। খুব কম ছেলের নামে কোর্টে কেস উঠেছে। বেশির ভাগই থাকছে বিনা বিচারে। নাম পালটে পালটে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারছে জেল কর্তৃপক্ষ। সেই প্রথম দিকে অনিমেষকে একবার কোর্টে তোলা হয়েছিল। কোনও কথা বলতে দেওয়া হয়নি, সে সুযোগও ছিল না। আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন নেই। কিন্তু এ দেশে একটা আইন করলেই তার একশোটা ফাঁকা রাখা হয়। তাই একবার কোর্টের মুখ দেখে অনন্তকাল এখানে বাস করতে হতে পারে।

তা ছাড়া এ ব্যাপারে অনিমেষের নিজস্ব কোনও তাড়াহুড়ো নেই। এই সেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে? যে মুখ প্রথমেই মনে পড়ে তা মাধবীলতার। মাধবীলতার কথা ভাবলেই এখন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটা তীব্র অপরাধবোধ তাকে সারাক্ষণ বল্লমের মতো খুঁচিয়ে মারে। সে অতীতের ঘটনাগুলোকে খুঁটিয়ে ভেবেছে অনেকবার। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে মাধবীলতা কী দেখে তাকে ভালবেসেছিল? অনিমেষ কোনও স্থির জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই জেনেও সে এক কথায় নিজের নিরাপদ আবাস ছেড়ে হোস্টেলে উঠে এল। অনিমেষ যখন প্রতিদিন ঘটনার আবর্তে পাক খাচ্ছে তখন মাধবীলতা স্থির হয়ে তার অপেক্ষায় ছিল। সামনে কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই, অতীতটাকে নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে এ ভাবে থাকতে মেয়েরাই পারে। শান্তিনিকেতনের সেই রাতে অনিমেষ কি একটুও সংযত হতে পারত না? চিরকালের জন্য মাধবীলতাকে সে অগ্নিকুণ্ডে ঠেলে দিল! এবং

BanglaBook.org

সবশেষে অনিমেষের কাছ থেকে খবর আদায় করতে পুলিশ সেই মাধবীলতার ওপরই অত্যাচার করেছে কিন্তু মাধবীলতা মুখ খোলেনি। ভালবাসা হয় সমানে সমানে। কিন্তু অনিমেষ বুঝতে পারছিল সে প্রতিটি স্তরে মাধবীলতার কাছে হেরে যাচ্ছে। এখন একটা দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় মাধবীলতা তাকে ছাড়িয়ে এত দূরে এগিয়ে গেছে যে তার পক্ষে আর ওকে ধরা সম্ভব নয়। মাধবীলতার কোনও খবর সে এখন জানে না। স্কুলের চাকরি আছে কি না, সন্তান স্বচ্ছন্দে ভূমিষ্ঠ হয়েছে কি না, তাকে নিয়ে সে এখন কোথায় আছে, কীভাবে আছে তা জানতে পারছে না সে। এই সামাজিক ব্যবস্থায় একটি কুমারী মেয়ে হঠাৎ মা হয়ে গেছে এই খবর সবাই কীভাবে নেবে তা জানা কথা। অনিমেষ সারা পৃথিবীর সামনে চিৎকার করে বলতে পারে যে মাধবীলতা তার স্ত্রী। কিন্তু যতক্ষণ না তাতে আইনের ছাপ পড়ছে ততক্ষণ মাধবীলতা কী করে লড়াই করছে? আর একটা চিন্তা আজকাল অনিমেষকে উত্তেজিত করছে। সে বাবা হয়ে গেল! তার রক্তের সৃষ্টি এখন পৃথিবীর বুকে। সে ছেলে কি মেয়ে তা জানা নেই এবং সে সুস্থভাবে জন্মেছিল কিনা তাও অজানা কিন্তু মায়ের পেট থেকে সে নিশ্চয়ই অনুভব করেছে তার বাবার জন্যে তার মাকে কীভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। এতটা দায় যে মেয়ে মুখ বুজে বয়ে চলেছে আজ জেল থেকে বেরিয়ে বাকি জীবনটার পাথর তার ওপর চাপিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চায় না অনিমেষ। সেই কারণে তার কোনও তাড়াহুড়ো নেই, এখান থেকে বের হবার। জলপাইগুড়িতে গিয়ে বাবা এবং ছোটমায়ের সামনে এই অবস্থায় যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। বাবা বিলাপ করবেন। তাঁর সব আশা নির্মূল করে যে ছেলে নকশাল হয়েছে তাকে হয়তো তিনি ভর্ৎসনা করতে পারেন কিন্তু তাকে সেই কারণে পঙ্গু দেখলে তাঁর আক্ষেপ অসহনীয় হয়ে উঠবে। না, নিজের দায় কারও ওপর চাপিয়ে দেবে না সে। কিন্তু এরা যদি তাকে ছেড়ে দেয়, যদিও সে সম্ভাবনা নেই, তবু, তা হলে সে কোথায় যাবে?

জেলে বসে অনিমেষ টের পায়নি কিছু। একদিন আচমকা চারধারে পাগলাঘন্টি বাজতে লাগল। অনিমেষ শুয়েছিল। শব্দ শুনে কোনওরকমে হামা দিয়ে দিয়ে সে দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। বাইরে মানুষ পাগলের মতো ছুটছে। বোমা পড়ছে ও পাশে। ছেলেরা দৌড়চ্ছে গেটের দিকে। এখান থেকে সামনের পুকুরটা দেখা যায়। অনিমেষ দেখল তিন চারটে পুলিশ দৌড়ে সেই পুকুরে ঝাঁপ দিল। তারপর ডুব দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে হাস্যকর ভাবে। মৃত্যুভয় এখন ওদের চোখে মুখে। অনিমেষের মাথায় একটা চিন্তা চলকে উঠল। তা হলে কি বিপ্লব শুরু হয়ে গেল? জেল ভেঙে বন্দিদের উদ্ধার করা হচ্ছে? ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল অনিমেষ। বাইরে তখন চেঁচামেচি, সবাই অকস্মাৎ ছাড়া পাওয়ার রাস্তাটা যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে। অনিমেষ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল সামনে যে যাচ্ছে তাকেই। ওদের সেলে তালা দেওয়া থাকে না, বোধহয় পঙ্গু বলে তালা খরচ করতে চায় না কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাইরে থেকে আটকানো থাকে দরজাটা। অনিমেষের ডাক কারও কানে যাচ্ছে না। অথচ এই রকম একটা মহান সময়ে সে যোগ দিতে পারছে না এই কষ্ট অনিমেষকে পাগল করে তুলছিল। বারংবার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সে। নিজের শরীরের কথা এই মুহূর্তে তার মাথায় ছিল না, তাকে ছেড়ে দিলে ওই গেট অবধি পৌঁছতে হয়তো তার এক ঘণ্টা লেগে যেতে পারে—এই বোধ কাজ করছিল না।

হঠাৎ গুলির শব্দ কানে এল। পর পর কয়েক রাউন্ড এবং খুবই কাছে। কয়েকটা আর্তচিৎকার শোনা গেল। এবং আচমকা বাইরের ছুটোছুটি থেমে গেল। যারা রাস্তা পার হতে পারেনি তারা যেন কে আগে সেলে পৌঁছাতে পারবে এইভাবে ফিরে আসতে লাগল। এখন আর বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু গুলি চলছে মাঝে মাঝে। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। একটুও আওয়াজ নেই কোথাও। পুকুরে যে পুলিশগুলো ডুবছিল আর ভাসছিল তারা ক্রমশ মাটিতে উঠে এল। ইউনিফর্ম সম্পূর্ণ সিক্ত কিন্তু হঠাৎ তাদের চেহারা যেন পালটে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধে তারা ছুটে গেল অফিস ঘরের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সামনের লনটা পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেল।

দরজায় সেঁটে থাকা অনিমেষ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ল। না, এটা কোনও বিপ্লব নয়, বিক্ষিপ্তভাবে জেল ভেঙে পালাতে চাইছিল কিছু ছেলে। কিন্তু কোথায় পালাতে চাইছিল? এই জেলের বাইরে যে ভারতবর্ষ সেটা কি এই জেলের চেয়ে নিরাপদ! সেখানে কি ওদের কেউ চিরকাল আশ্রয় দেবে? সারা দেশ যেখানে শীতল হয়ে রয়েছে সেখানে কয়েকটা কাঠকয়লার আগুনের কী মূল্য আছে!

এখন সেলে সেলে চিৎকার চলছে। পুলিশরা দল বেঁধে প্রতিটি সেলে ঢুকে বদলা নিচ্ছে। বন্দিদের যন্ত্রণায় এখন জেলের প্রতিটি দেওয়াল কাঁপছে। সামনের বারান্দায় বুটের শব্দ হল। তিনজন

BanglaBook.org

এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। একজন বলল, 'না, এরা বের হয়নি। তা ছাড়া একজন ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ড আর একজন পাগল।'

দ্বিতীয়জন থুতু ফেলল, 'সো হোয়াট ? এরা সব এক রক্তের। আজ কাউকে স্পেয়ার করব না।'

শব্দ করে দরজা খুলে গেল। দরজা খুললেই অনিমেষের সঙ্গী, হাঁ করে খাওয়ার অভ্যেসটুকু তার হয়েছে। কুঁকড়ে পড়ে থাকা অনিমেষ দেখল একটা লাঠি ছেলেটিকে নির্মমভাবে আঘাত করল। অন্য দুটো তার দিকে এগিয়ে আসছে।

চুয়াল্লিশ

সেদিন যারা গা ঢাকা দিতে পেরেছিল তারা খুব সামান্য সময়ের জন্যেই মুক্তির আনন্দ পেয়েছিল। আনন্দ শব্দটা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে অনিমেষের দ্বিধা আছে। সব সময় পুলিশের ছায়া পেছনে ঘুরছে, প্রতি মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে—এই রকম পরিস্থিতিতে কি জেলের বাইরের খোলা আকাশ আনন্দের হয়! যারা ধরা পড়ছে এবং জেলে ফেরত আসছে তাদের অবস্থা কী হতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু যারা জেলেই পড়েছিল তাদের ওপর আক্রোশ মিটিয়ে নিয়েছে পুলিশ।

অনিমেষের পাশে দীর্ঘ-সময় পড়েছিল ছেলেটি। তার পশ্চাদ্দেশ রক্তাক্ত। মোটা রুল সেখানে প্রবেশ করিয়ে শাস্তি দিয়ে গেছে ওরা ছেলেটিকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল ছেলেটি। কাটা ছাগলের মতো ছটফট করেছিল, কিন্তু সামান্য বাধা দেবার মতো মানসিকতা ছিল না ওর। এমনকী এত বড় আঘাত যে ও তারপরে টের পাচ্ছিল বলে মনে হল না অনিমেষের। একটা গাছও বোধহয় ওর চেয়ে বেশি অনুভূতিশীল হয়ে থাকে।

পঙ্গু বলে হয়তো অনিমেষের ওপর এই বীভৎস আক্রমণটি করেনি। কিন্তু বেধড়ক পিটিয়ে গেছে ওরা ওকে। কপালের আঘাত ফুলে চোখ ঢেকে দিয়েছে। একটা দাঁত থুতুর রং পালটে বেরিয়ে এসেছিল। ওরা চলে গেলে অনিমেষ অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়েছিল। তারপর মুখের রক্ত মুছে ছেলেটিকে দেখল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অর্ধ নগ্ন শরীরটা তিরতির করে কাঁপছে। দু হাতে হামা দিয়ে অনিমেষ ছেলেটির পাশে গিয়ে গায়ে হাত রাখল, 'এই, এই যে, শুনছ—।'

এই ঘরে ওরা যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন থেকেই অনিমেষ জানে ওর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। একটা মানুষের চোখের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায় এমন করে তা সে কখনও জানত না। এই ঘরে পায়খানা করে ফেললে রোজ দরজায় বসে অনিমেষকে চিৎকার করে পাহারাদারদের নজর কাড়তে হয়। কিন্তু তবু আজ ওর আঘাত দেখে সে না ডেকে পারল না। ছেলেটির কাঁপুনি কমছিল না। অনিমেষ ওর পাজামা টেনেটুনে ভদ্রস্থ করে চুপচাপ বসে থাকল।

কী হল ? হয় পঙ্গু নয় শরীর থেকে বোধবুদ্ধি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে ক্লীবের মতো বেঁচে থাকা—জীবনের এই পরিণতি শেষ পর্যন্ত ? এমন যদি হত বিপ্লবের চূড়ায় পৌঁছাতে ওরা সিঁড়ির কাজ করেছে, পরের মানুষেরা সেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাবে তা হলে নিজেদের এতটা অসাড় বলে মনে হত না। পুলিশ-খুনের চেষ্টার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও খবর তার কাছে নেই। এর মধ্যে একজন এসে জানতে চেয়েছিল সে কোনও উকিলের সাহায্য চায় কি না। অনিমেষ পরিষ্কার না বলেছে। নিজের কথা তার চেয়ে কোনও উকিল ভাল করে বলতে পারবে না। প্রথম দিকে সে একটা উত্তেজনায় ভুগত। কাঠগড়ায় যদি তাকে বিচারক জিজ্ঞাসা করেন সে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবে। এই বিচারব্যবস্থার সুস্থতা সম্পর্কে সে স্পষ্ট অভিযোগ জানাবে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত এই উত্তেজনাকে তার ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে। ধরা যাক, সরকারি উকিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ে সে মুক্তি পেল। তখন সে কোথায় যাবে ? বাকি জীবনটা সে কী ভাবে কাটাবে ? তার চেয়ে এই ভাল। কোনওরকম পালটা জবাব সে দেবে না। যদি তার যাবজ্জীবন জেল হয় এখন সেটাই তার পক্ষে মঙ্গল। এইরকম বিষাদে সে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছিল। শারীরিক অক্ষমতার সঙ্গে এক ধরনের মানসিক ক্লীবত্ব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মাঝে মাঝেই তার মাথায় অন্য সব চিন্তা আসতে লাগল। কোর্টে পুলিশ তার কেস তুলছে না। ঠিক যে ভাবে ওর সঙ্গী ছেলেটিকে ফেলে রাখা হয়েছে ওকেও যেন ওরা তেমনি দেখছে। নিজেকে এইরকম ছেঁড়া কাগজের মতো দেখতে যখন অসহ্য লাগে তখনই মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। এই

BanglaBook.org

ঘরে বাস করে আত্মহত্যা করার আপাতত কোনও সুযোগ নেই। গলায় দড়ি কিংবা বিষ খাওয়ার কোনও উপায় নেই। আত্মহত্যার কথা মনে হলেই যার মুখ চোখের সামনে ভাসে তাকে অনেক কষ্ট করে মন থেকে সরাতে চাইছে সে। সেই মুখ যেন ভার হয়ে বলে, ছিঃ! তুমি তো এত দুর্বল নও অনিমেষ।

তখনই হো-হো করে হেসে ওঠে অনিমেষ জেলের ঘরে বসে। শেষের দিকে হাসিটা ভেঙে যায়। গলা বন্ধ হয়ে যায়। দুর্বল কাকে বলে? যে লড়তে পারে না, যার সর্বস্ব কেড়ে নিলেও প্রতিবাদের সামান্য ক্ষমতা যে ধরে না সে কি দুর্বল নয়! এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে যাকে হাঁটতে হয় তার বল কোথায়? এমনকী আত্মহত্যা করার মতো শক্তিও তার নেই। এই সব ভাবনা মাথায় এলেই সে ছটফট করে। মনে হয় ক্রমশ উন্মাদ হয়ে যাবে। একদম বোধশূন্য হয়ে যাওয়া বরং ভাল। পৃথিবী সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকে না তা হলে। কিন্তু তা হচ্ছে না যখন তখন অনিমেষ কী করত সে জানে না যদি পাশের ছেলেটি এরকম আহত না হত।

একটু একটু করে ছেলেটি ওর ওপর নির্ভর করতে শিখল। ওর সঙ্গে কথা বলে অনিমেষের সময় কেটে যায়। এ এক মজার খেলা। অনিমেষ কথা বলতে শুরু করলে ছেলেটি চুপচাপ ওর দিকে চোখ মেলে বসে থাকে। যতক্ষণ না অনিমেষের মুখ বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ দৃষ্টি সরায় না সে। ক্রমশ এ এক নতুন খেলা হয়ে দাঁড়াল। সময় কাটানোর সমস্যা আর নেই। নিজের কথা, যা করার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু করা হল না, সেই সব কথা ছেলেটিকে বলত অনিমেষ। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগলেও এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করত সে। একটা রক্তমাংসের মানুষ তার কথা শুনছে। ছেলেটির কোনও প্রতিক্রিয়া হত না, তবু মানুষ তো! এইরকম একদিন কথা বলতে বলতে হেসে ফেলল অনিমেষ। এই ছেলেটি যেন গোটা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে তার সামনে বসে রয়েছে। যে যাই বলুক, যার কোনও কিছুতেই এসে যায় না।

জেলে বসে সময়ের হিসেব রাখা মুশকিল। মাঝে মাঝে অনিমেষেরই হিসেব গুলিয়ে যায় ঠিক কত বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে জেলের কর্তা এসে অনিমেষকে বলেছিল, 'মুক্তি পেলে কোথায় যাবেন?'

'মুক্তি, পাচ্ছি নাকি?'

'বলা যায় না, যা তোড়জোড় চলছে, পেলেও পেতে পারেন।'

অনিমেষ লোকটির দিকে তাকাল। শুধু পোশাক একটা মানুষের চেহারা পালটে দেয়। এই কয় বছরে এই লোকটি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে না। লোকটি আবার বলল, 'এখন কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে করতে পারেন। তেমন ইচ্ছে থাকলে আপনি তাদের চিঠিতে জানিয়ে দিন।'

'কী হবে দেখা করে?'

'সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আপনার এই শারীরিক অবস্থায় জেলের বাইরে যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্যেই যোগাযোগ করা দরকার।'

'আমি কারও দায় হতে চাই না।'

'প্রতিবন্ধীদের জন্যে একটা আশ্রম আছে। সেখানে নানা হাতের কাজ শেখানো হয় তাদের জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। সেখানে যাবেন?'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'বাঃ চমৎকার। একটু দেখুন না আমার জন্যে।'

সরকার পালটে গেছে এর মধ্যে। অনিমেষ জানল ভারতবর্ষ এখন চুপচাপ, শান্ত। কোনও শোক নেই কিংবা আফশোস। কোথাও আনাচে কানাচে যারা একদা স্বপ্ন দেখত তারা বেঁচে মরে আছে অথবা তাদের অস্তিত্ব আর তেমন জোরদার নয়। পশ্চিমবাংলার মানুষ বিপুল ভোটে বামপন্থীদের নির্বাচিত করেছে। নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের ওপর দেশের মানুষ তাদের আস্থা জানিয়েছে। অনিমেষদের প্রচার এবং বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এখন আর কেউ ভাবে না। জেলের ভেতরে যারা গোপনে গোপনে এখনও আশা রাখত তারা ভেঙে পড়ল।

অনিমেষের কিন্তু এই খবরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তবে নতুন মন্ত্রিসভা দায়িত্ব নিলে সে একটা নাম দেখে ঈষৎ চমকে উঠেছিল। পরে হেসে ফেলেছিল শব্দ করে। সুদীপ মন্ত্রিসভায় একটি ভাল জায়গা পেয়েছে। বিমান নয়, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারির থেকে অনেক ধাপ এগিয়ে সুদীপ চুরুট মুখে পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী হয়ে বসেছে। অনিমেষের মনে পড়ল,

banglabook.org

সুদীপের মধ্যে একটা পরিকল্পিত ভাবনা সব সময় কাজ করত। কীসে বেশি লাভ হয় কিংবা কোন ঘটনা বেশি প্রচার এনে দেবে এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটিতে সে বিমানের থেকেও সজাগ ছিল।

হঠাৎ জেলের মধ্যে একটা উৎসবের মেজাজ এসে গেল। নতুন সরকার নাকি রাজনৈতিকভাবে নকশাল বন্দিদের মোকাবিলা করবেন। বাইরে এখন বন্দিমুক্তি আন্দোলন চলছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছু কিছু নকশালপন্থীদের তাঁরা মুক্তি দেবেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন এতদিনে জেলে বন্দি থেকে নকশালপন্থীদের যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিংবা এদের মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর জেলে রাখার দরকার নেই। কীভাবে কখন মুক্তি দেওয়া হবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। আদালতে যে সব মামলা চলছিল তা সরকারপক্ষ তুলে নেবার সিদ্ধান্ত করলেন। সরকারের এই উদারতায় নানান মহলে নানান প্রতিক্রিয়া হলেও বন্দিরা স্বাভাবিকভাবে খুশি হল।

এর মধ্যে জেলের সেই কর্তাব্যক্তি অনিমেষের কাছে এসেছিলেন। ভদ্রলোক যে কেন অনিমেষকে পছন্দ করছেন তা সে বুঝতে পারে না। এসে বললেন, 'ব্যস, হয়ে গেল। আপনাদের জেলবাস পর্ব সমাপ্ত।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'কোনও মানে হয় না। ধরলই বা কেন আর ছাড়ছেই বা কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এত মানে খুঁজতে চান কেন? যা ঘটছে তাই মেনে নেওয়া ভাল। আমি এসেছিলাম আপনাকে দুটো খবর দিতে। এক ভদ্রমহিলা প্রায়ই আসছেন আপনার খবরা-খবর নিতে। আপনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না জেনেও তিনি বিরত হননি। গতকাল এসে জানতে চাইছিলেন যে আপনি কবে মুক্তি পাবেন।'

'আপনি কী বললেন?' শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ।

'আমাদের কাছে কোনও সঠিক খবর আসেনি। আমি সামনের সপ্তাহে ওঁকে আবার খবর নিতে বললাম।' তারপর একটু হেসে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তা হলে জিজ্ঞাসা করছি, উনি আপনার কে হন?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'ছেড়ে দিন এ সব কথা। আর একটা খবর কী যেন বলছিলেন? আর কেউ আমার খবর নিতে আসছে নাকি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না না। আর কেউ আসেনি। আমি একজনের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আশীর্বাদ আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

'কার কথা বলছেন?'

'দীপকের মা।'

'দীপক?' অনিমেষ অবাক হয়ে ডান দিকে তাকাল। এই ছেলেটির নাম যে দীপক তা ওর মনেই ছিল না। এখনও দীপকের মা প্রতি সপ্তাহে আসেন। ওকে তখন বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলা ছেলেকে খাইয়ে যান কাঁদতে কাঁদতে। কিন্তু তিনি কোন কারণে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন? এই বোধবুদ্ধিহীন ছেলেটি একটি নামের অধিকারী তা-ই খেয়াল ছিল না অনিমেষের।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কথা ওঁকে আমি বলেছি। আপনারা এক ঘরে থাকেন এবং আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেন ওর সাড়া না পেয়েও। একমাত্র আপনি যখন কথা বলেন তখন ওর দৃষ্টি খানিকটা স্বচ্ছন্দ হয়। এ সব শুনে মহিলা আপনার কথা জানতে চাইছিলেন। শোনার পর আপনার সঙ্গে কথা বলতে তিনি খুব আগ্রহী। যখন জানলেন যে আপনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না তখন আমাকে ওই কথাগুলো জানাতে বললেন।'

অনিমেষ হাসল। এ ছাড়া সে আর কী করতে পারে। তার নিজের শরীরের যা অবস্থা তাতে এ-কথা স্পষ্ট যে সে কোনওদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এই অবস্থায় ছেলেটির কোনও উপকারেই সে আসতে পারে না। কথা বলছে নিজের প্রয়োজনে। একা মুখ বন্ধ করে থাকলে সে এতদিনে পাগল হয়ে যেত।

কিন্তু তার পরের দিনই যে এমন চমক ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কল্পনাতেও আসেনি তার। দুজন সিপাই সাতসকালে ওদের সেল থেকে বের করে নিয়ে এল বাইরে। অনিমেষকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। দুটো পা ঝুলে পড়ছে। সঙ্গী ছেলেটি, যার নাম দীপক, হাঁটছিল উদাস পায়ে।

অফিস ঘরে বসার পর ওদের খবরটা জানানো হল। সরকার দয়াপরবশত ওদের বিরুদ্ধে আনীত সব রকম অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এবং সেই সঙ্গে আশা করছেন ভারতবর্ষের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে তারা বাকি জীবনটা কাটাবে।

মুক্তি! খবরটা শুনে অনিমেষের একটুও উত্তেজনা হল না। এই মুক্তি নিয়ে কী হবে! এতদিন মনে মনে এই দিনটির আশঙ্কা করেছিল সে। এখন সে কী করবে? চোখ বন্ধ করল অনিমেষ। এ ভাবে সে মুক্তি চায়নি কখনও। দীপকেরও এই খবরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। আর হাজারটা শব্দের মতো মুক্তি শব্দটার আলাদা কোনও মানে নেই ওর কাছে। শূন্যদৃষ্টি মেলে সে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষের গা ঘেঁষে। এই জিনিসটি সম্প্রতি ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় কোনও মানুষ এলে তার অস্তিত্ব বোধহয় অনুভব করে দীপক। কারণ সেই সময় সে অনিমেষের কাছছাড়া হতে চায় না। ব্যাপারটা ওর পরিবারের লোকের জানা দরকার। দীপকের চেতনা ফিরে আসবার একটা সূত্র হিসেবে এটাকে ডাক্তাররা কাজে লাগাতে পারেন।

কাগজপত্রে যখন তাদের মুক্তির ব্যাপারটা আইনসম্মত করা হচ্ছিল তখন সেই ভদ্রলোক এলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'না।'

'কিন্তু কোথাও তো যেতে হবে।'

'দেখি। এখান থেকে বের হয়ে তারপর ভাবব।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনি তো একজন সুস্থ মানুষের মতো ঘুরে বেড়িয়ে ভাবতে পারবেন না। আমি আপনার হয়ে সেই আশ্রমে খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'কোন আশ্রমে?'

'প্রতিবন্ধীদের। আপনাকে বলেছিলাম।'

'ও হ্যাঁ, সেখানে যাওয়া যাবে?'

'যাবে। কিন্তু এই মাসটা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'এই মাসটা!'

'হ্যাঁ, আর মাত্র আট দিন আছে মাস শেষ হতে। এই ক'দিন আপনি যদি দীপকের সঙ্গে থাকেন তা হলে ওর মা খুব খুশি হবেন।'

'দীপকের সঙ্গে?' অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। দীপকের সঙ্গে তার থাকার কথা ওঠে কী করে? সামান্য পরিচয় যেখানে নেই। সে ঘাড় নাড়ল, 'না, তা হয় না।'

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকালেন, 'বেশ, যা ভাল বোঝেন করবেন। আশ্রমের ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু দীপকের মাকে এড়াতে পারল না অনিমেষ। এক একজন বয়স্কা মহিলা আছেন যাঁদের চেহারা এবং কথায় এমন এক স্নেহময়ী জননী-জননী ভাব থাকে যে তাঁদের মুখের ওপর কটু কথা বলা যায় না। দীপকের মা সেই রকম একজন। তিনি ওর হাত ধরে বললেন, 'বাবা, আমি জানি তোমরা খুব অভিমানী হও। কিন্তু আমার দিকে তাকাও। যে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর যাকে নিয়ে আমি আজ বাড়ি ফিরছি সে তো এক নয়। আমার তো পৃথিবীতে কেউ নেই, আমি কী নিয়ে থাকব?'

অনিমেষ জবাব দিল না। মহিলা তখনও ওর হাত ছাড়েননি। বললেন, 'আমি সব শুনেছি। তুমি না থাকলে আমার ছেলে মরে যেত।'

'না, এটা সত্যি নয়। আপনাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'পৃথিবীর সব চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও মায়ের চোখকে কিছুতেই দিতে পারবে না। আমি এতদিন ধরে ওকে দেখতে আসছি, ও আমাকে একদিনও চিনতে পারেনি।' কেঁদে ফেললেন উনি। কিছুটা সময় লাগল সামলাতে, তারপর অন্য রকম গলায় বললেন, 'কিন্তু তোমার পাশে কেমন সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো।'

অনিমেষ হাসল, 'এটা একসঙ্গে থাকার অভ্যেস থেকে হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'যাই হোক, ও তো একটা পাথর হয়ে ছিল, এটুকু কম কী?'

অনিমেষ বলল, 'দীপক ভাল হয়ে যাবে।'

কথাটা বলেই কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য মনে হল। ভদ্রমহিলা সে কথায় কান দিলেন না মোটেই। বললেন, 'তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন?'

অনিমেষ অস্বস্তির চোখে তাকাল, 'এ সব প্রশ্ন করবেন না। এই সময় আমি কোনও আত্মীয়স্বজনের বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। তা ছাড়া—।'

'ঠিক আছে।' ভদ্রমহিলা ওকে থামিয়ে দিলেন, 'আমি তোমার কিছু জানতে চাই না। তুমি দীপকের সঙ্গে চলো। আমি জানব আমি দুই ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তোমরা দুজনে মিলে

BanglaBook.org

আমার এক ছেলে হলে।'

অনিমেষ ভাববার সময় পেল না। ভদ্রমহিলার মধ্যে এমন তৎপরতা কাজ করছিল যে সে আর আপত্তি তুলতে পারল না। কোনও পরিচিত বাড়িতে গিয়ে তাদের দয়ার ওপর নির্ভর করার চাইতে এটা অনেক বেশি শ্রেয় বলে মনে হল ওর। সে নিজে যাচ্ছে না, তাকে উনি আগ্রহ ভরে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজের ছেলের সঙ্গে একই মমতায় যতক্ষণ উনি তাকে দেখবেন ততক্ষণ কোনও অস্বস্তির কারণ হবে না। তা ছাড়া এই ক'টা দিন চলে গেলেই সে আশ্রমে যেতে পারবে। ততদিন তো মাথার ওপর একটা ছাদ দরকার।

ব্যবস্থা ভদ্রমহিলাই করলেন। দুজন সিপাই ওকে ধরে নিয়ে এল বাইরে। সেখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। খুব পুরনো আমলের বৃদ্ধ গাড়ি। তার ড্রাইভারও গাড়ির চেহারার সঙ্গে বেশ মিলে যায়। অনিমেষের সঙ্গে সঙ্গে দীপক হেঁটে এল। ভদ্রমহিলা এক হাতে অনিমেষকে অন্য হাতে দীপককে ধরে রেখেছেন। গাড়িতে ওরা ওকে তুলে দিয়ে ফিরে গেল। ভদ্রমহিলা দীপককে উঠতে বললে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'খোকা ওঠ, গাড়িটা চিনতে পারছিস না?'

দীপক কথাগুলো শুনল বলে মনেই হল না। তিন-চারবার ডেকে ব্যর্থ হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'কী করি বলো তো বাবা!'

সিটের ওপর হেলান দিয়ে বসতে পেরেছিল অনিমেষ। এবার ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে সে দীপককে ধরল, 'এই, গাড়িতে উঠে এসো।' দুবার ডাকতে দীপকের দৃষ্টি এদিকে ফিরল। অনিমেষ শক্ত হাতে ওকে টানতেই ছেলেটি গাড়ির ভেতরে ঝুঁকে পড়ল। তারপর কোনওরকম দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসল। খুব খুশি হলেন ভদ্রমহিলা, 'দ্যাখো তো, তোমার কথা কেমন শোনে ও।'

ছেলেটি সোজা হয়ে সিটে বসেছিল, তার একপাশে অনিমেষ, অন্যদিকে ভদ্রমহিলা। অনিমেষের সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে কিছুই ছিল না। জেল থেকে বের হবার সময় সেই ভদ্রমহিলার আনুকূল্যে একটু ভদ্রস্থ হয়ে বেরোতে পেরেছে এই যা। কিন্তু গাড়ির সিটে বসে ওর নিজেকে খুব কুঁজো মনে হচ্ছিল। সে তুলনায় দীপক অনেক খাড়া। জেলের সীমা ছাড়িয়ে গাড়িটা বড় রাস্তায় পড়লে অনিমেষ অনেক পাখির ডাক শুনতে পেল। বেশ নির্জন রাস্তা। কলকাতা বলেই মনে হয় না। একেই কি কপাল বলে? অনিমেষ নিজের কথা ভাবছিল। এতদিন পরে জেল থেকে বেরিয়ে যাদের সঙ্গে সে যাচ্ছে তাদের কাছে যাওয়ার কোনও কথাই ছিল না। তবুও যেতে হচ্ছে। যাচ্ছে কিছুটা পালিয়ে যাতে অন্য সবাই রক্ষা পায়। বিবেক বা চক্ষুলজ্জার সুযোগ নিতে সে কিছুতেই চায় না। তার চেয়ে পথের আলাপ পথেই রেখে যাওয়ার মতন এই ভদ্রমহিলার বাড়িতে ক'টা দিন চোখ বুজে কাটিয়ে দেওয়া বরং ঢের ভাল। রেসকোর্সের পাশ দিয়ে গাড়ি সোজা এগিয়ে এল রবীন্দ্রসদনের সামনে। দূর থেকে রঙিন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, কলকাতা একইরকম রয়ে গেছে। কোনও বড় শিল্পীর অনুষ্ঠান হবে নিশ্চয়ই, না হলে এই সকালবেলায় এত বড় লাইন পড়ে!

ল্যান্সডাউন রোডে যে বাড়িটায় ওরা ঢুকল সেটাই যে দীপকদের বাড়ি তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গেট পেরিয়ে বিরাট লন, বাগান এবং তার পাশে ধবধবে সাদা একটা দোতলা বাড়ি। নুড়ি পাথরের রাস্তা ঘুরে গাড়িটা এসে দরজায় দাঁড়াতেই দু'তিনজন ঝি-চাকর ছুটে এল। দীপকের মা নামলেন গাড়ি থেকে। অনিমেষ লক্ষ করল এর মধ্যেই ওঁর ভাবভঙ্গিতে একটা দৃঢ় মর্যাদাবোধ যোগ হয়েছে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'একটা ইজিচেয়ার নিয়ে আয় আগে।'

চাকর মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল কথাটা শুনে, উনি এবার ধমক দিলেন। ইজিচেয়ার আসতেই গলা নরম করে উনি বললেন, 'অনিমেষ তুমি আগে নামো। ওরা তোমাকে ধরুক।'

কর্মচারীরা এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। খুব সন্তর্পণে ওরা অনিমেষকে নামিয়ে ইজিচেয়ারে শোওয়াল। কিন্তু মুশকিল হল দীপককে নিয়ে। সে তেমনি খাড়া হয়ে বসেই আছে। শত ডাকেও তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অনিমেষ তিন-চারবার ডাকলেও সে তাকাল না। এবার ভদ্রমহিলা ঝুঁকে পড়ে ওর হাত ধরলেন, 'নেমে আয় খোকা। নিজের বাড়িতে এসেছিস তুই, আয় বাবা।' দীপকের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না কথাগুলোয়। ভদ্রমহিলা একটু ভেবে নিয়ে চাকরদের বললেন, 'ওকে জোর করে নামা গাড়ি থেকে।'

BanglaBook.org

এবার একটা কাঠের পুতুলের মতো নেমে এল দীপক ওদের হাতে। নেমে এসে যেন কিছুটা সহজ হল কারণ অনিমেষের ইজিচেয়ারের পাশ ঘেঁষে সে দাঁড়াল। ইজিচেয়ার নিয়ে চাকররা চলতে আরম্ভ করলে সেও সঙ্গ ধরল। দীপকের মা বললেন, 'দেখলে অনিমেষ, ও তোমার কেমন বশ মেনেছে।'

অনিমেষ বুকে ভার বোধ করল। ভদ্রমহিলা প্রতিমুহূর্তে তাকে জড়াবার চেষ্টা করছেন। এটা সে চায় না কিন্তু এখন সে-কথা বলার সময় নয়।

সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি। দোতলায় উঠে যে ঘরটায় ইজিচেয়ার নামাল সেখানে দুটো সুন্দর খাট, চেয়ার এবং ঘরের দেওয়ালে কালীঘাটের পটের দুটো ছবি টাঙানো। ঝি চাকরদের কাজ করতে যেতে বলে দীপককে ওর মা প্রায় জোর করেই একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'অনিমেষ তুমি একটু জিরিয়ে নাও, তারপর হাতমুখ ধুয়ে নেবে।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'বাঃ, ব্যস্ত হব না। অ্যাদ্দিন পরে ছেলে এল আর আমি ব্যস্ত হব না।' কথা শেষ করতেই ডুকরে উঠলেন ভদ্রমহিলা। এবং শেষ পর্যন্ত কান্নাটা আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। অনিমেষের কিছু করার নেই। সে দীপকের দিকে তাকাল। মায়ের কান্না দীপকের চোখে কোনও ছায়া ফেলছে না। স্থির চোখে সে সামনে তাকিয়ে আছে। এই সময় দরজায় থপথপ শব্দ হল। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অত্যন্ত বৃদ্ধা এক মহিলা খুব ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন। তারপর এগিয়ে এসে দীপকের গায়ে হাত রেখে বললেন, 'কাঁদছ কেন বউমা। ছেলে ফিরে এসেছে এখন কি কাঁদতে আছে। আহা, খোকা আমার কী রোগা হয়ে গেছে গো।'

দীপকের মা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে পারলেন, 'না মা কাঁদছি না। কাঁদব কেন? আমার এক ছেলে গেল আর দুই ছেলে ফিরল। একে দেখুন—এর নাম অনিমেষ। খোকাকে যে দেখাশুনা করত।'

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা এবার শ্লথ পায়ে অনিমেষের কাছে এলেন, 'তোমার কথা শুনেছি বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'মঙ্গল যা করার তিনি করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'ওকথা বোলো না বাবা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমাকে দ্যাখো না, স্বামীকে হারালাম তো ছেলেকে জড়িয়ে ধরলাম। ছেলেকে হারালাম তো নাতিকে জড়িয়ে ধরলাম। এবার নাতিকে—।' কথা শেষ না করে বললেন, 'আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি বাবা। বউমা বলত খোকা নাকি আর কখনও স্বাভাবিক হবে না। আবার কালকে এসে বলল ও নাকি একমাত্র তোমার ডাকেই সাড়া দেয়। তবে?'

এবার দীপকের মা এগিয়ে এলেন, 'অনিমেষ, উনি দীপকের ঠাকুরমা।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে প্রণাম করব সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি আজকাল কোমর বেঁকাতে পারি না।'

'থাক বাবা, যথেষ্ট হয়েছে। বউমা, এদের খাবার ব্যবস্থা করো।' অনিমেষ লক্ষ করল দীপকের মায়ের ব্যক্তিত্ব এই বৃদ্ধার কাছে কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে। তিনি মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বৃদ্ধা আর একটা চেয়ার নিয়ে ওর সামনে বসলেন। 'খোকা কি সত্যি তোমার ডাকে সাড়া দেয়?'

'ঠিক সাড়া নয়, তবে মাঝে মাঝে তাকায়।'

'খুব ব্রাইট ছেলে ছিল ও, দ্যাখো কী হল! প্রেসিডেন্সিতে পড়ত, হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করেছিল। ওর বাবাও খুব ভাল ছেলে ছিল। কিন্তু কখন যে কী হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে অনিয়ম করত। ওর মা বকা-ঝকা করলেও আমি বাধা দিতাম। বলতাম, খোকা কখনও কোনও অন্যায় করতে পারে না। তারপর একদিন ও আর বাড়িতে ফিরল না। কী দুশ্চিন্তা আমাদের। হাসপাতালের খবর নিই, আত্মীয়দের বাড়িতে খবর নিই। ঘরপোড়া গরু আমি—কিছুতেই মন মানে না। একটা সময় ওর চিঠি এল। দেশটাকে স্বাধীন করতে চাই, তোমরা আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। কিছুই বুঝলাম না। দেশ তো স্বাধীন, তাকে আবার স্বাধীন করবি কি! সেই সময় পুলিশ এল বাড়িতে। সব তল্লাশি করে কাগজপত্র পেল। যাওয়ার সময় বলে গেল সে নাকি নকশাল হয়েছে। কাগজে তখন এ সব খবর সবে ছাপা হচ্ছে। বুক আমার হিম হয়ে গেল। নকশাল মানে জানি যারা পুলিশের গলা কাটে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে। আমাদের খোকা ও সব করছে? একদিন রাত্তিরে টেলিফোন এল খোকার। বলল, শত্রুরা নাকি তাদের ঘিরে ফেলেছে। পালাবার পথ নেই। তার মাকে বলল,

BanglaBook.org

বারান্দায় ফুলের টবে নাকি বোমা লুকোনো আছে। সেগুলো নিয়ে ওর মা যদি আধঘণ্টার মধ্যে না পৌঁছতে পারে তা হলে ওরা মরে যাবে। আমরা দুজনে মিলে টব ভেঙে দেখলাম সত্যি সত্যি সুন্দর প্যাক করা কতগুলো বাক্স বের হল। ওর মা বলল সে যাবে। আমি বললাম, না, গেলে আমি যাব। কিন্তু কাউকেই যেতে হল না। বাড়ি থেকে বের হবার আগে পুলিশ এল। আমাদের টেলিফোন লাইনে যে আড়ি পাতা ছিল কে জানত! তারা এসে বোমাগুলো নিয়ে গেল। দু' তিনদিন বউমাকে থানায় যেতে হয়েছিল ওই জন্যে। খোকাকে নাকি পুলিশ সে রাত্রে উদ্ধার করেছে। কীরকম করেছে দেখতেই পাচ্ছ।' বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেললেন জোরে জোরে। তারপর হঠাৎ অনিমেষের হাত ধরে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলো তো বাবা, তোমরা কি নিজেদের ক্ষমতা জানতে না?'

অনিমেষ বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাল। বিবর্ণ মণিদুটো তার দিকে স্থির হয়ে আছে। মুখময় অজস্র ভাঁজ। সময়ের রেখাগুলো এখন স্পষ্ট।

সে পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমরা বিশ্বাস করি এ ভাবে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত নয়। রাজা নেই, বিদেশি শাসক নেই কিন্তু তাদের জায়গা নিয়েছে সামান্য কয়েকজন মানুষ, যাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর ভারতবাসীর দিন কাটছে। আমরা একটা রাস্তা খুঁজতে চেয়েছিলাম যা আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে।'

বৃদ্ধা অসহিষ্ণু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের জোরে তোমরা এমন ভাবে কোনও কিছু চিন্তা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লে?'

অনিমেষ আবার বলল, 'বিশ্বাস।'

'কিন্তু এই তো তার পরিণতি হল। খোকাকে দ্যাখো, কোনওদিন ও মুখ ফুটে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ, তুমি কি কোনওদিন স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে পারবে? তবে? কী দাম এই রকম বিশ্বাসের?' বৃদ্ধা নাতির হাত ধরলেন।

এই প্রশ্নটা জেলে বসে অনিমেষ হাজার বার নিজেকে করেছে। হঠকারিতা থেকে কোনও সুন্দর সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আজ এই সময়ের শিকার হওয়া মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে উত্তর দিতে একটুও অস্বস্তি বোধ করল না, 'বিশ্বাস যদি সত্যি হয় তা হলে অনেক অসাধ্যসাধন করা যায়। আমরা পারিনি কিন্তু তাই বলে কাজটা শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো সাময়িক ভাবে সেটা থেমে আছে। আমরা করতে চেয়েছিলাম বলেই ভুলগুলো ধরা পড়েছে। আমাদের আগে কেউ করেনি বলে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পরে যারা এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করবে তারা আমাদের ভুলগুলো থেকে অভিজ্ঞতা পাবে। ফলে তারা সফল হবেই।'

'কিন্তু আগুনে হাত দিয়ে তো তোমাদের হাত পুড়ল।'

'ঠিকই। তা থেকে মানুষ শিখল আগুনকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। সেইটুকুই লাভ।'

বৃদ্ধা নড়েচেড়ে বসলেন, 'আমি এত সব বুঝি না। খোকার না হয় কিছু বোঝার শক্তি নেই কিন্তু তোমার আফশোস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। ভুলগুলো করলাম বলেই আফশোস হচ্ছে।'

অনিমেষের কথা শেষ হওয়া মাত্র পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একটি মেয়ে হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল, পেছনে দীপকের মা। টেবিলে ট্রে নামানো হলে অনিমেষ দেখতে পেল একটা বড় কাচের বাটিতে জল আর তার পাশে ছোট তোয়ালে রাখা আছে। দীপকের মা বললেন, 'তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও অনিমেষ।'

জেলে বাস করে যে অভ্যাস হয়েছিল তার কাছে এই আপ্যায়নকে রাজসিক ব্যাপার বলা যায়। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে অনিমেষ হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছলে মেয়েটি সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেল। দীপকের মা তখন আর একটা ভেজা তোয়ালেতে দীপকের মুখ হাত পরম-যত্নে মুছিয়ে দিচ্ছেন। দীপক পাথরের মূর্তির মতো সোজা হয়ে বসে। তার চোখ অনিমেষের ওপর। হঠাৎ অনিমেষের মনে একটা নতুন চিন্তা এল। দীপক অভিনয় করছে না তো! সে সব বুঝে না বোঝার ভান করে নেই তো! কথাটা মাথায় আসতেই শরীর শিরশির করে উঠল তার। এবং কিছু না ভেবেই সে একটু ঝুঁকে দীপককে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে দীপকের ঠাকুমা চমকে উঠলেন, দীপকের মায়ের হাত থেমে গেল। সবাই দীপকের মুখের দিকে তাকিয়ে অথচ সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না। দীপক চোখ সরাল না, দৃষ্টি পালটাল না, শুধু ঠোঁট কেঁপে উঠল বলে অনিমেষের মনে হল। অনিমেষ ধীরে ধীরে ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিল।

BanglaBook.org

দীপকের ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ ওকে জিজ্ঞাসা করলে কেন?'

অনিমেষ বলল, 'আমার যেন মনে হল ও সব বুঝতে পারছে। কিন্তু না, আমার মনের ভুল।'

দীপকের মা বললেন, 'আমাদের পারিবারিক ডাক্তার একটু বাদেই আসবেন। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে চিকিৎসা শুরু করব। তোমার কথাও ওঁকে ফোনে বললাম। তোমাকেও দেখবেন উনি।'

'কী লাভ হবে?'

'এত হতাশ হচ্ছ কেন? বলা যায় না, অপারেশন করে ওরা তোমাকে হয়তো স্বাভাবিক করে দিতে পারে।'

'না, আমি জানি তা কখনও হবে না।' কথাটা বলতে বলতে অনিমেষ ডান হাত দিয়ে নিজের পা ঠিক করতে গেল। বেকায়দায় পড়ায় সেখানে ব্যথা লাগছে। তলপেটের নীচের শরীরটা তার ইচ্ছে মতো চলে না। বসবার সময় যদি সেগুলো বেকায়দায় থাকে তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। ইজিচেয়ারে বসে থাকার দরুন বেশ কষ্ট হল পা দুটোকে স্বাভাবিক করতে। সে চাইছিল না দীপকের মা ব্যাপারটা বুঝে তাকে সাহায্য করেন।

এই সময় মেয়েটি খাবারের প্লেট নিয়ে ফিরে এল। টোস্ট, ডিম সেদ্ধ আর দুটো সন্দেশ। অনিমেষের সামনে একটি টিপয় এগিয়ে দিয়ে তাতে প্লেট রেখে মেয়েটি দীপকের খাবার এগিয়ে দিল। তারপর নিচু গলায় দীপকের মাকে কিছু জানাল সে। কথাটা শুনে তিনি চকিতে দীপককে দেখলেন। তারপর মেয়েটিকে বললেন, 'তুই যা আমি আসছি।'

অনিমেষ খাবারগুলোর দিকে তাকাল। অনেক অনেক বছর বাদে কেউ তাকে ভদ্রভাবে খাবার খেতে দিল। দীপকের ঠাকুমা তখন টোস্ট নিয়ে দীপকের মুখের সামনে ধরেছেন। সে মুখ খুলছে না, এক দৃষ্টিতে অনিমেষকে তখন থেকেই দেখে যাচ্ছে। অনেক অনুনয়, পিঠে হাত বোলানো ব্যর্থ হল। সে মুখ খোলার কথা মাথায় যেন আনতেই পারছে না। অথচ দীপকের মা আগে জেলে গিয়ে ছেলেকে খাইয়ে আসতেন নিজের হাতে। অনিমেষের মনে হল ঠাকুমার বদলে মা খাওয়ালে দীপক সহজেই খেত। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েই সে চুপ করে গেল। বৃদ্ধা এতে যে আঘাত পাবেন তাতে সে নিঃসন্দেহ।

দীপকের মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি হাত গুটিয়ে আছ কেন, খাও।' কথাটা শুনে অনিমেষ প্লেট থেকে একটা টোস্ট তুলে দীপকের চোখে চোখ রাখল। তারপর সেটা মুখের কাছে ধরে সামান্য হাঁ করতেই দীপকও যেন একই ভঙ্গিতে মুখ খুলল। ওর ঠাকুমা সেই সুযোগে খাবার তার মুখে গুঁজে দিতে সে অনিমেষের অনুকরণে চিবোতে লাগল।

দীপকের মা বললেন, 'তোমার খুব বাধ্য হয়েছে দেখছি খোকা।' ঠাকুমা বললেন, 'হ্যাঁ, কী আশ্চর্য। দ্যাখো, এখন কী সুন্দর খাচ্ছে খোকা।'

দীপকের মা মাথা নেড়ে মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ঠাকুমা তখন নানান আদুরে সংলাপ বলে নাতিকে খাইয়ে চলেছেন। অনিমেষের অস্তিত্ব এই মুহূর্তে আর যেন ওঁর স্মরণে নেই। অনিমেষের খিদেও পেয়েছিল। প্লেট শেষ করে সে পুরো গ্লাস জল খেয়ে নিল। এই সময় দীপকের মা ফিরে এলেন। উনি অনিমেষকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।'

'আমার সঙ্গে?' অনিমেষ অবাক হয়ে তাকাল।

মাথা নাড়লেন মহিলা।

দীপকের মুখে শেষ খাবারটুকু গুঁজে দিয়ে ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও এখানে আছে তা লোকে জানল কী করে?'

'জেলখানায় গেলেই তো জানা যায়।' দীপকের মা জানালেন।

অনিমেষ সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল, 'নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। মাধবীলতা।'

ঠাকুমা বললেন, 'মেয়েছেলে! চেনো নাকি তুমি?'

অনিমেষ তখন নিস্পন্দ। মাধবীলতা এসেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা রিমঝিমে অনুভূতি শুরু হয়ে গেল তার। চট করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোনও রকমে দুহাতে টাল সামলাল সে। আর তখনই অদ্ভুত অবসাদ অনিমেষকে আচ্ছন্ন করল। যে কারণে সে এতগুলো বছর মাধবীলতার সঙ্গে দেখা করেনি, নিজের এই পঙ্গু শরীরটা নিয়ে মাধবীলতার ভার বাড়াতে চায়নি ঠিক সেই কারণেই এখন সে অস্থির হল। আজ তার মুক্তির দিন এ-কথা মাধবীলতা জানতে পারল কী করে? অবশ্য

BanglaBook.org

তার খেয়ালে ছিল না জেলখানায় গেলেই যে কেউ তার বর্তমান ঠিকানা পেয়ে যেতে পারে। ভদ্রমহিলা তো সবাইকে জানিয়েই অনিমেষকে এখানে নিয়ে এসেছেন। মাধবীলতা এখন তার অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে এবং তাদের মধ্যে জেলখানার লোহার গরাদ নেই, তবু অনিমেষের সঙ্কোচ হচ্ছিল।

ঠাকুমা প্রশ্নটা আবার করতেই অনিমেষের চমক ভাঙল। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। দীপকের মা বললেন, 'আমি কি মেয়েটিকে এখানে আসতে বলব?'

অনিমেষ নিচু গলায় বলল, 'আমার পক্ষে তো—।'

'না না ঠিক আছে। তুমি বসে থাকো। আমি ওকে এখানে আসতে বলছি। তোমার আত্মীয় না বন্ধু?'

'আত্মীয়।' অনিমেষ দ্রুত জবাব দিল।

'ও কি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে?' ঠাকুমার গলার স্বর এখন অন্যরকম। একটু সতর্ক সন্দেহ সেখানে।

'আমি জানি না।'

'যেই জেল থেকে ছেড়ে দিল অমনি সব এসে জুটেছে। এতদিন যখন জেলে কষ্ট পাচ্ছিলে তখন এরা দেখতে যেত?' ঠাকুমা ফোঁস করে উঠলেন।

দীপকের মা বললেন, 'না, কেউ ওর সঙ্গে দেখা করেনি বলেই তো জেলে শুনেছি। হয়তো আজ জেলে গিয়ে খবর পেয়ে এখানে এসেছে।'

ঠাকুমা দীপককে জড়িয়ে ধরলেন, 'যেই আসুক বলে দাও ও এখানেই থাকবে। ও কাছে না থাকলে আমাদের খোকা কখনও ভাল হবে না। অনিমেষকে আমরা ছাড়তে পারব না বলে দিচ্ছি।'

দীপকের মা খানিক ইতস্তত করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অনিমেষ দেখল শুধু দীপক নয়, তার ঠাকুমাও এখন তার মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছেন না। সে আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিল। মাধবীলতাকে কী কথা বলবে সে? এই ক' বছরে ওর কোনও খবর সে পায়নি। এখনও কি সেই হোস্টেলে রয়েছে মাধবীলতা। এ-কথা নিশ্চিত মাধবীলতা বাড়িতে ফিরে যায়নি কিংবা আর কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেনি। এখনও যদি ও হোস্টেলেই থেকে থাকে তা হলে সেখানে অনিমেষের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এক ধরনের গোপন লজ্জা অনিমেষকে আচ্ছন্ন করল। অনেকদিন দেখা হয়নি, মাধবীলতার চেহারা এখন কেমন হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরাধবোধ তাকে বিদ্ধ করল। একটি মেয়ে সারাজীবন তার জন্যে সব কিছু উপেক্ষা করল অথচ বিনিময়ে নিজের পঙ্গুত্ব ছাড়া সে কিছুই দিতে পারবে না তাকে। অনিমেষ দুহাতে মুখ ঢাকল।

পায়ের শব্দ হচ্ছিল। দীপকের মায়ের গলা শোনা গেল, 'আসুন।'

অনিমেষ অনেক চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করে মুখ তুলল, দরজায় মাধবীলতা দাঁড়িয়ে। তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে আছে সে। সমস্ত শরীরে যে এখন তিরতিরে কাঁপুনি এসেছে তা অনিমেষের চোখ এড়াল না। অনিমেষ অবাক হয়ে মাধবীলতাকে দেখল। এ কাকে দেখছে সে? যেমন করে পাহাড়ভাঙা পাথরের চাঁই নদীর জলে ঘষা খেয়ে মসৃণ চেহারা নিয়ে নেয় কিংবা সমুদ্রের উদ্দাম ঝড়ের মোকাবিলা করে জাহাজের রিক্ত অবস্থা হয় তেমনি একটি চেহারা নিয়ে মাধবীলতা এখন দরজায় দাঁড়িয়ে। অল্পবয়সী পেলবতার বদলে একটা রুক্ষ হাওয়া তার সর্বাঙ্গে। ওই ক' বছরে সময় যেন অনেকগুলো বয়সের ভার তার শরীরে চাপিয়ে দিয়েছে। চোখের কোলে কালি, হাত শীর্ণ, শরীরে একটা আটপৌরে শাড়ি দীনতার চিহ্ন হয়ে জড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ছাড়া আর কিছু অলঙ্কার মাধবীলতার নেই। এতদূর থেকেও যেন অনিমেষ মাধবীলতার বুকের নিশ্বাস অনুভব করল। সে দেখল খুব দ্রুত মাধবীলতা নিজেকে সামলে নিচ্ছে। অনিমেষ প্রাণপণে নিজের চোখ দুটোকে শুকনো রাখার চেষ্টা করছিল।

মাধবীলতা ধীর পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, 'কখন ছাড়ল?'

'সকালে।' অনিমেষের নিজের গলা অচেনা মনে হল।

'আজকে তো কথা ছিল না। হঠাৎ কী মনে হতে গিয়েই শুনতে পেলাম।—'

'হ্যাঁ, হঠাৎই হয়ে গেল।'

অনিমেষ দেখল মাধবীলতার চোখ তার পায়ের দিকে। সে দৃষ্টি ফেরাতে অন্য প্রসঙ্গে এল, 'এঁরা আমাকে নিয়ে এসেছেন। খুব আদর যত্ন করেছেন।'

BanglaBook.org

ঠাকুমা বললেন, 'আমার এই নাতিটি অনিমেষের সঙ্গে এক ঘরে ছিল। পুলিশ তো ওর সব কেড়ে নিয়েছে। কথা বলতে পারে না, কোনও অনুভূতি নেই। শুধু অনিমেষের ওপর একটা টান আছে।'

মাধবীলতা ঘাড় ঘুরিয়ে দীপককে দেখল। দীপক তখনও অনিমেষের দিকে তাকিয়ে আছে। দীপকের মা বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

একটু অস্বস্তি নিয়েই মাধবীলতা অনিমেষের পাশের চেয়ারে বসল। অনিমেষ আড়চোখে দেখল মাধবীলতা সেই খেটে খাওয়া মেয়েদের মতো, যাদের কাছে সামান্য প্রসাধন বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।

ঠাকুমা বললেন, 'তুমি ওকে জেলে দেখতে যেতে?'

মাধবীলতা মাথা নিচু করল, 'খবর নিতে যেতাম।'

'দেখা করতে না?'

'দেখা হত না।'

'কেন? বউমাকে তো খোকার সঙ্গে দেখা করতে দিত। তোমাকে দিত না কেন?' প্রশ্নটা শুনে মাধবীলতা একটু দ্বিধা নিয়েই বলল, 'হয়তো এক একজনের বেলায় এক এক রকম নিয়ম।'

অনিমেষ দেখছিল মাধবীলতাকে। ওর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে, মুখে খসখসে ভাব। খুব অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে ওকে। এখন পর্যন্ত মাধবীলতা তার শরীর নিয়ে একটাও প্রশ্ন করেনি। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে তার পায়ের দিকে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। এই সময় চা নিয়ে এল মেয়েটা। দীপকের মা নিজের কাপটি মাধবীলতার দিকে এগিয়ে দিতে সে মাথা নাড়ল, 'না, আমি খাব না।'

'কেন?'

'আমি সকালে এক কাপ খাই, বেশি খেলে শরীর খারাপ লাগে।'

'ও।'

অনিমেষ একটু অবাক হল। সেই মাধবীলতা এই কথা বলছে? রেস্টুরেন্টে বসে ওরা এক সময় আধ ঘণ্টা পর পর চা নিত, এর মধ্যেই কেমন বয়স্ক মানুষের মতো কথা বলছে মাধবীলতা।

চা খেতে খেতে দীপকের মা বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, তুমি বলছি তোমাকে।'

মাধবীলতা একটু শক্ত হল, তারপর বলল, 'বলুন।'

'তুমি কি অনিমেষকে নিয়ে যেতে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু অনিমেষ প্রতিবন্ধীদের একটা আশ্রমে যেতে চাইছিল। সত্যি বলতে কি সাতদিন এখানে থাকতে ওকে জোর করে রাজি করিয়েছি।'

মাধবীলতা দাঁতে ঠোঁট চাপল। কথা বলল না।

'তোমার কাছে যাওয়ার কথাও কিন্তু বলেনি।'

মাধবীলতা স্পষ্ট গলায় বলল, 'এটা আমাদের ব্যাপার।'

'ও!' দীপকের মা একটু অবাক হলেন যেন, 'আমি অবশ্য তোমাদের সম্পর্কটা কী তা জানি না।'

মাধবীলতা চকিতে অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে হেসে ফেলল। তারপরই উজ্জ্বল মুখে দীপকের মাকে বলল, 'আমি ওকে নিয়ে যেতেই এসেছি।'

দীপকের ঠাকুমা উষ্ণ গলায় বললেন, 'আমি বাবা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কাছে থাকলে খোকার উন্নতি হবে। আমরা খোকাকে যেমন চিকিৎসা করাব অনিমেষকেও তেমনি সেবাযত্ন করব। ভদ্রতা না করেই বলছি ওর থাকাটা আমাদের প্রয়োজনে লাগবে। তুমি ওর কে হও তাই স্পষ্ট করে বলতে পারছ না, তোমার সঙ্গে ওকে যেতে দেব কেন?'

মাধবীলতা অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল। তারপর সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?'

অনিমেষ এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে! এই মেয়েকে সে কখনও সুখের স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। জীবনের বাকি দিনগুলোতে আরও দুঃখের বোঝা চাপাতে চায়নি ওর ওপর। কিন্তু মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সে দীপকের মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে চাইল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, দীপককে ভাল করে চিকিৎসা করালে ও নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

'তুমি তা হলে যেতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

দুজন বয়স্কা মহিলার মুখ একসঙ্গে থমথমে হয়ে গেল। এবার অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাব?'

'আমাদের বাসায়। বেলগাছিয়া।'

'তুমি জানো নিশ্চয়ই আমি হাঁটতে পারি না। জীবনে কখনও হাঁটতে পারব না।'

'জানি, জেনেই এসেছি।'

'তুমি একা বাসা নিলে কেন? কবে থেকে নিলে?'

'নিতে হল।'

মাধবীলতার এইরকম কথা বলার ভঙ্গিতে অনিমেষ বুঝল আর প্রশ্ন করা উচিত হবে না। অন্তত দুজন বাইরের মানুষের সামনে মাধবীলতা বিশদ হতে চাইছে না।

অনিমেষ দীপকের মাকে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না, মনে করব কেন? শুধু জানতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সম্পর্কটা কী?'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে অনিমেষ জবাব দেওয়ার আগেই মাধবীলতা হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওমা, তাই বুঝি।' দীপকের ঠাকুমা যেন চমকে উঠলেন, 'তুমি তো এত বছর জেলেই ছিলে, বিয়ে করলে কখন?'

'জেলে যাওয়ার আগেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।' মাধবীলতা জবাব দিল। দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বউমা। যদি এরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকে তা হলে অনিমেষ জেল থেকে বেরিয়ে নিজেদের বাড়িতে যাবে না কেন? আশ্রমে যেতে চাইছিল? তুমি কিছু বুঝতে পারছ?' দীপকের ঠাকুমা এখনও অসহিষ্ণু।

দীপকের মা হেসে বললেন, 'মান অভিমানের ব্যাপার। আমাদের বেশি বুঝতে চাওয়া ঠিক নয়। তবে তুমি কিন্তু ওকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ো।'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তত স্বস্তি পাবে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

'কেন?'

'এ রকম মানুষের চিকিৎসার খরচ তো কম নয়, তাই বলছি।'

'আমি আমার সাধ্যমতন নিশ্চয়ই করব।'

'তুমি কি চাকরি করো?'

'হ্যাঁ, আমি স্কুলে পড়াই। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ওকে এখানে যত্ন করে এনেছিলেন। এবার আমি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি।' মাধবীলতা বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দীপকের মা বললেন, 'আরে ট্যাক্সি ডাকতে যাবে কেন? আমার গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে অনিমেষকে। তুমি বসো আমি ড্রাইভারকে খবর দিচ্ছি।'

'কী দরকার। এটুকু আমাকে করতে দিন।' মাধবীলতা শক্ত গলায় বলল।

দীপকের মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখলেন তিনিই জানেন, এবার গলা নামিয়ে বললেন, 'বেশ, গাড়ি যদি না নিতে চাও নিয়ো না, আমি ওদের কাউকে ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলছি। এ পাড়ায় চট করে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। তাতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি হবে না।'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল। দীপকের মা চলে গেলে সে আবার অনিমেষের সামনে এসে বসল, 'তোমার সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই, না?'

অনিমেষ বলল, 'আমি তো একদম খালি হাতে জেলে গিয়েছিলাম। বেরুবার সময় ওরা হাত ভরে দেবে কেন?'

মাধবীলতা বলল, 'তোমার হোস্টেল থেকে পাওয়া সেই স্যুটকেস এখনও আমার কাছে আছে। জামাগুলো ছোট হবে কিনা জানি না।'

BanglaBook.org

একটু বাদেই দীপকের মা এসে জানালেন ট্যাক্সি এসে গেছে। বললেন, 'তোমাদের ঠিকানাটা রেখে যাও, যদি কখনও দরকার পড়ে—।'

মাধবীলতা একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে টেবিলের ওপর রাখল। কাগজ এবং ডটপেন তার ব্যাগেই ছিল। অনিমেষ ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল। তাঁর মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট। দীপক এখনও তেমনি তাকিয়ে আছে। দীপকের মা সঙ্গে লোক নিয়ে এসেছিলেন যারা তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এখানে এনেছিল। তারা সাবধানে অনিমেষকে ইজিচেয়ার থেকে আর একটা সাধারণ চেয়ারে বসাল। তারপর সেই চেয়ারটি নিয়ে হাঁটা শুরু করতেই অনিমেষ ওদের বলল, 'একটু দাঁড়াও ভাই, আমাকে একটু দীপকের কাছে নিয়ে চলো।'

লোকগুলো অনিমেষকে চেয়ার-সমেত দীপকের সামনে নিয়ে এলে সে বলল, 'চললাম ভাই।' বলে ডান হাতটা আলতো করে দীপকের কাঁধে রাখল। হঠাৎ একটু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। দীপকের দুটো হাত সচল হয়ে অনিমেষের হাত জড়িয়ে ধরল। তার চোখ বিস্ফারিত, একটা গোঙানি উঠছে মুখ থেকে। অনিমেষের মনে হল তার হাত ভেঙে যাবে, দীপকের মুঠোয় এত শক্তি কল্পনা করতে পারেনি সে। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল অনিমেষ কিন্তু দীপক একটুও মুঠো আলগা করছে না। ওর মা ছুটে এলেন। লোকগুলো চেয়ার মাটিতে না নামালে অনিমেষ নিশ্চয়ই পড়ে যেত। সকলে মিলে অনেক চেষ্টার পর দীপকের হাত ছাড়ানো গেল। ওর মা আর ঠাকুমা তখন ওকে ধরে রেখেছেন। গোঙানিটা এখনও বন্ধ হয়নি। অনিমেষের হাতে তখনও জ্বলুনি হচ্ছিল। সে দীপকের দিকে আর একবার তাকাতে দেখল বেচারার কশ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। বীভৎস দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

ঠাকুমা তখন উত্তেজিত গলায় বলছেন, 'ডাক্তার বাবুকে ডাকো, ওর বোধহয় জ্ঞান ফিরে আসছে, ও বউমা, যাও।'

একটু বাদেই ছেলেটা শান্ত হয়ে এল। দীপকের মা তাকে একটা ডিভানে শুইয়ে দিতেই সে চোখ বন্ধ করল। বোঝা যাচ্ছিল খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে দীপক। এত বছর এক ঘরে বাস করেও একদিনের জন্যেও এরকম ব্যবহার করতে ওকে দেখেনি অনিমেষ। সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

মাধবীলতা পাশ থেকে চাপা গলায় বলল, 'এবার চলো।'

লোকগুলো চেয়ার তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দীপকের মা এবং ঠাকুমা ঘরে রয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টে অনিমেষকে ওরা ট্যাক্সিতে তুলে দিল। দুহাতে ভর করে অনিমেষ জানলার কাছে জায়গা নিল। মাধবীলতা ট্যাক্সিতে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো!'

দীপকের ব্যবহারে অনিমেষ তখনও অন্যমনস্ক ছিল। বলল, 'কেন ?'

মাধবীলতা ব্যাপারটা ভুল বুঝল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল। সে একটু অন্যরকম গলায় প্রশ্ন করল, 'আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি!'

অনিমেষ হেসে ফেলল। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।'

মাধবীলতা ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল, 'বেলগাছিয়ায় চলুন।'

পঁয়তাল্লিশ

জানলায় কলকাতা ঠিকঠাক, একটুও পালটায়নি। ট্রাম বাস ছুটছে যেমন চলত ওরা আন্দোলন শুরু করার আগে, মানুষজনেরা ঠিক তেমনি অলস কিংবা ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। মেট্রো সিনেমার সামনে বিরাট লাইন পড়েছে টিকিটের। ফুটপাতের বিদেশি জিনিস কিনবার জন্য জনস্রোত বইছে অর্থাৎ কলকাতা ঠিক কলকাতাতেই আছে। এত বড় একটা আন্দোলন হয়ে গেল, এত ছেলে মরে গেল কিংবা বেঁচে মরে থাকল তাতে কলকাতার কিছু এসে গেল না। অনিমেষের বুক হঠাৎ টনটন করে উঠল। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে এই কলকাতা দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে সে নিজের পঙ্গু পায়ের ওপর হাত রাখল।

দলের লোকজন কে কোথায় আছে সে জানে না। যারা বাইরে আছে তারা এখন কী ভাবনাচিন্তা করছে, আদৌ করছে কি না তাও অজানা। এই কলকাতার চেহারা দেখে সে-কথা মনে হয় না। আর এখন তার শরীরের অবস্থা যে রকম, কেউ যোগাযোগ করবে বলে মনে হয় না। কার কী প্রয়োজনে সে লাগতে পারে! প্রয়োজন শব্দটা মনে আসতেই সে সচকিত হল। মাধবীলতা তার পাশে বসে

BanglaBook.org

আছে। যদিও দুজনের মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব তবু মাধবীলতা তাকে কী প্রয়োজনে ওর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে ? অনিমেষের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। শেষ দেখার সময়, লালবাজারে পুলিশের সামনের স্মৃতি অনুযায়ী মাধবীলতা সন্তানসম্ভবা ছিল। তারপর কী হল ? মাধবীলতার কি সন্তান হয়েছে ? একা একা এই কলকাতা শহরে কোনও কুমারী মেয়ে কী ভরসা ও সাহসে সন্তানবতী হয়ে তাকে মানুষ করে অন্য কারও অপেক্ষায় থাকতে পারে ? হঠাৎ অদ্ভুত একটা হীনমন্যতাবোধ অনিমেষকে ঘিরে ধরল। তার মনে হতে লাগল, মাধবীলতা তাকে হারিয়ে দিয়েছে সর্বক্ষেত্রেই। বোলপুরে ক্ষণিকের উত্তেজনা তাকে মাঝেমাঝেই বিদ্ধ করত। তার ক্ষেত্রে শুধু এই যন্ত্রণাটুকু যা কিনা বাইরের নানান কাজের চাপে মাঝেমাঝেই চাপা পড়ে যায়। কিন্তু মাধবীলতাকে সেই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তাকে একা একা লড়াই করতে হয়েছে এই সমাজের সঙ্গে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে এবং প্রতীক্ষা করেছে কবে অনিমেষ মুক্তি পাবে। এবং এখন অনিমেষ পরিচিত সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল যে হীনতাবোধে ঠিক তার বিপরীত চিন্তায় মাধবীলতা অনিমেষকে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। সে-অনিমেষ সুস্থ কিংবা পঙ্গু যাই হোক তাতে মাধবীলতার কিছুই এসে যায় না। এখানেই মাধবীলতার জিত। হঠাৎ অনিমেষের মনে একটা আলোড়ন এল। মাধবীলতা একা এসেছে। ওর সন্তান —! কথাটা ভাবতেই আর একবার লজ্জিত হল অনিমেষ। সে তো ভাবতে পারল না আমাদের সন্তান! এ কি শুধু অনভ্যাসেই! সে মেয়ে না ছেলে তা অনিমেষ জানে না। তবে ক্রমশ তাকে দেখার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল।

এবার মাধবীলতার দিকে স্পষ্টচোখে তাকাল অনিমেষ। অন্যমনস্ক কিনা বোঝা যাচ্ছে না, মাধবীলতা জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখেছে। ট্যাক্সিটা এখন হ্যারিসন রোডের মুখে দাঁড়িয়ে। সার দিয়ে গাড়িগুলো অনড় হয়ে আছে। মাধবীলতার মুখে এখন কয়েকটা গাঢ় রেখা, চুল পাতলা হয়েছে, শাড়িটাও বেশ আটপৌরে। এরকম মেয়েকে পথেঘাটে অজস্র দেখা যায়। খুব ক্লান্ত একটা ছায়া ওদের ঘিরে রাখে। হঠাৎ মাধবীলতা সোজা হয়ে বসল। মুখ বাড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর একটা বিরক্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাচ্চলে, আবার মিছিল বেরিয়েছে।'

ততক্ষণে অনিমেষ দেখতে পেয়েছে। কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে অনেকটা রাস্তা জুড়ে একটা মিছিল বিপরীত দিক থেকে আসছে। তারা চিৎকার করে নানারকম দাবি জানাচ্ছে। ভঙ্গিটা খুবই চেনা, যে কোনও রাজনৈতিক দল এই একই ভঙ্গিতে বিক্ষোভ জানায়। ওদের যাত্রা শেষ হবে এসপ্লানেড ইস্ট-এ। তারপর মিছিলের লোক ফুচকা খাবে কিংবা সিনেমা দেখবে। এক ধরনের ঘেন্না হল অনিমেষের। এ যেন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হত্যে দেওয়া, দয়া করো, দয়া করো বাবা, তারপর জলটল মুখে দিয়ে মেলা দেখতে যাওয়া। যারা নিয়ে যায় তারা জানে নিয়ে যেতে হবে, যারা যায় তারা জানে যেতে হবে এবং যাদের কাছে যাওয়া হয় তারাও জানে ওরা আসবে। এইরকম ন্যাকামিতে শরীর গুলিয়ে ওঠে।

হাজার হাজার মানুষ ট্রামে বাসে ট্যাক্সিতে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে কখন এই মহৎ পদযাত্রা শেষ হবে এবং তারা তাদের প্রয়োজনে যেতে পারবে। অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাতে যেতেই ড্রাইভারের আয়নায় দৃষ্টি গেল। সেখানে মাধবীলতার চোখ, এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিমেষ বলল, 'আমি তোমার কথা কিছুই জানি না।'

'কী কথা ?'

'তুমি কেমন ছিলে ?'

'ছিলাম, এই পর্যন্ত।'

'আমি তোমার চিঠির উত্তর দিইনি, তোমার সঙ্গে দেখা করিনি, কেন করিনি তা নিয়ে তুমি কিছু ভেবেছ ?'

'তুমি ভাল মনে করেছ তাই ওই রকম করেছ, আমি কী বলব।'

'তবু তুমি আমাকে নিতে এলে ?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'কিন্তু কেন ?'

'তুমি বুঝবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধার পর অনিমেষ কথাটা তুলল। মাধবীলতার মুখ জানলার দিকে ফেরানো। ট্যাক্সিটা এখনও নড়ছে না। জিভ ভারী হয়ে আসছিল অনিমেষের, শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'তুমি কি

BanglaBook.org

একা আছ ?'

'একা ?' যেন চমকে উঠল মাধবীলতা, 'না একা থাকব কেন ? আমি আর আমার ছেলে থাকি।' কথাটা বলে মাধবীলতা পূর্ণদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষের মনে হল কেউ যেন একটা লোহার বল ওর হৃৎপিণ্ডে বেঁধে দিল। এইসময় গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলা শুরু করল। চোখের পাতা অকস্মাৎ ভারী হয়ে এল, অনিমেষ প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যাতে জল গড়িয়ে না আসে।

কিছুক্ষণ বাদে সে বলতে পারল, 'ও এখন কত বড় হয়েছে ?'

হেসে ফেলল মাধবীলতা, 'তোমার হিসেব নেই ?' তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'স্কুলে পড়ছে।'

'কোথায় ?'

'আমাদের পাড়াতেই। বড় স্কুলে পড়াবার সামর্থ্য আমার নেই।'

'তুমি এখনও পুরনো স্কুলেই পড়াচ্ছ ?'

'না, নতুন স্কুল খুঁজে নিতে হয়েছে।'

'কোনও অসুবিধে হয়নি ?'

'কীসের ?'

অনিমেষের ইচ্ছে হচ্ছিল বিশদভাবে মাধবীলতার সব কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু একটা আড়ষ্টতাবোধ তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল যে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল না। এই ব্যাপারটা বুঝতে মাধবীলতার একটুও বিলম্ব হল না। সে খুব শান্ত গলায় বলল, 'এই দেশে একটা কুমারী মেয়ের শরীরে সন্তান এলে তাকে কী কী সমস্যায় পড়তে হয় তা তুমি জানো না ? আমি নিজেকে কুমারী মনে না করলেও পাঁচজনে সে-কথা মানবে কেন ?'

শেষ পর্যন্ত অনিমেষ বলতে পারল, 'আমাকে সব কথা খুলে বলো।'

'কী বলব! আমার কিছুই বলার নেই।'

'কিন্তু —'

'অনিমেষ! আমি যা করেছি সেটা খুব সামান্য। নিজের মুখে সে সব কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। তুমি তো অনেক কিছু ভাবতে— দেশের কথা, অনেক মানুষের কথা; আমার মতো একটা সাধারণ মেয়ের কষ্টের কথা তুমি ভেবে নিতে পারবে না ?'

অনিমেষ নিশ্বাস ফেলল, 'তুমি 'আমার ছেলে' বললে কেন ? আমার পরিচয় —।'

মাধবীলতা হেসে ফেলল, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ, মুখে যাই বলো না কেন।'

'মানে ?'

'যে কোনও সন্তান প্রথমে তো মায়েরই। তা ছাড়া, তুমি তো কিছুই জানো না, খোঁজও রাখোনি, তোমার ছেলে বলি কোন সাহসে ?'

'কিন্তু আমিই তো ওর, মানে, আমি—।'

'বলতে পারছ না, আমি ওর বাবা!'

'হ্যাঁ তাই। তোমার পক্ষে যতটা সহজ আমার পক্ষে ততটা নয়। তুমি ওকে জন্ম দিয়েছ, প্রতিদিন মানুষ করেছ, তোমার সমস্ত অভ্যাসে ও মিশে রয়েছে।'

'সত্যি কথা। শান্তিনিকেতনের সেই রাতটাকে আমি আকণ্ঠ গ্রহণ করেছিলাম। তারপর তিলতিল করে সেই আনন্দটুকু আমার শরীরে বড় হল। অনেক আঘাত অনেক অপমান সয়েও আমি সেই আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। তোমার মনে সে-সব চিন্তা হয়তো আসেনি। তোমার কাছে সেটা একটা মুহূর্ত কিংবা একটা রাত হয়েই রইল, তার বেশি কী করে ভাববে ? যেমন ধরো, যেতে যেতে কেউ হয়তো কাউকে একটা কথা বলল। যে বলল সে হয়তো নানান কাজের ভিড়ে কী বলেছিল ভুলেই গেল। যাকে বলল সে কিন্তু চিরজীবন সেই কথাটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। সেই ধরে থাকাটা কিন্তু অনেক শক্তি দেয়।'

এই মাধবীলতা অন্যরকম। অনেক গভীর খাদের তলায় দাঁড়িয়ে চুড়োর দিকে তাকানোর মতো অনিমেষ মাধবীলতার কথাগুলো শুনল। সে আর কথা বলতে পারল না। ক্রমশ এক ধরনের হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ওর মনে হচ্ছিল সে মাধবীলতার সমান যোগ্যতা নিয়ে কোনও দিন ছেলেটির সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এই পঙ্গু শরীর নিয়ে ছেলেটির কোনও উপকারই সে করতে পারবে না।

BanglaBook.org

এই সব ভাবতে ভাবতে আচমকা অনিমেষের শরীর শিহরিত হয়। তার ছেলে এই পৃথিবীতে এসেছে। সরিৎশেখর, মহীতোষ এবং অনিমেষের রক্তস্রোত সেই ছেলেটির শিরায় বইছে। মাধবীলতা তাকে পরম যত্নে বাঁচিয়ে রেখে চলেছে। নিজের সন্তানকে দেখবার প্রচণ্ড আগ্রহ অনিমেষকে উত্তেজিত করল। আজ যদি মাধবীলতা তাকে চিনিয়ে না দেয় তা হলে কি সে ছেলেটিকে চিনতে পারবে ? তার চোখ মুখ হাঁটাচলার ভঙ্গিতে কি অনিমেষ আছে ? অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাল। ছুটন্ত ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়ে মাধবীলতা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। কিন্তু চোখের পাতা দুটো ভিজে টসটস করছে, যে কোনও মুহূর্তে জলের ধারা গড়িয়ে পড়বে গালে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল দু-হাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু ট্যাক্সির সিটের এই সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে আর একবার সজাগ হল সে। দুহাতে ভর করে শরীরটাকে হিঁচড়ে মাধবীলতার কাছে গিয়ে নিজের আবেগ প্রকাশ করা যায় না। নিজের কাছেই বড় দৃষ্টিকটু ঠেকে।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ট্যাক্সিটা আর জি কর হসপিটালের পাশ দিয়ে সোজা চলে এল বেলগাছিয়ায়। মাধবীলতা ডানদিকের একটা রাস্তায় ড্রাইভারকে ঢুকতে বলল। এ দিকে কখনও অনিমেষ আসেনি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ দিকটা চিনলে কী করে ?'

'আমার স্কুলের একজন টিচার এখানে থাকেন।'

'তুমি কি তাঁর সঙ্গেই আছ ?'

'না। তিনি এই মুখের বাড়িটায়, আমি ভেতরে।'

দেখতে দেখতে একটা বস্তি মতো এলাকা এসে গেল। রাস্তা খুব সরু। নর্দমার জল উপচে এসে একটা দিক ডুবিয়ে দিয়েছে। অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলছে। তাদের সামলে ট্যাক্সিটার এগোতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। একটা চায়ের দোকানের সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলল মাধবীলতা। বোধহয় এই গলিতে গাড়ি খুব কমই ঢোকে কারণ ততক্ষণে একরাশ ছোট ছেলেমেয়ে জুটে গেছে গাড়ির সামনে পেছনে। ড্রাইভার সমানে চিৎকার করেও তাদের সরাতে পারছে না। ভাড়া মিটিয়ে মাধবীলতা দরজা খুলে অসহায়ের ভঙ্গিতে এ-পাশ ও-পাশ তাকাতেই চায়ের দোকান থেকে কয়েকটি ছেলে নেমে এল। অনিমেষ তাদের চেহারা দেখল। টিপিক্যাল মাস্তানদের চেহারা সব পাড়াতে একই ধরনের হয়। সাদা কালো প্যান্টের ওপর চকরা-বকরা শার্ট, মোটা বেল্ট, হাতে বালা, ভাঙাচোরা শীতল মুখগুলো মাধবীলতার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে দিদি ?'

মাধবীলতা বলল, 'একটু বিপদে পড়েছি ভাই। তোমাদের দাদাকে নিয়ে এসেছি। উনি হাঁটতে পারেন না— ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সে সব জানি। পুলিশের অত্যাচার তো! আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমরা দাদাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

হইহই করে ছেলেগুলো বাচ্চাদের গাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দিল। তারপর এ পাশের দরজা খুলে দুজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে অনিমেষকে গাড়ি থেকে বের করে নিল। মানুষের কাঁধে ওঠার অভিজ্ঞতা এইভাবে প্রথম, অনিমেষ অস্বস্তিতে মাথা নিচু করেছিল। ততক্ষণে বোধহয় চারধারে খবর হয়ে গেছে। পিলপিল করে বস্তি থেকে কাচ্চাবাচ্চা মেয়েরা বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখছে। মাধবীলতার পিছু পিছু ছেলেরা অনিমেষকে নিয়ে এগোচ্ছিল। যেতে যেতে অনিমেষের কানে নকশাল শব্দটা বারবার প্রবেশ করছিল। এরা যে ওকে খুব বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে তা বোঝা যাচ্ছে। মাধবীলতাকেও হাঁটতে হাঁটতে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। কবে ছাড়ল দিদি, একদম হাঁটতে পারেন না, আহা—পুলিশ পুলিশ না পশু—এইসব। অনিমেষ বুঝল মাধবীলতা এখানে বেশ পরিচিত এবং তার ইতিহাসের কিছুটা এই বস্তির মানুষ জানে।

বড় গলি থেকে সরু গলিতে ঢুকল মাধবীলতা। দু-পাশে চাপা ঘরের সারি তার পরই একটা দেওয়াল। সদর দরজার পর চিলতে উঠোন। উঠোনের চারধারে চারটে ঘর। একটা বন্ধ দরজার তালা খুলে মাধবীলতা ইঙ্গিত করতে তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা তক্তাপোশের ওপর বসিয়ে দিল। সামনের উঠোনে সমস্ত বস্তি যেন ভেঙে পড়েছে। সবাই মুখ ঢুকিয়ে অনিমেষকে দেখতে চায়। মাধবীলতা ততক্ষণে দুটো বালিশ অনিমেষের পেছনে এনে রেখেছে যাতে সে আরাম করে বসতে পারে।

মাস্তান ছেলেগুলো যেন একটা বিরাট কাজ করেছে এমন ভঙ্গিতে মাধবীলতাকে বলল, 'কোনও দরকার হলে বলবেন, আমরা সবসময় আছি।'

BanglaBook.org

মাধবীলতা মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে হাসল।

একটি ছেলে অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনি কীসে স্পেশালিস্ট ? পেটো না পাইপ ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'দুটোর একটাতেও না। আমি ও সব কিছুই জানি না।'

'তা বললে শুনব কেন ? শুনেছি আপনি অনেক পুলিশের লাশ শুইয়ে দিয়েছেন। তা কি এমনি এমনি হয়! ঠিক হ্যায়, পরে আপনার কাছ থেকে সব জেনে নেব। এখন চলি।'

ছেলেগুলো আর একটা উপকার করল। যাওয়ার আগে বাইরের সব ভিড় সরিয়ে বাড়ি খালি করে দিয়ে গেল। শুধু পাশের তিনটে ঘরের বউ বাচ্চারা কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মেরে কৌতূহল মেটানোর পর ঘরটায় শান্তি এল।

দরজা থেকে ফিরে মাধবীলতা বলল, 'এখানে সবাই সবাইকে এমন করে চেনে-না, না চাইলেও এইরকম অত্যাচার সহ্য করতে হয় !'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল মাধবীলতা তাকে এই পরিবেশ সইয়ে দিতে চাইছে। এখানে আসার পর থেকেই অনিমেষের চোখ সন্ধানে ছিল কিন্তু তেমন কাউকে সে দেখতে পায়নি। অন্তত এই ঘরে যে ছেলেকে মাধবীলতা রেখে যায়নি সেটা তালা খোলা থেকেই বোঝা যায়।

খুবই সাধারণ ঘর। মেঝেটা সিমেন্টের, দেওয়ালও। কিন্তু ছাদ টিনের। এখনই বেশ গরম হচ্ছে। এই ঘরের ভাড়া কত অনুমান করা অসম্ভব। একটা তক্তাপোশের ওপর পাতলা তোশক রঙিন চাদর ঢাকা, শস্তার আলনায় কিছুশাড়ির আর বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট ঝুলছে, ও পাশে তক্তাপোশের মাথার কাছে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে কিছু বইপত্র চিঠি ছাড়া অন্য কোনও আসবাব ঘরে নেই। ঘরের এক কোনায় কিছু হাঁড়িকড়াই, কলাই-এর থালা, চায়ের কাপডিশ কেটলি আর স্টোভ দেখে বোঝা যায় রান্নাবান্না এখানেই সারতে হয় মাধবীলতাকে। মাধবীলতা বলল, 'আমাদের খেতে একটু দেরি হবে আজকে। এখনও তেল পাইনি।'

'তেল ?'

'কেরোসিন। আমার তো স্টোভই ভরসা। মোড়ের দোকানে বলে রেখেছি। তেল না পেলে হোটেল থেকে খাবার আনতে হবে।'

'তা হলে তো মুশকিল।'

'এই সব মুশকিল নিয়েই তো আমাকে থাকতে হয়। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তুমি কখন বের হও স্কুলে ?'

'সকালে। রান্না করে দুজনে খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'দুজনে ?'

'ও স্কুল যায়। ছুটির পরে দুঘণ্টা যাতে স্কুলে বসে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। তার মধ্যে চলে আসি আমি। ও অবশ্য থাকতে চায় না, কী করা যাবে!'

'তোমরা একা থাকো, এখানে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলে না ?'

'না। সমাজের উঁচু তলায় যেমন মানুষ মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঠিক এই নিচুতলার মানুষেরা তেমনি ঘোঁট পাকায় না। যত কিছু গোলমাল তা ওই মধ্যবিত্ত নিয়ে। আমি এখানে বেশ আছি।'

'ছেলের কোনও অসুবিধে হয় না ?'

'হয়। গালাগালি শুনছে দিনরাত। শিখছেও নিশ্চয়ই। আমি যেটুকু পারি সামলে রেখেছি। কদ্দিন পারব জানি না।'

'বুঝলাম।'

'কী বুঝলে ?'

'আমার কোনও ভূমিকা নেই!'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি যদি এখানে না থাকতে চাও তা হলে আমার কী সাধ্য তোমাকে আটকে রাখি। আমি তোমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এলাম কারণ আমি চাই ছেলে তোমাকে একবার দেখুক। তুমি যদি বলো ওর পিতৃত্বের কোনও দায়িত্ব তুমি নেবে না, আমি কি তোমাকে জোর করতে পারি! চা খাবে ?'

'না।'

'যা তেল আছে দু কাপ চা হয়ে যেত।'

'ভাল লাগছে না।'

BanglaBook.org

মাধবীলতা এগিয়ে এসে অনিমেষের সামনে বসল। তারপর খুব গাঢ় গলায় বলল, 'অনিমেষ, আমাদের আইনসম্মত বা সামাজিক বিয়ে হয়নি। তুমি সেগুলোকে মানো কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু যে মেয়ে এত বছর ধরে সন্তানকে বড় করেছে তার কাছে ও সবের কোনও মূল্য নেই। এখন আমি নতুন করে তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি ভেবে দেখো, আমি জোর করব না।'

'কী ভাবতে বলছ?' অনিমেষ হেসে ফেলল।

'হাসির কথা নয়। তুমি কি আমাকে স্ত্রী বলে মনে করো?'

'এ প্রশ্ন কেন? আমি কি তোমাকে সেভাবে পরিচয় করাইনি?'

'তা হলে আমার জন্যে অপেক্ষা না করে তুমি ওদের সঙ্গে চলে গেলে কেন? আমি যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি তুমি জানতে না?'

এই প্রথম অনিমেষ মাধবীলতাকে থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখল। মাধবীলতার কাঁধে হাত রাখল সে। মাধবীলতা খাদের শেষপ্রান্তে এসে অনেক চেষ্টার পর নিজেকে সামলে নিল। অনিমেষ বলল, 'কোনওদিন তোমাকে কিছু দিতে পারিনি, শুধু দু-হাত ভরে তোমার কাছ থেকে নিয়েই চলেছি। এ যে আমার কী লজ্জা—!'

মাধবীলতা মুখ তুলল। সেই মুখ, যা কিনা শত পদ্মের চেয়ে উজ্জ্বল, বলল, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না। আমি তো তোমার কাছে থেকে কিছুই চাইনি কোনও দিন, শুধু তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে মনে হয় তা আমার জন্যেই করছি—এতটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে কেন?'

অনিমেষ দু'হাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরল। বোধহয় এইরকম মুহূর্ত মাধবীলতার জীবনে অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। সে শিশুর মতো অনিমেষের বুকে মুখ রাখল। ওরা অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না। পেছনে দরজা হাট করে খোলা এই খেয়াল এখন ওদের নেই। অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, 'লতা, আমাকে ক্ষমা করো।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল মাধবীলতা। তারপর অনিমেষের চোখে ভেজা চোখ রেখে বলল, 'ছি! আমাকে এ ভাবে তুমি ছোট কোরো না।'

তারপর একটু সজাগ হয়ে বলল, 'দেখেছ কাণ্ড, দরজাটা খোলা রয়েছে সে-কথা মনেই নেই। তুমি বসো, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

অনিমেষ বলল, 'আমার খিদে নেই।'

মাধবীলতা হাসল, 'আমার আছে। আর তিনি তো এখনই এক পেট খিদে নিয়ে আসছেন। তুমি বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'সে কোথায়?

'স্কুলে। আজকে হাফ ছুটি। আসবার সময় আমি নিয়ে আসব। তুমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও।'

'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, তুমি ক্রাচ নিয়ে চলতে পারবে কিনা জানো?'

'না।'

'তা হলে একটা হুইল চেয়ার কিনতে হয়।'

'তার অনেক খরচ। তোমাকে ও সব ভাবতে হবে না। আমার যা করে হোক চলে যাবে। শুধু ভাবছি, একা এমন ভাবে বসে বসে সারা দিনরাত কী করব!'

'একা কেন, আমি আছি, আমরা আছি। তুমি কিন্তু এখনও মেনে নিতে পারছ না!'

'না, তা নয়। এ ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না।'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে খাটের এ পাশে চলে এল। তারপর অনিমেষের চুলে হাত রেখে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'হয়তো আমি অনেক কিছু বুঝি না। কিন্তু এইটুকু অন্তত বুঝি, আমাকে যা করতে হবে তা আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে করব। যে জানবে সে জানবে, আমি কিন্তু কাউকে জানাতে যাব না।'

'কী কথার কী জবাব হল!'

'একটু ভাবো তা হলে জবাবটাকে খুঁজে পাবে। নাঃ, আর দেরি করলে চলবে না। আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি, কেমন?'

'লতা, তুমি যেরকম পরিশ্রম করছ—।'

BanglaBook.org

'এই পরিশ্রমের একটা আনন্দ আছে। এবার আমি বলি, সেই আনন্দটা তুমিও বুঝবে না।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মাধবীলতা ব্যাগ আর টিন নিয়ে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ বালিশটাকে সামান্য সরিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আঃ, কী আরাম। কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল সে। বস্তিতে নানারকমের চিৎকার উঠছে। এই ঘরে ঢোকার পর থেকেই বোঝা গেছে এখানে এক মুহূর্ত কেউ চুপচাপ কাটাতে পারে না। মাধবীলতার পক্ষে নিশ্চয়ই প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয়েছিল। আশেপাশের মানুষ, এই ঘর—কোনটাই ওর রুচির সঙ্গে মানানসই নয়। অথচ কী চমৎকার মানিয়ে আছে ও। স্বর্গছেঁড়া কিংবা জলপাইগুড়িতে থাকতে অনিমেষ স্বপ্নেও ভাবেনি তার স্ত্রী এবং ছেলে বস্তির এই পরিবেশে দিন কাটাবে।

ঘুম আসছিল না। মিনিট দশেক বাদে অনিমেষ দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। দুটো পাকে সযত্নে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল সে। যত দিন যাচ্ছে তত লিকলিকে হয়ে যাচ্ছে ওগুলো। চিমটি কাটলে লাগে কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতো ওগুলোকে নাড়ানো যায় না। কাতর চোখে কিছুক্ষণ নিজের দুটো পা চেয়ে চেয়ে দেখল অনিমেষ। তারপর হঠাৎ সচেতন হতেই ঘরের চারপাশে নজর বোলাল। খাটের পাশ মেঝেতে যেটা রয়েছে সেটা যে একটা বেডপ্যান তা বুঝতে অসুবিধে হবার নয়। মাধবীলতা আগে থেকেই সেটা আনিয়ে রেখেছে। ঠোঁট কামড়াল অনিমেষ।

টেবিলের ওপর কোনও ছবি নেই। কিছু বইপত্র আর চিঠি। অনিমেষ একটা খাম তুলে ধরল। খামের ওপর নাম লেখা মাধবীলতা মিত্র। নামটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অনিমেষ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা মেয়ের মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। যে মেয়ে এই পৃথিবীর কাউকে কেয়ার করে না অথচ একটুও উদ্ধত নয়, যে অকারণে কোনও বাধার কাছে মাথা নোয়ায় না অথচ একটুও দাম্ভিক নয়, সেই মেয়ে একটা সুখের পরিমণ্ডল ছেড়ে শুধু ভালবাসার জন্যে একা একা লড়ে গেল, কখনও কোনও আপস করল না। শান্তিনিকেতনের সেই রাতের ঘটনা অনিমেষের মনে কিছুটা গ্লানি ছিটোলেও তা স্পর্শ করেনি এই মেয়েকে। পরম যত্নে সেই রাতটাকে সে অক্ষয় করেছে। এই কলকাতায় একা একটি অল্পবয়সী মেয়ে সেই রাতের ফসল দশমাস শরীরে ধরে নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেছে আইনের কোনও অধিকার ছাড়াই, কোনও প্রত্যাশা মনে না রেখেই। এটা এমন এক ধরনের লড়াই যা নিজেকে পরিশুদ্ধ করে। কোনওরকম ব্যাকরণ না মেনে এইভাবে লড়াই করে যাওয়া বোধহয় রাজনীতিতে সম্ভব নয় কিন্তু একটি মেয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব বলা যাবে না কেন? মাধবীলতা কারও কাছে সফলতা ভিক্ষে করেনি, সাফল্য সে আদায় করে নিয়েছে। সেটা পেরেছে বলেই সে নামের পাশে মিত্র লিখতে পারে, অনিমেষ তার পাশে থাকুক কিংবা না থাকুক, এই মানসিকতা কিছুতেই পালটাবে না।

আলনায় ছোট ছোট জামাপ্যান্ট ঝুলছে। নীচে একটা রবারের শস্তা হাওয়াই চটি। অনিমেষের সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ল মাধবীলতাকে ওর নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কী নাম রেখেছে মাধবীলতা? সে টেবিলের ওপর আর একবার খোঁজ করল। না, কোনও শিশুর বইপত্র নেই। যা আছে মাধবীলতার। ছেলেটার বই কোথায় রাখে? ঘরে তো আর কোনও রাখার জায়গা নেই। এই ঘরে একা বসে থাকা অনিমেষের উপকারে এল। এলোমেলো ভাবনা চিন্তাগুলো একসময় গুটিয়ে গিয়ে সে কিছুটা সুস্থ হতে পারল। সে আত্মহত্যা করতে পারবে না। পৃথিবীতে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। অনেকদিন আগে সে একটা রাশিয়ান গল্প পড়েছিল। মরুভূমির মধ্যে একটা পাহাড়ে বছরে একবার বৃষ্টি হত কিনা সন্দেহ। সেখানে জমি পাথুরে, কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। বাতাস সারা দিনই তেতে থাকত, শুধু শেষ রাতে একটু শীতল ছোঁয়া লাগত তাতে। জলের চিহ্ন নেই কয়েকশো মাইলের মধ্যে। পাখি দূরের কথা, হায়েনারাও এই পাহাড়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। এরকম এক জায়গায় হঠাৎ একটা বীজ এসে পড়ল পাথরের খাঁজে। পাথরের আড়াল বলেই বোধহয় হাওয়ার দাপটে সেই বীজটা উড়ে গেল না। কোত্থেকে এল সেটা কে জানে, হয় কোনও পথিক ফেলে গেছে নয় ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে এনেছে। বীজটার গায়ে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতেই তার শরীর টানটান হল। তার তলায় মাটি নেই কিন্তু ধুলো রয়েছে। দেখা গেল, বাতাস, সেই ভোরের বাতাস থেকে সে নিশ্বাস এবং আহার খুঁজে নিয়ে একটু একটু করে মুখ তুলছে, সারা দিনের রোদ ও গরম হাওয়া তাকে যতই পুড়িয়ে মারতে চায় তত সে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসকে জড়িয়ে ধরে। এইরকম লড়াই চলল কিছুদিন। বীজ থেকে ছোট্ট গাছ হল। পাথরটার আড়ালে আড়ালে সে বড় হল। সূর্য আর গরম হাওয়া ঠিক করল আর একটু বড় হলেই ওটাকে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তখন ওরা জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু যেই গাছটা মুখ তুলল দেখা গেল সেটা পাতা বা ডাল নয়, সূর্যের মুখ

চাওয়া ফুল। ছোট্ট সুন্দর। সূর্যের স্পর্শ পেয়ে সুন্দরতর হল। এই ঊষর মরুভূমিতে সে একদিন মৌমাছি ডেকে আনল।

অনিমেষের মনে হল তাকেও এমনি ভাবে লড়তে হবে। এই ঘরে বসে সে নিঃশব্দে লড়াই করে যেতে পারে। শুধু সেই লড়াইয়ের জন্যে তাকে মনে মনে প্রস্তুত হতে হবে। না, আর ভেঙে পড়া নয়। জীবনটা বড্ড ছোট, বাকি দিনগুলো সুন্দরভাবে খরচ করা দরকার। খুব ছেলেবেলা থেকেই যেদিনের কথা তার জ্ঞানে আছে সেদিন থেকেই সে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ভাল এবং মন্দ দুটোই এক সঙ্গে চিন্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটা মাধবীলতার মধ্যে একদম নেই। মাধবীলতা যদি কারও সাহায্য ছাড়াই একা লড়াই করে যেতে পারে তা হলে সে কেন পারবে না। পঙ্গুও তো পাহাড় পার হয়। একটু একটু করে নিজেদের ভুলগুলো ক্রটিগুলো নিয়ে চিন্তা করা দরকার। আজকের এই হেরে যাওয়া থেকে যে অভিজ্ঞতা হল তাকে কাজে লাগানো দরকার। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই দেশে কখনওই সর্বাত্মক বিপ্লব হয়নি। স্বাধীনতার পর এই প্রথম একটা চেষ্টা হয়েছিল। কয়েকটা ভুল-পা হেঁটে এলেও হাঁটা তো হয়েছিল। এরপরে যারা হাঁটবে তারা সেই ভুলটা করবে না।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে দলের কারও সঙ্গে দেখা করার কথা মাথায় আসেনি। নিজে থেকেও কেউ যোগাযোগ করেনি। অনিমেষ ঠিক জানে না তাদের দলের ছেলেরা এখনও সক্রিয় কি না। গোপনে কেউ আবার আগুন জ্বালাবার কথা ভাবছে কি না। কিন্তু যারাই সেই ভাবনা-চিন্তা করুক তাদের আগে মাটিতে পা রাখতে হবে।

তন্দ্রা এসেছিল। দরজায় শব্দ হতেই চোখ খুলল অনিমেষ। মাধবীলতা ফিরেছে। হাতে কেরোসিনের টিন, কাঁধে বাজারের ব্যাগ আর মুখ পেছন দিকে ফেরানো। খুব সহজ গলায় ডাকল, 'ওদিকে যেয়ো না, ঘরে এসো।'

দরজাটা হাট করে খুলে দিল সে। বাইরে ঝকঝকে রোদ্দুর। অনিমেষ দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে কোনওরকমে সোজা করে নিল। তারপর সতৃষ্ণ চোখে বাইরের দিকে তাকাল।

মাধবীলতা এখনও দরজা থেকে সরেনি। তার চোখ অনিমেষের মুখের ওপর স্থির। কয়েক মুহূর্ত বাদে অনিমেষ ওকে দেখতে পেল। দেখে চমকে উঠল।

অনিমেষের বুকের মধ্যে এখন একশোটা হিরোশিমা দুলছে। চারপাশ ভেঙে চুরে গলে জ্বলে অন্ধকার হয়ে গেল আচমকা। তারপর ক্রমশ ধোঁয়া সরে গেলে সেই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের বুক শান্ত করে বয়ে যাওয়া আংরাভাসা নদীর ওপর উপুড় হয়ে থাকা শিশু কিংবা বালকটি সামনে এসে দাঁড়াল। অপার বিস্ময় নিয়ে যে লাল চিংড়ি মাছদের খেলা করতে দেখত। অবিকল সেই চোখ, সেই মুখ, এমনকী তাকানোর ভঙ্গিটাও একই রকম। অনিমেষের মনে হল অনেক অনেক বছর আগের সে এখনকার তাকে দুচোখ ভরে দেখছে।

সেই বালক বলছে, 'কেমন আছ অনিমেষ?'

এই মধ্যবয়স জবাব দিচ্ছে, 'ভাল না, একদম ভাল না।'

'তোমার তো এমন হবার কথা ছিল না।'

'আমি যখন তুমি ছিলাম তখন ছিল না। তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি যখন তুমি ছিলাম তখন সত্যি ভাল ছিলাম।'

'আমার শরীরটা তোমার মতো হয়ে গেলে—।'

'না কক্ষনও নয়।'

মাধবীলতার গলা শোনা যেতেই সব কিছু মিলিয়ে গেল আচমকা। দরজার ফ্রেমে ছবির মতো এখনও মাধবীলতা এবং সে। মাধবীলতা বলল, 'অমন করে কী দেখছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল তারপর হাসবার চেষ্টা করল, 'এসো।'

ডাকটা যার উদ্দেশে সে তখন মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দুটো বড় চোখ মেলে এদিকে তাকিয়ে আছে। পায়ে ময়লা সাদা মোজা জুতো, প্যান্টশার্টের ওপর দীনতার ছাপ। পিঠে বই-ভরতি স্কুলের ব্যাগ।

মাধবীলতা বলল, 'ডাকছেন, যাও।'

একটু দ্বিধা কাটাতে সময় লাগল। তারপর মাধবীলতার আঁচল ছেড়ে সে ছোট ছোট পা ফেলে খাটের দিকে এগিয়ে এল। এসে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনিমেষ দেখল ওর চোখ এখন তার পায়ের দিকে। চোখ কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে ভাঁজ।

BanglaBook.org

সহজ হবার চেষ্টায় অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'বলো তো আমি কে?'

সে চোখ তুলল, তুলে আবার পায়ের ওপর নজর রাখল, 'তুমি হাঁটতে পারো না?'

অনিমেষ ওই এক চিলতে দৃষ্টিতে বুঝে নিল মাধবীলতা ওর কাছে কিছু গোপন রাখেনি। তার গলা ভারী হয়ে গেল, 'না।'

'পুলিশ করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

বুকের ঝড়টাকে কোনওরকমে শান্ত করছিল অনিমেষ। দুহাত বাড়িয়ে বলল, 'অত দূর থেকে কি গল্প করা যায়? আমি তো তোমার কাছে যেতে পারব না, তুমি আমার কাছে এসো।'

মাধবীলতার শরীরটা কাছে চলে এল। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে দিল দু-হাতের আলিঙ্গনে। এখন অনিমেষের দুহাতে এক তাল নরম কাদা, যা নিয়ে ইচ্ছে মতন মূর্তি গড়া যায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org